আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

ইসলামের ইতিহাস ঃ আদি-অন্ত

প্রথম খন্ড

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

(ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত)

প্রথম খণ্ড

মূল

আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)

মূল কিতাব পরিমার্জন ও সম্পাদনায়

* ড. আহমদ আবূ মুলহিম
* ড. আলী নজীব আতাবী
* প্রফেসর ফুয়াদ সাইয়েদ
* প্রফেসর মাহদী নাসির উদ্দীন
* প্রফেসর আলী আবদুস সাতির

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (প্রথম খণ্ড)
মূল : আবুল ফিদা হাফিজ ইব্ন কাসীর আদ-দামেশ্কী (র)
অনুবাদ : মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ এমদাদ উদ্দীন
মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
মাওলানা বোরহান উদ্দীন
মাওলানা মোঃ আবু তাহের
ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন : ১৭১
ইফাবা প্রকাশনা : ১৯৮৪/১
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.০৯
ISBN : 984-06-0565-8

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০০
দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৭
আষাঢ় ১৪১৪
জমাদিউস সানি ১৪২৮

মহাপরিচালক
মোঃ ফজলুর রহমান

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ : **জসিম উদ্দিন**

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ **মডার্ণ কম্পিউটার্স**

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মুহাম্মদ আবদুর রহীম শেখ
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১১২২৭১

মূল্য : ২৮২.০০ টাকা

AL-BIDAYA WAN NIHAYA (FIRST VOLUME) (Islamic History : First to Last—First Volume): Written by Abul Fidaa Hafiz Ibn Kasir Ad-Dameshki (R) in Arabic, translated by Maulana Syed Muhammad Emdad Uddin, Maulana Muhammad Muhiuddin, Maulana Burhan Uddin and Maulana Md. Abu Taher into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 June 2007

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 282.00 ; US Dollar : 9.00

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
রাজনৈতিক অবস্থা	১৩
অর্থনৈতিক অবস্থা	২০
শিক্ষা ব্যবস্থা	২২
ইব্‌ন কাসীর (র)-এর জীবনী	২৫
সৃষ্টি জগতের সূচনা	৪৩
আর্‌শ ও কুরসী সৃষ্টির বিবরণ	৫৩
সাত যমীন প্রসঙ্গ	৭০
সাগর ও নদ-নদী	৭৫
পরিচ্ছেদ	৮৬
ফেরেশতা সৃষ্টি ও তাঁদের গুণাবলীর আলোচনা	১১১
পরিচ্ছেদ	১২৯
জিন সৃষ্টি ও শয়তানের কাহিনী	১৪১
আদম (আ)-এর সৃষ্টি	১৬৯
আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর বাদানুবাদ	২০১
হাদীসে আদম (আ)-এর সৃষ্টি প্রসঙ্গ	২০৫
কাবীল ও হাবীলের কাহিনী	২১৬
ইদ্‌রীস (আ)	২২৮
নূহ (আ)-এর কাহিনী	২৩০
হযরত হূদ (আ)-এর কাহিনী	২৭৫
হযরত সালিহ্‌ (আ)-এর বর্ণনা	৩০১
হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর ঘটনা	৩২১
ইসমাঈল যাবীহুল্লাহ (আ)-এর ঘটনা	৩৫৫
ইসহাক (আ)-এর জন্ম	৩৬১
বায়তুল আতীক বা কা'বাগৃহ নির্মাণ	৩৬৭
হযরত ইবরাহীম খলীল (আ)-এর প্রশংসায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)	৩৭৫
কওমে শু'আয়ব বা মাদ্‌য়ানবাসীর ঘটনা	৪১০
হযরত ইসমাঈল (আ)	৪২৯

ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (আ)	৪৩৩
হযরত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা	৪৪২
হযরত আইয়ূব (আ)-এর ঘটনা	৪৯২
যুল-কিফ্ল-এর ঘটনা	৫০০
ইউনুস (আ)-এর বর্ণনা	৫১২
মূসা কালীমুল্লাহ (আ)-এর বিবরণ	৫২৩
পরিচ্ছেদ	৫৭৩
ফিরআউন ও তার বাহিনী ধ্বংসের বিবরণ	৫৯৭
ফিরআউনের ধ্বংসোত্তর যুগে বনী ইসরাঈলের অবস্থা	৬১১
মূসা (আ) ও খিযির (আ)-এর ঘটনা	৬৫৮
মূসা (আ)-এর সাথে কারূনের ঘটনা	৬৮৬
মূসা (আ)-এর ফযীলত স্বভাব গুণাবলী ও ওফাত	৬৯৩
খিযির (আ) ও ইলিয়াস (আ)-এর ঘটনা	৭১৯
ইলিয়াস (আ)	৭৩৯

মহাপরিচালকের কথা

'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' প্রখ্যাত মুফাসসির ও ইতিহাসবেত্তা আল্লামা ইবনে কাসীর (র) প্রণীত একটি সুবৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সৃষ্টির শুরু তথা আরশ, কুরসী, নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল প্রভৃতি এবং সৃষ্টির শেষ তথা হাশর-নশর, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

এই বৃহৎ গ্রন্থটি ১৪টি খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাসীর (র) তাঁর এই গ্রন্থকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে আরশ, কুরসী, ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সব কিছু তথা ফেরেশতা, জিন, শয়তান, আদম (আ)-এর সৃষ্টি, যুগে যুগে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের ঘটনা, বনী ইসরাঈল, ইসলাম-পূর্ব যুগের ঘটনাবলী এবং মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাতকাল থেকে ৭৬৮ হিজরী সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের বিভিন্ন ঘটনা এবং মনীষীদের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে ফিৎনা-ফাসাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, কিয়ামতের আলামত, হাশর-নশর, জান্নাত-জাহান্নামের বিবরণ ইত্যাদি।

লেখক তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিটি আলোচনা কুরআন, হাদীস, সাহাবাগণের বর্ণনা, তাবেঈন ও অন্যান্য মনীষীর উক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। ইবন হাজার আসকালানী (র), ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী (র) প্রমুখ ইতিহাসবিদ এই গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) এবং ইবন হাজার আসকালানী (র) গ্রন্থটির সার-সংক্ষেপ রচনা করেছেন। বিজ্ঞজনদের মতে, এ গ্রন্থের লেখক ইবনে কাসীর (র) ইমাম তাবারী, ইবনুল আসীর, মাসউদী ও ইবন খালদুনের ন্যায় উচ্চস্তরের ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও ইতিহাসবেত্তা ছিলেন।

বিখ্যাত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রথম খণ্ড পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। আমরা গ্রন্থখানির অনুবাদক ও সম্পাদকমণ্ডলীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। গ্রন্থটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে যাঁরা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবাইকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের এ শ্রম কবূল করুন। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

প্রথম মানব-মানবী হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে মানব সভ্যতার শুভ সূচনা হয়েছে। হযরত আদম (আ) ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা এবং সর্বপ্রথম নবী। আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টির পর তাঁর বিধি-বিধান আম্বিয়া-ই-কিরামের মাধ্যমেই মানব জাতির কাছে পৌঁছিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ সহীফা অথবা কিতাব নিয়ে এসেছেন। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা, আম্বিয়া-ই-কিরামের আগমন ও তাঁদের কর্মবহুল জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই ইসলামের নির্ভুল ইতিহাস জানার জন্য কুরআন ও হাদীসই হলো মৌলিক উপাদান। আজ বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কুরআন-হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্য প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত।

আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর (র) কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে আল্লাহ তা'আলার বিশাল সৃষ্টিজগতসমূহের সৃষ্টিতত্ত্ব ও রহস্য, মানব সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আম্বিয়া-ই-কিরামের সুবিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত এই বৃহৎ গ্রন্থটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় একটি ইতিহাস গ্রন্থ। লেখক গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত করে রচনা করেছেন।

গ্রন্থের প্রথম ভাগে সৃষ্টিজগতের তত্ত্ব-রহস্যাবলী, আদম (আ) থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত আম্বিয়া-ই-কিরামের ধারাবাহিক আলোচনা, বনী ইসরাঈল ও আইয়ামে জাহেলিয়াতের ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর থেকে ৭৬৮ হিজরী পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য খলীফা, রাজা-বাদশাহগণের উত্থান-পতনের ঘটনা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক বিষয়াবলীর সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ভাগে রয়েছে মুসলিম উম্মাহর অশান্তি ও বিপর্যয়ের কারণ, কিয়ামতের আলামতসমূহ, হাশর-নশর, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির বিশদ বিবরণ। তাই ইসলামের ইতিহাস চর্চাকারীদের জন্য গ্রন্থটি দিক-নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

গ্রন্থটির গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সবগুলো খণ্ড অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে গ্রন্থটির ৯ খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সুবিধার্থে 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'র বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত'। গ্রন্থটির অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের সবাইর প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ।

গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ২০০০ সালে অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এর সকল কপি ফুরিয়ে যায়। ব্যাপক পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে বর্তমানে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা আশা করি বইটি পূর্বের মতোই পাঠক মহলে সমাদৃত হবে। আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবূল করুন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান (সভাপতি)

মাওলানা আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী (সদস্য)

পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ (সদস্য সচিব)

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

প্রথম খণ্ড

ক. রাজনৈতিক অবস্থা

ভূমিকা

হিজরী ৭ম শতাব্দীতে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অনেক বিপ্লবাত্মক ঘটনা সংঘটিত হয়। ৬৫৬ হিজরী/১২৫৮ খৃঃ সনে তাতারীরা বাগদাদ আক্রমণ করে এবং প্রায় বিশ লাখ মুসলমানকে হত্যা করে।[১] তাতার রাজবংশের ঊর্ধতন পুরুষ হালাকু খান।[২] ২ লাখ যোদ্ধা নিয়ে হালাকু খান এই অভিযান পরিচালনা করে। শহরের পর শহর ও জনপদ ধ্বংস করে সে সদলবলে বাগদাদে এসে পৌঁছে। তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্যে বাদগাদে তখন মাত্র দশ হাজারের অধিক অশ্বারোহী সৈনিক ছিল না। অন্যান্য সৈনিক নিজ নিজ এলাকা ত্যাগ করে চলে যাবার পর এরাই কেবল অবশিষ্ট রয়েছিল। তাদের অনেকেই নিজ নিজ এলাকা থেকে উৎখাত হওয়ার পর তাদের অবস্থা এতই করুণ হয়ে দাঁড়ায় যে, বাজারে ও মসজিদের দরজায় দরজায় ভিক্ষাপ্রার্থী হয়। তাদেরকে লোকজনের করুণা ভিক্ষা করতে দেখা যায়।[৩]

উযীর ইব্ন আলকামী মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইব্ন আবী তালিবকে কেন্দ্র করে সন্দেহ আবর্তিত হয়ে থাকে। ইব্ন আলকামী ছিল খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ্‌র উযীর।[৪] তাতারদের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা ও হালাকু খাঁর সাথে তার ঘনিষ্ঠতাই এ সন্দেহের কারণ।

(১) খিলাফত

তাতাররা বাগদাদের শেষ আব্বাসী খলীফা মুসতাসিমকে হত্যা করে বাগদাদে আব্বাসী খিলাফতের অবসান ঘটায়।[৫] তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সক্ষম সকল নারী-পুরুষ, শিশু-যুবক ও বৃদ্ধকে তারা হত্যা করে। বাগদাদে নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় বিশ লাখ।[৬] কতক বিধর্মী, একদল ব্যবসায়ী এবং ইব্ন আলকামীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণকারী লোকজন ও অল্প কিছু লোক ব্যতীত বাগদাদের কেউই রক্ষা পায়নি। একাদিক্রমে ৪০ দিন এই হত্যাযজ্ঞ চলে।

খলীফা মুসতাসিমের সাথে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবুল আব্বাস আহমদ এবং মেজো পুত্র আবুল ফযল আবদুর রহমান নিহত হন। তিন বোনসহ তাঁর ছোট ছেলে মুবারক বন্দী হন।

---

(১) ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৩, পৃঃ ২১৫।
(২) প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬২ ।
(৩ প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৩।
(৪) প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৫
(৫) আল মুসতা'সিম বিল্লাহ্ ঃ আবূ আহমদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আল-মুসতানসির বিল্লাহ্। জন্ম ৬০৯ হিজরীতে, খিলাফতের বায়আত ৬৪০ হিজরীতে। নিহত ৬৫৬ হিজরীতে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন ১৫ বছর।
(৬) ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৩, পৃঃ ২১৬।

রাজধানী থেকে প্রায় এক হাজার কুমারী মেয়েকে বন্দী করা হয়। নির্যাতনের ভয়াবহতা এত করুণ ছিল যে, রাজধানী থেকে এক একজন আব্বাসী লোককে ধরে আনা হত অতঃপর তার ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রী-পরিজনসহ সবাইকে খিলাল কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হত। অতঃপর তাদের সম্মুখে বকরী জবাই করার মত তাকে জবাই করে দেয়া হত। তার কন্যা ও দাসীদের মধ্য থেকে যাদেরকে পছন্দ হত বন্দী করে নিয়ে যেত। এ পর্যায়ে তিন বছর পর্যন্ত খিলাফতের মসনদ খলীফা-শূন্য ছিল।

অবশেষে আবুল কাসিম আহমদ ইব্‌ন যাহিরের আবির্ভাব ঘটে। আবুল কাসিম ছিলেন খলীফা মুসতানসির বিল্লাহ্-এর ভাই এবং বাগদাদের শেষ খলীফা মুসতা'সিম বিল্লাহ্‌র চাচা। তিনি বাগদাদে বন্দী ছিলেন। পরে মুক্তি পেয়েছিলেন। এরপর তিনি মিসর, সিরিয়া ও আরব উপদ্বীপের কর্তৃত্বের অধিকারী যাহিরের নিকট যান।[৭] সেখানকার কাজী সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তারপর যাহির, তাঁর উযীরবর্গ ও অন্যান্য প্রশাসক তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। মুসতানসিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা তাঁর ভাই মুসতানসির বিল্লাহ্-এর নাম অনুসারে তাঁকে মুসতানসির বিল্লাহ্ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এটি ৬৫৯ হিজরীর ঘটনা। তখন তিনি মালিকুয যাহিরকে 'সুলতান' মনোনীত করেন। তাঁকে কালো জুব্বার খেলাত গলায় মালা এবং তাঁর পায়ে স্বর্ণের মল পরিয়ে দেয়া হয়। সচিব (রঈসুল কুত্তাব) খলীফার পক্ষ থেকে 'সুলতান' মনোনয়নের ঘোষণাপত্র পাঠ করে শুনালেন।[৮] এরপর খলীফা বাগদাদে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। সুলতান তাঁকে দশ লাখ স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন।[৯]

৬৬০ হিজরী সনের ৩রা মুহাররাম তাতারদের হাতে খলীফা নিহত হন। মালিকুয যাহিরের সেনাবাহিনী পরাজিত হয় এবং এক বছর যাবত খলীফার পদ শূন্য থাকে। অবশেষে ৬৬১ হিজরী সনের[১০] ২রা মুহাররাম হাকিম বি-আমরিল্লাহ্ আবুল আব্বাস আহমদ ইব্‌ন আবী আলী আল কাবী ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন মুসতারশিদ বিল্লাহ্-এর বংশ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর হাতে বাইয়াত সম্পন্ন হয়। ৪০ বছর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। ৭০১ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। অতঃপর তার পুত্র মুসতাকফী বিল্লাহ্ খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি রীতিমত খিলাফতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ৭৩৭ হিজরী সনে সুলতান নাসির মুহাম্মদ ইব্‌ন কালাউন তাঁকে বন্দী করে এবং জনসাধারণের সাথে তাঁর মেলামেশা নিষিদ্ধ করে দেয়। নজরবন্দী অবস্থায় ৭৪০ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

---

(৭) যাহির হল রুকনুদ্দীন বায়বার্স আল বুন্দুকদারী। সুলতান মালিক মুযাফফর কুতুযকে হত্যার পর লোকজন তাঁকে আল-মালিকুয যাহির উপাধি প্রদান করে। ৬৫৮ হিঃ সনে তিনি মিসর গমন করেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করেন। এক বছরের মধ্যে সিরিয়ার শাসন ক্ষমতা একে একে নাসির উদ্দীন ইব্‌ন আযীয তারপর হালাকু এবং তারপর মুযাফফর কুতুযের হাত বদল হওয়ার পর যাহির বায়বার্সের হাতে এসে স্থির হয়। অবশ্য আল মুজাহিদ নাম নিয়ে সানজার তাঁর সাথে প্রথমে অংশীদারিত্ব নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যাহির-ই একচ্ছত্র সুলতানাতের অধিকারী হন।

(৮) ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া, খঃ ১৩, পৃঃ ২৪৫।

(৯) প্রাগুক্ত পৃঃ ২৪৫।

(১০) প্রাগুক্ত পৃঃ ২৫০।

এরপর মুতাযিদ বিল্লাহ্ খিলাফতের মসনদে আসীন হন। ৭৬৩ হিজরী পর্যন্ত তাঁর খিলাফত অব্যাহত থাকে। তারপর মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্ খলীফা নিযুক্ত হন। খলীফার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার বর্ণনা স্বরূপ আমরা উল্লেখ করছি যে, খলীফা মুসতাকফী বিল্লাহ্ তাঁর পরবর্তী খলীফারূপে তাঁর পুত্র আহমদ আবী রাবীকে মনোনীত করে যান। কিন্তু সুলতান নাসির তাতে বাদ সাধেন। বরং আবী রাবী-এর ভ্রাতুষ্পুত্র আবূ ইসহাক ইবরাহীমকে তিনি খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি খলীফাকে আল ওয়াছিক উপাধি প্রদান করেন। কায়রোতে এক জুমু'আর নামাযে তিনি খলীফার পক্ষে খুতবা দেন। অতঃপর মনসূর এসে ইবরাহীমকে বরখাস্ত করেন এবং আবুল কাসিমকে খলীফা নিযুক্ত করেন। মনসূর তাঁকে মুসতানসির বিল্লাহ্ উপাধি দেন।

যাহোক, কায়রোতে অবস্থানকালে আব্বাসী খলীফাগণ বাগদাদে অবস্থানের তুলনায় ভালই ছিলেন। চরম দুরবস্থার দিনেও সুলতানগণ কায়রোর খলীফাদেরকে দেশান্তরিত করতেন কিংবা বরখাস্ত করতেন মাত্র। কিন্তু অঙ্গ কর্তন কিংবা হত্যা করা পর্যন্ত তা গড়াতো না। ঘটনা পরম্পরায় এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রথম দু'জন খলীফা তাদের নেতৃত্বে তাতারদের হাত থেকে বাগদাদ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অন্যান্য খলীফা এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেননি বিধায় এবং সুলতানগণ কর্তৃক মনোনয়ন ব্যতীত তাদের নিজস্ব কোন মান-মর্যাদা না থাকায় তাদের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এ সময়ে খিলাফতের পদবীটি একটি প্রতীকী ও ক্ষমতাহীন পদরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। অবশেষে ১৫১৭ খৃঃ সুলতান সালীম উছমানী কায়রো আগমন করেন এবং খিলাফতের পদ অধিকার করেন। তিনি দাবি করেন যে, শেষ খলীফা তাঁর সমর্থনে ঐ পদ থেকে ইস্তেফা দিয়েছেন।

(২) সুলতানী শাসন

৬৭৬ হিজরী থেকে ৭৭৬ হিজরী পর্যন্ত মিসর, সিরিয়া ও মক্কা-মদীনায় ২১ জনের অধিক সুলতান রাজত্ব করেছেন। এ থেকেই সুলতান পদবীটির অস্থিরতা ও দুর্বলতার দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত সুলতানগণ উচ্চপদস্থ আমীর-উমারা ও তুর্কী সেনাধ্যক্ষদের হাতের পুতুলে পরিণত হন। সুলতান পদবীটিও খলীফা পদের ন্যায় নামসর্বস্ব হয়ে পড়ে। উভয় পদই তখন নেহাৎ প্রতীকী রূপ ধারণ করে। প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় আমীর-উমারা ও নায়েবদের হাতে। সুলতানগণ তাদের ক্রীড়নকে পরিণত হন। তারা যাকে ইচ্ছা ক্ষমতায় বসাত আর যাকে ইচ্ছা অপসারিত করত। অনেককেই নিতান্ত অল্প বয়সে সুলতান পদে বসানো হয়েছে। সুলতান মনসুর সালাহউদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন মুযাফফর হাজী সুলতান পদে আসীন হয়েছিলেন মাত্র ১২ বছর বয়সে।[১১] শা'বান ইব্ন হুসায়ন যখন সুলতান হন তখন তাঁর বয়স ১০ বছরের বেশি ছিল না।[১২] আশরাফ নিহত হওয়ার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, নাসির মুহাম্মদকে সুলতান পদে বসানো হবে। তখন তিনি ৮ বছরের বালক মাত্র।[১৩] এমনও দেখা যেত যে, কোন কোন আমীর রাতে গৃহবন্দী হয়ে ঘুমোতেন আর ভোরে তিনি সুলতান পদে আসীন হতেন। আবার

(১১) ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ-১৪, পৃঃ ২১৯।
(১২) প্রাগুক্ত, খঃ ১৩, পৃঃ- ৩১৯।
(১৩) প্রাগুক্ত, খঃ ১৩, পৃঃ - ৩৫৪।

রাতে ঘুমোতেন নতুনভাবে গৃহবন্দী হয়ে। যেমন ঘটেছিল হুসায়ন নাসিরের ক্ষেত্রে। সেনাবাহিনীর একটি অংশ তাঁকে মিসরের সুলতান পদে অধিষ্ঠিত করে। এরপর তাদের নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় এবং তারা পরস্পর হানাহানিতে লিপ্ত হয়। ফলে শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে এবং হুসায়নকে ঐ প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তিনি ইতিপূর্বে বন্দী ছিলেন।[১৪] পরিস্থিতি এমন অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে যে, এখন গায়ে উকুন ভর্তি ও নোংরাদেহী কোন ক্রীতদাসও যদি সুলতান পদে আসীন হওয়ার স্বপ্ন দেখতো তাহলে অনায়াসেই তাও বাস্তবায়িত হতো, যেমন ঘটেছিল সুলতান কুতুযের ক্ষেত্রে।[১৫]

(৩) প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা

তাতারদের ধ্বংসলীলা মধ্যপ্রাচ্যের জন্যে ফিরিঙ্গীদের (ইউরোপীয় খৃস্টানদের) সাথে গোপন আলোচনার পথ খুলে দেয় এবং অবশিষ্ট আব্বাসী খিলাফত ও স্বাধীনতা রক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। বাগদাদ ও দামেশ্‌কে সংঘটিত মহা ধ্বংসযজ্ঞের পর বিজয়ীদের জন্যে অন্ধকারের সূচনা হয়। তাতার রাজারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং সুন্নত অনুসারে জীবন যাপনে প্রয়াসী হয়। তাদের রাজন্যবর্গও এতদঞ্চলের রাজাদের ন্যায় হয়ে যায়। তাঁরা আলোচনা সভা অনুষ্ঠান করতেন। তাঁরা কখনো রোমানদের সাথে যুদ্ধ করতেন আবার কখনো রাজত্বের খাতিরে সন্ধিও করতেন। অতঃপর উপহার-উপঢৌকন বিনিময় করতেন।

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ জনপদসমূহকে ক্রুসেড আক্রমণের প্রভাবমুক্ত করা। এ সূত্রে রাজা যাহির বায়বার্স কায়সারিয়্যাহ্, আরসূর্ণ, ইয়াফা, শাকীফ, এন্টিয়ক, তাবারিয়্যা, কাসীর, কুর্দীদের দুর্গ, আক্কা দুর্গ, গারীন ও সাফীতা দুর্গ উদ্ধার করেন। মারকাব, বানিয়াস, এন্টারতোস অঞ্চল আধাআধি ভাগে ভাগ করে নেন। যেমনটি সাইফুদ্দীন কালাউস ত্রিপোলী শহর এবং আশরাফ খলীল ইব্‌ন কালাউন আক্কা অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেছিলেন। সূর ও সায়দা অঞ্চল দু'টির কর্তৃত্ব আশরাফের হাতে সোপর্দ করে। অতঃপর তিনি আক্রমণ চালিয়ে ফিরিঙ্গীদের কবল থেকে উপকূলবর্তী অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন।

তৃতীয় ঘটনা ঃ ৭৩৬ হিজরীতে তাতারদের পতন। তাতার রাজা আবূ সাঈদ খয়বান্দা ইব্‌ন আরগূন ইব্‌ন আবাগা ইব্‌ন হালাকু ইব্‌ন তূল ইব্‌ন চেঙ্গীস খান-এর মৃত্যুর সাথে সাথে তাতারদের পতন ঘটে। তাঁর সম্পর্কে ইব্‌ন কাছীর (র) মন্তব্য করেছেন, "তিনি ছিলেন তাতার রাজদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক, সর্বোত্তম পন্থার অনুসারী এবং সুন্নত অনুসরণে সর্বাধিক দৃঢ়। তাঁর শাসনামলে আহলুস্ সুন্নাহ্ সম্প্রদায়ের উন্নতি হয় এবং রাফেযীগণ লাঞ্ছিত হয়। তাঁর পিতার শাসনামলে এর বিপরীত ঘটেছিল। তাঁর পরে তাতারী শাসন অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে কেউ মাথা তোলেনি। বরং তারা নিজেরা পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।[১৬] ইব্‌ন কাসীর (র) অন্যত্র বলেছেন, "রাজা আবূ সাঈদ তাঁর পিতা খরবান্দার পরে শাসনভার গ্রহণ করেন। ১১ বছর বয়সে তিনি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ন্যায়বিচার ও সুন্নত

(১৪) ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ২১৯।
(১৫) প্রাগুক্ত, খঃ ১৩, পৃঃ ২৩৫।
(১৬) ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ১৮২।

প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দেন। ফলে সকল প্রকারের বিশৃংখলা, অনাচার ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত স্তিমিত হয়ে পড়ে।[১৭] অবশ্য কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোকে আমরা উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে গণ্য করি না। এতদ্বারা আমরা সে সকল সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা বুঝাচ্ছি যা বিভিন্ন গোত্র ও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ ও ফিরিঙ্গীদের মধ্যে স্থাপিত হয়। এর একটি হল দামেশ্ক অধিপতি সালিহ ইসমাঈল কর্তৃক সায়দা ফিরিঙ্গীর নিকট সাকীফ আরনূন দুর্গ অর্পণ করা। খতীব শায়খ 'ইয্যুদ্দীন ইব্ন আবদুস সালাম ও মালেকী সম্প্রদায়ের শায়খ আবূ আমর ইব্ন হাজেব সুলতানের এই সন্ধি ও হস্তান্তর প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন। ফলে সুলতান এদের দু'জনকে কারারুদ্ধ করেন এবং পরবর্তীতে ছেড়ে দিয়ে গৃহবন্দী করে রাখেন।[১৮]

এ বিষয়ে অপর একটি ঘটনা হচ্ছে দুই মিত্র শক্তির উত্থান। এক পক্ষে ছিল ফিরিঙ্গীরা, দামেশ্ক অধিপতি সালিহ, কুর্ক অধিপতি নাসির দাঊদ এবং হিম্স অধিপতি মনসুর। অন্য পক্ষে ছিল খারিযিমিয়্যাহ ও মিসর অধিপতি সালিহ আইয়ূব।[১৯] ফিরিঙ্গী ও তাদের মুসলিম মিত্রদের মধ্যে অনেক ঘটনা সংঘটিত হয়।

পরবর্তী সময়ে মৈত্রী সম্পর্কের অবনতি ঘটে। প্রথম পক্ষে আসে ফিরিঙ্গীরা ও মিসরীয় সৈন্যগণ আর দ্বিতীয় পক্ষে থাকেন সিরিয়া অধিপতি ও বাগদাদের আব্বাসী খলীফা। খলীফা তখন মিসরের সুলতান ও সিরিয়ার সুলতানের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার জন্যে শায়খ নাজমুদ্দীন বাদরাঈকে প্রেরণ করেন। তখন উভয় পক্ষের সৈন্যগণ প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তিনি উভয় পক্ষের মাঝে বিরোধ মীমাংসা করে সন্ধি স্থাপন করে দিলেন। মিসরীয় সৈনিকগণ তখন ফিরিঙ্গীদের (ইউরোপীয় খৃস্টানদের) দিকে ঝুঁকে পড়েছিল এবং যুদ্ধে ফিরিঙ্গীদের সাহায্য কামনা করেছিল। তারা ফিরিঙ্গীদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে, ফিরিঙ্গীরা যদি তাদেরকে সিরিয়ার বিরুদ্ধে সাহায্য করে তবে বায়তুল মুকাদ্দাস তাদের হাতে সোপর্দ করা হবে।[২০]

অন্যান্য আরও কতক গোত্র ফিরিঙ্গীদের প্রতি আসক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। যেমন ঘটেছিল সুলতান আশরাফ খলীলের ক্ষেত্রে। পূর্ব থেকেই ফিরিঙ্গীদের সাথে তাদের সম্পর্ক থাকার কারণে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাসরাওয়ান পর্বত ও জুরাদের দিকে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন।

তাঁর সেনাবাহিনীর সেনাপতিত্বে ছিলেন বুনদার। আর তার সহযোগিতায় ছিল শানকার আল-আশকার।[২১] মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকগণ ফিরিঙ্গীদের সাথে উপহার-উপঢৌকন বিনিময় করতেন। ফিরিঙ্গী রাজার দূত যখন আশরাফের সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিল, তখন তার সাথে ছিল সাদা পশম বিশিষ্ট একটি বিরল প্রজাতির ভল্লুক, যার লোম ছিল সিংহের লোমের ন্যায়।[২২] ফিরিঙ্গীদের ও কতক শাসকের মধ্যকার এই সুসম্পর্কপূর্ণ মৈত্রী ও উপঢৌকন বিনিময়

---

(১৭) ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ৭৯।
(১৮) ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৩, পৃঃ ১৬৬।
(১৯) প্রাগুক্ত, খঃ ১৩, পৃঃ ১৭৫ - ১৭৬।
(২০) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৬।
(২১) প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪৬, ৩৪৭।
(২২) প্রাগুক্ত, ১৫১।

ছিল অনেকটা বিরল ঘটনা। তার তুলনায় তাদের বিরুদ্ধে জিহাদী তৎপরতা ছিল অনেক বেশি ও দীর্ঘস্থায়ী। প্রকাশ থাকে যে, এসব সম্পর্ক স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজত্ব দখলের লড়াইয়ে আপন ভাইয়ের বিরুদ্ধে বহিঃশত্রুর সাহায্য গ্রহণ ও শক্তি সঞ্চয় করা। সুতরাং এসব মৈত্রী চুক্তি ছিল একান্তই আত্মরক্ষার প্রয়োজনে।

(৪) অশান্তি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা

সে যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল ভয় ও ত্রাস। সে ভীতি ও ত্রাসের উৎস ছিল তাতাররা। বছরের পর বছর ধরে উত্তাল তরঙ্গের মত তারা হানা দিতে থাকে।

ইব্‌ন কাছীর (র) মানুষের এই সন্ত্রস্ত ভাবকে এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "সংবাদ প্রচারিত হল যে, তাতাররা সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং তারা মিসরেও হানা দেবে। ফলে মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠে এবং তারা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায়। তারা পালাতে থাকে মিসরের ছোট ছোট শহর, কুরক, শূবাক ও সংরক্ষিত দুর্গগুলোর দিকে। উট বিক্রি হতে লাগল হাজার দিরহামে, গাধা পাঁচশ' দিরহামে এবং গৃহের আসবাবপত্র ও খাদ্য-সামগ্রী পানির দরে বিক্রি হতে লাগল। শহরে ঘোষণা দেয়া হল—কেউ যেন পরিচয়পত্র ছাড়া পথে বের না হয়। পরে সংবাদ এল যে, মিসরের সুলতান শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে সিরিয়া অভিমুখে বের হওয়ার পর পুনরায় মিসর ফিরে এসেছেন। এতে ভীতি আরো বহুগুণ বেড়ে গেল এবং অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ল। এদিকে খাদ্যাভাব, অতি বর্ষণ, প্রচণ্ড শীত, ক্ষুধা ও আকালের কারণে পশুপাল দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে।"[২৩]

তাতারদের ত্রাস এই ভীতিকে আরও তীব্রতর করে তোলে। তারা লাখ লাখ লোককে জবাই করে। বাড়িঘর ও প্রাসাদ-অট্টালিকা ধ্বংস করে, ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং গাছপালা নির্মূল করে। তাতারদের 'কাতীআ' অঞ্চলে উপস্থিতি ইব্‌ন কাসীর (র) এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "তাতাররা যখন দামেশ্‌কের নিকটবর্তী 'কাতীআ' অঞ্চলে পৌঁছে, তখন কাতীআ ও তার আশে-পাশে কোন লোক ছিল না। শহর ও দুর্গসমূহ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। বাড়িঘর ও পথে-ঘাটে ভিড় জমে গেল। শহরে তখন কোন শাসক ছিল না, চোর-ডাকাতরা শহরে ও বাগ-বাগিচায় ঢুকে পড়ে। তারা সবকিছু ভেঙ্গে-চুরে দুমড়ে-মুচড়ে বিধ্বস্ত করে দেয় এবং যতটুকু পারল লুটপাট করে নিয়ে গেল। খুবানী, গম ও সকল শাক-সব্‌জি সময়ের পূর্বেই কেটে তুলে নিয়ে যায়।"[২৪]

এ ভীতি তাতারদের সৃষ্ট সন্ত্রাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং তাতাররা এবং ফিরিঙ্গীরা উভয় দলই এই ধ্বংসযজ্ঞে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করে। তাতাররা যা করেনি ফিরিঙ্গীরা তা ষোলকলায় পূর্ণ করে। তারা ৭৬৭ হিজরীতে আলেকজান্দ্রিয়ায় অভিযান পরিচালনা করে এবং ৪০০০ লোককে বন্দী করে এবং সাধ্যমত ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে সমুদ্রপথে নিয়ে যায়। চারদিকে তখন শুধু ক্রন্দন, আর্তনাদ, হাহাকার, আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ ও আশ্রয় প্রার্থনা, হৃদয়বিদারক আহাজারী যা দেখে চোখ অশ্রুসজল হয় আর কান বধির হয়ে যায়।[২৫] ভয় শুধু বহিরাগত শত্রুদের পক্ষ থেকে ছিল না, অভ্যন্তরীণ অশান্তি ও বিপর্যয়ের ভয়ও ছিল। উদাহরণ

(২৩) ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ১৫, ১৬।
(২৪) প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।
(২৫) প্রাগুক্ত, খঃ ১৪, পৃঃ ৩২৮।

স্বরূপ হাম্বলী সম্প্রদায় ও শাফিঈ সম্প্রদায়ের মধ্যে আকীদা সম্পর্কিত বিষয়ে সংঘটিত দাঙ্গা-হাঙ্গামার উল্লেখ করা যেতে পারে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি দামেশ্‌কে পর্যন্ত গড়ায় এবং উভয় পক্ষ নায়েবে সুলতান 'টাংকর'-এর দপ্তরে উপস্থিত হয়। তিনি তাদের মধ্যে আপস রফা করে দেন।[২৬]

নিরীহ মানুষদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত রাখার ক্ষেত্রে উগ্রপন্থী দলগুলোর প্রভাব ছিল। এসকল দলের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করার ব্যাপারে গভর্নরদের কোন গরজ ছিল না। তবে শাংকল মাংকল একবার হূরান অঞ্চলে ওদের একটি দলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তিনি তাদেরকে পরাজিত করেছিলেন এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসাবে তাদের খণ্ডিত শিরগুলো বুসরার প্রাচীরের ওপর ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।[২৭]

এ সময়ে শুধু অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও গুপ্তঘাতকদের ভীতি ছিল তা নয় বরং তখন একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও ঘটেছিল। কখনো কখনো দলে দলে পঙ্গপাল উড়ে এসে ক্ষেত-খামার ও ফলমূল, বৃক্ষের পাতা খেয়ে নিঃশেষ করে দিত। তখন পত্র-পল্লবহীন গাছগুলো লাঠির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকত। মানুষের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল আর মৃত্যু চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাথে সাথে ভূমিকম্পে মানুষের বাড়িঘর ও যানবাহন ধ্বংস এবং অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হচ্ছিল। এর সাথে প্রলয়ঙ্করী বন্যা ও প্লাবন দেখা দেয় ফলে শহর ও নগর ধ্বংস হয় এবং প্রচুর প্রাণহানি ঘটে। নীলনদ থেকে বাঁধভাঙ্গা জোয়ার উঠে পানিতে শহর-নগর ডুবে যায় এবং বহু লোকজন মারা যায়। প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এটি সংক্রামিত হতে থাকে শহর থেকে শহরে, নগর থেকে নগরে। ফলে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং এতে মানুষের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে।

(২৬) ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ৭৭।
(২৭) প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৭, ২৭৮।

খ. অর্থনৈতিক অবস্থা

দ্রব্যমূল্য, আমদানী-রপ্তানী ও রাষ্ট্রীয় কর

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চরম অস্থিরতা চলছিল। বহির্বাণিজ্য পাশ্চাত্যবাসীদের হাতে চলে যায়। কারণ, তখন ইউরোপীয়রা সিরিয়ার সাথে যুদ্ধ করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল নিজেদের করায়ত্ত করে নেয়। দুই যুগের অধিককাল ধরে তারা এটি নিজেদের করতলগত রাখতে সমর্থ হয়। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, নিয়মিতভাবে নদী খনন না করা এবং পানি সেচ ও ভূমি উন্নয়নের ব্যবস্থা না করার কারণে কৃষিপণ্যের ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বিশৃংখলার কারণে গ্রাম ও জনপদগুলো বিরান হয়ে যাচ্ছিল। সাথে সাথে যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে এবং আমির-উমারাদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্যে অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী বৃদ্ধি করতে হয়েছিল। কিন্তু সে তুলনায় আমদানী ছিল কম।

বিপ্লবোত্তর যুগে পালিয়ে যাওয়া আমীর-উমারা, বরখাস্তকৃত নায়েবরা এবং সচিব ও আমলারা ফিরে আসে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা জনসাধারণ থেকে সম্পদ দাবি করে।[২৮] সুলতানের নায়েবগণ কোন কোন ক্ষেত্রে গত তিন বছরের বকেয়া কর কিংবা ৪ মাসের খাজনা অগ্রিম দাবি করে বসে।[২৯]

রাজনৈতিক অস্থিরতা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের মন্দাভাব এবং কৃষিপণ্যের উৎপাদনহীনতা দেশকে দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধগতির দিকে ঠেলে দেয়। তখন একজোড়া ভেড়ার বাচ্চা বিক্রি হত ৫০০ দিরহামে।[৩০] একটি গারারার (এক বস্তা খাদ্যবস্তুর) দাম পৌঁছেছিল ২২০ দিরহামে। অনেক সময় রুটির অভাব দেখা দিত। ফলে কাঠের গুঁড়ি মিশ্রিত ভেজাল যবের রুটিও বিক্রি হতো। এক রতল* পরিমাণ যায়তুনের তেল বিক্রি হত ৪.৫০ দিরহামে। সাবান ও চাউলের মূল্যও অনুরূপ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কোন কিছুই জনগণের ক্রয়-ক্ষমতার আওতার মধ্যে ছিল না। তবে গোশত বিক্রি হত ২.২৫ দিরহামে। এক সের মিহি ময়দা বিক্রি হত ৪ দিরহামে। আঙ্গুর রসের দাম ছিল এক কিনতার ২০০ দিরহামের উপরে। চাউলের দাম ছিল আরো বেশি।[৩১] তবে সুলতান নাসিরের শাসনামলে কিছুটা সচ্ছলতা ও উন্নতি পরিলক্ষিত

---

(২৮) ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ১৬৯, ১৭৭।
(২৯) প্রাগুক্ত, খঃ ১৪, পৃঃ ১৫।
(৩০) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭।
* এক রতল হচ্ছে প্রায় এক পাউণ্ড বা আধা কেজি।
(৩১) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৭, ১৮৩, ২১৯, ২২০, ২২৩।

হয়। ৭২৪ হিজরী সনে সুলতান নাসির খাদ্য শস্যের কর রহিত করে দেন। তখন সমগ্র খাদ্যশস্য সিরিয়ায় সংরক্ষিত ছিল। ফলে সুলতানের কল্যাণের জন্যে অনেকেই দু'আ করেন।[৩২]

সুলতানের নায়েবও তখন বহু কর রহিত করে দেন। তার মধ্যে রয়েছে গো-খাদ্যের কর, দুধ-কর এবং চামড়ার উপর কর। বাজার পরিদর্শকদের থেকে অর্ধ দিরহামের অতিরিক্ত যে কর নেয়া হত তা তিনি বাতিল করে দেন। লাশ দাফন-কাফনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের আয় থেকে যে কর নেয়া হত তাও তিনি বাতিল করে দেন। অপরিপক্ব খেজুর বিক্রয়ের বিধি-নিষেধ তিনি প্রত্যাহার করেন। ফলে জিনিসপত্র অনেকটা সস্তা হয়ে যায়। এমনকি তখন বলা হত যে, এক কিনতার* খাদ্যশস্য বিক্রি হত ১০ দিরহামে।[৩৩]

পরবর্তীতে লবণ-কর এবং প্রাসাদ-করও রহিত করলেন।[৩৪] অনুরূপভাবে ছাগল-ভেড়ার করের অর্ধেক প্রত্যাহার করে নেন, যেমন করেছিলেন স্থানীয় ও বিদেশী সুতার করের ক্ষেত্রে। ফলে জনগণ আনন্দিত হয়।[৩৫] ঐ আমলটি রাজকীয় বিলাস-ব্যাসনের জন্য চিহ্নিত হয়ে আছে অবশ্য, যদিও তখন জনগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আর্ত-চীৎকার করছিল। তখন ৭৩২ হিজরী সনে সুলতান মালিক নাসিরের পুত্র আনুক মুহাম্মদের সাথে আমীর সাইফুদ্দীন বাক্তামার আস-সাকী-এর কন্যার বিবাহ হয়। ঐ বিবাহে যৌতুক ছিল দশ লাখ দীনার। এই বিবাহ ভোজে বকরী, মুরগী ও ঘোড়া-গরু মিলিয়ে প্রায় ২০ হাজার প্রাণী যবেহ করা হয়েছিল। ১৮ হাজার কিনতার মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়েছিল। আলোকসজ্জায় তিন হাজার কিন্‌তার তৈলাদি পোড়ানো হয়েছিল।[৩৬]

---

(৩২) ইবন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৪, পৃঃ ১১৫।
* কিনতার=১০০ রতল যা ১ মণের অধিক।
(৩৩) প্রাগুক্ত, ১৪, পৃঃ ১৯০।
(৩৪) প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৯৩।
(৩৫) প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৭।
(৩৬) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬৫।

গ. শিক্ষা ব্যবস্থা

ঐ যুগে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিদ্যা চর্চার ব্যাপক প্রচলন ছিল, তখনই 'জাহিয' শিক্ষক শ্রেণীর সমালোচনা করেন এবং তাদের দোষ-ক্রটি বর্ণনা করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্লথ গতি ও মন্দাভাবের আমলে অবস্থা যে কত শোচনীয় ছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

সে যুগের শিক্ষকদের দুরবস্থা সম্পর্কে অবগতির জন্যে আমরা ইব্ন কাসীরের বক্তব্যটুকু উদ্ধৃত করছি, যা তিনি শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন ফিরআউনের জীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত শায়খ মুহম্মদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। আমি তাঁর নিকট একাধিক বিষয়ে পড়াশুনা করেছি। ছোট ছোট ছেলেদেরকে তিনি কঠিন কঠিন বর্ণগুলো শিক্ষা দিতেন। যেমন 'রা' ইত্যাদি। তাঁর কোন সঞ্চয় ছিল না। ছিল না কোন বাসগৃহ বা ধনসম্পদ। খাবারের দোকান থেকে কিনে খেতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়েই রাত্রি যাপন করতেন।[৩৭]

শিক্ষকদের দুরবস্থার কথাটা আরও পরিষ্কার হয় যখন আমরা অবগত হই যে, সেযুগে মাদ্রাসার একজন ছাত্রের মাসিক বৃত্তি ছিল ১০ দিরহাম। উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের বৃত্তি ছিল ২০ দিরহাম এবং একজন শিক্ষকের বেতন ছিল ৮০ দিরহাম।[৩৮] এটি সে সময়ে যখন একটি ছাগল-ভেড়ার বাচ্চার দাম ছিল ২৫০ দিরহাম।[৩৯] অন্য কথায়, এর মূল্য ছিল একজন শিক্ষকের মাসিক বেতনের তিনগুণ। সম্ভবত এটিই ছিল অধঃপতনের যুগে শিক্ষার মন্দা বাজার—কথিত সোনালি বাণীর বাস্তব উদাহরণ।

১. যুগের বৈশিষ্ট্যাবলী

(১) এ যুগের শিক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন

জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রসমূহ ঃ শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ বাগদাদ, বসরা, কূফা ও মদীনা থেকে দামেশ্ক, কায়রো, কুদ্স, আলেকজান্দ্রিয়া, হামাত, হালাব, আলেপ্পো, হিম্স, উস্য়ূত ও ফায়্যূম নগরীসমূহে স্থানান্তরিত হয়। ফলে জ্ঞানার্জনকারীদের উপাধির বহর বেড়ে যায়। যথা—দিমাশ্কী, হালাবী, কাহেরী, ফায়্যূমী, ইস্কান্দরী, মাক্দেসী, হামাবী, সুয়ূতী ও হিমসী ইত্যাদি। এই যুগে কায়রো সেই ভূমিকা পালন করছে, যা ইতিপূর্বে বাগদাদ পালন করতো। ফলে আলিম-উলামা ও কবি-সাহিত্যিকগণ কায়রোতে ভিড় জমান।

---

(৩৭) ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ১১৮।
(৩৮) প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৩৬।
(৩৯) প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৫।

(২) সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে শাসকবর্গের মনোযোগ প্রত্যাহৃত হল। লেখককে তার গ্রন্থের ওজন পরিমাণ স্বর্ণ দিয়ে পুরস্কৃত করার সেই যুগটি গত হয়ে যায়। খুব অল্প সংখ্যক সুলতান, আমীর, উযীর ও খলীফাই জ্ঞানার্জনের প্রতি, আলিম লোকদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রতি অথবা কবিতা শ্রবণে তৃপ্তিলাভের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা আরবী সাহিত্যের স্বাদ কী করে আস্বাদন করবেন—যেখানে আরবী ভাষায় তাদের কোন ব্যুৎপত্তিই ছিল না। অবশ্য তাদের কেউ কেউ ইতিহাস শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। ফলে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কতক ইতিহাস গ্রন্থ ও বিশ্বকোষ রচিত হয়েছিল।

(৩) ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের উৎকর্ষ

ইব্ন খালদূনের 'মুকাদ্দমা' গ্রন্থটি এ শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থ। ইতিহাস দর্শনের গুরুত্ব ইব্ন খালদূন যথার্থরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন— কোন বিশেষ শাস্ত্রের তত্ত্বানুসন্ধানীর জন্যে তার ঘটনা প্রবাহ লেখাই মুখ্য কাজ নয় বরং তার কাজ হল শাস্ত্রের স্থান ও তার প্রকারভেদ নির্ণয় করা। পরবর্তী লেখকগণ সে অনুসারে ক্রমান্বয়ে ঘটনাবলী ও তথ্যাদি সন্নিবেশিত করবেন, যাতে এক সময় এই শাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করতে পারে। তখন অবশ্য রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামরিক জ্ঞান-বিজ্ঞানেরও প্রসার লাভ করে।

(৪) গ্রন্থাগার ও ঘরবাড়ি ধ্বংস

বড় বড় গ্রন্থাগারের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল। কারণ বাগদাদ লুণ্ঠনের সময় মোগল ও তাতাররা গ্রন্থাগারগুলো পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং নদীবক্ষে নিক্ষেপ করেছিল। তদ্রূপ স্পেন অধিকার করার পর সেখানকার অধিবাসীরা সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেছে। ইসলামী উপদলগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলশ্রুতিতেও বহু মূল্যবান গ্রন্থ বিনষ্ট হয়েছিল। যেমন মাহমুদ গযনবী মুতাযিলাদের কিতাবগুলো পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে সবচাইতে প্রলয়ঙ্করী ধ্বংসযজ্ঞ সাধিত হয়েছিল তাতারদের হাতে। তারা নরহত্যায় মেতে উঠেছিল, ঘরবাড়ি ধ্বংস করেছিল, বইপত্র পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং যেগুলো তারা লুট করে নিতে পারেনি, সেগুলো নষ্ট করে দিয়েছিল।

(৫) সঙ্কটকালে মানুষ ধর্মের আশ্রয় খোঁজে

আরবগণ পশ্চিমাঞ্চলের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। স্পেনবাসীরা আন্দালুস পুনঃ অধিকার করে নিল। মোগলরা শহরের পর শহর ধ্বংস করে দিল এবং মোগল, তুর্কী ও বর্বররা শহরগুলোকে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিল। অবশ্য কতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আরব সুলতানদের হাতে রয়ে যায়। যেমন ঘটেছে ইয়ামানে ও মাগরিবে।* তখন মুক্তির আশায় মানুষ ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ পর্যায়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পশ্চাৎমুখিতা দেখা দিল এবং কতক লোক বাজে বিষয়াদি ও কিস্সা কাহিনীর প্রতি ঝুঁকে পড়ল। যেমন ঘটেছিল মহাকাশ বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র ও রসায়ন শাস্ত্রের ক্ষেত্রে।

---

* মরক্কো-তিউনিসিয়া অঞ্চল।

(৬) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

মামলুক সুলতানদের আমলে মিসর ও সিরিয়ায় বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সে সময়ের কথা যখন মামলুক সুলতানগণ ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত মোগল আধিপত্যের প্রভাবাধীন ছিল।

আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থের ১৪তম খণ্ডে প্রায় ৮০টির অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রধানগুলো ও সিংহভাগই ছিল সিরিয়াতে আর অবশিষ্টগুলো কুদ্‌স, হালাব, বাআ'লবাক, হিম্‌স, হামাতু ও কায়রোতে ছিল।

ইব্‌ন কাসীর (র) কায়রোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কথা উল্লেখে তেমন কোন গুরুত্ব দেননি এ কারণে যে, এ গ্রন্থটি হল ইব্‌ন আসাকির (র)-এর লিখিত 'তারীখে দামেশ্‌ক' গ্রন্থের পরিশিষ্ট গ্রন্থ। তদুপরি জীবনের বিভিন্ন শাখায় অধঃপতনের প্রেক্ষিতে অধঃপতিত যুগ হিসেবে চিহ্নিত এ যুগের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আধিক্যের তথ্যটি সামঞ্জস্যশীল মনে হয় না। তবে মোগলদের ধ্বংসযজ্ঞের মুখে বহু বড় বড় আলিম-উলামা সিরিয়া ও মিসরে পালিয়ে গিয়েছিলেন বলে এতদঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্যের তথ্যটি সত্য প্রতীয়মান হয়। তদুপরি নূরুদ্দীন জঙ্গীর শাসনামল থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে প্রচুর সম্পত্তি ওয়াকফ করার বিষয়টিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্যের সত্যতার প্রমাণ করে। তৃতীয়ত, এ সময়ে শাফিঈ, হানাফী, হাম্বলী ও মালেকী মাযহাব অনুসারীদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। এই তিনটি কারণে সে যুগে প্রচুর সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান লক্ষ্য ছিল কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দেয়া। চিকিৎসা শাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব ও অন্যান্য শাস্ত্রের প্রতি তখন গুরুত্ব কম ছিল।

(৭) জ্ঞান চর্চা শিক্ষকদেরকে উচ্চ পদের যোগ্য করে তোলে

বহু শিক্ষক, উযীর, নায়েব ইত্যাদি বড় বড় প্রশাসনিক পদের তুলনায় কাযী, মুফতী, খতীব, শায়খ, ইমাম, বায়তুল মালের কার্যনির্বাহী, ভাণ্ডার পরিদর্শক, রাষ্ট্রীয় সংরক্ষণাগার পরিদর্শক, দফতরাদি পরিদর্শক, হিসাবরক্ষক, ইয়াতীমদের পরিদর্শক, গ্রন্থাগার পরিদর্শক, ওয়াক্‌ফ স্টেট পরিদর্শক ও কারামুক্তি প্রার্থী দফতরের পরিচালক পদে অধিকসংখ্যক নিয়োগ লাভ করেন।

২. ইব্‌ন কাসীর (র)-এর জীবনী

(ক) ব্যক্তি পরিচয়

তাঁর নাম ইসমাঈল ইব্‌ন উমর ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন দূ ইব্‌ন কাসীর ইব্‌ন দিরা আল-কুরায়শী। তাঁর খান্দানটি কুরায়শের বনী হাসালা শাখা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। সম্ভ্রান্ত গোত্ররূপে এ গোত্রটির খ্যাতি রয়েছে। তাদের বংশ লতিকা সংরক্ষিত রয়েছে।

আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক আল মিয্‌যী এ বংশ লতিকার কিছু অংশ সম্পর্কে অবগতি লাভ করেছেন— যদ্দরুন তিনি আনন্দিত হন ও অনেকটা বিস্ময়বোধ করেন। এ জন্যে তিনি আমার বংশ তালিকায় 'আল কুরায়শী' উপাধি লেখা শুরু করেন।[৪০]

আমার নিকট এটি ইব্‌ন কাসীর (র)-এর বিশুদ্ধতম বংশ তালিকা। কারণ, ইব্‌ন কাসীর (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া'তে নিজে এটি উদ্ধৃত করেছেন। এজন্যে তাঁর নাম ও বংশ পরিচয়ে যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে সে সম্পর্কে আমরা আলোকপাত করবো না।[৪১] কারণ যাঁর সম্পর্কে এসব বিবৃতি তাঁর সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীতে অন্য সব তথ্য একেবারে গুরুত্বহীন।

জন্ম ঃ ৭০১ হিজরী সনে ইব্‌ন কাছীর (র) জন্মগ্রহণ করেন। যেমনটি 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'তে তিনি উল্লেখ করেছেন।[৪২] এ থেকে তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে যে মতপার্থক্য ছিল তার নিরসন হল।[৪৩] তাঁর জন্মস্থান ছিল 'বুসরা'*-এর অন্তর্গত 'মিজদাল' নামক জনপদে। 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে তাঁর জন্মস্থান 'মুজায়দিল' বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।[৪৪] যতদূর মনে হয় ভুলক্রমেই এমনটি লিখিত হয়েছে।

তাঁর পিতা ঃ তাঁর পিতা হলেন খতীব শিহাবউদ্দীন আবূ হাফ্‌স উমর ইব্‌ন কাসীর। তিনি বসবাস করতেন বুসরা নগরীর পশ্চিমে অবস্থিত 'শারকাবীন' গ্রামে। বুসরা ও শারকাবীনের দূরত্ব খুবই সামান্য। খতীব শিহাবউদ্দীন ৬৪০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতুল গোত্র বনু উকবায় তিনি বিদ্যার্জনে ব্রতী হন। তিনি চমৎকার কবিতা লিখতেন। বুসরার আন্‌নাকা অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে তিনি লেখাপড়া করেন। তারপর বুসরার পূর্বদিকে অবস্থিত খিতাবা জনপদে চলে যান। তিনি শাফিঈ মাযহাব অবলম্বন করেন এবং ইমাম নওয়াবী ও ইমাম গাযারীর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। তিনি সেখানে প্রায় ১২ বছর অবস্থান করেন।

---

(৪০) ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ৩২।
(৪১) ইব্‌ন হাজর, আদদুরারুল কামিনা, খঃ ১, পৃঃ ২৯৯, ৩৭৭। দাউদী, তাবাকাতুল মুফাস্‌সিরীন, খঃ ১, পৃঃ ১১০। যাহাবী ঃ তাবাকাতুল হুফ্‌ফাজ পৃঃ ৫৭, যিরকানী আল-আলাম, খঃ ১, পৃঃ ৩২০।
(৪২) ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ২২।
(৪৩) ইব্‌ন কাসীর, উমাদাতুত্‌ তাফসীর (আল মুকাদ্দামা) খঃ ১১, পৃঃ ২২। যারকানী, আল ইলাম, খঃ ১; পৃঃ ৩৭।
* বর্তমানে উযা হুরান নামে পরিচিত।
(৪৪) ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ১৪, পৃঃ ৩২।

এরপর ফিরে আসেন 'মিজদাল'-এ। এখানে তাঁর বিবাহ হয়। আবদুল ওহ্হাব, আবদুল আযীয ও ইসমাঈল নামক তিন পুত্রের জন্মের পর তাঁর কয়েকজন কন্যা সন্তানও জন্মগ্রহণ করে। এছাড়া ইউনুস ও ইদ্রীস নামক দুই পুত্রও জন্মগ্রহণ করে। ইব্‌ন কাসীরের পিতার একটি প্রসিদ্ধ জীবনালেখ্য 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।[৪৫] ৭০৩ হিজরীতে মুজায়দিলে ইব্‌ন কাছীরের পিতার ইন্‌তিকাল হয়। তখন ইসমাঈল-এর বয়স প্রায় তিন বছর।

(২) শৈশব ও যৌবন

ইব্‌ন কাসীর (র)-এর সহোদর আবদুল ওহ্হাব ৭০৭ হিজরীতে সপরিবারে দামেশ্‌কে চলে যান। তাঁর সম্পর্কে ইব্‌ন কাসীরের মন্তব্য, "তিনি আমাদের সহোদর এবং আমাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহবৎসল ছিলেন।"[৪৬] ইব্‌ন কাসীর (র) হিজরী ৮ম শতাব্দীতে মামলুক সুলতানদের শাসনামলে তাঁর যৌবনকাল অতিবাহিত করেন। তাতারীদের আক্রমণ, একাধিক দুর্ভিক্ষ, হৃদয়-বিদারক দুর্যোগগুলো তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। তখন দুর্ভিক্ষে লক্ষ-লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটে। তিনি ফিরিঙ্গীদের সাথে সংঘটিত ক্রুসেড যুদ্ধগুলোও দেখেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, শাসকদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ইত্যাদি তাঁর সম্মুখেই সংঘটিত হয়। এতদসত্ত্বেও এ যুগে শিক্ষা-দীক্ষা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধনের প্রবল উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। আমীর-উমারাদের আগ্রহ এবং বিজ্ঞজন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে অকাতরে দান করার কারণে প্রচুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচিত ও সংকলিত হয়।

মৃত্যু ঃ ৭৭৪ হিজরী সনে ২৬শে শা'বান বৃহস্পতিবার তাঁর ইনতিকাল হয়। তাঁর জানাযায় বহুসংখ্যক লোকের সমাগম ঘটে। তাঁর ওসীয়ত অনুসারে তাঁর সর্বশেষ আবাসস্থল সূফীদের গোরস্থানে শায়খুল ইসলাম তকী উদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়্যা (র)-এর কাছে তাঁকে দাফন করা হয়। যা দামেশকের বাব আন-নাসর-এর সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত।

(৩) তাঁর শিক্ষকবৃন্দ

ইব্‌ন কাসীর (র) প্রখর মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। দশ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই তিনি কুরআন মজীদ কণ্ঠস্থ করে নিয়েছিলেন। শায়খ নূরুদ্দীন আলী ইব্‌ন ইব্‌নুহীজা কুরকী শাওবাকী দিমাশকী শাফিঈ (মৃত্যু ঃ ৭৩০ হিঃ)-এর ওফাত উপলক্ষে ইব্‌ন কাছীর (র) লিখেছেন, 'কুরআন হিফ্‌জ ও কিতাব অধ্যয়নে তিনি আমাদের সহপাঠী ছিলেন। আমি ৭১১ হিজরীতে কুরআন খতম করি।'[৪৭]

শত শত শায়খের নিকট তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে তিনি যাদের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং যাদের তিনি অনুসরণ করেন তাঁদের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। এদের মধ্যে শায়খ তকী উদ্দীন ইব্‌ন তাইমিয়া সর্বাগ্রগণ্য। কারণ তাঁর সাথে ইব্‌ন কাছীর (র)-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ইব্‌ন কাসীর তাঁর অভিমত অনুসরণ করতেন এবং তালাকের মাসআলায় তাঁর মতানুযায়ী ফতোয়া দিতেন। এ ব্যাপারে তিনি বিপদেও পড়েছিলেন এবং কষ্টও ভোগ

---

(৪৫) ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খণ্ড ১৪, পৃঃ ৩৩।

(৪৬) প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৮।

(৪৭) ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃ ১৫৬, ৩২৬।

করেছেন। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে ইব্ন কাসীর (র)-এর লিখিত তথ্য সূত্রে আমরা তা জানতে পারি। হিজরী ৮ম শতাব্দীর প্রথমার্ধের বড় বড় ঘটনার বর্ণনায় এ তথ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইতিহাস শাস্ত্রে তিনি সিরিয়ার ইতিহাসবিদ কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ বিরযালী (মৃত্যু ৭৩৯ হিঃ) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র)-এর ইতিহাস গ্রন্থ যা মূলত শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা মাকদেসী-এর ইতিহাস গ্রন্থের পরিশিষ্ট। ইব্ন কাসীরের ইতিহাস গ্রন্থে উপরোল্লেখিত গ্রন্থের সবিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন শায়খ মিয্যী ইউসুফ ইব্ন আবদুর রহমান জামালুদ্দীন (মৃত্যু ৭৪৪ হিঃ)। তিনি সে যুগে গোটা মিসরে স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ছিলেন। 'তাহযীবুল কামাল' গ্রন্থটি তাঁর রচিত। ইব্ন কাছীর (র) শায়খ 'মিয্যী'-এর অধিকাংশ গ্রন্থ তাঁর কাছে অধ্যয়ন করেন। ইব্ন কাসীর (র) উক্ত শায়খের এতই ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন যে, শায়খের কন্যা 'যায়নাব'কে তিনি বিবাহ করেন। তিনি হাদীসশাস্ত্র ও রাবীদের জীবনী সম্পর্কে শায়খ মিয্যী থেকে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।[৪৮] তিনি অংক শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করেন উস্তাদ 'হাযরী' থেকে।[৪৯]

ইব্ন কাসীর (র)-এর আরো কতিপয় শিক্ষক

(১) জনাব ইজ্জুদ্দীন আবূ ইয়া'লা, হামযা ইব্ন মুআইয়িদুদ্দীন আবুল মা'আলী, আস'আদ ইব্ন ইজ্জুদ্দীন আবূ গালিব মুযাফফর ইবনুল ওযীর আত তামীমী দামেশকী ইব্নুল কালান্সী (মৃঃ ৭২৯ হিঃ)। ইনি মুহাদ্দিস ছিলেন। নেতৃত্বের গুণাবলীও তাঁর মধ্যে ছিল। ৭১০ হিজরী সনে তিনি মন্ত্রীত্ব লাভ করেছিলেন।[৫০]

(২) ইব্রাহীম ইব্ন আবদুর রহমান গাযারী। ইব্ন কাসীর (র) তাঁর নিকট শাফিঈ মাযহাবের দীক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থ তাঁর কাছে অধ্যয়ন করেন।[৫১]

(৩) নাজমুদ্দীন ইবনুল আসকালানী (র)। ৯টি মজলিসে ইব্ন কাসীর (র) তাঁর নিকট সহীহ মুসলিম অধ্যয়ন করেন।

(৪) শিহাবুদ্দীন আলহিজার ওরফে ইব্ন শাহ্না। আশরাফিয়া দারুল হাদীসে তিনি হাদীসের প্রায় ৫০০টি পুস্তিকা (جزء) অধ্যয়ন করেন। ৭৩০ হিজরীতে তাঁর ইনতিকাল হয়। তাঁর নাম ছিল আহমদ ইব্ন আবূ তালিব।

(৫) কামালুদ্দীন ইব্ন কাযী শাহ্বাহ্, তাঁর নিকট ইব্ন হাজিব রচিত উসূল বিষয়ক গ্রন্থ 'মুখতাসার' পাঠ করেন।

---

(৪৮) ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ২০৩, ২০৪। ইব্ন হাজর, আদদুরারুল কামিনা, খঃ ৪, পৃঃ ৪৫৭।
(৪৯) ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ১৫৬।
(৫০) ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ১৫৩।
(৫১) প্রাগুক্ত, খঃ ১৪, পৃষ্ঠা ১৫২।

(৬) শায়খ নাজমুদ্দীন মূসা ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ জীলী দামেশ্‌কী। ইনি বিদগ্ধ জ্ঞানীজন এবং লেখক ছিলেন। ইব্‌নুল বাসীস নামে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। লিপি বিদ্যায় উস্তাদ এবং স্থানীয় বিশেষজ্ঞ বলে তিনি বিবেচিত হতেন। ৭১৬ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

(৭) শায়খ হাফিজ ও ইতিহাসবিদ শামসুদ্দীন যাহাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ কায়মায- তাঁর নিকটও তিনি শিক্ষা লাভ করেন। ৭৪৮ হিজরী সনে তাঁর মৃত্যু হয়।

(৮) নাজমুদ্দীন মূসা ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ, তিনি একাধারে শায়খ এবং উচ্চমানের কবি ছিলেন। ৭১৬ হিজরীতে তিনি ইন্‌তিকাল করেন।

(৯) কাসিম ইব্‌ন আসাকির, ইব্‌ন শীরাযী, ইসহাক আসাদী মিসর থেকে তাঁকে অনুমতি দিয়েছেন আবূ মূসা কুরাফী এবং আবুল ফাতাহ্ দাবূসী।

তাঁর জ্ঞান গরিমার স্বীকৃতি

এমন একজন মানুষ যিনি তাঁর সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ, হাদীসবিশারদ, তাফসীরকারগণ এবং অংক শাস্ত্রবিদগণের কাছে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন, এ ধরনের বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মানুষ খুব কমই দেখা যায়।

দাউদী তাঁর প্রশংসা করেছেন এভাবে— 'আমরা যাঁদেরকে পেয়েছি তাঁদের মধ্যে ইব্‌ন কাসীর (র) হাদীসের মূল পাঠ কণ্ঠস্থকারীদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন এবং হাদীসের উৎস, পরিচিতি, রিজাল পরিচিতি এবং শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারে বিজ্ঞতম ব্যক্তি। তাঁর সমকালীন বিদগ্ধজন ও তাঁর শায়খগণ তাঁর স্বীকৃতি দিতেন। ফিকাহ্ ও ইতিহাস শাস্ত্রের বহু কিছু তাঁর নখদর্পণে ছিল। তিনি যা শুনতেন তা খুব কমই ভুলতেন। তিনি গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী উত্তম ফিকাহ্‌বিদ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। আরবী ভাষার আলোচনায় তিনি সার্থকভাবে অংশ নিতেন। কবিতা রচনা করতেন। আমি বহুবারই তাঁর কাছে গিয়েছি কিন্তু কোন বার কিছু না শিখে এসেছি বলে আমার মনে পড়ে না।[৫২]

ইব্‌ন কাসীর (র)-এর প্রশংসা বর্ণনায় হাফিজ যাহাবী (র) বলেন ঃ তিনি হাদীসসমূহের উৎস নির্ণয় করেছেন, সেগুলো যাচাই-বাছাই করেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং এসব ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।[৫৩] 'আল মু'জামুল মুখতাস' গ্রন্থে বলেছেন, "তিনি ফতোয়াবিশারদ ইমাম, প্রাজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছ, বিজ্ঞ ফকীহ এবং হাদীসের বরাত সমৃদ্ধ তাফসীরে সিদ্ধহস্ত।"

আবুল মুহাসিন হুসাইনী (র) বলেছেন, "তিনি একই সাথে ফতোয়া দিয়েছেন, শিক্ষকতা করেছেন, তর্কযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, ফিকাহ্, তাফসীর ও ব্যাকরণ শাস্ত্রে নতুন রচনাশৈলী উদ্ভাবন করেছেন এবং হাদীস বর্ণনাকারী ও হাদীসের সত্যাসত্য বিচারের ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।[৫৪]

আল্লামা সুয়ূতী (র) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর তাফসীর গ্রন্থটি অভূতপূর্ব, তাঁর পদ্ধতিতে আর কোন তাফসীর গ্রন্থ সংকলিত হয়নি।[৫৫]

---

(৫২) দাউদী, তাবাকাতুল মুফাসসিরীন, খঃ ১৪, পৃঃ ১১১।
(৫৩) যাহাবী, তাবাকাতুল হুফফায, খঃ ৪, পৃঃ ২৯।
(৫৪) আবুল মাহাসিন আল হুসায়নি, যায়লু তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, পৃঃ ৫৮।
(৫৫) সুয়ূতী, যায়লু তাবাকাতিল হুফ্‌ফাজ, পৃঃ ২২।

গবেষণামূলক বিষয়াদিতে যেমন, ইতিহাসবিদ, তাফসীরকার এবং হাদীস বিশারদরূপে তিনি সামাজিক জীবনে এবং চিন্তার জগতে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লামা যাহাবী (র)-এর পর তিনি উম্মুস্‌সা'ওয়াত তানাক্কুরিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[৫৬] তিনি 'নুজায়বিয়ায়' শিক্ষকতা করেন এবং ৭৪৮ হিজরী সনে ফাওকানী বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন।

দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সিরিয়ার নায়েবে সুলতানের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন এবং সাইপ্রাসবাসীদের ভীতি প্রদর্শন ও শাস্তির ঘোষণা প্রদানসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৫৭] অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি খলীফার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন এবং খলীফা তাঁকে বিনয়ী, বিচক্ষণ ও মিষ্টভাষী বলে প্রশংসা করেছিলেন।[৫৮]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

অধঃপতনের যুগে রাজনৈতিক বিষয়াদিতে উলামা-মাশায়েখদের পরস্পর বিরোধী ভূমিকার কারণে দলীল-প্রমাণের প্রতি জনসাধারণের বীতশ্রদ্ধ ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। তাই ফতোয়া প্রার্থী সংশ্লিষ্ট ফতোয়ার সাহায্যে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা আন্দোলন সংগঠিত করবে এমন আশংকায় তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফতোয়া দানে বিরত থাকেন। যেমন কাযীর বিরুদ্ধে ফতোয়া দানে তিনি বিরত থাকতেন। কারণ ফতোয়া দ্বারা প্রশাসনকে বিব্রত করা হয়।[৫৯]

অস্থিরতার এই যুগে রাজনৈতিক বিষয়ে নিজের রায় ঘোষণার ব্যাপারে তিনি যতটুকু রক্ষণশীল ছিলেন, অন্যদের সাথে মিলেমিশে কাজ করার ব্যাপারে তিনি ততটুকু উদার ও অকুণ্ঠ ছিলেন। হারীরিয়্যা তরীকার সাথে সংশ্লিষ্ট ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনকারী আবদুল্লাহ আল মুলাতী থেকে হাদীস বর্ণনা করাকে তিনি স্বভাবগতভাবে এবং শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে অপছন্দ করতেন।[৬০]

খ. রচনাবলী

ইব্‌ন কাসীর (র) বিশেষত ইতিহাস, তাফসীর এবং হাদীস বিষয়ে প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত ও পাণ্ডুলিপি আকারে বহু গ্রন্থ রয়েছে।

(১) প্রকাশিত গ্রন্থরাজি

(১) আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ঃ এটির জন্যেই আমরা এই ভূমিকা লিখছি। এটি ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ। ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত। শেষ দু'খণ্ড শেষ যুগের ফিতনা-ফাসাদ ও

(৫৬) আলহাসানী, যায়লু তাযকিরাতিল হুফ্‌ফাজ পৃঃ ৫৮। ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ১৮২, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭৫।
(৫৭) ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ৩২৯।
(৫৮) প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫৭।
(৫৯) ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ২১৬।
(৬০) প্রাগুক্ত. পৃষ্ঠা ৩২৭।

যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ক। ইব্ন কাসীর (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, "শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা মাকদেসীর ইতিহাস গ্রন্থের পরিশিষ্ট স্বরূপ আমাদের শায়খ হাফিজ ইলমুদ্দীন বিরযালী যে ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন এটি তার পরিশিষ্ট। তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের পরিশিষ্ট স্বরূপ এযুগ পর্যন্ত ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ আমি এ গ্রন্থে সংযোজিত করেছি। তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলো চয়ন করার কাজ আমি শেষ করেছি ৭৫১ হিজরী সনে। হযরত আদম (আ) থেকে আমাদের এ যুগ পর্যন্ত তিনি যা লিখেছেন তা এখানে এসে শেষ হয়েছে।[৬১]

কিন্তু ৭৩৮ হিজরীর পর থেকে ৭৫১ হিজরী পর্যন্ত সময়কালে বিরযালীর সংগৃহীত কোন তথ্য সম্পর্কে আমি অবগত হইনি।[৬২] ইব্ন কাসীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের অনুসরণ করে ৭৬৮ হিজরী সন পর্যন্ত পৌঁছান অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর ৬ বছর পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থটি শায়খ শিহাবুদ্দীন আবূ শামা মাকদেসীর (মৃঃ ৬৬৫ হিঃ) ইতিহাস গ্রন্থের পরিশিষ্টের পরিশিষ্ট।[৬৩]

সুতরাং এই কিতাবের বুনিয়াদ ও ভিত্তি হল শায়খ আবূ শামা মাকদেসীর ইতিহাস গ্রন্থ, এটিতে রয়েছে ৬৬৫ হিজরী পর্যন্ত সময়কালের তথ্য। তার পরবর্তী অংশের ভিত্তি হল বিরযালীর ইতিহাস গ্রন্থ।[৬৪] এটি হল ৭৩৮ হিজরী সন পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর এক বছর পূর্ব পর্যন্ত। তারপর তথ্য সন্নিবেশিত করলেন ইব্ন কাসীর (র) ৭৬৮ হিজরী সন পর্যন্ত। অবশ্য 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থটি হুবহু আবূ শামার গ্রন্থ নয়। কারণ, ইব্ন কাসীর (র) ছিলেন আবূ শামা-এর ইতিহাস গ্রন্থ এবং বিরযালীর ইতিহাস গ্রন্থের পরিশোধন ও

---

(৬১) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৪।

(৬২) আমাদের সম্মুখে উপস্থিত গ্রন্থে আমরা এই বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ্য করি ঃ

(ক) ইব্ন আসাকিরের (মৃত্যু ৫৭১) দামেশ্কের ইতিহাস (تاريخ دمشق)

(খ) আবূ শামা (মৃত্যু ঃ ৬৬৫) রচিত দামেশ্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (اختصار تاريخ دمشق)

(গ) বিরযালী (মৃত্যু ঃ ৭৩৯) রচিত দামেশ্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পরিশিষ্ট (ذيل اختصا تاريخ دمشق)

(ঘ) ইব্ন কাসীর (মৃত্যু ঃ ৭৭৪) রচিত, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (البداية والنهاية)

(ঙ) শিহাবুদ্দীন ইব্ন হাজী (মৃঃ ৮১৬) রচিত, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-এর পরিশিষ্ট (ذيل البداية والنهاية)
আমার ধারণা, এটিই তাঁর পূর্বতন আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থ।

(৬৩) ইনি হলেন শিহাবুদ্দীন আবদুর রহমান ইব্ন ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন উছমান ইব্ন আবূ বকর ইব্ন আব্বাস, আবূ মুহাম্মদ আল মাকদেসী। তিনি ছিলেন একাধারে ইমাম, আলিম, হাফিজ, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও ইতিহাসবিদ। তিনি আবূ শামা নামে প্রসিদ্ধ। তিনি দারুল হাদীস আল আশরাফিয়্যা-এর শায়খ এবং রুকনিয়্যাহ্ মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হল বহু খণ্ডে সমাপ্ত ইখতিসার তারিখে দামিশ্ক [বিরযালী (র) এ গ্রন্থেরই পরিশিষ্ট রচনা করেছেন], শরহুশ শাতিবিয়্যাহ, আররাদ্দু ইলাল আমীরিল আউয়াল, আল মাবআছ, আল ইস্রা, আররাওদাতায়ন ফীদ দাউলাতায়ন আসসালাহিয়্যাহ্ ওয়ান নূরিয়্যাহ। ৫৯৯ হিজরীতে তাঁর জন্ম 'আররাওদাতায়ন' গ্রন্থের পরিশিষ্ট রূপে তিনি আরও কিছু তথ্য সংযোজন করেছেন। তিনি হাদীস এবং ফিকাহ্ অধ্যয়ন করেছেন ফখর ইবন আসাকির ও ইব্ন আবদুস সালাম (র) থেকে। তিনি মুজতাহিদের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। কবিতাও রচনা করেছেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। ৬৬৫ হিজরী সনে তাঁর বাসগৃহে তাঁকে দাফন করা হয়।

(৬৪) বিরযালী হলেন, ইলমুদ্দীন আবূ মুহাম্মদ আল কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন বিরযালী। সিরিয়ার ইতিহাসবিদ। শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী। ৬৬৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ যে বছর শায়খ আবূ শামা মাকদেসী ইনতিকাল করেন সে বছর বিরযালীর জন্ম হয়। ৭৩৯ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। তখন তিনি ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর তাঁকে গোসল দেওয়া হয় এবং কাফন পরানো হয়। এক হাজারেরও অধিক শায়খ ও আলিম তাঁর লাশ বহন করে নিয়ে যান। আন নূরিয়্যা মাদ্রাসায় তিনি শায়খুল হাদীস ছিলেন। তাঁর কিতাবগুলো ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্যে তিনি ওয়াকফ করে দেন। (ইব্ন কাসীর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ১৪, পৃঃ ১৯৬-৯৭)

পরিমার্জনকারী। ইব্ন কাসীর (র) বলেন, তাঁর ইতিহাস-গ্রন্থ থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্যগুলো চয়ন করার কাজ শেষ করি ৭৫১ হিজরী সনের জুমাদাল উখরার ২০ তারিখ বুধবারে।[৬৫]

তিনি তাঁর এই গ্রন্থটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ

(১) প্রথম অংশে রয়েছে আরশ্-কুরসী, আসমান-যমীন ও এগুলোর মধ্যে যা আছে তা সৃষ্টির ইতিহাস এবং আসমান-যমীনের মধ্যবর্তী যা আছে সেগুলো সৃষ্টির ইতিহাস। অর্থাৎ ফেরেশতাকুল, জিন, শয়তান ইত্যাদির বর্ণনা। আরও রয়েছে হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি, আম্বিয়া-ই কেরামের ঘটনাবলী, ইসরাঈলীদের বিবরণ এবং আইয়ামে জাহিলিয়াতের ঘটনাবলীসহ হযরত মুহাম্মদ (সা)–এর নবুওত লাভ পর্যন্ত কালের ঘটনাবলী।

(২) দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে নবী করীম (সা)-এর ওফাতের পর থেকে ৭৬৮ হিজরী পর্যন্ত।

(৩) তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য অশান্তি, বিপর্যয়, কিয়ামতের আলামতসমূহ, পুনরুত্থান, হাশর-নশর, কিয়ামত দিবসের ভয়াবহ অবস্থা ও জান্নাত-জাহান্নামের বিবরণ।

ইতিহাস গ্রন্থ সংকলনে তিনি তাঁর পূর্বে সংকলিত ইতিহাস গ্রন্থগুলোর তথা তারীখে তাবারী, তারীখে মাসউদী ও তারীখে ইব্নিল আছীর ইত্যাদি গ্রন্থের রীতি অনুসরণ করেছেন। ঘটনাবলী তিনি বছরওয়ারী বর্ণনা করেছেন। এগুলো বর্ণনায় তিনি বিভিন্ন শিরোনাম ব্যবহার করেছেন। প্রথমে তিনি বছরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। তারপর ঐ বছর যাঁরা ইনতিকাল করেছেন তাঁদের জীবনী আলোচনা করেছেন। কবিতার উদ্ধৃতি আছে প্রায় সব পৃষ্ঠাতেই। অনেক সময় তাঁর স্বরচিত কবিতা কিংবা প্রাসঙ্গিক কুরআনুল করীমের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

এই গ্রন্থটি বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। আমার মনে হয় এর প্রাচীনতম মুদ্রণ হল ১৩৪৮ হিজরীর মুদ্রণটি। বাদশাহ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুর রহমান আল সউদ এটি মুদ্রণ ও প্রকাশে আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছিলেন। আসতানাতে অবস্থিত ওলীউদ্দীন লাইব্রেরীতে রক্ষিত কপি থেকে কুর্দিস্তান আল আলামিয়া প্রেসে এটি মুদ্রিত হয়েছিল।

দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়েছিল কায়রোর আস্‌সা'আদাহ্ ছাপাখানায় ১৩৫১ হিজরীতে। তারপর দুই খণ্ডে আলাদা-আলাদা ছাপা হয় মিসরে। অনুরূপভাবে শায়খ ইসমাঈল আনসারী কর্তৃক পরিমার্জিত রূপে রিয়াদে ছাপা হয় ১৩৮৮ হিজরী সনে, তবে এ সকল মুদ্রণে বিভিন্ন ত্রুটি ছিল। এ জন্যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিশোধন করে বর্তমান মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রসংগে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, শিহাবুদ্দীন ইব্ন হুয্যী (ওফাত ৮১৬ হিঃ) 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থের পরিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ৭৪১ হিজরী থেকে

(৬৫) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৪, তাঁর সংকলন 'আলমুকতাফা লি তারীখে আবীশামা' এটিকে তিনি আবূ শামা রচিত ইতিহাস গ্রন্থ 'আর রাওদাতায়ন'-এর সাথে সংযোজন করেছেন। জুরজী যায়দান তাঁর তারীখে আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এরূপ উল্লেখ করেছেন। তাতে ৭২০ হিজরী পর্যন্ত কালের ঘটনাবলী তিনি বিবৃত করেছেন। 'কৃপরিলীতে' এর একটি কপি রয়েছে। কায়রোর আন্তর্জাতিক আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি বিভাগে এর একটি ফটো কপি রয়েছে। তাঁর শিষ্য তকীউদ্দীন ইব্ন রাফি সালামী (মৃত্যু ৭৭৪ হিঃ) 'আল ওফিয়্যাতে' এর একটি পরিশিষ্ট লিখেছেন। 'দারুল কুতুব আলমিসরিয়্যাতে' এর একটি কপি রয়েছে।

৭৬৯ হিজরী সন পর্যন্ত সময়কালের ঐতিহাসিক তথ্যাদি সন্নিবেশিত করে। বার্লিনে তার একটি কপি রয়েছে।

আমরা এ বিষয়ে ঐতিহাসিক জুরজী যায়দানের একটি অভিমতের বিরোধিতা করি। তিনি বলেছেন যে, 'বিরযালী' রচিত 'আল মুকতাফা লি তারীখে আবী শামাহ্' গ্রন্থটি ইব্ন আসাকির রচিত 'ইখতিসারু তারীখ-ই-দামিশক' গ্রন্থের পরিশিষ্ট। জুরজী যায়দান উল্লেখ করেছেন যে, আররাওদাতাইন ফী আখবারে দাওলাতাইন আস্‌সিলাহিয়্যাহ্ ওয়ান নুরিয়্যাহ্' গ্রন্থের সাথে 'আল মুকতাফা লি তারীখে আবী শামাহ্'-এর সম্পর্ক রয়েছে তা সঠিক নয়।

যেহেতু ইব্ন আসাকীর-এর ইতিহাস গ্রন্থটি হল এ সিরিজের মূল ভিত্তি যা সর্বমহলে সুপরিচিত। 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'-ই যেহেতু এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত, তাই ইব্ন আসাকির সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার— যদিও এখানে তাঁর আলোচনা খুব একটা প্রাসংগিক নয়।

তিনি, ইব্ন আসাকির, হাফিজ আবুল কাসেম আলী ইব্ন আবূ মুহাম্মদ হাসান ইব্ন হিবাতুল্লাহ্ ওরফে ইব্ন আসাকির দিমাশকী। তাঁর উপাধি ছিল সেকাতুদ্দীন। তিনি সিরিয়ার মুহাদ্দিছ, শাফিঈ মাযহাবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফকীহ্। কোন কোন সফরে তিনি সামআনীর সফরসঙ্গী ছিলেন। দামেশ্‌কের নূরিয়া মাদ্রাসায় অধ্যাপক পদে নিয়োগ লাভ করেছিলেন। তার রচিত 'তারীখে দিমাশ্‌ক' গ্রন্থের জন্যে তিনি সমধিক খ্যাতি লাভ করেন। খতীব আবূ বকরের 'তারীখ-ই বাগদাদ' গ্রন্থের রচনা-রীতি অনুসরণে ইবনে আসাকির ৮০ খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। তাতে তিনি ইসলামের প্রারম্ভিক যুগ থেকে তাঁর সমসাময়িক কাল পর্যন্ত দামেশ্‌কে বসবাসকারী এবং দামেশ্‌কে আগত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, রাবীগণ, মুহাদ্দিসগণ, হাফিজগণ, রাজনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদদের জীবনী আলোচনা করেছেন। দামেশ্‌কের "মাজমা আল ইলমী আল-আরবী"-এর অর্থানুকল্যে এ গ্রন্থের কতক অংশ প্রকাশিত হয়েছিল আর কতক অংশ প্রকাশিত হয়েছিল দামেশ্‌কের 'রাওদাতুশ্‌শাম' প্রকাশনালয়ের সহায়তায়।

এই গ্রন্থের কয়েকটি পরিশিষ্ট গ্রন্থ রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল ঃ

মূল রচয়িতা ইব্ন আসাকির (র)-এর পুত্র আলকাসিম রচিত পরিশিষ্ট।

সদরুদ্দীন বাক্‌রী-এর রচিত পরিশিষ্ট।

উমর ইব্ন হাজিব রচিত পরিশিষ্ট।

আলোচ্য গ্রন্থের কয়েকটি সার-সংক্ষেপ গ্রন্থ রয়েছে, তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল ঃ

ইখতিসারে আবী শামা, এটির পরিশিষ্ট লিখেছেন বিরযালী এবং পরবর্তী অংশ ইব্ন কাসীর (র)।

'লিসানুল আরব' গ্রন্থ প্রণেতা জামালউদ্দীন ইব্ন মানযূর রচিত সংক্ষিপ্তসার। ইসমাঈল আজলূযী আল-জার্রাহ্ কৃত সংক্ষিপ্তসার।

ইখতিসার-ই শায়খ আবুল ফাতহ্ আল খাতীব (ওফাত ১৩১৫ হিঃ)।

(১) ইব্ন কাসীর (র)-এর অন্যান্য রচনা

(২) তাফসীরুল কুরআনিল কারীম (তাফসীরে ইব্ন কাসীর)

এটি প্রথমে ছাপা হয় বূলাকে, কানূজীর 'ফাতহুল বয়ানের' পার্শ্বটীকা রূপে এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১০ খণ্ডে। পুনরায় ছাপা হয় ১৩০০ হিজরীতে সাইয়িদ আবূ তায়্যিব সিদ্দীক ইব্ন হাসান খান রচিত 'মাজমাউল বয়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন' গ্রন্থের পার্শ্বটীকা স্বরূপ। ১৩৪৩ হিজরীতে এটি নাজদ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ইমাম সুলতান আবদুল আযীয ইব্ন আবদুর রহমান আল ফায়সাল-এর নির্দেশে মিসরের আল মানার ছাপাখানায় মুদ্রিত হয়। এটির পার্শ্বটীকায় ছিল ইমাম বগভী (র) রচিত তাফসীর। পরে সংক্ষিপ্ত আকারে "উম্‌দাতুত্ তাফসীর আনিল হাফিজ ইব্ন কাছীর" নামে ১৯৫৬ খৃস্টাব্দ/১৩৭৫ হিজরীতে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এটি ৫টি খণ্ডে মুদ্রিত হয়। তাফসীর নং ১৬৮ ক্রমিক নম্বরে ৭ খণ্ডে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত মাক্‌তাবাতুল আযহারিয়্যায় রক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে এটি মুদ্রিত হয়। ৮২৫ হিজরীতে মুহাম্মদ আলী সূফী এটির কপি করে দিয়েছিলেন। আমার জানা মতে এটি উৎকৃষ্টতম ছাপা।

ইব্ন কাসীর (র) কুরআন করীমের তাফসীর কুরআনের আয়াত দ্বারা, অতঃপর হাদীস দ্বারা এই নীতির অনুসরণ করেছেন। ইসরাঈলীদের মনগড়া বর্ণনাগুলোর তিনি সমালোচনা করেছেন। এগুলোর প্রতি তাঁর কোন আস্থা ছিল না। তবে শরীয়ত যেগুলো সমর্থন করে, সেগুলো ব্যতিক্রম। তিনি তাফসীর গ্রন্থের সাথে 'ফাযায়েলুল কুরআন'ও সংযুক্ত করে দিয়েছেন। যা ১৩৪৮ হিজরীতে স্বতন্ত্রভাবে মিসরে ছাপা হয়েছিল। অতঃপর তাঁর তাফসীরের সাথে পুনরায় ছাপা হয়।

(৩) আল ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ

দারুল কুতুব আল্‌মিস্‌রিয়্যাতে এর একটি অশুদ্ধ কপি সংরক্ষিত আছে। 'আলমাখতূতাত ইন্সটিটিউটে' এর ফটোকপি মজুদ আছে। এ কিতাবটি অতি সাধারণভাবে কোন প্রকারের পরিশোধন পরিমার্জন ব্যতীত প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ছিল বহু ভুল ও বিকৃতি। ১৩৪৭ হিজরী সনে 'আবুল হাওল' প্রেসে এটি মুদ্রিত হয়। তবে পরিশোধিত ও পরিমার্জিত প্রকাশনা হল ১৪০১ হিজরী মুতাবিক ১৯৮১ খৃস্টাব্দে বৈরুতে প্রকাশিত মুদ্রণটি। আবদুল্লাহ আবদুর রহীম উসায়লীন এই মুদ্রণের তত্ত্বাবধান করেন।

সিরিয়ার নায়েবে সুলতান আমীর মুনজাক ইব্ন আবদুল্লাহ্ সায়ফুদ্দীন আল ইউসুফীর (ওফাত-৭৭৬ হিঃ) আগ্রহ পূরণার্থে ইব্ন কাসীর (র) এ গ্রন্থটি সংকলন করেছিলেন। এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত রয়েছে হিজরী ৮ম শতাব্দীর মুসলিম ও ক্রুসেডারদের যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনা। সেই যুগের বর্ণনা যে যুগে ইব্ন কাসীর (র) জীবন যাপন করেছিলেন। ইতিহাস শাস্ত্রে এটি একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়। কারণ, সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী এই গ্রন্থে সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে বর্ণিত হয়েছে। তিনি তাঁর এ গ্রন্থটি একটি ভূমিকা দ্বারা শুরু করেন। এতে তিনি জিহাদে উদ্বুদ্ধকারী কুরআনের আয়াতসমূহ এবং এরপর এ বিষয়ক হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন। মোট ১৩টি হাদীস তিনি এখানে সন্নিবেশিত করেছেন। তারপর ক্রুসেডার ও মুসলমানদের মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। এরপর আলেকজান্দ্রিয়া সীমান্তে ফিরিঙ্গীদের আগ্রাসী

আক্রমণ এবং মুসলমানদের প্রতিরোধের কথা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ থেকে শুরু করে খিলাফতে রাশেদা ও তার পরবর্তী যুগের সিরিয়ায় মুসলমানদের 'জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্'-এর জন্যে অবিরাম প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছেন। ফিরিঙ্গীদের বায়তুল মুকাদ্দাস দখল এবং সালাহউদ্দীন আয়ুবী কর্তৃক তা পুনরুদ্ধারের ইতিহাস এবং গাযা, নাবলুস, আজলূন, কুর্ক, গাওর, শাওবাক ও সাফাদ অঞ্চল পুনরাধিকারের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন।

(৪) ইখতিসার-ই-উলূমিল হাদীস

এটি হাদীসের পরিভাষা বিষয়ক একটি পুস্তিকা। "আল-বাইছুল হাছীছ ইলা মা'রিফাতি উলূমিল হাদীস" শিরোনামে আহমদ মুহাম্মদ শাকির এটির ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছেন। এটা হচ্ছে ইব্‌ন কাসীর (র) কৃত ইব্‌ন সালাহ্-এর 'মুকদ্দিমা' গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত সার। এ গ্রন্থের কয়েকটি মুদ্রণ হয়।

(ক) ১৩৫৩ হিজরী সনে শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রায্‌যাক হাম্‌যার পরিশোধন সহকারে এর মক্কা সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

(খ) ১৩৫৫ হিজরী সনে এর মিসরীয় সংস্করণ ছাপা হয়। আহমদ শাকির এটি সংশোধন করেছেন।

(গ) কিছু অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ও মন্তব্য সহকারে আহমদ শাকির ১৩৭০ হিজরী সনে এটা কায়রো থেকে পুনঃ প্রকাশ করেন।

(৫) শামাইলুর রাসূল ওয়া দালাইলু নুবুওয়াতিহী ওয়া ফযায়েলিহী ও খাসাইসিহী

এটি 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। ১৩৮৬ হিঃ/১৯৬৭ খ্রীঃ কায়রো থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি মুস্তাফা আবদুল ওয়াহিদ কর্তৃক পরিশোধিত ও পরিমার্জিত।

পরিশোধনে তিনি নিম্নে উল্লেখিত কপিগুলোর সাহায্য নিয়েছেন।

(ক) ওলীউদ্দীন কৃত ফটোকপি, এটি ইতিহাস গ্রন্থ ক্রমিক নং ১১১০ রূপে 'দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যা' গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত রয়েছে।

(খ) মাকতাবা-ই-তায়মুরিয়্যা সংরক্ষিত ইতিহাস গ্রন্থ নং ২৪৪৩।

(গ) আলেপ্পোর মাকতাবা-ই-আহমদিয়া পাণ্ডুলিপি থেকে সংরক্ষিত কপি অনুসারে ১৩৫১ হিঃ সনে দারুস সাআ'দা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত কপি।

(৬) ইখতিসারু আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ্

এটিও 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' থেকে সংকলিত গ্রন্থ। এতে ইব্‌ন কাসীর (র)-এর জাহেলী যুগের আরব ইতিহাস এবং সীরাতুন্নবী (সা) বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে। 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া'-এর ২য় খণ্ডের শেষ থেকে ৫ম খণ্ডের শেষ পর্যন্ত প্রায় তিন খণ্ডের আলোচনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ এই অংশটি ৪ ভাগে বিভক্ত। গ্রন্থটি বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ঃ

(ক) মিসরীয় মুদ্রণ ঃ ১৩৫৮ হিঃ/১৯৫৭ খ্রীঃ আরিফ লাইব্রেরীতে রক্ষিত কপি অনুসারে "আল ফুসূল ফী ইখতিসারে সীরাতে রাসূল (সা)" শিরোনামে প্রকাশিত হয়।

(খ) বৈরুত ও দামেশ্কের 'মুআস্সাসাতু উলুমিল কুরআন ওয়া দারুল কলম' প্রকাশনালয়ের প্রকাশনা। ১৩৯৯-১৪০০ হিজরীর মধ্যে ডঃ মুহাম্মদ ঈদ আল-খাতরাবী ও প্রফেসর মুহিউদ্দীন মস্তু এই সংস্করণটি সম্পাদনা করেন।

(৭) আহাদীসুত তাওহীদ ওয়ার রাদ্দু আলাশ্ শিরক

ব্রুকলম্যান তাঁর আরবী সাহিত্যের ইতিহাস تاريخ الادب العربى গ্রন্থের (২/৪৮) পরিশিষ্টে এ তথ্য উল্লেখ করেছেন এবং তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ১২৯৭ হিজরী সনে এটি দিল্লীতে মুদ্রিত হয়েছে।

উপরোল্লেখিত গ্রন্থগুলোই হচ্ছে ইব্ন কাসীর (র) রচিত প্রকাশিত গ্রন্থ। তাঁর অপ্রকাশিত রচনাবলীর সংখ্যা অনেক। সেগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধগুলোর তালিকা নিম্নে দেয়া হচ্ছে ঃ

(২) তাঁর অপ্রকাশিত রচনাবলী

(৮) জামিউল মাসানীদ

এ গ্রন্থটি ৮ খণ্ডে সমাপ্ত। শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রায্যাক হামযা এটির নামকরণ করেছেন "আল-হাদস্ ওয়াস্ সুনান ফী আহাদীসিল মাসানীদ ওয়াস্ সুনান"। এটিতে তিনি ইমাম আহমদ আল-বায্যায-এর মুসনাদ, আবূ ইয়া'লা-এর মুসনাদ, ইব্ন আবী শায়বার মুসনাদ এবং ৬টি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাতে এর একটি কপি মওজুদ আছে যা সাত খণ্ডে বাঁধাইকৃত।

৭ম খণ্ডে আবূ হুরায়রা (রা)-এর মুসনাদ-এর সিংহভাগ স্থান পেয়েছে।

(৯) তাবাকাতুশ্ শাফিঈয়্যা

দাউদী তাঁর গ্রন্থে (১ম খঃ পৃঃ ১১০-১১১)-এর উল্লেখ করেছেন। কায়রোর আল মাখতূতাত ইন্সটিটিউটে ৭৮৯ ক্রমিক নম্বরে এ পুস্তকটির একটি ফটোকপি মওজুদ আছে যা ত্রুটিপূর্ণ। রাবাতের কাতানীর কপি থেকে এটি ফটো কপি করা হয়েছে। সেখানে গুস্তারবামিত এর অপর একটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে— যার ক্রমিক নং হচ্ছে ৩৩৯০।

(৩) ইব্ন কাসীর (র)-এর বিলুপ্ত রচনাবলী

ইব্ন কাসীর (র)-এর যে সকল রচনা আমরা পাইনি কিন্তু তাঁর গ্রন্থাদিতে কিংবা পূর্ববর্তী যুগের লেখকদের গ্রন্থে সেগুলোর নাম পাওয়া যায় তার কতকগুলোর কথা আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি ঃ

(১০) আত তাক্মীল ফী মা'রিফাতিস সিকাতি ওয়াদ দুআ'ফা ওয়াল মাজাহীল

হাদীসের বর্ণনাকারিগণ সংক্রান্ত ৫ খণ্ডে সমাপ্ত এ গ্রন্থটিতে তিনি তাঁর শায়খ 'মিয্যী'-এর 'তাহযীবুল কামাল' এবং আল্লামা যাহাবী-এর 'মীযানুল ইতিদাল' গ্রন্থদ্বয় একত্র করেছেন। তিনি নিজে হাদীস বর্ণনাকারীদের যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত অতিরিক্ত কিছু তথ্যও এতে সংযোজন করেছেন।

নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থসমূহে আলোচ্য গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে ঃ

(ক) হাজী খলীফা রচিত কাশফুয্‌যুনূন, খঃ ১, পৃঃ ৪৭১

(খ) দাউদী রচিত তাবাকাতুল মুফাস্‌সেরীন, খঃ ১, পৃঃ ১১০

(গ) আল্লামা সুয়ূতী রচিত যায়লু তাযকিরাতিল হুফ্‌ফাজ, পৃঃ ৫৮।

(১১) আল কাওয়াকিবুদ দারারী ফীত তারীখ

এটি জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থ। 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া' থেকে এটি সংকলিত। হাজী খলীফা তাঁর 'কাশফুজ জুনূন' গ্রন্থে আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫২১ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ করেছেন।

(১২) সীরাতুশ শায়খায়ন

এ গ্রন্থে তিনি হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত প্রাপ্তি, তাঁর মর্যাদা ও আচার-আচরণের বিষয় উল্লেখ করেছেন। এরপর উল্লেখ করেছেন হযরত উমর ফারুক (রা)-এর জীবন, কর্ম ও অন্যান্য বিষয়। তাঁরা দু'জনে নবী করীম (সা) থেকে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন, সেগুলোও তিনি এ গ্রন্থে সংকলিত করেছেন। ফলে গ্রন্থটি হয়েছে তিনখণ্ড বিশিষ্ট।

নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থগুলোতে আলোচ্য গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ

(ক) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া খঃ ৭, পৃঃ ১৮।

(খ) আল্লামা সুয়ূতী রচিত যায়লু তাযকিরাতিল হুফ্‌ফাজ, পৃঃ ৩৬১।

(১৩) আল ওয়াদিহুন নাফীস ফী মানাকিবিল ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইদ্‌রীস

এ গ্রন্থটি 'মানাকিবিশ শাফি'ঈ' নামে প্রসিদ্ধ।

নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থগুলোতে এর উল্লেখ রয়েছে ঃ

(ক) হাজী খলীফা রচিত কাশফুজ জুনূন, খঃ ২, পৃঃ ১৮৪০।

(খ) আদ দাউদী রচিত 'তাবাকাতুল মুফাসসিরীন' খঃ ১, পৃঃ ১১১।

(১৪) কিতাবুল আহকাম

এটি একটি বিরাট গ্রন্থ। তিনি এটি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। হজ্জ অধ্যায় পর্যন্ত রচনা করেছিলেন। "আল-আহকামুস্ সুগরা ফীল হাদীস" নামেও এটির উল্লেখ পাওয়া পায়। হাজী খলীফা রচিত 'কাশফুজ জুনূন' গ্রন্থের ১ম খণ্ডে ৫৫০ পৃষ্ঠায় এ গ্রন্থটির উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১৫) আল আহকামুল কবীরা

নিম্নলিখিত গ্রন্থাদিতে এ গ্রন্থের আলোচনা রয়েছে ঃ

(ক) ইব্‌ন কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ৩, পৃঃ ২৫৩।

(খ) আদ দাউদী তাবাকাতুল মুফাস্‌সিরীন, খঃ ১, পৃঃ ১১০, ১১১।

(১৬) তাখরীজু আহাদীসি আদিল্লাতিৎ তানবীহ ফী ফুরুইশ শাফি'ঈয়্যা

নিম্নোক্ত গ্রন্থাদিতে এ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ

(ক) ইব্‌ন কাসীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খঃ ২, পৃঃ ১২৫।

(খ) আল বাগদাদী, হিদায়াতুল আরেফীন, খঃ ১, পৃঃ ২১৫।

(১৭) ইখতিসারুল কিতাবি আল মাদখাল ইলা কিতাবিস সুনান লিল বায়হাকী

এর সারসংক্ষেপ। ইব্‌ন কাসীর (র) রচিত "ইখতিসার উলুমিল হাদীস" গ্রন্থের ৪র্থ পৃষ্ঠায় উল্লেখ পাওয়া যায়।

(১৮) শারহু সহীহ আল-বুখারী

তিনি এটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। নিম্নে বর্ণিত গ্রন্থগুলোতে এর উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ

(ক) ইব্‌ন কাসীর (র) রচিত 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া', খঃ ৩, পৃঃ ৩।

(খ) প্রাগুক্ত খঃ ১১, পৃঃ ৩৬।

(গ) হাজী খলীফা রচিত 'কাশফুজ জুনূন' খঃ ১, পৃঃ ৫৫০।

(ঘ) আদ দাউদী, তাবাকাতুল মুফাস্‌সিরীন, খঃ ১, পৃঃ ১১০-১১১।

(১৯) আস-সিমাত

হাজী খলীফা রচিত কাশফুজ জুনূন গ্রন্থের ২য় খণ্ডে ১০০২ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ রয়েছে। উপরোল্লেখিত পরিশিষ্ট, ভাষ্য গ্রন্থ, সারসংক্ষেপ এবং সংকলনগুলোর পাশাপাশি ইব্‌ন কাসীর (র)-এর একটি কাব্য গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়, যা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর। এটি সংকলন ও ব্যাখ্যা করা জরুরী। অদূর ভবিষ্যতে একাজ সম্পন্ন করার হিম্মত ও তাওফীক যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দান করেন।

তাঁর কবিতার নমুনা ঃ

تمر بنا الايام تترى وانما – نساق الى الاجال والعين تنظر

দিন যাচ্ছে অবিরাম আর আমরা আহা
নীত হচ্ছি মৃত্যুর দিকে চক্ষু দেখিছে তাহা।

فلا عائد ذاك الشباب الذى مضى – ولا زائل هذا المشيب المكدر

অতীত যৌবন আসবে না ফিরে কভু এ জীবনে
জরাজীর্ণ এই বার্ধক্য যাবে না সরে কোনক্ষণে।

(৩) জ্ঞাতব্য

(১) **তাঁর রচনাশৈলী ঃ** আল্লামা ইব্‌ন কাসীর (র) ও তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে আলোচনার উপসংহারে তাঁর রচনাশৈলী সম্পর্কে কিছু কথা বলা জরুরী। ইব্‌ন কাসীর (র) ছন্দ ও বাক্যের সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দিতেন। তবে তিনি কতগুলো স্থানীয় শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেগুলো ঐতিহাসিক তাবারী, মাস'উদী ও ইব্‌নুল আসীরের ভাষাগত উৎকর্ষের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। ইব্‌ন খালদূন তাঁর মুকাদ্দমা ও ইতিহাস গ্রন্থে যে পর্যায়ের ভাষাগত অলংকার ব্যবহার করেছেন ইব্‌ন কাসীর (র)-এর ব্যবহৃত ভাষা তার তুলনায় দুর্বল। আমরা এ কথা বলতে পারি যে, ইব্‌ন কাসীর (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থ রচনার প্রতি যত বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, শব্দ ও

ভাষার প্রতি তত গুরুত্ব দেননি। কারণ তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে ততটা পারদর্শী ছিলেন না। তাঁর কবিতার ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।

তাঁর ভাষার মধ্যে আমরা প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি লক্ষ্য করি। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

ووطنوا اراضى كثيرة من صنع بلادهم

অনুরূপভাবে তাঁর যুগের তুর্কী ও মামলূকদের ব্যবহৃত কতকগুলো শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন। যথোচিত শব্দ চয়নেও কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।

যেমন সালাহ উদ্দীনের ব্যাপারে তাঁর পুত্রদের শোক ও আহাজারীর বর্ণনায় তিনি লিখেছেন يتباكون عليه (তারা কৃত্রিমভাবে তাঁর জন্যে কাঁদছে।) যেন পিতা-পুত্রের মাঝে কোন আন্তরিক ও আত্মিক সম্পর্ক ছিল না, ফলে তারা কান্নার ভান করেছে।

(২) বর্ণনা পদ্ধতি ঃ এতো ছিল ভাষাগত দিক। বর্ণনা পদ্ধতির ক্ষেত্রে ইব্ন কাসীরের রচনা পাঠে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে।

(ক) কুরআনুল দ্বারা কুরআনের তাফসীর করার পদ্ধতি বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে তিনি কুরআন করীমের প্রচুর আয়াত সন্নিবেশিত করেছেন। অতঃপর আয়াতের সাথে সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছেন।

(খ) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বিশ্বকোষ সুলভ বর্ণনা পদ্ধতি লক্ষণীয়। তিনি বর্ণনাকারীদের সূত্র ও ভাষ্যসমূহ দ্বারা তাঁর ইতিহাস গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করেছেন।

(৩) ইসরাঈলী বর্ণনাগুলো সম্পর্কে তিনি সন্দেহ পোষণ করতেন। তিনি বলেছেন, এটি এবং এটির ন্যায় অন্যান্য বর্ণনা আমার মতে মিথ্যাচারী ও ধর্মত্যাগী লোকদের স্বকপোলকল্পিত রচনা। এ সবের দ্বারা তারা তাদের দীনের ব্যাপারে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে। অন্যত্র তিনি বলেছেন, এই তাফসীরে আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি তা হল ইসরাঈলী বর্ণনা বর্জন। কারণ এগুলোর উল্লেখ করা শুধু সময়ের অপচয়। এগুলোতে রয়েছে তাদের মধ্যে প্রচলিত মিথ্যাচারের বর্ণনা।

(৪) একজন হাদীসবিশারদ ইমামের মতই তিনি রেওয়ায়েত বা বর্ণনা সূত্রসহ তথ্য উল্লেখে গুরুত্ব দিয়েছেন। ইজতিহাদ ও আপন অভিমত সংযোজনকে তিনি অপছন্দ করতেন।

(৫) সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগুলোর একত্রীকরণ। কোন তথ্য কিংবা বর্ণনাতে রং চড়াতে গিয়ে তিনি নিজের পক্ষ থেকে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করতেন না। বরং প্রতিটি দলীল ও বর্ণনাকে তিনি হুবহু উদ্ধৃত করতেন।

(৬) অলংকরণ, বিন্যাস, সৌন্দর্য বিধান, ব্যাখ্যাকরণ ও হেতু বর্ণনা তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল না। বরং তাঁর প্রধান ও সার্বিক লক্ষ্য ছিল তথ্যসমূহ একত্র করা। ফলে কখনো কখনো তথ্য ও বর্ণনার পুনরাবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। আবার কখনো কোন তথ্যের প্রাসংগিক বিষয়াদি একাধিক স্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

তথ্য সূত্র

আমরা শুধু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান তথ্য সূত্রসমূহ উল্লেখ করছি, যাতে বিস্তারিত জানার জন্যে ভাষ্যগ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া যায় ঃ

(১) ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৪ খণ্ড, ৭ ভলিউমে।

(২) ইব্‌ন কাসীর, উমদাতুত তাফসীর আনিল হাফিজ ইব্‌ন কাসীর

সংক্ষেপায়ন ও সম্পাদনা— আহমদ মুহাম্মদ শাকির, দারুল মাআরিফ, মিসর। প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৬ হি/১৯৫৬ খৃঃ।

(৩) ইব্‌ন কাসীর, আল-ইজতিহাদ ফী তালাবিল জিহাদ, সম্পাদনা, আবদুল্লাহ আবদুর রহীম উসায়লান, বৈরুত, ১৪০১ হিঃ/১৯৮১ খৃঃ।

(৪) ইব্‌ন কাসীর, ইখতিসার উলুমিল হাদীস, সম্পাদনা—আহমদ শাকির, ভূমিকা, আবদুর রায্‌যাক হামযা, কায়রো, ১৩৭০ হিঃ।

(৫) ইব্‌ন কাসীর, শামাইলুর রাসূলু ওয়া দালাইলু নুবুওয়াতিহী, ওয়া ফাযাইলিহী ওয়া খাসাইসিহী, সম্পাদনা— মুস্তফা আবদুল ওয়াহিদ, ঈসা আল বাবী আল হালাবী এণ্ড কোম্পানী মুদ্রণালয়, কায়রো, ১৩৮৬হিঃ/১৯৬৭ খৃঃ।

(৬) ইব্‌ন কাসীর, ইখতিসারু আস্‌সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, সম্পাদনা—মুহাম্মদ ঈদ আল খাতরাবী ও মুহিউদ্দীন মস্তূও, উলুমুল কুরআন ওয়া দারুল কলম ফাউন্ডেশন দামেশ্‌ক, বৈরুত, ১৩৯৯-১৪০০ হিঃ।

(৭) ইব্‌ন কাসীর, আসসীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, সম্পাদনা—মুস্তাফা আবদুল ওয়াহিদ, দারুল মা'রিফাহ্ লিত তাবাআ' ওয়ান নাশ্‌র, বৈরুত, ১৩৯৯ হিঃ/১৯৭৯ খৃঃ।

(৮) ইব্‌ন কাসীর, তাফসীর ইব্‌ন কাসীর ওয়াল বাগাবী, মাতবা'আতুল মানার মুদ্রিত, মুহাম্মদ রশীদ রেযার উপস্থাপনা, মুদ্রণ নির্দেশ দিয়েছেন সুলতান আবদুল আযীয আল-সাউদ, নজদ ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ইমাম, মিসর, ১৩৪৩ হিজরী।

(৯) খায়রুদ্দীন আয্‌যিরিকলী, আল-আ'লাম, কামূস ও তারাজিম, দারুল ইল্‌ম লিল মালাঈন, বৈরুত রোড নং-৫, ১৯৮০ খৃস্টাব্দ।

(১০) জুরজী যয়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, উপস্থাপনা, শাওকী দায়ফ, দারুল হিলাল মুদ্রিত, কায়রো।

(১১) শামসুদ্দীন আয্‌যাহাবী, তায্‌কিরাতুল হুফ্‌ফাজ, হায়দ্রাবাদে মুদ্রিত, ১৩৩৪ হিজরী।

(১২) ইব্‌ন হাজর আল আস্‌কালানী, আদদুরারুল কামিনা ফী আ'ইয়ান আল মিআতিস সামিনা, হায়দ্রাবাদে মুদ্রিত, ১৩৪৮ হিজরী।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া

প্রথম অংশ

সৃষ্টি জগতের সূচনা

بـــــسم الله الرحمن الرحيـــــم

الحمد لله الاول الاخر، الباطن الظاهر، الذى هو بكل شيئ عليم، الأول فليس قبله شيئ، الاخر فليس بعده شيئ، الظاهر فليس فوقه شيئ، الباطن فليس دونه شيئ ، الازلى القديم الذى لم يزل موجودا بصفات الكمال، ولا يزال دائما مستمرا باقيا سرمد يابلا انقضاء ولا انفصال ولازوال، يعلم دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، فى الليلة الظلماء. وعدد ا لرمال ، وهو العلى الكبير المتعال، العلى العظيم الذى خلق كل شيئ فقدره تقديرا -

ورفع السموت بغير عمد، وزينها بالكواكب الزاهرات ، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وسوى فوقهن سريرا، شرعا عاليا منيفا متسعا مقبيا مستديرا ، وهو العرش العظيم - له قوائم عظام، تحمله الملئكة الكرام، وتحفه الكروبيون عليهم الصلاة والسلام ، ولهم زجل بالتقديس و التعظيم. وكذا أرجاء السموت مشحونة بالملئكة ، ويفد منهم فى كل يوم سبعون ألفا إلى البيت المعمور بالسماء الرابعة لا يعودون إليه آخر ما عليهم فى تهليل وتحميد وتكبير وصلاة وتسليم.

ووضع الأرض للأنام على تيار الماء وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة ايام قبل خلق السماء، وأثبت فيها من كل زوجين اثنين، دلالة للالباء من جميع ما يحتاج العباد اليه في شتائهم وصيفهم، ولكل ما يحتاجون أليه ويملكونه من حيوا بهيم.

وبدأ خلق الإ نسان من طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، فى قرار مكين. فجعله سميعا بصيرا، بعدأن لم يكن شيئا مذكورا. وشرفه بالعلم والتعليم. خلق بيده الكريمة آدم أبا البشر وصور جثته ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، وخلق منه زوجه حواء أم البشر فأنس بها وحدته، واسكنهما جنته، وأسبغ عليهما نعمته. ثم أهبطهما إلى الأرض لما سبق فى ذالك من حكمة الحكيم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقسمهم بقدره العظيم ملوكا ورعاة ، وفقراء واغنياء، واحرارا وعبيدا وحرائر وإماء، وأسكنهم أرجاء الأرض طولها والعرض وجعلهم خلائف فيها يخلف البعض منهم البعص، إلى يوم الحساب والعرض على العليم الحكيم ، وسخر لهم الأنهار من سائر الاقطار، تشق الأقاليم إلى الامصار، مابين صغار وكبار، على مقدار الحاجات والأوطار، وأنبع لهم العيون والأبار، وارسل عليهم السحائب بالأمطار. فأنبت لهم سائر صنوف الزرع والثمار، وآتاهم من كل ما سألوه بلسان حالهم وقالهم: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار) فسبحان الكريم العظيم الحليم. وكان من اعظم نعمه عليهم وإحسانه إليهم، بعد أن خلقهم ورزقهم، ويسرلهم السبيل وأنطقهم، أن أرسل رسله إليهم، وأنزل كتبه عليهم، مبينة حلاله وحرامه وأخباره، واحكامه، وتفصيل كل شيئ فى المبدء والمعاد إلى يوم القيامة.

فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق والتسليم والأوامر بالإنقياد والنواهى بالتعظيم. ففاز بالنعيم المقيم وزحزح عن مقام المكذبين فى الجحيم ذات الزقوم والحميم والعذاب الأليم.

أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يملأ أرجاء السموات والأرضين. دائما أبدالابدين ودهرالداهرين إلى يوم الدين فى كل ساعة

وأن ووقت وحين كما ينبغي لجلاله العظيم وسلطانه القديم ووجهه الكريم . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ولاصاحبة له ولا نظيرله ولا وزيرله ولا مشير ولاعديدله ولاتديد ولا قسيم.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المصطفى من خلاصة العرب العرباء من الصميم خاتم الأنبياء وصاحب الحوض الأكبر الرواء، صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة، وحامل اللواء الذى يبعثه الله المقام المحمود الذى يرغب إليه فيه الخلق كلهم حتى الخليل إبراهيم صلى الله عليه وعلى سائر اخوانه من النبيين والمرسلين، وسلم وشرف وكرم أزكى صلاة وتسليم واعلى تشريف وتكريم . ورضي الله عن جميع أصحابه الغر الكرام السادة النجباء الأعلام خلاصة العالم بعد الأنبياء . ما إختلط الظلام بالضياء، وأعلن الداعي بالنداء وما نسخ النهار ظلام الليل البهيم أما بعد :

অর্থাৎ— সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি আদি-অন্ত, ব্যক্ত ও গুপ্ত এবং যিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। তিনি আদি, তাই তাঁর আগে কিছু নেই। তিনি অন্ত, তাই তার পরে কিছু নেই। তিনি ব্যক্ত, তাই তাঁর উপরে কিছু নেই। তিনি গুপ্ত, তাই তাঁর পেছনে কিছু নেই। তিনি আপন কামালিয়াতের যাবতীয় গুণাবলী অনাদি সহ অনন্ত, অক্ষয়, অব্যয়, চিরন্তন সত্তা। আঁধার রাতে নিরেট পাথরের উপর কালো পিঁপড়ের পদচারণা এবং ক্ষুদ্র বালু-কণার সংখ্যা সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবহিত। তিনি উন্নত, মহান ও মহিমান্বিত। তিনি মহা উন্নত। সব কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন নিখুঁত পরিকল্পনা অনুসারে।

আকাশমণ্ডলীকে তিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ছাড়াই এবং সেগুলোকে সুশোভিত করেছেন উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা দ্বারা, তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ্ত সূর্য এবং জ্যোতির্ময় চন্দ্র এবং তার উপরে তৈরি করেছেন সুউচ্চ, প্রশস্ত ও গোলাকার সিংহাসন। তাহলো মহান আরশ। যার আছে বিরাট বিরাট স্তম্ভ যা বহন করেন সম্মানিত ফেরেশতাগণ, যা ঘিরে আছেন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ, তাঁদের প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা গাওয়াই যাঁদের একমাত্র কাজ। অনুরূপভাবে আকাশসমূহ পরিপূর্ণ রয়েছে ফেরেশতাকুলের দ্বারা। প্রতিদিন তাঁদের মধ্য থেকে সত্তর হাজার চতুর্থ আসমানে অবস্থিত বায়তুল মামূরে হাযির হন। দ্বিতীয়বার আর সেখানে তাঁদের আগমন ঘটে না। তাসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর এবং সালাত ও তাসলীমই তাঁদের একমাত্র ব্রত।

সৃষ্ট জীবের জন্য পানির তরঙ্গের উপর সৃজন করেছেন তিনি পৃথিবী, তার উপরে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, আর আকাশ সৃষ্টিরও আগে চার দিনে তাতে ব্যবস্থা করেছেন তার জীবিকার এবং তাতে জোড়ায়-জোড়ায়, সব কিছু সৃষ্টির বিষয়টি স্থির করেছেন। শীত-গ্রীষ্মে সর্বক্ষণ মানুষের যা কিছু প্রয়োজন, বুদ্ধিমানদের জন্য পথ-নির্দেশ স্বরূপ এবং তাদের প্রয়োজনীয় ও মালিকানাধীন জীবজন্তু। মাটি থেকে তিনি মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন এবং নিরাপদ আধারে তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে তার বংশধর সৃষ্টি করে উল্লেখযোগ্য কিছু না থাকার পর তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন, আর শিক্ষা দান করে তাঁকে করেছেন সম্মানিত। আদি পিতা আদম (আ)-কে নিজের পবিত্র হাতে সৃষ্টি করেছেন তিনি, গঠন করেছেন তাঁর অবয়ব। নিজের পক্ষ থেকে তাঁর মধ্যে সঞ্চার করেছেন আত্মা এবং ফেরেশতাদেরকে তাঁর সামনে করিয়েছেন সিজদাবনত। তারপর তাঁর থেকে তাঁর সহধর্মিনী আদি মাতা হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করে দূর করে দিয়েছেন তাঁর নিঃসঙ্গতা এবং তাদেরকে বাস করতে দিয়েছেন তাঁর জান্নাতে এবং পূর্ণ মাত্রায় দান করেছেন অফুরন্ত নিয়ামত।

তারপর তাঁর মহাপ্রজ্ঞাময় পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদেরকে নামিয়ে দেন পৃথিবীর মাটিতে এবং তাদের থেকে বিস্তার ঘটিয়েছেন অসংখ্য নর-নারীর। তাদেরকে বিভক্ত করেছেন রাজা-প্রজা, গরীব-ধনী, স্বাধীন ও অধীন নর-নারীতে এবং তাদেরকে বসবাস করতে দিয়েছেন পৃথিবীর আনাচে-কানাচে। বংশ পরম্পরায় বিচার দিনে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তাদের অধীন করে দিয়েছেন ছোট-বড় নদ-নদী উৎসারিত করে দিয়েছেন প্রয়োজন অনুসারে কূপ ও ঝর্ণারাজি এবং বারি বর্ষণ করে উৎপন্ন করেছেন রকমারী শস্য ও ফলমূল। সর্বোপরি তাদেরকে দান করেছেন তিনি তাদের প্রয়োজন ও যাচঞা অনুসারে সবকিছু। وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَاتُحْصُوْهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ 'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় জালিম, অকৃতজ্ঞ। (১৪ : ৩৪) অতএব পবিত্রতা ঘোষণা করছি সে সত্তার, যিনি মহানুভব, মহান ও পরম সহনশীল।

মানব সৃষ্টি, তাদের জীবিকা প্রদান, তাদের পথ সুগম করে দেয়া এবং তাদেরকে বাকশক্তি দান করার পর তাদের প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ একটি নিয়ামত ও অনুগ্রহ হলো এই যে, তিনি তাদের নিকট প্রেরণ করেছেন তাঁর নবী-রাসূলগণকে এবং নাযিল করেছেন তাঁর হালাল-হারাম, যাবতীয় সমাচার ও বিধি-বিধান এবং সৃষ্টির সূচনা ও পুনরুত্থান সহ কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিতব্য সব কিছুর বিশদ বিবরণ সম্বলিত কিতাবসমূহ।

সুতরাং ভাগ্যবান সে ব্যক্তি, যে সমাচারসমূহকে সত্য বলে মেনে নেয়, সাথে সাথে আদেশসমূহকে বশ্যতা ও নিষেধসমূহকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়ে স্থায়ী নিয়ামতরাজি লাভে ধন্য হলো এবং যাক্কূম, ফুটন্ত পানি ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি বিশিষ্ট জাহান্নামে মিথ্যাবাদীদের অবস্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকল।

আমি মহান আল্লাহর বিপুল উত্তম ও বরকতময় প্রশংসা বর্ণনা করছি—যা ভরে দেবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীসমূহের প্রান্তরমালা কিয়ামত পর্যন্ত, অনন্তকাল ধরে। তার মাহাত্ম্য,

ক্ষমতা ও মহান সত্তার জন্য যেমন শোভনীয়। আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, যাঁর নেই কোন অংশীদার। নেই কোন সন্তান, জনক, অর্থ বা সঙ্গিনী। নেই তাঁর কোন সমকক্ষ এবং নেই কোন মন্ত্রণাদাতা বা উপদেষ্টা।

আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর হাবীব ও খলীল। আরবের বিশিষ্ট লোকদের যিনি সেরা, নির্বাচিত সর্বশেষ নবী, তৃষ্ণা নিবারণকারী সর্ববৃহৎ হাউজের যিনি অধিপতি, কিয়ামতের দিন শ্রেষ্ঠ শাফাআতের যিনি একচ্ছত্র মালিক ও পতাকা বহনকারী, যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা অধিষ্ঠিত করবেন এমন এক প্রশংসিত স্থানে, যার আকাঙ্ক্ষা করবে সৃষ্টিকুল, এমনকি আল্লাহ্‌র খলীল ইবরাহীমসহ সকল নবী-রাসূল পর্যন্ত। তাঁর প্রতি ও অন্য সকল নবী-রাসূলের প্রতি সালাত ও সালাম।

আর আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হোন তাঁর সাহাবাগণের প্রতি যাঁরা মহা সম্মানিত, নেতৃস্থানীয় ও নবীদের পরে জগতের সেরা ব্যক্তিত্ব। যতক্ষণ আলো আর আঁধারের অস্তিত্ব থাকবে, আহবানকারীর আহবান ধ্বনি উচ্চারিত হবে এবং দিন-রাতের আবর্তন অব্যাহত থাকবে।

হাম্‌দ ও সালাতের পর—এ কিতাবে আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্য ও তাঁর প্রদত্ত তাওফীক বলে সৃষ্টি জগতের সূচনা তথা আরশ-কুরসী, আসমান-যমীন ও এসবের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সেই ফেরেশতা, জিন ও শয়তান যা কিছু আছে তাঁর সৃষ্টি, আদম (আ)-এর সৃষ্টির ধরন, বনী ইসরাঈল ও জাহেলী যুগ পর্যন্ত নবীগণের কাহিনী এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর সীরাত যথাযথভাবে আলোচনা করব।

তারপর আলোচনা করব আমাদের যুগ পর্যন্ত সংঘটিত কাহিনী, যুগে যুগে সংঘটিতব্য বিপর্যয়, ও সংঘাতসমূহ, কিয়ামতের আলামতসমূহ এবং পুনরুত্থান ও কিয়ামতের বিভীষিকাসমূহ। তারপর কিয়ামতের বিবরণ এবং সে দিনকার ভয়াবহ ঘটনাবলী। তারপর জাহান্নামের বিবরণ। তারপর জান্নাতসমূহ ও জান্নাতের সুশীলা সুন্দরী রমণীগণের বিবরণ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

আমাদের এসব আলোচনার উৎস হবে কুরআন, সুন্নাহ ও নবুওতে মুহাম্মদীর দীপাধার থেকে সংগৃহীত উলামা ও ওরাছাতুল আম্বিয়ার বর্ণিত আছার ও আখবার তথা ইতিহাস ও বিবরণ। ইসরাঈলী বিবরণসমূহ থেকে আমরা কোন তথ্য উল্লেখ করব না। তবে শরীয়ত প্রবর্তক মহানবী (সা), আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী নয় এমন যা কিছু উদ্ধৃত করতে অনুমতি দিয়েছেন তার কথা স্বতন্ত্র। আর তাহলো সে সব ইসরাঈলী বিবরণ, শরীয়ত যার সত্যাসত্য সম্পর্কে নিরব। যাতে রয়েছে সংক্ষিপ্ত তথ্যের বিশদ ব্যাখ্যা কিংবা শরীয়তে বর্ণিত অস্পষ্ট তথ্যকে নির্দিষ্টকরণ, যাতে আমাদের বিশেষ কোন ফায়দা নেই। কেবল শোভাবর্ধনের উদ্দেশ্যে আমরা তা উল্লেখ করব—প্রয়োজনের তাগিদে, যা তার উপর নির্ভর করার উদ্দেশ্যে নয়। নির্ভর তো করব শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর রাসূল (সা)-এর সহীহ্ কিংবা হাসান সনদে বর্ণিত সুন্নাহ্‌র উপর। আর কোন বর্ণনার দুর্বলতা থাকলে তাও আমরা উল্লেখ করব। আল্লাহ্‌রই নিকট আমাদের সাহায্য প্রার্থনা এবং তাঁরই উপর আমাদের ভরসা। ক্ষমতা তো একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র হাতে।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র গ্রন্থে বলেন ঃ

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ. وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا.

অর্থাৎ—পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ এভাবে আমি তোমার নিকট বিবৃত করি এবং আমি আমার নিকট থেকে তোমাকে দান করেছি উপদেশ। (২০ ঃ ৯৯)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (সা)-এর নিকট সৃষ্টির সূচনা, পূর্ববর্তী জাতিসমূহের প্রসঙ্গ, অনুগতদের প্রতি তাঁর আনুকূল্য এবং অবাধ্যদের প্রতি শাস্তি ইত্যাদির বিবরণ দিয়েছেন। আবার রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর উম্মতের উদ্দেশে তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বর্ণিত আয়াতসমূহের পাশাপাশি আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে এমন বর্ণনাসমূহ উপস্থাপন করব। উল্লেখ্য যে, মহানবী (সা) আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী জানিয়ে দিয়েছেন আর যাতে আমাদের কোন উপকার নেই তা বর্জন করেছেন। তবে ইহুদী-খৃস্টান পণ্ডিতদের বেশ কিছু লোক তা জানা ও বুঝার জন্যে গলদঘর্ম হয়েছেন, যাতে আমাদের অধিকাংশ লোকেরই কোন ফায়দা নেই। আমাদের একদল আলিমও সেগুলো আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করেছেন। আমরা তাদের পথ অনুসরণ করবো না। তবে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে তা কিঞ্চিত উল্লেখ করব এবং আমাদের নিকট যা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে, তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়াদি এবং যা তার বিপরীত বলে সমালোচিত হয়েছে তা আমরা বর্ণনা করবো। তবে ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ বুখারীতে আমর ইব্‌ন আস (রা) সূত্রে এ মর্মে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولاحرج وحدثوا عنى ولا تكذبوا على ومن كذب على متعمدا فليبوأ مقعده من النار.

অর্থাৎ- "আমার পক্ষ থেকে একটি বাক্য হলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দাও, বনী ইসরাঈল সূত্র থেকেও বর্ণনা করতে পার তাতে কোন অসুবিধা নেই এবং আমার পক্ষ থেকে বর্ণনা কর, তবে আমার নামে মিথ্যা রটনা করো না। ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি আমার নামে মিথ্যা রটনা করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" তা আমাদের মতে ঐ সব ইসরাঈলী রেওয়ায়েত সম্পর্কে প্রযোজ্য, যার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন বক্তব্য নেই। সুতরাং সেগুলোকে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার মত কিছু আমাদের কাছে নেই। তাই শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে এসব রেওয়ায়ত বর্ণনা করা জায়েয আছে। এ জাতীয় বর্ণনাই আমরা আমাদের এ কিতাবে ব্যবহার করব।

পক্ষান্তরে আমাদের শরীয়ত যার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে; আমাদের তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই–আমাদের কাছে যা আছে তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর আমাদের শরীয়ত যাকে বাতিল বলে সাক্ষ্য দিয়েছে তা প্রত্যাখ্যাত এবং প্রত্যাখ্যান বাতিল ঘোষণা করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা না জায়েয। যা হোক, মহান আল্লাহ যখন আমাদের ও রাসূল (সা) দ্বারা অন্য সব শরীয়ত থেকে এবং তাঁর কিতাব দ্বারা অন্য সব কিতাব থেকে আমাদেরকে অমুখাপেক্ষী

করেছেন; তখন আমরা বনী ইসরাঈলদের সে সব বর্ণনা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না, যেগুলোতে রয়েছে প্রক্ষেপ ও মিশ্রণ, মিথ্যা ও বানোয়াট, বিকৃতি ও পরিবর্তন এবং সর্বোপরি সেগুলো রহিত হয়ে গেছে। মোটকথা, যা প্রয়োজনীয়, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের জন্য তা স্পষ্ট ও বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। কেউ তা অনুধাবন করতে পেরেছে, কেউ বা পারেনি। যেমন আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ

كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعد كم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالعزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله.

অর্থাৎ-আল্লাহর কিতাবে তোমাদের পূর্বকালীন সমাচার, পরবর্তী কালের ঘটনাবলী এবং তোমাদের বর্তমানের বিধি-বিধান রয়েছে। এটাই চূড়ান্ত ফয়সালা এটা কোন হেলা-ফেলার ব্যাপার নয়। যে মদমত্ত ব্যক্তি তা বর্জন করবে, আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করবেন আর যে কেউ তা ছেড়ে অন্য কোথাও হিদায়ত অনুসন্ধান করবে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করবেন।

আবূ যর (রা) বলেন ঃ

لقد توفى رسول الله وما طائريطير بجناحيه إلا اذكرنا منه علما.

অর্থাৎ—রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ওফাতের পূর্বেই দু'ডানায় ভর করে উড়ে যাওয়া পাখি থেকেও আমাদেরকে শিক্ষা দান করেছেন।

ইমান বুখারী (র) সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়ে বলেন ঃ তারিক ইব্ন মূসা (র) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, "রাসূলুল্লাহ (সা) একস্থানে আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির সূচনা থেকে জান্নাতীদের তাদের মনযিলে এবং জাহান্নামীদের তাদের মন্যিলে প্রবেশ করা পর্যন্ত অবস্থার সংবাদ প্রদান করেন। কেউ তা মুখস্থ রাখতে পেরেছে, কেউ বা তা ভুলে গিয়েছে।

ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) তাঁর মুসনাদে আবূ যায়দ আনসারী (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামায আদায় করে মিম্বরে আরোহণ করেন এবং জোহর পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশে খুতবা দান করেন। তারপর মিম্বর থেকে নেমে জোহরের নামায আদায় করে আবার মিম্বরে আরোহণ করেন এবং আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত আমাদেরকে খুতবা দান করেন। তারপর মিম্বর থেকে নেমে আসর নামায আদায় করেন। তারপর আবার মিম্বরে আরোহণ করে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত খুতবা দান করেন। তাতে তিনি অতীতে যা ঘটেছিল এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার বিশদ বিবরণ দেন। আমাদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী তা বেশি স্মরণ রাখতে পেরেছেন।' কেবল ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ'-এর 'কিতাবুল ফিতানে' এ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহান গ্রন্থে বলেন ঃ

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ.

অর্থাৎ- "আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্ম বিধায়ক। (৩৯ ঃ ৬২)

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যা কিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্ট, পোষ্য, নিয়ন্ত্রণাধীন, নাস্তি থেকে অস্তিত্ব প্রাপ্ত। অতএব, গোটা সৃষ্টি জগতের ছাদস্বরূপ আরশ থেকে আরম্ভ করে পাতাল পর্যন্ত এবং এ দু'টির মধ্যকার জড় ও জীব নির্বিশেষে সবই তাঁর সৃষ্ট, তাঁর কর্তৃত্বাধীন তাঁর আজ্ঞাবহ এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণ, কুদরত ও ইচ্ছার অধীন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ. ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ. يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِى الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

অর্থাৎ— "তিনিই ছ'দিনে (ছয়টি সময়কালে) আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তারপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা থেকে বের হয় এবং আকাশ থেকে যা কিছু নামে ও আকাশে যা উত্থিত হয় সে সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন; তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। (৫৭ ঃ ৪)

শাস্ত্রবিদগণ এ ব্যাপারে এমন অভিন্ন অভিমত পোষণ করেন, যাতে কোন মুসলিমের তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সব কিছু ছ'দিনে সৃষ্টি করেছেন, যেমন কুরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে। তবে এদিন কি আমাদের পৃথিবীর দিনের ন্যায়, নাকি তার প্রতিটি দিন হাজার বছরের সমান? এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে। আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়টি আলোচনা করেছি এবং এ কিতাবেও যথাস্থানে তার আলোচনা করব। আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে কোন সৃষ্টির অস্তিত্ব ছিল কি না—এ ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। কালাম শাস্ত্রবিদগণের একদলের মতে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর পূর্বে কিছুই ছিল না। নিতান্ত নাস্তি থেকেই এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যরা বলেন বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে অন্য মাখলূকের অস্তিত্ব ছিল। তাঁর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ. وَّكَانَ عَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ.

অর্থাৎ— তিনিই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছ'দিনে (ছয়টি সময়কালে) সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। (১১ ঃ ৭)

ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ

كان الله ولم يكن قبله شيئ وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شيئ ثم خلق السموت والأرض.

অর্থাৎ— "আল্লাহ ছিলেন, তাঁর আগে কিছুই ছিল না, তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। আর স্মারকলিপিতে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে পরে তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন।

ইমাম আহমদ (র) আবু রাযীন লাকীত ইব্ন আমির আকীলী (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করার আগে আমাদের প্রতিপালক কোথায় ছিলেন ? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ মেঘমালার দেশে–যার উপরেও শূন্য, নিচেও শূন্য, তারপর পানির উপর তিনি তাঁর আরশ সৃষ্টি করেন।

ইমাম আহমদ (র) য়াযীদ ইব্ন হারুন ও হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র) সূত্রেও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর প্রথমাংশের শব্দ হলো মাখ্লুক সৃষ্টি করার আগে আমাদের প্রতিপালক কোথায় ছিলেন? অবশিষ্টাংশ একই রকম।

ইমাম তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন।

আবার এসবের মধ্যে কোন্টা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে এ ব্যাপারেও আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। একদল বলেন, সব কিছুর আগে কলম সৃষ্টি করা হয়েছে। এটা ইব্ন জারীর ও ইব্ন জাওযী (র) প্রমুখের অভিমত। ইব্ন জারীর বলেন ঃ আর কলমের পর সৃষ্টি করা হয়েছে হালকা মেঘ। তাদের দলিল হলো, সে হাদীস যা ইমাম আহমদ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী (র) উবাদা ইব্ন সামিত (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

إن أول ما خلق الله القلم ثم قال له أكتب فجري في تلك الساعة كائن إلى يوم القيامة .

অর্থাৎ— "আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তাহলো, কলম। তারপর তাকে বললেন, লিখ—তৎক্ষণাৎ সে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, তা লিখে চলল।" হাদীসে এ পাঠটি ইমাম আহমদের। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব বলে মন্তব্য করেছেন।

পক্ষান্তরে হাফিজ আবুল আলা হামদানী (র) প্রমুখ এর বর্ণিত তথ্য মোতাবেক জমহুর আলেমগণের অভিমত হলো সর্বপ্রথম মাখলূক হলো, 'আরশ'। ইব্ন জারীর যাহ্হাক সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) থেকে এটিই বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত ইমাম মুসলিমের হাদীসটিও এর প্রমাণ বহন করে। তাহলো ঃ ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবন আস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি !

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموت والأرض بخمسين الف سنة قال وكان عرشه على الماء .

অর্থাৎ— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই আল্লাহ সৃষ্টি জগতের তাকদীর লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর।

আলিমগণ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কলম দ্বারা মাকাদীর লিপিবদ্ধ করাই হলো, এ তাকদীর।

এ হাদীস প্রমাণ করে যে, এ কাজটি আরশ সৃষ্টির পরে হয়েছে। এতে আল্লাহ যে কলম দ্বারা মাকাদীর লিপিবদ্ধ করেছেন, আরশ তার আগে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয় যা জমহূর-এর অভিমত। আর যে হাদীসে সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো, কলম এ জগতের সৃষ্টিসমূহের প্রথম। ইমরান ইব্ন হুসায়ন (র) থেকে ইমাম বুখরীর (র) বর্ণিত হাদীসটি এ মতের পরিপূরক। ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) বলেনঃ ইয়ামানের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলল, দীন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং এ সৃষ্টি জগতের সূচনা সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে আমরা আপনার কাছে এসেছি। জবাবে তিনি বললেন ঃ

كان الله ولم يكن شئ قبله وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شئ وخلق السموت والأرض.

অর্থাৎ— আল্লাহ ছিলেন, তাঁর আগে কিছুই ছিল না এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। স্মরকলিপিতে তিনি সবকিছু লিপিবদ্ধ করে পরে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন।

এক বর্ণনায় قبله (তার আগে)-এর স্থলে معه (তাঁর সাথে) এসেছে। আর অন্য বর্ণনায় আছে ঃ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ আর অন্য বর্ণনায় وَخَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ এর স্থলে আছে ঃ ثُمَّ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ

মোটকথা, তাঁরা নবী করীম (সা)-কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। আর এ জন্য তারা বলেছিল, আপনাকে এ সৃষ্টি জগতের প্রথমটা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমরা আপনার নিকট এসেছি। ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) ঠিক ততটুকুই জবাব দেন যতটুকু তারা জানতে চেয়েছিল। এ কারণেই তিনি তাদেরকে আরশ সৃষ্টির সংবাদ দেননি, যেমন পূর্ববর্তী আবূ রাযীনের হাদীসে দিয়েছেন। ইব্ন জারীর (র) বলেন, আর অন্যদের মতে আল্লাহ তা'আলা আরশের আগে পানি সৃষ্টি করেছেন।

সুদ্দী আবূ মালিক ও আবূ সালিহ (র) সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে, মুররা সূত্রে ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে এবং আরো কতিপয় সাহাবা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেন ঃ আল্লাহর আরশ পানির উপর ছিল আর পানির আগে তিনি কিছুই সৃষ্টি করেননি।

ইব্ন জারীর মুহাম্মদ ইব্ন ইস্হাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তাহলো-আলো ও অন্ধকার। তারপর দু'য়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে তিনি অন্ধকারকে কালো আঁধার রাতে এবং আলোকে উজ্জ্বল দিবসে পরিণত করেন।

ইব্ন জারীর (র) আরো বলেন যে, কেউ কেউ বলেছেন, আমাদের প্রতিপালক কলমের পর যা সৃষ্টি করেছেন তাহলো কুরসী। তারপর কুরসীর পরে তিনি 'আরশ' সৃষ্টি করেন। তারপর মহাশূন্য ও আঁধার এবং তারপর পানি সৃষ্টি করে তার উপর নিজের আরশ স্থাপন করেন। বাকি আল্লাহ্ তা'আলা ভালো জানেন।

আর্‌শ ও কুরসী সৃষ্টির বিবরণ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ رَفِيْعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ

অর্থাৎ— 'তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী আর্‌শের অধিপতি।' (৪০ ঃ ১৫)

فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

অর্থাৎ— মহিমান্বিত আল্লাহ, যিনি প্রকৃত মালিক তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সম্মানিত আর্‌শের তিনি অধিপতি। (২৩ ঃ ১১৬)

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

অর্থাৎ— তুমি জিজ্ঞেস কর, কে সাত আকাশ এবং মহা আর্‌শের অধিপতি ? (২৩ ঃ ৮৬)

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ.

অর্থাৎ— 'তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, 'আর্‌শের অধিকারী ও সম্মানিত।' (৮৫ ঃ ১৪,১৫)

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰي.

অর্থাৎ— 'দয়াময়, 'আরশে সমাসীন।' (২০ ঃ ৫)

ثُمَّ اسْتَوٰي عَلَى الْعَرْشِ.

অর্থাৎ— তারপর তিনি 'আরশে সমাসীন হন।' (১০ ঃ ২)

এসব সূরাসহ কুরআনের আরো বহুস্থানে এ আয়াতটি রয়েছে।

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا.

অর্থাৎ— "যারা আর্‌শ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চারপাশ ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। (৪০ ঃ ৭)

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.

অর্থাৎ— সে দিন আটজন ফেরেশ্‌তা তাদের প্রতিপালকের আরশকে তাদের উর্ধ্বে ধারণ করবে। (৬৯ ঃ ১৭)

وَتَرَى الْمَلَٰئِكَةَ حَافِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ— 'এবং তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চারপাশে ঘিরে তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে; বলা হবে, প্রশংসা জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য। (৩৯ ঃ ৭৫)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত বিপদকালীন দু'আয় আছে ঃ

لا إله الا الله العظيم الحليم – لا اله الا الله رب العرش الكريم – لا اله الا الله رب السموت ورب الأرض رب العرش الكريم .

অর্থাৎ— আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি মহান পরম সহনশীল। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি আকাশ মণ্ডলীর অধিপতি ও পৃথিবীর অধিপতি। যিনি সম্মানিত আরশের অধিপতি।

ইমান আহমদ (র) আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ননা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে বাত্হা নামক স্থানে উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময়ে একখণ্ড মেঘ অতিক্রম করলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তোমরা কি জান এগুলো কী? আমরা বললাম, মেঘমালা! তিনি বললেন, সাদা মেঘ বলতে পার। আমরা বললাম সাদা মেঘ। তিনি বললেন ঃ 'আনানও (মেঘ) বলতে পার, আমরা বললাম ওয়াল আনান। তারপর বললেন, আমরা নীরব থাকলাম। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান যে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে দূরত্ব কতটুকু? আব্বাস (রা) বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক অবহিত। তিনি বললেন ঃ উভয়ের মাঝে পাঁচশ বছরের দূরত্ব। এক আকাশ থেকে আরেক আকাশ পর্যন্ত পাঁচশ বছরের দূরত্ব, প্রত্যেকটি আকাশ পাঁচশ বছরের দূরত্ব সমান পুরু এবং সপ্তম আকাশের উপরে একটি সমুদ্র আছে ঃ যার উপর ও নীচের মধ্যে ঠিক ততটুকু দূরত্ব; যতটুকু দূরত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে। তারপর তার উপরে আছে আটটি পাহাড়ী মেষ, যাদের হাঁটু ও ক্ষুরের মাঝে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্বের সমান দূরত্ব। সেগুলোর উপরে হলো আরশ। যার নিচ ও উপরের মধ্যে ততটুকু দূরত্ব, যতটুকু আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে। আল্লাহ হলেন তারও উপরে। কিন্তু বনী আদমের কোন আমলই তাঁর কাছে গোপন থাকে না।

পাঠটি ইমাম আহমদ (র)-এর। আর ইমাম আবু দাউদ ইব্ন মাজাহ ও তিরমিযী (র) সিমাক (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমান তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান বলে মন্তব্য করেছেন। আবার শুরায়ক সিমাক থেকে এ হাদীসটির অংশ বিশেষ মওকূফ পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর শব্দ হলো ঃ

وهل ترون بعد ما بين السماء والأرض ؟ قالوا لا ندرى قال ما بينهما اما واحدة او اثنين او ثلاثة وسبعون سنة.

অর্থাৎ— "আকাশ ও পৃথিবীর মাঝের দূরত্ব কতটুকু তা কি তোমরা জান ? তাঁরা বলল, আমরা তো জানি না। তিনি বললেন, উভয়ের মাঝে একাত্তর কিংবা বাহাত্তর কিংবা তিহাত্তর বছরের দূরত্ব।[১] অবশিষ্টগুলোর দূরত্ব অনুরূপ।"

ইমাম আবূ দাঊদ (র) সাহাবী জুবায়র ইবন মুতইম (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ জনৈক বেদুঈন একদা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে এসে বলল ঃ

يارسول الله جهدت الأنفس وجاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام. فا ستسق الله لنا فانا نستشفع بك على الله و نستشفع بالله عليك.

অর্থাৎ—হে আল্লাহর রাসূল! মানুষগুলো সংকটে পড়ে গেছে, পরিবার-পরিজন অনাহারে দিনপাত করছে এবং ধন-সম্পদ ও গবাদি পশুগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। অতএব, আপনি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য বৃষ্টির দু'আ করুন। আমরা আপনার উসিলা দিয়ে আল্লাহর নিকট এবং আল্লাহর উসিলা দিয়ে আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ ويحك أتدرى ما تقول ধিক তোমাকে, তুমি কি বুঝতে পারছো, কী বলছ! এই বলে রাসূলুল্লাহ (সা) অনবরত আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকেন। এমনকি সাহাবীগণের মুখমণ্ডলে তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তারপর তিনি বললেন ঃ

ويحك انه لا يستشفع بالله علي احد من خلقه شان الله اعظم من ذالك ويحك اتدرى ما الله ان عرشه على سموته هكذا.

অর্থাৎ—ধিক তোমাকে! আল্লাহর উসিলা দিয়ে তাঁর সৃষ্টির কারো সাহায্য প্রার্থনা করা চলে না। আল্লাহর শান তার অনেক ঊর্ধ্বে। ধিক তোমাকে! তোমার কি জানা আছে যে, আল্লাহর আরশ তার আকাশসমূহের উপরে এভাবে আছে। এ বলে তিনি তাঁর অঙ্গুলিসমূহের দ্বারা ইশারা করে গম্বুজের মত করে দেখান। তারপর বললেন ঃ

وانه ليئط به أطيط الرحل بالراكب.

অর্থাৎ—বাহন তার আরোহীর ভারে যেমন মচমচ করে উঠে আরশও তেমনি মচমচ করে উঠে। ইবন বাশ্শার (র)-এর বর্ণনায় রয়েছে ঃ

ان الله فوق عرشه والعرش فوق سموته.

অর্থাৎ—আল্লাহ আছেন তাঁর আরশের উপর আর আরশ আছে তাঁর আকাশসমূহের উপর।

হাফিজ আবুল কাসিম ইব্ন আসাকির দামেশকী (র) এ হাদীসের বিরুদ্ধে "বায়ানুল ওহমি ওয়াত তাখলীতিল ওয়াকিয়ি ফী হাদীসিল আতীত" নামক একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করেছেন

১. সংখ্যা সংক্রান্ত এ সন্দেহটি রাবীর।

এবং হাদীসের রাবী মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন বাশ্‌শার-এর সমালোচনায় তিনি তাঁর সর্বশক্তি ব্যয় করেছেন এবং এ ব্যাপারে অনেকের মতামত উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ব্যতীত অন্য রাবী থেকে ভিন্ন সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। যেমন আব্‌দ ইব্‌ন হুমায়দ ও ইব্‌ন জারীর তাঁদের তাফসীরদ্বয়ে, ইব্‌ন আবূ 'আসিম ও তাবারানী তাঁদের কিতাবুস সুন্নাহয়, বায্‌যার তাঁর মুসনাদে এবং হাফিজ জিয়া আল মাকদেসী তাঁর 'মুখতারাত' গ্রন্থে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলল, আল্লাহর কাছে আমার জন্য দু'আ করুন, যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। উমর (রা) বলেন, একথা শুনে তিনি আল্লাহ তা'আলার মহিমা বর্ণনা করে বললেন ঃ

إن كرسيه وسع السموت والأرض وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله.

অর্থাৎ—'নিঃসন্দেহে তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত এবং তা নতুন বাহন বোঝার ভারে শব্দ করার ন্যায় শব্দ করে।'

এ হাদীসের সনদ তেমন মশহুর নয়। সহীহ বুখারীতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

اذا سالتم الله الجنة فسئلوه الفردوس فإنه اعلى الجنة واوسطها الجنة وفوقه عرش الرحمن.

অর্থাৎ—যখন তোমরা আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা করবে তখন ফিরদাউস প্রার্থনা করবে। কারণ তা সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম জান্নাত। আর তার উপরে হলো দয়াময়ের আরশ। فوقه শব্দটি ظرف হিসেবে ফাত্‌হা দ্বারাও পড়া হয় এবং যাম্মা দ্বারাও পড়া হয়। আমাদের শায়খ হাফিজ আল মুযী বলেন, যাম্মা দ্বারা পড়াই উত্তম। তখন فوقه عرش الرحمن এর অর্থ হবে أعلاها عرش الرحمن অর্থাৎ—তার উপরটা হলো রাহমানের' আর্‌শ'। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, ফিরদাউসবাসীগণ আরশের শব্দ শুনে থাকে। আর তাহলো তাঁর তাসবীহ ও তাজীম। তাঁরা আরশের নিকটবর্তী বলেই এমনটি হয়ে থাকে।

সহীহ বুখারীতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد ابن معاذ.

অর্থাৎ—'সাদ ইব্‌ন মুআযের মৃত্যুতে রাহমানের আরশ কেঁপে উঠে।'

হাফিজ ইব্‌ন হাফিজ মুহাম্মদ ইব্‌ন উছমান ইব্‌ন আবু শায়বা 'সিকতুল আরশ' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, "আরশ লাল ইয়াকুত দ্বারা তৈরি। তাঁর প্রান্তদ্বয়ের দূরত্ব হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ।'

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ.

সূরা মাআরিজ-এর (৭০ ঃ ৪) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, 'আরশ ও সপ্তম যমীনের মধ্যকার দূরত্ব হলো, পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ এবং তার বিস্তৃতি পঞ্চাশ হাজার বছরের পথের সমান।

একদল কালাম শাস্ত্রবিদের মতে, আরশ হচ্ছে গোলাকার একটি আকাশ বিশেষ যা গোটা জগতকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এ কারণেই তাঁরা একে নবম আকাশ, 'আল ফালাকুল আতলাস ওয়াল আসীর' নামে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু তাদের এ কথাটি যথার্থ নয়। কারণ, শরীয়তে একথা প্রমাণিত যে, 'আরশের কয়েকটি স্তম্ভ আছে এবং ফেরেশতাগণ তা বহন করে থাকেন। কিন্তু আকাশের স্তম্ভও হয় না এবং তা বহনও করা হয় না। তাছাড়া আরশের অবস্থান জান্নাতের উপরে আর জান্নাত হলো আকাশের উপরে এবং তাতে একশটি স্তর আছে, প্রতি দু'স্তরের মাঝে আকাশ ও যমীনের মধ্যকার সমান দূরত্ব। এতে প্রমাণিত হয় যে, আরশ ও কুরসীর মাঝের দূরত্ব আর এক আকাশ থেকে আরেক আকাশের দূরত্ব এক কথা নয়। আরেকটি যুক্তি হলো, অভিধানে আরশ অর্থ রাজ সিংহাসন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ অর্থাৎ তার আছে বিরাট এক সিংহাসন। (২৭ ঃ ২৩)

বলা বাহুল্য যে, এ আয়াতে যে আরশের কথা বলা হয়েছে তা কোন আকাশ ছিল না এবং আরশ বলতে আরবরা তা বুঝেও না। অথচ কুরআন নাযিল করা হয়েছে আরবী ভাষায়। মোটকথা, আরশ কয়েকটি স্তম্ভ বিশিষ্ট একটি সিংহাসন বিশেষ যা ফেরেশতাগণ বহন করে থাকেন। তা বিশ্বজগতের উপরে অবস্থিত গুম্বজের ন্যায় আর তাহলো সৃষ্টি জগতের ছাদস্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا.

অর্থাৎ—যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (৪০ ঃ ৭)

পূর্বে উল্লেখিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, তারা হলেন আটজন এবং তাদের পিঠের উপর রয়েছে আরশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.

অর্থাৎ—এবং সে দিন আটজন ফেরেশতা তাঁদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে তাদের ঊর্ধ্বে। (৬৯ ঃ ১৭)

শাহ্র ইব্ন হাওশাব (র) বলেন, আরশ বহনকারী ফেরেশতা হলেন আটজন। তাঁদের চার জনের তাস্বীহ হলো ঃ

سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك.

আর অপর চার জনের তাসবীহ হলো ঃ

سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك.

ইমাম আহ্মদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ (সা) উমায়্যা ইবন আবুস-সাল্ত–এর কবিতার নিম্নোক্ত দু'টো পংক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। উমায়্যা যথার্থ বলেছে। পংক্তি দ্'টি হলো ঃ

رجل وثور تحت رجل يمينه – والنسر للأخري وليث مرصد.

অর্থাৎ—তাঁর (আরশের) ডান পায়ের নিচে আছে একজন লোক ও একটি ষাঁড়। আর অপর পায়ের নিচে আছে একটি শকুন ও ওঁৎ পেতে থাকা একটি সিংহ।

একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ সে যথার্থই বলেছে। তারপর উমায়্যা বলল ঃ

والشمس تطلع كل آخر ليلة – حمراء مطلع لونها متورد

تأبى فلا تبد ولنا في رسلها – الا معذبة والا تجلد

অর্থাৎ—প্রতি রাতের শেষে লাল হয়ে সূর্য উদিত হয় যার উদয়াচলের রঙ হলো গোলাপী। আমাদের জন্য আত্মপ্রকাশ করতে সূর্য ইতস্তত করে থাকে। অবশেষে আত্মপ্রকাশ করে শাস্তিদানকারী রূপে এবং কশাঘাতকারী রূপে।

শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে যথার্থই বলেছে। এ হাদীসের সনদ সহীহ এবং তার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, আর্শ বহনকারীদের বর্তমান সংখ্যা চারজন। অতএব, পূর্বোক্ত হাদীসের সঙ্গে এটি সাংঘর্ষিক। এর জবাবে বলা যেতে পারে যে, এ ধরনের এ চারজনের উল্লেখের দ্বারা বাকি চারজনের অস্তিত্বের অস্বীকৃতি বুঝায় না। আল্লাহ্ সম্যক অবগত।

'আরশ সম্পর্কে উমায়্যা ইবনুস সাল্ত-এর আরো কয়েকটি পংক্তি আছে। তাহলো ঃ

مجد والله فهوللمجد أهل – ربنا فى السماء امسى كبيرا

بالبناءالعالى الذى بهرالنا – س وسوي فوق السماء سريرا

شرجعا لاينالہ بصر العير – ن نرى حولہ الملائك صورا

অর্থাৎ—তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর। তিনি মহিমময়, আমাদের প্রতিপালক আকাশে, তিনি মহীয়ান গরীয়ান। সে এমন এক সুউচ্চ ছাদ যা মানুষকে বিস্ময় বিমূঢ় করে দেয়। আর আকাশের উপরে তিনি স্থাপন করে রেখেছেন এমন সুউচ্চ এক সিংহাসন, চর্ম চক্ষু যার নাগাল পায় না আর তার আশে-পাশে তুমি দেখতে পাবে ঘাড় উঁচিয়ে রাখা ফেরেশতাগণ। صور – أصور এর বহুবচন। এর অর্থ হলো, সে ব্যক্তি উপরের দিকে তাকিয়ে

থাকার দরুন যার ঘাড় বাঁকা হয়ে আছে। الشرجع। অর্থ অত্যন্ত উঁচু। السرير। অর্থ হলো সিংহাসন।

আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-এর কয়েকটি পংক্তি; যিনি স্ত্রী কর্তৃক দাসীর সঙ্গে যৌন মিলনের অপবাদের মুখে কুরআন পাঠের পরিবর্তে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন

شهدت بأن وعد الله حق – وان النار مثوي الكافرينا

وأن العرش فوق الماء طاف – وفوق العرش رب العالمينا

وتحمله ملئكة كرام – ملائكة الإله مسومينا

অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিলাম যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং জাহান্নাম হলো কাফিরদের ঠিকানা।

আর আরশ পানির উপর ভাসমান এবং আরশের উপর রয়েছেন বিশ্বজগতের প্রতিপালক। যে আরশ বহন করেন সম্মানিত এবং আল্লাহর চিহ্নিত ফেরেশতাগণ।

ইব্ন আবদুল বার (র) প্রমুখ ইমাম তা বর্ণনা করেছেন। আবূ দাঊদ (র) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

أذن لى أن أحدث عن ملك من ملئكة الله عز وجل من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه ألى عاتقه مسيرة سبعماة عام.

অর্থাৎ—"আমাকে আল্লাহর আরশ বহনকারী আল্লাহর ফেরেশতাদের একজনের বিবরণ দেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তাঁর কানের লতি ও কাঁধের মাঝে সাতশ বছরের পথ।"

ইব্ন আবূ আসিমও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর পাঠ হলো ঃ

محقق الطير مسيرة سبعمأة عام.

কুরসী

ইব্ন জারীর (র) বলেন ঃ হাসান বসরী (র) বলতেন, কুরসী আর 'আরশ একই কিন্তু এ তথ্যটি সঠিক নয়, হাসান এমন কথা বলেননি। বরং সঠিক কথা হলো, হাসান (র) সহ সাহাবা ও তাবেয়ীগণের অভিমত হলো এই যে, কুরসী আর 'আরশ দুটি আলাদা।

পক্ষান্তরে ইব্ন আব্বাস (রা) ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) সম্পর্কে বর্ণিত যে, তাঁরা وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন كُرْسِيُّهُ অর্থ عِلْمُهُ অর্থাৎ আল্লাহর ইলম কিন্তু ইবন আব্বাস (রা)-এর প্রকৃত অভিমত হলো এই যে, কুরসী হচ্ছে আল্লাহর কুদরতী কদমদ্বয়ের স্থল এবং আরশের সঠিক পরিমাপ আল্লাহ ব্যতীত কারো জ্ঞাত নেই।

এ বর্ণনাটি হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে বর্ণনা করে মন্তব্য করেছেন যে, এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ, যদিও তাঁরা তা বর্ণনা করেন নি।

আবার শুমা ইবন মুখাল্লাদ ও ইবন জারীর তাঁদের নিজ নিজ তাফসীর গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়ত করেন যে, কুরসী হলো আরশের নিচে। সুদ্দীর নিজস্ব অভিমত হলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কুরসীর পেটের মধ্যে আর কুরসীর অবস্থান আরশের সম্মুখে।

ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবূ হাতিম যাহ্হাক সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, সাত আসমান ও সাত যমীনকে যদি পাশাপাশি বিছিয়ে একটির সঙ্গে অপরটি জুড়ে দেয়া হয়; তাহলে কুরসীর তুলনায় তা বিশাল প্রান্তরের মধ্যে একটি আংটি তুল্য। ইব্ন জারীর বর্ণনা করেন যে, যায়দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

ما السموت السبع فى الكرسي إلا كدراهم سبعة القيت فى ترس.

অর্থাৎ—কুরসীর মধ্যে সাত আকাশ ঠিক একটি থালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি মুদ্রা তুল্য।

যায়দ বলেন, আবূ যর (রা) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে,

ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من جديد ألقيت بين ظهرى فلاة من الأرض.

অর্থাৎ—'আরশের মধ্যে কুরসী ধূ ধূ প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত লোহার আংটির চাইতে বেশি কিছু নয়।' হাকিম আবু বকর ইবন মারদূয়েহ্ (র) তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, আবূ যর গিফারী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কুরসী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ

والذى نفسى بيده ما السموت السبع والأرضون السبع عند الكرسي الا كحلقة ملفاة بأرض فلاة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل كفلاة على تلك الحلقة -

অর্থাৎ— "যার হাতে আমার জীবন সে সত্তার শপথ! কুরসীর নিকট সাত আকাশ ও সাত যমীন বিশাল প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত কড়া অপেক্ষা বেশি কিছু নয়। আর কুরসীর তুলনায় আরশ প্রান্তরের তুলনায় কড়ার মত।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে যথাক্রমে মিনহাল ইবন 'আমর' আমাশ সুফয়ান, ওকী ও ইব্ন ওকী সূত্রে ইব্ন জারীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা) কে وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ-এ আয়াত প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, পানি কিসের উপর ছিল ? জবাবে তিনি বললেন, বাতাসের পিঠের উপর। তিনি আরো বলেন, আসমান ও যমীনসমূহ এবং এ সবের মধ্যকার সমুদয় বস্তুকে সমুদ্র ঘিরে রেখেছে এবং সমুদ্ররাজিকে ঘিরে রেখেছে হায়কাল। আর কথিত বর্ণনা মতে, হায়কালকে ঘিরে রেখেছে কুরসী। ওহ্ব ইবন মুনাব্বিহ থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। ইব্ন ওহ্ব হায়কাল-এর ব্যাখ্যায়

বলেন, হায়কাল আকাশমণ্ডলীর চতুষ্পার্শ্বস্থ একটি বস্তু বিশেষ যা আসমানের প্রান্ত থেকে তাঁবুর লম্বা রশির ন্যায় যমীনসমূহ ও সমুদ্রসমূহকে ঘিরে রেখেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কারো কারো ধারণা, কুরসী হলো অষ্টম আকাশ, যাকে স্থির গ্রহরাজির কক্ষ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের এ ধারণা যথার্থ নয়। কারণ পূর্বেই এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরসী সাত আকাশ অপেক্ষা অনেক অনেকগুণ বড়। তাছাড়া একটু আগে উল্লেখিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, কুরসীর তুলনায় আকাশ বিশাল প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত একটি কড়ার ন্যায়। কিন্তু এক আকাশের তুলনায় আরেক আকাশ তো এরূপ নয়।

যদি এরপরও তাদের কেউ একথা বলে যে, আমরা তা স্বীকার করি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে ফালাক বা আসমান নামে অভিহিত করি। তাহলে আমরা বলব, অভিধানে কুরসী আর ফালাক-এর অর্থ এক নয়। বস্তুত প্রাচীন যুগের একাধিক আলিমের মতে, কুরসী আরশের সম্মুখে অবস্থিত তাতে আরোহণের সিঁড়ির মত একটি বস্তু বিশেষ। আর এরূপ বস্তু ফালাক হতে পারে না। তাদের আরো ধারণা যে, স্থির নক্ষত্রসমূহকে তাতেই স্থাপন করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই। উপরন্তু, এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

লাওহে মাহ্ফূজ

ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে আবুল কাসিম তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী করীম (সা) বলেন ঃ

إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور لله فيه فى كل يوم ستون وثلثمأة لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيى ويعز ويذل ويفعل ما يشاء.

অর্থাৎ—"আল্লাহ শুভ্র মুক্তা দ্বারা লাওহে মাহফূজ সৃষ্টি করেছেন। তার পাতাগুলো লাল ইয়াকুতের তৈরি। আল্লাহ তা'আলার কলমও নূর এবং কিতাবও নূর। প্রতি দিন তাঁর তিনশ ষাটটি ক্ষণ আছে। তিনি সৃষ্টি করেন, জীবিকা দান করেন। মৃত্যু দেন, জীবন দেন, সম্মানিত করেন, অপমানিত করেন এবং যা খুশী তা-ই করেন।

ইবন আব্বাস (রা) আরও বলেন, লাওহে মাহফূযের ঠিক মাঝখানে লিখিত আছে ঃ

لا اله الا الله وحده دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله.

অর্থাৎ—"এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। তাঁর মনোনীত দীন হলো ইসলাম এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"

অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহতে ঈমান আনবে, তাঁর প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলে স্বীকার করবে এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করবে; তাঁকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

ইবন আব্বাস (রা) আরো বলেন, লাওহে মাহফূজ শুভ্র মুক্তা দ্বারা তৈরি একটি ফলক বিশেষ। তার দৈর্ঘ্য আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আর তার প্রস্থ পৃথিবীর পূর্ব ও

পশ্চিমের মাঝখানের দূরত্বের সমান। তার পরিবেষ্টনকারী হলো মুক্তা ও ইয়াকুত এবং প্রান্তদেশ হলো লাল ইয়াকুতের। তার কলম হলো নূর এবং তার বাণী আরশের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ ও তার গোড়া হলো এক ফেরেশতার কোলে।

আনাস ইব্‌ন মালিক প্রমুখ বলেন, লাওহে মাহফূজ ইসরাফীল (আ)-এর ললাটে অবস্থিত। মুকাতিল বলেন, তার অবস্থান আরশের ডান পার্শ্বে।

আকাশসমূহ পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যকার বস্তু নিচয়ের সৃষ্টি

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ . ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ .

প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন আর উৎপত্তি ঘটিয়েছেন অন্ধকার ও আলোর। এতদসত্ত্বেও কাফিরগণ তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়। (৬ ঃ ১)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ .

অর্থাৎ—তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী ছ'দিনে (ছয়টি সময়কালে) সৃষ্টি করেছেন। (১১ ঃ ৭)

এ ধরনের বর্ণনা অন্যান্য বহু আয়াতে রয়েছে। এ ছ'দিনের পরিমাণ নির্ণয়ে মুফাসসিরগণের দু'টি অভিমত রয়েছে। জমহুর-এর অভিমত হলো তা আমাদের এ দিবসেরই ন্যায়। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা)), মুজাহিদ, যাহহাক ও কা'ব আহবার (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, তার প্রতিটি দিন আমাদের হিসাবের হাজার বছরের সমান। এটা হচ্ছে ইব্‌ন জারীর ও ইব্‌ন আবূ হাতিম-এর বর্ণনা। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) তাঁর জাহমিয়্যাদের বিরুদ্ধে লিখিত কিতাবে এবং ইব্‌ন জারীর ও পরবর্তী একদল আলিম দ্বিতীয় মতটি সমর্থন করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। এ অভিমতের পক্ষের দলীল পরে আসছে।

ইব্‌ন জারীর যাহ্হাক ইব্‌ন মুযাহিম (র) প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেন যে, দিবস ছ'টির নাম হলো—আবজাদ; হাও, য়ায, 'হুত্তী কালমান, সা'ফাস, কারশাত।

ইব্‌ন জারীর (র) এদিনগুলোর প্রথম দিন সম্পর্কে তিনটি অভিমত বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তাওরাত পন্থীদের অভিমত হলো, আল্লাহ তা'আলা রবিবার দিন সৃষ্টি শুরু করেছিলেন। ইনজীল পন্থীগণ বলেন, আল্লাহ সৃষ্টি শুরু করেছিলেন সোমবার দিন আর আমরা মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বলি যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি শুরু করেছিলেন শনিবার দিন। ইব্‌ন ইসহাক (র) কর্তৃক বর্ণিত এ অভিমতের প্রতি শাফেঈ মাযহাবের একদল ফকীহ ও অন্যান্য আলিমের সমর্থন রয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহ শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেছেন মর্মে আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসটি পরে আসছে।

আর ইব্‌ন জারীর রবিবার সংক্রান্ত অভিমতটি বর্ণনা করেছেন আবূ মালিক, ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) এবং আরো একদল সাহাবা থেকে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম থেকেও তিনি তা বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন জারীর নিজেও এ অভিমতটি পোষণ করেন। আর তা তাওরাতেরই ভাষ্য। একদল ফকীহ্ও এ অভিমত পোষণ করেন। বলা বাহুল্য যে, রবিবার দিনকে ইয়াওমুল আহাদ বা প্রথম দিন নামকরণ অধিক যুক্তিসঙ্গত। আর এ জন্যই সৃষ্টি কার্য ছ'দিনে সম্পন্ন হয়েছে এবং তার শেষ দিন হলো শুক্রবার। ফলে মুসলমানগণ একে তাদের সাপ্তাহিক উৎসবের দিন রূপে ধার্য করে নিয়েছে। আর এদিনটিই সেদিন, আল্লাহ্ যা থেকে আমাদের পূর্বের আহলি কিতাবদেরকে বিচ্যুত করে দিয়েছিলেন। পরে এর আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰي. اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ.

অর্থাৎ—তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন, তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (২ ঃ ২৯)

قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهٗ اَنْدَادًا. ذَالِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا اَقْوَاتَهَا فِىْ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ. سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ. ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْكَرْهًا. قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَأَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا. ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.

অর্থাৎ—বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক। তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে তাতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য।

তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।

তারপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দুদিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রতি আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করলেন, এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (৪১ ঃ ৯-১২)

এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পৃথিবী আকাশের আগে সৃষ্ট হয়েছে। কেননা, পৃথিবী হলো, প্রাসাদের ভিত স্বরূপ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ. ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ—আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং আকাশকে করেছেন ছাদ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিযক, এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক। কত মহান জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ! (৪০ ঃ ৬৪)

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا. وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا. وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا.

অর্থাৎ—আমি কি করিনি ভূমিকে শয্যা ও পর্বতসমূহকে কীলক? আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়, তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম, রাত্রিকে করেছি আবরণ এবং দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়। আর তোমাদের ঊর্ধদেশে নির্মাণ করেছি সুস্থিত সাত আসমান এবং সৃষ্টি করেছি প্রদীপ। (৭৮ ঃ ৬-১৩)

واَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ.

অর্থাৎ—যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশেছিল ওতপ্রোতভাবে; তারপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রাণসম্পন্ন সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে; তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না ? (২১ ঃ ৩০)

অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে আমি ফাঁক করে দিয়েছি; ফলে প্রবাহিত হয়েছে বায়ুমালা, বর্ষিত হয়েছে বারিধারা, প্রবাহিত হয়েছে ঝরনা ও নদ-নদী এবং জীবনীশক্তি লাভ করেছে প্রাণীকুল। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا وَّهُمْ عَنْ اٰيٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ.

অর্থাৎ—এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ; কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (২১ ঃ ৩২)

অর্থাৎ আকাশে আল্লাহর সৃষ্টি করা স্থির ও চলমান তারকা রাজি, প্রদীপ্ত নক্ষত্র ও উজ্জ্বল গ্রহমালা, ইত্যাকার নিদর্শনাবলী এবং তাতে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর সৃষ্টিকর্তার হিকমতের প্রমাণসমূহ থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ.

অর্থাৎ—আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে; তারা এ সকল প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ সকলের প্রতি উদাসীন। তাদের অধিকাংশ আল্লাহে বিশ্বাস করে না; কিন্তু তাঁর শরীক করে। (১২ ঃ ১০৫-১০৬)

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنٰهَا. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحٰهَا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.

অর্থাৎ—তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি ? তিনিই তা নির্মাণ করেছেন। তিনি একে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন, তিনি রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। তিনি তা থেকে নির্গত করেছেন তার পানি ও তৃণ এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন; এ সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর ভোগের জন্য। (৭৯ ঃ ২৭-৩৩)

এ আয়াত দ্বারা কেউ কেউ পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে আকাশ সৃষ্টির প্রমাণ পেশ করেছেন। কিন্তু এতে তাঁরা পূর্ববর্তী আয়াতদ্বয়ের সুস্পষ্ট বক্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন এবং এ আয়াতের মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন নি। কারণ এ আয়াতের মর্ম হলো, পৃথিবীর বিস্তার এবং বাস্তবে তা থেকে পানি ও তৃণ নির্গত করা আকাশ সৃষ্টির পরে হয়েছে। অন্যথায় এসব পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা ছিল। যেমন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا أَقْوَاتَهَا.

এবং তাতে (পৃথিবীতে) রেখেছেন কল্যাণ এবং তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। (৪১ঃ ১০)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফসলের ক্ষেত্র এবং ঝরনা ও নদী-নালার স্থানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারপর যখন নিম্নজগত ও ঊর্ধ্ব জগতের আকার সৃষ্টি করেন, তখন পৃথিবীকে বিস্তৃত করে তা থেকে তার মধ্যে রক্ষিত বস্তুসমূহ বের করেন। ফলে ঝরনাসমূহ বের হয়ে আসে, নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং শস্য ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়। এ জন্যই তো دَحٰى -কে পানি ও তৃণ বের করা এবং পর্বতকে প্রোথিত করা দ্বারা ব্যাখ্যা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا وَالْجِبَالَ أَرْسٰهَا.

অর্থাৎ—তারপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন (অর্থাৎ) তা থেকে পানি ও তৃণ নির্গত করেন। তিনি পর্বতসমূহকে যথাস্থানে স্থাপন করে সেগুলোকে দৃঢ় ও মজবুত করে দিয়েছেন। (৭৯ ঃ ৩০-৩২)

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

অর্থাৎ—আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতা বলে এবং আমি অবশ্যই মহা-সম্প্রসারণকারী এবং আমি ভূমিকে বিছিয়ে দিয়েছি, আমি এটা কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি। আমি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছি জোড়ায়-জোড়ায়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (৫১ : ৪৭-৪৯)

بِأَيْدٍ অর্থ بِقُوَّةٍ অর্থাৎ ক্ষমতা বলে। আর আকাশ সম্প্রসারণ করার তাৎপর্য হলো, যা উঁচু তাই প্রশস্ত। সুতরাং প্রতিটি আকাশ তার নিচেরটির চেয়ে উচ্চতর বিধায় নিচেরটি অপেক্ষা তা প্রশস্ততর। আর এ জন্যই তো কুরসী আকাশসমূহ থেকে উঁচু বিধায় তা সব ক'টি আকাশ অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত। আর আরশ এর সব ক'টি থেকে অনেক বড়।

এরপর وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا অর্থ আমি পৃথিবীকে বিছিয়ে বিস্তৃত করে স্থির অটল করে দিয়েছি; ফলে তা আর তোমাদেরকে নিয়ে নড়ে না। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ অর্থাৎ আমি এটা কত সুন্দরভাবে বিছিয়েছি। উল্লেখ্য যে, এ আয়াতগুলোতে প্রতিটি বাক্যের মাঝে যে واو (যার অর্থ, এবং) ব্যবহার করা হয়েছে তা বিষয়গুলো সংঘটনে ধারাবাহিকতা নির্দেশক নয়। নিছক সংবাদ প্রদানই এর উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ই সম্যক অবহিত। ইমান বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেছেন, আমি একদিন নবী করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হই এবং আমার উটনীটি দরজার সংঙ্গে বেঁধে রাখি। এ সময়ে তাঁর নিকট বনু তামীমের কিছু লোক আগমন করলে তিনি বললেন :

اقبلوا البشرى يابنى تميم.

অর্থাৎ—সুসংবাদ নাও হে বনু তামীম। জবাবে তারা বলল, সুসংবাদ তো দিলেন, আমাদেরকে কিছু দান করুন। কথাটি তারা দু'বার বলল। তারপরই ইয়ামানের একদল লোকের আগমন ঘটলে তিনি বললেন : বনু তামীম যখন গ্রহণ করেনি তখন হে ইয়ামানবাসী তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। জবাবে তারা বলল, আমরা গ্রহণ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা বলল, আপনার নিকট আমরা এ সৃষ্টির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে এসেছি। নবী করীম (সা) বললেন :

كان الله ولم يكن شيئ غيره وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شيئ وخلق السموت والأرض .

অর্থাৎ—"আল্লাহ ছিলেন, তিনি ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না। তাঁর 'আরশ ছিল পানির উপর। লিপিতে তিনি সব কিছু লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।" এমন সময় কে একজন ডেকে বলল, হে হুসায়নের পুত্র! তোমার উটনী তো চলে গেল। উঠে গিয়ে দেখতে পেলাম যে, উটনীটি মরিচীকার দিকে চলে যাচ্ছে। আল্লাহর শপথ! পরে আমার আফসোস হলো—হায়, যদি আমি উটনীটির পিছে না পড়তাম!

ইমাম বুখারী (র) মাগাযী (যুদ্ধ-বিগ্রহ) এবং তাওহীদ অধ্যায়েও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে কোন কোন বর্ণনায় وَخَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ এর স্থলে ثُمَّ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ। অর্থাৎ—তারপর তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন। ইমাম নাসাঈর বর্ণনায় পাঠও এটিই।

ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমার হাত চেপে ধরে বললেন ঃ

خلق الله التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاث وخلق النور يوم الأربعاء وبث الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخرخلق خلق فى آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل.

অর্থাৎ—"আল্লাহ তা'আলা মাটি শনিবার দিন, পাহাড়-পর্বত রবিবার দিন, গাছপালা সোমবার দিন ও অপ্রীতিকর বস্তুসমূহ মঙ্গলবার দিন সৃষ্টি করেছেন, বুধবারে নূর (জ্যোতি) সৃষ্টি করেন এবং কীট-পতঙ্গ ও ভূচর জন্তু সমূহকে বৃহস্পতিবার দিন পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি আদমকে সৃষ্টি করেছেন জুমআর দিন আসরের পর। আদমই সর্বশেষ সৃষ্টি, যাকে জুমআর দিনের সর্বশেষ প্রহরে আসর ও রাতের মাঝামাঝি সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে।

ইমাম মুসলিম (র) ও নাসাঈ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈ (র) তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমার হাত চেপে ধরে বললেন ঃ

يا أباهريرة إن الله خلق السموت والأرض وما بينهما فى ستة ايام ثم استوى على العرش يوم السابع وخلق التربة يوم السبت.

অর্থাৎ—"হে আবূ হুরায়রা! আল্লাহ আকাশসমূহ, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত বস্তুরাজি ছ'দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর সপ্তম দিনে তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি শনিবার দিন মাটি সৃষ্টি করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ইব্‌ন জুরায়জের এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। 'আলী ইব্‌ন মাদীনী, বুখারী ও বায়হাকী প্রমুখ এ হাদীসটির সমালোচনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁর আত-তারীখে বলেন ঃ কারো কারো মতে, হাদীসটি কা'ব আল-আহবার (রা)-এর এবং তাই বিশুদ্ধতর। অর্থাৎ এ হাদীসটি কা'ব আল-আহবার থেকে আবূ হুরায়রা (রা)-এর শ্রুত হাদীসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা দু'জন একত্রে বসে হাদীস আলোচনা করতেন। ফলে একজন অপরজনকে নিজের লিপিকা থেকে হাদীস শোনাতেন। আর এ হাদীসটি সেসব হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো আবূ হুরায়রা (রা) কাব (রা)-এর লিপিকা থেকে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু কোন কোন রাবী ভুলক্রমে ধারণা করেছেন أخذ رسول الله بيدى আবূ হুরায়রা সরাসরি রসূলুল্লাহ (সা)

থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং রসূলুল্লাহ (সা) আবূ হুরায়রার হাত চেপে ধরেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

আবার এর পাঠেও ভীষণ দুর্বলতা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো এই যে, তাতে আকাশ মণ্ডলী সৃষ্টির উল্লেখ নেই, আছে শুধু সাতদিনে পৃথিবী ও তাঁর অন্তর্বর্তী বস্তুসমূহের সৃষ্টির উল্লেখ। আর এটা কুরআনের বর্ণনার পরিপন্থী। কেননা পৃথিবীকে চার দিনে সৃষ্টি করে তারপর দু'দিনে দুখান থেকে আকাশসমূহকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুখান হলো, পানি থেকে উত্থিত সে বাষ্প যা পানি তরঙ্গায়িত হওয়ার সময় উপরে উঠেছিল, যে পানি মহান কুদরতের দ্বারা যমীনের থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। যেমন আবূ মালিক, ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন মাসউদ (রা) এবং আরো কয়েকজন সাহাবা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)

هُوَالَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى وَإِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ.

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আল্লাহর আরশ ছিল পানির উপর। পানির আগে তিনি কিছুই সৃষ্টি করেননি। তারপর যখন তিনি মাখলূক সৃষ্টি করতে মনস্থ করেন তখন পানি থেকে ধোঁয়া আকারে বাষ্প বের করেন। ফলে তা পানির উপরে উঠে যায়। এই ওঠাকে আরবীতে سماء বলা হয়ে থাকে। তাই এ উপরে ওঠার কারণেই আকাশকে سماء বলে নামকরণ করা হয়।

তারপর পানি শুকিয়ে একটি যমীনে রূপান্তরিত করেন। তারপর তা পৃথক পৃথক করে দু'দিনে (রবি ও সোমবার দিন) সাত যমীনে পরিণত করেন। পৃথিবীকে আল্লাহ তা'আলা একটি মাছের উপর সৃষ্টি করেন। এ সেই نُوْنٌ যার কথা আল্লাহ তা'আলা نُوْنٌ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ . আয়াতে উল্লেখ করেছেন। (৬৮ ঃ ১) মাছ হলো পানিতে আর পানি হলো সিফাতের উপর আর সিফাত হলো এক ফেরেশতার পিঠের উপর, ফেরেশতা হলেন একখণ্ড পাথরের উপর আর পাথর হলো মহাশূন্যে । এ সেই পাথর যার কথা লুকমান (আ) উল্লেখ করেছেন, যা আকাশেও নয় পৃথিবীতেও নয়। মাছটি নড়ে উঠলে পৃথিবী প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। তাই আল্লাহ তা'আলা তার উপর দৃঢ়ভাবে পর্বতমালা প্রোথিত করে দেন, ফলে তা স্থির হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা মঙ্গলবার দিন পাহাড়-পর্বত ও তাঁর উপকারিতা, বুধবার দিন গাছপালা, পানি, শহর-বন্দর এবং আবাদ ও বিনাশ সৃষ্টি করেছেন এবং পরস্পর ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা আকাশকে পৃথক পৃথক করেছেন। বৃহস্পতি ও শুক্র এ দু'দিনে তিনি সাত আকাশে পরিণত করেন। উল্লেখ্য যে, জুমআর দিনকে জুমআ বলে এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, এ দিনে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির সমাবেশ ঘটানো হয়েছিল এবং প্রত্যেক আকাশে তাঁর বিধানের প্রত্যাদেশ দেওয়া হয়েছিল।

তারপর তিনি প্রত্যেক আকাশে ফেরেশতা, পাহাড়-পবর্ত, সাগরমালা, তুষার পর্বত ও এমন বস্তু সৃষ্টি করেন, যা তিনি ব্যতীত অন্য কেউ জ্ঞাত নয়। তারপর আকাশকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা

সুশোভিত করে তাকে সুষমামণ্ডিত ও শয়তানের কবল থেকে সুরক্ষিত বানিয়েছেন। তারপর ইচ্ছা মত সৃষ্টি পর্ব শেষ করে তিনি আরশের প্রতি মনোসংযোগ করেন।

বলাবাহুল্য যে, এ হাদীসে অনেকগুলো দুর্বলতা রয়েছে এবং এর বেশির ভাগই ইসরাঈলী বিবরণসমূহ থেকে নেয়া। কারণ, কা'ব আল আহবার উমর (রা)-এর আমলে যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁর সামনে আহলে কিতাবদের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন আর উমর (রা) তাঁর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এবং তাঁর অনেক বক্তব্য ইসলামের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় মুগ্ধ হয়ে মনোযোগের সঙ্গে তা শুনে যেতেন। এ কারণে এবং বনী ইসরাঈলদের থেকে বর্ণনা করার অনুমতি থাকার ফলে অনেকে কা'ব আল-আহবার-এর বক্তব্য বিবৃত করা বৈধ মনে করেন। কিন্তু তিনি যা বর্ণনা করতেন তার অধিকাংশই প্রচুর ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে মুআবিয়া (রা) সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি কা'ব আল-আহবার সম্বন্ধে বলতেন ঃ তা সত্ত্বেও তিনি যা উদ্ধৃত করতেন আমরা তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করে নিতাম। যদিও তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল বিবরণ দিতেন না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এখানে আমরা সে সব বিষয় আনয়ন করব যা তাদের থেকে বড় বড় ইমামগণ বর্ণনা করেছেন। তারপর সে সব হাদীসও উল্লেখ করব, যা তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দেবে কিংবা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে আর অবশিষ্ট কিছু এমনও থাকবে যা সত্যায়নও করা হবে না, প্রত্যাখ্যানও না। আমরা আল্লাহরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখি।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لما قضى الله الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتى غلبت غضبى.

অর্থাৎ—"আল্লাহ সৃষ্টিকার্য শেষ করে আরশের উপরে তাঁর নিকটে থাকা কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রাখেন যে, নিঃসন্দেহে আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল।"

ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ ও কুতায়বা (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তারপর ইমাম বুখারী (র) সাত যমীন প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন।

সাত যমীন প্রসঙ্গ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ. يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ. وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا.

অর্থাৎ—আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং পৃথিবীও, তাদের অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ, ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। (৬৫ ঃ ১২)

বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (রা) ও কতিপয় লোকের মধ্যে একটি জমি নিয়ে বিরোধ ছিল। আয়েশা (রা)-এর নিকট গিয়ে তিনি তাঁকে ঘটনাটি অবহিত করেন। জবাবে আয়েশা (রা) বললেন, আবূ সালামা! জমির ব্যাপারে ভয় করে চল, কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين.

অর্থাৎ—কেউ এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে গ্রাস করলে সাত যমীন থেকে তা শৃংখল বানিয়ে তার গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

ইমাম বুখারী 'মাজালিম' অধ্যায়েও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (র) এবং ইমাম আহমদ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ সালিম বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

من اخذ شيئا من الارض بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع ارضين.

অর্থাৎ-"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য একটু জমিও দখল করবে, কিয়ামতের দিন তা সহ তাকে সাত যমীন পর্যন্ত ধসিয়ে দেওয়া হবে।"

ইমাম বুখারী (র) 'মাজালিম' অধ্যায়েও মূসা ইব্ন উক্বা সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র) আবূ বকর ও আবূ বকর (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموت والارض السنة اثنى عشر شهرا.

অর্থাৎ—'সময় আপন গতিতে আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে পর্যায়ক্রমে পরিক্রমণ করে আসছে। বছর হলো বার মাস।' উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের প্রকৃত মর্ম কি তা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে এ হাদীসের অর্থ —

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۔

এ আয়াতের সমর্থক। যার অর্থ হলো ঃ আল্লাহ তা'আলা সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন এবং সংখ্যায় তাদের অনুরূপ যমীনও সৃষ্টি করেছেন। (৬৫ ঃ ১২) অর্থাৎ এখন মাসের সংখ্যা যেমন বার তেমনি সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহর নিকটও মাসের সংখ্যা বারটিই ছিল। এটা হলো কালের মিল আর আলোচ্য আয়াতে স্থানের মিলের কথা বলা হয়েছে।

সাঈদ ইব্ন যায়দ 'আমর ইব্ন নুফায়ল থেকে যথাক্রমে আবূ হিশাম, হিশাম, আবূ উসামা ও উবায়দ ইব্ন ইসমাঈল সূত্রে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আরওয়া নাম্নী মহিলা সাঈদ ইব্ন আমর-এর বিরুদ্ধে মারওয়ানের নিকট জমি আত্মসাতের অভিযোগ করেন। জবাবে সাঈদ বললেন, আমি করবো তাঁর সম্পদ জবরদখল? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ

من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين .

অর্থাৎ—"কেউ অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি আত্মসাৎ করলে কিয়ামতের দিন সাত তবক যমীন তার গলায় জড়িয়ে দেয়া হবে।"

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কোন্ জুল্ম সর্বাধিক গুরুতর? তিনি বললেন ঃ

ذراع من الارض ينقصه المرء المسلم من حق أخيه فليس حصاة من الارض يأخذها احد إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر الارض ولا يعلم قعرها إلا الذى خلقها .

অর্থাৎ—কোন মুসলমান ব্যক্তি তার ভাইয়ের হক এক হাত পরিমাণ জমিও যদি কেড়ে নেয় তবে তার প্রতিটি কঙ্করের জন্য সাত যমীনের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত কিয়ামতের দিন তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। আর যমীনের সর্বনিম্ন স্তরের গভীরতা সম্পর্কে একমাত্র তার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কেউই জ্ঞাত নন।

ইমাম আহমদ (র) এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আর এ সনদটি ত্রুটিমুক্ত।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

من أخذ شبرا الارض بغير حقه طوقه من سبع أرضين .

অর্থাৎ—কেউ অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমি আত্মসাৎ করলে সাত তবক যমীন তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

এ সূত্রে ইমাম আহমদ (র) একাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসটি মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ। ইমাম আহমদ (র) ভিন্ন সূত্রে ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে من اخذ -এর স্থলে من اقتطع শব্দটি রয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে ইমাম আহমদ (র) বর্ণিত অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ من أخذ من الأرض شبرا بغير حقه طوقه من سبع أرضين.

এটিও ইমাম আহমদের এককভাবে বর্ণিত হাদীস। ইমাম তাবারানী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মোটকথা, এ হাদীসগুলো যমীনের সংখ্যা যে সাত তার প্রমাণ হিসাবে প্রায় মুতাওয়াতির তুল্য—যাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আর এর দ্বারা সাত যমীনের একটি যে অপরটির উপর অবস্থিত তা-ই বুঝানো হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, নীচের যমীন উপরের যমীনের ঠিক মাঝ বরাবর অবস্থিত। সপ্তমটি পর্যন্ত এভাবেই রয়েছে। সপ্তমটি হলো সম্পূর্ণ নিরেট— যার মধ্যে একটুও ফাঁকা নেই। এর মধ্যখানেই হলো কেন্দ্র। এটি একটি কল্পিত বিন্দু— আর এটিই হলো ভারি বস্তু পতনের স্থল। চতুর্দিক থেকে যা কিছু পতিত হয়, কোন কিছুর দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হলে তার সব গিয়ে ওখানেই পতিত হয়। আর প্রতিটি যমীন একটির সঙ্গে অপরটি মিলিত, নাকি প্রতিটির মাঝে ফাঁকা রয়েছে, এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ মতভেদ আসমানের বেলায়ও রয়েছে। স্পষ্টত এটা প্রতীয়মান হয় যে, তার প্রতিটির একটি থেকে অপরটির মাঝে দূরত্ব রয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ .

অর্থাৎ—আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন সাত আকাশ এবং তাদের অনুরূপ পৃথিবীও, তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ। (৬৫ ঃ ১২)

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময়ে একখণ্ড মেঘ অতিক্রম করলে তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান এগুলো কী? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন ঃ "এগুলো হচ্ছে মেঘমালা। পৃথিবীর দিক-দিগন্ত থেকে এগুলোকে হাঁকিয়ে নেওয়া হয় অকৃতজ্ঞ আল্লাহর বান্দাদের নিকট যারা তাঁকে ডাকে না।" তোমরা কি জান, তোমাদের উর্ধ্বদেশে এটা কী ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিকতর জ্ঞাত। তিনি বললেন,এ হচ্ছে সুউচ্চ জমাট ঢেউ এবং সুরক্ষিত ছাদ। তোমরা কি জান, তোমাদের ও তার মধ্যকার দূরত্ব কতটুকু ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক অবহিত। তিনি বললেন ঃ পাঁচশ বছরের পথ। তারপর তিনি বললেন ঃ 'তোমরা কি জান যে, তার উপরে কী আছে ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক জ্ঞাত। তিনি বললেন, পাঁচশ বছরের দূরত্ব। এভাবে তিনি একে একে সাতটি আসমান পর্যন্ত বর্ণনা দিলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান, তার উপরে কি রয়েছে ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক অবহিত। তিনি বললেন, আরশ। তোমরা কি জান যে, তার ও সপ্তম আসমানের মধ্যে দূরত্ব কতটুকু ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিকতর জ্ঞাত। তিনি বললেন, পাঁচশ

বছরের পথ। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান যে, তোমাদের নিচে এসব কী ? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, যমীন। তোমরা কি জান যে, তার নিচে কী আছে? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই অধিকতর জ্ঞাত। তিনি বললেন ঃ আরেকটি যমীন। তোমরা কি জান, এ দু'টির মাঝে দূরত্ব কতটুকু? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ সাতশ বছরের পথ। এভাবে তিনি গুনে গুনে সাত যমীনের কথা উল্লেখ করে পরে বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! যদি তোমাদের কাউকে নিচের দিকে চাপ দিতে থাকে তাহলে সে সপ্তম যমীন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে। তারপর তিনি নিম্নের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

অর্থাৎ—তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত। (৫৭ ঃ ৩)

ইমাম তিরমিযী (র) এবং আরও একাধিক আলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্র উল্লেখ করে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে প্রতি দু'যমীনের মধ্যে পাঁচশ' বছরের দূরত্বের উল্লেখ রয়েছে। আবার বর্ণনার শেষে তিনি একটি কথা উল্লেখ করেছেন, যা আমরা সূরা হাদীদের এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করেছি। তারপর ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, এ সূত্রে হাদীসটি গরীব শ্রেণীভুক্ত।[১] অপর দিকে ইব্ন জারীর (র) তাঁর তাফসীরে কাতাদা (র) সূত্রে মুরসাল'[২] রূপে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এ সনদটিই বেশি গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি। আল্লাহ্ই সম্যক জ্ঞাত। হাফিজ আবূ বকর, বায্যার ও বায়হাকী (র) আবূযর গিফারী (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তার সনদ সহীহ নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আরশের বর্ণনায় উল্লেখিত পাহাড়ী মেষ সংক্রান্ত হাদীসটি সপ্তম আসমান থেকে আরশের উচ্চতার ব্যাপারে এ হাদীস এবং এর অনুরূপ আরো কয়েকটি হাদীসের বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্ত হাদীসে এও আছে যে, দু' আকাশের মধ্যকার দূরত্ব হলো পাঁচশ বছর এবং তার স্থূলতাও পাঁচশ বছর।

পক্ষান্তরে طوقه من سبع أرضين এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কোন কোন কালামশাস্ত্রবিদ বলেছেন যে, এর দ্বারা সাতটি মহাদেশ (اقليم) বুঝানো হয়েছে। তা এ আয়াত ও সহীহ হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এছাড়া এটা দলীল-প্রমাণ ব্যতীত হাদীস ও আয়াতকে সাধারণ অর্থের বিপরীত অর্থে প্রয়োগ করার নামান্তর। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

অনুরূপভাবে আহ্লে কিতাব সম্প্রদায়ের অনেকে বলে বেড়ান এবং আমাদের একদল আলিমও তাদের নিকট থেকে তা করেছেন যে, এ পৃথিবী হলো মাটির তৈরি, এর নিচেরটা লোহার তার নিচেরটা গন্ধকের তার নিচেরটা আরেক ধাতুর ইত্যাদি। বিশুদ্ধ সনদে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত না হওয়ার কারণে তাও প্রত্যাখ্যাত। আবার ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত

১. গরীব হচ্ছে ঐ সহীহ হাদীস যার সনদে কোন যুগে একজন মাত্র রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
২. মুরসাল হচ্ছে ঐ হাদীস যার সনদে সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয়নি।

এ মর্মের রিওয়ায়েত যে, প্রতিটি যমীনে ঠিক এ পৃথিবীর মত মাখলূক রয়েছে। এমনকি তোমাদের আদমের মত আদম ও তোমাদের ইবরাহীমের মত ইবরাহীমও আছে, একথাগুলো ইব্ন জারীর (র) সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন এবং বায়হাকী 'আল-আসমা ওয়াস্ সিফাত' গ্রন্থে তা উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু এতথ্যটি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে উদ্ধৃত হওয়ার দাবিটি সঠিক হয়ে থাকলে বলতে হবে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) তা ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে গ্রহণ করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করার পর তা দুলতে শুরু করে, তাই তিনি পর্বতমালা সৃষ্টি করে তার উপর তা স্থাপন করেন। তাতে পৃথিবী স্থির হয়ে যায়। পর্বতমালা দেখে ফেরেশতাগণ অবাক হয়ে বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক' আপন'র সৃষ্টির মধ্যে পর্বত থেকে মজবুত আর কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, লোহা। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে লোহা থেকে বেশি মজবুত আর কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন হ্যাঁ, আগুন। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে আগুনের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী আর কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন ঃ হ্যাঁ বাতাস। ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার সৃষ্টির মধ্যে বাতাসের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী কিছু আছে কি? আল্লাহ বললেন ঃ হ্যাঁ, আদম সন্তান, যে ডান হাতে দান করে আর বাম হাত থেকে তা গোপন রাখে। 'ইমাম আহমদ (র) এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডে কত পাহাড়-পর্বত আছে; জ্যোতির্বিদগণ তাঁর সংখ্যা উল্লেখ করেছেন এবং তার দৈর্ঘ, প্রস্থ ও উচ্চতার পরিসংখ্যান প্রদান করেছেন। এ ব্যাপারে তারা এত দীর্ঘ আলোচনা করেছেন যে, এখানে তার ব্যাখ্যা দিতে গেলে কিতাবের কলেবর অনেক বেড়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ .

অর্থাৎ-পাহাড়ের মধ্যে আছে বিচিত্র বর্ণের পথ—শুভ্র, লাল ও নিকষ কালো। (৩৫ ঃ ২৭)

ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেন, اَلْجُدَدُ। মানে পথঘাট। ইকরিমা (র) প্রমুখ বলেন, اَلْغَرَابِيبُ। মানে সুউচ্চ কালো পাহাড়। সমগ্র পৃথিবীর পর্বতমালায় স্থানের ও বর্ণের বৈচিত্রের মধ্যে এ চিত্রই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তো তাঁর কিতাবে সুনির্দিষ্টভাবে জূদী পাহাড়ের কথা উল্লেখই করেছেন। সে কি বিরাট পাহাড়! দিজলার পাশে জাযীরা ইব্ন উমরের পূর্ব অংশে যার অবস্থান। মাওসিলের কাছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে তার দৈর্ঘ হলো, তিন দিনের পথ আর উচ্চতা আধা দিনের পথ। বর্ণ তার সবুজ। কারণ তা ওক জাতীয় গাছে পরিপূর্ণ। তার পাশে আছে একটি গ্রাম, নাম তার কারয়াতুস সামানীন (আশি ব্যক্তির গ্রাম)। কারণ একাধিক মুফাসসিরের মতে, তা নূহ (আ)-এর সঙ্গে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকজনের আবাসস্থল ছিল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

সাগর ও নদ-নদী

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَي الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَعَلَامَاتٍ وَّبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ - افَلَا تَذَكَّرُونَ. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَاتُحْصُوهَا. إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.

অর্থাৎ—তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা থেকে তাজা মাছ খেতে পার এবং যাতে তা থেকে আহরণ করতে পার রত্নাবলী, যা তোমরা ভূষণরূপে পরতে পার এবং তোমরা দেখতে পাও, তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এ জন্য যে, তোমরা যেন তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর;

এবং তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছুতে পার; এবং পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও। আর তারা নক্ষত্রের সাহায্যেও পথের নির্দেশ পায়।

সুতরাং যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তারই মত, যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না ? তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। আল্লাহ্ অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ, পরম দয়ালু। (১৬ ঃ ১৪-১৮)

وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

অর্থাৎ—সমুদ্র দু'টো একরূপ নয়- একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, অপরটির পানি লোনা, খর। প্রত্যেকটি থেকে তোমরা তাজা গোশত আহার কর এবং অলংকার যা তোমরা পরিধান কর এবং রত্নাবলী আহরণ কর এবং তোমরা দেখ তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (৩৫ ঃ ১২)

وَهُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا.

অর্থাৎ—তিনিই দু'দরিয়াকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটি মিষ্ট সুপেয় এবং অপরটি লোনা, খর; উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। (২৫ ঃ ৫৩)

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ.

অর্থাৎ— তিনি প্রবাহিত করেন দু'দরিয়া, যারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা তারা অতিক্রম করতে পারে না। (৫৫ ঃ ১৯, ২০)

মোটকথা, দু'দরিয়া দ্বারা লোনা, খর দরিয়া এবং সুমিষ্ট দরিয়া বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন জুরায়জ প্রমুখ ইমাম বলেন, সুমিষ্ট দরিয়া হলো, সৃষ্টিকুলের স্বার্থে দেশের আনাচে-কানাচে যে সব নদ-নদী প্রবহমান রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارُ فِى الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَّشَأْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهِ إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ. أَوْيُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ.

অর্থাৎ— তাঁর অন্যতম নিদর্শন সমুদ্রে পর্বততুল্য চলমান নৌযানসমূহ। তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন, ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্রপৃষ্ঠে। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য। অথবা তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য সেগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন এবং অনেককে তিনি ক্ষমাও করেন। (৪২ ঃ ৩২-৩৪)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّالٍ كَفُوْرٍ.

অর্থাৎ—তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে নৌযানগুলো সমুদ্রে বিচরণ করে, যা দিয়ে তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছুটা প্রদর্শন করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।

যখন তরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে মেঘের ছায়ার মত, তখন তারা আল্লাহ্‌কে ডাকে তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান, তখন তাদের কেউ কেউ সরলপথে থাকে; কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাই তাঁর নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে। (৩১ ঃ ৩১-৩২)

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ. وَمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ

فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا . وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .

অর্থাৎ–আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, যা মানুষের হিতসাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ্ আকাশ থেকে যে বারিবর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে। (২ ঃ ১৬৪)

এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের জন্য যে সাগরমালা ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন, তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মহাসাগর ও তার শাখা-প্রশাখা সবই লোনা ও খর। পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার ব্যাপারে এতে বিরাট হিকমত রয়েছে। কারণ যদি তা মিঠা হতো; তাহলে তাতে যে সব প্রাণী আছে তা মরে পরিবেশ দূষিত এবং আবহাওয়া কলুষিত হয়ে যেত এবং তা মানুষকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিত। তাই পরিপক্ক প্রজ্ঞার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মানুষের স্বার্থে তা এমন হয়েছে। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সমুদ্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ هو الطهور ماءه الحل ميتة "তার পানি পাক, তার মৃত জীব হালাল।"

পক্ষান্তরে নদীর পানি পানকারীর জন্যে সুমিষ্ট ও সুপেয়। আল্লাহ্ তাকে প্রবহমান করেছেন এবং এক স্থানে তা উৎসারিত করে মানুষের জীবিকার সুবিধার্থে তা অন্যান্য স্থানে পরিচালিত করেন। মানুষের প্রয়োজন ও উপকারের চাহিদা অনুপাতে নদ-নদীর কোনটা বড়, আবার কোনটা ছোট হয়ে থাকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও তাফসীর বিশারদগণ সমুদ্র ও বড় বড় নদ-নদীর সংখ্যা, তার উৎস ও গন্তব্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন, যাতে মহান সৃষ্টিকর্তার কুদরতের অনেক নিদর্শন রয়েছে এবং এ প্রমাণও রয়েছে যে, তিনি নিজ এখতিয়ার ও হিকমত মোতাবেক কাজ করেন।

সূরা তূর-এর ষষ্ঠ আয়াত ঃ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ (এবং শপথ উদ্বেলিত সমুদ্রের) সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। প্রথমত, এর দ্বারা পাহাড়ী মেষ সংক্রান্ত হাদীসে উল্লেখিত ঐ সমুদ্রই বুঝানো হয়েছে, যা আরশের নিচে অবস্থিত এবং যা সপ্ত আকাশের উপরে রয়েছে এবং যার নিচ ও উপরের মধ্যে এতটুকু ব্যবধান, যতটুকু এক আকাশ থেকে আরেক আকাশের। পুনরুত্থানের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা এ সমুদ্র থেকেই বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তাতে দেহসমূহ কবর থেকে পুনর্জীবিত হয়ে উঠবে। রবী ইব্ন আনাস এ অভিমতটিই গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, البحر। জাতিবাচক বিশেষ্য। পৃথিবীর সব সমুদ্রই এর আওতাভুক্ত। এটাই অধিকাংশ আলিমের অভিমত।

اَلْمَسْجُوْرُ এর অর্থ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ اَلْمَسْجُوْرُ অর্থ পরিপূর্ণ। কেউ বলেন, সমুদ্রটি কিয়ামতের দিন প্রজ্বলিত আগুনে পরিণত হয়ে হাশরের ময়দানে উপস্থিত সকলকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। যেমনটি আলী, ইব্ন আব্বাস, সাঈদ ইব্ন জুবায়র

(রা) ও ইব্‌ন মুজাহিদ (র) প্রমুখ থেকে তাফসীর গ্রন্থে আমি উল্লেখ করেছি। কারো কারো মতে, اَلْمَسْجُوْرُ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সংযত ও প্রহরাধীন বুঝানো হয়েছে। যাতে তা উদ্বেলিত হয়ে পৃথিবী ও তাতে বসবাসকারী প্রাণীদেরকে ডুবিয়ে মারতে না পারে। ওয়ালিবী (র) তা ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটাই সুদ্দী (র) প্রমুখেরও অভিমত। নিচের হাদীসটিতে এর সমর্থন মিলে।

ইমাম আহমদ (র) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها ثلاث مرات يستأذن الله عز وجل أن ينقصه عليهم فيكفه الله عز وجل -

অর্থাৎ—"উদ্বেলিত হয়ে সবকিছু ডুবিয়ে দেয়ার জন্য সমুদ্র প্রতি রাতে তিনবার করে আল্লাহ্‌র কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ তাকে সংযত করে রাখেন।"

ইসহাক ইব্‌ন রাহওয়ে (র) এক বয়োঃবৃদ্ধ সীমান্ত প্রহরীর বরাতে বলেন, এক রাতে আমি পাহারার জন্য বের হই। তখন আমি ছাড়া আর কোন প্রহরী বের হয়নি। এক সময়ে আমি বন্দরে পৌঁছে উপরে উঠে তাকাতেই আমার কাছে মনে হচ্ছিলো সমুদ্র যেন পাহাড়ের চূড়ায় উঁচু ঢেউ রূপে এগিয়ে আসছে। কয়েকবারই এরূপ ঘটলো। আমি তখন জাগ্রত। তারপর হযরত উমর (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ সালিহ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি বললেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات يستأذن الله أن يتفصح عليهم فيكفه الله عز وجل.

অর্থাৎ– 'উদ্বেলিত হয়ে সব তলিয়ে দেয়ার জন্য সমুদ্র প্রতি রাতে তিন বার আল্লাহ্‌র নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে কিন্তু আল্লাহ্ তাকে সংযত করে রাখেন।' এ সনদে একজন অজ্ঞাত পরিচয় রাবী আছেন। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

এটা বান্দার প্রতি মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ একটি অনুগ্রহ যে, তিনি তাদেরকে সমুদ্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। তাকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, ফলে নৌযানে চড়ে তারা তার উপর দিয়ে ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদির উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্ত দেশে ভ্রমণ করে থাকে এবং আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁর সৃষ্ট নক্ষত্ররাজি ও পর্বতমালা তাতে পথের দিশা লাভ করে থাকে। আরো তারা উপকৃত হয় সমুদ্রে সৃষ্ট অতি উত্তম ও মূল্যবান মণিমুক্তা দ্বারা যা তিনি সমুদ্রে সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং মানুষের জন্য হালাল করে দিয়েছেন, এমনকি তার মৃত প্রাণীগুলো পর্যন্ত। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ احل لكم صيد البحر وطعامه

অর্থাৎ– তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা ভক্ষণ হালাল করা হয়েছে। (৫ ঃ ৯৬)

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ هو الطهور ماءه الحل ميتته

অর্থাৎ– সমুদ্রের পানি পবিত্র ও মৃত জীব হালাল।

অন্য হাদীসে আছে ঃ

احلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال.

অর্থাৎ- 'আমাদের জন্য দু'টো মৃত প্রাণী ও দু'টো রক্ত হালাল করা হয়েছে। মাছ ও পঙ্গপাল এবং কলিজা ও প্লীহা।' এটি আহমদ ও ইব্‌ন মাজাহ্ (র) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সনদ প্রশ্নাতীত নয়।

হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার তাঁর মুসনাদে বলেছেন যে, আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন মু'আবিয়া আল-বাগদাদী (র) রচিত একটি কিতাবে পেয়েছি, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ পশ্চিমের ও পূর্বের এ সমুদ্রগুলোর সঙ্গে আল্লাহ্ কথা বলেছেন। তিনি পশ্চিমের সমুদ্রকে বলেন, তোমাতে আমি আমার কতিপয় বান্দাকে বহন করাতে চাই, তাদের সঙ্গে তুমি কিরূপ আচরণ করবে? সমুদ্র বলল, আমি তাদেরকে ডুবিয়ে মারব। আল্লাহ্ বললেন ঃ 'তোমার অকল্যাণ হোক' এবং তাকে অলংকার ও শিকার থেকে তিনি বঞ্চিত করে দেন। পক্ষান্তরে পূর্বের সমুদ্রকে যখন বললেন, "আমি তোমাতে আমার কতিপয় বান্দাকে বহন করাব, তাদের সঙ্গে তুমি কিরূপ আচরণ করবে?" তখন সে বলল, আমি তাদেরকে আমার নিজ হাতে করে বহন করব এবং সন্তানের জন্য মায়ের মত হবো। ফলে পুরস্কার হিসেবে আল্লাহ্ তাকে অলংকার ও শিকার সম্ভার দান করেন। তারপর বলেছেন যে, একথা কাউকে জানতে দিও না।

এ হাদীসের সনদে এক পর্যায়ে এমন একজন রাবী এককভাবে রয়েছেন-- যিনি মুন্‌কারুল হাদীস।[১] আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) সূত্রেও মওকূফ পদ্ধতিতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। আমার মতে, এটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা, তিনিই ইয়ারমুকের যুদ্ধের দিন আহলি কিতাবদের কিতাব বোঝাই দু'টো বাহন পেয়েছিলেন। ফলে সেগুলো থেকে তিনি ইসরাঈলিয়াতের অনেক তথ্য বর্ণনা করতেন, যার কতকটা সাধারণভাবে জ্ঞাত ও প্রসিদ্ধ এবং কতকটা প্রক্ষিপ্ত ও প্রত্যাখ্যাত। আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন হাফ্‌স-ইব্‌ন আসিম ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব আবুল কাসিম আল-মাদানী এককভাবে তার গ্রহণযোগ্য অংশগুলো বর্ণনা করেছেন। তার সম্পর্কে ইমাম আহমদ (র) বলেছেন, লোকটি আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। আমি তার থেকে হাদীস শুনেছিলাম। কিন্তু পরে তা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলি। সে ছিল একজন ডাহা মিথ্যুক এবং তার হাদীছসমূহ মুনকার পর্যায়ের। তদ্রূপ ইব্‌ন মাঈন, আবূ যুর'আ, আবূ হাতিম, জাওয়জানী, বুখারী, আবূ দাঊদ ও নাসাঈ তাকে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন। ইব্‌ন আদী বলেছেন, তাঁর হাদীসগুলো মুনকার। তন্মধ্যে দুর্বলতম হলো সমুদ্র সংক্রান্ত হাদীসটি।

দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, সমুদ্র, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, প্রান্তরাদি, পৃথিবীর শহর-বন্দর, বিজনভূমি ও জনবসতিপূর্ণ এলাকাসমূহ, পারিভাষিক অর্থের সাত মহাদেশ, সুবিদিত দেশসমূহ এবং বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক উদ্ভিদজাত, খনিজ ও বাণিজ্যিক বিষয়াদি সম্পর্কে আলোকপাতকারী তাফসীরবিদগণ বলেন, গোটা পৃথিবীর একভাগ স্থল এবং তিনভাগ পানি। এ ভূ-ভাগের পরিমাপ হচ্ছে নব্বই ডিগ্রী। আল্লাহ্ তা'আলা অনুগ্রহ করেই এ বিশাল পানি রাশিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত রেখেছেন যাতে করে প্রাণীকুল জীবন যাপন করতে পারে এবং শস্যাদি এবং ফলমূল উৎপন্ন হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

---

১. মুনকারুল হাদীস ঐ দুর্বল রাবীকে বলা হয়ে থাকে যার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না।

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

অর্থাৎ– তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য, এতে আছে ফলমূল এবং খেজুর গাছ, যার ফল আবরণযুক্ত এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধ গুল্ম। অতএব, তোমরা (জিন ও মানবজাতি) উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫৫ ঃ ১০-১৩)

তাঁরা বলেন, পৃথিবীর স্থল ভাগের তিন ভাগের দু'ভাগ বা তদপেক্ষা একটু বেশিতে মানুষের বসবাস রয়েছে। এর পরিমাপ ৯৫ ডিগ্রী।[১]

তারা আরো বলেন, সমুদ্রসমূহের মধ্যে একটি হলো, পশ্চিম মহাসাগর যাকে আটলান্টিক মহাসাগরও বলা হয়। এ মহাসাগরই পশ্চিমের দেশগুলোকে ঘিরে আছে। এর পশ্চিম ভাগে আছে ছ'টি দ্বীপ। এ মহাসাগরও এর উপকূলের মাঝে প্রায় এক মাসের পথে দশটি ডিগ্রী রয়েছে। এটি এমন এক সাগর অধিক ঢেউ এবং আবহাওয়া ও তরঙ্গ সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে এতে চলাচল করা অসম্ভব প্রায়। তাতে কোন শিকারও নেই এবং তা থেকে কোন কিছু আহরণও করা হয় না এবং বাণিজ্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাতে ভ্রমণও করা যায় না। দক্ষিণ দিক ঘেঁষে এটি কামার পর্বতমালার দিকে চলে গেছে। এ কামার পর্বতমালাই মিসরের নীল নদের উৎসস্থল। তারপর বিষুবরেখা অতিক্রম করে তা চলে গেছে পূর্ব দিকে। তারপর আরও পূর্ব দিকে মহাসাগরটি অগ্রসর হয়ে তাই পৃথিবীর সর্বদক্ষিণ এলাকায় পরিণত হয়েছে। সেখানে কয়েকটি দ্বীপ রয়েছে যা আযযাবিজ দ্বীপপুঞ্জ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এ মহাসাগরটির উপকূল অঞ্চলে প্রচুর অনাবাদী এলাকা রয়েছে। তারপর পূর্ব দিকে গিয়ে তা চীন সাগর ও ভারত মহাসাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তারপর পূর্ব-উত্তর দিকে গিয়ে পৃথিবীর পূর্ব দিকের শেষ প্রান্তে গিয়ে ঠেকেছে। সেখানেই চীন সাগরের অবস্থান। তারপর চীনের পূর্বে মোড় নিয়ে তা উত্তর দিকে চলে গিয়ে চীন দেশ অতিক্রম করে চলে গেছে য়াজূজ-মাজূজের প্রাচীর পর্যন্ত। সেখান থেকে আবার এমন একদিকে মোড় নিয়েছে যার অবস্থা কারো জানা নেই। তারপর পৃথিবীর উত্তর-প্রান্তে পশ্চিম দিকে রাশিয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে এবং তা অতিক্রম করে আবার পশ্চিম-দক্ষিণে মোড় নিয়ে পৃথিবী ঘুরে এসে পুনরায় সোজা পশ্চিম দিকে গিয়ে পশ্চিম থেকে প্রণালী[২] অঞ্চলের দিকে চলে যায়, যার শেষ প্রান্ত সিরিয়ার দিকে গিয়ে ঠেকেছে। তারপর রোমের পথ ধরে তা কনস্টান্টিনিপল প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

পূর্ব মহাসাগর থেকে আরো কয়েকটি সমুদ্র প্রবাহিত হয়েছে। সেগুলোতে অনেক দ্বীপ আছে। এমনকি কথিত আছে যে, কেবল ভারত সাগরেই জনশূন্য দ্বীপসমূহের কথা বাদ দিলেও শহর-বন্দর ও অট্টালিকাদি বিশিষ্ট দ্বীপের সংখ্যা এক হাজার সাতশ'। এই সাগরসমূহকে বাহরে আখসারও বলা হয়ে থাকে। এর পূর্বাংশে চীন সাগর, পশ্চিমে ইয়ামান সাগর, উত্তরে ভারত সাগর এবং দক্ষিণে কী আছে তা অজ্ঞাত।

---

১. মূল আরবীতে ৯৫ ডিগ্রী লিখিত আছে যা সম্ভবত মুদ্রণ প্রমাদ। কেননা গোটা স্থলভাগই ৯০ ডিগ্রী বলে লেখক উল্লেখ করেছেন।

২. লেখক এখানে জিব্রালটার প্রণালীর কথা বলেছেন।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ভারত সাগর ও চীন সাগরের মধ্যখানে দু'য়ের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টিকারী কয়েকটি পাহাড় আছে এবং তাতে স্থলপথের ন্যায় কয়েকটি প্রশস্ত পথ আছে যা দিয়ে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِى الْأَرْضِ رَوَاسِىَ أَنْ تَمِيْدَبِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا. لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ -

অর্থাৎ- এবং আমি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত যাতে পৃথিবী তাদেরকে নিয়ে এদিক-ওদিক ঢলে না যায় এবং আমি তাতে করেছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছুতে পারে। (২১ ঃ ৩১)

ভারত উপমহাদেশের বাতলীমূস নামক জনৈক রাজা তাঁর 'মিজেসতী' নামক গ্রন্থে খলীফা মামুনের আমলে যা আরবীতে অনূদিত হয়েছিল, যা এ সংক্রান্ত বিদ্যার উৎস বলে পরিগণিত– তাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, পশ্চিম, পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর মহাসাগর থেকে প্রবহমান সমুদ্রের সংখ্যা অনেক। এগুলোর মধ্যে এমনও রয়েছে যা আসলে একই সাগর, তবে পার্শ্ববর্তী জনপদের নামানুসারে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, বাহরে কুলযুম বা লোহিত সাগর। কুলযুম হচ্ছে আয়লার কাছাকাছি সমুদ্রের উপকূলবর্তী একটি গ্রাম। আরো আছে পারস্য সাগর, কাস্পিয়ান সাগর, অরনক সাগর, রোম সাগর, বানতাশ সাগর ও আযরাক সাগর। আযরাক উপকূলবর্তী একটি শহরের নাম। একে কারম সাগরও বলা হয়। এটি সংকীর্ণ হয়ে দক্ষিণ কনস্টান্টিনিপলের নিকট ভূমধ্যসাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে। এটি কনস্টান্টিনিপলের উপসাগর। আর এ কারণেই কারম সাগর থেকে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে। আর এ কারণেই কারম সাগর থেকে ভূমধ্যসাগরে আসার সময় নৌযানসমূহ দ্রুত চলে কিন্তু পানির বিপরীতে প্রবাহের কারণে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কারমে আসার সময় চলে ধীর গতিতে। আর এটি পৃথিবীর একটি অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। কারণ, যত প্রবহমান পানি আছে সবই মিষ্ট, কিন্তু এটি তার ব্যতিক্রম আর সকল স্থির সমুদ্রের পানি লোনা, খর। কিন্তু কাস্পিয়ান সাগর তার ব্যতিক্রম। একে জুরজান সাগর ও তাবারিস্তান সাগরও বলা হয়। পর্যটকদের বর্ণনা, এর বিরাট এক অংশের পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়।

জ্যোতির্বিদগণ বলেন, এ সাগরটি প্রায় গোলাকার। কেউ কেউ বলেন, তা নৌকার পালের ন্যায় ত্রিকোণা বিশিষ্ট। মহাসাগরের কোন অংশের সঙ্গে তার সংযোগ নেই বরং তা সম্পূর্ণ আলাদা। তার দৈর্ঘ্য আটশ' মাইল ও প্রস্থ ছয়শ' মাইল। কেউ কেউ এর বেশিও বলেছেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

ঐ সমুদ্রগুলোর আরেকটি হলো বসরার নিকটবর্তী সাগর, যাতে জোয়ার-ভাটা হয়। সাগরের এলাকার দেশগুলোতেও[১] এর অনুরূপ সাগর রয়েছে। চান্দ্র মাসের শুরু থেকে পানি বাড়তে শুরু করে এবং পূর্ণিমা রাতের শেষ পর্যন্ত, তা অব্যাহত থাকে। এ হলো জোয়ার। তারপর কমতে শুরু করে মাসের শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। এ হলো ভাটা। বিশেষজ্ঞগণ এসব সাগরের সীমারেখা এবং এগুলোর উৎস ও মোহনাসমূহের উল্লেখ করেছেন এবং পৃথিবীর

১. মরক্কো-তিউনিসিয়া অঞ্চল।

ছোট ছোট নদ-নদী এবং খাল-নালার আলোচনাও তাঁরা করেছেন। আবার বড় বড় প্রসিদ্ধ নদ-নদী এবং সেগুলোর উৎস ও মোহনাসমূহের কথাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন। আমরা এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না - আমরা কেবলমাত্র হাদীসে বর্ণিত নদীসমূহ সম্পর্কেই আলোকপাত করব।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِهٖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوْهُ وَإِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ.

অর্থাৎ– তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে।

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে যারা অবিরাম একই নিয়মের অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তার নিকট যা চেয়েছ তা থেকে। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় জালিম, অকৃতজ্ঞ। (১৪ ঃ ৩২-৩৪)

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে কাতাদা (র) সূত্রে আনাস ইব্ন মালিক ও মালিক ইব্ন সা'সা'আ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সিদরাতুল মুন্তাহার আলোচনাকালে বলেছিলেন ঃ

فإذا يخرج من اصلها نهران باطنان ونهران ظاهران فأما الباطنان ففى الجنة واما الظاهران فالنيل والفرات.

অর্থাৎ–আমি দেখতে পেলাম যে, তার মূলদেশ থেকে দু'টো অদৃশ্য নদী ও দু'টো দৃশ্যমান নদী বেরিয়ে যাচ্ছে। অদৃশ্য দু'টো জান্নাতে আর দৃশ্যমান দু'টো হলো নীল ও ফোরাত।

সহীহ্ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.

অর্থাৎ— আমু দরিয়া ও শির দরিয়া ফোরাত ও নীল সব ক'টিই জান্নাতের নদী।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

فجرت أربعة انهار من الجنة الفرات والنيل وسيحان وجيحان.

অর্থাৎ— জান্নাত থেকে চারটি নদী প্রবাহিত করা হয়েছে। ফোরাত, নীল, আমু দরিয়া ও শির দরিয়া। ইমাম মুসলিমের শর্ত মোতাবেক এ হাদীসের সনদ সহীহ্।

সম্ভবত এর দ্বারা পরিচ্ছন্নতা, স্বাদ ও প্রবাহের ক্ষেত্রে এ নদীগুলো জান্নাতের নদ-নদীর সাথে সাদৃশ্য রাখে বলে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। এ ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা আবূ হুরায়রা সূত্রে ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণিত ও তাঁর দ্বারা সহীহ বলে আখ্যায়িত– হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সেই হাদীসে রয়েছে যাতে তিনি বলেছেন ঃ

العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم.

"আজওয়া (উন্নতমানের এক প্রকার খেজুর) জান্নাতী খেজুর এবং তাতে বিষ-এর উপশম রয়েছে।" অর্থাৎ–আজওয়া জান্নাতের ফল-ফলাদির সাথে সাদৃশ্য রাখে। এর অর্থ এ নয় যে, এটি জান্নাত থেকে আহরণ করে নিয়ে আসা হয়েছে. কেননা, বাস্তবে এর বিপরীতটিই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং এটা যে শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, তা স্পষ্ট। অনুরূপ অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

الحمي من فيح جهنم فأبردوها بالماء.

অর্থাৎ— জ্বর হলো জাহান্নামের তাপ। কাজেই তাকে তোমরা পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।

অপর একটি হাদীসে আছে ঃ

إذا اشتد الحمي فابردوها بالماء فإن شدة الحر من فيح جهنم.

অর্থাৎ– জ্বর তীব্র আকার ধারণ করলে তাকে তোমরা পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করে নিও। কেননা গরমের তীব্রতা জাহান্নামের তাপ বিশেষ।

তদ্রূপ এসব নদ-নদীর মূল উৎসও পৃথিবীতেই।

নীল নদ ঃ স্রোতের তীব্রতা, পানির স্বচ্ছতা এবং গতিপথের দৈর্ঘ্যের দিক থেকে গোটা পৃথিবীতে এটি অতুলনীয় নদী। এর শুরু হলো জিবালুল কামার বা শুভ্র পর্বতমালা থেকে। কারো কারো মতে, জিবালুল কামার দ্বারা চন্দ্রের পাহাড় বুঝানো হয়েছে। এটি পৃথিবীর পশ্চিমাংশে বিষুবরেখার পেছনে দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। কারো কারো মতে, তাহলো যার মধ্য থেকে উৎসারিত হয়েছে একাধিক ঝরনা। তারপর দূরে দূরে অবস্থিত দশটি স্রোতধারার সম্মিলন ঘটেছে। তারপর তার প্রতি পাঁচটি গিয়ে একত্রিত হয় একটি সাগরে। তারপর তা থেকে বেরিয়ে আসে ছ'টি নদী। তারপর তার প্রতিটি গিয়ে মিলিত হয় অন্য এক হ্রদে। তারপর তা থেকে বেরিয়ে আসে আরেকটি নদী। এটাই হলো নীল নদ। এ নদটি সুদান, নওবা ও আসওয়ান হয়ে অবশেষে মিসরে গিয়ে উপনীত হয়েছে। নওবার প্রধান শহর হচ্ছে দামকালা। হাবশার বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি এবং তার পলিমাটি মিসরে গড়িয়ে আসে। মিসরের এ দু'টো বস্তুরই প্রয়োজন রয়েছে। কারণ মিসরে বৃষ্টি এত কম হয় যে, তা ফসলাদি ও গাছ-গাছালির জন্য যথেষ্ট নয়। আর তার মাটি হলো বালুময়। যাতে কোন ফসলই উৎপন্ন হয় না। নীল নদ হয়ে যে পানি ও মাটি আসে তা থেকেই মিসরবাসীর প্রয়োজনীয় ফসলাদি উৎপন্ন হয়।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ –

অর্থাৎ– তারা কি লক্ষ্য করে না, আমি ঊষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে তার সাহায্যে উদগত করি শস্য যা হতে খাদ্য গ্রহণ করে তাদের গবাদি পশু এবং তারাও ? তারা কি লক্ষ্য করে না? (সাজদা ঃ ২৭)

মিসরের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক প্রযোজ্য। তারপর মিসরের কিছু অংশ অতিক্রম করে উপকূলবর্তী শাতনূফ নামক একটি গ্রামের নিকট গিয়ে নীল নদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে তার পশ্চিমের শাখাটি রশীদ অঞ্চল অতিক্রম করে লোনা সমুদ্রে পড়েছে, অপরদিকে পূর্ব দিকের শাখাটি জাওজার-এর নিকট গিয়ে দু'ভাগ হয়ে শাখাদ্বয়ের পশ্চিম ভাগ দুমিয়াত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়েছে। আর পূর্বভাগ আশমূনতান্নাহ হয়ে দুমিয়াতের পূর্বে অবস্থিত তান্নীস হ্রদ ও দুমিয়াত হ্রদে পড়েছে। নীল নদের উৎপত্তিস্থল ও সঙ্গম স্থলের মধ্যে এভাবে বিরাট দূরত্ব রয়েছে। আর এ কারণেই এর পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ।

ইব্ন সীনা বলেন, নীল নদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা পৃথিবীর অন্য কোন নদ-নদীর নেই। প্রথমত, উৎপত্তিস্থল থেকে শেষ প্রান্তের মাঝে এর দূরত্ব সর্বাধিক। দ্বিতীয়ত, তা প্রবাহিত হয় বড় বড় পাথর ও বালুময় প্রান্তরের উপর দিয়ে, যাতে কোন শ্যাওলা ও ময়লা-আবর্জনা নেই। তৃতীয়ত, তার মধ্যে কোন পাথর বা কংকর সবুজ হয় না। বলা বাহুল্য যে, নদীটির পানির স্বচ্ছতার কারণেই এরূপ হয়ে থাকে। চতুর্থত, আর সব নদ-নদীর পানি যখন হ্রাস পায়, এর পানি তখন বৃদ্ধি পায় আর অন্যসব নদীর পানি যখন বৃদ্ধি পায়, এর পানি তখন হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে কেউ কেউ বলে যে, নীল নদের উৎস হলো কোন এক উঁচু স্থান, কেউ কেউ যার সন্ধান পেয়েছেন এবং তাতে ভীষণ এক ভয়ানক বস্তু কতিপয় রূপসী নারী এবং আরো অনেক অদ্ভূত জিনিস দেখতে পেয়েছেন; এর সবই ঐতিহাসিকদের ভিত্তিহীন বর্ণনা এবং মিথ্যাচারীদের কল্পকাহিনী মাত্র।

কায়স ইব্ন হাজ্জাজ সূত্রে জনৈক ব্যক্তি থেকে আবদুল্লাহ ইব্ন লাহীয়া বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি বলেন, মিসর জয় করে আমর ইব্ন আস (রা) যখন অনারব কিবতী ক্যালেন্ডারের বু'না নামক মাসে তাতে প্রবেশ করেন তখন মিসরের লোকজন তাঁর নিকট এসে বলল, মাননীয় আমীর! আমাদের এ নীল নদের একটি প্রথা আছে, যা পালন না করলে তা প্রবাহিত হয় না। তিনি বললেন ঃ কী সে প্রথাটি? তাঁরা বলল, এ মাসের বার তারিখের রাত শেষ হলে আমরা বাবা-মার নিকট থেকে তাদের সম্মতিক্রমে একটি কুমারী মেয়ে নিয়ে আসি এবং উন্নতমানের অলংকারাদি ও পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়ে তাকে এ নীল নদে ফেলে দেই। শুনে আমর ইব্ন আস (রা) তাদেরকে বললেন ঃ

إن هذا لا يكون في الإسلام وإن الا سلام يهدم ما قبله .

অর্থাৎ– ইসলামে এটা চলবে না। পূর্বের সব কুসংস্কারকে ইসলাম নির্মূল করে দেয়। অগত্যা বু'না মাসটা তারা এভাবেই কাটিয়ে দেয়। কিন্তু নীল নদে কোন পানি আসলো না। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তারা বু'না, আবীব ও মাসরা এ তিন মাস অপেক্ষা করলো কিন্তু নীল আর প্রবাহিত হয় না। এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা দেশ ত্যাগ করতে মনস্থ করে। অবশেষে আমর (রা) খলীফা উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট এ ব্যাপারে পত্র লিখেন। জবাবে উমর (রা) লিখে পাঠান যে, তুমি যা' করেছ ঠিকই করেছ। আর তোমার নিকট একটি লিপি প্রেরণ

করছি, তুমি তা নীল নদে ফেলে দিও। পত্রটি এসে পৌঁছুলে আমর (রা) লিপিটি খুলে দেখতে পেলেন যে, তাতে লিখা রয়েছে ঃ

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر اما بعد- فان كنت تجري من قبلك فلا تجر وان كان الله الواحد القهار هو الذى يجريك فنسأل الله أن يجريك .

অর্থাৎ– "আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন উমর-এর পক্ষ থেকে মিসরের নীল নদের প্রতি– হামদ ও সালাতের পর ঃ `

যদি তুমি নিজ ক্ষমতায় প্রবাহিত হয়ে থাকো, তাহলে তুমি প্রবাহিত হয়ো না। আর যদি পরাক্রমশালী এক অদ্বিতীয় আল্লাহ তোমাকে প্রবাহিত করে থাকেন, তাহলে তাঁরই কাছে আমরা প্রার্থনা করছি যেন তিনি তোমাকে প্রবাহিত করেন।"

আমর (রা)-এর চিঠিটি নীল নদে ফেলে দিলে শনিবার দিন সকালে দেখা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা নীল নদকে এমনভাবে প্রবাহিত করে দিয়েছেন যে, এক রাতে ষোল হাত পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে আল্লাহ মিসরবাসী থেকে সে কুপ্রথা চিরতরে বন্ধ করে দেন।

ফোরাত ঃ বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্ত হলো এর উৎপত্তিস্থল। সেখান থেকে মালতিয়ার নিকট দিয়ে অতিক্রম করে শমীশাত ও বয়রা হয়ে তারপর পূর্ব দিকে মোড় নিয়ে বালেস ও জা'বার কেল্লায় চলে গেছে। তারপর রিক্কা, রহ্বা, 'আনা, হায়ত ও কূফা হয়ে ইরাকের দিকে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। এ নদীটির অনেক প্রসিদ্ধ উপনদী, শাখা নদী রয়েছে।

সায়হান (আমু দরিয়া) ঃ একে সায়হুনও বলা হয়। বাইজানটাইন এলাকা থেকে এর উৎপত্তি। উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এর প্রবাহ। জায়হানের পশ্চিমে এর অবস্থান এবং আকারে তারচেয়ে ছোট। যে ভূখণ্ডে এর অবস্থান, বর্তমানে তা সীস নামে পরিচিত। ইসলামী রাজত্বের প্রথমে তা মুসলমানদের হাতে ছিল। তারপর ফাতেমীগণ যখন মিসরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন এবং সিরিয়া ও তার আশপাশের অধিকার লাভ করেন, তখন তারা তাকে শত্রুদের থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে তিনশ' হিজরীর গোড়ার দিকে আর্মেনিয়ার অধিবাসী তাকফূর এ সীস নগরী দখল করে নেয়। এখন পর্যন্ত তা তাদের দখলেই রয়েছে। আল্লাহর নিকট আমাদের প্রার্থনা, যেন আপন ক্ষমতাবলে তিনি আবার আমাদের হাতে তা ফিরিয়ে দেন। তারপর সায়হান ও জায়হান উযনার নিকট মিলিত হয়ে একই স্রোতধারায় পরিণত হয়েছে। অবশেষে আরাস ও তার সূস-এর মধ্যবর্তী স্থানে তা সাগরে পতিত হয়েছে।

জায়হান (শির দরিয়া) ঃ একে জায়হুনও বলা হয়, সাধারণ্যে এর নাম হলো জাহান। এর উৎস হলো বাইজানটাইন এলাকা এবং সীস নগরীতে তা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এটি আকারেও প্রায় ফোরাতের সমান। তারপর একটি সায়হান উযনার নিকট মিলিত হয়ে দুটো এক স্রোতধারায় পরিণত হয়েছে। আয়াস ও তারসূস-এর মধ্যবর্তী স্থানে সাগরে গিয়ে পড়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পরিচ্ছেদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ . كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى . يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ . وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا . وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ - اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ . وَفِى الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ فِى الْاُكُلِ . اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ .

অর্থাৎ – আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত— তোমরা তা দেখতে পাও। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেন; প্রত্যেক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করতে পার।

তিনি ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখণ্ড তাতে আঙ্গুর বাগান, শস্য ক্ষেত্র, একাধিক শিরবিশিষ্ট অথবা এক শিরবিশিষ্ট খেজুর গাছ– সিঞ্চিত একই পানিতে এবং ফল হিসেবে এগুলোর কতক কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন। (১৩ ঃ ২-৪)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً . فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ . مَاكَانَ لَكُمْ اَنْ تُنْۢبِتُوْا شَجَرَهَا . ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ . بَلْ هُمْ

قَوْمٌ يَعْدِلُوْنَ . أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَا أَنْهَارًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا . ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ . بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ– বরং তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ থেকে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; তারপর আমি তা দিয়ে মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার গাছপালা উদ্গত করবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য-বিচ্যুত হয়।

বরং তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বাসোপযোগী এবং তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দু' সমুদ্রের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়, আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি? তবুও তাদের অনেকেই জানে না। (২৭ ঃ ৬০-৬১)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَالَّذِىْ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ . يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ . إِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ . وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ . وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ . إِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ .

অর্থাৎ—তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন; তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশুচারণ করে থাক। তোমাদের জন্য তিনি তা দিয়ে জন্মান শস্য, যায়তুন, খেজুর গাছ, আঙ্গুর সব ধরনের ফল-ফলারি। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিন, সূর্য এবং চন্দ্র আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই বিধানে। অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (১৬ ঃ ১০-১২)

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন, যা তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন, যেমন ঃ পাহাড়-পর্বত, গাছ-গাছড়া, ফলমূল, নরম ও শক্ত ভূমি এবং জলে-স্থলে সৃষ্ট নানা প্রকার জড়পদার্থ ও প্রাণীকুল, যা তাঁর মাহাত্ম্য ও কুদরত, হিকমত ও রহমতের প্রমাণ বহন করে, আবার সাথে সাথে সৃষ্টি করেছেন ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকল প্রাণীর জীবিকা। দিনে রাতে, শীতে গ্রীষ্মে ও সকাল সন্ধ্যায় তারা যাঁর মুখাপেক্ষী।

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا . كُلٌّ فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ .

অর্থাৎ- ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্রই। তিনি তাদের স্থায়ী-অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সবই আছে। (১১ ঃ ৬)

হাফিজ আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে,

خلق الله ألف أمة منها ستمائة فى البحر واربعمائة فى البر وأول شيئ يهلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلك تتابعت مثل النظام اذ قطع سلكه .

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা এক হাজারটি প্রজাতি সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে ছ'শ হলো জলভাগে আর চারশ স্থল ভাগে। আর এ প্রজাতিসমূহের যেটি সর্বপ্রথম ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তা হলো পঙ্গপাল। পঙ্গপাল ধ্বংস হয়ে গেলে অপরাপর প্রজাতি মালার সূতা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো যেভাবে পর পর পড়তে থাকে ঠিক সেভাবে একের পর এক ধ্বংস হতে শুরু করবে।

এ হাদীসের সনদে উল্লেখিত একজন রাবী অত্যন্ত দুর্বল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَيْئٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ .

ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন কোন পাখি উড়ে না, যা তোমাদের মত একটি উম্মত নয়। কিতাবে কোন কিছুই আমি বাদ দেইনি; তারপর তাদের প্রতিপালকের দিকে তাদের সকলকেই একত্র করা হবে। (৬ ঃ ৩৮)

আকাশসমূহ ও তন্মধ্যস্থ নিদর্শনাবলীর সৃষ্টি সম্পর্কে আলোচনা

উপরে আমরা একথা বলে এসেছি যে, পৃথিবী সৃষ্টি আকাশ সৃষ্টির আগে হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ .

অর্থাৎ- তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে সাত আকাশে বিন্যস্ত করেন; তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (২ ঃ ২৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ أَنْدَادًا . ذَالِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ . وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَا أَقْوَاتَهَا فِىْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ . سَوَاءً لِّلسَّائِلِيْنَ . ثُمَّ اسْتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ

وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا . قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِيْنَ . فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحٰى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا . وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا . ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ .

অর্থাৎ–বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি তো জগতসমূহের প্রতিপালক!

তিনি স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা ভূপৃষ্ঠে এবং তাতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চার দিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমভাবে যাচনাকারীদের জন্য। তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন। যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ, তারপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা আসলাম অনুগত হয়ে।

তারপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দু'দিনে সাত আকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করলেন, এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (৪১ ঃ ৯-১২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا . رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا . وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا . وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا .

অর্থাৎ- তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা নির্মাণ করেছেন; তিনিই একে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

তিনি রাতকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক; এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন। (৭৯ ঃ ২৭-৩০)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا . وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ . الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ . ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ . وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيَاطِيْنِ . وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ .

অর্থাৎ– মহা মহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত; তিনি সর্ববিষয়ে শক্তিমান। যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য– কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সাত আকাশ। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; আবার তাকিয়ে দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?

তারপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফিরাও, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমাদের দিকে ফিরে আসবে। আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। (৬৭ ঃ ১-৫)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا

অর্থাৎ– আর আমি নির্মাণ করেছি তোমাদের ঊর্ধ্বদেশে সুস্থিত সাত আকাশ এবং সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ। (৭৮ ঃ ১২-১৩)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا .

অর্থাৎ– তোমরা কি লক্ষ্য করনি? আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সাত স্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী? এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে। (৭১ ঃ ১৫-১৬)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْا. اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ. وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْئٍ عِلْمًا .

অর্থাৎ– আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন সপ্ত আকাশ এবং পৃথিবীও। তাদের অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে নেমে আসে তাঁর নির্দেশ; ফলে তোমরা বুঝতে পার যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান এবং জ্ঞানে আল্লাহ সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন। (৬৫ ঃ ১২)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا. وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا .

অর্থাৎ- কত মহান তিনি যিনি নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন রাশিচক্র এবং তাতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র এবং যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিন পরস্পরের অনুগামীরূপে। (২৫ ঃ ৬১-৬২)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ. لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ.

অর্থাৎ– আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে। ফলে তারা ঊর্ধ্বজগতের কিছু শুনতে পায় না এবং তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক থেকে বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পিছু ধাওয়া করে। (৩৭ : ৬-১০)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ .

অর্থাৎ–আকাশে আমি গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে করেছি সুশোভিত দর্শকদের জন্য; প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি তাকে রক্ষা করে থাকি। আর কেউ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে তার পশ্চাদ্ধাবন করে প্রদীপ্ত শিখা। (১৫ : ১৬-১৮)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَّإِنَّا لَمُوسِعُونَ .

অর্থাৎ-আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী। (৫১ : ৪৭)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَّهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ . وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَّسْبَحُونَ .

অর্থাৎ– এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ কিন্তু তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সাঁতার কাটে। (২১ : ৩২-৩)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُّظْلِمُونَ. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَّسْبَحُونَ.

অর্থাৎ– তাদের জন্য এক নিদর্শন রাত্রি, তা থেকে আমি দিবালোক অপসারিত করি, সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এবং সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল, অবশেষে তা শুষ্ক বক্র পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে।

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষ পথে সাঁতার কাটে। (৩৬ ঃ ৩৭-৪০)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا . وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا . ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ . وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِيْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ–তিনিই ঊষার উন্মেষ ঘটান, তিনিই বিশ্রামের জন্য রাত্রি এবং গণনার জন্য সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন; এসবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিরূপণ। তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যেন তা দ্বারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথ পাও; জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি। (৬ ঃ ৯৬-৯৭)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ-তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছ'দিনে সৃষ্টি করেন; তারপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তারই আজ্ঞাধীন, তা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। জেনে রেখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিমময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্। (৭ ঃ ৫৪)

উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারে প্রচুর আয়াত রয়েছে। এই তাফসীরে আমরা তার প্রতিটির উপর আলোকপাত করেছি। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশসমূহ সৃষ্টি, তার বিশাল ও উচ্চতা সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করছেন, আরো সংবাদ দিচ্ছেন যে, তা যারপর নাই রূপ ও সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত। যেমন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ অর্থাৎ- শপথ! সুষমামণ্ডিত আকৃতি বিশিষ্ট আকাশের।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ . ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ .

অর্থাৎ– আবার তাকিয়ে দেখ, (দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে) কোন ক্রটি পাও কি? তারপর তুমি বার বার দৃষ্টি ফিরাও, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।

অর্থাৎ— আকাশের সৃষ্টিতে কোন প্রকার ক্রটি কিংবা খুঁত দেখার ব্যাপারে তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে এবং সে দৃষ্টি এতই দুর্বল যে, দেখতে দেখতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে গেলেও তাতে সে কোন ক্রটি বা খুঁত খুঁজে বের করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অত্যন্ত শক্তভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং তার দিগন্তকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সুভোশিত করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ. অর্থাৎ– শপথ গ্রহ নক্ষত্র বিশিষ্ট আকাশের। (৮৫ ঃ ১)

اَلْبُرُوْجُ অর্থ اَلنُّجُوْمُ অর্থাৎ গ্রহ-নক্ষত্র। কেউ কেউ বলেছেন اَلْبُرُوْجُ অর্থ প্রহরার স্থানসমূহ, যেখান থেকে চুরি করে শ্রবণকারীর প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়। এ দু'টি অভিমতের মাঝে কোন বিরোধ নেই। এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِيْنَ. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ.

অর্থাৎ– আকাশে আমি গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে করেছি সুশোভিত দর্শকদের জন্য; প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি তাকে রক্ষা করে থাকি। (১৫ ঃ ১৬-১৭)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা একথা ব্যক্ত করেছেন যে, তিনি আকাশের দৃশ্যকে স্থির ও গতিশীল গ্রহরাজি দ্বারা সুশোভিত করেছেন। যেমন ঃ সূর্য, চন্দ্র ও উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা এবং তিনি তার সীমান্তকে শয়তানের অনুপ্রবেশ থেকে সংরক্ষণ করেছেন। আর এক অর্থে এও এক প্রকার শোভা। এ প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন ঃ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ.

অর্থাৎ– আর আমি তাকে প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে রক্ষা করেছি।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ. وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ. لاَ يَسَّمَّعُوْنَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى.

অর্থাৎ– আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে। ফলে তারা উর্ধ্বজগতের কিছু শুনতে পায় না। (৩৭ ঃ ৬-৯)

ইমাম বুখারী (র) সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়ে বলেছেন ঃ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) বলেন, এ তিন নক্ষত্রকে আল্লাহ্ তা'আলা আকাশের শোভা, শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং পথের দিশা লাভের চিহ্নরূপে সৃষ্টি করেছেন। কেউ এর ভিন্ন ব্যাখ্যা করলে সে ভুল করবে, নিজের ভাগ্য নষ্ট করবে এবং যে বিষয়ে তার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে পণ্ডশ্রম করবে। কাতাদা (র)-এর এ বক্তব্য নিচের আয়াত দু'টোতে সুস্পষ্ট বিবৃত হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ .

অর্থাৎ– নিকটবর্তী আকাশকে আমি প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ। (৬৭ ঃ ৫)

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ .

অর্থাৎ– তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন যেন তদ্দ্বারা স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারে তোমরা পথের দিশা পাও। (৬ ঃ ৯৭)

অতএব, যদি কেউ এ তিনটির বাইরে এর অন্য কোন মর্ম বের করার চেষ্টা করে তাহলে সে মারাত্মক ভুল করবে। যেমন এগুলোর চলাচল ও একটির সঙ্গে আরেকটির মিলন ঘটলে কী হবে সে জ্ঞান আহরণ করা এবং এ বিশ্বাস করা যে, এগুলো পৃথিবীতে কোন অঘটন ঘটার প্রমাণ দেয়। এ সংক্রান্তে তাদের অধিকাংশ বক্তব্যই ভিত্তিহীন, মিথ্যা ধারণা ও অবাস্তব দাবি।

আবার আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি স্তরে স্তরে অর্থাৎ একটির উপর একটি করে সাত আকাশ সৃষ্ট করেছেন কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে যে, সেগুলো কি পরস্পর মিশ্রিত নাকি বিচ্ছিন্ন, মধ্যে ফাঁকা রয়েছে। তবে দ্বিতীয় অভিমতটিই সঠিক। তার প্রমাণ পার্বত্য ছাগল اعوال। সংক্রান্ত হাদীসে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আহনাফ সূত্রে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমায়রার হাদীস যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اتدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله اعلم قال بينهما مسيرة خمسمأة عام ومن كل سماء إلى سماء خمسمأة سنة وكثف كل سماء خمسمأة سنة .

অর্থাৎ– তোমরা কি জান যে, আকাশ ও পৃথিবীর মাঝে ব্যবধান কতটুকু? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সম্যক অবহিত। তিনি বললেন ঃ উভয়ের মধ্যে পাঁচশ' বছরের দূরত্ব এবং এক আকাশ থেকে আরেক আকাশ পর্যন্ত দূরত্ব পাঁচশ বছর আর প্রত্যেক আকাশের স্থুলত্ব হলো পাঁচশ বছর।

ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, ইবন মাজাহ ও তিরিমিযী (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে মি'রাজ সংক্রান্ত হাদীস আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, 'এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিকটবর্তী আকাশে আদম (আ)-কে পান, তখন জিবরাঈল (আ) তাঁকে বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম (আ)। ফলে তিনি তাঁকে সালাম করেন এবং তিনি সালামের জবাব দেন ও বলেন, مرحبا واهلايابني نعم الإبن انت (মারহাবা স্বাগতম হে আমার পুত্র, আপনি কতই না উত্তম পুত্র!) আনাস (রা) এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আরোহণ ও এর কথা উল্লেখ করেন, তা আকাশসমূহের মধ্যে বিস্তর ব্যবধানের প্রমাণ বহন করে। আবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজেও বলেছেন ঃ

ثم عرج بنا حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح فقيل من هذا.

অর্থাৎ– 'তারপর সে (বোরাক) আমাদেরকে নিয়ে উপরে আরোহণ করে। এমনকি আমরা দ্বিতীয় আকাশে এসে উপনীত হই। তিনি (জিবরাঈল) দরজা খুলতে বললে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইনি কে? এ হাদীস আমাদের বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন হায্ম, ইবনুল মুনীর ও আবুল ফায়জ ইবনুল জাওযী (র) প্রমুখ এ ব্যাপারে আলিমগণের ঐকমত্যের কথা বর্ণনা করেছেন যে, আকাশমণ্ডলী হলো একটি গোলাকার বল স্বরূপ। আল্লাহর বাণী كُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ (প্রত্যেকে আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ করে) এ আয়াত দ্বারা তার সপক্ষে প্রমাণ দেয়া হয়েছে।

হাসান (র) বলেন, يَسْبَحُوْنَ অর্থ يَدُوْرُوْنَ অর্থাৎ চক্রাকারে ঘুরে। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, প্রতিটি চক্রে চরকার ন্যায় বৃত্ত আছে। আলিমগণ বলেন, প্রতি রাতে পশ্চিম আকাশে সূর্যের অস্ত যাওয়া এবং শেষে পূর্ব আকাশে আবার উদয় হওয়াও এর প্রমাণ বহন করে। যেমন উমাইয়া ইবন আবুস্সাল্ত বলেন ঃ

والشمس تطلع كل آخر ليلة – حمراء مطلع لونها متورد

تأبى فلا تبدو النا فى رسلها – إلا معذبة وإلا تجلد

অর্থাৎ– সূর্য প্রতি রাতের শেষে লাল হয়ে উদয় হয়। তার উদয় স্থলের রঙ হলো গোলাপী। আমাদের জন্য আত্মপ্রকাশ করতে সূর্য ইতস্তত করে। অবশেষে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে শাস্তিদানকারী অথবা কশাঘাতকারী রূপে।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সূর্যাস্তের সময় আমাকে বললেন ঃ তুমি কি জান যে, সূর্য কোথায় যায়? বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সম্যক অবগত। তিনি বললেন ঃ সূর্য গিয়ে আরশের নিচে সিজদায় পড়ে যায়। তারপর অনুমতি প্রার্থনা করলে তাকে অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু একটি সময় এমন আসবে, যখন সূর্য সিজদা করবে কিন্তু তা কবূল হবে না এবং সে অনুমতি প্রার্থনা করবে কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে, যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও, ফলে সে পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে। وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا الخ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা এ কথাটিই বলেছেন।

এ হলো সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (র)-এর ভাষ্য। কিতাবুত তাফসীরেও তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন; আবার তাওহীদ অধ্যায়ে আমাশ-এর হাদীস থেকেও তা বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাঊদ (র) হাদীসটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

উপরে আমরা আকাশসমূহের চক্রাকারে আবর্তিত হওয়ার ব্যাপারে যা বলে এসেছি, এ হাদীসটি তার পরিপন্থী নয় এবং হাদীসটিতে আরশের গোলাকার হওয়ারও প্রমাণ মিলে না। যেমন কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন। ইতিপূর্বে আমরা তাদের বক্তব্য ভুল প্রমাণ করে এসেছি। আবার তা এ কথাও প্রমাণ করে না যে, সূর্য আমাদের দিক থেকে গিয়ে আকাশমণ্ডলীর

উপরের দিকে উঠে আরশের নিচে সিজদায় লুটে পড়ে। বরং নিজ কক্ষে সন্তরণ অবস্থাতেই আমাদের দৃষ্টি থেকে অস্তমিত হয়ে যায়। একাধিক তাফসীর বিশেষজ্ঞের মতে, সূর্যের কক্ষ পথ হলো চতুর্থ আকাশ। শরীয়তেও এর বিরোধী কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না বরং বাস্তবে এর পক্ষে প্রমাণ রয়েছে। যেমন সূর্যগ্রহণে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। মোটকথা, সূর্য দুপুর বেলায় আরশের সর্ব নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করলেও, মধ্য রাতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছে—আরশ থেকে দূরবর্তী স্থান, এটাই সূর্যের সিজদার স্থান। এখানে গিয়ে সে পূর্বদিক থেকে উদয় হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে। অনুমতি পেয়ে সে পূর্বদিক থেকে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে নাফরমান বনী আদমের উপর উদিত হওয়াকে অপছন্দ করে। আর এজন্যই উমাইয়া বলেছিল ঃ

تأبى فلا تبد ولنا فى رسلها - الا معذبة والا تجلد .

অর্থাৎ—আমাদের উপর উদয় হতে সূর্য ইতস্তত করে। শেষ পর্যন্ত উদয় হয় শাস্তি দানকারীরূপে বা কশাঘাতকারীরূপে।

তারপর যখন সে সময়টি এসে যাবে, যে সময়ে আল্লাহ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যকে উদিত করতে মনস্থ করবেন; তখন সূর্য তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী সিজদা করবে এবং নিয়ম অনুযায়ী উদিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করবে, কিন্তু তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। ফলে সে আবারো সিজদায় পড়ে অনুমতি চাইবে কিন্তু অনুমতি দেয়া হবে না। পুনরায় সে সিজদা করে অনুমতি প্রার্থনা করবে কিন্তু এবারও তাকে অনুমতি দেয়া হবে না এবং সে রাতটি দীর্ঘ হয়ে যাবে, যেমন আমরা তাফসীরে উল্লেখ করেছি। তারপর সূর্য বলবে, হে আমার রব! প্রভাত তো ঘনিয়ে এলো, অথচ পাড়ি অনেক দূর। জবাবে তাকে বলা হবে, তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও। ফলে সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। তা দেখে তখন সকলে ঈমানদার হয়ে যাবে কিন্তু ইতিপূর্বে যে ব্যক্তি ঈমান আনেনি কিংবা ঈমান এনে কোন কল্যাণ অর্জন করেনি তার সে সময়ের ঈমান কোন কাজে আসবে না। আলিমগণ وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا এর এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার আদেশ প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সূর্য এভাবেই চলতে থাকবে।

কেউ কেউ বলেন, مستقروها বলতে আরশের নিচে সূর্যের সিজদার স্থানকেই বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে, مستقرها- অর্থ منتهى অর্থাৎ সূর্যের সর্বশেষ গন্তব্যস্থল যা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا তিলাওয়াত করে এর ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ সূর্য অবিরাম ভ্রমণ করে কখনো ক্ষান্ত হয় না। এ অর্থে সূর্য চলন্ত অবস্থায়ই সিজদা করে নেয়। আর এ জন্য আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ .

অর্থাৎ- সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (৩৬ ঃ ৪০)

অর্থাৎ – সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না। ফলে সে নিজ রাজ্যেই উদিত হয় আর চন্দ্রও সূর্যকে ধরতে পারে না। রাত দিনকে অতিক্রম করতে পারে না। অর্থাৎ রাত এমন গতিতে অতিক্রম করে না যে, দিনকে হটে গিয়ে তাকে স্থান করে দিতে হয়। বরং নিয়ম হলো, দিন চলে গেলে তার অনুগামীরূপে তার পেছনে রাতের আগমন ঘটে। যেমন অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعٰلَمِينَ .

অর্থাৎ– তিনি দিবসকে রাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে তাদের একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি যা তাঁরই আজ্ঞাধীন, তা তিনি সৃষ্টি করেছেন। জেনে রাখ, সৃজন ও আদেশ তাঁরই; মহিমময় বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্। (৭ ঃ ৫৪)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَّذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوْرًا .

অর্থাৎ— এবং যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায় তাদের জন্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামী রূপে। (২৫ ঃ ৬২)

অর্থাৎ রাত ও দিনকে তিনি এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, একটির পর অপরটি পর্যায়ক্রমে আগমন করে থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

إذا اقبل الليل من ههنا وادبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم .

অর্থাৎ-একদিকে রাত ঘনিয়ে এলে অপরদিকে দিনের পরিসমাপ্তি ঘটলে এবং সূর্য ডুবে গেলে রোযাদার যেন ইফতার করে নেয়।

মোটকথা, সময় রাত ও দিন এ দু'ভাগে বিভক্ত। এ দু'য়ের মাঝে অন্য কিছু নেই। আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى .

আল্লাহ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন। তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকে বিচরণ করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। (৩১ ঃ ২৯)

অর্থাৎ রাত ও দিনের একটির কিছু অংশকে তিনি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন অর্থাৎ একটির দীর্ঘায়তন থেকে কিছু নিয়ে অপরটি ক্ষুদ্রায়তনে ঢুকিয়ে দেন। ফলে দু'টো সমান সমান হয়ে যায়। যেমন বসন্তকালের প্রথম দিকে হয়ে থাকে যে, এর আগে রাত থাকে দীর্ঘ আর দিন থাকে খাটো। তারপর ধীরে ধীরে রাত হ্রাস পেতে থাকে আর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে এক সময় উভয়ে সমান হয়ে যায়। তাহলো বসন্তের প্রথম অংশ। তারপর দিন দীর্ঘ ও রাত খাটো হতে থাকে। এভাবে পুনরায় হেমন্তের শুরুতে উভয়ই সমান হয়ে যায়। তারপর হেমন্তের শেষ পর্যন্ত রাত বৃদ্ধি পেতে এবং দিন হ্রাস পেতে থাকে। তারপর একটু একটু করে দিন প্রাধান্য লাভ করতে থাকে এবং রাত ক্রমে

ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে। এভাবে বসন্তের শুরুতে এসে রাত-দিন দু'টো সমান হয়ে যায়। আর প্রতি বছরই এরূপ চলতে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

এবং তাঁরই অধিকারে রাত ও দিনের পরিবর্তন । (২৩ ঃ ৮০)

অর্থাৎ এ সব কিছু আল্লাহরই হাতে। তিনি এমন এক শাসক, যাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা কিংবা যাকে বাধা প্রদান করা যায় না। এ জন্যই তিনি আকাশসমূহ, নক্ষত্ররাজি ও রাত-দিনের আলোচনার সময় আয়াতের শেষে বলেছেন ঃ ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ অর্থাৎ-এসবই পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণ। (৬ ঃ ৯৬)

اَلْعَزِيْزُ। অর্থ সবকিছুর উপর যিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং সবই যাঁর অনুগত। ফলে তাঁকে ঠেকানো যায় না, পরাস্ত করা যায় না। আর اَلْعَلِيْمُ। অর্থ যিনি সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ। ফলে সব কিছুকে তিনি যথারীতি একটি অপরিবর্তনীয় ও অলংঘনীয় নিয়মে নিয়ন্ত্রণ করেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

قال الله يوذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدى الأمر. اقلب الليل والنهار.

অর্থাৎ—আল্লাহ বলেন, আদমের সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়। তারা সময়কে গালাগাল করে। অথচ আমিই সময়, আমার হাতেই সব ক্ষমতা। রাত ও দিনকে আমিই আবর্তিত করে থাকি।

অন্য বর্ণনায় আছে ঃ فأنا الدهر اقلب ليله ونهاره

অর্থাৎ আমিই কাল। তার রাত ও দিনকে আমিই আবর্তিত করে থাকি।

ইমাম শাফেঈ ও আবূ উবায়দ কাসিম (র) প্রমুখ আলিম يسب الدهر এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ মানুষ বলে থাকে যে, কাল আমাদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করেছে কিংবা বলে যে, হায় কালের করাল গ্রাস! সে আমাদের সন্তানদেরকে ইয়াতীম বানিয়ে দিল, নারীদেরকে বিধবা করল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وانا الدهر অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে আমিই সে কাল যাকে উদ্দেশ করে মানুষ এসব বলে থাকে। কেননা কালের প্রতি আরোপিত কর্মকাণ্ডের কর্তা তিনিই; আর কাল হলো তাঁরই সৃষ্ট। আসলে যা ঘটেছে আল্লাহই তা ঘটিয়েছেন। সুতরাং সে কর্তাকে গাল দিচ্ছে আর ধারণা করছে যে, এ সব কালেরই কাণ্ড! কর্তা মূলত আল্লাহ যিনি সবকিছুর স্রষ্টা ও সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

وانا الدهر بيدى الأمر اقلب ليله ونهاره আমিই কাল। আমার হাতেই সব কিছু। তাঁর রাত ও দিবসকে আমিই পরিবর্তন করি।

কুরআনে করীমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ . بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

অর্থাৎ—বল, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও; যাকে ইচ্ছা সম্মান দাও, আর যাকে ইচ্ছা তুমি হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

তুমিই রাতকে দিনে পরিণত কর এবং দিনকে রাতে পরিণত কর; তুমিই মৃত থেকে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটাও, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান কর। (৩ ঃ ২৬-২৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ . مَاخَلَقَ اللّٰهُ ذَالِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ. يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ. إِنَّ فِى اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَّقُوْنَ .

অর্থাৎ—তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা সাল গণনা ও হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এটা নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি এসব নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করেন। দিন ও রাতের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা সৃষ্টি করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে মুত্তাকী সম্প্রদায়ের জন্য। (১০ ঃ ৫-৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আলো, আকার-আকৃতি, সময় ও চলাচলের ক্ষেত্রে সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে ব্যবধান করেছেন। সূর্যের কিরণকে করেছেন তেজস্কর জ্বলন্ত প্রমাণ ও দীপ্ত আলো আর চন্দ্রকে বানিয়েছেন নূর অর্থাৎ জ্বলন্ত সূর্যের প্রমাণের তুলনায় নিষ্প্রভ এবং তার আলো সূর্যের আলো থেকে প্রাপ্ত।

আবার তিনি চন্দ্রের মনযিলসমূহও নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ চন্দ্র সূর্যের নিকটে থাকার কারণে এবং উভয়ের মুখোমুখিতা কম হওয়ার ফলে মাসের প্রথম রাতে চন্দ্র দুর্বল ও স্বল্প আলোকময় হয়ে উদিত হয়। চন্দ্রের আলো তার সূর্যের মুখোমুখিতা অনুপাতে হয়ে থাকে। তাই দ্বিতীয় রাতে চন্দ্র প্রথম রাতের তুলনায় সূর্যের দ্বিগুণ দূরবর্তী হওয়ার কারণে তার আলোও প্রথম রাতের দ্বিগুণ হয়ে যায়। তারপর চন্দ্র সূর্যের যত দূরে আসতে থাকে তার আলোও তত বাড়তে থাকে। এভাবে পূর্ব আকাশে উভয়ের মুখোমুখি হওয়ার রাতে চন্দ্রের আলো পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর তাহলো মাসের চৌদ্দ তারিখের রাত। তারপরে অপরদিকে চন্দ্র সূর্যের নিকটে চলে আসার কারণে মাসের শেষ পর্যন্ত তা হ্রাস পেতে থাকে। এভাবে এক পর্যায়ে তা অদৃশ্য হয়ে

দ্বিতীয় মাসের শুরুতে আবার পূর্বের ন্যায় উদিত হয়। এভাবে চন্দ্র দ্বারা মাস ও বছরের এবং সূর্য দ্বারা রাত ও দিনের পরিচয় পাওয়া যায়। এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ .

অর্থাৎ—তিনিই সূর্যকে তেজস্কর এবং চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তার মন্যিলসমূহ নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা সাল গণনা ও হিসাব জানতে পার। (১০ ঃ ৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيْلاً.

অর্থাৎ—আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন; রাতের নিদর্শনকে অপসারিত করেছি এবং দিবসের নিদর্শনকে করেছি আলোকপ্রদ যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষসংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পার এবং আমি সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। (১৭ ঃ ১২)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ -

অর্থাৎ—লোকে তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করে; বল, তা মানুষ এবং হজ্জের জন্য সময় নির্ধারক। (২ ঃ ১৮৯)

তাফসীরে আমরা এসব প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। মোটকথা, আকাশে যেসব গ্রহ আছে, তন্মধ্যে কিছু হলো গতিশীল। তাফসীরবিদদের পরিভাষায় এগুলোকে মুতাখায়্যারা বলা হয়। এ এমন এক বিদ্যা যার বেশির ভাগই সঠিক। কিন্তু ইলমুল আহকাম অর্থাৎ এগুলোর অবস্থানের ভিত্তিতে বিধি-নিষেধ আরোপ করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অবাস্তব এবং অমূলক দাবি মাত্র।

গ্রহ মোট সাতটি। (১) চন্দ্র, প্রথম আকাশে (২) বুধ, দ্বিতীয় আকাশে (৩) শুক্র, তৃতীয় আকাশে (৪) সূর্য, চতুর্থ আকাশে (৫) মঙ্গল, পঞ্চম আকাশে (৬) বৃহস্পতি, ষষ্ঠ আকাশে এবং (৭) শনি, সপ্তম আকাশে।

অবশিষ্ট গ্রহগুলো স্থির, গতিহীন। বিশেষজ্ঞদের মতে তা অষ্টম আকাশে অবস্থিত। পরবর্তী যুগের বহু সংখ্যক আলিমের পরিভাষায় যাকে কুরসী বলা হয়। আবার অন্যদের মতে, সবক'টি গ্রহই নিকটবর্তী আকাশে বিরাজমান এবং সেগুলোর একটি অপরটির উপরে অবস্থিত হওয়া বিচিত্র নয়। নিচের দু'টো আয়াত দ্বারা এর সপক্ষে প্রমাণ দেওয়া হয়ে থাকে।

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيَاطِيْنِ.

অর্থাৎ—আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ। (৬৭ : ৫)

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِىْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا. ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.

অর্থাৎ—তারপর তিনি আকাশমণ্ডলীকে দু'দিনে সাত আকাশে পরিণত করেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করেন এবং আমি প্রদীপমালা দ্বারা আকাশকে সুশোভিত ও সুরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (৪১ : ১২)

এ আয়াতদ্বয়ে সবক'টি আকাশের মধ্যে শুধুমাত্র নিকটবর্তী আকাশকেই নক্ষত্র শোভিত বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এর অর্থ যদি এই হয় যে, নক্ষত্রসমূহকে নিকটবর্তী আকাশে গেঁথে রাখা হয়েছে; তাহলে কোন কথা নেই। অন্যথায় ভিন্নমত পোষণকারীদের অভিমত সঠিক হওয়ায় কোন বাধা নেই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সাত আকাশ বরং অষ্টম আকাশও তাদের মধ্যস্থিত গতিহীন ও গতিশীল গ্রহসমূহসহ পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘুরে বেড়ায়। চন্দ্র এক মাসে তার কক্ষপথ অতিক্রম করে এবং সূর্য তার কক্ষপথ তথা চতুর্থ আকাশ অতিক্রম করে এক বছরে।

সুতরাং দু'গতির মাঝে যখন কোন তারতম্য নেই এবং উভয়ের গতিই যখন সমান তাই প্রমাণিত হয় যে, চতুর্থ আকাশের পরিমাপ প্রথম আকাশের পরিমাপের চারগুণ। আর শনিগ্রহ ত্রিশ বছরে একবার তার কক্ষপথ সপ্তম আকাশ অতিক্রম করে। এ হিসেবে সপ্তম আকাশ প্রথম আকাশের তিনশ' ষাট গুণ বলে প্রমাণিত হয়।

বিশেষজ্ঞগণ এসব নক্ষত্রের আকার ও গতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এমনকি তাঁরা ইলমুল আহকামের পর্যন্ত শরণাপন্ন হয়েছেন। ঈসা (আ)-এর বহু যুগ আগে সিরিয়ায় যে গ্রীক সম্প্রদায়ের লোকজন বসবাস করত, এ বিষয়ে তাদের বিশদ বক্তব্য রয়েছে। তারাই দামেশ্‌ক নগরী নির্মাণ করে তার সাতটি ফটক স্থাপন করে এবং প্রতিটি ফটকের শীর্ষদেশে সাতটি গ্রহের একটি করে প্রতিকৃতি স্থাপন করে সেগুলোর পূজা পার্বণ এবং সেগুলোর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো। একাধিক ঐতিহাসিক এবং আরও অনেকে এসব তথ্য বর্ণনা করেছেন। আস্‌সিররুল মাকতূম ফী মাখাতাজতিশ শামসে ওয়াল কামারে ওয়ান নুজুম (السر المكتوم فى مخاطة الشمس والقمر والنجوم) গ্রন্থের লেখক হাররানের প্রাচীনকালের দার্শনিক মহলের বরাতে এসব উল্লেখ করেছেন। তারা ছিল পৌত্তলিক। তারা সাত গ্রহের পূজা করত। আর তারা সাবেয়ীদেরই একটির অন্তর্ভুক্ত সম্প্রদায়।

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمِنْ اٰيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

অর্থাৎ—তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না চন্দ্রকেও না, সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাকো। (৪১ ঃ ৩৭)

আবার আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ সম্পর্কে বলেছেন যে, সে সুলায়মান (আ)-কে ইয়ামানের অন্তর্গত সাবার রাণী বিলকীস তার বাহিনী সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করতে গিয়ে বলেছিল ঃ

إِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ . وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ . أَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ. اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

অর্থাৎ—আমি এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্ব করছে। তাকে সবকিছু থেকে দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাকে এবং তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে, ফলে তারা সৎপথ পায় না।

নিবৃত্ত করেছে এ জন্য যে, তারা যেন সিজদা না করে আল্লাহকে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা ব্যক্ত কর। আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি মহা আরশের অধিপতি। (২৭ ঃ ২৩-২৬)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ. وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. وَمَنْ يُّهِنِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ. إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ.

অর্থাৎ—তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্কে সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে ও পৃথিবীতে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীব-জন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেকে? আবার অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউই নেই। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা করেন। (২২ ঃ ১৮)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّؤُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلّٰهِ وَهُمْ دَاخِرُوْنَ . وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ

دَابَّةٍ وَّالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ. يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

অর্থাৎ—তারা কি লক্ষ্য করে না আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া দক্ষিণে ও বামে ঢলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয়? আল্লাহকেই সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যত জীব-জন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফেরেশতাগণও; তারা অহংকার করে না। তারা ভয় করে তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের প্রতিপালককে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা করে। (১৬ ঃ ৪৮-৫০)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْأٰصَالِ.

অর্থাৎ—আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল-সন্ধ্যায়। (১৩ ঃ ১৫)

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ. وَإِنْ مِّنْ شَىْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ. إِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا.

অর্থাৎ—সাত আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করে কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না; তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ। (১৭ ঃ ৪৪)

এ প্রসংগে আরো প্রচুর সংখ্যক আয়াত রয়েছে। আর যেহেতু আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে দৃশ্যমান বস্তু নিচয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো গ্রহ-নক্ষত্রাদি আবার এগুলোর মধ্যে দর্শনীয় ও শিক্ষণীয় হিসাবে সেরা হলো সূর্য ও চন্দ্র। সেহেতু ইবরাহীম খলীল (আ)-এর কোনটিই উপাসনার যোগ্য না হওয়ার প্রমাণ পেশ করেছিলেন। নীচের আয়াতে তার বিবরণ রয়েছে ঃ

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ. فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ. فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّىْ. فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِىْ رَبِّىْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّيْنَ. فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَا اَكْبَرُ. فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ. إِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

অর্থাৎ—তারপর রাতের অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, এ আমার প্রতিপালক তারপর যখন তা অস্তমিত হলো, তখন সে বলল, যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।

তারপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বল রূপে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, এ আমার প্রতিপালক। যখন তাও অস্তমিত হলো তখন সে বলল, আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

তারপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, এ আমার প্রতিপালক, এ সর্ববৃহৎ; যখন তাও অস্তমিত হলো, তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক কর, তার সাথে আমার কোন সংশ্রব নেই। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে আমার মুখ ফিরাই যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (৬ ঃ ৭৬-৭৯)

মোটকথা, ইবরাহীম (আ) অকাট্য প্রমাণ দ্বারা পরিষ্কারভাবে একথা বুঝিয়ে দিলেন যে, নক্ষত্ররাজি, চন্দ্র ও সূর্য প্রভৃতি দৃশ্যমান বস্তু নিচয়ের কোনটিই উপাস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। কারণ এর সবটিই সৃষ্ট বস্তু, অন্যের দ্বারা প্রতিপালিত, নিয়ন্ত্রিত এবং চলাচলের ক্ষেত্রে অন্যের আজ্ঞাধীন, যাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে এতটুকু নড়চড় হওয়ার শক্তি কারো নেই। এগুলো প্রতিপালিত, সৃষ্ট ও অন্যের আজ্ঞাধীন হওয়ার এটাই প্রমাণ। আর এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمِنْ اٰيَاتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

অর্থাৎ—তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না। সিজদা কর আল্লাহকে যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করে থাকো। (৪১ ঃ ৩৭)

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবন উমর, ইব্ন আব্বাস (রা) ও আয়েশা (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে সালাতুল কুসুফ (সূর্য গ্রহণের নামায) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته.

অর্থাৎ—"সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনসমূহের দু'টো নিদর্শন। কারো জীবন বা মৃত্যুর কারণে এগুলোতে গ্রহণ লাগে না।"

ইমাম বুখারী (র) সৃষ্টির সূচনা অধ্যায়ে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ الشمس والقمر مكوران يوم القيامة অর্থাৎ-"সূর্য ও চন্দ্র কিয়ামতের দিন নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।"

ইমাম বুখারী (র) এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র)-এর চেয়ে আরো বিস্তারিতভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাহলো ঃ

আবুদল্লাহ ইব্ন দানাজ বলেন, আমি আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমানকে খালিদ ইব্ন আবদুল্লাহ আল-কাসবী-এর আমলে কূফার এ মসজিদে হাসান-এর উপস্থিতিতে বলতে শুনেছি যে, আবূ হুরায়রা (রা) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

ان الشمس والقمر ثوران فى النار يوم القيامة.

অর্থাৎ—"সূর্য ও চন্দ্র কিয়ামতের দিন জাহান্নামে দু'টো ষাঁড় হবে।"

একথা শুনে হাসান (র) বললেন, ওদের কোন্ কর্মফলের দরুন? জবাবে আবূ সালামা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস তোমার নিকট বর্ণনা করছি আর তুমি কি না বলছ ওদের কোন্ কর্মফলের দরুন? তারপর বায্যার (র) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ সূত্র ব্যতীত হাদীসটি বর্ণিত হয়নি। আর আবদুল্লাহ দানাজ আবূ সালামা (রা) থেকে এ হাদীসটি ব্যতীত অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করেননি।

হাফিজ আবূ ইয়া'লা আল-মূসিলী য়াযীদ আর রুকাশী নামক একজন দুর্বল রাবী সূত্রে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

الشمس والقمر ثوران عقيران فى النار.

অর্থাৎ—"সূর্য ও চন্দ্র জাহান্নামে দু'টো ভীত-সন্ত্রস্ত ষাঁড় হবে।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. -এর ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহকে সমুদ্রে ফেলে নিষ্প্রভ করে দেবেন। তারপর আল্লাহ পশ্চিমা বায়ু প্রেরণ করবেন, তা সেগুলোকে আগুনে ইন্ধনরূপে নিক্ষেপ করবে।

এসব বর্ণনা প্রমাণ করে যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর সৃষ্টিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বিশেষ উদ্দেশ্যে এগুলো সৃষ্টি করেছেন। তারপর আবার একদিন এগুলোর ব্যাপারে তাঁর যা ইচ্ছা তাই করবেন। তিনি অকাট্য প্রমাণ ও নিখুঁত হিকমতের অধিকারী। ফলে তাঁর প্রজ্ঞা, হিকমত ও কুদরতের কারণে তিনি যা করেন তাতে কারো কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই এবং তাঁর কর্তৃত্বকে প্রতিরোধ বা প্রতিহত করার ক্ষমতা কারো নেই। ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) তাঁর সীরাত গ্রন্থের শুরুতে যায়দ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফায়ল আকাশ, পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র ইত্যাদি সৃষ্টি সম্পর্কিত যে পংক্তিগুলো উল্লেখ করেছেন তা কতই না সুন্দর। ইব্ন হিশাম বলেন, পংক্তিগুলো উমায়্যা ইব্ন আবুস সালত-এর। পংক্তিগুলো এই ঃ

الى الله اهدى مدحتى وثنائيا – وقولا رضيا لا ينى الدهر باقيا

إلى الملك الاعلى الذى ليس فوقه – اله ولا رب يكون مدانيا

ألا أي تها الإنسان اياك والردى – فإنك لا تخفى من الله فاقيا

واياك لا تجعل مع الله غيره – فإن سبيل الرشد اصبح باديا

حنانيكه ان الجن كانت رجائهم - وانت الهى ربنا ورجيئيا

رضيت بك اللهم ربا فلن ارى - أدينِ الها غيرك الله ثانيا

وانت الذى من فضل من ورحمة - بعثت إلى موسى رسولا مناديا

فقلت له اذهب وهارون فادعوا - الى الله فرعون الذى كان طاغيا

وقولا له أأنت سويت هذه - بلا وتد حتى اطمأنت كما هيا

وقولا له أأنت رفعت هذه - بلا عمدارفق إذابك بانيا

وقولا له أأنت سويت وسطها - منيرا اذاما جنه الليل هاديا

وقولا له من يرسل الشمس غدوة - فيصبح ما مست من الارض ضاحيا

وقولا له من ينبت الحب فى الثرى - فيصبح منه البقل يهتز رابيا

ويخرج منه حبه فى رؤسه - وفى ذالك آيات لمن كان واعيا

وانت بفضل منك نجيت يونسا - وقد بات فى اضعاف حوت لياليا

وإنى لو سبحت باسمك ربنا - لاكثر إلا غفرت خطائيا

فرب العباد ألق سيبا ورحمة - علي وبارك فى بنى وماليا

অর্থাৎ—আমার যাবতীয় প্রশংসা, স্তুতি ও প্রেম গাঁথা অনন্তকালের জন্য আল্লাহর সমীপেই আমি উৎসর্গ করছি, যিনি রাজাধিরাজ যাঁর উপরে কোন উপাস্য এবং যাঁর সমকক্ষ কোন রব নেই।

ওহে মানব জাতি! ধ্বংসের হাত থেকে তুমি বেঁচে থাক। আল্লাহর থেকে কিছুই গোপন রাখার সাধ্য তোমার নেই। আর আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে অংশীদার স্থাপন করা থেকে বেঁচে থাকা তোমার একান্ত প্রয়োজন। হেদায়াতের পথ আজ একেবারেই সুস্পষ্ট।

প্রভো! তোমার রহমতই আমার কাম্য; তুমিই তো আমার উপাস্য।

হে আল্লাহ! তোমাকেই আমি রব বলে গ্রহণ করে নিয়েছি; তোমাকে ছাড়া অপর কারো উপাসনা করতে তুমি আমায় দেখবে না।

তুমি তো সে সত্তা, যিনি আপন দয়া ও করুণায় মূসাকে আহবানকারী রাসূল বানিয়ে প্রেরণ করেছো। আর তাঁকে বলে দিয়েছ হারূনকে নিয়ে তুমি অবাধ্য ফিরআউনের নিকট যাও এবং তাকে আল্লাহর প্রতি আহবান কর। আর তাকে জিজ্ঞেস কর; তুমি কি স্থির করেছ এ পৃথিবীকে কীলক ব্যতীত? তুমিই কি উর্ধ্বে স্থাপন করেছ আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতিরেকে? রাতের আঁধারে পথের দিশারী এ উজ্জ্বল চন্দ্রকে আকাশের মাঝে স্থাপন করেছ কি তুমিই? প্রভাতকালে সূর্যকে

কে প্রেরণ করে, যা উদয় হয়ে পৃথিবীকে করে দেয় আলোকময়? বল, কে মাটির মধ্যে বীজ অংকুরিত করে উৎপন্ন করে তাজা শাক-সবজি ও তরিতরকারি? এতে বহু নিদর্শন রয়েছে তার জন্য যে বুঝতে চায়।

আর তুমি নিজ অনুগ্রহে মুক্তি দিয়েছ ইউনুসকে। অথচ সে মাছের উদরে কাটিয়েছিল বেশ ক'টি রাত।

প্রভো! আমি যদি তোমার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে যাই তা হলে তো তোমার অনেক অনেক মহিমার কথা বলতে হয়, তবে তুমি যদি মাফ করে দাও, তা হলে ভিন্ন কথা!

ওহে মানুষের প্রভু! আমার উপর বর্ষণ কর তুমি তোমার অপার দয়া ও করুণার বারিধারা আর বরকত দাও আমার সন্তান-সন্ততি ও ধন-দৌলতে।

যাহোক, এতটুকু জানার পর আমরা বলতে পারি যে, আকাশে স্থির ও চলমান যেসব নক্ষত্র আছে, তা সবই মাখলুক, আল্লাহ তা'আলা তা সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَاَوْحٰى فِىْ كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظًا. ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ.

অর্থাৎ—এবং তিনি প্রত্যেক আকাশে তার বিধান ব্যক্ত করলেন, এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (৪১ ঃ ১২)

পক্ষান্তরে, হারূত ও মারূতের কাহিনী সম্পর্কে অনেক মুফাস্সির যে কথাটি বলে থাকেন, যুহরা (শুক্রগ্রহ) ছিল এক মহিলা, তার কাছে তারা অসৎ প্রস্তাব দিলে তাঁরা তাকে ইস্মে আজম শিক্ষা দেবে এ শর্তে সে তাতে সম্মত হয়। শর্তমত হারূত ও মারূত তাকে ইসমে আজম শিখিয়ে দিলে তা উচ্চারণ করে সে নক্ষত্র হয়ে আকাশে উঠে যায়। আমার ধারণা, এটা ইসরাঈলীদের মনগড়া কাহিনী। যদিও কা'ব আল-আহবার তা বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর বরাতে পূর্ববর্তী যুগের একদল আলিম বনী ইসরাঈল-এর কাহিনী হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ এবং ইব্ন হিব্বান (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে এ প্রসংগে একটি রিওয়ায়েত করেছেন, আহমদ উমর (রা) সূত্রে নবী করীম (সা) থেকে কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে যে, যুহরাকে (শুক্রগ্রহ) পরমা সুন্দরী এক নারী রূপে হারূত-মারূতের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়।

মহিলাটি তাদের কাছে এলে তারা তাকে প্ররোচিত করে। এভাবে বর্ণনাকারী কাহিনীটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

হাদীসবিদ আবদুর রায্যাক তাঁর তাফসীর অধ্যায়ে কা'ব আল-আহবার (রা) সূত্রে কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন। আর এটিই সর্বাপেক্ষা সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা।

আবার হাকিম (র০ তাঁর মুসতাদরাকে এবং ইব্ন আবূ হাতিম (র) তাঁর তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, সে যুগে এক রমণী

ছিল। মহিলাদের মধ্যে তাঁর রূপ ছিল ঠিক নক্ষত্রকুলে যুহরার রূপের ন্যায়। এ কাহিনী সম্পর্কে বর্ণিত পাঠসমূহের মধ্যে এটিই সর্বোত্তম পাঠ।

ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার (র)-এর হাদীসটিও একইরূপ। তাহলো, রাসূলুল্লাহ (সা) সুহায়ল সম্পর্কে বলেছেন ঃ

كان عشارا ظلوما فمسخه الله شهابا.

অর্থাৎ—"সুহায়ল কর আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত জালেম ছিল। ফলে আল্লাহ তাকে উল্কাপিণ্ডে রূপান্তরিত করে দেন।"

আবূ বকর বায্‌যার (র) এ রিওয়ায়াতের সনদে দু'জন দুর্বল রাবী রয়েছেন বলে উল্লেখ করা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে অন্য কোন সূত্রে বর্ণনাটি না পাওয়ার কারণে এ সূত্রেই বর্ণনাটি উপস্থাপিত করলাম। বলাবাহুল্য যে, এ ধরনের সনদ দ্বারা একদম কিছুই প্রমাণিত হয় না। তাছাড়া তাদের ব্যাপারে সুধারণা রাখলেও আমাদের বলতে হবে যে, এটি বনী ইসরাঈলের কাহিনী। যেমনটি ইবন উমর (রা) ও কা'ব আল-আহবার (রা)-এর বর্ণনা থেকে পূর্বে আমরা বলে এসেছি। এসব তাদের মনগড়া অলীক কাহিনী যার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই।

ছায়াপথ ও রংধনু

আবুল কাসিম তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সম্রাট হিরাক্লিয়াস মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট পত্র লিখেন এবং এ সময় তিনি বলেন যে, যদি তাঁদের অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে নবুওতের শিক্ষার কিছুটাও অবশিষ্ট থাকে তবে অবশ্যই তারা আমাকে আমার প্রশ্নের জবাব দেবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, পত্রে তিনি মু'আবিয়া (রা)-কে ছায়াপথ, রংধনু এবং ঐ ভূখণ্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করেন যাতে স্বল্প সময় ব্যতীত কখনো সূর্য পৌঁছেনি। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, পত্র ও দূত এসে পৌঁছলে মু'আবিয়া (রা) বললেন, এ তো এমন একটি বিষয় যে ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন হবো বলে এ যাবত কখনো আমি কল্পনাও করিনি। কে পারবেন এর জবাব দিতে? বলা হলো, ইব্‌ন আব্বাস (রা) পারবেন। ফলে মু'আবিয়া (রা) হিরাক্লিয়াসের পত্রটি গুটিয়ে ইব্‌ন আব্বাসের নিকট পাঠিয়ে দেন। জবাবে ইব্‌ন আব্বাস (রা) লিখেন ঃ রংধনু হলো, পৃথিবীবাসীর জন্য নিমজ্জন থেকে নিরাপত্তা। ছায়াপথ আকাশের সে দরজা, যার মধ্য দিয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ হবে আর যে ভূখণ্ডে দিনের কিছু সময় ব্যতীত কখনো সূর্য পৌঁছেনি; তাহলো সাগরের সেই অংশ যা দু'ভাগ করে বনী ইসরাঈলদেরকে পার করানো হয়েছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) পর্যন্ত এ হাদীসের সনদটি সহীহ।

তাবারানী বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ "হে মু'আয! তোমাকে আমি কিতাবীদের একটি সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করছি। যখন তুমি আকাশস্থিত ছায়াপথ সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হবে তখন বলে দেবে যে, 'তা আরশের নীচে অবস্থিত একটি সাপের লালা।"

এ হাদীছটি অতিমাত্রায় মুনকার বরং এটা মওযূ বা জাল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এর রাবী ফায্‌ল ইব্‌ন মুখতার হলেন আবূ সাহ্‌ল বসরী। পরে তিনি মিসরে চলে যান। তাঁর সম্পর্কে আবূ

হাতিম রাযী বলেছেন, লোকটি অজ্ঞাত পরিচয়, বাজে কথা বলায় অভ্যস্ত। হাফিজ আবুল ফাত্হ আযদী বলেছেন, লোকটি অতি মাত্রায় মুনকারুল হাদীস। আর ইব্ন আদী (র) বলেছেন, মতন ও সনদ কোন দিক থেকেই তার হাদীস অনুসরণযোগ্য নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّ يُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاۤءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ .

অর্থাৎ— তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী যা ভয় ও ভরসা সঞ্চার করে এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ। বজ্রনির্ঘোষ ও ফেরেশতাগণ সভয়ে তাঁর সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তা দ্বারা আঘাত করেন; তথাপি তারা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, যদিও তিনি মহাশক্তিশালী। (১৩ ঃ ১২-১৩)

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِىْ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاۤءِ مِنْ مَّاۤءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاۤءِ وَالْأَرْضِ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ .

অর্থাৎ— আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে দিন ও রাতের পরিবর্তন, যা মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে আল্লাহ আকাশ থেকে যে বারিবর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তারণে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্য নিদর্শন রয়েছে। (২ ঃ ১৬৪)

ইমাম আহমদ (র) যথাক্রমে ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, ইবরাহীম ইব্ন সা'দ ও সা'দ সূত্রে গিফার গোত্রের জনৈক প্রবীণ ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি ঃ

إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك.

অর্থাৎ— "আল্লাহ মেঘ সৃষ্টি করেন, ফলে তা উত্তমভাবে কথা বলে ও উত্তম হাসি হাসে।"

মূসা ইব্ন উবায়দা ইব্ন সা'দ ইবরাহীম (র) বলেন, 'মেঘের কথা বলা হলো বজ্র আর হাসি হলো বিজলী।' ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম বলেন, আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, البرق। এমন একজন ফেরেশতা, যার চারটি মুখ আছে, মানুষের

মুখ, ষাঁড়ের মুখ, শকুনের মুখ ও সিংহের মুখ। সে তার লেজ নাড়া দিলেই তা থেকে বিজলী সৃষ্টি হয়।

ইমাম আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও বুখারী (র) কিতাবুল আদবে এবং হাকিম তাঁর মুসতাদরাকে হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাহ (র) বর্ণিত হাদীসটি সালিমের পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বজ্রধ্বনি শুনতেন তখন বলতেন ঃ

اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذالك.

অর্থাৎ—'হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি তোমার গযব দ্বারা বধ কর না ও তোমার আযাব দ্বারা ধ্বংস কর না এবং এর আগেই তুমি আমাদেরকে নিরাপত্তা দান কর।'

ইব্‌ন জারীর (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বজ্রের আওয়াজ শুনলে বলতেন ঃ سبحان من يسبح والرعد بحمده . অর্থাৎ—পবিত্র সেই মহান সত্তা, বজ্র যার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে।

আলী (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন ঃ من سبحت له ইব্‌ন 'আব্বাস, আস্‌ওয়াদ ইবন ইয়াযীদ ও তাউস প্রমুখ থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। মালিক আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বজ্রের আওয়ায শুনলে কথা-বার্তা ত্যাগ করে বলতেন ঃ

سبحان من يسبح الرعد بحمده والملئكة من خيفته –

অর্থাৎ— পবিত্র সেই মহান সত্তা, বজ্র ও ফেরেশতাগণ সভয়ে যার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে।

তিনি আরো বলতেন ঃ إن هذا وعيد شديد لأهل الارض

অর্থাৎ— নিশ্চয় এটা পৃথিবীবাসীর জন্য এক কঠোর হুঁশিয়ারি।

ইমাম আহমদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

قال ربكم لوْ أن عبيدى اطاعونى لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما اسمعتهم صوت الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرا.

অর্থাৎ— তোমাদের রব বলেছেন ঃ আমার বান্দারা যদি আমার আনুগত্য করতো, তাহলে আমি তাদের জন্য রাতে বৃষ্টি দিতাম আর দিনে সূর্য উদিত করতাম আর তাদেরকে বজ্রের নিনাদ শুনাতাম না। অতএব, তোমরা আল্লাহর যিকির কর। কারণ যিকিরকারীর উপর তা' আপতিত হয় না।

আমার তাফসীর গ্রন্থে এর বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। প্রশংসা সব আল্লাহরই প্রাপ্য।

ফেরেশতা সৃষ্টি ও তাঁদের গুণাবলীর আলোচনা

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ . لاَ يَسْبِقُوْنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُوْنَ . يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُوْنَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُوْنَ. وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّى إِلَهٌ مِّنْ دُوْنِهِ فَذَالِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ. كَذَالِكَ نَجْزِالظَّالِمِيْنَ .

অর্থাৎ—তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তাঁর সম্মানিত বান্দা। তারা আগে বাড়িয়ে কথা বলে না, তারা তো আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।

তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে যে বলবে, আমিই ইলাহ তিনি ব্যতীত; তাকে আমি প্রতিফল দেব জাহান্নাম; এভাবেই আমি জালিমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (২১ ঃ ২৬-২৯)

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِى الْأَرْضِ. أَلاَ إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ .

অর্থাৎ— আকাশমণ্ডলী ঊর্ধ্বদেশ থেকে ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে; জেনে রেখ, আল্লাহ্, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৪২ ঃ ৫)

اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا. رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْئٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ . رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ اِلَّتِى وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُالْحَكِيْمُ.

অর্থাৎ— যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারদিক ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান

সর্বব্যাপী; অতএব, যারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৪০ ঃ ৭-৮)

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوْا فَالَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُوْنَ.

অর্থাৎ— তারা অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে তারা তো দিনে ও রাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না। (৪১ ঃ ৩৮)

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ. يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَايَفْتُرُوْنَ.

অর্থাৎ—তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে তারা অহংকারবশে তাঁর ইবাদত করা থেকে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিবারাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তারা শৈথিল্য করে না। (২১ ঃ ১৯-২০)

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ.

অর্থাৎ—আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান আছে আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী। (৩৭ ঃ ১৬৪-১৬৬)

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.

অর্থাৎ— আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না। যা আমাদের সামনে ও পেছনে আছে এবং যা এ দু'-এর অন্তর্বর্তী তা তাঁরই এবং তোমার প্রতিপালক ভুলবার নন। (১৯ ঃ ৬৪)

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ. كِرَامًا كَاتِبِيْنَ. يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ.

অর্থাৎ—অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ; সম্মানিত লিপিকারবৃন্দ; তারা জানে তোমরা যা কর। (৮২ ঃ ১০-১২)

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ.

অর্থাৎ— তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (৭৪ ঃ ৩১)

وَالْمَلٰئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

অর্থাৎ— ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রবেশ করবে প্রতিটি দরজা দিয়ে এবং বলবে, তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি; কতই না ভালো এ পরিণাম! (১৩ ঃ ২৩-২৪)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا أُولِىْ أَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ. إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ.

অর্থাৎ— প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই, যিনি বাণীবাহক করেন ফেরেশতাদেরকে যারা দু'-দু তিন-তিন অথবা চার-চার পক্ষ বিশিষ্ট। তিনি তাঁর সৃষ্টি যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। (৩৫ ঃ ১)

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ. وَنُزِّلَ الْمَلٰئِكَةُ تَنْزِيْلًا. اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ نِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا.

অর্থাৎ— যেদিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে, সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময়ের এবং কাফিরদের জন্য সেদিন হবে কঠিন। (২৫ ঃ ২৫, ২৬)

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰئِكَةُ أَوْنَرٰى رَبَّنَا. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِىْ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيْرًا. يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا.

অর্থাৎ— যারা আমার সাক্ষাত কামনা করে না তারা বলে, আমাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয় না কেন ? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন ? তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমালংঘন করেছে গুরুতররূপে। সেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে প্রত্যক্ষ করবে। সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে, রক্ষা কর, রক্ষা কর। (২৫ ঃ ২১-২২)

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ.

অর্থাৎ— যে কেউ আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাগণের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মীকাঈলের শত্রু সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ নিশ্চয় কাফিরদের শত্রু। (২ ঃ ৯৮)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

অর্থাৎ— হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ্ যা আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা-ই করে। (৬৬ ঃ ৬)

ফেরেশতা প্রসঙ্গ অনেক আয়াতেই রয়েছে। সেগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইবাদত ও দৈহিক কাঠামো সৌন্দর্যে, অবয়বের বিশালতায় এবং বিভিন্ন আকৃতি ধারণে পারঙ্গমতায় শক্তির অধিকারী বলে পরিচয় প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ. وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ.

অর্থাৎ— এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের নিকট আসল, তখন তাদের আগমনে সে বিষণ্ন হলো এবং নিজকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল এবং বলল, এ এক নিদারুণ দিন! তার সম্প্রদায় তার নিকট উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসল এবং পূর্ব থেকে তারা কুকর্মে লিপ্ত ছিল। (১১ ঃ ৭৭-৭৮)

তাফসীরের কিতাবে আমি উল্লেখ করেছি, যা একাধিক আলিম বলেছেন যে, ফেরেশতাগণ তাদের সামনে পরীক্ষাস্বরূপ সুদর্শন যুবকের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। অবশেষে লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পরাক্রমশালী শক্তিধররূপে পাকড়াও করেন।

অনুরূপভাবে জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-এর নিকট বিভিন্ন আকৃতিতে আগমন করতেন। কখনো আসতেন দিহয়া ইব্ন খলীফা কালবী (রা)-এর আকৃতিতে, কখনো বা কোন বেদুঈনের রূপে, আবার কখনো তিনি স্বরূপে আগমন করতেন। তাঁর ছ'শ ডানা রয়েছে। প্রতি দু'টি ডানার মধ্যে ঠিক ততটুকু ব্যবধান যতটুকু ব্যবধান পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে। রাসূলুল্লাহ (সা) এ আকৃতিতে তাঁকে দু'বার দেখেছেন। একবার দেখেছেন আসমান থেকে যমীনে অবতরণরত অবস্থায়। আর একবার দেখেছেন জান্নাতুল মাওয়ার নিকটবর্তী সিদরাতুল মুনতাহার কাছে (মি'রাজের রাতে)।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوٰى . ذُوْ مِرَّةٍ. فَاسْتَوٰى . وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى.

অর্থাৎ— তাকে শিক্ষা দান করে শক্তিশালী প্রজ্ঞাসম্পন্ন সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিল, তখন সে ঊর্ধ্ব দিগন্তে, তারপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী। (৫৩ ঃ ৫-৮)

এ আয়াতে যার কথা বলা হয়েছে তিনি হলেন জিবরাঈল (আ) যেমনটি আমরা একাধিক সাহাবা সূত্রে বর্ণনা করেছি। তন্মধ্যে ইব্ন মাসঊদ (রা), আবূ হুরায়রা (রা), আবূ যর (রা) ও আয়েশা (রা) অন্যতম।

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى. فَاَوْحٰي إِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى.

অর্থাৎ— ফলে তাদের মধ্যে দু' ধনুকের ব্যবধান থাকে অথবা তারও কম। তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি যা ওহী করবার তা ওহী করলেন। (৫৩ ঃ ৯-১০)

'তাঁর বান্দার প্রতি' অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি।

তারপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى. عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى. مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى.

অর্থাৎ— নিশ্চয় সে (মুহাম্মদ) তাকে (জিবরাঈল) আরেকবার দেখেছিল প্রান্তবর্তী কুল গাছের নিকট, যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। যখন বৃক্ষটি, যদ্দারা আচ্ছাদিত হওয়ার তদ্দারা ছিল আচ্ছাদিত, তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষচ্যুতও হয়নি। (৫৩ ঃ ১৩-১৭)

সূরা বনী ইস্রাঈলে মি'রাজের হাদীসসমূহে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সিদরাতুল মুন্তাহা সপ্তম আকাশে অবস্থিত। অন্য বর্ণনায় আছে, তা ষষ্ঠ আকাশে। এর অর্থ হচ্ছে সিদরাতুল মুন্তাহার মূল হলো ষষ্ঠ আকাশে আর তার ডাল-পালা হলো সপ্তম আকাশে।

যখন সিদরাতুল মুন্তাহা আল্লাহ তা'আলার আদেশে যা তাকে আচ্ছাদিত করার তা তাকে আচ্ছাদিত করলো— এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, তাকে আচ্ছাদিত করেছে একপাল সোনার পতঙ্গ। কেউ বলেন, নানা প্রকার রং যার অবর্ণনীয়রূপ তাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। কারো কারো মতে, কাকের মত ফেরেশতাগণ তাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। কেউ কেউ বলেন, মহান প্রতিপালকের নূর তাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে- যার অবর্নণীয় সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য বর্ণনাতীত। এ অভিমতগুলোর মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই। কারণ সবগুলো বিষয় একই ক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে।

আমরা আরো উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তারপর আমাকে সিদরাতুল মুন্তাহার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি দেখলাম, তার ফুলগুলো ঠিক পর্বতের চূড়ার ন্যায় বড় বড়। অন্য বর্ণনায় আছে, 'হিজরের পর্বত চূড়ার ন্যায়, আমি আরো দেখতে পেলাম তার পাতাগুলো হাতীর কানের মত।' আরো দেখলাম, তার গোড়া থেকে দু'টো অদৃশ্য নদী এবং দু'টো দৃশ্যমান নদী প্রবাহিত হচ্ছে। অদৃশ্য দু'টো গেছে জান্নাতে আর দৃশ্যমান দু'টো হচ্ছে নীল ও ফোরাত। "পৃথিবী ও তাঁর মধ্যকার সাগর ও নদ-নদী সৃষ্টি" শিরোনামে পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

উক্ত হাদীসে এও আছে যে, তারপর বায়তুল মা'মূরকে আমার সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। লক্ষ্য করলাম, প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাতে প্রবেশ করেন। তারপর আর কখনো তারা সেখানে ফিরে আসে না। নবী করীম (সা) আরো জানান যে, তিনি ইবরাহীম খলীল (আ)-কে বায়তুল মা'মূরে ঠেস দিয়ে বসা অবস্থায় দেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমরা এও বলে এসেছি যে, বায়তুল মা'মূর সপ্তম আকাশে ঠিক তেমনিভাবে অবস্থিত, যেমন পৃথিবীতে কা'বার অবস্থান।

সুফিয়ান ছাওরী, শু'বা ও আবুল আহওয়াস ইব্ন ফাওয়া (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)-কে বায়তুল মা'মূর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, তা আকাশে অবস্থিত যুরাহ্ নামক একটি মসজিদ। কা'বার ঠিক বরাবর উপরে তার অবস্থান। পৃথিবীতে বায়তুল্লাহ্র মর্যাদা যতটুকু আকাশে তার মর্যাদা ঠিক ততটুকু। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাতে সালাত আদায় করেন যাঁরা দ্বিতীয়বার আর কখনো সেখানে আসেন না। ভিন্ন সূত্রেও হযরত আলী (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "বায়তুল মা'মূর আকাশে অবস্থিত। তাকে যুরাহ নামে অভিহিত করা হয়। বায়তুল্লাহ্র ঠিক বরাবর উপরে তার অবস্থান। উপর থেকে পড়ে গেলে তা ঠিক তার উপরই এসে পড়বে। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাতে প্রবেশ করেন। তারপর তাঁরা তা আর কখনো দেখেন না। পৃথিবীতে মক্কা শরীফের মর্যাদা যতটুকু আকাশে তার মর্যাদা ঠিক ততটুকু। আওফী অনুরূপ বর্ণনা ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র), ইকরিমা (রা), রবী ইব্ন আনাস (র) ও সুদ্দী (র) প্রমুখ থেকেও করেছেন।

কাতাদা (র) বলেন, আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন তাঁর সাহাবাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জান, বায়তুল মা'মূর কী ? জবাবে তাঁরা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল-ই ভালো জানেন। তখন তিনি বললেন ঃ "(বায়তুল মা'মূর) কা'বার বরাবর আকাশে অবস্থিত একটি মসজিদ যদি তা উপর থেকে নিচে পড়তো তাহলে কা'বার উপরই পড়তো। প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা তাতে সালাত আদায় করেন। আর কখনো তাঁরা ফিরে আসেন না।

যাহ্হাক ধারণা করেন যে, বায়তুল মা'মূরকে ইবলীস গোত্রীয় একদল ফেরেশতা আবাদ করে থাকেন। এদেরকে জিন বলা হয়ে থাকে। তিনি বলতেন, তার খাদেমরা ঐ গোত্রভুক্ত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

অন্যরা বলেন ঃ প্রতি আকাশে একটি করে ঘর আছে। সংশ্লিষ্ট আকাশের ফেরেশতাগণ তার মধ্যে ইবাদত করে তাকে আবাদ করে রাখেন। পালাক্রমে তারা সেখানে এসে থাকেন যেভাবে পৃথিবীবাসী প্রতি বছর হজ্জ করে এবং সর্বদা উমরা তাওয়াফ ও সালাতের মাধ্যমে বায়তুল্লাহকে আবাদ করে রাখে।

সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্য়া ইব্ন সাঈদ উমাবী তাঁর আল-মাগাযী কিতাবের শুরুতে বলেছেন ঃ আবূ উবায়দ মুজাহিদ এর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, সাত আসমান ও সাত যমীনের মধ্যে হারম শরীফ-এর মর্যাদাকে সমুন্নত করা হয়েছে। এটি চৌদ্দটি গৃহের চতুর্থটি, প্রতি আসমানে একটি এবং প্রতি যমীনে একটি করে সম্মানিত ঘর আছে যার একটি উপর থেকে পতিত হলে তা নিচেরটির উপর গিয়ে পতিত হবে।

হাজ্জাজের মুআয্যিন আবূ সুলায়মান থেকে আ'মাশ ও আবূ মু'আবিয়া সূত্রে সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্য়া বর্ণনা করেন যে, আবূ সুলায়মান বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ

إن الحرم محرم فى السموت السبع مقداره من الارض وإن بيت المقدس مقدس فى السموت السبع مقداره من الأرض-

অর্থাৎ— হারম শরীফ সাত আকাশে বিশেষভাবে সম্মানিত। পৃথিবীতে তার অবস্থান। তার বায়তুল মুকাদ্দাসও সাত আকাশে সম্মানিত। তার অবস্থানও পৃথিবীতে।

যেমন কোন এক কবি বলেন ঃ

إن الذى سمك السماء بنى لها - بيتا دعائعه اشد واطول.

অর্থাৎ— আকাশকে যিনি উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন; তিনি তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেছেন যার স্তম্ভগুলো অত্যন্ত মজবুত ও দীর্ঘ।

আকাশে অবস্থিত ঘরটির নাম হলো, বায়তুল ইয্যাত এবং তার রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতাদের যিনি প্রধান, তার নাম হলো ইসমাঈল। সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রতিদিন বায়তুল মা'মূরে প্রবেশ করেন এবং পরে কোনদিন সেখানে ফিরে আসার সুযোগ পান না। তারা কেবল সপ্তম আকাশেরই অধিবাসী। অন্য আকাশের ফিরিশতাগণের তো প্রশ্নই উঠে না। আর এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ -

অর্থাৎ— তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (৭৪ ঃ ৩১)

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ যর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

'নিশ্চয় আমি এমন অনেক কিছু দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না এবং এমন অনেক কিছু শুনি, যা তোমরা শুনতে পাও না। আকাশ চড় চড় শব্দ করে। আর তার চড় চড় শব্দ করারই কথা। আকাশে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই যাতে কোন ফেরেশতা সিজদায় না পড়ে আছেন। আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে তোমরা অল্প হাসতে ও বেশি কাঁদতে। শয্যায় নারী সম্ভোগ করতে না এবং লোকালয় ত্যাগ করে বিজন প্রান্তরে চলে গিয়ে উচ্চস্বরে আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকতে।'

একথা শুনে আবূ যর (রা) বলে উঠলেন, والله لو ردت أنى شجرة تعضد

অর্থাৎ— আল্লাহর শপথ! আমি খুশি হতাম যদি আমি বৃক্ষ রূপে জন্মগ্রহণ করে কর্তিত হয়ে যেতাম!

ইমাম তিরমিযী ও ইব্‌ন মাজাহ্ (র) ইসরাঈলের হাদীস থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান গরীব বলে মন্তব্য করেছেন। আবার আবূ যর (রা) থেকে মওকূফ সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়ে থাকে।

তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সাত আকাশে কোথাও এক পা, এক বিঘত বা এক করতল পরিমাণ স্থান ফাঁকা নেই। যাতে কোন না কোন ফেরেশতা হয় দাঁড়িয়ে আছেন, কিংবা সিজদায় পড়ে আছেন নতুবা রুকূরত আছেন। তারপর যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তারা সকলে বলবেন, আমরা আপনার ইবাদতের হক আদায় করতে পারিনি। তবে আমরা আপনার সাথে কোন কিছু শরীক সাব্যস্ত করিনি।

এ হাদীসদ্বয় প্রমাণ করে যে, সাত আকাশের এমন কোন স্থান নেই যেখানে কোন কোন ফেরেশতা বিভিন্ন প্রকার ইবাদতে লিপ্ত নন। কেউ সদা দণ্ডায়মান, কেউ সদা সিজদারত আবার কেউবা অন্য কোন ইবাদতে ব্যস্ত আছেন। আল্লাহ তা'আলার আদেশ মতে তাঁরা সর্বদাই তাঁদের ইবাদত, তাসবীহ, যিকির-আযকার ও অন্যান্য আমলে নিযুক্ত রয়েছেন। আবার আল্লাহর নিকট তাদের রয়েছে বিভিন্ন স্তর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مِنَّا اِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ . وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّوْنَ . وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُوْنَ .

অর্থাৎ— আমাদের প্রত্যেকের জন্যই নির্ধারিত স্থান আছে এবং আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান এবং আমরা অবশ্যই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী। (৩৭ ঃ ১৬৪-১৬৬)

অন্য এক হাদীসে নবী করীম (সা) বলেন ঃ ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের নিকট যেভাবে সারিবদ্ধ হয়; তোমরা কি সেভাবে সারিবদ্ধ হতে পার না? সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট কিভাবে সারিবদ্ধ হয়? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেনঃ তাঁরা প্রথম সারি পূর্ণ করে নেয় এবং সারি যথা নিয়মে সোজা করে নেয়।

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেন ঃ

فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملئكة .

অর্থাৎ— তিনভাবে অন্যদের উপর আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে। গোটা পৃথিবীকে আমাদের জন্য মসজিদ এবং তার মাটিকে আমাদের জন্য পাক বানানো হয়েছে। আর আমাদের সারিসমূহকে ফেরেশতাদের সারির মর্যাদা দান করা হয়েছে।

অনুরূপ কিয়ামতের দিনও তাঁরা মহান প্রতিপালকের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

অর্থাৎ—আর যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন এবং সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও। (৮৯ ঃ ২২)

তারপর তাঁরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰئِكَةُ صَفًّا لاَّ يَتَكَلَّمُوْنَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا.

অর্থাৎ— সেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন; সে ব্যতীত অন্যরা কথা বলবে না এবং সে যথার্থ বলবে। (৭৮ ঃ ৩৮)

এখানে اَلرُّوْحُ শব্দ দ্বারা আদম-সন্তান বুঝানো হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (র), হাসান ও কাতাদা (র) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেন اَلرُّوْحُ হলো, ফেরেশতাদের একটি শ্রেণী; আকারে যাঁরা আদম-সন্তানের সাথে সাদৃশ্য রাখেন। ইব্ন আব্বাস (র), মুজাহিদ,

আবূ সালিহ ও আ'মাশ এ কথা বলেছেন। কেউ বলেন, اَلرُّوْحُ হলেন জিবরাঈল (আ)। এ অভিমত শা'বী, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও যিহাক (র)-এর। আবার কেউ বলেন, اَلرُّوْحُ এমন একজন ফেরেশতার নাম, যার অবয়ব গোটা সৃষ্টি জগতের সমান। আলী ইব্‌ন আবূ তালহা ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, اَلرُّوْحُ এমন একজন ফেরেশতা যিনি দৈহিক গঠনে ফেরেশতা জগতে সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্যতম।

ইব্‌ন মাসউদ (রা) সূত্রে ইব্‌ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ رُوْحُ চতুর্থ আকাশে অবস্থান করেন। আকাশসমূহের সবকিছু এবং পাহাড়-পর্বত অপেক্ষাও বৃহৎ। তিনি ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিদিন তিনি বার হাজার তাসবীহ পাঠ করেন। প্রতিটি তাসবীহ থেকে আল্লাহ তা'আলা একজন করে ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। কিয়ামতের দিন একাই তিনি এক সারিতে দণ্ডায়মান হবেন। তবে এ বর্ণনাটি একান্তই গরীব শ্রেণীভুক্ত।

তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, "আল্লাহর এমন একজন ফেরেশতা আছেন, তাঁকে যদি বলা হয় যে, তুমি এক গ্রাসে আকাশ ও পৃথিবীসমূহকে গিলে ফেল; তবে তিনি তা করতে সক্ষম। তার তাসবীহ হলো, سبحانك حيث كنت - এ হাদীসটিও অত্যন্ত গরীব। কোন কোন রিওয়ায়তে হাদীসটি মওকূফ রূপে বর্ণিত।

আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের বিবরণে আমরা জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে উল্লেখ করেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "আরশ বহনকারী আল্লাহর ফেরেশতাদের এক ফেরেশতা সম্পর্কে বলার জন্য আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর কানের লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত সাতশ' বছরের দূরত্ব।" দাঊদ ও ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) তা বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিমের পাঠে আছে পাখির গতির সাতশ' বছর।

জিবরাঈল (আ)-এর পরিচিতি অধ্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى অর্থাৎ—তাঁকে শিক্ষাদান করে শক্তিশালী। (৫৩ ঃ ৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আলিমগণ বলেন, জিবরাঈল (আ) তার প্রবল শক্তি দ্বারা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের বসতিগুলো—যা ছিল সাতটি— তাতে বসবাসকারী লোকজন যারা ছিল প্রায় চার লাখ এবং তাদের পশু-পক্ষী, জীব-জানোয়ার, জমি-জমা, অট্টালিকাদিসহ তাঁর একটি ডানার কোণে তুলে নিয়ে তিনি ঊর্ধ্ব আকাশে পৌঁছে যান। এমনকি ফেরেশতাগণ কুকুরের ঘেউ ঘেউ ও মুরগীর আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পান। তারপর তিনি তাকে উল্টিয়ে উপর দিক নিচে করে দেন। এটাই হলো شَدِيْدُ الْقُوٰى -এর তাৎপর্য। আল্লাহর বাণী ঃ ذُوْمِرَّةٍ অর্থ অপরূপ সুন্দর আকৃতিসম্পন্ন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ নিশ্চয় এ কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা। (৬৯ ঃ ৪০)

رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ অর্থাৎ জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহর দূত করীম— সুদর্শন।

ذِىْ قُوَّةٍ অর্থ প্রবল শক্তিমান ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ অর্থ আরশের মহান অধিপতির নিকটে তাঁর উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। مُطَاعٍ অর্থ ঊর্ধ্ব জগতে তিনি সকলের

অনুকরণীয়। أَمِيْنٌ অর্থ তিনি গুরুত্বপূর্ণ আমানতের অধিকারী। এ জন্যই তিনি আল্লাহ ও নবীগণের মাঝে দূত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, যিনি তাদের উপর সত্য সংবাদ ও ভারসাম্যপূর্ণ শরীয়ত সম্বলিত ওহী নাযিল করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আগমন করতেন। তাঁর নিকট তিনি অবতরণ করতেন বিভিন্ন রূপে। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল (আ)-কে যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন; রাসূলুল্লাহ (সা) সে আকৃতিতে তাঁকে দু'বার দেখেছেন। তাঁর রয়েছে ছ'শ ডানা। যেমন ইমাম বুখারী (র) তাল্ক ইব্ন গান্নাম ও যায়েদা শায়বানী (র) সূত্রে বর্ণনা করেন। যায়েদা শায়বানী (র) বলেন, আমি যির (র)-কে আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى فَأَوْحٰي إِلٰي عَبْدِهِ مَا أَوْحٰى.

সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মুহাম্মদ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে তাঁর ছ'শ ডানাসহ দেখেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে তাঁর নিজ আকৃতিতে দেখেছেন। তার ছ'শ ডানা ছিল। প্রতিটি ডানা দিগন্ত আচ্ছাদিত করে ফেলেছিল। তাঁর ডানা থেকে ঝরে পড়ছিল নানা বর্ণের মুক্তা ও ইয়াকূত। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ই সমধিক অবহিত।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসঊদ (রা) وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰي عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমি জিবরাঈল (আ)-কে দেখেছি। তার ছ'শ ডানা ছিল। তাঁর পালক থেকে নানা বর্ণের মণি-মুক্তা ছড়িয়ে পড়ছিল।

আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "আমি সিদরাতুল মুনতাহা'র নিকট জিবরাঈল (আ)-কে দেখেছি। তখন ছিল তাঁর ছ'শ ডানা।

হুসায়ন (রা) বলেন, আমি আসিমকে ডানাসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে তা জানাতে অস্বীকৃতি জানান। পরে তাঁর জনৈক সংগী আমাকে জানান যে, তাঁর ডানা পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। উল্লেখ্য যে, এ রিওয়ায়েতগুলোর সনদ উত্তম ও নির্ভরযোগ্য। ইমাম আহমদ (র) এককভাবেই তা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, শাকীক (র) বলেন, আমি ইব্ন মাসঊদ (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "আমি জিবরাঈলকে তারুণ্য দীপ্ত যুবকের আকৃতিতে দেখেছি, যেন তাঁর সাথে মুক্তা ঝুলছে।" এর সনদ সহীহ।

আবদুল্লাহ (রা) থেকে ইব্ন জারীর (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে সূক্ষ্ম রেশমের তৈরি দুই জোড়া পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। তিনি তখন আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী গোটা স্থান জুড়ে অবস্থান করছিলেন।' এর সনদও উত্তম ও প্রামাণ্য।

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, মাসরূক বলেন, আমি একদিন আয়েশা (রা)-এর নিকট ছিলাম। তখন আমি বললাম, আল্লাহ্ তা'আলা কি এ কথা বলছেন না যে, وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ সে তো (মুহাম্মদ) তাকে (জিবরাঈলকে) স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে। (৮১ ঃ ২৯) وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى (নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল।) (৫৩ ঃ ১৩) উত্তরে আয়েশা (রা) বললেন, এ উম্মতের আমিই প্রথম ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ 'উনি হলেন জিবরাঈল।' তিনি তাঁকে আল্লাহ সৃষ্ট তার আসল অবয়বে মাত্র দু'বার দেখেছেন। তিনি তাঁকে দেখেছেন আসমান থেকে যমীনে অবতরণরত অবস্থায়। তখন তাঁর সুবিশাল দেহ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে জুড়ে রেখেছিল।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে বললেন ঃ "আচ্ছা, আপনি আমার সঙ্গে যতবার সাক্ষাৎ করে থাকেন তার চেয়ে অধিক সাক্ষাৎ করতে পারেন না ?" ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তারপর নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ .

অর্থাৎ— আমরা আপনার প্রতিপালকের আদেশ ব্যতীত অবতরণ করি না। যা আমাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে এবং যা এ দু'-এর অন্তর্বর্তী; তা তাঁরই। (১৯ ঃ ৬৪)

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) সর্বাপেক্ষা বেশি দানশীল ছিলেন। আর তাঁর এ বদান্যতা রমযান মাসে, যখন জিবরাঈল (আ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তখন অনেক বেশি বৃদ্ধি পেতো। জিবরাঈল (আ) রমযানের প্রতি রাতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কুরআনের দার্স দিতেন।' মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সা) কল্যাণ সাধনে মুক্ত বায়ু অপেক্ষাও অধিকতর উদার ছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) একদিন আসর পড়তে কিছুটা বিলম্ব করে ফেলেন। তখন উরওয়া (রা) তাকে বললেন, নিশ্চয়ই জিবরাঈল (আ) অবতরণ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছিলেন। এ কথা শুনে উমর (রা) বললেন, হে উরওয়া! তুমি যা বলছ, আমার তা জানা আছে। 'আমি বশীর ইব্‌ন আবূ মাসঊদকে তার পিতার বরাতে বলতে শুনেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ জিবরাঈল (আ) অবতরণ করলেন। তারপর তিনি আমার ইমামতি করলেন। আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম, তারপর আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম, তারপর আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম, তারপর আমি তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করলাম। এভাবে আঙ্গুল দ্বারা গুণে গুণে তিনি পাঁচ নামাযের কথা উল্লেখ করেন।

এবার ইসরাফীল (আ)-এর পরিচিতি জানা যাক। ইনি আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের একজন। ইনি সেই ফেরেশতা, যিনি তাঁর প্রতিপালকের আদেশে শিঙ্গায় তিনটি ফুৎকার

দেবেন। প্রথমটি ভীতি সৃষ্টির, দ্বিতীয়টি ধ্বংসের এবং তৃতীয়টি পুনরুত্থানের। এর বিস্তারিত আলোচনা পরে আমাদের এ কিতাবের যথাস্থানে আসবে ইনশাআল্লাহ্।

সূর (صور) হলো একটি শিঙ্গা, যাতে ফুৎকার দেয়া হবে। তার প্রতিটি আওয়াজ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। আল্লাহ যখন তাকে পুনরুত্থানের জন্য ফুৎকার দেয়ার আদেশ করবেন, তখন মানুষের রূহগুলো তাঁর মধ্যে অবস্থান নিয়ে থাকবে। তারপর যখন তিনি ফুৎকার দেবেন, তখন রূহগুলো বিহ্বল চিত্তে বেরিয়ে আসবে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমার ইয্যত ও পরাক্রমের শপথ! প্রতিটি রূহ্ তার দেহে ফিরে যাক দুনিয়াতে যে দেহকে প্রাণবন্ত রাখতো। ফলে রূহ্গুলো কবরে গিয়ে দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ে এমনভাবে মিশে যাবে যেমনটি বিষ সর্পদষ্ট ব্যক্তির মধ্যে মিশে যায়। এতে দেহগুলো প্রাণবন্ত হয়ে যাবে এবং কবরসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে আর তারা দ্রুত গতিতে হাশরের ময়দানের দিকে বেরিয়ে পড়বে। যথাস্থানে এর বিস্তারিত আলোচনা আসবে। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

كيف انعم وصاحب القرن قد إلتقم القرن وحنى جبهته وا نتظر أن يؤذن له.

অর্থাৎ— আমি কিভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি যেখানে শিঙ্গাধারী ফেরেশতা শিঙ্গা মুখে নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে অনুমতির অপেক্ষায় রয়েছেন।

একথা শুনে সাহাবাগণ বললেন, তাহলে আমরা কি দু'আ পাঠ করবো ইয়া রাসূলাল্লাহ! জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা বলবে ঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَيَ اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا.

'আমাদের আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি উত্তম অভিভাবক। আল্লাহর উপরই আমাদের ভরসা।'

ইমাম আহমদ (র) ও তিরমিযী (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আতিয়্যা আল-আওফী-এর হাদীস থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) শিঙ্গাধারী ফেরেশতার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তার ডানে জিবরাঈল ও বামে মীকাঈল (আ) অবস্থান করছেন।

তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন বসা অবস্থায় ছিলেন। জিবরাঈল (আ) তখন তাঁর পাশে অবস্থান করছিলেন। এমন সময়ে দিগন্ত ভেদ করে ঝুঁকে ঝুঁকে ইসরাফীল (আ) পৃথিবীর নিকটবর্তী হতে শুরু করেন। হঠাৎ দেখা গেল একজন ফেরেশতা বিশেষ এক আকৃতিতে নবী করীম (সা)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! বান্দা নবী ও বাদশাহ নবী এ দু'য়ের কোন একটি বেছে নেয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আদেশ করছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তখন জিবরাঈল (আ) তাঁর হাত দ্বারা আমার প্রতি ইংগিতে বলেন যে, আপনি বিনয় অবলম্বন করুন। এতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি আমার মঙ্গলার্থেই বলছেন। ফলে আমি বললাম ঃ আমি বান্দা নবী হওয়াই পছন্দ করি। তারপর সে ফেরেশতা আকাশে উঠে গেলে আমি বললাম, হে জিবরাঈল! এ

ব্যাপারে আমি আপনার নিকট জিজ্ঞেস করব বলে মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু আপনার ভাবগতি দেখে আর তা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। এবার বলুন, ইনি কে, হে জিবরাঈল? জবাবে জিবরাঈল (আ) বললেন ঃ ইনি ইসরাফীল (আ)। যেদিন আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকেই তিনি তাঁর সম্মুখে পদদ্বয় সোজা রেখে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছেন। কখনো তিনি চোখ তুলেও তাকান না। তাঁর ও মহান প্রতিপালকের মধ্যে রয়েছে সত্তরটি নূরের পর্দা। তার কোন একটির কাছে ঘেষলে তা তাকে পুড়িয়ে ফেলবে। তাঁর সামনে একটি ফলক আছে। আকাশ কিংবা পৃথিবীর ব্যাপারে আল্লাহ কোন আদেশ দিলে সে ফলকটি উঠে গিয়ে তা তার ললাট-দেশে আঘাত করে। তখন তিনি চোখ তুলে তাকান। সে আদেশ যদি আমার কর্ম সম্পৃক্ত হয়; তাহলে সে ব্যাপারে আমাকে তিনি আদেশ দেন আর যদি তা মীকাঈল-এর কাজ সংক্রান্ত হয় তাহলে তিনি তাঁকে তার আদেশ দেন। আর যদি তা মালাকুল মউতের কাজ হয় তবে তিনি তাকে তার আদেশ দেন। আমি বললাম, হে জিবরাঈল! আপনার দায়িত্ব কী? তিনি বললেন, বায়ু ও সৈন্য সংক্রান্ত। আমি বললাম, আর মীকাঈল কিসের দায়িত্বে নিয়োজিত? বললেন, উদ্ভিদাদি ও বৃষ্টির দায়িত্বে। আমি বললাম, আর মালাকুল মউত কোন্ দায়িত্বে আছেন? বললেন, রূহ্ কবয করার দায়িত্বে। আমি তো মনে করেছিলাম, উনি কিয়ামত কায়েম করার জন্য অবতরণ করেছেন বুঝি! আর আপনি আমার যে ভাবগতি দেখেছিলেন, তা কিয়ামত কায়েম হওয়ার ভয়েই হয়েছিল। এ সূত্রে এটি গরীব হাদীস। সহীহ মুসলিমে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রাতে যখন নামায পড়ার জন্য দণ্ডায়মান হতেন, তখন তিনি বলতেন ঃ

اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إهدنى لما اختلف فيه من الحق باذنك إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم.

অর্থাৎ— হে আল্লাহ! হে জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীল-এর প্রতিপালক! হে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, গুপ্ত ও প্রকাশ্য সবকিছুর পরিজ্ঞাতা! তুমিই তো তোমার বান্দাদের মাঝে সে বিষয়ে মীমাংসা করবে, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধে লিপ্ত ছিল। তুমি আমাকে সত্যের বিরোধপূর্ণ বিষয়ে হিদায়ত দান কর। তুমি তো যাকে ইচ্ছা কর তাকেই সঠিক পথের সন্ধান দিতে পার।

শিঙ্গা সম্পর্কিত হাদীসে আছে যে, ইসরাফীল (আ)-ই হবেন প্রথম, যাঁকে আল্লাহ ধ্বংসের পর শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার জন্য পুনর্জীবিত করবেন।

মুহাম্মদ ইব্ন হাসান নাক্কাশ (র) বলেন, ইসরাফীল (আ)-ই ফেরেশতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সিজদা করেছিলেন। এরই পুরস্কারস্বরূপ তাকে লাওহে মাহফূজের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। আবুল কাসিম সুহায়লী (র) তাঁর التعريف والاعلام بما انهم فى القرآن من الأعلام নামক কিতাবে এ কথাটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَرُسُلِهٖ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ.

অর্থাৎ— যে কেউ আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রাসূলগণের এবং জিবরাঈল ও মীকাঈলের শত্রু....। (২ ঃ ৯৮)

এ আয়াতে বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার কারণে জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ)-কে ملائكة -এর উপর عطف করা হয়েছে। জিবরাঈল হলেন এক মহান ফেরেশতা। পূর্বেই তাঁর প্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আর মীকাঈল (আ) হলেন বৃষ্টি ও উদ্ভিদাদির দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি আল্লাহ থেকে প্রাপ্ত বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ও নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাদের অন্যতম।

ইমাম আহমদ (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে রিওয়ায়েত করেন, তিনি বলেছেন যে, নবী করীম (সা) জিবরাঈল (আ)-কে বললেন ঃ "ব্যাপার কি, আমি মীকাঈল (আ)-কে কখনো হাসতে দেখলাম না যে? উত্তরে জিবরাঈল (আ) বললেন, মীকাঈল (আ) জাহান্নাম সৃষ্টির পর থেকে এ যাবত কখনো হাসেন নি।

এ হলো সে সব ফেরেশতার আলোচনা, পবিত্র কুরআনে যাঁদের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সিহাহ সিত্তায় নবী করীম (সা)-এর দু'আয়ও এঁদের উল্লেখ রয়েছে। তাহলো, اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل.

জিবরাঈল (আ)-এর দায়িত্ব ছিল উম্মতের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য নবী-রাসূলগণের নিকট হিদায়াত নিয়ে আসা। মীকাঈল (আ) বৃষ্টি ও উদ্ভিদাদির দায়িত্বে নিয়োজিত, যার মাধ্যমে এ দুনিয়াতে জীবিকা সৃষ্টি করা হয়। তাঁর অনেক সহযোগী ফেরেশতা আছেন, আল্লাহর আদেশ অনুসারে তিনি যা বলেন তারা তা পালন করেন। আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি অনুযায়ী তাঁরা বাতাস ও মেঘমালা পরিচালিত করে থাকেন। আর পূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, আকাশ থেকে যে ফোঁটাটিই পতিত হয়, তাঁর সাথে একজন ফেরেশতা থাকেন যিনি সে ফোঁটাটি পৃথিবীর যথাস্থানে স্থাপন করেন। পক্ষান্তরে ইসরাফীল (আ)-কে কবর থেকে উত্থানের এবং কৃতজ্ঞদের সাফল্য লাভ ও কৃতঘ্নদের পরিণতি লাভ করার উদ্দেশ্যে পুনরুত্থান দিবসে উপস্থিত হওয়ার জন্য শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত করে রাখা হয়েছে। ঐ দিন কৃতজ্ঞদের পাপ মার্জনা করা হবে এবং তাদের পুণ্য কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে। আর কৃতঘ্নদের আমল বিক্ষিপ্ত ধুলির ন্যায় হয়ে যাবে আর সে নিজের ধ্বংস ও মৃত্যু কামনা করবে।

মোটকথা, জিবরাঈল (আ) হিদায়েত অবতারণের দায়িত্ব পালন করেন, মীকাঈল (আ) জীবিকা প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন আর ইসরাফীল (আ) পালন করেন সাহায্য দান ও প্রতিদানের দায়িত্ব। কিন্তু মালাকুল মউতের নাম কুরআন এবং সহীহ হাদীসসমূহের কোথাও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে কোন কোন রিওয়ায়েতে তাঁকে আযরাঈল নামে অভিহিত করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ.

অর্থাৎ— বল, তোমাদের জন্য মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যানীত হবে। (৩২ ঃ ১১)

এ মালাকুল মউতেরও কিছু সহযোগী ফেরেশতা আছেন, যাঁরা মানুষের রূহ্‌কে দেহ থেকে বের করে তা কণ্ঠনালী পর্যন্ত নিয়ে আসেন, তারপর মালাকুল মউত নিজ হাতে তা কবয করেন। তিনি তা কবয করার পর সহযোগী ফেরেশতাগণ এক পলকের জন্যও তা তার হাতে থাকতে না দিয়ে সংগে সংগে তাঁরা তাকে নিয়ে উপযুক্ত কাফনে আবৃত করেন। নিম্নের আয়াতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأٰخِرَةِ.

অর্থাৎ— যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। (১৪ ঃ ২৭)

তারপর তাঁরা রূহ্‌টি নিয়ে ঊর্ধ্ব জগতের দিকে রওয়ানা হন। রূহ্ যদি সৎকর্মপরায়ণ হয়, তাহলে তার জন্য আকাশের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়। অন্যথায় তার সামনেই তা বন্ধ করে দিয়ে তাকে পৃথিবীর দিকে ছুঁড়ে ফেলা হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتّٰى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِيْنَ.

অর্থাৎ— তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী এবং তিনিই তোমাদের রক্ষক প্রেরণ করেন; অবশেষে যখন তোমাদের কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন আমার প্রেরিতরা তার মৃত্যু ঘটায় এবং তার কোন ত্রুটি করে না। তারপর তাদের প্রকৃত প্রতিপালকের দিকে তারা প্রত্যানীত হয়। দেখ, কর্তৃত্ব তো তাঁরই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর। (৬ ঃ ৬১-৬২)

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন, গোটা পৃথিবী মালাকুল মউতের সামনে একটি পাত্রের ন্যায়। তার যে কোন অংশ থেকে ইচ্ছা তিনি হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে পারেন। আমরা এও উল্লেখ করেছি যে, মৃত্যুর ফেরেশতাগণ মানুষের নিকট তার আমল অনুপাতে আগমন করে থাকেন। লোক যদি মু'মিন হয়, তবে তার নিকট উজ্জ্বল চেহারা, সাদা পোশাক ও হৃদয়বান ফেরেশতাগণ আগমন করেন। আর লোক যদি কাফির হয় তাহলে এর বিপরীতবেশী ফেরেশতাগণ আগমন করেন। এ ব্যাপারে আমরা মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।

জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ তার পিতাকে বলতে শুনেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক আনসারীর শিয়রে বসে মালাকুল মউতকে দেখতে পেয়ে তাঁকে বললেন ঃ হে মালাকুল মউত! আমার সাহাবীর সঙ্গে সদয় ব্যবহার করুন! কারণ সে মু'মিন। জবাবে মালাকুল মউত বললেন,

হে মুহাম্মদ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এবং আপনার চোখ জুড়াক, কেননা আমি প্রত্যেকটি মুমিনের ব্যাপারেই সদয়। আপনি জেনে রাখুন, পৃথিবীর কোন মাটির কাঁচা ঘর বা পশম আচ্ছাদিত তাঁবু, তা জলে হোক বা স্থলে হোক এমন নেই, যেখানে আমি দৈনিক পাঁচবার লোকদের তল্লাশি না করে থাকি। ফলে ছোট-বড় সকলকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। আল্লাহর শপথ! হে মুহাম্মদ, আল্লাহর আদেশ ব্যতীত একটি মশার রূহ্ কবয করার সাধ্যও আমার নেই।

জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ বলেন, আমার আব্বা আমাকে জানিয়েছেন যে, মৃত্যুর ফেরেশতাগণ নামাযের সময়ও লোকদেরকে তল্লাশি করে ফিরেন। তখন কারো মৃত্যুর সময় এসে পড়লে যদি সে নামাযের পাবন্দ হয়ে থাকে তাহলে ফেরেশতা তাঁর নিকটে এসে শয়তানকে তাড়িয়ে দেন এবং সে সঙ্কটময় মুহূর্তে তাকে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ-এর তালকীন করেন।

এ হাদীসটি মুরসাল এবং কেউ কেউ এর সমালোচনা করেছেন। শিঙ্গা সম্পর্কিত হাদীসে আমরা আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছি। তাতে এও আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইসরাফীল (আ)-কে ধ্বংসের ফুৎকারের আদেশ করবেন। সে মতে তিনি ফুৎকার দিলে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। কেবল তারাই নিরাপদ থাকবেন, যাদেরকে আল্লাহ নিরাপদ রাখতে ইচ্ছা করবেন। এভাবে তারা বিনাশ হয়ে গেলে মৃত্যুর ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এসে বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যাদেরকে রক্ষা করতে ইচ্ছা করেছেন তাঁরা ব্যতীত আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের সকলেই তো মারা গিয়েছে। কে কে জীবিত আছে তা জানা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ কে জীবিত রইলো ? তিনি বলবেন, জীবিত আছেন আপনি, যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর মৃত্যু নেই। আর বেঁচে আছেন আপনার আরশ বহনকারিগণ এবং জিবরাঈল ও মীকাঈল। এ কথা শুনে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ জিবরাঈল এবং মীকাঈলেরও মৃত্যু হয়ে যাক। তখন আরশ আল্লাহর সঙ্গে কথা বলবে। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! জিবরাঈল এবং মীকাঈলও মারা যাবেন? আল্লাহ বলবেন ঃ চুপ কর! আমার আরশের নিচে যারা আছে; তাদের প্রত্যেকের জন্য আমি মৃত্যু অবধারিত করে রেখেছি। তারপর তাঁরা দু'জনও মারা যাবেন।

তারপর মালাকুল মউত মহান আল্লাহর নিকট এসে বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! জিবরাঈল এবং মীকাঈলও তো মারা গিয়েছেন। একথা শুনে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন— অথচ কে বেঁচে আছে সে সম্পর্কে তিনি সমধিক অবহিত, তাহলে আর কে বেঁচে আছে? তিনি বলবেন, বেঁচে আছেন আপনি চিরঞ্জীব সত্তা, যাঁর মৃত্যু নেই। আর বেঁচে আছে আপনার আরশ বহনকারিগণ ও আমি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আমার আরশ বহনকারীদেরও মৃত্যু হোক। ফলে তারা মারা যাবেন এবং আল্লাহর আদেশে আরশ ইসরাফীলের নিকট থেকে শিঙ্গাটা নিয়ে নেবেন। তারপর মালাকুল মউত এসে বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার আরশ বহনকারিগণ মারা গেছেন। তা শুনে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন। যদিও কে বেঁচে আছে তা তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন— তাহলে আর কে বেঁচে আছে? তিনি বলবেন, বেঁচে আছেন আপনি চিরঞ্জীব সত্তা, যাঁর মৃত্যু নেই। আর বেঁচে আছি আমি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমিও আমার সৃষ্টিসমূহের একটি সৃষ্টি। আমি তোমাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি

করেছিলাম। অতএব, তুমিও মরে যাও। ফলে তিনিও মারা যাবেন। তারপর অবশিষ্ট থাকবেন শুধু অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী এক ও অমুখাপেক্ষী সত্তা, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং যাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি, যাঁর তুল্য কেউ নেই, যিনি প্রথমে যেমন ছিলেন, পরেও তেমনি থাকবেন।

ইমাম তাবারানী, ইব্‌ন জারীর এবং বায়হাকী (র) এ হাদীসটি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। আর হাফিজ আবূ মূসা আল-মাদীনী 'আত-তিওয়ালাত' গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় কিছু অতিরিক্ত বিরল কথাও আছে। তাহলো "আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি আমার সৃষ্টিসমূহের একটি সৃষ্টি। তোমাকে আমি বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছিলাম। অতএব, তুমি এমনভাবে মরে যাও, যারপর আর কখনো তুমি জীবিত হবে না।"

কুরআনে যে সব ফেরেশতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে; প্রাচীন যুগের বিপুল সংখ্যক আলিমের মতে তাঁদের মধ্যে হারূত এবং মারূতও রয়েছেন। এদের কাহিনী সম্পর্কে বেশ কিছু রিওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, যার বেশির ভাগই ইসরাঈলী বর্ণনা।

ইমাম আহমদ (র) এ প্রসংগে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে একটি মারফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ইব্‌ন হিব্বান তাঁর 'তাকাসীম' গ্রন্থে তাঁকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। তবে আমার মতে, বর্ণনাটির বিশুদ্ধতায় সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-এর উপর মওকূফ হওয়াই অধিকতর যুক্তিসংগত। সম্ভবত এটি তিনি কা'ব আহবার থেকে গ্রহণ করেছেন, যেমন পরে এর আলোচনা আসছে। উক্ত বর্ণনায় আছে যে, যুহরা তাঁদের সামনে সেরা সুন্দরী রমণীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

আলী ইব্‌ন আব্বাস ও ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, যুহরা একজন রমণী ছিল। হারূত ও মারূত তার নিকট কুপ্রস্তাব দিলে ইসমে আ'জম শিক্ষা দানের শর্তারোপ করে এবং তাঁরা তাকে তা শিখিয়ে দেন। তখন সে তা পাঠ করে আকাশে উঠে যায় এবং (শুক্র) গ্রহের রূপ ধারণ করে।

হাকিম (র) তাঁর মুসতাদরাকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সে যুগে এমন একজন রূপসী রমণী ছিল, নারী সমাজে তাঁর রূপ ছিল ঠিক নক্ষত্র জগতে যুহরার রূপের ন্যায়। যুহরা সম্পর্কে বর্ণিত পাঠগুলোর মধ্যে এটিই সর্বোত্তম।

কেউ কেউ বলেন, হারূত-মারূতের কাহিনীটি ইদরীস (আ)-এর আমলে ঘটেছিল। আবার কেউ ব্লেন, এটা সুলায়মান ইব্‌ন দাঊদের আমলের ঘটনা। তাফসীরে আমরা এ কথাটি উল্লেখ করেছি।

মোটকথা, এসব হচ্ছে ইসরাঈলী বর্ণনা। কা'ব আহবার হলেন এর উৎস। যেমন আবদুর রায্যাক তাঁর তাফসীর গ্রন্থে কা'ব আহবার সূত্রে কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন। আর সনদের দিক থেকে এটি বিশুদ্ধতর। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

তাছাড়া কেউ কেউ বলেন ঃ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ

এ আয়াত দ্বারা জিনদের দু'টি গোত্রকে বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন হায্ম (র) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে এ অভিমতটি একটি বিরল ও কপট কল্পিত অভিমত।

আবার কেউ কেউ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ যের যোগে পড়েছেন এবং হারূত ও মারূতকে ইরানের সানীপন্থী দু'জন লোক বলে অভিহিত করেছেন। এটা যাহ্হাকের অভিমত।

আবার কারো কারো মতে এরা দু'জন আকাশের ফেরেশতা। কিন্তু আল্লাহর পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী তাদের এ দশা হয়েছে, যা বর্ণিত হয়েছে। যদি তা সঠিক হয়ে থাকে, তবে তাদের ঘটনা ইবলীসের ঘটনার সাথে তুল্য হবে, যদি ইবলীস ফেরেশতাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধতর কথা হলো, ইবলীস জিনদের অন্তর্ভুক্ত। এর আলোচনা পরে আসছে।

হাদীসে যেসব ফেরেশতার নাম এসেছে তন্মধ্যে মুনকার ও নাকীর অন্যতম। বিভিন্ন হাদীসে কবরের সওয়াল প্রসঙ্গে তাদের আলোচনা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আমরা يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ الخ। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তা আলোচনা করেছি।

এরা দু'জন কবরের পরীক্ষক। মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে তার রব, দীন ও নবী সম্পর্কে প্রশ্ন করার দায়িত্বে এঁরা নিয়োজিত। এঁরা সৎকর্মশীল ও পাপাচারীদের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এঁরা নীল রঙের, ভয়ংকর বড় বড় দাঁত, ভয়ানক আকৃতি ও ভয়ংকর গর্জন বিশিষ্ট। আল্লাহ আমাদের কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন এবং ঈমানের অটল বাণী দ্বারা আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখুন! আমীন!!

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, উরওয়া বলেন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) একদিন নবী করীম (সা)-কে বললেন ঃ আপনার উপর উহুদের দিনের চাইতে কঠিনতর কোনদিন এসেছে কি? উত্তরে নবী করীম (সা) বললেন ঃ তোমার সম্প্রদায় থেকে আমি যে আচরণ পেয়েছি তন্মধ্যে আকাবার (তায়েফের) দিনের আচরণটি ছিল কঠোরতম। সেদিন আমি ইব্ন আব্দ য়ালীল ইব্ন আব্দ কিলাল-এর নিকট আমার দাওয়াত পেশ করলাম। কিন্তু সে আমার দাওয়াতে কোন সাড়াই দিল না। ফলে আমি বিষণ্ন মুখে ফিরে আসি এবং করনুছ ছাআলিবে পৌঁছা পর্যন্ত আমার হুঁশই ছিল না। সেখানে পৌঁছার পর উপর দিকে মাথা তুলে দেখতে পেলাম যে, একখণ্ড মেঘ আমার উপর ছায়াপাত রেখেছে। সেদিকে তাকিয়ে আমি তার মধ্যে জিবরাঈল (আ)-কে দেখতে পাই। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং যে জবাব দিয়েছে আল্লাহ তা শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে প্রেরণ করেছেন, যাতে আপনি তাঁকে তাদের ব্যাপারে যা ইচ্ছা আদেশ করেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি যদি বলেন তা'হলে এ দু'পাহাড় চাপা দিয়ে ওদেরকে খতম করে দেই। জবাবে নবী করীম (সা) বললেন ঃ "বরং আমি আশা করি যে, আল্লাহ তাদের ঔরস থেকে এমন প্রজন্ম সৃষ্টি করবেন যারা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না।" ইমাম মুসলিম (র) ইব্ন ওহাবের হাদীস থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ তা'আলা যেসব উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেছেন সেদিক থেকে ফেরেশতাগণ কয়েক ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে একদল হলেন আরশ বহনকারী। উপরে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আরেক দল হলেন কারুবীয়্যুন ফেরেশতাগণ। আরশের চতুর্পার্শ্বে এঁদের অবস্থান। আরশ বহনকারীদের মত এরাও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ أَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ.

অর্থাৎ— (ঈসা) মাসীহ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও নয়। (৪ ঃ ১৭২)

জিবরাঈল এবং মীকাঈল (আ)-ও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাঁদের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁরা অনুপস্থিতিতে মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ . رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ. وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. وَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অর্থাৎ—এবং তারা মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব, যারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে দাখিল কর স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। এবং তুমি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা কর, সেদিন তুমি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে, তাকে তো অনুগ্রহই করবে। এটাই তো মহা সাফল্য। (৪০ ঃ ৭-৯)

আর তাঁরা এমন পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হওয়ার কারণে তাঁরা তাদেরকে ভালো-বাসেন, যারা এ গুণে গুণান্বিত। যেমন হাদীসে মহানবী (সা) বলেছেন ঃ

إذا دعا العبد لا فيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل .

অর্থাৎ— কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দু'আ করলে ফেরেশতারা বলেন, আমীন, আর তোমার জন্যও তাই হোক।

আরেক দল হলেন সাত আকাশে বসবাসকারী ফেরেশতা। তারা রাত-দিন ও সকাল-সন্ধ্যা অবিরাম ইবাদত করে আকাশসমূহকে আবাদ রাখেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَيَفْتُرُوْنَ.

অর্থাৎ—তাঁরা রাত-দিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তাঁরা শৈথিল্য করে না। (২১ ঃ ২০)

ফেরেশতাদের কেউ কেউ সর্বদা রুকূ অবস্থায় আছেন, কেউ কেউ আছেন দণ্ডায়মান আর কেউ কেউ সিজদারত। আরেক দল আছেন যাঁরা দলে দলে পালাক্রমে প্রত্যহ সত্তর হাজার বায়তুল মা'মূরে গমনাগমন করেন। একবার যাঁরা আসেন তাঁরা পুনরায় আর সেখানে আসেন না।

আরেক দল আছেন যাঁরা জান্নাতসমূহের দায়িত্বে রয়েছেন। জান্নাতীদের সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থাপনা, তাতে বসবাসকারীদের এমন পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও খাদ্য-পানীয় ইত্যাদির আয়োজন করাও তাদের দায়িত্ব যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান যা শুনেনি এবং কোন মানুষের হৃদয়ে যার কল্পনাও আসেনি। উল্লেখ্য যে, জান্নাতের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতার নাম রিদ্ওয়ান। বিভিন্ন হাদীসে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

আবার কতিপয় ফেরেশতা জাহান্নামের দায়িত্বেও নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁরা হলেন যাবানিয়া। এঁদের মধ্যে উনিশজন হলেন নেতৃস্থানীয়। আর জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতার নাম মালিক। জাহান্নামের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাদের তিনিই প্রধান। নিচের আয়াতগুলোতে তাঁদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ.

অর্থাৎ—জাহান্নামীরা তার প্রহরীদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, যেন তিনি আমাদের থেকে একদিনের শাস্তি লাঘব করে দেন। (৪০ ঃ ৪৯)

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. قَالَ إِنَّكُمْ مَّاكِثُوْنَ. لَقَدْجِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُوْنَ.

অর্থাৎ—তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালিক! তোমার প্রতিপালক আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন! সে বলবে, তোমরা তো এভাবেই থাকবে।

আল্লাহ বলবেন, আমি তো তোমাদের নিকট সত্য পৌঁছিয়েছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিল সত্য-বিমুখ। (৪৩ ঃ ৭৭-৭৮)

عَلَيْهَا مَلٰئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤْمَرُوْنَ.

অর্থাৎ—তাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাবের ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে। (৬৬ ঃ ৬)

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلٰئِكَةً وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِيْمَانًا وَّلاَ يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلاً. كَذَالِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ.

অর্থাৎ—তার তত্ত্বাবধানে আছে উনিশজন প্রহরী। আমি ফেরেশতাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী। কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপই আমি তাদের এ সংখ্যা উল্লেখ করেছি— যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীগণ ও কিতাবিগণ সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলবে, আল্লাহ এ অভিনব উক্তি দ্বারা কী বুঝাতে চেয়েছেন? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (৭৪ ঃ ৩০-৩১)

আবার এদেরই উপর আদম সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ. إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّالٍ.

অর্থাৎ— তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে তা প্রকাশ করে, রাত্রিতে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে আল্লাহর গোচরে রয়েছে।

মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে, তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তা রদ করবার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবক নেই। (১৩ ঃ ১০-১১)

ওয়ালিবী (র) হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ الخ এ আয়াতে مُعَقِّبَاتٌ দ্বারা ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে।

ইকরিমা (র) হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেন যে, يحفظون من أمر الله অর্থ ফেরেশতাগণ তাকে তার সম্মুখে ও পশ্চাতে রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। পরে আল্লাহর সিদ্ধান্ত এসে পড়লে তাঁরা সরে পড়েন।

মুজাহিদ (র) বলেন, প্রতি বান্দার জন্যে তার নিদ্রায় ও জাগরণে জিন, মানব ও হিংস্র জন্তু থেকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন করে ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। কেউ তার ক্ষতি করতে আসলে ফেরেশতা বলেন, সরে যাও। তবে কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর অনুমতি থাকলে তার সে ক্ষতি হয়েই যায়।

আবূ উসামা (রা) বলেন, প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে এমন একজন ফেরেশতা আছেন যিনি তার হেফাজতের দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে তিনি তাকে তাকদীরের হাতে সোপর্দ করেন।

আবূ মিজলায (রা) বলেন, এক ব্যক্তি আলী (রা)-এর নিকট এসে বলল, মুরাদ গোত্রের কিছু লোক আপনাকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছে। একথা শুনে তিনি বললেন, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে দু'জন করে ফেরেশতা আছেন; যারা এমন বিষয় থেকে তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, যা তার তাকদীরে নেই। পরে যখন তাকদীর এসে যায় তখন তাঁরা তার তাকদীরের হাতেই তাকে ছেড়ে দেন। নির্ধারিত আয়ু হচ্ছে এক সুরক্ষিত ঢালস্বরূপ।

আরেক দল ফেরেশতা আছেন, যাঁরা বান্দার আমল সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

অর্থাৎ—দক্ষিণে ও বামে বসে তারা কর্ম লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর ফেরেশতা তার নিকটেই রয়েছে। (৫০ ঃ ১৭-১৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ. كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ.

অর্থাৎ— অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ, সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ; তারা জানে তোমরা যা কর। (৮২ ঃ ১০-১২)

আবূ হাতিম রাযী (র) তাঁর তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা সম্মানিত লিপিকরবৃন্দকে সম্মান কর, যারা গোসল করতে থাকা অবস্থায় ও পেশাব-পায়খানা জনিত নাপাকী অবস্থা এ দু'টি অবস্থায় ব্যতীত তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। অতএব, তোমাদের কেউ যখন গোসল করে তখন যেন সে দেয়াল কিংবা উট দ্বারা আড়াল করে নেয় অথবা তার কোন ভাই তাকে আড়াল করে রাখে।

এ সূত্রে হাদীসটি মুরসাল। বায্যার তাঁর মুসনাদে জাফর ইব্‌ন সুলায়মান সূত্রে মুত্তাসাল পদ্ধতিতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

'আলকামা মুজাহিদ সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে বিবস্ত্র হতে নিষেধ করেন। অতএব, তোমরা লজ্জা করে চল আল্লাহকে এবং তোমাদের সঙ্গের সেসব সম্মানিত লিপিকরদেরকে যারা

পেশাব-পায়খানা, জানাবত ও গোসলের সময় এ তিন অবস্থা ব্যতীত কখনো তোমাদের থেকে পৃথক হন না। তাই তোমাদের কেউ খোলা মাঠে গোসল করলে সে যেন তার কাপড় কিংবা দেয়াল বা তাঁর উট দ্বারা আড়াল করে নেয়।

ফেরেশতাগণকে সম্মান করার অর্থ হলো, তাদের ব্যাপারে লজ্জা করে চলা। অর্থাৎ তাদের দ্বারা মন্দ আমল লিপিবদ্ধ করাবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাদের সৃষ্টিতে এবং চারিত্রিক গুণাবলীতে তাঁদেরকে সম্মানিত করেছেন।

সিহাহ, সুনান ও মাসানীদের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে কিছু সংখ্যক সাহাবা কর্তৃক বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না যে ঘরে ছবি, কুকুর ও জুনুবী (গোসল ফরজ হয়েছে এমন ব্যক্তি) রয়েছে।

হযরত আলী (রা) থেকে আসিম (রা) বর্ণিত রিওয়ায়তে অতিরিক্ত শব্দ আছে এবং যে ঘরে প্রশ্রাব রয়েছে।

আবূ সাঈদ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত রাফি-এর এক বর্ণনায় আছে ঃ যে গৃহে ছবি কিংবা মূর্তি আছে সে গৃহে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত মুজাহিদের এক বর্ণনায় আছে ঃ ফেরেশতাগণ সে গৃহে প্রবেশ করেন না, যে গৃহে কুকুর বা মূর্তি আছে।

যাকওয়ান আবূ সালিহ সাম্মাক-এর বর্ণনায় আছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ফেরেশতাগণ সে দলের সঙ্গে থাকেন না, যাদের সাথে কুকুর বা ঘণ্টা থাকে। যুরারা ইব্‌ন আওফার বর্ণনায় কেবল ঘণ্টার কথা উল্লেখিত হয়েছে।

বায্‌যার (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহর ফেরেশতাগণ আদমের সন্তানদেরকে চিনেন (আমার ধারণা তিনি বলেছেন) এবং তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কেও তাঁরা জ্ঞাত। তাই কোন বান্দাকে আল্লাহর আনুগত্যের কোন কাজ করতে দেখলে তাঁকে নিয়ে তাঁরা পরস্পর আলোচনা করেন এবং তার নাম-ধাম উল্লেখ করে বলেন, আজ রাতে অমুক ব্যক্তি সফল হয়েছে, আজ রাতে অমুক ব্যক্তি মুক্তি লাভ করেছে। পক্ষান্তরে কাউকে আল্লাহর অবাধ্যতামূলক কোন কাজ করতে দেখলে তাঁরা তাকে নিয়ে পরস্পরে আলোচনা করেন এবং তার নাম-ধাম উল্লেখ করে বলেন, অমুক ব্যক্তি আজ রাতে ধ্বংস হয়েছে।

এ বর্ণনাটিতে একজন দুর্বল রাবী রয়েছেন। ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "ফেরেশতাগণ পালাক্রমে আগমন করে থাকেন। একদল আসেন রাতে, একদল আসেন দিনে এবং ফজর ও আসর নামাযে দুইদল একত্রিত হন। তারপর যারা তোমাদের মধ্যে রাত যাপন করলেন, তাঁরা আল্লাহর নিকট চলে যান। তখন আল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন— অথচ তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন— আমার বান্দাদেরকে তোমরা কী অবস্থায় রেখে এসেছ ? জবাবে তাঁরা বলেন, তাদেরকে রেখে এসেছি সালাতরত অবস্থায় আর তাদের নিকট যখন গিয়েছিলাম তখনও তারা সালাতরত অবস্থায় ছিল।

এ বর্ণনার শব্দমালা ঠিক এভাবেই 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়ে ইমাম বুখারী (র) এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) তাঁদের সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে 'সূচনা' ভিন্ন অন্য সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

বায্যার বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "সংরক্ষণকারী ফেরেশতাদ্বয় দৈনিকের সংরক্ষিত আমলনামা আল্লাহর দরবারে নিয়ে যাওয়ার পর তার শুরুতে ও শেষে ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) দেখতে পেয়ে তিনি বলেন ঃ লিপির দুই প্রান্তের মধ্যখানে যা আছে আমার বান্দার জন্য আমি তা ক্ষমা করে দিলাম।

বাযযার বলেন, তাম্মাম ইব্ন নাজীহ এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর হাদীস সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসবেত্তার সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও তাঁর বর্ণিত হাদীস মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

মোটকথা, প্রত্যেক মানুষের জন্য দু'জন করে হেফাজতের ফেরেশতা আছেন। একজন তার সম্মুখ থেকে ও একজন তার পেছন থেকে আল্লাহ্র আদেশে তাকে হেফাজত করে থাকেন। আবার প্রত্যেকের সংগে দু'জন করে লিপিকর ফেরেশতা আছেন। একজন ডানে ও একজন বামে। ডানের জন্য বামের জনের উপর কর্তৃত্ব করে না।

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ . مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ.

এ আয়াতের (৫০ ঃ ১৮) ব্যাখ্যায় আমরা এ বিষয়টি আলোচনা করেছি। ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেনঃ

ما منكم من أحد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملئكة.

অর্থাৎ— তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই একজন করে জিন সহচর ও ফেরেশতা সহচর দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন।

একথা শুনে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর আপনারও ? বললেন ঃ

وايا ى ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني الا بخير.

অর্থাৎ—"হ্যাঁ আমারও। কিন্তু আল্লাহ তার উপর আমাকে সাহায্য করেছেন। ফলে সে আমাকে মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছুর আদেশ করে না। (মুসলিম শরীফ)

এ ফেরেশতা সহচর এবং মানুষের সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত সহচর অভিন্ন না হওয়া বিচিত্র নয়। আলোচ্য হাদীসে যে সহচরের কথা বলা হয়েছে ,সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আল্লাহর আদেশে কল্যাণ ও হেদায়েতের পথে পরিচালিত করার জন্য তিনি নিযুক্ত। যেমন শয়তান সহচর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ধ্বংস ও বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় নিয়োজিত। এতে সে চেষ্টার ত্রুটি করে না। আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন, সে-ই রক্ষা পায়। আল্লাহ্রই সাহায্য কাম্য।

ইমাম বুখারী (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "জুম'আর দিনে মসজিদের প্রতিটি দরজায় একদল ফেরেশতা অবস্থান নিয়ে আগন্তুকদের ধারাবাহিক তালিকা লিপিবদ্ধ করেন, তারপর ইমাম মিম্বরে বসে গেলে তারা লিপিসমূহ গুটিয়ে এসে খুতবা শুনতে থাকেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হাদীসটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

অর্থাৎ—এবং ফজরের সালাত কায়েম করবে। ফজরের সালাত বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। (১৭ ঃ ৭৮)

কেননা, দিনের ও রাতের ফেরেশতাগণ তা লক্ষ্য করে থাকেন। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ "ফজরের সালাত রাতের ফেরেশতাগণ ও দিনের ফেরেশতাগণ (একত্রে) প্রত্যক্ষ করে থাকেন।"

তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহ্‌ (র) ও আসবাতের থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী হাদীসটি হাসান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। আমার মতে, হাদীসটি মুনকাতি পর্যায়ের। ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر.

অর্থাৎ—"একাকী সালাতের চাইতে জামাতের সালাতের ফযীলত পঁচিশ গুণ বেশি এবং রাতের ফেরেশতাগণ ও দিনের ফেরেশতাগণ ফজরের সালাতে একত্রিত হয়ে থাকেন।"

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, তোমাদের ইচ্ছে হলে وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا আয়াতটি পাঠ করতে পার। ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

إذا دعا الرجل إمرأته الى فراشه فأبت فبات غضبان لعنتها الملئكة حتى تصبح.

অর্থাৎ—"কেউ তার স্ত্রীকে তার শয্যায় আহবান করার পর যদি সে তা প্রত্যাখ্যান করে আর স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায় তাহলে ভোর পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিশাপ দিতে থাকেন।"

শু'বা, আবূ হামযা, আবূ দাঊদ এবং আবূ মু'আবিয়াও আ'মাশ (র) থেকে এর পরিপূরক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملئكة غفرله ما تقدم من ذنبه.

অর্থাৎ—"যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে। কেননা, ফেরেশতাদের আমীন বলার সঙ্গে যার আমীন বলা একযোগে হয়; তার পূর্বের সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।"

সহীহ্ বুখারীতে ইসমাঈল (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির পাঠ হলো ঃ

إذا قال الإمام آمين فإن الملئكة تقول فى السماء آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملئكة غفرله ما تقدم من ذنبه.

অর্থাৎ—ইমাম যখন আমীন বলেন তখন আকাশে ফেরেশতারাও আমীন বলে। অতএব, ফেরেশতাদের আমীন বলার সঙ্গে যার আমীন বলা যোগ হয়; তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হয়।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإن من وافق قوله قول الملئكة غفرله ما تقدم من ذنبه .

অর্থাৎ—ইমাম যখন سمع الله لمن حمده বলবে, তখন তোমরা বলবে, ربنا ولك الحمد। কারণ যার কথা ফেরেশতাদের কথার সঙ্গে মিলে যাবে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

ইব্‌ন মাজাহ্ (র) ব্যতীত হাদীসের মশহুর ছয় কিতাবের সংকলকগণের অন্য সকলে ইমাম মালিকের সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) কিংবা আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে (সন্দেহটি রাবী আমাশ-এর) ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ লিপিকর ফেরেশতাদের অতিরিক্ত আল্লাহর কিছু ফেরেশতা আছেন যাঁরা পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ান। তারপর কোন জনগোষ্ঠীকে আল্লাহর যিকররত অবস্থায় পেলে তাঁরা একে অপরকে ডেকে বলেন, এসো এখানেই তোমাদের বাঞ্ছিত বস্তু রয়েছে। তারপর তাঁরা নিম্ন আকাশে চলে গেলে আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদেরকে তোমরা কী কাজে রত রেখে এসেছ? জবাবে তাঁরা বলেন, তাদেরকে আমরা আপনার প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা এবং যিকররত রেখে এসেছি। আল্লাহ বলেন, তারা কি আমাকে দেখেছে ? ফেরেশতাগণ বলেন, না। আল্লাহ বলেন, আমাকে তারা দেখলে কেমন হতো ? জবাবে তারা বলেন ঃ তারা যদি আপনাকে দেখত; তাহলে তারা আপনার প্রশংসা জ্ঞাপন, সাহায্য প্রার্থনা ও যিকর করায় আরো বেশি তৎপর হতো। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তারা কী চায়? ফেরেশতাগণ বলেন ঃ তারা জান্নাত চায়।

আল্লাহ বলেন, তা কি তারা দেখেছে ? ফেরেশতাগণ বলেন, জ্বী না। আল্লাহ বলেন, তা যদি তারা দেখত তাহলে কেমন হতো ? জবাবে ফেরেশতারা বলেন ঃ যদি তারা তা দেখত তাহলে জান্নাত কামনায় ও তার অন্বেষণে তারা আরো বেশি তৎপর হতো। তারপর আল্লাহ বলবেন, তারা কোন্ বস্তু থেকে আশ্রয় চায় ? ফেরেশতারা বলেন ঃ জাহান্নাম থেকে।

আল্লাহ বলেন, তা কি তারা দেখেছে ? ফেরেশতাগণ বলেন ঃ জ্বী না। আল্লাহ বলেন, তা দেখলে কেমন হতো ? জবাবে তাঁরা বলেন ঃ দেখলে তাঁরা তা থেকে আরো অধিক পলায়নপর এবং আরো অধিক সন্ত্রস্ত হতো। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আল্লাহ বলেন, তোমাদেরকে আমি সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, তখন ফেরেশতারা বলেন, তাদের মধ্যে তো অমুক গুনাহগার ব্যক্তি আছে, যে এ উদ্দেশ্যে তাদের নিকট আসেনি, সে এসেছিল নিজের কোন প্রয়োজনে। জবাবে আল্লাহ বলেন, ওরা এমনই এক সম্প্রদায়, তাদের কাছে যেই বসে, সে বঞ্চিত হয় না। বুখারী, মুসলিম, আহমদ (র) (ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে)।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة. والله فى عون العبد ماكان العبد فى عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة . وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملئكة وذكرهم الله فيمن عنده . ومن بطاء به عمله لم يسرع به نسبه.

অর্থাৎ—'কেউ কোন মু'মিনের দুনিয়ার একটি সংকট দূর করে দিলে, আল্লাহ তার কিয়ামতের দিনের একটি সংকট দূর করে দেবেন। কেউ কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখলে আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার ভাইয়ের সাহায্যার্থে তৎপর থাকে, আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাহায্য করতে থাকেন। কেউ ইল্‌ম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে পথ চললে তাঁর উসিলায় আল্লাহ তাঁর জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। কোন জনগোষ্ঠী যদি আল্লাহর কোন ঘরে বসে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে ও পরস্পরে তার দারস দান করে, তাহলে তাদের উপর প্রশান্তি নেমে আসে, রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয়। ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন এবং আল্লাহ্ তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন। আর আমলে যে পিছিয়ে থাকবে; বংশের পরিচয় তাকে এগিয়ে নিতে পারবে না।' মুসলিম (র) এ হাদীসটি রিওয়ায়ত করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملئكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده.

অর্থাৎ—কোথাও একদল লোক একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকর করলে ফেরেশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেন, রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটে যারা আছেন তাঁদের সাথে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মুসলিম, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ্ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। এ মর্মে আরো বহু হাদীস রয়েছে।

মুসনাদে ইমাম আহমদ ও সুনানের গ্রন্থ চতুষ্টয়ে আবুদ্‌দারদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

وإن الملئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.

অর্থাৎ—"ইল্‌ম অন্বেষণকারীর কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য ফেরেশতাগণ তাদের ডানা বিছিয়ে দেন।" অর্থাৎ তাঁরা তাদের প্রতি বিনয় প্রকাশ করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.

'মমতাবশে তাদের (পিতা-মাতার) জন্য নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত করবে।' (১৭ ঃ ২৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

'যারা তোমার অনুসরণ করে সেসব মুমিনদের প্রতি তুমি বিনয়ী হও।' (২৬ ঃ ২১৫)

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

إن لله ملئكة سياحين فى الأرض ليبلغونى عن أمتى السلام.

অর্থাৎ— "আল্লাহর এমন কিছু ফেরেশতা আছেন যাঁরা আমার নিকট আমার উম্মতের সালাম পৌঁছানোর জন্য পৃথিবীময় ঘুরে বেড়ান।" ইমাম নাসাঈ (র) হাদীসটি ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

خلقت الملئكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم.

"ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে, জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা দ্বারা যা তোমাদেরকে বলা হয়েছে।" ইমাম মুসলিম (র)ও ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

বলা বাহুল্য যে, ফেরেশতাগণের আলোচনা সম্পর্কিত বিপুল সংখ্যক হাদীস রয়েছে। এখানে আমরা ঠিক ততটুকু উল্লেখ করলাম, যতটুকুর আল্লাহ তাওফীক দান করেছেন। প্রশংসা সব তাঁরই প্রাপ্য।

পরিচ্ছেদ

মানব জাতির উপর ফেরেশতাগণের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কালাম শাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাবেই এ মাস'আলাটি বেশি পাওয়া যায়। এ মাস'আলায় মতবিরোধ হলো, মুতাযিলা ও তাদের সমমনা লোকদের সঙ্গে।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রাচীন আলোচনা হাফিজ ইব্ন আসাকির-এর ইতিহাস গ্রন্থে আমি লক্ষ্য করেছি। তিনি উমায়্যা ইব্ন আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন আস-এর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একদিন উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর কোন এক মজলিসে উপস্থিত হন। তাঁর নিকট তখন একদল লোক উপস্থিত ছিল। কথা প্রসঙ্গে খলীফা উমর (রা) বললেন, সচ্চরিত্র আদম সন্তান অপেক্ষা আল্লাহর নিকট সম্মানিত আর কেউ নেই এবং নিচের আয়াতটি দ্বারা তিনি প্রমাণ পেশ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ.

অর্থাৎ— যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। (৯৮ ঃ ৭)

উমায়্যা ইব্ন আমর ইব্ন সাঈদ (র) তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেন। শুনে ইরাক ইব্ন মালিক বললেন, আল্লাহর নিকট তার ফেরেশতাদের চেয়ে সম্মানিত আর কেউ নেই। তাঁরা উভয় জগতের সেবক এবং আল্লাহর নবীগণের নিকট প্রেরিত তাঁর দূত। নিচের আয়াতটি দ্বারা তিনি এর দলীল প্রদান করেন ঃ

مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ.

অর্থাৎ— পাছে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। (৭ ঃ ২০)

তখন উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব কুরাযীকে বললেন, হে আবূ হামযা! আপনি এ ব্যাপারে কী বলেন ? জবাবে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ আদম (আ)-কে সম্মানিত করেছেন। তাঁকে তিনি নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মধ্যে রূহ সঞ্চার করেছেন, তাঁর সামনে ফেরেশতাদেরকে সিজদাবনত করিয়েছেন এবং তার সন্তানদের থেকে নবী-রাসূল বানিয়েছেন এবং যাদের কাছে ফেরেশতাগণ সাক্ষাৎ মানসে উপস্থিত হন।

মোটকথা, আবূ হামযা (র) মূল বিষয়ে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর সঙ্গে একমত হয়ে ভিন্ন দলীল পেশ করেন এবং আয়াত দ্বারা তিনি যে দলীল পেশ করেছেন তাকে দুর্বল আখ্যা দেন। তাহলো ঃ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .

এ আয়াতের মর্ম হলো, ঈমান ও সৎকর্ম শুধু মানুষেরই বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা وَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ বলে ফেরেশতাগণকেও ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তদ্রূপ জিন জাতিও ঈমানের গুণে গুণান্বিত। যেমন তারা বলেছিল ঃ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ.

অর্থাৎ—আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনলাম, তাতে ঈমান আনলাম। (৭২ ঃ ১৩) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ. অর্থাৎ আমাদের কতক মুসলিম। (৭২ ঃ ১৪)

আমার মতে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে উসমান ইব্‌ন সাঈদ দারেমী (র) কর্তৃক বর্ণিত মারফূ হাদীসটি এ মাসআলার সর্বাপেক্ষা উত্তম দলীল এবং হাদীসটি সহীহও বটে। তাহলো রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা জান্নাত সৃষ্টি করার পর ফেরেশতাগণ বললেন ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যও এমনটি বানিয়ে দিন, তা থেকে আমরা পানাহার করব। কারণ, আদম সন্তানের জন্য আপনি দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ আমি যাকে আমার নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছি তার পুণ্যবান সন্তানদেরকে কিছুতেই ওদের ন্যায় করব না, যাকে বলেছি, 'হও আর সে হয়ে গেছে।'

জিন সৃষ্টি ও শয়তানের কাহিনী

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ . وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ .

فبأى آلاء ربكما تكذبان .

অর্থাৎ– মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মত শুকনো মাটি থেকে এবং জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা থেকে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ? (৫৫ ঃ ১৪-১৬)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُوْمِ.

অর্থাৎ– আমি তো মানুষ সৃষ্টি করেছি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে এবং তার পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিন লু-হাওয়ার আগুন থেকে। (১৫ ঃ ২৬-২৭)

ইব্ন আব্বাস (রা), ইক্‌রিমা, মুজাহিদ ও হাসান (র) প্রমুখ বলেন, مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ অর্থ من طرف اللهب অর্থাৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের শীর্ষ প্রান্ত থেকে...। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ অর্থ من خالصه وأحنه অর্থাৎ তার নির্যাস ও সর্বোত্তম অংশ থেকে....। আর একটু আগে আমরা যুহরী, উরওয়া ও আয়েশা (রা) সূত্রে উল্লেখ করে এসেছি যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'ফেরেশতাকুলকে নূর থেকে এবং জিন জাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে সে উপাদান দ্বারা যার বিবরণ তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম)

বেশ কিছু তাফসীর বিশেষজ্ঞ বলেছেন যে, জিন জাতিকে আদম (আ)-এর পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়। তাদের পূর্বে পৃথিবীতে হিন ও বিনদের (এরা জিনদেরই একটি সম্প্রদায় বিশেষ) বসবাস ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা জিনদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করলে তারা তাদের কতককে হত্যা করে এবং কতককে পৃথিবী থেকে নির্বাসন দেয়। তারপর নিজেরাই সেখানে বসবাস করতে শুরু করে।

সুদ্দী (র) তাঁর তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবা থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন তা সৃষ্টি করা শেষ করে আরশে সমাসীন হন। তারপর ইবলীসকে দুনিয়ার ফেরেশতাদের প্রধান নিযুক্ত করেন। ইবলীস

ফেরেশতাদেরই একটি গোত্রভুক্ত ছিল যাদেরকে জিন বলা হতো। তাদেরকে জিন নামে এজন্য অভিহিত করা হতো, কারণ তারা হলো জান্নাতের রক্ষীবাহিনী। ইবলীসও তার ফেরেশতাদের সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করত। এক পর্যায়ে তার মনে এভাবের উদয় হয় যে, ফেরেশতাদের উপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলেই তো আল্লাহ আমাকে এ ক্ষমতা দান করেছেন।

যাহ্হাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জিনরা যখন পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে ও রক্তপাত করে তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে তাদের নিকট প্রেরণ করেন। তার সঙ্গে ছিল ফেরেশতাগণের একটি বাহিনী। তারা কতককে হত্যা করে এবং কতককে পৃথিবী থেকে তাড়িয়ে বিভিন্ন দ্বীপে নির্বাসন দেয়।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, পাপে লিপ্ত হওয়ার পূর্বে ইবলীসের নাম ছিল আযাযীল। সে ছিল পৃথিবীর বাসিন্দা। অধ্যবসায় ও জ্ঞানের দিক থেকে ফেরেশতাদের মধ্যে সেই ছিল সকলের সেরা। সে যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাদেরকে জিন বলা হয়।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবলীসের নাম ছিল আযাযীল। চার ডানাবিশিষ্ট ফেরেশতাগণের মধ্যে সে ছিল সকলের সেরা। হাজ্জাজ ও ইব্ন জুরায়েজের সূত্রে বর্ণিত আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, ইবলীস গোত্রের দিক থেকে আর সব ফেরেশতার চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানিত ছিল। সে ছিল জান্নাতসমূহের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তার হাতে ছিল নিম্ন আসমান ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব।

সালিহ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ ইবলীস আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করত। ইব্ন জারীর এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন। কাতাদা (র) সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবলীস নিম্ন আকাশের ফেরেশতাগণের প্রধান ছিল। হাসান বসরী (র) বলেন, ইবলীস এক পলকের জন্যও ফেরেশতার দলভুক্ত ছিল না। সে হলো আদি জিন, যেমন আদম হলেন আদি মানব। শাহ্র ইব্ন হাওশাব প্রমুখ বলেন, ইবলীস ঐসব জিনের একজন ছিল, যাদেরকে ফেরেশতাগণ বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইবলীসকে কয়েকজন ফেরেশতা বন্দী করে আকাশে নিয়ে যায়। ইব্ন জারীর (র) এ কথাটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁরা বলেন, তারপর যখন আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার সংকল্প করেন, যাতে পৃথিবীতে তিনি এবং পরে তার বংশধরগণ বসবাস করতে পারে এবং তিনি মাটি দ্বারা তাঁর দেহাবয়ব তৈরি করেন, তখন জিনদের প্রধান এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী আযাযীল বা ইবলীস তার চারদিকে ঘুরতে শুরু করে। যখন সে দেখতে পেল যে, তা একটি শূন্য গর্ভ, মূর্তি। তখন সে আঁচ করতে পারল যে, এটি এমন একটি দেহাবয়ব যার আত্মসংযম থাকবে না। তারপর সে বলল, যদি তোমার উপর আমাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়; তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে ধ্বংস করব আর যদি আমার উপর তোমাকে ক্ষমতা দেয়া হয়, তাহলে আমি অবশ্যই তোমার অবাধ্যতা করব। তারপর যখন আল্লাহ তা'আলা আদমের মধ্যে তাঁর রূহের সঞ্চার করেন এবং তাঁকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন, তখন প্রবল

হিংসাবশে ইবলীস তাঁকে সিজদা করা থেকে বিরত থাকে এবং বলে, আমি তার চাইতে উত্তম। আমাকে তুমি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ। আর তাকে সৃষ্টি করেছ কাদা মাটি থেকে। এভাবে ইবলীস আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ অমান্য করে এবং মহান প্রতিপালকের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলে। সে ভুল যুক্তি প্রদর্শন করে তাঁর প্রতিপালকের রহমত থেকে দূরে সরে যায় এবং ইবাদত করে যে মর্যাদা লাভ করেছিল তা থেকে বিচ্যুৎ হয়। উল্লেখ্য যে, ইবলীস ফেরেশতাগণের মতই ছিল বটে। তবে সে ফেরেশতা জাতিভুক্ত ছিল না। কারণ সে হলো আগুনের সৃষ্টি আর ফেরেশতারা হলেন নূরের সৃষ্টি। এভাবে তার সর্বাধিক প্রয়োজনের মুহূর্তে তার প্রকৃতি তাকে প্রতারিত করে এবং সে তার মূলের দিকে ফিরে যায়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ إِلَّا إِبْلِيْسَ. اَبٰى اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ.

অর্থাৎ- তখন ফেরেশতাগণ সকলেই একত্রে সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস করল না। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। (১৫ ঃ ৩০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. بِئْسَ لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلاً.

অর্থাৎ- এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, আদমের প্রতি সিজদা কর, তখন সকলেই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে জিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল। তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করছ ? তারা তো তোমাদের শত্রু। জালিমদের এ বিনিময় কত নিকৃষ্ট! (১৮ ঃ ৫০)

অবশেষে ইবলীসকে ঊর্ধ্বজগত থেকে নামিয়ে দেয়া হয় এবং সেখানে কোনরকম বাস করতে পারে এতটুকু স্থানও তার জন্য হারাম করে দেয়া হয়। অগত্যা সে অপদস্থ লাঞ্ছিত ধিকৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় পৃথিবীতে নেমে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে এবং তার অনুসারী জিন ও মানুষের জন্য জাহান্নামের সতর্ক বাণী জানিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সকল পথে ও ঘাঁটিতে আদম-সন্তানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা চালায়। যেমন সে বলেছিল ঃ

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلٰي يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيْلاً. قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوْرًا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. وَمَا يَعِدُهُمُ

الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوْرًا. إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيلًا.

অর্থাৎ- সে বলল, বলুন- তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন কেন ? কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরকে কর্তৃত্বাধীন করে ফেলব।

আল্লাহ্ বললেন, যাও, তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, জাহান্নামই তোমাদের সকলের শাস্তি – পূর্ণ শাস্তি। তোমার আহ্বানে তাদের মধ্যে যাকে পার তুমি পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং ধনে ও সন্তান-সন্তুতিতে শরীক হয়ে যাও এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র।

আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। (১৭ ঃ ৬২-৬৫)

পরে আদম (আ)-এর সৃষ্টির আলোচনায় আমরা কাহিনীটি বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করব। সারকথা, জিন জাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা আদম সন্তানদের মত পানাহার ও বংশ বিস্তার করে। তাদের কতক ঈমানদার ও কতক কাফির।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে সূরা আহ্কাফে বলেন ঃ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ. فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْا أَنْصِتُوْا. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ. قَالُوْا يٰقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ إِلَى الْحَقِّ وَإِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ. يٰقَوْمَنَا أَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ. وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖ أَوْلِيَاءُ. أُوْلٰئِكَ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ.

অর্থাৎ— স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হলো তারা একে অপরকে বলতে লাগল, চুপ করে শুন! যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো, তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট সতর্ককারীরূপে ফিরে গেল।

তারা বলেছিল, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শুনে এসেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও

এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ্ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।

কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয়, তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (৪৬ ঃ ২৯-৩২)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. يَهْدِيْ إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَااتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلاَ وَلَدًا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَي اللّٰهِ شَطَطًا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُوْلَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ وَالْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللّٰهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًارَّصَدًا. وَأَنَّا لاَنَدْرِى أَشَرٌّ أُرِيْدَ بِمَنْ فِيْ الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَبِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذَالِكَ. كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰي آمَنَّا بِهِ. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلاَ يَخَافُ بَخْسًا وَّلاَرَهَقًا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقَاسِطُوْنَ. فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. وَأَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. وَّأَنْ لَو اسْتَقَامُوْا عَلَي الطَّرِيْقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَّاءً غَدَقًا. لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ. وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.

অর্থাৎ– বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ দিয়ে শুনেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে, ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরিক স্থির করব না।

এবং নিশ্চয় সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেননি কোন পত্নী অথবা কোন সন্তান। এবং যে আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহর সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করত, অথচ আমরা মনে করতাম মানুষ এবং জিন আল্লাহ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা আরোপ করবে না।

আর যে কতিপয় মানুষ কতক জিনের শরণ নিত, ফলে তারা জিনদের অহংকার বাড়িয়ে দিত। আর জিনরা বলেছিল, তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাউকেও পুনরুত্থিত করবেন না।

এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ; আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।

আমরা জানি না জগদ্বাসীর অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাদের পালনকর্তা তাদের মঙ্গল সাধন করার ইচ্ছা রাখেন। এবং আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক তার ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী; এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে পরাভূত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না।

আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনলাম তখন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবে না। আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী, এবং কতক সীমালঙ্ঘনকারী। যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুনিশ্চিতভাবে সত্য পথ বেছে লয়। অপরপক্ষে সীমালংঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।

তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত তাদেরকে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম, যা দিয়ে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তিনি তাঁকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন। (৭২ ঃ ১-১৭)

সূরা আহকাফের শেষে আমরা এ সূরাটির তাফসীর এবং পূর্ণ কাহিনী উল্লেখ করেছি এবং সেখানে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহও উল্লেখ করেছি।

এরা ছিল নাসীবীন-এর জিনদের একটি দল। কোন কোন বর্ণনা মতে, তারা ছিল বুসরার জিন। রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কাভূমির 'বৎনে নাখলা'য় তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। এ সময় তারা তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে থেমে মনোযোগ সহকারে তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনতে থাকে। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের নিয়ে সারারাত ধরে বৈঠক করেন। এ সময় তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে তাঁর আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত কিছু বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তারা তাঁকে খাদ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তাদেরকে বললেন ঃ যেসব হাড়ের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হবে সেগুলোকে তোমরা গোশতে পরিপূর্ণ পাবে। আর গোবর মাত্রই তোমাদের জীব-জানোয়ারের খাদ্য। আর নবী করীম (সা) এ দুটো বস্তু দ্বারা ইসতিনজা করতে নিষেধ করে বলেছেন ঃ এ দু'টো বস্তু তোমাদের ভাইদের (জিনের) খাদ্য। এবং রাস্তায় পেশাব করতে তিনি নিষেধ করেছেন। কারণ, তা জিনদের আবাসস্থল। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদেরকে সূরা আররাহমান পাঠ করে শুনান। যখনই তিনি فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (তবে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ নিয়ামত তোমরা অস্বীকার করবে?) এ আয়াতটি পাঠ করতেন— তারা

বলতো, ولا بشي من الائك ربنا نكذب فلك الحمد —'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার কোন অবদানই আমরা অস্বীকার করি না। প্রশংসা তো সব তোমারই প্রাপ্য।'

পরবর্তীতে নবী করীম (সা) যখন লোকদেরকে এ সূরাটি পাঠ করে শুনান আর তারা নিশ্চুপ বসে থাকে, তখন তিনি এ ব্যাপারে জিনদের প্রশংসা করে বললেন : "উত্তরদানে তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম ছিল। যতবারই আমি তাদের নিকট فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ আয়াতটি পাঠ করেছি ততবারই তারা বলেছিল ولا بشي من الائك ربنا نكذب فلك الحمد। 'হে আমাদের প্রপিালক! তোমার কোন নিয়ামতই আমরা অস্বীকার করি না। প্রশংসা তো সব তোমারই প্রাপ্য। ইমাম তিরমিযী (র) যুবায়র (রা) সূত্রে এবং ইব্‌ন জারীর (র) ও বায্‌যার (র) ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মুমিন জিনদের ব্যাপারে এ মতভেদ আছে যে, তারা কি জান্নাতে প্রবেশ করবে, না কি তাদের পুরস্কার শুধু এ-ই হবে যে, তাদেরকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়া হবে না ? তবে সঠিক কথা হলো, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। কুরআনের বক্তব্যের ব্যাপ্তিই এর প্রমাণ। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ .

অর্থাৎ– আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় পোষণ করে তার জন্য আছে দু'টো জান্নাত। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ? (৫৫ : ৪৬)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতের কথা উল্লেখ করে জিনদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তারা জান্নাত না পাওয়ার হলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নেয়ামত দানের ওয়াদার কথা উল্লেখই করতেন না। এ ব্যাপারে এ দলীলটিই যথেষ্ট।

ইমাম বুখরী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) রাবী আবদুল্লাহকে বলেন, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ছাগল ও মুক্ত প্রান্তর পছন্দ কর। অতএব, যখন তুমি তোমার বকরীর পালে ও মাঠে-ময়দানে থাকবে, তখন উচ্চৈঃস্বরে আযান দেবে। কারণ জিন, মানুষ ও অন্য বস্তু যে-ই মুআয্‌যিনের শব্দ শুনতে পায়, কিয়ামতের দিন সে-ই তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এ কথাটি আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেছি। (বুখারী)

পক্ষান্তরে জিনদের মধ্যে যারা কাফির, শয়তান এদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের প্রধান নেতা হলো মানব জাতির আদি পিতা আদম (আ)-এর শত্রু ইবলীস। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এবং তার বংশধরকে আদম (আ) ও তার বংশধরের উপর ক্ষমতা দান করেছেন এবং যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর রাসূলগণকে বিশ্বাস করবে ও তাঁর শরীয়াতের অনুসরণ করবে; তিনি তাঁদের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا .

অর্থাৎ– আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। (১৭ : ৬৫)

অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوْهُ إِلاَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَمَاكَانَ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شَكٍّ. وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ حَفِيْظٌ

অর্থাৎ– তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল। ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সকলেই তার অনুসরণ করল; তাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না। কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা তাতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক (৩৪ ঃ ২০-২১)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَابَنِىْ اٰدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا اَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَتَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِيْنَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ.

অর্থাৎ— হে বনী আদম! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রলুব্ধ না করে, যেভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে সে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে নিজে এবং তার দলবল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না, যারা ঈমান আনে না শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক করেছি। (৭ ঃ ২৭)

মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا - مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْالَهُ سَاجِدِيْنَ. فَسَجَدَالْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ. إِلاَّ إِبْلِيْسَ أَبٰى أَنْ يَّكُوْنَ من مَعَ السَّاجِدِيْنَ. قَالَ يَاإِبْلِيْسُ مَالَكَ أَنْ لاَتَكُوْنَ مَعَ السّٰجِدِيْنَ. قَالَ الَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ. وَّإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ. إِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ. قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَنِىْ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ. إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ. قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ. إِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ

سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَوِيْنَ. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ.

অর্থাৎ-স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করছি। তারপর যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তার মধ্যে আমার রূহ্ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।

তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সিজদা করল কিন্তু ইবলীস করল না, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! তোমার কি হলো যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না।

সে বলল, আপনি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আমি তাকে সিজদা করবার নই। তিনি বললেন, তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কারণ তুমি বিতাড়িত এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রইল লা'নত।

সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। তিনি বললেন, যাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে, অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।

সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন তজ্জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে শোভন করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করব, তবে তাদের মধ্যে তোমার নির্বাচিত বান্দাদেরকে নয়।

আল্লাহ বললেন, এটাই আমার নিকট পৌঁছানোর সরল পথ, বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না। অবশ্যই তোমার অনুসারীদের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম; তার সাতটি দরজা আছে— প্রতি দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে। (১৫ ঃ ২৮-৪৪)

এ কাহিনী আল্লাহ্ তা'আলা সূরা বাকারা, আ'রাফ, ইসরা, তা-হা ও সা'দ-এ উল্লেখ করেছেন। আমার তাফসীরের কিতাবে যথাস্থানে সে সব বিষয়ে আমি আলোচনা করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য। আর আদম (আ)-এর কাহিনীতেও তা উপস্থাপন করব, ইনশাআল্লাহ।

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য ইবলীসকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ প্রদান করেন।

যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شَكٍّ. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ.

অর্থাৎ– তাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না। কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা তাতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেওয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। (৩৪ ঃ ২১)

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُوْمُوْنِي وَلُوْمُوْا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ. إِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. وَأُدْخِلَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَامٌ.

অর্থাৎ– যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি। আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি। আমার তো তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিল না, আমি কেবল তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, তোমরা নিজেদের প্রতি দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহর শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। জালিমদের জন্য তো মর্মন্তুদ শাস্তি আছেই। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের দাখিল করা হবে জান্নাতে– যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম। (১৪ ঃ ২২-২৩)

ফলকথা, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী ইবলীস এখনো জীবিত এবং কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশপ্রাপ্ত। তার প্রতি আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক। সমুদ্র পৃষ্ঠে তার একটি সিংহাসন আছে আর তাতে সমাসীন হয়ে সে তার বাহিনী প্রেরণ করে, যারা মানুষের মাঝে অনিষ্ট করে এবং বিপর্যয় বাঁধায়। তবে আল্লাহ্ তা'আলা আগেই বলে রেখেছেন ঃ

إن كيد الشيطان كان ضعيفا শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল। (৪ ঃ ৭৬)

মহাপাপের আগে ইবলীসের নাম ছিল আযাযীল। নাক্কাশ বলেন, তার উপনাম হলো আবূ কারদূস। আর এ জন্যই নবী করীম (সা) যখন ইব্ন সায়াদকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি দেখতে পাও ? সে বলেছিল, আমি পানির উপর একটি সিংহাসন দেখতে পাই। তখন নবী করীম (সা) তাকে বলেছিলেন, 'তুই লাঞ্ছিত হ, তুই কিছুতেই তোর নির্ধারিত সীমা ডিংগাতে পারবি না।' মোটকথা, নবী করীম (সা) এ কথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের শক্তি হলো সেই শয়তানের প্রদত্ত। যার সিংহাসন সমুদ্রের উপর বিছানো বলে সে দেখে থাকে। আর এজন্যই নবী করীম (সা) বলেছিলেন, তুই লাঞ্ছিত হ। কিছুতেই তুই তোর সীমা ডিংগাতে পারবি না। অর্থাৎ কোন রকমেই তুই তোর হীন ও তুচ্ছ মর্যাদা অতিক্রম করতে পারবি না।

ইবলীসের সিংহাসন সমুদ্রের উপর অবস্থিত হওয়ার প্রমাণ হলো, ইমাম আহমদ (র)-এর হাদীস। তাতে জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ইবলীসের সিংহাসন হলো সমুদ্রের উপর। প্রত্যহ সে তার বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণ করে, যারা মানুষের মধ্যে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে থাকে। মানুষের জন্য সেরা ফেতনা সৃষ্টি করে যে অনুচর, ইবলীসের নিকট মর্যাদায় সে সকলের চাইতে সেরা।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, ইবলীসের সিংহাসন হলো সমুদ্রের উপর। সে তার বাহিনীসমূহ প্রেরণ করে, যারা জনসমাজে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে বেড়ায়। ফেৎনা সৃষ্টিতে যে তাদের সেরা, তার কাছে সে-ই সকলের বড়। এ সূত্রে ইমাম আহমদ (র) এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) সূত্রে ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইব্‌ন সায়াদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী দেখতে পাও ? সে বলল, আমি পানির উপর কিংবা (বলল) সমুদ্রের উপর একটি সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি, যার আশেপাশে আছে কয়েকটি সাপ। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, ওটাই ইবলীসের সিংহাসন।

ইমাম আহমদ (র) 'মুসনাদে আবূ সাঈদ'-এ বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইব্‌ন সায়াদকে বললেন, তুমি কী দেখতে পাচ্ছ ? ইব্‌ন সায়াদ বলল, আমি সমুদ্রের উপর একটি সিংহাসন দেখতে পাচ্ছি, যার আশেপাশে আছে সর্পরাজি। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ ও যথার্থ বলেছে। ওটাই ইবলীসের সিংহাসন।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ যে, সালাত আদায়কারীরা তার ইবাদত করবে। কিন্তু পরস্পরে বিভেদ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা তার অব্যাহত রয়েছে।"

ইমাম মুসলিম (র) জাবির (রা) সূত্রে বর্ণিত আ'মাশের হাদীস থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেন ঃ "শয়তান তার সিংহাসনকে পানির উপর স্থাপন করে। তারপর জনসমাজে তার বাহিনীসমূহ প্রেরণ করে। তার দৃষ্টিতে ফেৎনা সৃষ্টি করায় যে যত বড়, মর্যাদায় সে তার তত বেশি নৈকট্যের অধিকারী। তাদের কেউ একজন আসে আর বলে যে, আমি অমুকের পেছনে লেগেই থাকি। অবশেষে তাকে এমন অবস্থায় রেখে এসেছি যে, সে এমন এমন জঘন্য কথা বলে বেড়াচ্ছে। একথা শুনে ইবলীস বলে— না, আল্লাহর শপথ! তুমি কিছুই করনি। আবার আরেকজন এসে বলে— আমি অমুক ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েই তবে ছেড়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, একথা শুনে শয়তান তাকে কাছে টেনে আনে আর বলে, نعم أنت কত উত্তম কাজই না তুমি করেছো! এক বর্ণনায় نعم-এর নূনকে ফাতহা দ্বারা পড়া হয়েছে। যার অর্থ نعم أنت ذاك الذى تستحق الإكرام অর্থাৎ তুমি মর্যাদা পাওয়ার উপযুক্ত বটে! আবার কাসরা দ্বারা পড়ার কথাও আছে।

আমাদের শায়খ আবুল হাজ্জাজ প্রথমটিকে সমর্থন করে তাঁকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এ হাদীসটি আমরা مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এনেছি। আয়াতটির অর্থ হলো, শয়তানদের থেকে লব্ধ যাদু-মানুষ-শয়তান হোক বা জিন-শয়তান—দু'ই পরম আপনজনের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হওয়াই তার পরিণতি। এজন্যই শয়তান সে ব্যক্তির চেষ্টা-সাধনায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে থাকে, যার দ্বারা এ কাজ সাধিত হয়। মোটকথা, আল্লাহ যাকে নিন্দা করেছেন, ইবলীস করে তার প্রশংসা এবং যার প্রতি আল্লাহ্ হন রুষ্ট, শয়তান হয় তার প্রতি প্রসন্ন। তার প্রতি আল্লাহর লা'নত!

এদিকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রকার অনিষ্ট—সেগুলোর মাধ্যমসমূহ এবং সেগুলোর অশুভ পরিণাম থেকে রক্ষার উপায় হিসেবে ফালাক ও নাস দু'টো সূরা নাযিল করেছেন। বিশেষত সূরা নাস যার মর্ম হলো ঃ

"বল, আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের নিকট আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।" (১১৪ ঃ ১-৬)

সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রা) সূত্রে এবং সহীহ্ বুখারীতে হুসায়ন কন্যা সাফিয়া (র) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের শিরায় শিরায় চলাচল করে থাকে।

হাকিম আবূ ইয়া'লা আল-মূসিলী বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ শয়তান আদম সন্তানের হৃৎপিণ্ডের উপর তার নাকের অগ্রভাগ স্থাপন করে আছে। যদি আদম সন্তান আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে শয়তান পিছিয়ে যায়। আর যদি সে আল্লাহকে বিস্মৃত হয়, তাহলে শয়তান তার হৃদয়কে কব্জা করে নেয়। এটাই হলো, اَلْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ। বা আত্মগোপনকারীর কুমন্ত্রণা। উল্লেখ্য, যেভাবে আল্লাহর (মৌখিক) যিকর অন্তর থেকে শয়তানকে বিতাড়িত করে, ঠিক সেভাবে তা মানুষকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভুলে যাওয়া ব্যক্তিকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اُذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ .

'যদি তুমি ভুলে যাও, তবে তোমার প্রতিপালককে স্মরণ করবে।' (১৮ ঃ ২৪)

আবার মূসা (আ)-এর সঙ্গী তাকে বলেছিলেন ঃ

وَمَا اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ .

অর্থাৎ– শয়তানই তার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। (১৮ ঃ ৬৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ .

অর্থাৎ– শয়তান তাকে তার প্রভুর নিকট তার বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দিল (১২ ঃ ৪২)

অর্থাৎ ইউসুফ (আ) যখন সাকীকে বলেছিলেন যে, তুমি তোমার মনিবের নিকট আমার কথা বলবে, সে তার মনিব বাদশাহ্র নিকট তা বলতে ভুলে গিয়েছিল। আর এ ভুলে যাওয়াটা ছিল শয়তানের পক্ষ থেকে। ফলে ইউসুফ (আ) কয়েক বছর কারাগারে অবরুদ্ধ থাকেন। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা পরে বলেন ঃ - وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ

অর্থাৎ– দু'জন কারাবন্দীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হলো সে বলল, ... । (ইউসুফ ঃ ৪৫)
بَعْدَ اُمَّةٍ অর্থাৎ بَعْدَ مُدَّةٍ দীর্ঘকাল পরে। আবার কেউ কেউ بَعْدَ اُمَّةٍ এর অর্থ করেছেন بَعْدَ نِسْيَانٍ অর্থাৎ ভুলে যাওয়ার পর। আর এই যে আমরা বললাম, সে লোকটি ভুলে গিয়েছিল; সে হলো সাকী; দু'অভিমতের মধ্যে এটাই সঠিক কথা। তাফসীরে আমরা একে সপ্রমাণ বর্ণনা করেছি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আসিম (র) বলেন যে, আমি আবূ তামীমা (র) কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সওয়ারীতে তাঁর পেছনে উপবেশনকারী এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, একদিন নবী করীম (সা)-কে নিয়ে তাঁর গাধা হোঁচট খায়। তখন আমি বললাম, শয়তান বদনজর করেছে। আমার একথা শুনে নবী করীম (সা) বললেন ঃ শয়তান বদনজর করেছে, বলো না। কেননা, যখন তুমি বলবে শয়তান বদনজর করেছে; তখন সে গর্বিত হয়ে যাবে আর বলবে; আমার শক্তি দ্বারা আমি তাকে ধরাশায়ী করেছি। আর যখন তুমি বলবে, 'বিসমিল্লাহ্' তখন ছোট হতে হতে সে মাছির ন্যায় হয়ে যায়। এ হাদীসটি কেবল ইমাম আহমদই বর্ণনা করেছেন। এর সনদ উত্তম।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে এলে শয়তান মানুষকে এভাবে বশীভূত করে, যেভাবে কেউ তার বাহনকে শান্ত করে একান্তে বসার ন্যায়, তারপর তাকে লাগাম পরিয়ে দেয়।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, লক্ষ্য করলে তোমরা তা দেখতে পাবে। শয়তান যাকে কোণঠাসা করে, দেখবে সে নত হয়ে কেবল আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকে। আর যাকে লাগাম পরায় সে মুখ খুলে হা করে বসে থাকে– আল্লাহ্র যিক্র করে না। ইমাম আহমদ (র) এককভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "বদনজর যে হয়ে থাকে তা সত্য। তাতে শয়তান ও বনী আদমের হিংসা বিদ্যমান থাকে।"

তাঁর আরেক বর্ণনায় আছে যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মনে এমন এমন কল্পনা জাগ্রত হয় যে, তা ব্যক্ত করার চাইতে আকাশ থেকে পড়ে যাওয়াই আমার নিকট শ্রেয় মনে হয়। শুনে নবী করীম (সা) বললেন ঃ "আল্লাহু আকবার। সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর যিনি শয়তানের চক্রান্তকে কুমন্ত্রণায় পরিণত করে দিয়েছেন।"

ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) মানসূর-এর হাদীস থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নাসঈ এবং আ'মাশ হযরত আবূ যর (রা) সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "শয়তান তোমাদের এক একজনের কাছে এসে বলে, এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে ? শেষ পর্যন্ত বলে যে, তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে ? সুতরাং কেউ এ পরিস্থিতির

সম্মুখীন হলে যেন সে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং এখানেই ক্ষান্ত দেয়। ইমাম মুসলিম (র) লায়ছ, যুহরী ও হিশামের হাদীস থেকে, পরের দুজন উরওয়া থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ.

অর্থাৎ– যারা তাকওয়ার অধিকারী হয় তাদেরকে শয়তান যখন কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়। (৭ ঃ ২০১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُلْ رَّبِّ أَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ . وَأَعُوْذُبِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنِ.

অর্থাৎ– বল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা থেকে। হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি থেকে। (২৩ ঃ ৯৭-৯৮)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. إِنَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থাৎ- যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্‌র শরণ নেবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (৭ ঃ ২০০)

আরেক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَي الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُوْنَ.

অর্থাৎ— যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে তুমি আল্লাহর শরণ নেবে। যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকেরই উপর নির্ভর করে তাদের উপর তার আধিপত্য নেই। তার আধিপত্য তো কেবল তাদেরই উপর যাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহ্‌র শরীক করে। (১৬ ঃ ৯৮ - ১০০)

ইমাম আহমদ (র) ও সুনান সংকলকগণ আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণিত আবুল মুতাওয়াক্কিল-এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন ঃ

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.

অর্থাৎ– আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তানের হামায, নাফাখ ও নাফাছ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

জুবায়র ইব্ন মুতইম, আবূল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) এবং আবূ উমামা বাহিলীর বর্ণনা থেকেও এরূপ পাওয়া যায়। আর হাদীসে এর এরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, همزه অর্থ হচ্ছে শয়তান কর্তৃক শ্বাসরুদ্ধকরণ বা কাবু করা نفخه তার অহংকার আর نفثه তার কাব্য।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন তখন তিনি বলতেন ঃ

اعوذ بالله من الخبث والخبائث.

অর্থাৎ– "আমি আল্লাহর নিকট خبث ও خبائث থেকে আশ্রয় চাই।" বহু সংখ্যক আলিম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) পুরুষ শয়তান ও মহিলা শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। (অর্থাৎ– তাদের মতে خبث অর্থ পুরুষ শয়তানের দল ও خبائث অর্থ মহিলা শয়তানের দল)।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কেউ পায়খানায় গেলে সে যেন আড়াল করে নেয়। যদি সে মাটিকে স্তূপীকৃত করা ব্যতীত অন্য কিছু না পায় তবে যেন তা-ই করে তা পেছনে রেখে বসে। কারণ, শয়তান আদম সন্তানের নিতম্ব নিয়ে খেলা করে। যে ব্যক্তি এরূপ করে সে ভালো করবে আর একান্ত তা না পারলে ক্ষতি নেই। ইমাম আবূ দাউদ ও ইব্ন মাজাহ্ ছাওর ইব্ন য়াযীদ-এর হাদীস থেকে এ হাদীছসট বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, সুলায়মান ইব্ন সুরাদ বলেছেন, নবী করীম (সা) -এর দরবারে দু'জন লোক একে অপরকে গালাগাল করে। আমরা তখন তাঁর নিকট বসা ছিলাম। দেখলাম, ওদের একজন তার সঙ্গীকে এমন রাগান্বিত হয়ে গালাগাল করছে যে, তার চেহারা লাল হয়ে গেছে। তা দেখে নবী করীম (সা) বললেন ঃ আমি অবশ্য এমন একটি কথা জানি, যদি সে তা বলে তাহলে তার রাগ দূরীভূত হবে। যদি সে বলে ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।' একথা শুনে উপস্থিত লোকজন লোকটিকে বলল, তুমি কি শুনছ না নবী করীম (সা) কি বলছেন ? উত্তরে সে বলল, 'আমি পাগল নই।' ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ এবং নাসাঈও আমাশ থেকে বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে পানাহার না করে। কারণ শয়তান বাম হাতে পানাহার করে থাকে।' এ সনদে এটা ইমাম বুখারী ও মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ। আর সহীহ বুখারীতে এ হাদীসটি অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি তার বাম হাতে আহার করে, তার সঙ্গে শয়তান আহার করে আর যে ব্যক্তি তার বাম হাতে পান করে শয়তানও তার সঙ্গে পান করে।"

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ যিয়াদ তাহ্‌হান (র) বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী করীম (সা) এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে পান করতে দেখে তাকে বললেন ঃ বমি কর। লোকটি বলল, কেন ? নবী করীম (সা) বললেন, "তুমি কি এতে খুশী হবে যে, তোমার সঙ্গে বিড়াল পান করুক ? সে বলল, জ্বী না। তখন নবী করীম (সা) বললেন ঃ কিন্তু তোমার সঙ্গে তো এমন এক প্রাণী পান করেছে, যে বিড়ালের চাইতেও নিকৃষ্ট অর্থাৎ শয়তান। এ সূত্রে ইমাম আহমদ (র) এককভাবেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তিনি আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পান করে, যদি সে জানত তার পেটে কি আছে, তাহলে অবশ্যই সে ইচ্ছে করে বমি করত।' এ হাদীসটি ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, আপনি কি নবী করীম (সা)-কে একথা বলতে শুনেছেন যে, মানুষ ঘরে প্রবেশকালে এবং আহারের সময় 'বিসমিল্লাহ' বললে শয়তান তার সঙ্গীদেরকে বলে, এখানে তোমাদের থাকাও নেই, খাবারও নেই। আর প্রবেশকালে বিসমিল্লাহ্ না বললে শয়তান বলে, তোমরা রাত যাপনের জায়গা পেয়ে গেছ এবং আহারের সময় 'বিসমিল্লাহ্' না বললে শয়তান বলে, তোমরা রাত যাপনের জায়গা এবং রাতের খাবার পেয়ে গেছ ? জবাবে জাবির (রা) বললেন, হ্যাঁ।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সূর্যোদয়কালে যখন তার প্রান্তদেশ দেখা যায়, তখন পুরোপুরি তা উদিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সালাত স্থগিত রাখ এবং যখন সূর্য অস্ত যেতে থাকে তা পুরোপুরি না ডুবা পর্যন্ত সালাত স্থগিত রাখ। আর সূর্যের উদয় ও অস্তকে তোমরা নামাযের সময় সাব্যস্ত করো না। কারণ সুর্য শয়তানের দু' শিং-এর মধ্যবর্তী স্থানে উদিত হয়ে থাকে। ইমাম মুসলিম এবং নাসাঈও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখেছি যে, তিনি পূর্বদিকে ইশারা করে বলেছিলেন ঃ শুনে রেখ, ফেতনা এখানে, ফেতনা এখানে, যেখান থেকে শয়তানের শিং আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) রৌদ্র ও ছায়ার মাঝখানে বসতে নিষেধ করে বলেছেন; তা হলো শয়তানের মজলিস। হাদীস বিশারদগণ এর কয়েকটি অর্থের উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো এই যে, যেহেতু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, এরূপ স্থানে বসলে অঙ্গ সৌষ্ঠব নষ্ট হয়, তাই শয়তান তা পছন্দ করে। কেননা, তার নিজের অবয়বই কুৎসিত। আর এটা সর্বজন বেদিত।

এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ

অর্থাৎ- তার (জাহান্নামের তলদেশ থেকে উদ্গত যাক্কুম বৃক্ষের) মোচা যেন শয়তানের মাথা। (৩৭ ঃ ৬৫)

সঠিক কথা হলো, আয়াতে শয়তান বলতে শয়তানই বুঝানো হয়েছে- এক শ্রেণীর গাছ নয় যেমন কোন কোন তাফসীরবিদের ধারণা। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। কেননা, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মানুষের মনে এ বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে, শয়তান কদর্যতার এবং ফেরেশতাগণ সৌন্দর্যের আধার।

আর এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ তার মোচা যেন শয়তানের মাথা।

পক্ষান্তরে ইউসুফ (আ)-এর রূপ দেখে মহিলাগণ বলেছিল ঃ

حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ.

অর্থাৎ-অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয় এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশ্তা। (১২ ঃ ৩১)

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ "রাত যখন ছায়াপাত করে তখন তোমরা তোমাদের শিশু-কিশোরদেরকে ঘরে আটকে রাখবে। কারণ শয়তানগণ এ সময়ে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর রাতের কিছু সময় পার হয়ে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দেবে এবং দরজা বন্ধ করে আল্লাহর নাম নেবে। বাতি নিভিয়ে দেবে ও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে, পানপাত্রের মুখ বেঁধে রাখবে ও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে এবং বরতন ঢেকে রাখবে ও আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে। তার উপর কিছু একটা ফেলে রেখে হলেও তা করবে।"

ইমাম আহমদ (র) ইয়াহয়া ও ইব্ন জুরায়জের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় আছে فان الشيطان لا يفتح مغلقا শয়তান বন্ধ জিনিস খুলতে পারে না।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "তোমরা তোমাদের দরজাগুলো বন্ধ করে দাও, বরতনগুলো ঢেকে রাখ, পানপাত্রগুলোর মুখ বেঁধে রাখ এবং বাতিগুলো নিভিয়ে দাও। কারণ শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না, ঢাকনা উন্মুক্ত করে না এবং বন্ধন খুলে না, আর ইঁদুর তো বসবাসকারীদেরসহ ঘরে আগুনই ধরিয়ে দেয়।"

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আপন স্ত্রীগমনকালে তোমাদের কেউ যদি বলে ঃ

اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنى .

'হে আল্লাহ! আমাদেরকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাকে তুমি যা দান করেছ, তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখ।' তাহলে এ মিলনে তাদের কোন সন্তান জন্মালে শয়তান তার ক্ষতি করতে পারে না এবং তার উপর তার আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না।

হাদীসটি ভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আরেকটি রিওয়ায়তে ঈষৎ পরিবর্তনসহ উক্ত দু'আর পূর্বে বিসমিল্লাহ শব্দটি অতিরিক্ত এসেছে। ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা

(রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ 'তোমাদের কেউ ঘুমালে শয়তান তার মাথার পশ্চাৎভাগে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতিটি গিঁট দেওয়ার সময় সে বলে, দীর্ঘ রাত আছে তুমি ঘুমাও! যদি সে জেগে ওঠার পর আল্লাহকে স্মরণ করে, তাহলে একটি গিঁট খুলে যায়। তারপর যদি ওযূ করে তাহলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। তারপর যদি সে সালাত আদায় করে তাহলে সবক'টি গিঁটই খুলে যায়। ফলে সে প্রফুল্ল ও প্রশান্ত চিত্তে সকালে ওঠে। অন্যথায় সে সকালে ওঠে কলুষিত মন ও অলস দেহ নিয়ে।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জেগে ওঠে এবং ওযূ করতে যায় তখন সে যেন তিনবার পানি নিয়ে নাক ঝেড়ে নেয়। কেননা, শয়তান তার নাকের ছিদ্রে রাতযাপন করে থাকে।

ইমাম মুসলিম এবং ইমাম নাসাঈ ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আলোচনা হলো যে, এক ব্যক্তি সারারাত নিদ্রা যায়। তারপর ভোর হলে জাগ্রত হয়। শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, লোকটির দু'কানে তো শয়তান পেশাব করে দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) দু' কানে বললেন, নাকি শুধু কানে বললেন—এ ব্যাপারে রাবী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ইমাম মুসলিম, ইমাম বুখারী, নাসাঈ এবং ইব্ন মাজাহ্ ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "যখন নামাযের আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পিছু হটে যায়। আযান শেষ হয়ে গেলে আবার এসে পড়ে। তারপর ইকামতকালে শয়তান আবার হটে যায়। ইকামত শেষ হয়ে গেলে আবার এসে সে মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে অবস্থান নেয় এবং বলতে শুরু করে যে, তুমি এটা স্মরণ কর, ওটা স্মরণ কর। শেষ পর্যন্ত লোকটি ভুলেই যায় যে, সে নামায তিন রাকআত পড়ল, নাকি চার রাকআত। তারপর তিন রাকআত পড়ল, নাকি চার রাকআত পড়ল তা নির্ণয় করতে না পেরে দু'টি সিজদা সাহু করে নেয়।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "তোমরা (নামাযের) সারিগুলো ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট করে নাও। কারণ শয়তান ফাঁকে দাঁড়িয়ে যায়।"

আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলতেন ঃ তোমরা সারিগুলো ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট করে নাও, এক সারিকে আরেক সারির কাছাকাছি করে নাও এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নাও। যে সত্তার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, তাঁর শপথ! নিঃসন্দেহে আমি দেখতে পাচ্ছি যে, শয়তান সারির ফাঁকা জায়গায় ঢুকে পড়ে, যেন সে একটি পাখি।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "তোমাদের কারো সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলে, যেন সে তাকে বাধা দেয়। যদি সে অগ্রাহ্য করে তাহলে যেন আবারও বাধা দেয়। এবারও যদি অগ্রাহ্য করে, তাহলে যেন সে তার সঙ্গে লড়াই করে। কারণ সে আস্ত শয়তান।" মুসলিম এবং আবূ দাউদ (র)-ও ভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আহমদ (র) বর্ণনা কলেন যে, আবূ উবায়দ (র) বলেন, আমি আতা ইব্ন য়াযীদ লায়ছী (র)-কে দেখলাম যে, তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। তারপর আমি তাঁর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে তিনি আমাকে ফিরিয়ে দেন। পরে তিনি বললেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন ফজর নামায আদায় করছিলেন আর তিনি [আবূ সাঈদ (রা)] তাঁর পেছনে কিরাআত পড়ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কিরাআত পাঠে বিঘ্ন ঘটে। সালাত শেষ করে তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা আমার ও ইবলীসের ব্যাপারটি দেখতে! হাত বাড়িয়ে আমি ওর গলাটিপে ধরেছিলাম। এমনকি আমি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলিও তার পাশের অঙ্গুলির মাঝখানে ওর মুখের লালার শীতলতা অনুভব করি। আমার ভাই সুলায়মানের দু'আ না থাকলে নিঃসন্দেহে ও মসজিদের কোন একটি খুঁটির সঙ্গে শৃংখলাবদ্ধ হয়ে যেত আর মদীনার শিশুরা তাকে নিয়ে খেলতো। অতএব, তোমাদের মধ্যকার যার এ ক্ষমতা আছে যে, সে তার ও কেবলার মধ্যকার অন্তরায় ঠেকাতে পারবে তাহলে সে যেন তা অবশ্যই করে।"

ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটির 'যার ক্ষমতা আছে'... অংশটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন কোন এক সালাত আদায় করে বললেন, "শয়তান এসে আমার সালাত নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ তাকে কাবু করার শক্তি আমাকে দান করেছেন।" ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ (র) হাদীসটি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

সুলায়মান (আ) সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা সংবাদ প্রদান করেন যে, তিনি বলেছিলেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ .

অর্থাৎ- হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ যেন না হয়, তুমি তো পরম দাতা। (৩৮ ঃ ৩৫)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আমার সালাত বরবাদ করার জন্য গত রাতে দুষ্ট এক জিন আমার উপর চড়াও হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কাবু করার শক্তি আমাকে দান করেন। ফলে আমার ইচ্ছে হলো, তাকে ধরে এনে মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখি আর ভোরে উঠে তোমরা সকলেই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু পরক্ষণে আমার ভাই সুলায়মান (আ)-এর رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْ لِىْ الخ. এ উক্তিটি মনে পড়ে যায়। রাবী বলেন, ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ব্যর্থ মনোরথ করে ফিরিয়ে দেন।

মুসলিম (র) আবুদ্দারদা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন সালাত আদায়ে রত হন। এমন সময় আমরা হঠাৎ শুনতে পেলাম যে, তিনি বলছেন ঃ اعوذ بالله منك (তোমার থেকে আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই)। তারপর তিনি বললেন ঃالعنك بلعنة الله (তোমার প্রতি আল্লাহর লা'নত হোক!) এ কথাটি তিনবার বলে তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন, যেন তিনি কিছু একটা ধরছেন। তারপর সালাত শেষ হলে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সালাতের মধ্যে আমরা আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনলাম যা ইতিপূর্বে আমরা আপনাকে বলতে শুনিনি! আবার আপনাকে দেখলাম যে, আপনি আপনার হাত প্রসারিত করলেন! জবাবে তিনি বললেন ঃ "আমার মুখে নিক্ষেপ করার জন্য আল্লাহর দুশমন ইবলীস

একটি অগ্নিপিণ্ড নিয়ে আসে। তাই আমি তিনবার বললাম, اعوذ بالله منك। তারপর বললাম, العنك بلعنة الله التامة। কিন্তু সে সরলো না, তারপর আমি তাকে ধরতে মনস্থ করি। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি আমাদের ভাই সুলায়মানের দু'আ না থাকত; তাহলে সে বন্দী হয়ে যেত আর মদীনাবাসীদের শিশু সন্তানরা তাকে নিয়ে খেলা করত।"

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ.

অর্থাৎ–পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক (অর্থাৎ শয়তান) যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। (৩১ ঃ ৩৩)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا اِنَّمَا يَدْعُوْ حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ.

অর্থাৎ–শয়তান তোমাদের দুশমন, সুতরাং তাকে তোমরা শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে কেবল এ জন্য আহ্বান করে, যেন তারা জাহান্নামী হয়। (৩৫ ঃ ৬)

মোটকথা, চলা-ফেরা, উঠা-বসা ইত্যাদি অবস্থায় শয়তান মানুষের সর্বনাশ করার ব্যাপারে তার চেষ্টা ও শক্তি প্রয়োগে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। যেমন ঃ হাফিজ আবূ বকর ইব্‌ন আবুদ্দুনিয়া (র) 'মাসায়িদিশ শয়তান' (শয়তানের ফাঁদ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান।

আবূ দাউদ শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর দু'আয় বলতেন ঃ

واعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت.

মৃত্যুর সময় শয়তানের ছোবল থেকে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি!

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, শয়তান বলেছিল ঃ

يا رب وعزك وجلالك لا ازال اغو يهم مادامت ارواحهم في اجسادهم.

অর্থাৎ–'হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্‌যত ও জালাল-এর শপথ করে বলছি, তাদের দেহে প্রাণ থাকা পর্যন্ত আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করতেই থাকব।'

আর আল্লাহ্ তা'আলা এর জবাবে বলেছিলেন ঃ

وعزتي وجلالي ولاازال اغفر لهم ما استغفروني.

অর্থাৎ–'আর আমি আমার ইয্‌যত ও জালাল-এর শপথ করে বলছি, তারা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নিকট ক্ষমা চাইতে থাকবে; আমি তাদেরকে ক্ষমা করতেই থাকব।'

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

অর্থাৎ—শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা এবং অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (২ ঃ ২৬৮)

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতিই সঠিক ও সত্য। আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি মাত্রই বাতিল।

তিরমিযী ও নাসাঈ এবং ইব্ন হিব্বান (র) তাঁর সহীহে আর ইব্ন আবূ হাতিম (র) তাঁর তাফসীরে ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আদম সন্তানের সঙ্গে শয়তানের একটি ছোঁয়াচ আছে এবং ফেরেশতাদের একটি ছোঁয়াচ আছে। শয়তানের ছোঁয়াচ হলো, মন্দের প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা আর ফেরেশতাদের ছোঁয়াচ হলো, কল্যাণের প্রতিশ্রুতি প্রদান ও সত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করা। সুতরাং কেউ এটি অনুভব করলে সে যেন বুঝে নেয় যে, তা আল্লাহ্রই পক্ষ থেকে। ফলে যেন সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অপরটি অনুভব করবে, সে যেন শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে।" তারপর তিনি اَلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ الخ আয়াতটি পাঠ করেন।

সূরা বাকারার ফযীলতে আমরা উল্লেখ করেছি যে, শয়তান সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়, যে ঘরে সূরা বাকারা পাঠ করা হয়। আবার আয়াতুল কুরসীর ফযীলতে উল্লেখ করেছি যে, যে ব্যক্তি রাতে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে ভোর হওয়া পর্যন্ত শয়তান তার কাছে ঘেঁষতে পারে না।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একশ' বার — لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير . পাঠ করবে; তা তার জন্য দশটি গোলাম আযাদ করার তুল্য হবে, তার নামে একশ নেকী লেখা হবে ও তার একশ গুনাহ মুছে ফেলা হবে এবং তা সে দিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য শয়তান থেকে নিরাপত্তাস্বরূপ হবে। আর তার চাইতে অধিক আমলকারী ব্যতীত অন্য কেউই তার থেকে উত্তম আমলের অধিকারী বলে বিবেচিত হবে না।

ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও ইব্ন মাজাহ্ (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় প্রত্যেক বনী আদমের দু'পার্শ্বে শয়তান তার আঙ্গুল দ্বারা খোঁচা দেয়। তবে মারয়াম পুত্র ঈসা (আ) তার ব্যতিক্রম। তাঁকে খোঁচা দিতে গিয়ে শয়তান তাঁর দেহে জড়ানো আবরণে খোঁচা দিয়ে আসে।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ التثاؤب من الشيطان فاذا تثاؤب احدكم فليرده ما استطاع فان احدكم اذا قال (ها) ضحك الشيطان .

অর্থাৎ— "হাই তোলা হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব, তোমাদের কারো হাই আসলে, সে যেন যথাসম্ভব তা রোধ করে। কারণ (হাই আসার সময়) তোমাদের কেউ 'হা' বললে শয়তান হেসে দেয়।

আহমদ, আবূ দাউদ এবং তিরমিযী (র) ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম নাসাঈ (র) হাদীসটি সহীহ বলে রায় দিয়েছেন। এ হাদীসের অন্য পাঠে আছে—

اذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل.

অর্থাৎ— তোমাদের কারো হাই আসলে সে যেন যথাসম্ভব তা দমন করে। কারণ (হাই তোলার সময়) শয়তান ভিতরে ঢুকে পড়ে।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

ان الله يحب العطاس ويبغض او يكره التثاؤب فإذا قال احدكم ها ها فانما ذالك الشيطان يضحك من جوفه.

অর্থাৎ—আল্লাহ্ তা'আলা হাঁচি পছন্দ করেন আর হাই তোলা ঘৃণা করেন অথবা (রাবী বলেন, অপছন্দ করেন) (হাই তোলার সময়) তোমাদের কেউ হা-হা বললে শয়তান একেবারে তার পেট থেকে হাসতে থাকে। ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি নবী করীম (সা)-কে মানুষের সালাতের মধ্যে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। উত্তরে তিনি বললেন ঃ هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم.

অর্থাৎ— "এ হলো, ছিনতাই যা তোমাদের কারো সালাত থেকে শয়তান ছিনিয়ে নিয়ে যায়।"

ইমাম আবূ দাউদ ও নাসাঈ (র) ভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم احدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فانها لا تضره.

অর্থাৎ— সুস্বপ্ন হয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। আর অলীক স্বপ্ন হয় শয়তানের পক্ষ থেকে। অতএব, তোমাদের কেউ ভয়ংকর কোন দুঃস্বপ্ন দেখলে, সে যেন তার বাম দিকে থুথু ফেলে এবং তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। এতে সে তার অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ

لا يشيرن احدكم الى اخيه بالسلاح فإنه لايدرى احدكم لعل الشيطان أن ينزغ فى يده فيقع فى حفرة من النار.

অর্থাৎ— তোমাদের কেউ কিছুতেই যেন তার কোন ভাইয়ের প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা না করে। কারণ কি জানি, হয়ত শয়তান তার হাতে এসে ভর করবে যার ফলে সে জাহান্নামের কুণ্ডে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হবে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ.

অর্থাৎ— আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি। (৬৭ ঃ ৫)

অন্য আয়াতে তিনি বলেন ঃ

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ. لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ.

অর্থাৎ— আমি নিকটবর্তী আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে। ফলে তারা ঊর্ধজগতের কিছু শুনতে পায় না এবং তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল দিক থেকে— বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য আছে অবিরাম শাস্তি। তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে ফেললে উল্কাপিণ্ড তার পিছু ধাওয়া করে। (৩৭ ঃ ৬-১০)

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ.

অর্থাৎ— আকাশে আমি গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং দর্শকের জন্য তাকে সুশোভিত করেছি; এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান থেকে আমি তাকে রক্ষা করে থাকি; আর কেউ চুরি করে সংবাদ শুনতে চাইলে তার পিছু ধাওয়া করে প্রদীপ্ত শিখা। (১৫ ঃ ১৬-১৮)

আরেক জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِينُ. وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ.

অর্থাৎ— শয়তানরা তা সহ অবতীর্ণ হয়নি। তারা এ কাজের যোগ্য নয় এবং তারা এর সামর্থ্যও রাখে না। তাদেরকে তো শ্রবণের সুযোগ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (২৬ ঃ ১০-১২)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা জিন জাতি সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَّشُهُبًا . وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ . فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا .

অর্থাৎ— এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ডে আকাশ পরিপূর্ণ; আর পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শোনার জন্য বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়। (৭২ ঃ ৮-৯)

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

الملئكة تحدث فى العنان بالأمر يكون فى الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها فى أذن الكاهن كما نقر القارورة فيزيدون معها مأة كلمة .

অর্থাৎ— ফেরেশতাগণ মেঘমালায় বসে পৃথিবীতে যা ঘটবে সে সব বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করে থাকেন। শয়তানরা তার শব্দ বিশেষ শুনে এসে জ্যোতিষীর কানে ঢেলে দেয়, যেমন বোতলে কোন কিছু ঢালা হয়ে থাকে। পরে তারা তার সাথে আরো একশ কথা জুড়ে দেয়।

ইমাম বুখারী (র) ইবলীস পরিচিতি অধ্যায়ে লায়ছ (র) থেকে মু'আল্লক সূত্রেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) বর্ণনা করেন যে, আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জ্যোতিষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ إنهم ليسوا بشئ 'ওরা কিছু নয়'। তাঁরা বললেন; হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তারা তো কখনো কখনো কোন কিছু সম্পর্কে আমাদেরকে এমন কথা বলে থাকে, যা সঠিক প্রমাণিত হয়ে যায়। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ

تلك الكلمة من الحق غطفها من الجني فيقرقرها فى اذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون معها مائة كذبة .

অর্থাৎ— ঐ সত্য কথাটি জিনদের কেউ ছোঁ মেরে এনে মুরগীর কড় কড় শব্দের ন্যায় শব্দ করে তার সাঙ্গাতের কানে দিয়ে দেয়। পরে তার সাথে তারা শত মিথ্যা কথা জুড়ে দেয়। এ পাঠটি হচ্ছে ইমাম বুখারী (র)-এর।

বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ তা'আলা ঊর্ধ্বজগতে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিলে আনুগত্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে ফেরেশতাগণ তাদের ডানা ঝাপটাতে শুরু করেন, যেন তা মসৃণ পাথরের উপর জিঞ্জিরের ঝনঝনানি, তারপর তারা শান্ত ও নির্ভয় হলে তারা বলাবলি করেন যে, তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন? উত্তরে তাঁরা বলেন, তিনি যা বললেন, তা নির্ঘাত সত্য। তিনি তো মহীয়ান গরীয়ান। এ সুযোগে চুরি করে শ্রবণকারী তা শুনে ফেলে। চুরি করে শ্রবণকারী দল এবারে একজন আরেকজনের উপর

অবস্থান করে। সুফয়ান তাঁর হাতটি একদিকে সরিয়ে নিয়ে আঙ্গুলগুলোর মাঝে ফাঁক করে তার বিবরণ দেন। (তারপর বলেন) তারপর একজন কোন কথা শুনে নিয়ে তা তার নিচের জনের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। সে আবার তার নিচের জনের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে কথাটি জাদুকর কিংবা জ্যোতিষীর মুখে পৌঁছানো হয়। তবে অনেক সময় তা পৌঁছানোর আগেই উল্কাপিণ্ডের কবলে পড়ে যায় আবার অনেক সময় উল্কাপিণ্ড ধরে ফেলার আগে-ভাগেই তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। সে তখন তার সঙ্গে শত মিথ্যা জুড়ে দেয়। তারপর বলাবলি হয় যে, অমুক দিন কি সে আমাদেরকে এমন এমন বলেনি? ফলে আকাশ থেকে শ্রুত কথাটির ভিত্তিতে তাকে সত্যবাদী বলে মেনে নেওয়া হয়।' ইমাম মুসলিম (র)-ও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَلَهُ قَرِيْنٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ. حَتّٰى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ.

অর্থাৎ— যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান, তারপর সে হয় তার সহচর। শয়তানরাই মানুষকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎপথে পরিচালিত হচ্ছে। অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে শয়তানকে বলবে, হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত। কত নিকৃষ্ট সহচর সে! (৪৩ ঃ ৩৬-৩৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ.

অর্থাৎ— আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর, যারা তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল। (৪১ ঃ ২৫)

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ قَرِيْنُهُ رَبَّنَا مَا اَطْغَيْتُهُ وَلٰكِنْ كَانَ فِىْ ضَلاَلٍ بَعِيْدٍ. قَالَ لاَ تَخْتَصِمُوْا لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ. مَايُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا اَنَا بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيْدِ.

অর্থাৎ— তার সহচর শয়তান বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচিত করিনি। বস্তুত সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত।

আল্লাহ্ বলবেন, আমার সামনে বাক-বিতণ্ডা করো না, তোমাদেরকে আমি তো পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম। আমার কথার রদবদল হয় না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি কোন অবিচার করি না। (৫০ ঃ ২৭-২৯)

অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ. وَلِتَصْغَي اِلَيْهِ اَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَاهُمْ مُقْتَرِفُوْنَ.

অর্থাৎ— এরূপ মানব ও জিনের মধ্যে শয়তানদেরকে আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি; প্রতারণার উদ্দেশ্যে তাদের একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে, যদি তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন; তবে তারা তা করতো না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যা রচনাকে বর্জন কর।

এবং তারা এ উদ্দেশ্য প্ররোচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মন যেন তার প্রতি অনুরাগী হয় এবং তাতে যেন তারা পরিতুষ্ট হয় আর যে অপকর্ম করে তারা যেন তাই করতে থাকে। (৬ ঃ ১১২-১১৩)

ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে ইমাম আহমদ ও মুসলিম (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস আমরা ফেরেশতা পরিচিতি অধ্যায়ে উল্লেখ করে এসেছি। তাতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملئكة.

অর্থাৎ— "কেউ বাদ নেই, তোমাদের প্রত্যেকের জিন সহচর ও ফেরেশতা সহচরকে তার দায়িত্বে রাখা হয়েছে।"

এ কথা শুনে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, এবং আপনারও ইয়া রাসূলাল্লাহ্? তিনি বললেন ঃ আমারও কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তার উপর সাহায্য করেছেন। ফলে সে আমাকে মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছুর আদেশ করে না।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেনঃ

ليس منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الشياطين.

অর্থাৎ— তোমাদের কেউ এমন নেই, যার উপর তার শয়তান সহচরকে নিয়োজিত করে রাখা হয়নি।

একথা শুনে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, আর আপনিও ইয়া রাসূলাল্লাহ্? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "হ্যাঁ, তবে আল্লাহ্ আমাকে তার উপর সাহায্য করেছেন, ফলে সে আমার অনুগত হয়ে গেছে।" ইমাম আহমদ (র) একাই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এ রিওয়ায়েতটি সহীহ বুখারীর শর্তে উত্তীর্ণ।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক রাতে তাঁর নিকট থেকে বের হয়ে যান। তিনি বলেন, তাঁর এভাবে চলে যাওয়ায়

আমি মনঃক্ষণ্ন হই। আয়েশা (রা) বলেন, কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে তিনি আমার অবস্থা দেখে বললেন ঃ কী ব্যাপার, আয়েশা! তুমি মনঃক্ষণ্ন হয়েছ? আয়েশা (রা) বলেন, জবাবে আমি বললাম, আমার মত মানুষ আপনার মত লোকের উপর মনঃক্ষুণ্ন হবে না তো কী? এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ কি ব্যাপার, তোমার শয়তানটা তোমাকে পেয়ে বসেছে না কি? আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, আমার সঙ্গে শয়তান আছে নাকি হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আমি বললাম, সব মানুষের সঙ্গেই আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আপনার সঙ্গেও আছে কি হে আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ' আছে বটে কিন্তু আল্লাহ্ তার উপর আমাকে সাহায্য করেছেন। ফলে সে অনুগত হয়ে গিয়েছে।' অনুরূপ ইমাম মুসলিম (র)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

إن المؤمن لينصي شيطانه كما ينصى أحدكم بعيره في السفر.

অর্থাৎ— মু'মিন তার শয়তানের মাথার সম্মুখ ভাগের কেশ গুচ্ছ ধরে তাকে পরাভূত করে থাকে, যেমনটি তোমাদের কেউ সফরে তার অবাধ্য উটকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ইবলীস সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قال فبما أغويتنى لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين.

অর্থাৎ— সে বলল, তুমি আমাকে শাস্তিদান করলে, এ জন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয় ওঁৎ পেতে থাকব ঃ তারপর আমি তাদের নিকট আসবই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক থেকে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না। (৭ ঃ ১৬-১৭)

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, সুবরা ইব্ন আবূ ফাকিহ্ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, শয়তান আদম সন্তানের জন্য বিভিন্ন পথে ওঁৎ পেতে বসে আছে। ইসলামের পথে বসে থেকে সে বলে, তুমি কি তোমার ও তোমার পিতৃ-পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিন্তু আদম সন্তান তাকে অগ্রাহ্য করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর সে হিজরতের পথে বসে থেকে বলে, তুমি কি আপন মাটি ও আকাশ (মাতৃভূমি) ত্যাগ করে হিজরত করছ? মুহাজির তো দূরত্ব অতিক্রমে ঘোড়ার ন্যায়। কিন্তু সে তাকে অগ্রাহ্য করে হিজরত করে। তারপর শয়তান জিহাদের পথে বসে যায়— জিহাদ হলো জান ও মাল উৎসর্গ করা— তারপর বলল, তুমি লড়াই করে নিহত হবে আর তোমার স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করবে ও তোমার ধন-সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এবারও সে তাকে উপেক্ষা করে ও জিহাদ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আদমের সন্তানদের যে কেউ তা করবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র যিম্মায় থাকবে। সে শহীদ হয়ে গেলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র যিম্মায় থাকবে। সে ডুবে গেলে তাকে

জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র যিম্মায় থাকবে এবং তার সওয়ারী তাকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেললেও তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্র যিম্মায় থাকবে।

ইমাম আহমদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রতিদিন সকাল-বিকাল এ দু'আগুলো পাঠ করতেন—কখনো ছাড়তেন না ঃ

اللهم إنى أسئلك العافية فى الدنيا والا خرة - اللهم إنى أسئلك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلي ومالى - اللهم استر عوراتى وآمن روعاتى - اللهم احفظنى من بين يدى و من خلفي وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى واعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتى.

অর্থাৎ— "হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাময়তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ক্ষমা এবং আমার দীন-দুনিয়া, পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ্! তুমি আমার সে সব বিষয় গোপন রাখ, যা প্রকাশ পেলে আমার লজ্জা পেতে হবে আর আমার ভীতিকর বিষয়সমূহকে তুমি নিরাপদ করে দাও। হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে অগ্র-পশ্চাৎ, আমার ডান-বাম ও আমার উপর থেকে হেফাজত কর। আর তোমার মর্যাদার উসিলায় আমার নিচের থেকে আমাকে ধ্বংস করার ব্যাপারে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি।"

ওকী (র) বলেন, নিচের থেকে ধ্বংস করা মানে ধসিয়ে দেয়া। ইমাম আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইব্ন মাজাহ্, ইব্ন হিব্বান ও হাকিম (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম (র) একে সহীহ্ সনদের হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আদম (আ)-এর সৃষ্টি

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً. قَالُوْا أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ. وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُوْنِيْ بِأَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ. قَالُوْا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ. قَالَ يٰاٰدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ اَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّيْ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ. أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ. وَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ وَقُلْنَا إِهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ. فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًي فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا أُولٰئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অর্থাৎ— স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতি ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি যা জানি তোমরা জান না।

এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন, তারপর সে সমুদয় ফেরেশতার সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এ সবের নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী

হও। তারা বলল, আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।

তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এ সকল নাম বলে দাও। যখন সে তাদেরকে এ সকল নাম বলে দিল, তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাও জানি?

আর যখন ফেরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল, সে অমান্য করল ও অহংকার করল। সুতরাং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

এবং আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। হলে তোমরা অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু শয়তান সেখান থেকে তাদের পদস্খলন ঘটালো এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করল। আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।

তারপর আদম তার প্রতিপালকের নিকট থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলো। আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমা পরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

আমি বললাম, তোমরা সকলেই এ স্থান থেকে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা আমার সৎপথের অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা কুফরী করে ও আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে তারাই জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। (২ঃ ৩০-৩৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

অর্থাৎ— আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্তের ন্যায়। আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন; তারপর তাকে বলেছিলেন, হও; ফলে সে হয়ে যায়। (৩ ঃ ৫৯)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

يا يها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء . واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا.

অর্থাৎ— হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন

থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন। এবং আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচ্ঞা কর এবং সতর্ক থাক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। (৪ : ১)

যেমন অন্য আয়াতে বলেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ.

অর্থাৎ— হে মানব জাতি! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন। (৪৯ : ১৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

هُوَالَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا.

অর্থাৎ— তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। (৭ : ১৮৯)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا إِلاَّ إِبْلِيْسَ. لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ لاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ - خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ. قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا - فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ. قَالَ أَنْظِرْنِىْ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ. قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِىْ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ. ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. وَلاَ تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ. قَالَ إِخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ. وَيٰاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَاوٗرِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْتَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ. فَدَلّٰهُمَا

بِغُرُوْرٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادٰهُمَا رَبُّهُمَا اَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَاَقُلْ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ. قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. وَلَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلٰى حِيْنٍ. قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَفِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ.

অর্থাৎ— আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, তারপর রূপদান করি, তারপর ফেরেশতাদের আদমকে সিজদা করতে বলি, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করে। যারা সিজদা করল, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

তিনি বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন সিজদা করা থেকে কিসে তোমাকে বারণ করল ? সে বলল, আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ; আমাকে তুমি আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছ আর তাকে সৃষ্টি করেছ কাদা মাটি দিয়ে। তিনি বললেন, এখান থেকে তুমি নেমে যাও, এখানে থেকে তুমি অহংকার করবে তা হতে পারে না। সুতরাং তুমি বের হয়ে যাও, তুমি অধমদের অন্তর্ভুক্ত।

সে বলল, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে তুমি অবকাশ দাও। তিনি বললেন, যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে। ইবলীস বলল, তুমি আমাকে শাস্তি দান করলে, তাই আমিও নিঃসন্দেহে তোমার সরল পথে মানুষের জন্য ওঁৎ পেতে থাকব। তারপর আমি তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক থেকে তাদের নিকট আসবই এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।

তিনি বললেন, এখান থেকে তুমি ধিক্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও; মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই। আর বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যা এবং যেখানে ইচ্ছা আহার কর কিন্তু এ গাছের নিকটবর্তী হয়ো না। অন্যথায় তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

তারপর তাদের গোপন করে রাখা লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, পাছে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা চিরস্থায়ী হও—এ জন্য তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। এবং সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।

এভাবে সে প্রবঞ্চনা দ্বারা তাদেরকে অধঃপতিত করল। তারপর যখন তারা সে বৃক্ষফল আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে

বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে নিষেধ করিনি এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি, তুমি যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর; তা হলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

তিনি বললেন, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে দাও এবং পৃথিবীতে কিছু দিনের জন্যে তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল। তিনি বললেন, সেখানেই তোমরা জীবন যাপন করবে এবং সেখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে এবং সেখান থেকেই তোমাদের বের করে আনা হবে। (৭ ঃ ১১-২৫)

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى.

অর্থাৎ— এ (মাটি) থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদের ফিরিয়ে দেব এবং সেখান থেকেই পুনরায় তোমাদেরকে বের করে আনব। (২০ ঃ ৫৫)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ. وَالْجَانَّ خَلَقْنٰهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوْمِ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ. فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ. إِلَّا إِبْلِيْسَ. أَبٰى أَنْ يَكُوْنَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ. قَالَ يٰإِبْلِيْسُ مَا لَكَ أَنْ لَا تَكُوْنَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ. قَالَ لَمْ أَكُنْ لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيْ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ. إِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ. قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِيْ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ. قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ. إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ.

অর্থাৎ— আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে এবং তার পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিন জাতিকে অতি উষ্ণ বায়ুর উত্তাপ থেকে। স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, আমি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করতে

যাচ্ছি। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব; তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যেয়ো। তখন ফেরেশতাগণ সকলেই সিজদা করল কিন্তু ইবলীস সিজদা করল না। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।

আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! কি ব্যাপার তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না যে! সে বলল, আমি এমন মানুষকে সিজদা করবার নই, যাকে আপনি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বললেন, তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। কারণ তুমি বিতাড়িত এবং কিয়ামত পর্যন্ত তোমার প্রতি রইল লা'নত।

সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন, যাও অবধারিত সময় আসা পর্যন্ত তোমাকে অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, সে জন্য আমি পৃথিবীতে পাপকর্মকে মানুষের সামনে শোভন করে উপস্থাপন করব এবং আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত তাদের সকলকেই আমি বিপথগামী করে ছাড়ব।

আল্লাহ বললেন, এ হলো আমার নিকট পৌঁছুবার সোজা পথ। বিভ্রান্তদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে; তারা ব্যতীত আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা থাকবে না। তোমার অনুসারীদের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম। যার সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য আছে পৃথক পৃথক দল। (১৫ ঃ ২৬-৪৪)

وإذ قلنا للملئكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس. قال ءاسجد لمن خلقت طينا. قال ارايتك هذا الذى كرمت علي لئن أخرتن الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الاموال والاولاد وعدهم. ومايعدهم الشيطان الا غرورا. إن عبادى ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.

অর্থাৎ— স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে বলল, যাকে আপনি কাদা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, আমি কি তাকে সিজদা করব?

সে আরো বলল, বলুন, ওকে যে আপনি আমার উপর উচ্চ মর্যাদা দান করলেন, তা কেন? আপনি যদি কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দেন; তবে অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরকে আমি আমার কর্তৃত্বাধীন করে ফেলব।

আল্লাহ বললেন, যাও তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে; জাহান্নামই হবে তোমাদের সকলের শাস্তি— পূর্ণ শাস্তি। তোমার আহবানে ওদের মধ্যকার যাদেরকে পার

পদস্খলিত কর, তুমি তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়; তা ছলনা মাত্র। আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। (১৭ ঃ ৬১-৬৫)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. أَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ. بِئْسَ لِلظّٰالِمِيْنَ بَدَلاً.

অর্থাৎ— আর স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত তারা সকলেই সিজদা করল। সে জিনদের একজন, সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল, তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। জালিমদের এ বিনিময় কত নিকৃষ্ট! (১৮ ঃ ৫০)

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلٰى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِآدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ. أَبٰى. فَقُلْنَا يٰآدَمُ إِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى. وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُ فِيْهَا وَلَا تَضْحٰي. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يٰآدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلٰى. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصٰى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوٰى . ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيْعًا بَّعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقٰى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمٰى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ أَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا. قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ آيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا. وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى.

অর্থাৎ— আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল, আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি। স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমের প্রতি সিজদা কর; তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল; সে অমান্য করল। তারপর আমি বললাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু; সুতরাং সে যেন কিছুতেই

তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ পাবে। তোমার জন্য এ-ই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না ও নগ্নও হবে না এবং তথায় পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্রক্লিষ্টও হবে না।

তারপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ গাছের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা ? তারপর তারা তা থেকে ভক্ষণ করল; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা জান্নাতের গাছের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হলো। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হলেন ও তাকে পথ-নির্দেশ করলেন।

তিনি বললেন, তোমরা একই সাথে জান্নাত থেকে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎ পথের নির্দেশ আসলে যে আমার অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাবে না। যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেন তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম।

তিনি বলবেন, এরূপই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তুমিও বিস্মৃত হলে। (২০ ঃ ১১৫-১২৬)

قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ. أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ. مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ. إِنْ يُّوْحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ. إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ. فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُوْنَ. إِلَّا إِبْلِيْسَ. إِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ. قَالَ يَاإِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ. أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ. قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ. خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ. إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ. قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُوْلُ. لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ. قُلْ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِيْنٍ.

অর্থাৎ— বল, এ এক মহা সংবাদ, যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ; ঊর্ধ্বলোকে তাদের বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। আমার কাছে তো এ ওহী এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদের বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি কাদা মাটি থেকে, যখন আমি তাকে সুষম করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো। তখন ইবলীস ব্যতীত ফেরেশতারা সকলেই সিজদাবনত হলো। সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

তিনি বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল ? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ? সে বলল, আমি তার থেকে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি থেকে। তিনি বললেন, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত এবং তোমার উপর আমার লা'নত স্থায়ী হবে কর্মফল দিবস পর্যন্ত। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। তিনি বললেন, তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বলল, আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করব, তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের নয়।

তিনি বললেন, তবে এটাই সত্য; আর আমি সত্যই বলি— তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই। বল, এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবি করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। এতো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ মাত্র। এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে কিছুকাল পরে। (৩৮ ঃ ৬৭-৮৮)

এ হলো কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আলোকে আদম (আ)-এর সৃষ্টির বিবরণ। আমি তাফসীরে এসব বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমি উপরোক্ত আয়াতসমূহের সারমর্ম এবং এসব আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহ উল্লেখ করেছি। আল্লাহই তওফীক দাতা। আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ফেরেশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ – إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً

অর্থাৎ— "পৃথিবীতে আমি প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি" (২ ঃ ৩০)

এ ঘোষণায় আল্লাহ তা'আলা আদম ও তার এমন বংশধরদের সৃষ্টি করার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন; যারা একে অপরের প্রতিনিধিত্ব করবে। যেমন এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ অর্থাৎ- "তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি বানিয়েছেন। (৬ ঃ ১৬৫)

যাহোক, এ ঘোষণা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সংকল্প ব্যক্ত করণার্থে ফেরেশতাদেরকে আদম (আ) ও তাঁর বংশধরদের সৃষ্টি করার কথা জানিয়ে দেন। যেমন বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আগাম সংবাদ দেওয়া হয়ে থাকে। ঘোষণা শুনে ফেরেশতাগণ বললেন ঃ أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. অর্থাৎ—"আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে সেখানে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে ?" (২ ঃ ৩০)

উল্লেখ্য যে, ফেরেশতাগণ বিষয়টির তাৎপর্য জানা এবং তার রহস্য সম্পর্কে অবগতি লাভ করার উদ্দেশ্যে এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আপত্তি তোলা, আদম সন্তানদের অমর্যাদা বা তাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। যেমন কোন কোন অজ্ঞ মুফাসসির ধারণা করেছেন। তারা বলেছিলেন, আপনি কি পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী ও রক্তপাতকারী কাউকে সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন? এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন, আদমের পূর্বে যে জিন ও বিন জাতির বসবাস ছিল; তাদের কার্যকলাপ দেখে ফেরেশতাগণ জানতে পেরেছিলেন যে, আগামীতেও এমন অঘটন ঘটবে। এটা কাতাদার অভিমত।

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ আদম (আ)-এর পূর্বে জিন জাতি দু'হাজার বছর বসবাস করে। তারা রক্তপাতে লিপ্ত হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে এক ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করেন। তারা তাদেরকে বিভিন্ন দ্বীপে তাড়িয়ে দেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। হাসান (র) থেকে বর্ণিত যে, ফেরেশতাগণের প্রতি এ তথ্য ইলহাম করা হয়েছিল। কেউ বলেন, লাওহে মাহফূজ থেকে তারা এ ব্যাপারে অবগত হয়েছিলেন। কেউ বলেন, মারূত ও হারূত তাদেরকে তা অবগত করেছিলেন। তাঁরা দুজন তা জানতে পেরেছিলেন তাদের উপরস্থ শাজাল নামক এক ফেরেশতা থেকে। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) আবূ জাফর বাকির (র) সূত্রে এটা বর্ণনা করেন। কেউ কেউ বলেন, তাদের একথা জানা ছিল যে, মাটি থেকে সৃষ্ট জীবের স্বভাব এরূপ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. অর্থাৎ—আমরা সর্বদা আপনার ইবাদত করি। আমাদের মধ্যকার কেউ আপনার আবাধ্যতা করে না। এখন যদি এদেরকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য এই হয় যে, তারা আপনার ইবাদত করবে; তবে আমরাই তো রাত-দিন অবিশ্রান্তভাবে একাজে নিয়োজিত রয়েছি। قَالَ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ—এদেরকে সৃষ্টি করার মধ্যে যে কী সার্থকতা রয়েছে; তা আমি জানি—তোমরা জান না। অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে এদেরই মধ্য থেকে বহু নবী-রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদের আবির্ভাব হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইল্‌মের ক্ষেত্রে ফেরেশতাগণের উপর আদমের শ্রেষ্ঠত্বের কথা ব্যক্ত করে বলেন ঃ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا অর্থাৎ- "এবং তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন।" ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তাহলো, এসব নাম যদ্দ্বারা মানুষ পরিচিতি লাভ করে থাকে। যেমন মানুষ, জীব, ভূমি, স্থলভাগ ও জলভাগ, পাহাড়-পবর্ত, উট-গাধা ইত্যাদি। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ডেগ-ডেকচি, থালা-বাসন থেকে আরম্ভ করে অধঃবায়ু নির্গমনের নাম পর্যন্ত শিক্ষা দেন। মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ তাঁকে সকল জীব-জন্তু পশু-পক্ষী ও সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা) এবং কাতাদা (র) প্রমুখও এরূপ বলেছেন। রাবী বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ফেরেশতাগণের নামসমূহ শিক্ষা দেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ (র) বলেন, আল্লাহ তাঁকে তাঁর সন্তানদের নাম শিক্ষা দিয়েছেন। তবে সঠিক কথা হলো, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে ছোট-বড় সকল বস্তু ও তার গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্যের নাম শিক্ষা দেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) এদিকে ইংগিত করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) ও মুসলিম (র) এ প্রসংগে আনাস ইব্‌ন মালিক (রা), কাতাদা এবং সাঈদ ও হিশামের সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ কিয়ামতের দিন মু'মিনগণ সমবেত হয়ে বলবে, আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার জন্য আমরা যদি কারো কাছে আবেদন করতাম! এই বলে তারা আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, আপনি মানব জাতির পিতা। আল্লাহ্ আপনাকে নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণকে আপনার সামনে সিজদাবনত করেছেন ও আপনাকে যাবতীয় বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন .....।

ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَي الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُوْنِيْ بِأَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

অর্থাৎ— "তারপর সেগুলো ফেরেশতাগণের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এ সবের নাম বলে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।" (২ ঃ ৩১)

হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করতে চাইলে ফেরেশতারা বললেন, আমাদের রব যাকেই সৃষ্টি করুন না কেন আমরাই তাঁর চাইতে বেশি জ্ঞানী প্রতিপন্ন হবো। তাই এভাবে তাদেরকে পরীক্ষা করা হয়। 'যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক' বলে এদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। এ প্রসংগে আরো বিভিন্ন মুফাস্সির বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। আমি তাফসীরে তা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

قَالُوْا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ.

অর্থাৎ—তারা (ফেরেশতারা) বলল, আপনি পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোন জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। (২ ঃ ৩২)

যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ إِلَّا بِمَا شَاءَ.

তিনি যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তার জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। (২ ঃ ২৫৫)

قَالَ يٰآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ إِنِّيْ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ.

অর্থাৎ— আল্লাহ বললেন, হে আদম! তাদেরকে এগুলোর নাম বলে দাও। যখন সে এ সকল নাম বলে দিল, তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তাও জানি? (২ ঃ ৩৩)

অর্থাৎ আমি প্রকাশ্যটা যেমন জানি, গোপনটাও ঠিক তেমনই জানি। কেউ কেউ বলেন, 'তোমরা যা ব্যক্ত কর' বলতে তাদের পূর্বেকার বক্তব্য (أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا) -কে বুঝানো হয়েছে আর 'তোমরা যা গোপন রাখ' দ্বারা ইবলীসের মনে গুপ্ত সে অহংকার ও

নিজেকে আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করাই বুঝানো হয়েছে। সাঈদ ইব্ন জুবায়র, মুজাহিদ, সুদ্দী যাহ্হাক ও ছাওরী (র) এ কথা বলেছেন এবং ইব্ন জারীর (র) তা সমর্থন করেছেন।

আবুল 'আলিয়া, রবী, হাসান ও কাতাদা (র) বলেন ঃ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ দ্বারা ফেরেশতাদের বক্তব্য, 'আমাদের রব যাকেই সৃষ্টি করুন না কেন আমরা তার চেয়ে বেশি জ্ঞানী এবং বেশি সম্মানিত-ই থাকব' এ বক্তব্যটির কথা বুঝানো হয়েছে। এবং —

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِأٰدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ أَبٰى وَاسْتَكْبَرَ.

এটা আদমের প্রতি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বিরাট বড় সম্মানের বহিঃপ্রকাশ যা তিনি তাঁকে নিজ হাতে সৃষ্টি করে তাঁর মধ্যে রূহ সঞ্চার করার পর প্রদর্শন করেছিলেন। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ.

অর্থাৎ— "আমি যখন তাকে সুঠাম করব এবং তার মধ্যে রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।" (১৫ ঃ ২৯)

মোটকথা, আদম (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা চারটি মর্যাদা দান করেছেন ঃ (১) তাঁকে নিজের পবিত্র হাতে সৃষ্টি করা, (২) তাঁর মধ্যে নিজের রূহ থেকে সঞ্চার করা, (৩) ফেরেশতাগণকে তাঁকে সিজদা করার আদেশ দান ও (৪) তাঁকে বস্তু নিচয়ের নাম শিক্ষা দান। এ জন্যই ঊর্ধ্বজগতে মূসা কালীম (আ) ও আদম (আ)-এর সাক্ষাৎ হলে বাদানুবাদ প্রসংগে মূসা (আ) তাঁকে বলেছিলেন ঃ "আপনি মানব জাতির পিতা আদম (আ)। আল্লাহ আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মধ্যে তিনি নিজের রূহ থেকে সঞ্চার করেছেন, তাঁর ফেরেশতাগণকে তিনি আপনার সামনে সিজদাবনত করিয়েছেন এবং আপনাকে বস্তু নিচয়ের নাম শিক্ষা দিয়েছেন।" কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সমবেত লোকজন এরূপ বলবে। এতদসংক্রান্ত আলোচনা পূর্বেও হয়েছে এবং একটু পরে আবারো আসবে ইনশাআল্লাহ।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِأٰدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا إِبْلِيْسَ . لَمْ يَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ . قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ.

অর্থাৎ—তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করি, তারপর তোমাদের রূপ দান করি, তারপর ফেরেশতাদেরকে বলি, আদমকে সিজদা কর। ইবলীস ব্যতীত তারা সকলেই সিজদাবনত হয়। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলো না।

আল্লাহ বললেন, আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম তখন কিসে তোমাকে সিজদা করতে বারণ করল ? সে বলল, আমি তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমাকে তুমি সৃষ্টি করেছ আগুন দিয়ে আর তাকে সৃষ্টি করেছ কাদা মাটি দিয়ে। (৭ ঃ ১১-১২)

হাসান বস্‌রী (র) বলেন, ইবলীস এখানে যুক্তি প্রয়োগের আশ্রয় নিয়েছিল। আর সে-ই সর্বপ্রথম যুক্তি প্রয়োগকারী। মুহাম্মদ ইব্‌ন শিরীন (র) বলেন, সর্বপ্রথম যে যুক্তির অবতারণা করেছিল, সে হলো ইবলীস। আর যুক্তির উপর নির্ভর করেই সূর্য ও চন্দ্রের পূজা করা হয়ে থাকে। ইব্‌নে জারীর (র) এ দুটি রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, ইবলীস নিজেকে তার ও আদমের মাঝে তুলনামূলক দৃষ্টিতে মূল্যায়ন করে আদমের চাইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করে। ফলে তার এবং সকল ফেরেশতার প্রতি সিজদার আদেশ থাকা সত্ত্বেও সে সিজদা করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যুক্তি যখন (نص) স্পষ্ট নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক হয়; তখন তার গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। তদুপরি ইবলীসের এ যুক্তিটিই মূলত ভ্রান্ত। কেননা মাটি আগুন অপেক্ষা বেশি উপকারী ও উত্তম। কারণ মাটির মধ্যে আছে গাম্ভীর্য, সহনশীলতা, কোমলতা ও উর্বরতা। পক্ষান্তরে আগুনে আছে অস্থিরতা, অধীরতা, ঝোঁক প্রবণতা ও দহন প্রবণতা। তাছাড়া আপন কুদরতী হাতে সৃষ্টি করে ও নিজের রূহ থেকে সঞ্চার করে আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। আর এ কারণেই তাঁকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ্ ফেরেশতাগণকে আদেশ করেছিলেন। যেমন, এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ. فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ. فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ. اِلَّا اِبْلِيْسَ. اَبٰى اَنْ يَكُوْنَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ. قَالَ يٰاِبْلِيْسُ مَالَكَ اَنْ لَّاتَكُوْنَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ. قَالَ لَمْ اَكُنْ لِّاَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهٗ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ. وَاِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ.

অর্থাৎ—স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক যখন বললেন, আমি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করছি, যখন আমি তাঁকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ্ সঞ্চার করব; তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো। তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল, সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। আল্লাহ্ বললেন, হে ইবলীস! তোমার কি হলো যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?

ইবলীস বলল, আপনি ছাঁচে-ঢালা শুকনো ঠনঠনে মাটি হতে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন; তাকে আমি সিজদা করবার নই। আল্লাহ্ বললেন, তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। কারণ তুমি বিতাড়িত এবং কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রইল অভিশাপ। (১৫ ঃ ২৮-৩৫)

আল্লাহ্ তা'আলার শুকনো থেকে ইবলীসের এ পরিণতির কারণ এই ছিল যে, একদিকে আদম (আ)-কে তুচ্ছ করায় এবং নিজেকে আদমের চাইতে মর্যাদাবান জ্ঞান করায় সে আদম (আ)-এর ব্যাপারে আল্লাহ্‌র সুনির্দিষ্ট আদেশের বিরোধিতা এবং সত্যদ্রোহিতার অপরাধে

অপরাধী হয়। অপরদিকে সে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে নিষ্ফল যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে। বলা বাহুল্য যে, ইবলীস নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার অপচেষ্টা তার মূল অপরাধের চাইতেও জঘন্যতর ছিল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ. قَالَ ءَاَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا. قَالَ اَرَاَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗ اِلَّا قَلِيْلًا. قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُوْرًا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُوْرًا. اِنَّ عِبَادِىْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ. وَكَفٰى بِرَبِّكَ وَكِيْلًا.

অর্থাৎ—স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে বলল, আমি কি তাকে সিজদা করব যাকে আপনি কাদা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন?

সে বলেছিল, বলুন তো এ সে ব্যক্তি যাকে আপনি আমার উপর উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন? আপনি যদি কিয়ামত পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দেন, তবে অল্প কয়েকজন ব্যতীত তার বংশধরগণকে আমি আমার কর্তৃত্বাধীনে নিয়ে আসবো।

আল্লাহ্ বললেন, যাও তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, জাহান্নামই তোমাদের সকলের শাস্তি, পূর্ণ শাস্তি। তোমার আহ্বানে তুমি তাদের মধ্য থেকে যাকে পার পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও ও তাদের প্রতিশ্রুতি দাও। শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। কর্মবিধায়ক হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট। (১৭ ঃ ৫১-৫৪)

সূরা কাহফে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ.

অর্থাৎ- স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে জিনদের একজন ছিল।ফলে সে ইচ্ছাকৃতভাবে হঠকারিতা ও অহংকারবশত আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়। (১৮ ঃ ৫০)

আগুনের সৃষ্ট হওয়ার কারণে তার স্বভাব এবং তার মন্দ উপাদানই তাকে এ অধঃপতনের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। ইবলীস যে আগুনের সৃষ্টি তা তার নিজের বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত।

তাছাড়া সহীহ মুসলিমে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "ফেরেশতাগণকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে আর জিনদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা হতে এবং আদমকে যা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে তা তো তোমাদের কাছে বিবৃত হয়েছে।"

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ ইবলীস এক পলকের জন্যও ফেরেশতাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। শাহর ইব্‌ন হাওশাব (র) বলেন, ইবলীস জিন দলভুক্ত ছিল। যখন তারা পৃথিবীতে হাঙ্গামা সৃষ্টি করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকট একটি ফেরেশতা বাহিনী প্রেরণ করেন। ফেরেশতাগণ তাদের কতককে হত্যা করেন, কতককে বিভিন্ন দ্বীপে নির্বাসন দেন এবং কতককে বন্দী করেন। ইবলীস ছিল বন্দীদের একজন। ফেরেশতাগণ তাকে ধরে সঙ্গে করে আকাশে নিয়ে যান এবং সে সেখানেই রয়ে যায়। তারপর যখন ফেরেশতাগণকে সিজদার আদেশ করা হয় তখন ইবলীস সিজদা থেকে বিরত থাকে।

ইব্‌ন মাসউদ ও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-সহ একদল সাহাবা এবং সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) প্রমুখ বলেন, ইবলীস সর্বনিম্ন আকাশের ফেরেশতাগণের নেতা ছিল। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তার নাম ছিল আযাযীল। হারিস (র) থেকে বর্ণিত এক বর্ণনায় আছে যে, আবূ কারদূস নাক্কাশ (র) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ ইবলীস ফেরেশতাগণের একটি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যাদেরকে জিন বলা হতো। এরা জান্নাতের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল। ইল্‌ম ও ইবাদতে ইবলীস ছিল এদের সকলের সেরা। তখন তার চারটি ডানাও ছিল। পরে তার রূপ বিকৃতি ঘটিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিতাড়িত শয়তানে পরিণত করেন।

সূরা সাদ-এ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ . فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ. فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ . اِلَّا اِبْلِيْسَ. اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ. قَالَ يَا اِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ. اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ. قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ. خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ. قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ. وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِىْ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ. قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِىْ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ . قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ. اِلٰى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ . اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ. قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ اَقُوْلُ. لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

অর্থাৎ—স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করছি কাদা মাটি থেকে। যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব,

তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো। তখন ফেরেশতারা সকলেই সিজদাবনত হলো—কেবল ইবলীস ব্যতীত, সে অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

তিনি বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করলাম, তার প্রতি সিজদাবনত হতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন? সে বলল, আমি তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদা মাটি থেকে।

তিনি বললেন, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত এবং তোমার উপর আমার লা'নত স্থায়ী হবে কর্মফল দিবস পর্যন্ত।

সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। তিনি বললেন, তুমি অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে—অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। সে বলল, আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করব। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে নয়।

তিনি বললেন, তবে এটাই সত্য আর আমি সত্যই বলি— তোমার দ্বারা ও তোমার অনুসারীদের দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবই। (৩৮ ঃ ৭১-৮৫)

সূরা আ'রাফে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِىْ لَاَ قْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ. ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ.

সে বলল, আপনি আমাকে উদভ্রান্ত করলেন, এ জন্য আমিও তোমার সরল পথে নিশ্চয় ওঁৎ পেতে বসে থাকব। তারপর আমি তাদের নিকট আসবই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক থেকে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞরূপে পাবে না। (৭ ঃ ১৬-১৭)

অর্থাৎ তোমার আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করার ফলে আমি ঘাটে ঘাটে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে বসে থাকব এবং তাদের কাছে তাদের সকল দিক থেকেই আসব। অতএব, ভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, আর যে তার অনুসরণ করবে সে হলো হতভাগা।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, সুবরা ইব্‌ন আবুল ফাকিহ (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, শয়তান আদম (আ)-এর সন্তানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য অলিতে-গলিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকে। ইবলীসের পরিচিতিতে আমি এ হাদীসটি উল্লেখ করেছি।

আদম (আ)-কে সিজদা করার জন্য আদিষ্ট ফেরেশতাগণের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মতভেদ রয়েছে যে, এ আদেশটি সকল ফেরেশতার জন্য নয়, কেবল পৃথিবীর ফেরেশতাগণের জন্য ছিল? জমহুর আলিমগণের মতে, সকল ফেরেশতার জন্যেই এ আদেশটি ছিল। যেমন কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের ব্যাপকতার দ্বারা বোঝা যায়। পক্ষান্তরে ইব্‌ন আব্বাস (রা)

থেকে যাহ্হাক (র)-এর সূত্রে ইব্ন জারীর শুধুমাত্র পৃথিবীর ফেরেশতাগণের আদিষ্ট হওয়ার কথা বর্ণনা করেন। তবে এ সনদে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে এবং বর্ণনাটিতে অপরিচিতি জনিত দুর্বলতা রয়েছে। পরবর্তী যুগের আলিমগণের কেউ কেউ এ দ্বিতীয় অভিমতটি প্রাধান্য দিলেও বর্ণনাভঙ্গি অনুসারে প্রথমটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। 'এবং তিনি তাঁর ফেরেশতাদেরকে তাঁর সম্মুখে সিজদাবনত করান' এ হাদীসটিও এর সপক্ষে প্রমাণ বহন করে। এ হাদীসটি ব্যাপক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

اِهْبِطْ مِنْهَا 'তুমি এখান থেকে নেমে যাও' এবং اُخْرُجْ مِنْهَا 'তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও' ইবলীসের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার এ আদেশ প্রমাণ করে যে, ইবলীস আকাশে ছিল। পরে তাকে সেখান থেকে নেমে যাওয়ার এবং নিজের ইবাদত ও আনুগত্যে ফেরেশতাগণের সাদৃশ্য অবলম্বনের ফলে যে পদমর্যাদা সে লাভ করেছিল; তা থেকে বের হয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। তারপর অহংকার, হিংসা ও তার রব-এর বিরুদ্ধাচরণ করার কারণে তার সে পদমর্যাদা ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং ধিক্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় তাকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে নিজ স্ত্রীসহ জান্নাতে বসবাস করার আদেশ দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُلْنَا يَٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ .

অর্থাৎ—এবং আমি বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; হলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (২ ঃ ৩৫)

সূরা আ'রাফে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا . لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِيْنَ . وَيَٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ .

অর্থাৎ— আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, এ স্থান থেকে তুমি ধিক্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও। মানুষের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই।

আর হে আদম! তুমি ও তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর; কিন্তু এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না, হলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (৭ ঃ ১৮-১৯)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِيْسَ. اَبٰى فَقُلْنَا يٰاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى. اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى. وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى.

অর্থাৎ—স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমের প্রতি সিজদাবনত হও; তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল, সে অমান্য করল। তারপর আমি বললাম, হে আদম! এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ পাবে। তোমার জন্য এ-ই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্ত হবে না এবং নগ্নও হবে না; এবং সেথায় পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না। (২০ ঃ ১১৬-১১৯)

এ আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, হাওয়া (আ)-এর সৃষ্টি আদম (আ)-এর জান্নাতে প্রবেশের আগেই হয়েছিল। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর।" ইসহাক ইব্ন বাশ্শার (র) স্পষ্টরূপেই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু সুদ্দী আবূ সালিহ ও আবূ মালিকের সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এবং মুর্রা-এর সূত্রে ইব্ন মাসঊদ (রা) ও কতিপয় সাহাবা থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে জান্নাত থেকে বের করে দেন। আদম (আ)-কে জান্নাতে বসবাস করতে দেন। আদম (আ) তথায় নিঃসঙ্গ একাকী ঘুরে বেড়াতে থাকেন। সেখানে তাঁর স্ত্রী নেই, যার কাছে গিয়ে একটু শান্তি লাভ করা যায়। এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলেন যে, তাঁর শিয়রে একজন নারী উপবিষ্ট রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আদম (আ)-এর পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেন। দেখে আদম (আ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে হে? তিনি বললেন ঃ আমি একজন নারী। আদম (আ) বললেন, তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? জবাবে তিনি বললেন, যাতে আপনি আমার কাছে শান্তি পান। তখন ফেরেশতাগণ আদম (আ)-এর জ্ঞানবত্তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আদম! উনার নাম কি বলুন তো! আদম (আ) বললেন, হাওয়া। আবার তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা হাওয়া নাম হলো কেন? আদম (আ) বললেন, কারণ তাঁকে 'হাই' (জীবন্ত সত্তা) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, হাওয়াকে আদম (আ)-এর বাম পাঁজরের সবচাইতে ছোট হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তখন আদম (আ) ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। পরে সে স্থানটি আবার গোশত দ্বারা পূরণ করে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً.

অর্থাৎ—হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন এবং তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন। (৪ ঃ ১)

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا . فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ .

অর্থাৎ—তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। তারপর যখন সে তার সঙ্গে সংগত হয়, তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং তা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে। (৭ ঃ ১৮৯)

এ বিষয়ে ইনশাআল্লাহ্ পরে আরো আলোচনা করব।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "মহিলাদের ব্যাপারে তোমরা আমার সদুপদেশ গ্রহণ কর। কেননা, নারীদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের উপরের অংশটুকুই সর্বাধিক বাঁকা। যদি তুমি তা সোজা করতে যাও তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে এবং আপন অবস্থায় ছেড়ে দিলে তা বাঁকাই থেকে যাবে। অতএব, মহিলাদের ব্যাপারে তোমরা আমার সদুপদেশ গ্রহণ কর।" পাঠটি ইমাম বুখারী (র)-এর।

وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, গাছটি ছিল আঙুরের। ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন জুবায়র, শাবী, জা'দা ইব্ন হুরায়রা, মুহাম্মদ ইব্ন কায়স ও সুদ্দী (র) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে। ইব্ন আব্বাস, ইব্ন মাসঊদ (রা) এবং আরো কতিপয় সাহাবা থেকে এক বর্ণনায় আছে যে, ইহুদীদের ধারণা হলো গাছটি ছিল গমের। ইব্ন আব্বাস (রা), হাসান বসরী (র), ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ, অতিয়্যা আওফী, আবূ মালিক, মুহারি ইব্ন দিছার ও আবদুর রহমান ইব্ন আবূ লায়লা থেকেও এ কথা বর্ণিত আছে। ওহাব (র) বলেন, তার দানাগুলো ছিল মাখন অপেক্ষা নরম আর মধু অপেক্ষা মিষ্ট। ছাওরী আবূ হাসীন ও আবূ মালিক (র) সূত্রে বলেন ঃ فَمَرَّتْ بِهِ -এ আয়াতে যে বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে তাহলো, খেজুর গাছ। ইব্ন জুরায়জ মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাহলো ডুমুর গাছ। কাতাদা এবং ইব্ন জুরায়জও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আবুল আলিয়া বলেন, তা এমন একটি গাছ ছিল যে, তার ফল খেলেই পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যেতো। কিন্তু জান্নাতে পবিত্রতা নষ্ট হওয়া অনুচিত।

তবে এ মতভেদগুলো পরস্পর কাছাকাছি। কিন্তু লক্ষণীয় হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট করে এর নাম উল্লেখ করেননি। যদি এর উল্লেখ করার মধ্যে আমাদের কোন উপকার নিহিত থাকত; তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই নির্দিষ্ট করে তার উল্লেখ করে দিতেন। পবিত্র কুরআনের আরো বহু ক্ষেত্রে এরূপ অস্পষ্ট রাখার নজীর রয়েছে।

তবে আদম (আ) যে জান্নাতে প্রবেশ করেছিলেন, তার অবস্থান আসমানে না যমীনে; এ ব্যাপারে যে মতভেদ রয়েছে, তা বিস্তারিত আলোচনা ও নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। জমহুর

উলামার মতে তা হচ্ছে আসমানে অবিস্থত জান্নাতুল মাওয়া। কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীসে যার ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ -

অর্থাৎ— আমি বললাম, হে আদম! তুমি এবং তোমার সঙ্গিনী জান্নাতে বসবাস কর।

এ আয়াতে الجنة। এর আলিফ-লাম ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়নি বরং তদ্দ্বারা সুনির্দিষ্ট একটি জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। তাহলো জান্নাতুল মাওয়া। আবার যেমন মূসা (আ) আদম (আ)-কে বলেছিলেন ঃ কেন আপনি আমাদেরকে এবং নিজেকে জান্নাত থেকে বের করলেন? এটি একটি হাদীসের অংশ, এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) ও হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে সমবেত করবেন। ফলে মুমিনগণ এমন সময়ে উঠে দাঁড়াবে, যখন জান্নাত তাঁদের নিকটে এসে যাবে। তারা আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবেন, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য আপনি জান্নাত খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করুন! তখন তিনি বলবেন, তোমাদের পিতার অপরাধই তো তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল! ... এ হাদীসাংশ শক্তভাবে প্রমাণ করে যে, আদম (আ) যে জান্নাতে বসবাস করেছিলেন, তা হলো জান্নাতুল মাওয়া। কিন্তু এ যুক্তিটিও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়।

অন্যরা বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে যে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছিলেন, তা 'জান্নাতুল খুল্দ' তথা অনন্ত জান্নাত ছিল না। কারণ নির্দিষ্ট একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করে সেখানেও তাঁর উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। তিনি সেখানে নিদ্রাও যান, সেখান থেকে তাঁকে বহিষ্কারও করা হয় এবং ইবলীসও সেখানে তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়। এ সব কটি বিষয়ই তা যে জান্নাতুল মাওয়া ছিল না তাই নির্দেশ করে। এ অভিমতটি উবাই ইব্ন কা'ব, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা), ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ ও সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (রা) থেকে বর্ণিত। ইব্ন কুতায়বা তার 'আল-মা'আরিফ' গ্রন্থে এবং কাযী মুন্যির ইব্ন সাঈদ আল-বালূতী তাঁর তাফসীরে এ অভিমতটির সমর্থন করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে একটি স্বতন্ত্র পুস্তকও রচনা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যবৃন্দ থেকেও এরূপ অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্ন উমর আর-রাযী ইব্ন খতীব আর-রাই (র) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে আবুল কাসিম আল-বলখী ও আবূ মুসলিম ইস্পাহানী (র) থেকে এবং কুরতুবী তাঁর তাফসীরে 'মুতাযিলা ও কাদরিয়্যা থেকে এ অভিমতটি উদ্ধৃত করেছেন। আহলে কিতাদের হস্তস্থিত তাওরাতের পাঠেও এর স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। আবূ মুহাম্মদ ইব্ন হায্ম আল-মিলাল ও আননিহল' গ্রন্থে এবং আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আতিয়্যা ও আবূ ঈসা রুম্মানী আপন আপন তাফসীরে এ বিষয়টির মতভেদের কথা উল্লেখ করেছেন।

জমহুর উলামার বর্ণনায় প্রথম অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। কাযী মাওয়ারদী (র) তাঁর তাফসীরে বলেন, আদম (আ) ও হাওয়া (আ) যে জান্নাতে বসবাস করেন, তার ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে। প্রথমত, তা জান্নাতুল খুল্দ। দ্বিতীয় অভিমত হলো, তা স্বতন্ত্র এক জান্নাত যা

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের জন্য পরীক্ষা স্থল হিসাবে তৈরি করেন। এটা সে জান্নাতুল খুল্দ নয়, যা আল্লাহ্ তা'আলা পুরস্কারের স্থান হিসেবে প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এ দ্বিতীয় অভিমতের সমর্থকদের মধ্যে আবার মতভেদ রয়েছে। একদল বলেন, তার অবস্থান আসমানে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে জান্নাত থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন। এটা হাসানের অভিমত। অপর দল বলেন, তার অবস্থান ছিল পৃথিবীতে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সে জান্নাতে বহু ফল-ফলাদির মাঝে বিশেষ একটি গাছ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলেন। ইব্ন য়াহ্য়া-এর অভিমতও অনুরূপ। উল্লেখ্য যে, এ ঘটনাটি ঘটেছিল ইবলীসকে আদম (আ)-এর প্রতি সিজদাবনত হওয়ার আদেশ দেওয়ার পর। তবে এসব অভিমতের কোন্টা সঠিক তা মহান আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

এ হলো কাযী মাওয়ারদির বক্তব্য। এতে তিনি তিনটি অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর এ বক্তব্য থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মাস'আলাটিতে তিনি নিজের কোন সিদ্ধান্ত প্রদান থেকে বিরত রয়েছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ রাযী (র) তাঁর তাফসীরে এ মাস'আলা সম্পর্কে চারটি অভিমত বর্ণনা করেছেন। কাযী মাওয়ারদির উপস্থাপিত তিনটি আর চতুর্থটি হলো এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। তাছাড়া তিনি আবূ আলী জুবায়ী (র) থেকে এ অভিমত বর্ণনা করেন যে, আদম (আ) যে জান্নাতে বসবাস করেন, তার অবস্থান আসমানে। তবে তা 'জান্নাতুল মাওয়া' নয়।

দ্বিতীয় অভিমতের সমর্থকগণ একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যার জবাব দেওয়া আবশ্যক। তাঁরা বলেন, এটা নিঃসন্দেহ যে, সিজদা করা থেকে বিরত থাকার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা ইবলীসকে আপন সান্নিধ্য থেকে বিতাড়িত করে দেন এবং তাকে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়ার ও নেমে যাওয়ার আদেশ প্রদান করেন। আর এ আদেশটি কোন শরয়ী আদেশ ছিল না যে, তাঁর বিরুদ্ধাচরণের অবকাশ থাকবে বরং তা ছিল এমন অখণ্ডনীয় তকদীর সংক্রান্ত নির্দেশ যার বিরুদ্ধাচরণ বা প্রতিরোধের কোন অবকাশই থাকে না।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اُخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا । অর্থাৎ—এখান থেকে তুমি ধিক্কৃত ও বিতাড়িত অবস্থায় বের হয়ে যাও। (৭ ঃ ১৮) فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا অর্থাৎ—এ স্থান থেকে তুমি নেমে যাও, এখানে থেকে তুমি অহংকার করবে, এ হতে পারে না। (৭ ঃ ১৩) اُخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ. অর্থাৎ—তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কারণ তুমি অভিশপ্ত। (১৫ ঃ ৩৪)

এ আয়াতগুলোতে منها এর সর্বনামটি দ্বারা الجنة। (জান্নাত) কিংবা السماء। (আসমান) অথবা المنزلة। (আবাস স্থল) বুঝানো হয়েছে। তা যাই হোক, এটা জানা কথা যে, ইবলীসকে যে স্থান থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, সেখানে সামান্যতম সময়ের জন্যেও তার অবস্থান থাকার কথা নয়—স্থায়িভাবে বসবাস রূপেই হোক, আর কেবল পথ অতিক্রম রূপেই হোক। তাঁরা বলেন যে, কুরআনের বাহ্যিক বর্ণনাভঙ্গী থেকে এটাও প্রমাণিত যে, ইবলীস আদম (আ)-কে এই বলে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল যে ঃ

هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى .

অর্থাৎ—হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা এবং অক্ষয় রাজ্যের কথা? (২০ ঃ ১২০)

وَقَالَ مَانَهَا كُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخَالِدِيْنَ . وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ . فَدَلَّهُمَا بِغُرُوْرٍ .

অর্থাৎ—আর সে বলল, পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন। এভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনা দ্বারা অধঃপতিত করল। (৭ ঃ ২০-২২)

এ আয়াতগুলো স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, আদম (আ) ও হাওয়ার সঙ্গে তাঁদের জান্নাতে ইবলীস-এর সাক্ষাৎ ঘটেছিল। তাঁদের এ প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, নিয়মিত বসবাসের ভিত্তিতে না হলেও যাতায়াত ও আনাগোনার সুবাদে জান্নাতে আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর সঙ্গে ইবলীস-এর একত্রিত হওয়া বিচিত্র নয়। কিংবা এও হতে পারে যে, জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে বা আকাশের নিচে থেকে ইবলীস তাঁদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল। তবে তিনটি জবাবের কোনটিই সন্দেহমুক্ত নয়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

আদম (আ) যে জান্নাতে বসবাস করেন, তার অবস্থান পৃথিবীতে হওয়ার সপক্ষে যারা মতপোষণ করেন, তার দলিল নিম্নের হাদীস— তা হলো ঃ

উবাই ইব্ন কা'ব (রা) সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইমাম আহমদ যিরাদাতে বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেছেন, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আদম (আ)-এর জান্নাতের আঙ্গুর খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হলে তাঁর সন্তানরা আঙ্গুরের সন্ধানে বের হন। পথে তাঁদের সঙ্গে ফেরেশতাগণের সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আদমের সন্তানরা! তোমরা যাচ্ছ কোথায়? তাঁরা বললেন, আমাদের পিতা জান্নাতের এক ছড়া আঙ্গুর খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ফেরেশতাগণ বললেন, "তোমরা ফিরে যাও, তোমরা তার জন্য যথেষ্ট করেছ, আর দরকার নেই।" অগত্যা তাঁরা আদম (আ)-এর নিকট ফিরে গেলেন। ফেরেশতাগণ আদম (আ)-এর রূহ্ কবয্ করে গোসল দিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে তাঁকে কাফন পরান। তারপর অন্যান্য ফেরেশতাকে নিয়ে জিবরাঈল (আ) তাঁর জানাযার নামায আদায় করে তাঁকে দাফন করেন। এরপর তাঁরা বলল, এ হলো তোমাদের মৃতদের ব্যাপারে তোমাদের করণীয় সুন্নত। সনদসহ হাদীসটি পরে আসছে এবং আদম (আ)-এর ওফাতের আলোচনায় পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ করা হবে।

এ হাদীসের ভিত্তিতে দ্বিতীয় অভিমতের সমর্থকগণ বলেন ঃ আদম (আ) যে জান্নাতে বসবাস করেছিলেন, তাতে পৌঁছানো যদি সম্ভব না হতো, তাহলে আদম (আ)-এর সন্তানরা তাঁর অনুসন্ধানে বেরই হতেন না। অতএব, প্রমাণিত হলো যে, সে জান্নাত ছিল পৃথিবীতে— আসমানে নয়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

তাঁরা আরো বলেন ঃ وَيَاآدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ এ আয়াতে الجنة। বলতে আসমানের জান্নাত বুঝানো হয়নি বরং আদম (আ) আসমানে বক্তব্যের পূর্বাপর দৃষ্টে প্রতীয়মান

হয় যে, তা ছিল দুনিয়াতে অবস্থিত। কেননা, আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে পৃথিবী থেকে। আর কোথাও এ কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, তাঁকে আসমানে তুলে নেয়া হয়েছিল। তাছাড়া তাঁকে সৃষ্টিই করা হয়েছে পৃথিবীতে থাকার জন্য।

আর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে এ বলে তা জানিয়েও দিয়েছিলে যে, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً অর্থাৎ—"পৃথিবীতে আমি প্রতিনিধি বানাচ্ছি।" এর সমর্থনে তাঁরা আরেকটি নজীর হিসাবে নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করেন।

إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ- 'আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান ওয়ালাদেরকে।' (৬৮ ঃ ১৭) এ আয়াতেও الجنة বলতে সকল উদ্যানকে বুঝানো হয়নি বরং তা এক বিশেষ উদ্যান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তাঁরা আরো বলেন, অবতরণ করার উল্লেখ আদম (আ)-এর আসমান থেকে নেমে আসার প্রমাণ বহন করে না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ .

অর্থাৎ— "বলা হলো, হে নূহ! তুমি নেমে এসো আমার প্রদত্ত শান্তিসহ এবং তোমার প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সাথে আছে তাঁদের প্রতি কল্যাণসহ।" (১১ ঃ ১৮)

এখানে লক্ষণীয় যে, যখন ভূপৃষ্ঠ থেকে পানি শুকিয়ে যায় এবং নৌকাটি জূদী পর্বতে গিয়ে স্থির হয়, তখন নূহ (আ) ও তাঁর অনুসারীদেরকে সেখান থেকে নেমে আসার আদেশ করা হয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ .

অর্থাৎ— তোমরা নগরে অবতরণ কর, তোমরা যা চাও তা সেখানে আছে। (২ ঃ ৬১)

আরেক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ .

অর্থাৎ— কতক পাথর এমনও আছে যা আল্লাহর ভয়ে ধসে পড়ে। (২ ঃ ৭৪) হাদীস ও অভিধানে এর অসংখ্য নজীর রয়েছে।

তাঁরা আরো বলেন ঃ এতে অসুবিধার কিছু নেই বরং এটাই বাস্তব যে, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে যে জান্নাতে থাকতে দিয়েছিলেন, তা ছিল সমগ্র ভূখণ্ড থেকে উঁচু বৃক্ষরাজি, ফল-ফলাদি, ছায়া, ভোগ-সামগ্রী ও সুখ সমৃদ্ধ একটি মনোরম উদ্যান। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ

অর্থাৎ— সেখানে তোমার অভ্যন্তর ক্ষুধার জ্বালায় এবং বহির্দেহ রৌদ্রের দাহনে ক্লিষ্ট হবে না। (২০ ঃ ১১৮) وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ.

অর্থাৎ— তথায় তোমার ভেতরাংশ পিপাসার উষ্ণতা এবং বহিরাংশ সূর্যের তাপ স্পর্শ করবে না। (২০ ঃ ১১৯)

পরস্পর সাযুজ্য থাকার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'আয়াতে ক্ষুধা ও বিবস্ত্রতাকে একসাথে এবং পিপাসার উষ্ণতা ও সূর্যের দাহনকে একসাথে উল্লেখ করেছেন।

তারপর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে ফেললে আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে দুঃখ-কষ্ট, পংকিলতা, শ্রম-সাধনা, বিপদাপদ; পরীক্ষা, অধিবাসীদের দীন-ধর্ম, স্বভাব-চরিত্র, কার্যকলাপ, কামনা-বাসনা ও উচ্চারণ আচরণগত বৈপরিত্যপূর্ণ পৃথিবীপৃষ্ঠে নামিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ إِلَى حِيْنٍ .

অর্থাৎ— পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রয়েছে। (২ ঃ ৩৬) এতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁরা আগে আসমানে ছিল। যেমন এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِىْ إِسْرَائِيْلَ اسْكُنُوْا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا .

অর্থাৎ— এরপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে বসবাস কর। এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্র করে উপস্থিত করব। (১৭ ঃ ১০৪)

কিন্তু এটা সর্বজনবিদিত যে, বনী ইসরাঈলের বসবাস এ পৃথিবীতেই ছিল— আসমানে নয়। তাঁরা আরো বলেন, যারা বর্তমানে জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, আমরা তাঁদের সে বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করছি না। তাঁদের বক্তব্য ও আমাদের এ অভিমতের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। এ জন্যই এ দ্বিতীয় মত পোষণকারী প্রাচীন কালের সকল আলিম এবং পরবর্তী যুগের অধিকাংশ আলিমের অভিমত বর্ণিত হয়েছে; তাঁরা বর্তমানেও জান্নাত-জাহান্নামের অস্তিত্ব রয়েছে বলে স্বীকার করেন। যেমন কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও বহু বিশুদ্ধ হাদীস তার প্রমাণ বহন করে। যথাস্থানে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ .

অর্থাৎ— কিন্তু শয়তান তা থেকে তাদেরকে পদস্খলন ঘটাল (অর্থাৎ বেহেশত থেকে) এবং তারা যেখানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কৃত করল। (২ ঃ ৩৬)

অর্থাৎ—জান্নাত থেকে এবং তারা যে সুখ-সম্ভোগ ও আমোদ-আহলাদে ছিলেন তা থেকে বের করে অশান্তি ও দুর্দশার জগতে নিয়ে আসলো। তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিয়ে এবং মোহে ফেলে শয়তান তাদের দুর্দশা ঘটায়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَاوُرِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ . وَقَاسَمَهُمَا إِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيْنَ .

অর্থাৎ-তারপর তাদের লজ্জাস্থান, যা গোপন রাখা হয়েছিল তা তাদের কাছে প্রকাশ করার জন্য শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলল, পাছে তোমরা উভয়ে ফেরেশতা হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন। সে তাদের উভয়ের কাছে শপথ করে বলল, আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন। (৭ ঃ ২০-২১)

অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে বলল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এ বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করার কারণ হলো তা খেলে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা চিরস্থায়ী হয়ে যাবে। আর তাঁদেরকে এ ব্যাপারে শপথ করে বলল যে, নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের হিতকাঙ্ক্ষীদের একজন। যেমন অন্য আয়াতের আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى.

অর্থাৎ— তারপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? (২০ ঃ ১২০)

অর্থাৎ আমি কি তোমাকে এমন বৃক্ষের সন্ধান দেব, যার ফল খেলে তুমি স্থায়ী জীবন লাভ করবে, তুমি এখন যে সুখ-সম্ভোগ ও শান্তিতে আছ; চিরজীবন তা ভোগ করতে পারবে এবং তুমি এমন রাজত্ব লাভ করবে, যার কখনো বিনাশ ঘটবে না। ইবলীসের এ বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক এবং বাস্তবতা বিবর্জিত।

আলোচ্য আয়াতে شجرة الخلد এর মর্ম হচ্ছে যে, এর ফল ভক্ষণ করলে তুমি অনন্ত জীবন লাভ করবে। আবার তদ্দ্বারা সে বৃক্ষও উদ্দেশ্য হতে পারে, নিম্নোক্ত হাদীসে যার উল্লেখ রয়েছে। তাহলো ঃ

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "জান্নাতে এমন একটি বৃক্ষ আছে যে, আরোহী তার ছায়ায় একশ বছর ভ্রমণ করেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। তাহলো 'শাজারাতুল খুলদ'। হাদীসটি অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত আছে এবং ইমাম আবূ দাউদ তায়ালিসীও তার মুসনাদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। গুনদুর বলেন, আমি শু'বাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কি সেই শাজারাতুল খুলদ? তিনি বললেন, না বর্ণনায় 'তাহলো' বাক্যাংশটি নেই।

فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ— এভাবে সে তাদেরকে প্রবঞ্চনা দ্বারা অধঃপতিত করল। তারপর যখন তারা সে বৃক্ষ-ফলের আস্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং উদ্যানপত্র দ্বারা তারা তাদেরকে আবৃত করতে লাগল। (৭ ঃ ২২)

যেমন সূরা তা-হায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ— তারপর তারা তা থেকে ভক্ষণ করল; তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল। (২০ ঃ ১২১)

আদম (আ)-এর আগেই হাওয়া (আ) বৃক্ষ-ফল ভক্ষণ করেছিলেন এবং তিনিই আদম (আ)-কে তা খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। বুখারীর নিম্নোক্ত হাদীসটি এ অর্থেই নেওয়া হয়ে থাকে।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "বনী ইসরাঈলরা না হলে গোশত পচতো না আর হাওয়া না হলে কোন নারী তার স্বামীর সঙ্গে খেয়ানত করত না।" বুখারী ও মুসলিম, আহমদ ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আহলে কিতাবদের হাতে রক্ষিত তাওরাতে আছে যে, হাওয়া (আ)-কে বৃক্ষ-ফল খাওয়ার পথ দেখিয়েছিল একটি সাপ। সাপটি ছিল অত্যন্ত সুদর্শন ও বৃহদাকার। তার কথায় হাওয়া (আ) নিজেও তা খান এবং আদম (আ)-কেও তা খাওয়ান। এ প্রসঙ্গে ইবলীসের উল্লেখ নেই। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের চোখ খুলে যায় এবং তাঁরা দু'জনে আঁচ করতে পারেন যে, তাঁরা দু'জন বিবস্ত্র। ফলে তাঁরা ডুমুরের পাতা গায়ে জড়িয়ে নেন। তাওরাতে এও আছে যে, তাঁরা বিবস্ত্রই ছিলেন। ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) বলেন, আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-এর পোশাক ছিল তাদের উভয়ের লজ্জাস্থানের উপর একটি জ্যোতির আবরণ।

উল্লেখ্য যে, আহলে কিতাবদের হাতে রক্ষিত বর্তমান তাওরাতে একথাটি ভুল এবং বিকৃত এবং আরবী ভাষান্তরের প্রমাদ বিশেষ। কারণ, ভাষান্তর কর্মটি যার-তার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। বিশেষ করে আরবী ভাষায় যার ভালো দক্ষতা নেই এবং মূল কিতাবের ভাব উদ্ধারে যিনি পটু নন, তার পক্ষে তো এ কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। এজন্যই আহলে কিতাবদের তাওরাত আরবীকরণে শব্দ ও মর্মগত যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে। কুরআনে করীমের নিম্নোক্ত বর্ণনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আদম ও হাওয়া (আ)-এর দেহে বস্ত্র ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا

অর্থাৎ— শয়তান তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাবার জন্য বিবস্ত্র করে। (৭ ঃ ২৭) কুরআনের এ বক্তব্য তো আর অন্য কারো কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে দীর্ঘকায় এবং ঘন কেশবিশিষ্ট পুরুষরূপে সৃষ্টি করেন, যেন তিনি ছিলেন দীর্ঘ এক খেজুর গাছ। তারপর যখন তিনি বৃক্ষ-ফল আস্বাদন করেন, তখন দেহ থেকে তার পোশাক খসে পড়ে। তখন সর্বপ্রথম তাঁর যে অঙ্গটি প্রকাশ পেয়েছিল তাহলো তাঁর লজ্জাস্থান। নিজের লজ্জাস্থান দেখে তিনি জান্নাতের মধ্যে দৌড়াতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে তার চুল একটি বৃক্ষে আঁটকে যায়। ফলে তিনি তা টেনে নেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আদম! তুমি কি আমার থেকে পালিয়ে যাচ্ছ? আল্লাহ্র কথা শুনে আদম (আ) বললেন, পালাচ্ছি না হে আমার রব! লজ্জায় এমনটি করছি।

ছাওরী (র) وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ এখানে জান্নাতের যে বৃক্ষ-পত্রের কথা বলা হয়েছে তা ছিল ডুমুর বৃক্ষের পাতা। এটাই সহীহ সনদ। সম্ভবত তা আহলি কিতাবদের বর্ণনা থেকে নেওয়া হয়েছে। আয়াতে সুস্পষ্টভাবে কোন নির্দিষ্ট পাতার কথা বলা হয়নি। আর এটা মেনে নিলেও কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "তোমাদের পিতা আদম (আ) লম্বা খেজুর গাছের ন্যায় ষাট হাত দীর্ঘ ঘন কেশবিশিষ্ট ছিলেন এবং গোপনাঙ্গ আবৃত ছিল। তারপর জান্নাতে অপরাধ করে বসলে তাঁর গোপনাঙ্গ প্রকাশ হয়ে পড়ে। ফলে তাঁকে জান্নাত থেকে বের হতে হয়। তখন একটি বৃক্ষের মুখোমুখি হলে বৃক্ষটি তাঁর মাথার সম্মুখ ভাগের কেশগুচ্ছ ধরে ফেলে। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ডেকে বললেন, আমার নিকট থেকে পালাতে চাও হে আদম? আদম (আ) বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনার লজ্জায় নিজ কৃতকর্মের জন্যে এমনটি করছি, হে আমার রব!

অন্যান্য সূত্রে বিশুদ্ধতর সনদে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে অনুরূপ একটি রিওয়ায়ত রয়েছে ঃ

وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

অর্থাৎ— তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষের নিকটবর্তী হতে বারণ করিনি? এবং আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?

তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর এবং দয়া না কর তবে অবশ্য আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব। (৭ ঃ ২২-২৩)

এ হলো অপরাধের স্বীকারোক্তি, তাওবার শরণাপন্ন হওয়া এবং উপস্থিত মুহূর্তে আল্লাহ্‌র নিকট নিজের হীনতা, বিনয় ও অসহায়ত্বের অভিব্যক্তি। বলা বাহুল্য যে, আদমের সন্তানদের যে-ই অপরাধ স্বীকার করে এরূপ তাওবা করবে ইহকাল ও পরকালে তার পরিণাম মঙ্গলজনকই হবে।

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. وَلَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ.

অর্থাৎ— আল্লাহ্ বললেন, তোমরা নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু এবং পৃথিবীতে তোমাদের কিছুকাল বসবাস ও জীবিকা রয়েছে। (৭ ঃ ২৪)

আদম (আ), হাওয়া (আ) ও ইবলীসকে সম্বোধন করে এ আদেশ দেওয়া হয়েছিল। কারো কারো মতে, তাদের সঙ্গে সাপটিও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সীমালংঘন করার অপরাধে তাদেরকে জান্নাত থেকে নেমে যাওয়ার এ আদেশ দেওয়া হয়।

আদম ও হাওয়া (আ)-এর সাথে সাপের উল্লেখের সপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি হাদীস পেশ করা হয়ে থাকে। তাহলো— রাসূলুল্লাহ (সা) সাপ হত্যার আদেশ দিয়ে বলেন, 'যেদিন ওগুলোর সাথে আমরা লড়াই করেছি, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ওগুলোর সাথে আর আমরা সন্ধি করিনি।' সূরা তা-হায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ .

অর্থাৎ— তোমরা দু'জনে একই সঙ্গে জান্নাত থেকে নেমে যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। (২০ ঃ ১২৩)

এই আদেশ হলো আদম (আ) ও ইবলীসের প্রতি। আর হাওয়া আদমের এবং সাপ ইবলীসের অনুগামী হিসাবে এ আদেশের আওতাভুক্ত। কেউ কেউ বলেন, এখানে দ্বিবচন শব্দ দ্বারা একত্রে সকলকেই আদেশ করা হয়েছে। যেমন একস্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ .

অর্থাৎ—এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্য ক্ষেত্র সম্পর্কে; তাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার। (২১ ঃ ৭৮)।

সঠিক কথা হলো—এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বহুবচন শব্দ দ্বারা দু'ব্যক্তিকে বুঝিয়েছেন। কেননা, বিচারক দু'ব্যক্তির মাঝে বিচার করে থাকেন। একজন বাদী অপরজন বিবাদী। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ 'আমি তাদের বিচার প্রত্যক্ষ করছিলাম।'

সূরা বাকারায় (৩৬-৩৯) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. وَلَكُمْ فِى الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ إِلَى حِيْنٍ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا. فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ . وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا أُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ .

আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা দু'বার اهبطوا বলে অবতরণের আদেশ করেছেন। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন মুফাস্সির বলেন, প্রথম অবতরণ দ্বারা জান্নাত থেকে পৃথিবীর নিকটবর্তী আসমানে নেমে আসা আর দ্বিতীয়টি দ্বারা নিকটবর্তী আসমান থেকে দুনিয়াতে নেমে আসা বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যাটি দুর্বল। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা প্রথম আদেশে বলেছেন ঃ

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ إِلَى حِيْنٍ.

অর্থাৎ--"আমি বললাম, তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও। পৃথিবীতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইল।" এ আয়াত প্রমাণ করে যে, প্রথমবারেই তাঁদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সঠিক কথা হলো— বিষয়বস্তু এক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা শব্দগতভাবে কথাটি দু'বার উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিবারের সাথে একটি করে অবশ্যম্ভাবী বিধান জুড়ে দিয়েছেন। প্রথমটির সাথে জুড়ে দিয়েছেন তাদের পারস্পরিক শত্রুতা এবং দ্বিতীয়টির সাথে জুড়ে দিয়েছেন যে, পরবর্তীতে তাদের উপর যে হিদায়ত নাযিল করা হবে, যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে সে হবে ভাগ্যবান, আর যে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে, সে হবে ভাগ্যাহত। বলা বাহুল্য যে, কুরআনে করীমে এ ধরনের ভাবভঙ্গির বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে তাঁর নৈকট্য থেকে বের করে দেয়ার জন্য দু'জন ফেরেশতাকে আদেশ দেন। ফলে জিবরাঈল (আ) তাঁর মাথা থেকে মুকুট উঠিয়ে নেন এবং মীকাঈল (আ) তাঁর কপাল থেকে মুকুট খুলে ফেলেন এবং একটি বৃক্ষশাখা তাকে জড়িয়ে ধরে। তখন আদম (আ) ধারণা করলেন যে, এটা তাঁর তাৎক্ষণিক শাস্তি। তাই তিনি মাথা নিচু করে বলতে লাগলেন—ক্ষমা চাই, ক্ষমা চাই। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তুমি কি আমার নিকট থেকে পালাচ্ছো? আদম (আ) বললেন, বরং আপনার লজ্জায় এমনটি করছি, হে আমার মনিব!

আওযায়ী (র) হাস্‌সান ইব্‌ন আতিয়্যা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আদম (আ) জান্নাতে একশ' বছরকাল অবস্থান করেন। অন্য এক বর্ণনায় ষাট বছরের উল্লেখ রয়েছে। তিনি জান্নাত হারানোর দুঃখে সত্তর বছর, অন্যায়ের অনুতাপে সত্তর বছর এবং নিহত পুত্রের শোকে চল্লিশ বছর ক্রন্দন করেন। ইব্‌ন আসাকির (র) এটি বর্ণনা করেন।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আদম (আ)-কে মক্কা ও তায়িফের মধ্যবর্তী দাহনা নামক স্থানে নামিয়ে দেয়া হয়। হাসান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আদম (আ)-কে ভারতে, হাওয়া (আ)-কে জিদ্দায় এবং ইবলীসকে বসরা থেকে মাইল কয়েক দূরে দস্তমীসান নামক স্থানে নামিয়ে দেয়া হয় আর সর্পটিকে নামানো হয় ইস্পাহানে।

সুদ্দী (র) বলেন, আদম (আ) ভারতে অবতরণ করেন। আসার সময় তিনি হাজরে আসওয়াদ ও জান্নাতের এক মুঠো পাতা নিয়ে আসেন এবং এ পাতাগুলো ভারতের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে দেন। ফলে সে দেশে সুগন্ধির গাছ উৎপন্ন হয়। ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আদম (আ)-কে সাফায় এবং হাওয়া (আ)-কে মারওয়ায় নামিয়ে দেওয়া হয়। ইব্‌ন আবূ হাতিম এ তথ্যটিও বর্ণনা করেছেন।

আব্দুর রায্‌যাক (র) আবূ মূসা আশআরী (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়ার সময় যাবতীয় বস্তুর প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়ে দেন এবং জান্নাতের ফল-ফলাদি থেকে তার আহার্যের ব্যবস্থা করে দেন। সুতরাং তোমাদের এ ফল-মূল জান্নাতের ফল-মূল থেকেই এসেছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, এগুলোতে বিকৃতি আসে আর ওগুলোর কোন বিকৃতি নেই।

হাকিম (র) তাঁর মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আদম (আ)-কে জান্নাতে শুধুমাত্র আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টুকু থাকতে দেয়া হয়েছিল। হাকিম (র) বলেন, হাদীসটি বুখারী, মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ, তবে তাঁরা হাদীসটি বর্ণনা করেন নি।

সহীহ মুসলিমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "দিনসমূহের মধ্যে জুমু'আর দিন হলো সর্বোত্তম। এ দিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়, এদিনেই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়, এ দিন তাঁকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়।" সহীহ বুখারীতে অন্য এক সূত্রে আছে যে, "এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে।"

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ দিবসসমূহের মধ্যে জুমু'আর দিন হলো সর্বোত্তম। এদিনে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়, এদিনে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়, এ দিনে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয় এবং এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। বর্ণনাটি মুসলিমের শর্তে উত্তীর্ণ।

ইব্ন আসাকির (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে বিবস্ত্র অবস্থায় একত্রে নামিয়ে দেওয়া হয়। তখন তাদের দেহে জান্নাতের পাতা জড়ানো ছিল। তখন আদম (আ) অসহ্য গরম অনুভব করেন। এমনকি তিনি বসে কান্নাকাটি করতে শুরু করেন এবং হাওয়াকে লক্ষ্য করে বলেন যে, হাওয়া! গরমে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, তারপর জিবরাঈল (আ) তাঁর কাছে কিছু তুলো নিয়ে আসেন এবং হাওয়াকে সুতা কাটার আদেশ দিয়ে তাকে তা শিখিয়ে দেন। আর আদম (আ)-কে কাপড় বুননের আদেশ দেন এবং তাকে বুনন কার্য শিক্ষা দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আদম (আ) জান্নাতে তাঁর স্ত্রীর সংগে সহবাস করেননি; ইতিমধ্যেই বৃক্ষ-ফল খাওয়ার অপরাধে তাদেরকে জান্নাত থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, তাঁরা উভয়ে আলাদা শয়ন করতেন। একজন বাতহায় এবং অপরজন অন্য প্রান্তে শয়ন করতেন। একদিন জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে সহবাসের আদেশ দেন এবং তার পদ্ধতিও শিখিয়ে দেন। তারপর যখন আদম (আ) স্ত্রী সঙ্গম করলেন, তখন জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনি আপনার স্ত্রীকে কেমন পেয়েছেন? আদম (আ) বললেন, সতী-সাধ্বী পেয়েছি। ইব্ন আসাকির (র) বর্ণিত এ হাদীসটি 'গরীব' পর্যায়ভুক্ত এবং এটি মারফূ হওয়া অত্যন্ত 'মুনকার'। কোন কোন পূর্বসূরি আলিম সাঈদ ইব্ন মায়সারা সম্পর্কে বলেন, ইনিই আবূ ইমরান বিকরী আল-বসরী। ইমাম বুখারী (র) এ লোকটিকে মুনকারুল হাদীস বলে অভিহিত করেছেন। ইব্ন হিব্বান বলেন, এ লোকটি যতসব জাল হাদীস বর্ণনা করে। ইব্ন আদী (র) বলেন, লোকটি একান্তই অজ্ঞাত পর্যায়ের।

فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

অর্থাৎ— তারপর আদম তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কিছু বাণী প্রাপ্ত হলো। ফলে আল্লাহ্ তার প্রতি ক্ষমা পরবশ হলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২ ঃ ৩৭)

কেউ কেউ বলেন, আদম (আ) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে বাণী প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাহলো ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ.

অর্থাৎ— হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি। আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবুল আলিয়া, রবী ইব্‌ন আনাস, হাসান, কাতাদা, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, খালিদ ইব্‌ন মা'দান, আতা আল-খুরাসানী (র) ও আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ (র) থেকে এ অভিমত বর্ণিত আছে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আদম (আ) বললেন, হে আমার রব! আমি যদি তাওবা করি ও ফিরে আসি; তাহলে আমি কি আবার জান্নাতে যেতে পারব? আল্লাহ্ বললেন, হ্যাঁ। এটাই সে বাণী যার কথা- فتلقى ادم الخ এ আয়াতে বলা হয়েছে। এ সূত্রে হাদীসটি 'গরীব' এবং এতে ইনকিতা তথা বিচ্ছিন্নতা রয়েছে।

ইব্‌ন আবূ নাজীহ (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন— ঐ বাণীগুলো হলো ঃ

اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب انى ظلمت نفسى فاغفرلى انك خيرالغافرين. اللهم لا اله الا انت سبحانك وبحمدك رب انى ظلمت نفسى فاغفرلى انك خيرالراحمين. اللهم لا اله الا انت سبحانك و بحمدك رب انى ظلمت نفسى فتب علي انك انت التواب الرحيم.

অর্থাৎ— হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করি। হে আমার রব! নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রতি অত্যাচার করেছি। অতএব, তুমি আমায় ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাকারীদের সর্বোত্তম।

হে আল্লাহ্! তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি ও প্রশংসা করি। হে আমার রব! নিশ্চয় আমি নিজের প্রতি অবিচার করেছি। আমায় তুমি ক্ষমা করে দাও। নিশ্চয় তুমি দয়ালুদের সর্বোত্তম।

হে আল্লাহ্! তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি ও প্রশংসা করি। হে আমার রব! আমি নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। আমার প্রতি তুমি ক্ষমা পরবশ হও। নিশ্চয় তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

হাকিম (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّه كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْه এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আদম (আ) বললেন, হে আমার রব! আপনি কি আমাকে আপনার নিজ কুদরতী হাতে সৃষ্টি করেননি? বলা হলো, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আপনি কি আমার দেহে আপনার রূহ সঞ্চার করেননি? বলা হলো, হ্যাঁ। তখন তিনি পুনরায় বললেন, আমি হাঁচি দিলে আপনি কি يرحمك الله (আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুন) বলেননি? এবং আপনার রহমত কি আপনার গযবের উপর প্রবল নয়? বলা হলো, হ্যাঁ। পুনরায় তিনি বললেন ঃ আপনি কি একথা নির্ধারণ করে রাখেননি যে, আমি এ কাজ করব? বলা হলো, হ্যাঁ। এবার আদম (আ) বললেন, আচ্ছা, আমি যদি তাওবা করি; তাহলে আপনি পুনরায় আমাকে জান্নাতে ফিরিয়ে

নেবেন কি? আল্লাহ্ বললেন, হ্যাঁ। হাকিম বলেন, এর সনদ সহীহ্ কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করেননি।

হাকিম, বায়হাকী ও ইব্ন আসাকির (র) উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "আদম (আ) যখন ভুল করে বসলেন তখন বললেন, হে আমার রব! মুহাম্মদের উসিলা দিয়ে আমি আপনার দরবারে প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন! তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তুমি মুহাম্মদকে চিনলে কি করে অথচ এখনও তাঁকে আমি সৃষ্টি-ই করিনি? আদম (আ) বললেন, হে আমার রব! যখন আপনি আমাকে আপনার নিজ হাতে সৃষ্টি করলেন এবং আমার মধ্যে আপনার রূহ্ সঞ্চার করলেন তখন আমি মাথা তুলে আরশের স্তম্ভসমূহে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ লিখিত দেখতে পাই। তাতে আমি বুঝতে পারলাম যে, আপনার পবিত্র নামের সাথে আপনি সৃষ্টির মধ্যে আপনার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো নাম যোগ করেননি। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তুমি যথার্থই বলেছ, হে আদম! নিশ্চয় তিনি সৃষ্টির মধ্যে আমার প্রিয়তম। তাঁর উসিলায় যখন তুমি আমার কাছে প্রার্থনা করেই ফেলেছ, তখন আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর মুহাম্মদ (সা)-কে সৃষ্টি না করলে তোমাকে আমি সৃষ্টিই করতাম না।

বায়হাকী বলেন, এ সূত্রে আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম-ই হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি হলেন দুর্বল রাবী। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ। উল্লেখ্য যে, এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির অনুরূপ ঃ

وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى . ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى .

অর্থাৎ- আদম তার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করল, ফলে সে ভ্রমে পতিত হলো। এরপর তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন, তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হলেন ও তাকে পথ-নির্দেশ করলেন। (২০ ঃ ১২১-১২২)

আদম (আ) ও মূসা (আ)-এর বাদানুবাদ

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "মূসা (আ) আদম (আ)-এর সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হন। তিনি তাঁকে বলেন, আপনি-ই তো মানুষকে আপনার অপরাধ দ্বারা জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছেন এবং তাদেরকে দুর্বিপাকে ফেলেছেন।" আদম (আ) বললেন, হে মূসা! আপনি তো সে ব্যক্তি যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রিসালাত ও কালাম দিয়ে আপনাকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন : আপনি কি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য তিরস্কার করছেন, যা আমাকে সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ্ আমার নামে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এতে আদম (আ) তর্কে মূসা (আ)-এর উপর জয়লাভ করেন।

মুসলিম, নাসাঈ ও আহমদ (র) ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আদম (আ) ও মূসা (আ) বাদানুবাদে লিপ্ত হন। মূসা (আ) আদম (আ)-কে বলল যে, আপনি সে আদম যে আপনার ত্রুটি আপনাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছে। উত্তরে আদম (আ) তাঁকে বললেন, আর আপনি তো সে মূসা, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রিসালাত ও কালাম দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। আপনি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য তিরস্কার করছেন, যা আমার সৃষ্টির পূর্বেই স্থির করে রাখা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এভাবে আদম (আ) যুক্তিপ্রমাণে মূসা (আ)-এর উপর জয়লাভ করেন। একথাটি তিনি দু'বার বলেছেন।

ইমাম বুখারী এবং মুসলিম (র) ভিন্ন সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "আদম (আ) ও মূসা (আ) বিতর্কে লিপ্ত হন। মূসা বললেন, হে আদম (আ)! আপনি সে ব্যক্তি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন ও আপনার মধ্যে তাঁর রূহ্ সঞ্চার করেছেন। আর আপনি লোকদেরকে ভ্রমে নিপতিত করলেন ও তাদেরকে জান্নাত থেকে বের করিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এর উত্তরে আদম (আ) বললেন, আর আপনি সেই মূসা (আ) যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তাঁর কালাম দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। আমার এমন একটি কৃতকর্মের জন্য আপনি আমাকে তিরস্কার করছেন, যা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা আমার নামে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, ফলে যুক্তিতে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়লাভ করেন।

ইমাম তিরমিযী ও নাসাঈ (র) ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসটি 'গরীব' পর্যায়ের। বায্যারও ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র)

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "আদম (আ) ও মূসা (আ) বাদানুবাদে লিপ্ত হন। মূসা (আ) বললেন, হে আদম (আ)! আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদের সর্বনাশ করেছেন এবং আমাদের জান্নাত থেকে বের করিয়ে দিয়েছেন। উত্তরে আদম (আ) তাঁকে বললেন, আপনি তো সে মূসা যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তাঁর কালাম দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। কখনো বলেছেন, তাঁর রিসালাতের জন্য এবং তিনি নিজ হাতে আপনাকে মনোনীত করেছেন। আপনি কি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য তিরস্কার করছেন, যা আমাকে সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বেই আমার নামে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যুক্তি-তর্কে আদম (আ) মূসার উপর জয়লাভ করেন। আদম (আ) মূসার উপর জয়লাভ করেন, আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়লাভ করেন।

ইব্ন মাজাহ্ (র) ব্যতীত সিহাহ সিত্তার সংকলকগণের অবশিষ্ট পাঁচজনই হাদীসটি দশটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "মূসা (আ)-এর সংগে আদম (আ)-এর সাক্ষাৎ হলে মূসা (আ) তাঁকে বললেন, আপনি সে আদম (আ) যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তাঁর নিজ হাতে সৃষ্টি করেন, তাঁর ফেরেশতাদেরকে আপনার সামনে সিজদাবনত করান এবং আপনাকে জান্নাতে স্থান দেন। তারপর আপনি একটি কাজ করে বসেন। আদম (আ) বললেন, আপনি তো সে মূসা (আ) যে, আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সাথে কথা বলেছেন, তাঁর রিসালতের জন্যে আপনাকে মনোনীত করেছেন এবং আপনার উপর তাওরাত অবতীর্ণ করেছেন। আচ্ছা, আপনি বলুনতো আমার সৃষ্টি আগে হয়েছে নাকি আমার এ কর্মের উল্লেখ আগে হয়েছে? মূসা (আ) বললেন, না বরং আপনার এ কর্মের উল্লেখ আগে হয়েছে। এভাবে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়লাভ করেন।"

ইব্ন আবূ হাতিম (র) বর্ণিত এ হাদীসের শেষাংশে আদম (আ)-এর উক্তিসহ অতিরিক্ত এরূপ বর্ণনা আছে ঃ আল্লাহ্ আপনাকে এমন কয়েকটি ফলক দান করেছেন, যাতে যাবতীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে এবং একান্তে নৈকট্য দান করেছেন। এবার আপনি বলুন, আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত কখন লিপিবদ্ধ করেছিলেন? মূসা (আ) বললেন, সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে। আদম (আ) বললেন, তাতে কি আপনি وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ কথাটি পাননি? মূসা (আ) বললেন, জী হ্যাঁ। আদম (আ) বললেন, তবে কি আপনি আমাকে আমার এমন একটি কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করছেন যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর আগেই আল্লাহ্ তা'আলা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যে, আমি তা করব? বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এভাবে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়লাভ করেন।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণিত এ সংক্রান্ত বর্ণনা মূসা (আ)-এর বক্তব্যে অতিরিক্ত একথাটিও আছে ঃ "আপনি আপনার সন্তানদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন।" তবে এ অংশটি হাদীসের অংশ কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

হাফিজ আবূ ইয়ালা আল-মূসিলী তাঁর মুসনাদে আমীরুল মু'মিনীন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "মূসা (আ) বললেন, হে আমার রব! আপনি

আমাকে সে আদম (আ)-কে একটু দেখান, যিনি আমাদেরকে এবং তাঁর নিজেকে জান্নাত থেকে বের করিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আদম (আ)-কে দেখালেন। দেখে মূসা (আ) বললেন, আপনিই আদম (আ)? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মূসা (আ) বললেন, আপনি সে ব্যক্তি যার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রূহ্ সঞ্চার করেছেন, যাঁর সামনে তাঁর ফেরেশতাদেরকে সিজদাবনত করিয়েছেন এবং যাঁকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিয়েছেন। জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। মূসা (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদেরকে এবং আপনার নিজেকে জান্নাত থেকে বের করে দিতে কিসে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল? উত্তরে আদম (আ) বললেন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি মূসা (আ)। আদম (আ) বললেন, আপনি কি বনী ইসরাঈলের নবী মূসা যে, আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার আড়াল থেকে আপনার সাথে এমনভাবে কথা বলেছেন যে, আপনার ও তাঁর মধ্যে কোন দূত ছিল না? মূসা (আ) বললেন, জী হ্যাঁ। এবার আদম (আ) বললেন ঃ আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে তিরস্কার করছেন, যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ এভাবে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়যুক্ত হন, এভাবে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়যুক্ত হন।

আবূ দাঊদ (র) ও ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবূ ইয়া'লা (র) ঈষৎ পরিবর্তনসহ ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসের ব্যাপারে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। কাদরিয়া সম্প্রদায়ের একটি দল এ হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ এ হাদীসে পূর্ব সিদ্ধান্ত তথা তাকদীরের প্রমাণ রয়েছে। জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের একটি দল এ হাদীস দ্বারা তাদের মতের সপক্ষে প্রমাণ পেশ করেছে। আর বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা প্রমাণিত হয়ও। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ পূর্ব সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়যুক্ত হন। এর জবাব পরে দেওয়া হবে। অন্য একদল আলিম বলেন, আদম (আ) মূসা (আ)-এর মতের বিপরীতে এ জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেছেন যে, মূসা (আ) তাকে এমন একটি অপরাধের জন্য তিরস্কার করেছেন, যা থেকে তিনি তাওবা করে নিয়েছিলেন। আর অপরাধ থেকে তাওবাকারী ঠিক সে ব্যক্তির ন্যায়, যার কোন অপরাধ নেই।

কারো কারো মতে, এ জয়লাভের কারণ হলো, আদম (আ) হলেন মূসা (আ)-এর চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ ও প্রবীণ। কেউ কেউ বলেন, এর কারণ হলো, আদম (আ) হলেন তাঁর আদি পিতা। কারো কারো মতে এর কারণ, তাঁরা দু'জন ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন শরীয়তের ধারক। আবার কেউ কেউ বলেন, এর কারণ তাঁরা দু'জনই ছিলেন আলমে-বরযখে।[১] আর তাঁদের ধারণায় সে জগতে শরীয়তের বিধান প্রযোজ্য নয়।

সঠিক কথা হলো এই যে, এ হাদীসটি বহু পাঠে বর্ণিত হয়েছে। তার কতক বর্ণিত হয়েছে অর্থগতরূপে। কিন্তু তা সন্দেহমুক্ত নয়। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবের বেশির ভাগ বক্তব্যের সারকথা হলো, মূসা (আ) আদম (আ)-কে তাঁর নিজেকে ও সন্তানদেরকে

---

১. যা এ জগতের বা পরকালের ব্যাপার নয়, বরং মধ্যবর্তী আরেক জগতের ব্যাপার।

জান্নাত থেকে বের করিয়ে দেয়ার জন্য দোষারোপ করেছিলেন। তাই উত্তরে আদম (আ) তাঁকে বলেছিলেন, আপনাদেরকে আমি বের করিনি। বের করেছেন সেই সত্তা যিনি আমার বৃক্ষ-ফল খাওয়ার সাথে বহিষ্কারকে সংশ্লিষ্ট করে রেখেছিলেন; আর যিনি তা সংশ্লিষ্ট করে রেখেছিলেন আমার সৃষ্টির পূর্বেই এবং তা লিপিবদ্ধ ও নির্ধারণ করে রেখেছিলেন, তিনি হলেন মহান আল্লাহ্। সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি কাজের জন্য দোষারোপ করছেন, যার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। বড় জোর এতটুকু বলা যায় যে, আমাকে বৃক্ষ-ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছিল, কিন্তু আমি তা খেয়ে ফেলি। এর সাথে বহিষ্কারের সংশ্লিষ্টতা আমার কর্ম নয়। সুতরাং আপনাদেরকে এবং আমার নিজেকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার আমি করিনি। তা ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের লীলাখেলা! অবশ্য তাতে আল্লাহ্র হিকমত রয়েছে। অতএব, এ কারণে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে যারা এ হাদীসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাঁরা আসলে একগুঁয়ে। কেননা, হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্মৃতিশক্তির ব্যাপারে আবূ হুরায়রা (রা)-এর মর্যাদা প্রশ্নাতীত। তাছাড়া আরো কতিপয় সাহাবা থেকেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যা আমরা উপরে উল্লেখ করে এসেছি। আর একটু আগে হাদীসটির যেসব ব্যাখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, তা হাদীসের শব্দ ও মর্ম উভয়ের সাথেই অসংগতিপূর্ণ। তাদের মধ্যে অবস্থানের যৌক্তিকতা জাবরিয়্যা সম্প্রদায়ের চাইতে বেশি আর কারোরই নেই। কিন্তু কয়েক দিক থেকে তাতেও আপত্তি রয়েছে ঃ

প্রথমত, মূসা (আ) এমন কাজের জন্য দোষারোপ করতে পারেন না, যে কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাওবা করে নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, মূসা (আ) নিজেও আদিষ্ট না হয়েও এক ব্যক্তিকে হত্যা করে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ বলে প্রার্থনা করেছিলেন যে, رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهُ হে আমার রব! আমি নিজের উপর অত্যাচার করেছি। অতএব, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। ফলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। (২৮ ঃ ১৬)

তৃতীয়ত, আদম (আ) যদি পূর্ব লিখিত তকদীর দ্বারা অপরাধের জন্য দোষারোপের জবাব দিয়ে থাকেন, তাহলে কৃতকর্মে তিরস্কৃত সকলের জন্যই এ পথ খুলে যেতো এবং সকলেই পূর্ব নির্ধারিত তকদীরের দোহাই দিয়ে প্রমাণ পেশ করতে পারতো। এভাবে কিসাস ও হুদূদ তথা শরীয়ত নির্ধারিত শাস্তিসমূহের বিধানের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যেতো। তকদীরকেই যদি দলীল রূপে পেশ করা যেতো, তাহলে যে কেউ ছোট-বড় সকল কৃত-অপরাধের জন্য তার দ্বারা দলীল পেশ করতে পারত। আর এটা ভয়াবহ পরিণতির দিকেই নিয়ে যেতো। এ জন্যই কোন কোন আলিম বলেন ঃ আদম (আ) তকদীর দ্বারা দুর্ভোগের ব্যাপারে দলীল পেশ করেছিলেন আল্লাহ্র আদেশ অমান্যের সপক্ষের যুক্তি হিসাবে নয়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

হাদীসে আদম (আ)-এর সৃষ্টি প্রসঙ্গ

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সমগ্র পৃথিবী থেকে সংগৃহীত এক মুঠো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন। তাই মাটি অনুপাতে আদমের সন্তানদের কেউ হয় সাদা, কেউ হয় গৌরবর্ণ, কেউ হয় কালো, কেউ মাঝামাঝি বর্ণের। আবার কেউ হয় নোংরা, কেউ হয় পরিচ্ছন্ন, কেউ হয় কোমল, কেউ হয় পাষাণ, কেউ বা এগুলোর মাঝামাঝি। ঈষৎ শাব্দিক পার্থক্যসহ তিনি ভিন্ন সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ দাঊদ, তিরমিযী এবং ইব্ন হিব্বান (র) আবূ মূসা আশ'আরী (রা) যাঁর আসল নাম আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়েস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

সুদ্দী (র) ইব্ন আব্বাস ও ইব্ন মাসঊদ (রা)-সহ কতিপয় সাহাবা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তারা বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কিছু কাদামাটি নেয়ার জন্য জিবরাঈল (আ)-কে যমীনে প্রেরণ করেন। তিনি এসে মাটি নিতে চাইলে যমীন বলল, তুমি আমার অঙ্গহানি করবে বা আমাতে খুঁত সৃষ্টি করবে; এ ব্যাপারে তোমার নিকট থেকে আমি আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। ফলে জিবরাঈল (আ) মাটি না নিয়ে ফিরে গিয়ে বললেন, হে আমার রব! যমীন তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করায় আমি তাকে ছেড়ে এসেছি।

এবার আল্লাহ্ তা'আলা মীকাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেন। যমীন তাঁর নিকট থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করে বসে। তাই তিনিও ফিরে গিয়ে জিবরাঈল (আ)-এর মতই বর্ণনা দেন। এবার আল্লাহ্ তা'আলা মালাকুল মঊত (আ) বা মৃত্যুর ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন। যমীন তার কাছ থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, আর আমিও আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ বাস্তবায়ন না করে শূন্য হাতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে তার পানাহ্ চাই। এ কথা বলে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে সাদা, লাল ও কালো রঙের কিছু মাটি সংগ্রহ করে মিশিয়ে নিয়ে চলে যান। এ কারণেই আদম (আ)-এর সন্তানদের এক একজনের রঙ এক এক রকম হয়ে থাকে।

আজরাঈল (আ) মাটি নিয়ে উপস্থিত হলে আল্লাহ্ তা'আলা মাটিগুলো ভিজিয়ে নেন। এতে তা আটালো হয়ে যায়। তারপর ফেরেশতাদের উদ্দেশে তিনি ঘোষণা দেন ঃ

إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءٍ مَّسْنُوْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ .

অর্থাৎ— কাদামাটি দ্বারা আমি মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ্ সঞ্চার করব; তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো। (১৫ ঃ ২৮)

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে নিজ হাতে সৃষ্টি করেন, যাতে ইবলীস তার ব্যাপারে অহংকার করতে না পারে। তারপর মাটির তৈরি এ মানব দেহটি থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত যা জুম'আর দিনের অংশ বিশেষ ছিল[1] একইভাবে পড়ে থাকে। তা দেখে ফেরেশতাগণ ঘাবড়ে যান। সবচাইতে বেশি ভয় পায় ইবলীস। সে তাঁর পাশ দিয়ে আনাগোনা করত এবং তাঁকে আঘাত করত। ফলে দেহটি ঠনঠনে পোড়া মাটির ন্যায় শব্দ করত। এ কারণেই মানব সৃষ্টির উপাদানকে صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ তথা পোড়ামাটির ন্যায় ঠনঠনে মাটি বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর ইবলীস তাঁকে বলত, তুমি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছ।

এক পর্যায়ে ইবলীস তাঁর মুখ দিয়ে প্রবেশ করে পেছন দিয়ে বের হয়ে এসে ফেরেশতাগণকে বলল, একে তোমাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। কেননা, তোমাদের রব হলেন সামাদ তথা অমুখাপেক্ষী আর এটি একটি শূন্যগর্ভ বস্তুমাত্র; কাছে পেলে আমি একে ধ্বংস করেই ছাড়ব।

এরপর তাঁর মধ্যে রূহ্ সঞ্চার করার সময় হয়ে এলে আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাগণকে বললেন ঃ আমি যখন এর মধ্যে রূহ সঞ্চার করব; তখন তার প্রতি তোমরা সিজদাবনত হয়ো। যথাসময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মধ্যে রূহ্ সঞ্চার করলেন যখন রূহ্ তাঁর মাথায় প্রবেশ করে, তখন তিনি হাঁচি দেন। ফেরেশতাগণ বললেন, আপনি আল-হামদুলিল্লাহ্ বলুন। তিনি 'আলা-হামদুলিল্লাহ্' বললেন। জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ رَحِمَكَ رَبُّكَ (তোমার রব তোমাকে রহম করুন!) তারপর রূহ্ তাঁর দু'চোখে প্রবেশ করলে তিনি জান্নাতের ফল-ফলাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। এবার রূহ্ তাঁর পেটে প্রবেশ করলে তাঁর মনে খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। ফলে রূহ্ পা পর্যন্ত পৌঁছানের আগেই তড়িঘরি করে তিনি জান্নাতের ফল-ফলাদির প্রতি ছুটে যান। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ 'মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই ত্বরাপ্রবণ।' (২১ ঃ ৩৭)

فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ. اِلَّا اِبْلِيْسَ. اَبٰى. اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ السَّاجِدِيْنَ.

অর্থাৎ— তখন ইবলীস ব্যতীত ফেরেশতারা সকলেই সিজদা করল। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। (১৫ ঃ ৩০)

সুদ্দী (র) এভাবে কাহিনীটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। এ কাহিনীর সমর্থনে আরো বেশ ক'টি হাদীস পাওয়া যায়। তবে তার বেশির ভাগই ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে গৃহীত।

---

১. ঊর্ধ জগতের একদিন পৃথিবীর হাজার বছরের, বর্ণনান্তরে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান বলে কুরআনের বর্ণনায় পাওয়া যায়। (বিঃ দ্রঃ ২২ ঃ ৪৭ ও ৭০ ঃ ৪)

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কিছুদিন তাঁকে ফেলে রাখেন। এ সুযোগে ইবলীস তাঁর চতুষ্পার্শ্বে চক্কর দিতে শুরু করে। অবশেষে তাঁকে শূন্যগর্ভ দেখতে পেয়ে সে আঁচ করতে পারল যে, এটাতো এমন একটি সৃষ্টি যার সংযম ক্ষমতা থাকবে না।"

ইব্‌ন হিব্বান (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "আদম (আ)-এর মধ্যে রূহ্ সঞ্চারিত হওয়ার পর রূহ্ তাঁর মাথায় পৌঁছুলে তিনি হাঁচি দেন এবং 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলেন। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ 'ইয়ারহামুকাল্লাহ'। ঈষৎ শাব্দিক পার্থক্যসহ হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার (র) (য়াহয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন সাকান)-ও হাদীসটি বর্ণনা করেন।

উমর ইব্‌ন আব্দুল আযীয (র) বলেন, "আদম (আ)-কে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাগণকে আদেশ করা হলে সর্বপ্রথম হযরত ইসরাফীল (আ) সিজদাবনত হন। এর পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ললাটে কুরআন অঙ্কিত করে দেন। ইবনে আসাকির এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন।

হাফিজ আবূ ইয়া'লা (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন। প্রথমে মাটিগুলোকে ভিজিয়ে আটালো করে কিছু দিন রেখে দেন। এতে তা ছাঁচে-ঢালা মাটিতে পরিণত হলে আদম (আ)-এর আকৃতি সৃষ্টি করে কিছুদিন এ অবস্থায় রেখে দেন। এবার তা পোড়া মাটির মত শুকনো ঠনঠনে মাটিতে রূপান্তরিত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, ইবলীস তখন তাঁর কাছে গিয়ে বলতে শুরু করে যে, তুমি এক মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হয়েছ। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মধ্যে রূহ্ সঞ্চার করেন। রূহ্ সর্বপ্রথম তাঁর চোখ ও নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করলে তিনি হাঁচি দেন। হাঁচি শুনে আল্লাহ্ বললেন ঃ يَرْحَمُكَ رَبُّكَ তোমার রব তোমার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন!

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, হে আদম! তুমি ঐ ফেরেশতা দলের কাছে গিয়ে দেখ তারা কী বলে? তখন তিনি ফেরেশতা দলের কাছে গিয়ে তাঁদেরকে সালাম দেন। আর তারা اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ। বলে উত্তর দেন। তখন আল্লাহ বললেন, হে আদম! এটা তোমার এবং তোমরা বংশধরের অভিবাদন। আদম (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার রব! আমার বংশধর আবার কি? আল্লাহ্ বললেন ঃ আদম! তুমি আমার দু'হাতের যে কোন একটি পছন্দ কর। আদম (আ) বললেন, আমি আমার রব্বের ডান হাত পছন্দ করলাম। আমার বর-এর উভয় হাতই তো ডান হাত— বরকতময়।

এবার আল্লাহ্ তা'আলা নিজের হাতের তালু প্রসারিত করলে আদম (আ) কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী তাঁর সকল সন্তানকে আল্লাহ্‌র হাতের তালুতে দেখেতে পান। তন্মধ্যে কিছুসংখ্যকের মুখমণ্ডল ছিল নূরে সমুজ্জ্বল। সহসা তাদের মধ্যে একজনের নূরে অধিক বিমুগ্ধ হয়ে আদম (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার বর! ইনি কে? আল্লাহ্ বললেন, ইনি তোমার সন্তান দাঊদ। জিজ্ঞাসা করলেন, এর আয়ূ কত নির্ধারণ করেছেন? আল্লাহ বললেন, ষাট বছর। আদম (আ) বললেন, আমার থেকে নিয়ে এর আয়ু পূর্ণ একশ' বছর করে দিন। আল্লাহ তাঁর

আবদার মঞ্জুর করেন এবং এ ব্যাপারে ফেরেশতাগণকে সাক্ষী রাখেন। তারপর যখন আদম (আ)-এর আয়ু শেষ হয়ে আসলো তখন তাঁর রূহ্ কবয করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আযরাঈল (আ)-কে প্রেরণ করেন। তখন আদম (আ) বললেন, কেন, আমার আয়ু তো আরো চল্লিশ বছর বাকি আছে! ফেরেশতা বললেন, আপনি না আপনার আয়ুর চল্লিশ বছর আপনার সন্তান দাঊদ (আ)-কে দিয়ে দিয়েছিলেন! কিন্তু আদম (আ) তা অস্বীকার করে বসেন এবং পূর্বের কথা ভুলে যান। ফলে তার সন্তানদের মধ্যে অস্বীকৃতি ও বিস্মৃতির প্রবণতা সৃষ্টি হয়। হাফিজ আবূ বকর বায্যার (র) তিরমিযী ও নাসাঈ (র) তাঁর 'ইয়াওম ওয়াল লাইলা' কিতাবে আবূ হুরায়রা সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান গরীব পর্যায়ের এবং ইমাম নাসাঈ (র) 'মুনকার' তথা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন।

তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পিঠে হাত বুলান। সাথে সাথে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী তাঁর সবক'টি সন্তান তাঁর পিঠ থেকে ঝরে পড়ে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রত্যেকের দু'চোখের মাঝে একটি করে নূরের দীপ্তি স্থাপন করে দিয়ে তাদেরকে আদম (আ)-এর সামনে পেশ করেন। তখন আদম (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আমার রব! এরা কারা? আল্লাহ্ বললেন, এরা তোমার সন্তান-সন্ততি। তখন তাদের একজনের দু'চোখের মাঝে দীপ্তিতে বিমুগ্ধ হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার রব! ইনি কে? আল্লাহ বললেন, সে তোমার ভবিষ্যত বংশধরের দাঊদ নামক এক ব্যক্তি। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এর আয়ু কত নির্ধারণ করেছন? আল্লাহ বললেন ঃ ষাট বছর। আদম (আ) বললেন, হে আমার রব! আমার আয়ু থেকে নিয়ে এর আয়ু আরো চল্লিশ বছর বৃদ্ধি করে দিন। তারপর যখন আদম (আ)-এর আয়ু শেষ হয়ে যায়; তখন জান কবয করার জন্য আযরাঈল (আ) তাঁর কাছে আগমন করেন। তখন তিনি বললেন, আমার আয়ু না আরো চল্লিশ বছর বাকি আছে? আযরাঈল (আ) বললেন, কেন আপনি না তা আপনার সন্তান দাঊদ (আ)-কে দিয়ে দিয়েছিলেন? কিন্তু আদম (আ) তা অস্বীকার করে বসেন। এ কারণে তাঁর সন্তানদের মধ্যে অস্বীকৃতির প্রবণতা রয়েছে। তিনি পূর্বের কথা ভুলে যান। ফলে তাঁর সন্তানদের মধ্যেও বিস্মৃতির প্রবণতা রয়েছে। আদম (আ) ত্রুটি করেন, তাই তাঁর সন্তানরাও ত্রুটি করে থাকে।

ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে আরো একাধিক সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হাকিম (র) তাঁর মুস্তাদরাকে আবূ নুআয়ম (ফযল ইব্নে দুকায়ন)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাদীসটি সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও মুসলিমের কেউই হাদীসটি বর্ণনা করেননি। আর ইব্নে আবূ হাতিম (র) হাদীসটির যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে এও আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-এর বংশধরকে তার সামনে পেশ করে বললেন, হে আদম! এরা তোমার সন্তান-সন্ততি। তখন আদম (আ) তাদের মধ্যে কুষ্ঠ ও শ্বেতী রোগী, অন্ধ এবং আরো নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত লোক দেখতে পেয়ে বললেন, হে আমার রব! আমার সন্তানদের আপনি এ দশা করলেন কেন? আল্লাহ বললেন, করেছি এ জন্য যাতে আমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা হয়। এর পরে বর্ণনটিতে দাঊদ (আ)-এর প্রসঙ্গও রয়েছে—যা ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে পরে আসছে।

ইমাম আহমদ (র) তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, আবুদ্ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যথা সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তার ডান কাঁধে আঘাত করে মুক্তার ন্যায় ধবধবে সাদা তাঁর একদল সন্তানকে বের করেন। আবার তাঁর বাম কাঁধে আঘাত করে কয়লার ন্যায় মিশমিশে কালো একদল সন্তানকে বের করে আনেন। তারপর ডান পাশের গুলোকে বললেন, তোমরা জান্নাতগামী, আমি কারো পরোয়া করি না। আর বাম কাঁধের গুলোকে বললেন, তোমরা জাহান্নামগামী , আমি কারো পরোয়া করি না।

ইব্‌নে আবুদ্ দুনিয়া (র) বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন, "আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ডান পার্শ্বদেশ থেকে জান্নাতীদের আর বাম পার্শ্বদেশ থেকে জাহান্নামীদের বের করে এনে তাদেরকে যমীনে নিক্ষেপ করেন। এদের মধ্যে কিছু লোককে অন্ধ, বধির ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত দেখে আদম (আ) বললেন, হে আমার রব! আমার সন্তানদের সকলকে এক সমান করে সৃষ্টি যে করলেন না তার হেতু কি? আল্লাহ বললেন, "আমি চাই যে, আমার শুকরিয়া আদায় হোক।" আব্দুর রায্‌যাক অনুরূপ রিওয়ায়ত বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন হিব্বানের এ সংক্রান্ত বর্ণনার শেষ দিকে আছে—আল্লাহ্‌র মর্জি মোতাবেক আদম (আ) কিছুকাল জান্নাতে বসবাস করেন। তারপর সেখান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। অবশেষে এক সময় আযরাঈল (আ) তাঁর নিকট আগমন করলে তিনি বললেন, আমার আয়ু তো এক হাজার বছর। আপনি নির্ধারিত সময়ের আগেই এসে পড়েছেন। আযরাঈল (আ) বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আপনি না আপনার আয়ু থেকে চল্লিশ বছর আপনার সন্তান দাউদকে দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আদম (আ) তা অস্বীকার করে বসেন। ফলে তাঁর সন্তানদের মধ্যেও অস্বীকার করার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। তিনি পূর্বের কথা ভুলে যান। ফলে তাঁর সন্তানদের মধ্যে বিস্মৃতির প্রবণতা দেখা দেয়। সেদিন থেকেই পারস্পরিক লেন-দেন লিপিবদ্ধ করে রাখার এবং সাক্ষী রাখার আদেশ জারি হয়।"

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে ষাট হাত দীর্ঘ করে সৃষ্টি করেন। তারপর বললেন, ঐ ফেরেশতা দলের কাছে গিয়ে তুমি তাদের সালাম কর এবং লক্ষ্য করে শোন, তারা তোমাকে কি উত্তর দেয়। কারণ এটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তান-সন্ততির অভিবাদন। আদেশ মত ফেরেশতাগণের কাছে গিয়ে তিনি اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ। বলে সালাম করেন, আর তাঁরা اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ। বলে উত্তর দেন। উল্লেখ্য যে, আদমের সন্তানদের যারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা সকলেই আদম (আ)-এর আকৃতিসম্পন্ন হবে। ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে পেতে মানুষের উচ্চতা এখন এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

অনুরূপ ইমাম বুখারী (র) 'কিতাবুল ইস্তিয়ানে' আর ইমাম মুসলিম (র) তাঁর গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আদম (আ)-এর উচ্চতা ছিল ষাট হাত আর প্রস্থ সাত হাত।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, বকেয়া লেন-দেন লিপিবদ্ধ করে রাখার আদেশ সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, সর্বপ্রথম যিনি

অস্বীকার করেন; তিনি হলেন আদম (আ), সর্বপ্রথম যিনি অস্বীকার করেন, তিনি হলেন আদম (আ), সর্বপ্রথম যিনি অস্বীকার করেন, তিনি হলেন আদম (আ)। ঘটনা হলো—আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাঁর পৃষ্ঠদেশে হাত বুলিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষকে বের করে এনে তাদের তাঁর সামনে পেশ করেন। তাদের মধ্যে তিনি উজ্জ্বল এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে বললেন, হে আমার রব! ইনি কে? আল্লাহ বলেন, সে তোমার সন্তান দাউদ। আদম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, এর আয়ু কত? আল্লাহ বললেন, ষাট বছর। আদম (আ) বললেন, এর আয়ু আরো বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ্ বলেন. না তা হবে না। তবে তোমার আয়ু থেকে কর্তন করে বাড়াতে পারি। উল্লেখ্য যে, আদম (আ)-এর আয়ু ছিল এক হাজার বছর। তাঁর থেকে কর্তন করে আল্লাহ্ তা'আলা দাউদ-এর আয়ু চল্লিশ বছর বৃদ্ধি করেন।

এ ব্যাপারে চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করে নেন এবং ফেরেশতাদের সাক্ষী রাখেন। অবশেষে আদম (আ)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তাঁর জান কবয করার জন্য একদিন আযরাইল (আ) তাঁর কাছে আগমন করেন। তখন তিনি বললেন, আমার আয়ুর তো আরো চল্লিশ বছর বাকি আছে! উত্তরে বলা হলো, কেন আপনি না তা আপনার সন্তান দাউদকে দিয়ে দিয়েছিলেন! আদম (আ) তা অস্বীকার করে বললেন, আমি তো এমনটি করিনি! তখন প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা পূর্বের লিখিত চুক্তিনামা তাঁর সামনে তুলে ধরেন এবং ফেরেশতাগণ এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেন।"

ইমাম আহমদের অনুরূপ আরেকটি বর্ণনার শেষাংশে আছে ঃ "অবশেষে আল্লাহ দাউদের বয়স একশ বছর আর আদম (আ)-এর এক হাজার বছর পূর্ণ করে দেন।" তাবারানী (র)ও অনুরূপ একটি রিওয়ায়ত বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মালিক ইব্‌নে আনাস (র) বর্ণনা করেন যে, মুসলিম ইব্‌নে য়াসার (র) বলেন, উমর ইব্‌নে খাত্তাব (রা)-কে وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ الخ এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন, এ আয়াত সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাঁর পিঠে নিজের ডান হাত বুলিয়ে তাঁর সন্তানদের একদল বের করে এনে বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করলাম। এরা জান্নাতীদের আমলই করবে। তারপর পুনরায় হাত বুলিয়ে আরেক দল সন্তানকে বের করে এনে বললেন, এদের আমি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। এরা জাহান্নামীদেরই আমল করবে। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমল করার প্রয়োজন কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "আল্লাহ যাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তার থেকে তিনি জান্নাতীদেরই আমল করান। আমৃত্যু জান্নাতীদের আমল করতে করতেই শেষ পর্যন্ত সে জান্নাতে চলে যাবে। পক্ষান্তরে যাকে তিনি জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন; তার দ্বারা তিনি জাহান্নামীদের আমলই করান। আমৃত্যু জাহান্নামীদের আমল করতে করতেই শেষ পর্যন্ত সে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে।"

ইমাম আহমদ আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌নে জারীর ও ইব্‌নে আবূ হাতিম ও আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান (র) বিভিন্ন সূত্রে ইমাম মালেক (র) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি 'হাসান সহীহ' বলে মন্তব্য করেছেন। তবে উমর (রা) নিকট থেকে মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার (র) সরাসরি হাদীসটি শুনেননি। আবূ হাতিম ও আবূ যুর'আ (র) এ অভিমত পেশ করেছেন। আবু হাতিম (র) আরো বলেছেন যে, এ দুজনের মাঝে আরেক রাবী নুয়ায়ম ইব্‌নে রবীয়া রয়েছেন। ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটির সূত্রে ইব্‌নে যায়েদ ইবনে খাত্তাব, মধ্যবর্তী রাবী নুয়ায়ম ইব্‌ন রবীয়ার নামও উল্লেখ করেছেন। দারা কুতনী বলেন, "উপরোক্ত সব ক'টি হাদীস এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-এর সন্তানদের তাঁরই পিঠ থেকে ছোট ছোট পিঁপড়ার মত বের করে এনেছেন এবং তাদেরকে ডান ও বাম এ দু'দলে বিভক্ত করে ডান দলকে বলেছেন, তোমরা জান্নাতী, আমি কাউকে পরোয়া করি না। আর বাম দলকে বলেছেন, তোমরা জাহান্নামী, আমার কারো পরোয়া নেই।" পক্ষান্তরে তাঁদের নিকট থেকে সাক্ষ্য এবং আল্লাহর একত্ব সম্পর্কে তাঁদের থেকে স্বীকারোক্তি নেয়ার কথা প্রামাণ্য কোন হাদীস পাওয়া যায় না। সূরা আরাফের একটি আয়াতকে এ অর্থে প্রয়োগ করার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। যথাস্থানে এ বিষয়ে আমি সবিস্তার আলোচনা করেছি। তবে এ মর্মে ইমাম আহমদ (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস আছে। ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী যার সনদ উত্তম ও শক্তিশালী। হাদীসটি হলো ঃ

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা জিলহজ্জের নয় তারিখে নু'মান নামক স্থানে আদম (আ)-এর পিঠ থেকে অঙ্গীকার নেন। তারপর তাঁর মেরুদণ্ড থেকে (কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী) তাঁর সকল সন্তানকে বের করে এনে তাঁর সম্মুখে ছড়িয়ে দেন। তারপর তাদের সাথে সামনা-সামনি কথা বলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলল, নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী থাকলাম। এ স্বীকৃতি গ্রহণ এ জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন বলতে না পারো আমরা তো এ ব্যাপারে অনবহিত ছিলাম। কিংবা তোমরা যেন বলতে না পার যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শির্‌ক করে। আর আমরা তো তাঁদের পরবর্তী বংশধর, তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃত-কর্মের জন্য তুমি আমাদের ধ্বংস করবে ? (৭ ঃ ১৭২ - ১৭৩)

ইমাম নাসাঈ, ইব্‌ন জারীর ও হাকিম (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম (র) হাদীসটির সনদ সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। প্রামাণ্য কথা হলো, বর্ণিত হাদীসটি আসলে ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি। আব্দুল্লাহ ইব্‌নে উমর (রা) থেকেও মওকূফ, মরফূ উভয় সূত্রেই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে মওফূক সূত্রটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। তবে অধিকাংশ আলিমের মতে, সেদিন আদম (আ)-এর সন্তানদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। তাদের দলীল হলো, ইমাম আহমদ (র) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটি। যাতে আছে –

আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ "কিয়ামতের দিন কোন এক জাহান্নামীকে বলা হবে— আচ্ছা, যদি তুমি পৃথিবীর সমুদয় বস্তু-সম্ভারের মালিক হতে; তাহলে এখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তার সমস্ত কিছু মুক্তিপণ রূপে দিতে প্রস্তুত থাকতে? উত্তরে

সে বলবে, জী হ্যাঁ। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি তো তোমার নিকট থেকে এর চাইতে আরো সহজটাই চেয়েছিলাম। আদম (আ)-এর পিঠে থাকা অবস্থায় আমি তোমার নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, আমার সাথে তুমি কাউকে শরীক করবে না। কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করে তুমি শরীক না করে ছাড়োনি। শু'বার বরাতে বুখারী (র) এবং মুসলিম (র) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবূ জাফর রাযী (র) বর্ণনা করেন যে, উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ الخ এ আয়াত এবং এর পরবর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মানুষ সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এক স্থানে সমবেত করেন। তারপর তাদের সাথে কথা বলেন ও তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন এবং তাদের নিজেদেরকেই তাদের সাক্ষীরূপে রেখে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "আমি কি তোমাদের রব নই? তাঁরা বলল, জী হ্যাঁ। আল্লাহ্ বললেন, এ ব্যাপারে আমি সাত আসমান, সাত যমীন এবং তোমাদের পিতা আদমকে সাক্ষী রাখলাম, যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা এ কথা বলতে না পার যে, এ ব্যাপারে তো আমরা কিছুই জানতাম না। তোমরা জেনে রাখ যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমি ব্যতীত কোন রব নেই। আর আমার সাথে তোমরা কাউকে শরীক করো না। তোমাদের নিকট পর্যায়ক্রমে আমি রাসূল পাঠাব, তাঁরা তোমাদেরকে আমার এ অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে সতর্ক করবেন। আর তোমাদের কাছে আমি আমার কিতাব নাযিল করব।" তাঁরা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিলাম যে, আপনি আমাদের রব ও ইলাহ। আপনি ব্যতীত আমাদের কোন রব বা ইলাহ নেই। মোটকথা, সেদিন তাঁরা আল্লাহর আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিল।

এরপর উপর থেকে দৃষ্টিপাত করে আদম (আ) তাঁদের মধ্যে ধনী-গরীব ও সুশ্রী-কুশ্রী সকল ধরনের লোক দেখতে পেয়ে বললেন, হে আমার রব! আপনার বান্দাদের সকলকে যদি সমান করে সৃষ্টি করতেন! আল্লাহ্ বললেন, আমি চাই, আমার শুকরিয়া আদায় করা হোক। এরপর আদম (আ) নবীগণকে তাদের মধ্যে প্রদীপের ন্যায় দীপ্তিমান দেখতে পান। আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট থেকে রিসালাত ও নবুওতের বিশেষ অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَإِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا .

অর্থাৎ— স্মরণ কর, যখন আমি নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট থেকেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারয়াম তনয় ঈসার নিকট থেকে—এদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার। (৩৩ ঃ ৭)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا . فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا . لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ .

অর্থাৎ—তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্‌র প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। (৩০ ঃ ৩০)

هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى অর্থাৎ—অতীতের সতর্ককারীদের ন্যায় এ নবীও একজন সতর্ককারী। (৫৩ ঃ ৫৭)

وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْثَرِهِمْ مِّنْ عَهْدٍ . وَاِنْ وَّجَدْنَا اَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِيْنَ .

অর্থাৎ— আমি তাঁদের অধিকাংশকে প্রতিশ্রুতি পালনকারী পাইনি বরং তাদের অধিকাংশকে তো সত্যত্যাগী পেয়েছি। (৭ ঃ ১০২)

ইমাম আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ, ইব্ন আবূ হাতিম, ইব্ন জারীর ও ইব্ন মারদূওয়েহ্ (র) তাঁদের নিজ নিজ তাফসীর গ্রন্থে আবূ জাফর (র) সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, হাসান বসরী, কাতাদা ও সুদ্দী (র) প্রমুখ পূর্বসূরি আলিম থেকেও এসব হাদীসের সমর্থনে বর্ণনা পাওয়া যায়। আর পূর্বে আমরা এ কথাটি উল্লেখ করে এসেছি যে, ফেরেশতাগণ আদম (আ)-কে সিজদা করার জন্যে আদিষ্ট হলে ইবলীস ব্যতীত সকলেই সে খোদায়ী ফরমান পালন করেন। ইবলীস হিংসা ও শত্রুতাবশত সিজদা করা থেকে বিরত থাকে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে আপন সান্নিধ্য থেকে বিতাড়িত করে অভিশপ্ত শয়তান বানিয়ে পৃথিবীতে নির্বাসন দেন।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "আদমের সন্তানরা সিজদার আয়াত পাঠ করে যখন সিজদা করে; ইবলীস তখন একদিকে সরে গিয়ে কাঁদতে শুরু করে এবং বলে, হায় কপাল! আল্লাহর আদেশ পালনার্থে সিজদা করে আদম সন্তান জান্নাতী হলো আর সিজদার আদেশ অমান্য করে আমি হলাম জাহান্নামী।" ইমাম মুসলিমও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

যাহোক, আদম (আ) ও তাঁর সহধর্মিনী হাওয়া (আ) জান্নাতে— তা আসমানেরই হোক, বা যমীনেরই কোন উদ্যান হোক— যে মতভেদের কথা পূর্বেই বিবৃত হয়েছে— কিছুকাল বসবাস করেন এবং অবাধে ও স্বচ্ছন্দে সেখানে আহারাদি করতে থাকেন। অবশেষে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আহার করায় তাদের পরিধানের পোশাক ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তাদেরকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়। অবতরণের ক্ষেত্র সম্পর্কে মতভেদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

জান্নাতে আদম (আ)-এর অবস্থানকাল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে দুনিয়ার হিসাবের একদিনের কিছু অংশ। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মরফূ সূত্রে ইমাম মুসলিম (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস উপরে উল্লেখ করে এসেছি যে, আদম (আ)-কে জুম'আর দিনের শেষ প্রহরে সৃষ্টি করা হয়েছে। আরেক বর্ণনায় এও আছে যে, জুম'আর দিন আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয় আর এদিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করা হয়। সুতরাং যদি এমন হয়ে থাকে যে, যেদিন আদম (আ)-এর সৃষ্টি হয় ঠিক সেদিনই জান্নাত থেকে তিনি বহিষ্কৃত হন, তাহলে একথা বলা যায় যে, তিনি একদিনের মাত্র কিছু অংশ জান্নাতে অবস্থান করেছিলেন। তবে এ বক্তব্যটি বিতর্কের ঊর্ধে নয়। পক্ষান্তরে যদি তাঁর বহিষ্কার সৃষ্টির দিন থেকে ভিন্ন কোন দিনে হয়ে থাকে কিংবা ঐ ছয় দিনের সময়ের পরিমাণ ছয় হাজার বছর হয়ে থাকলে সেখানে তিনি

সুদীর্ঘ সময়ই অবস্থান করে থাকবেন। যেমন ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ও যাহ্হাক (র) থেকে বর্ণিত এবং ইব্ন জারীর (র) কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে বলে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

ইবনে জারীর (র) বলেন, এটা জানা কথা যে, আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে জুম'আ দিবসের শেষ প্রহরে। আর তথাকার এক প্রহর দুনিয়ার তিরাশি বছর চার মাসের সমান। এতে প্রমাণিত হয় যে, রূহ সঞ্চারের পূর্বে মাটির মূর্তিরূপে আদম (আ) চল্লিশ বছর এমনিতেই পড়ে রয়েছিলেন। আর পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বে জান্নাতে অবস্থান করেছেন তেতাল্লিশ বছর চার মাস কাল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আবদুর রায্যাক (র) বর্ণনা করেন যে, 'আতা ইবনে আবূ রাবাহ (র) বলেন, আদম (আ)-এর পদদ্বয় যখন পৃথিবী স্পর্শ করে তখনো তাঁর মাথা ছিল আকাশে। তারপর আল্লাহ তাঁর দৈর্ঘ্য ষাট হাতে কমিয়ে আনেন। ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রেও এরূপ একটি বর্ণনা আছে। তবে এ তথ্যটি আপত্তিকর। কারণ ইতিপূর্বে আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক সর্বজন স্বীকৃত বিশুদ্ধ হাদীস উদ্ধৃত করে এসেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে ষাট হাত দীর্ঘ করে সৃষ্টি করেন। এরপর তাঁর সন্তানদের উচ্চতা কমতে কমতে এখন এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আদম (আ)-কে সৃষ্টিই করা হয়েছে ষাট হাত দৈর্ঘ্য দিয়ে— তার বেশি নয়। আর তাঁর সন্তানদের উচ্চতা হ্রাস পেতে পেতে এখন এ পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে।

ইবনে জারীর (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম! আমার আরশ বরাবর পৃথিবীতে আমার একটি সম্মানিত স্থান আছে। তুমি গিয়ে তথায় আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে তা তাওয়াফ কর, যেমনটি ফেরেশতারা আমার আরশ তাওয়াফ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কাছে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তিনি আদম (আ)-কে জায়গাটি দেখিয়ে দেন এবং তাকে হজ্জের করণীয় কাজসমূহ শিখিয়ে দেন। ইবনে জারীর (র) আরো উল্লেখ করেন যে, দুনিয়ার যেখানে সেখানে আদম (আ)-এর পদচারণা হয়, পরবর্তীতে সেখানেই এক একটি জনবসতি গড়ে ওঠে।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, পৃথিবীত আদম (আ)-এর প্রথম খাদ্য ছিল গম। জিবরাঈল (আ) তার কাছে সাতটি গমের বীজ নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কি? জিবরাঈল (আ) বললেন, এ-ই তো আপনার সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল, যা আপনি খেয়েছিলেন। আদম (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো আমি কি করব? জিবরাঈল (আ) বললেন, যমীনে বপন করবেন। উল্লেখ্য যে, তাঁর প্রতিটি বীজের ওজন ছিল দুনিয়ার এক লক্ষ দানা অপেক্ষা বেশি। বীজগুলো রোপণ করার পর ফসল উৎপন্ন হলে আদম (আ) তা কেটে মাড়িয়ে পিষে আটা বানিয়ে খামির করে রুটি বানিয়ে বহু ক্লেশ ও শ্রমের পর তা আহার করেন। এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا الخ সুতরাং সে যেন তোমাদের কিছুতেই জান্নাত থেকে বের করে না দেয়। দিলে তোমরা দুঃখ পাবে।' (২০-১১৭)

আদম ও হাওয়া (আ) সর্বপ্রথম যে পোশাক পরিধান করেন, তা ছিল ভেড়ার পশমের তৈরি। প্রথমে চামড়া থেকে পশমগুলো খসিয়ে তা দিয়ে সুতা তৈরি করেন। তারপর আদম (আ) নিজের জন্য একটি জুব্বা আর হাওয়ার জন্য একটি কামীজ ও একটি ওড়না তৈরি করে নেন।

জান্নাতে থাকাবস্থায় তাঁদের কোন সন্তানাদি জন্মেছিল কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও তাঁদের কোন সন্তান জন্মেনি। কেউ বলেন, জন্মেছে। কাবীল ও তার বোনের জন্ম জান্নাতেই হয়েছিল। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

উল্লেখ্য যে, প্রতি দফায় আদম (আ)-এর এক সঙ্গে একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিত। আর এক গর্ভের পুত্রের সঙ্গে পরবর্তী গর্ভের কন্যার ও কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেওয়ার বিধান দেওয়া হয়। পরবর্তীতে একই গর্ভের দু'ভাই-বোনের বিবাহ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

কাবীল ও হাবীলের কাহিনী

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. قَالَ يَا وَيْلَتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ.

অর্থাৎ— আদমের দু'পুত্রের বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শোনাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের কুরবানী কবূল হলো, অন্য অনের কবূল হলো না। তাদের একজন বলল, আমি তোমাকে হত্যা করব-ই। অপরজন বলল, আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানী কবূল করেন।

আমাকে হত্যা করার জন্য আমার প্রতি তুমি হাত বাড়ালেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি হাত বাড়াব না। আমি তো জগতসমূহের রব আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই যে, তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন করে জাহান্নামী হও এবং এটা জালিমদের কর্মফল। তারপর তার প্রবৃত্তি তাকে তার ভাইকে হত্যায় প্ররোচিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা একটি কাক পাঠালেন যে তার ভাই-এর লাশ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার জন্য মাটি খুঁড়তে লাগল। সে বলল, হায়! আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না যাতে আমার ভাই-এর লাশ গোপন করতে পারি? তারপর সে অনুতপ্ত হলো। (৫ ঃ ২৭-৩১)

তাফসীর গ্রন্থে আমরা সূরা মায়িদার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কাহিনী সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করেছি। এখানে শুধু পূর্বসূরি ইমামগণ এ বিষয়ে যা বলেছেন তার সারাংশ উল্লেখ করব।

সুদ্দী (র) ইব্‌ন আব্বাস ও ইব্‌ন মাসউদ (রা)-সহ কতিপয় সাহাবা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আদম (আ) এক গর্ভের পুত্র সন্তানের সঙ্গে অন্য গর্ভের কন্যা সন্তানকে বিয়ে দিতেন। হাবীল সে মতে কাবীলের যমজ বোনকে বিয়ে করতে মনস্থ করেন। কাবীল বয়সে হাবীলের চাইতে বড় ছিল। আর তার বোন ছিল অত্যধিক রূপসী।[১]

তাই কাবীল ভাইকে না দিয়ে নিজেই আপন বোনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইল এবং আদম (আ) হাবীলের সাথে তাকে বিবাহ দেয়ার আদেশ করলে সে তা অগ্রাহ্য করল। ফলে আদম (আ) তাদের দু'জনকে কুরবানী করার আদেশ দিয়ে নিজে হজ্জ করার জন্য মক্কায় চলে যান। যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি আসমানসমূহকে তাঁর সন্তানদের দেখাশুনার দায়িত্ব দিতে চান কিন্তু তারা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। যমীন এবং পাহাড় পর্বতসমূহকে তা নিতে বললে তারাও অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে কাবীল এ দায়িত্বভার গ্রহণ করে।

তারপর আদম (আ) চলে গেলে তারা তাদের কুরবানী করে। হাবীল একটি মোটা-তাজা বকরী কুরবানী করেন। তার অনেক বকরী ছিল। আর কাবীল কুরবানী দেয় নিজের উৎপাদিত নিম্নমানের এক বোঝা শস্য।

তারপর আগুন হাবীলের কুরবানী গ্রাস করে নেয় আর কাবীলের কুরবানী অগ্রাহ্য করে। এতে কাবীল ক্ষেপে গিয়ে বলল, তোমাকে আমি হত্যা করেই ছাড়ব। যাতে করে তুমি আমার বোনকে বিয়ে করতে না পার। উত্তরে হাবীল বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা কেবল মুত্তাকীদের কুরবানী-ই কবূল করে থাকেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আরো একাধিক সূত্রে এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকেও এটা বর্ণিত আছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! তাদের দু'জনের মধ্যে নিহত লোকটি-ই অধিকতর শক্তিশালী ছিল। কিন্তু নির্দোষ থাকার প্রবণতা তাকে হত্যাকারীর প্রতি হাত বাড়ানো থেকে বিরত রাখে।

আবূ জা'ফর আল-বাকির (র) বলেন, আদম (আ) হাবীল ও কাবীলের কুরবানী করার এবং হাবীলের কুরবানী কবূল হওয়ার আর কাবীলের কুরবানী কবূল না হওয়ার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। তখন কাবীল বলল, ওর জন্য আপনি দু'আ করেছিলেন বিধায় তার কুরবানী কবূল হয়েছে আর আমার জন্য আপনি দু'আই করেননি। সাথে সাথে সে ভাইকে হুমকি প্রদান করে।

এর কিছুদিন পর একরাতে হাবীল পশুপাল নিয়ে বাড়ি ফিরতে বিলম্ব করেন। ফলে আদম (আ) তার ভাই কাবীলকে বললেন, দেখতো ওর আসতে এত দেরি হচ্ছে কেন? কাবীল গিয়ে হাবীলকে চারণ ভূমিতে দেখতে পেয়ে তাকে বলল, তোমার কুরবানী কবূল হলো আর আমারটা হয়নি। হাবীল বললেন, আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের কুরবানী-ই কবূল করে থাকেন। এ কথা শুনে চটে গিয়ে কাবীল সাথে থাকা একটি লোহার টুকরো দিয়ে আঘাত করে তাকে হত্যা করে।

১. মূল আরবীতে সম্ভবত ভুলবশত কাবীল স্থলে হাবীল ছাপা হয়েছে। — সম্পাদকদ্বয়

কেউ কেউ বলেন, কাবীল ঘুমন্ত অবস্থায় হাবীলকে একটি পাথর খণ্ড নিক্ষেপে তাঁর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। কেউ কেউ বলেন, কাবীল সজোরে হাবীলের গলা টিপে ধরে এবং হিংস্র পশুর ন্যায় তাঁকে কামড় দেয়াতেই তিনি মারা যান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. إِنِّيْ أَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ .

অর্থাৎ— আমাকে খুন করার জন্য তুমি আমার প্রতি হাত বাড়ালেও তোমাকে খুন করার জন্য আমি তোমার প্রতি হাত বাড়াবার নই। (৫ ঃ ২৮)

কাবীলের হত্যার হুমকির জবাবে হাবীলের এ বক্তব্য তাঁর উত্তম চরিত্র, খোদাভীতি এবং ভাই তাঁর ক্ষতি সাধন করার যে সংকল্প ব্যক্ত করেছিল তার প্রতিশোধ নেয়া থেকে তাঁর বিরত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ প্রসঙ্গেই সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ তরবারি উঁচিয়ে দু' মুসলিম মুখোমুখি হলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি দু'জনেই জাহান্নামে যাবে। একথা শুনে সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হত্যাকারী জাহান্নামে যাওয়ার কারণটা তো বুঝলাম, কিন্তু নিহত ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে তার কারণ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এর কারণ সেও তার সঙ্গীকে হত্যার জন্য লালায়িত ছিল।

إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ تَبُوْأَ بِإِثْمِيْ وَإِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ . وَذٰلِكَ جَزٰؤُا الظّٰلِمِيْنَ .

অর্থাৎ— আমি তোমার সাথে লড়াই করা পরিহার করতে চাই। যদিও আমি তোমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। কারণ আমি এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছি যে, তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন করবে। অর্থাৎ তোমার পূর্ববর্তী পাপসমূহের সাথে আমাকে হত্যা করার পাপের বোঝাও তুমি বহন করবে, আমি এটাই চাই। মুজাহিদ সুদ্দী ও ইব্ন জারীর (র) প্রমুখ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থ করেছেন। এ আয়াতের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, নিছক হত্যার কারণে নিহত ব্যক্তির যাবতীয় পাপ হত্যাকারীর ঘাড়ে গিয়ে চাপে, যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন। কেননা, ইব্ন জারীর এ মতের বিপরীত মতকে সর্ববাদী সম্মত মত বলে বর্ণনা করেছেন।

অজ্ঞাত নামা কেউ কেউ এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির যিম্মায় কোন পাপ অবশিষ্ট রাখে না। কিন্তু এর কোন ভিত্তি নেই এবং হাদীসের কোন কিতাবে সহীহ; হাসান বা যয়ীফ কোন সনদে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কারো কারো ব্যাপারে কিয়ামতের দিন এমনটি ঘটবে যে, নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীর নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করবে। কিন্তু হত্যাকারীর নেক আমলসমূহ তা পূরণ করতে পারবে না। ফলে নিহত ব্যক্তির পাপকর্ম হত্যাকারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। যেমনটি সর্বপ্রকার অত্যাচার-অবিচারের ব্যাপারে সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর হত্যা হলো, সব জুলুমের বড় জুলুম। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। তাফসীরে আমরা এসব আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য।

ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী (র) সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর গোলযোগের সময় বলেছিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি গোলযোগ হবে যে, সে সময়ে বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চাইতে, দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি চলন্ত ব্যক্তির চাইতে এবং চলন্ত ব্যক্তি ধাবমান ব্যক্তির চাইতে উত্তম হবে।" এ কথা শুনে সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) বললেন, আচ্ছা, কেউ যদি আমার ঘরে প্রবেশ করে আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়ায় তখন আমি কি করব? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ "তখন তুমি আদমের পুত্রের ন্যায় হয়ো।" হুযায়ফা ইব্ন য়ামান (রা) থেকে ইব্ন মারদুয়েহ মারফূ সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "তখন তুমি আদমের দু'পুত্রের উত্তমজনের ন্যায় হয়ো।" মুসলিম এবং একমাত্র নাসাঈ ব্যতীত সুনান সংকলকগণ আবূ যর (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "অন্যায়ভাবে যে ব্যক্তিই নিহত হয় তার খুনের একটি দায় আদমের প্রথম পুত্রের ঘাড়ে চাপে। কারণ সে-ই সর্বপ্রথম হত্যার রেওয়াজ প্রবর্তন করে।"

আবূ দাউদ (র) ব্যতীত সিহাহ সিত্তাহ্র সংকলকগণ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তদ্রূপ আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন আস (রা) ও ইবরাহীম নাখয়ী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা এতটুকু বলার পর আরো বলেছেন যে, দামেশ্কের উত্তর সীমান্তে কাসিউন পাহাড়ের সন্নিকটে একটি বধ্যভূমি আছে বলে কথিত আছে। এ স্থানটিকে মাগারাতুদ দাম বলা হয়ে থাকে। কেননা সেখানেই কাবীল তার ভাই হাবীলকে খুন করেছিল বলে কথিত আছে। এ তথ্যটি আহলে কিতাবদের থেকে সংগৃহীত। তাই এর যথার্থতা সম্পর্কে আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) তাঁর গ্রন্থে আহমদ ইব্ন কাসীর (র)-এর জীবনী প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি একজন পুণ্যবান লোক ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা), আবূ বকর (রা), উমর (রা) ও হাবীলকে স্বপ্ন দেখেন। তিনি হাবীলকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, এখানেই তাঁর রক্তপাত করা হয়েছে কি না। তিনি শপথ করে তা স্বীকার করেন এবং বলেন যে, তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করেছিলেন, যেন তিনি এ স্থানটিকে সব দু'আ কবূল হওয়ার স্থান করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দু'আ কবূল করেন। আর রাসূলুল্লাহ (সা) এ ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন দান করে বলেন ঃ আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) প্রতি বৃহস্পতিবার এ স্থানটির যিয়ারত করেন। এটি একটি স্বপ্ন মাত্র। ঘটনাটি সত্যি সত্যি আহমদ ইব্ন কাসীর-এর হলেও এর উপর শরয়ী বিধান কার্যকর হবে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِيْ سَوْءَةَ أَخِيْهِ. قَالَ يَا وَيْلَتٰى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِىَ سَوْءَةَ أَخِىْ. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِيْنَ.

অর্থাৎ— তারপর আল্লাহ এক কাক পাঠালেন, যে তার ভাই-এর শব কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার জন্য মাটি খনন করতে লাগল। সে বলল, হায়! আমি কি এ কাকের মতও

হতে পারলাম না, যাতে আমার ভাইয়ের লাশ গোপন করতে পারি? তারপর সে অনুতপ্ত হলো। (৫ : ৩১)

কেউ কেউ উল্লেখ করেন যে, কাবীল হাবীলকে হত্যা করে এক বছর পর্যন্ত; অন্যদের মতে একশত বছর পর্যন্ত তাকে নিজের পিঠে করে রাখে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা দু'টি কাক প্রেরণ করেন। সুদ্দী (র) সনদসহ কতিপয় সাহাবীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, দু'ভাই (ভাই সম্পর্কীয় দু'টি কাক) পরস্পর ঝগড়া করে একজন অপরজনকে হত্যা করে ফেলে। তারপর মাটি খুঁড়ে তাকে দাফন করে রাখে। তখন কাবীল এ দৃশ্য দেখে বলল, ... يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ- এরপর সে কাকের ন্যায় হাবীলকে দাফন করে।

ইতিহাস ও সীরাত বিশারদগণ বলেন যে, আদম (আ) তাঁর পুত্র হাবীলের জন্য অত্যন্ত শোকাহত হয়ে পড়েন এবং এ বিষয়ে কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করেন। ইব্ন জারীর (র) ইব্ন হুমায়দ থেকে তা উল্লেখ করেন। তাহলো :

تغيرت البلاد ومن عليها – فوجه الأرض مغبر قبح

تغير كل ذى لون وطعم – وقل بشاشة الوجه المليح

অর্থাৎ— জনপদ ও জনগণ সব উলট-পালট হয়ে গেছে। ফলে পৃথিবীর চেহারা এখন ধূলি-ধূসর ও মলিন রূপ ধারণ করেছে। কোন কিছুরই রং-রূপ-স্বাদ-গন্ধ এখন আর আগের মত নেই। লাবণ্যময় চেহারার উজ্জ্বলতাও আগের চেয়ে কমে গেছে।

এর জবাবে আদম (আ)-এর উদ্দেশে বলা হলো :

ابا هابيل قد قتلا جميعا – وصار الى كالميت الذبح

وجاء بشرة قد كان منها – علي خوف فجماء بها يصبح

অর্থাৎ— হে হাবীলের পিতা! ওরা দু'জনই নিহত হয়েছে এবং বেঁচে থাকা লোকটিও যবাইকৃত মৃতের ন্যায় হয়ে গেছে। সে এমন একটি অপকর্ম করলো যে, তার ফলে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করতে করতে ছুটতে লাগলো।

এ পংক্তিগুলোও সন্দেহমুক্ত নয়। এমনও হতে পারে যে, আদম (আ) পুত্রশোকে নিজের ভাষায় কোন কথা বলেছিলেন, পরবর্তীতে কেউ তা এভাবে কবিতায় রূপ দেয়। এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

মুজাহিদ (র) উল্লেখ করেন যে, কাবীল যেদিন তার ভাইকে হত্যা করেছিল সেদিনই নগদ নগদ তাকে এর শাস্তি প্রদান করা হয়। মাতা-পিতার অবাধ্যতা, ভাইয়ের প্রতি হিংসা এবং পাপের শাস্তিস্বরূপ তার পায়ের গোছাকে উরুর সাথে ঝুলিয়ে এবং মুখমণ্ডলকে সূর্যমুখী করে রাখা হয়েছিল। হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : পরকালের জন্য শাস্তি সঞ্চিত রাখার সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেও তার নগদ শাস্তি প্রদান করেন। শাসকের বিরুদ্ধাচরণ ও আত্মীয়তা ছিন্ন করার মত এমন জঘন্য অপরাধ আর নেই।

আহ্‌লে কিতাবদের হাতে রক্ষিত তথাকথিত তাওরাতে আমি দেখেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা কাবীলকে অবকাশ দিয়েছিলেন। সে এডেনের পূর্বদিকে অবস্থিত নূদ অঞ্চলের কিন্নীন নামক স্থানে কিছুকাল বসবাস করেছিল এবং খানূখ নামক তার একটি সন্তানও জন্ম হয়েছিল। তারপর খানূকের ঔরসে উনদুর, উনদুরের ঔরসে মাহ্ওয়াবীল, মাহওয়াবীলের ঔরসে মুতাওয়াশীল এবং মুতাওয়াশীলের ঔরসে লামাকের জন্ম হয়। এই লামাক দু' মহিলাকে বিবাহ করে। একজন হলো আদা আর অপর জন সালা। আদা ইবিল নামক একটি সন্তান প্রসব করেন। এ ইবিলই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি গম্বুজাকৃতির তাঁবুতে বসবাস করেন এবং সম্পদ আহরণ করেন। ঐ আদার গর্ভে নওবিল নামক আরেকটি সন্তান জন্ম হয় এবং ঐ ব্যক্তিই সর্বপ্রথম বাদ্যযন্ত্র এবং করতাল ব্যবহার করে।

আর সালা তুবলাকীন নামক একটি সন্তান প্রসব করেন। এ তুবলাকীনই সর্বপ্রথম তামা ও লোহা ব্যবহার করেন। সালা একটি কন্যা সন্তানও প্রসব করেন, তার নাম ছিল না'মা।

কথিত তাওরাতে এও আছে যে, আদম (আ) একদা স্ত্রী সহবাস করলে তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। স্ত্রী তার নাম শীছ রেখে বললেন, কাবীল কর্তৃক নিহত হাবীলের পরিবর্তে আমাকে এ সন্তান দান করা হয়েছে বলে এর এ নাম রাখা হলো। এ শীছের ঔরসে আনূশ-এর জন্ম হয়।

কথিত আছে যে, শীছ-এর যেদিন জন্ম হয় সেদিন আদম (আ)-এর বয়স ছিল একশ ত্রিশ বছর। এরপর তিনি আরো আটশ বছর বেঁচেছিলেন। আনূশের জন্মের দিন শীছ-এর বয়স ছিল একশ পঁয়ষট্টি বছর। এরপর তিনি আরো আটশ' সাত বছর বেঁচেছিলেন। আনূশ ছাড়া তাঁর আরো কয়েকটি ছেলে-মেয়ে ভূমিষ্ঠ হন। আনূশের বয়স যখন নব্বই বছর, তখন তাঁর পুত্র কীনান-এর জন্ম হয়। এরপর তিনি আরো আটশ' পনের বছর বেঁচেছিলেন। এ সময়ে তাঁর আরো কয়েকটি ছেলে-মেয়ের জন্ম হয়। তারপর যখন কীনানের বয়স সত্তর বছরে উপনীত হয়, তখন তাঁর ঔরসে মাহলাইল-এর জন্ম হয়। এরপর তিনি আরো আটশ চল্লিশ বছর আয়ু পান। এ সময়ে তাঁর আরো কিছু ছেলে-মেয়ের জন্ম হয়। তারপর মাহলাইল পঁয়ষট্টি বছর বয়সে উপনীত হলে তার পুত্র য়ারদ-এর জন্ম হয়। এরপর তিনি আরো আটশ ত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন। এ সময়ে তাঁর আরো কয়েকটি ছেলে-মেয়ে জন্ম হয়। তারপর য়ারদ একশ বাষট্টি বছর বয়সে পৌঁছুলে তাঁর পুত্র খানূখ-এর জন্ম হয়। এরপর তিনি আরো আটশ' বছর বেঁচে থাকেন। এ সময়ে তাঁর আরো কয়েকটি পুত্র-কন্যার জন্ম হয়। তারপর খানূখের বয়স পঁয়ষট্টি বছর হলে তার পুত্র মুতাওয়াশ্শালিহ-এর জন্ম হয়। এরপর তিনি আরো আটশ' বছর বেঁচেছিলেন। এ সময়ে তাঁর আরো কয়েকটি ছেলে-মেয়ে জন্ম নেয়। তারপর যখন মুতাওয়াশ্শালিহ একশ সাতাশি বছর বয়সে উপনীত হন, তখন তাঁর পুত্র লামাক-এর জন্ম হয়। এরপর তিনি আরো সাতশ বিরাশি বছর হায়াত পান। এ সময়ে তাঁর আরো কয়েকটি ছেলে-মেয়ে জন্মলাভ করে। লামাক এর বয়স একশ' বিরাশি বছর হলে তার ঔরসে নূহ (আ)-এর জন্ম হয়। এর পর তিনি আরো পাঁচশ' পঁচানব্বই বছর বেঁচে থাকেন। এ সময়ে তাঁর আরো করেকটি ছেলে-মেয়ের জন্ম হয়। তারপর নূহ (আ)-এর বয়স পাঁচশ বছর হলে তাঁর ঔরসে সাম, হাম ও য়াফিছ-এর জন্ম হয়। এ হলো আহলি কিতাবদের গ্রন্থের সুস্পষ্ট বর্ণনা।

উক্ত ঘটনাপঞ্জি আসমানী কিতাবের বর্ণনা কি না এ ব্যাপারে যথাযথ সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। বহু আলিম এ অভিমত ব্যক্ত করে এ ব্যাপারে আহ্লি কিতাবদের বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। উক্ত বর্ণনায় যে অবিবেচনা প্রসূত অতিকথন রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। অনেকে এ বর্ণনাটিতে ব্যাখ্যাস্বরূপ অনেক সংযোজন করেছেন এবং তাতে যথেষ্ট ভুল রয়েছে। যথাস্থানে আমি বিষয়টি আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

ইমাম আবূ জাফর ইব্ন জাবীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে কতিপয় আহ্লি কিতাবের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, আদম (আ)-এর ঔরসে হাওয়া (আ)-এর বিশ গর্ভে চল্লিশটি সন্তান প্রসব করেন। ইব্ন ইসহাক এ বক্তব্য দিয়ে তাদের নামও উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

কেউ কেউ বলেন, হাওয়া (আ) প্রতি গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান করে একশ' বিশ জোড়া সন্তানের জন্ম দেন। এদের সর্বপ্রথম হলো, কাবীল ও তার বোন কালীমা আর সর্বশেষ হলো আবদুল মুগীছ ও তাঁর বোন উম্মুল মুগীছ। এরপর মানুষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং সংখ্যায় তারা অনেক হয়ে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বিস্তার লাভ করে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً.

অর্থাৎ— হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তার থেকে তার সংগিনী সৃষ্টি করেন এবং যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন । (৪ ঃ ১)

ঐতিহাসিকগণ বলেন, আদম (আ) তাঁর নিজের ঔরসজাত সন্তান এবং তাদের সন্তানদের সংখ্যা চার লক্ষে উপনীত হওয়ার পরই ইন্তিকাল করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهِ. فَلَمَّا اَثْقَلَتْ دَعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ. فَلَمَّا اٰتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيْمَا اٰتَاهُمَا. فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

অর্থাৎ— তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সংগিনী সৃষ্টি করেন, যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। তারপর যখন সে তার সাথে সংগত হয়, তখন সে এক লঘু গর্ভ ধারণ করে এবং তা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে; গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে— যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দাও, তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকবই। তারপর যখন তিনি তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন, তখন তারা তাদেরকে যা দান করা হয় সে সম্বন্ধে আল্লাহর শরীক করে, কিন্তু তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ্ তা অপেক্ষা অনেক উর্ধে। (৭ ঃ ১৮৯)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম আদম (আ)-এর কথা উল্লেখ করে পরে জিন তথা মানব জাতির আলোচনায় চলে গেছেন। এর দ্বারা আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে বুঝানো হয়নি বরং ব্যক্তি উল্লেখের দ্বারা মানব জাতিকে বুঝানোই আসল উদ্দেশ্য।

যেমন এক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِيْنٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ .

অর্থাৎ— আমি মানুষকে মৃত্তিকার উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে শুক্র বিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে। (২৩ ঃ ১২-১৩)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيَاطِيْنِ .

অর্থাৎ— আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাদেরকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ। (৬৭ ঃ ৫)

এখানে একথা সকলেরই জানা যে, শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ সত্যি সত্যি আকাশের নক্ষত্ররাজি নয়। আয়াতে নক্ষত্র শব্দ উল্লেখ করে নক্ষত্র শ্রেণী বুঝানো হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হাওয়ার সন্তান জন্মগ্রহণ করে বাঁচত না। একবার তাঁর একটি সন্তান জন্ম হলে ইবলীস তাঁর কাছে গমন করে বলল, তুমি এর নাম আবদুল হারিছ রেখে দাও, তবে সে বাঁচবে। হাওয়া তার নাম আবদুল হারিছ রেখে দিলে সে বেঁচে যায়। তা ছিল শয়তানের ইংগিত ও নির্দেশে।

ইমাম তিরমিযী, ইব্ন জারীর, ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন মারদুয়েহ (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আপন আপন তাফসীরে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর হাকিম বর্ণনা করেছেন তাঁর মুসতাদরাকে। এরা সকলেই আবদুস সামাদ ইব্ন আবদুল ওয়ারিছ-এর হাদীস থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাকিম বলেছেন, এর সনদ সহীহ। তবে বুখারী ও মুসলিম (র) তা বর্ণনা করেননি। আর তিরমিযী (র) বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব। উমর ইব্ন ইবরাহীম-এর হাদীস ব্যতীত অন্য কোনভাবে আমি এর সন্ধান পাইনি। কেউ কেউ আবদুস সামাদ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মারফূ সূত্রে নয়। এ সাহাবী পর্যন্ত মওকূফ সূত্রে বর্ণিত হওয়াই হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণ। এটিই যুক্তিসঙ্গত কথা। স্পষ্টতই বর্ণনাটি ইসরাঈলিয়াত থেকে সংগৃহীত। অনুরূপভাবে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেও মওকূফ রূপে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। স্পষ্টতই এটা কা'ব আহবার সূত্রে প্রাপ্ত হাসান বসরী (র) এ আয়াতগুলোর এর বিপরীত ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর নিকট যদি সামুরা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে হাদীসটি প্রমাণিত হতো, তাহলে তিনি ভিন্নমত পোষণ করতেন না। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

তাছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা আদম ও হাওয়া (আ)-কে এ জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তাঁরা মানব জাতির উৎসমূল হবেন এবং তাঁদের থেকে তিনি বহু নর-নারী বিস্তার করবেন। সুতরাং উপরোক্ত হাদীসে যা উল্লেখ করা হয়েছে যদি তা যথার্থ হয়ে থাকে, তাহলে হাওয়া (আ)-এর

সন্তানাদি না বাঁচার কী যুক্তি থাকতে পারে? নিশ্চিত হলো এই যে, একে মারফূ আখ্যা দেয়া ভুল। মওকূফ হওয়াই যথার্থ। আমি আমার তাফসীরের কিতাবে বিষয়টি আলোচনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

উল্লেখ যে, আদম ও হাওয়া (আ) অত্যন্ত মুত্তাকী ছিলেন। কেননা আদম (আ) হলেন মানব জাতির পিতা। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেন, তাঁর মধ্যে নিজের রূহ্ সঞ্চার করে তাঁর ফেরেশতাদেরকে তাঁর সম্মুখে সিজদাবনত করান, তাঁকে যাবতীয় বস্তুর নাম শিক্ষা দেন ও তাঁকে জান্নাতে বসবাস করতে দেন।

ইব্‌ন হিব্বান (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবূ যর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! নবীর সংখ্যা কত? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাঁদের মধ্যে রাসূলের সংখ্যা কত? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তিনশ তেরজনের বিরাট একদল। আমি বললাম, তাঁদের প্রথম কে ছিলেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ আদম (আ)। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি কি প্রেরিত নবী? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ। আল্লাহ তাঁকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেন। তারপর তাঁর মধ্যে তাঁর রূহ্ সঞ্চার করেন। তারপর তাঁকে নিজেই সুঠাম করেন।

তাবারানী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "শুনে রেখ, ফেরেশতাদের সেরা হলেন জিবরাঈল (আ)। নবীদের সেরা হলেন আদম (আ)। দিবসের সেরা হলো জুম্‌আর দিন, মাসের সেরা হলো রমযান, রাতের সেরা হলো লাইলাতুল কদর এবং নারীদের সেরা হলেন ইমরান তনয়া মারয়াম।"

এটি দুর্বল সনদ। কারণ, রাবী আবূ হুরমুয নাফি'কে ইব্‌ন মাঈন মিথ্যুক সাব্যস্ত করেছেন। আর আহমদ, আবূ যুর'আ, আবূ হাতিম, ইব্‌ন হিব্বান (র) প্রমুখ তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

কা'ব আল-আহবার বলেন, জান্নাতে কারো দাড়ি থাকবে না। কেবল আদম (আ)-এর নাভি পর্যন্ত দীর্ঘ কালো দাড়ি থাকবে। আর জান্নাতে কাউকে উপনাম ধরে ডাকা হবে না। শুধুমাত্র আদম (আ)-কেই উপনাম ধরে ডাকা হবে। দুনিয়াতে তাঁর উপনাম হলো আবুল বাশার আর জান্নাতে হবে আবূ মুহাম্মদ।

ইব্‌ন আদী জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, "আদম (আ) ব্যতীত সকল জান্নাতীকেই স্বনামে ডাকা হবে। আদম (আ)-কে ডাকা হবে আবূ মুহাম্মদ উপনামে।" ইব্‌ন আবূ আদী আলী (রা) ইব্‌ন আবূ তালিব-এর হাদীস থেকেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তা সর্বদিক থেকেই দুর্বল। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত মি'রাজ সংক্রান্ত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন নিম্ন আকাশে আদম (আ)-এর নিকট গমন করেন; তখন আদম (আ) তাঁকে বলেছিলেন, পুণ্যবান পুত্র ও পুণ্যবান নবীকে স্বাগতম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ডানে একদল এবং বামে একদল লোক দেখতে পান। আদম (আ) ডানদিকে দৃষ্টিপাত করে হেসে দেন ও বামদিকে দৃষ্টিপাত করে কেঁদে পেলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, জিবরাঈল

এসব কী? উত্তরে জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনি আদম এবং এরা তাঁর বংশধর। ডান দিকের লোকগুলো হলো জান্নাতী। তাই সেদিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি হেসে দেন আর বামদিকের লোকগুলো হলো জাহান্নামী। তাই ওদের দিকে দৃষ্টিপাত করে তিনি কেঁদে ফেলেন। আবুল বায্যার বর্ণনা করেন যে, হাসান (র) বলেন যে, আদম (আ)-এর জ্ঞান-বুদ্ধি তাঁর সমস্ত সন্তানের জ্ঞান-বুদ্ধির সমান ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) ঐ হাদীসে আরও বলেন ঃ তারপর আমি ইউসুফ (আ)-এর নিকট গমন করি। দেখতে পেলাম, তাকে অর্ধেক রূপ দেয়া হয়েছে। আলিমগণ এর অর্থ করতে গিয়ে বলেন, ইউসুফ (আ) আদম (আ)-এর রূপের অর্ধেকের অধিকারী ছিলেন। এ কথাটা যুক্তিসঙ্গত। কারণ, আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে নিজের পবিত্র হাতে সৃষ্টি করেছেন ও আকৃতি দান করেছেন এবং তাঁর মধ্যে নিজের রূহ্ সঞ্চার করেছেন। অতএব, এমন লোকটি অন্যদের তুলনায় অধিক সুন্দর হবেন এটাই স্বাভাবিক।

আমরা আব্দুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) এবং ইব্ন আমর (রা) থেকেও মওকূফ ও মারফূ রূপে বর্ণনা করেছি যে, আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাত সৃষ্টি করেন; তখন ফেরেশতাগণ বলেছিল যে, হে আমাদের রব! এটি আপনি আমাদেরকে দিয়ে দিন। কারণ, আদম (আ)-এর সন্তানদের জন্যে তো দুনিয়া-ই সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যাতে তারা সেখানে পানাহার করতে পারে। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ আমার সম্মান ও মহিমার শপথ! যাকে আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করলাম, তার সন্তানদেরকে আমি তাদের সমান করবো না— যাদেরকে আমি কুন (হও) বলতেই হয়ে গেছে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম ইত্যাদিতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেন।" এ হাদীসের ব্যাখ্যায় অনেকে অনেক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আদম (আ)-এর ওফাত ও আপন পুত্র শীছ (আ)-এর প্রতি তাঁর ওসীয়ত

শীছ অর্থ আল্লাহর দান। হাবীলের নিহত হওয়ার পর তিনি এ সন্তান লাভ করেছিলেন বলে আদম ও হাওয়া (আ) তার এ নাম রেখেছিলেন।

আবূ যর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা একশ' চারখানা সহীফা (পুস্তিকা) নাযিল করেন। তন্মধ্যে পঞ্চাশটি নাযিল করেন শীছ-এর উপর।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন, মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আদম (আ) তাঁর পুত্র শীছ (আ)-কে ওসীয়ত করেন, তাকে রাত ও দিবসের ক্ষণসমূহ এবং সেসব ক্ষণের ইবাদতসমূহ শিখিয়ে যান ও ভবিষ্যতে ঘটিতব্য তুফান সম্পর্কে অবহিত করে যান। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আজকের সকল আদম সন্তানের বংশধারা শীছ পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যায় এবং শীছ ব্যতীত আদম (আ)-এর অপর সব ক'টি বংশধারাই বিলুপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

কোন এক জুমু'আর দিনে আদম (আ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে ফেরেশতাগণ আল্লাহর পক্ষ হতে জান্নাত থেকে কিছু সুগন্ধি ও কাফন নিয়ে তাঁর নিকট আগমন করেন এবং তাঁর পুত্র এবং স্থলাভিষিক্ত শীছ (আ)-কে সান্ত্বনা দান করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, আর সাত দিন ও সাতরাত পর্যন্ত চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ লেগে থাকে।

ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে, য়াহয়া ইব্‌ন যামরা সাদী বলেন, মদীনায় আমি এক প্রবীণ ব্যক্তিকে কথা বলতে দেখতে পেয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে লোকেরা বলল, ইনি উবাই ইব্‌ন কা'ব। তখন তিনি বলছিলেন যে, "আদম (আ)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি তাঁর পুত্রদেরকে বললেন, আমার জান্নাতের ফল খেতে ইচ্ছে হয়। ফলে তাঁরা ফলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। পথে তাঁদের সঙ্গে কতিপয় ফেরেশতার সাক্ষাৎ ঘটে। তাদের সাথে আদম (আ)-এর কাফন, সুগন্ধি, কয়েকটি কুঠার, কোদাল ও থলে ছিল। ফেরেশতাগণ তাদেরকে বললেন, হে আদম-পুত্রগণ! তোমরা কী চাও এবং কী খুঁজছো? কিংবা বললেন, তোমরা কি উদ্দেশ্যে এবং কোথায় যাচ্ছো? উত্তরে তারা বললেন, আমাদের পিতা অসুস্থ। তিনি জান্নাতের ফল খাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। এ কথা শুনে ফেরেশতাগণ বললেন ঃ তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের পিতার ইন্তিকালের সময় ঘনিয়ে এসেছে। যা হোক, ফেরেশতাগণ আদম (আ)-এর নিকট আসলে হাওয়া (আ) তাদের চিনে ফেলেন এবং আদম (আ)-কে জড়িয়ে ধরেন। তখন আদম (আ) বললেন, আমাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি সরে যাও। কারণ তোমার আগেই আমার ডাক পড়ে গেছে। অতএব, আমি ও আমার মহান রব-এর ফেরেশতাগণের মধ্য থেকে তুমি সরে দাঁড়াও। তারপর ফেরেশতাগণ তাঁর জানকবয করে নিয়ে গোসল দেন, কাফন পরান, সুগন্ধি মাখিয়ে দেন এবং তার জন্য বগলী কবর খুঁড়ে জানাযার নামায আদায় করেন। তারপর তাঁকে কবরে রেখে দাফন করেন। তারপর তারা বললেন, হে আদমের সন্তানগণ! এ হলো তোমাদের দাফনের নিয়ম। এর সনদ সহীহ।

ইব্‌ন আসাকির (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ফেরেশতাগণ আদম (আ)-এর জানাযায় চারবার, আবূ বকর (রা) ফাতিমা (রা)-এর জানাযায় চারবার, উমর (রা) আবূ বকর (রা)-এর জানাযায় চারবার এবং সুহায়ব (রা)-র উমর (রা)-এর জানাযায় চারবার তাকবীর পাঠ করেন।[১] ইব্‌ন আসাকির বলেন, শায়বান ব্যতীত অন্যান্য রাবী মাইমূন সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেন।

আদম (আ)-কে কোথায় দাফন করা হয়েছে, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ মত হলো, তাঁকে সে পাহাড়ের নিকটে দাফন করা হয়েছে, যে পাহাড় থেকে তাঁকে ভারতবর্ষে নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, মক্কার আবূ কুবায়স পাহাড়ে তাঁকে দাফন করা হয়। কেউ কেউ বলেন, মহা প্লাবনের সময় হযরত নূহ (আ) আদম ও হাওয়া (আ)-এর লাশ একটি সিন্দুকে ভরে বায়তুল মুকাদ্দাসে দাফন করেন। ইব্‌ন জারীর এ তথ্য বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন আসাকির কারো কারো সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আদম (আ)-এর মাথা হলো মসজিদে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আর পা দু'খানা হলো বায়তুল মুকাদ্দাস-এর সাখরা নামক বিখ্যাত পাথর খণ্ডের নিকট। উল্লেখ্য যে, আদম (আ)-এর ওফাতের এক বছর পরই হাওয়া (আ)-এর মৃত্যু হয়।

---

১. হাদীসটি বিশুদ্ধ হয়ে থাকলে এটাকে রসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি ভবিষ্যদ্বাণী বলে বিবেচনা করতে হবে। - সম্পাদক

আদম (আ)-এর আয়ু কত ছিল এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, আদম (আ)-এর আয়ু লাওহে মাহফূজে এক হাজার বছর লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আদম (আ) ন'শ ত্রিশ বছর জীবন লাভ করেছিলেন বলে তাওরাতে যে তথ্য আছে, তার সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই। কারণ ইহুদীদের এ বক্তব্য আপত্তিকর এবং আমাদের হাতে যে সংরক্ষিত সঠিক তথ্য রয়েছে; তার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে তা প্রত্যাখ্যাত। তাছাড়া ইহুদীদের বক্তব্য ও হাদীসের তথ্যের মাঝে সমন্বয় সাধন করাও সম্ভব। কারণ তাওরাতের তথ্য যদি সংরক্ষিত হয়; তা হলে তা অবতরণের পর পৃথিবীতে অবস্থান করার মেয়াদের উপর প্রয়োগ হবে। আর তাহলো সৌর হিসাবে ন'শ ত্রিশ বছর আর চান্দ্র হিসাবে নয় শ' সাতান্ন বছর। এর সঙ্গে যোগ হবে ইব্ন জারীর-এর বর্ণনানুযায়ী অবতরণের পূর্বে জান্নাতে অবস্থানের মেয়াদকাল তেতাল্লিশ বছর। সর্বসাকুল্যে এক হাজার বছর।

'আতা খুরাসানী বলেন, আদম (আ)-এ ইন্তিকাল হলে গোটা সৃষ্টিজগত সাতদিন পর্যন্ত ক্রন্দন করে। ইব্ন আসাকির (র) এ তথ্য বর্ণনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শীছ (আ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি সে হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী নবী ছিলেন যা ইব্ন হিব্বান তাঁর সহীহ-এ আবূ যর (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, শীছ (আ)-এর উপর পঞ্চাশটি সহীফা নাযিল হয়। এরপর তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে তাঁর ওসীয়ত অনুসারে তাঁর পুত্র আনূশ, তারপর তাঁর পুত্র কীনন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তারপর তিনিও মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ছেলে মাহলাঈল দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। পারসিকদের ধারণা মতে, এ মাহলাঈল সপ্তরাজ্যের তথা গোটা পৃথিবীর রাজা ছিলেন। তিনি-ই সর্ব প্রথম গাছপালা কেটে শহর, নগর ও বড় বড় দুর্গ নির্মাণ করেন। বাবেল ও 'সূস আল-আকসা' নগরী তিনিই নির্মাণ করেন। তিনিই ইবলীস ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদেরকে পরাজিত করে তাদেরকে পৃথিবী সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ এবং বিভিন্ন পাহাড়ী উপত্যকায় তাড়িয়ে দেন। আর তিনিই একদল অবাধ্য জিন-ভূতকে হত্যা করেন। তাঁর একটি বড় মুকুট ছিল। তিনি লোকজনের উদ্দেশে বক্তৃতা প্রদান করতেন। তাঁর রাজত্ব চল্লিশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র য়ারদ তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এরপর তাঁরও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তিনি আপন পুত্র খানুখকে ওসীয়ত করে যান। প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী এ খানুখ-ই হলেন ইদরীস (আ)।

ইদ্‌রীস (আ)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا . وَّرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا .

অর্থাৎ—স্মরণ কর, এ কিতাবে উল্লেখিত ইদ্‌রীস-এর কথা। সে ছিল সত্যনিষ্ঠ, নবী এবং আমি তাকে উন্নীত করেছিলাম উচ্চ মর্যাদায়। (১৯ ঃ ৫৬)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইদ্‌রীস (আ)-এর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর নবী ও সিদ্দীক হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনিই হলেন, উপরে বর্ণিত খানুখ। বংশ বিশেষজ্ঞদের অনেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বংশ লতিকার অন্যতম স্তম্ভ। আদম (আ) ও শীছ (আ)-এর পরে তিনিই সর্বপ্রথম আদম সন্তান যাঁকে নবুওত দান করা হয়েছিল। ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ইনিই সর্বপ্রথম কলম দ্বারা লেখার সূচনা করেন। তিনি আদম (আ)-এর জীবন কালের তিনশত আশি বছর পেয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন, মু'আবিয়া ইব্‌ন হাকাম সুলামী-এর হাদীসে এ ইদরীস (আ)-এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, একজন নবী ছিলেন যিনি এ বিদ্যার সাহায্যে রেখা টানতেন। সুতরাং যার রেখা চিহ্ন তাঁর রেখা চিহ্নের অনুরূপ হবে তাঁরটা সঠিক। বেশকিছু তাফসীরকার মনে করেন যে, ইদ্‌রীস (আ)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তারা তাঁকে দুর্ধর্ষ সিংহকুলের জ্যোতিষী বলে অভিহিত করেন এবং তাদের বক্তব্যে অনেক অসত্য তথ্য তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছে যেমনটি অন্য অনেক নবী-রসূল, দার্শনিক, পণ্ডিতবর্গ ও ওলীর প্রতি আরোপ করা হয়েছিল।

আল্লাহর বাণী ঃ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا

(আর আমি তাকে সুউচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেছিলাম।) (১৯ ঃ ৫৭) প্রসঙ্গে সহীহ বুখারী ও মুসলিমে মি'রাজ সংক্রান্ত হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চতুর্থ আসমানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। ইব্‌ন জারীর (র) হিলাল ইব্‌ন য়াসাফ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবন আব্বাস (রা) আমার উপস্থিতিতে কা'ব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ইদ্‌রীস (আ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার উক্তি وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا -এর অর্থ কী? উত্তরে কা'ব (রা) বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা ইদ্‌রীস (আ)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করেন যে, প্রতিদিন আমি আদম সন্তানদের সমস্ত আমলের সমপরিমাণ প্রতিদান দেবো। সম্ভবত তাঁর সমকালীন মানব সন্তানদেরকেই বুঝানো হয়েছে। এতে তিনি তাঁর আমল আরো বৃদ্ধি করতে আগ্রহান্বিত হয়ে পড়েন। এরপর তাঁর এক ফেরেশতা বন্ধু তাঁর নিকট আগমন করলে তিনি তাঁকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি এরূপ এরূপ ওহী পাঠিয়েছেন। আপনি মালাকুল মউত-এর সঙ্গে কথা বলুন, যাতে আমি আরো বেশি আমল করতে পারি। ফলে সেই ফেরেশতা তাঁকে তার দু'ডানার মধ্যে বহন করে আকাশে নিয়ে যান। তিনি চতুর্থ আসমানে পৌঁছলে তাঁর সঙ্গে মালাকুল মউতের সাক্ষাত ঘটে। ফেরেশতা তাঁর সঙ্গে ইদ্‌রীস (আ)-এর বক্তব্য সম্পর্কে আলাপ করেন। মালাকুল মউত বললেন, ইদ্‌রীস (আ) কোথায়? জবাবে তিনি বললেন ঃ এই তো তিনি

আমার পিঠের উপর। মালাকুল মঊত বললেন, আশ্চর্য! চতুর্থ আকাশে ইদ্‌রীস (আ)-এর রূহ্ কবয করার আদেশ দিয়ে আমাকে প্রেরণ করা হলে আমি ভাবতে লাগলাম যে, কিভাবে আমি চতুর্থ আকাশে তাঁর রূহ্ কবয করব, অথচ তিনি পৃথিবীতে রয়েছেন। যা হোক, মালাকুল মঊত সেখানেই তাঁর রূহ্ কবয করেন।

আল্লাহ তা'আলার কালাম وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا-এর অর্থ এটাই। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এ আয়াতের তাফসীরে এ তথ্যটি বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, তখন ইদ্‌রীস (আ) সে ফেরেশতাকে বলেছিলেন যে, আপনি মালাকুল মঊতকে একটু জিজ্ঞাসা করুন, আমার আয়ু আর কতটুকু বাকি আছে? ফেরেশতা তাঁকে তা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি না দেখে বলতে পারব না। তারপর দেখে তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাচ্ছ, যার আয়ুর এক পলক ব্যতীত আর কোন সময় অবশিষ্ট নেই। তারপর ঐ ফেরেশতা তার ডানার নীচের দিকে ইদ্‌রীস (আ)-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করে দেখেন যে, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে অথচ তিনি তা টেরই পাননি। এ তথ্য ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে গৃহীত হয়েছে। এর কিছু কিছু অংশ মুনকার পর্যায়ের। وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا -এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আবূ নাজীহ মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইদ্‌রীস (আ)-কে তুলে নেয়া হয়েছে; তার মৃত্যু হয়নি, যেমন তুলে নেয়া হয়েছে হযরত ঈসা (আ)-কে। তার এ কথার অর্থ যদি এই হয় যে, তিনি এখন পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেননি, তা হলে এতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আর যদি তার অর্থ এই হয় যে, তাঁকে জীবিতাবস্থায় তুলে নেয়া হয়েছে, তারপর সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়--তাহলে কা'ব আহবারের পূর্ব বর্ণিত অভিমতের সঙ্গে এর কোন বিরোধ নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আওফী বলেন ঃ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا -এর ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ইদ্‌রীস (আ)-কে ষষ্ঠ আকাশে তুলে নেয়া হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। যাহ্হাক (র)-এর অভিমতও তাই। ইদ্‌রীস (আ)-এর চতুর্থ আকাশে থাকা সম্পর্কিত ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) বর্ণিত হাদীসটিই বিশুদ্ধতর। মুজাহিদ (র) প্রমুখের অভিমতও তাই। হাসান বসরী (র) বলেন, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا অর্থ তাকে আমি জান্নাতে তুলে নিয়েছি। অনেকের মতে, ইদ্‌রীস (আ)-কে তার পিতা য়ারদ ইব্‌ন মাহ্লাইল-এর জীবদ্দশাতেই তুলে নেয়া হয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। কারো কারো মতে, ইদ্‌রীস (আ) নূহ (আ)-এর পূর্বসূরি নন বরং তিনি বনী ইসরাঈলের আমলের লোক।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইব্‌ন মাসউদ ও ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বলা হয়ে থাকে যে, ইলিয়াস (আ) ও ইদ্‌রীস (আ) অভিন্ন ব্যক্তি। মি'রাজ সম্পর্কে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যুহরীর হাদীসের বক্তব্য দ্বারা তাঁরা এর প্রমাণ পেশ করেন যে, উক্ত হাদীসে আছে, নবী করীম (সা) যখন ইদ্‌রীস (আ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন, তখন তিনি বলেছিলেন, পুণ্যবান ভাই ও পুণবান নবীকে খোশ আমদেদ। আদম (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর ন্যায় এ কথা বলেননি যে, পুণ্যবান নবী ও পুণ্যবান পুত্রকে খোশ আমদেদ। তারা বলেন, ইদ্‌রীস (আ) যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বংশের ঊর্ধ্বতন পুরুষের অন্তর্ভুক্ত হতেন, তাহলে আদম (আ) ও ইবরাহীম (আ) যা বলেছিলেন, তিনিও তাই বলতেন। কিন্তু এতে তাদের দাবি সপ্রমাণিত হয় না। তাছাড়া বর্ণনাকারী হাদীসের বক্তব্য সুষ্ঠুভাবে মুখস্থ রাখতে না পারার সম্ভাবনাও রয়েছে। অথবা বিনয় স্বরূপ তিনি পিতৃত্বের পরিচয় না দিয়ে এরূপ বলেছেন, আদি পিতা আদম (আ) এবং আল্লাহর বন্ধু ও মুহাম্মদ (সা) ব্যতীত সর্বশ্রেষ্ঠ মহান নবী ইবরাহীম (আ)-এর মত নিজের পিতৃত্বের উল্লেখ করেননি।

নূহ (আ)-এর কাহিনী

তিনি হলেন নূহ ইব্‌ন লামাক ইব্‌ন মুতাওশশালিখ ইব্‌ন খানুখ। আর খানুখ হলেন ইদ্‌রীস ইব্‌ন য়ারদ ইব্‌ন মাহলাইল ইব্‌ন কীনন ইব্‌ন আনূশ ইব্‌ন শীছ ইব্‌ন আবুল বাশার আদম (আ)। ইব্‌ন জারীর প্রমুখের বর্ণনা মতে, আদম (আ)-এর ওফাতের একশ' ছাব্বিশ বছর পর তাঁর জন্ম। আহ্‌লি কিতাবদের প্রাচীন ইতিহাস মতে নূহ (আ)-এর জন্ম ও আদম (আ)-এর ওফাতের মধ্যে একশ' ছেচল্লিশ বছরের ব্যবধান ছিল। দু'জনের মধ্যে ছিল দশ করন (যুগ)-এর ব্যবধান। যেমন হাফিজ আবূ হাতিম ইব্‌ন হিব্বান (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবূ উমামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আদম (আ) কি নবী ছিলেন? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন হ্যাঁ, আল্লাহ তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তাঁর ও নূহ (আ)-এর মাঝে ব্যবধান ছিল কত কালের? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, দশ যুগের। বর্ণনাকারী বলেন, এ হাদীসটি মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। তবে তিনি তা রিওয়ায়াত করেননি। সহীহ বুখারীতে ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আদম (আ) ও নূহ (আ)-এর মাঝখানে ব্যবধান ছিল দশ যুগের। তাঁরা সকলেই ইসলামের অনুসারী ছিলেন।

এখন করন বা যুগ বলতে যদি একশ' বছর বুঝানো হয়—যেমনটি সাধারণ্যে প্রচলিত তাহলে তাঁদের মধ্যকার ব্যবধান ছিল নিশ্চিত এক হাজার বছর। কিন্তু এক হাজার বছরের বেশি হওয়ার কথাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। কেননা, ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাঁকে ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। আর তাদের দু'জনের মধ্যবর্তী সময়ে এমন কিছু যুগও অতিবাহিত হয়ে থাকবে, যখন লোকজন ইসলামের অনুসারী ছিল না। কিন্তু আবূ উমামার হাদীস দশ করন-এ সীমাবদ্ধ হওয়ার কথা প্রমাণ করে আর ইব্‌ন আব্বাস (রা) একটু বাড়িয়ে বলেছেন, 'তাঁরা সকলে ইসলামের অনুসারী ছিলেন।' এসব তথ্য আহলি কিতাবদের সে সব ঐতিহাসিক ও অন্যদের এ অনুমানকে বাতিল বলে প্রমাণ করে যে, কাবীল ও তার বংশধররা অগ্নিপূজা করতো। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আর যদি করন দ্বারা প্রজন্ম বুঝানো হয়ে থাকে ঃ যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ.

"নূহের পর আমি কত প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি।" (১৭ ঃ ১৭)

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوْنًا أٰخَرِيْنَ.

"তারপর তাদের পরে আমি বহু প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি।" (২৩ ঃ ৪২)

وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيْرًا.

তাদের অন্তবর্তীকালের বহু প্রজন্মকেও। (২৫ : ৩৮)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ.

"তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকে আমি বিনাশ করেছি।" (১৯ : ৭৪)

আবার যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, خير القرون قرني উত্তম প্রজন্ম আমার প্রজন্ম।

এ-ই যদি হয়, তাহলে নূহ (আ)-এর পূর্বে বহু প্রজন্ম দীর্ঘকাল যাবত বসবাস করেছিল। এ হিসাবে আদম (আ) ও নূহ (আ)-এর মধ্যে ব্যবধান দাঁড়ায় কয়েক হাজার বছরের। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মোটকথা, যখন মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজা শুরু হয় এবং মানুষ বিভ্রান্তি ও কুফরীতে নিমজ্জিত হতে শুরু করে, তখন মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে প্রেরণ করেন। অতএব, জগদ্বাসীর প্রতি প্রেরিত তিনিই সর্বপ্রথম রাসূল, যেমন কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে উপস্থিত লোকজন তাঁকে সম্বোধন করবে। আর ইব্ন জুবায়র (র) প্রমুখের বর্ণনা মতে নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়কে বনূ রাসিব বলা হতো।

নবুওত লাভের সময় নূহ (আ)-এর বয়স কত ছিল, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর। কেউ বলেন, তিনশ' পঞ্চাশ বছর। কারো কারো মতে, চারশ' আশি বছর। এ বর্ণনাটি ইব্ন জারীরের এবং তৃতীয় অভিমতটি ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বলে তিনি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে নূহ (আ)-এর কাহিনী তাঁর সম্প্রদায়ের যারা তাঁকে অস্বীকার করেছিল প্লাবন দ্বারা তাদের প্রতি অবতীর্ণ শাস্তির কথা এবং কিভাবে তাঁকে ও নৌকার অধিবাসীদেরকে মুক্তি দান করেছেন তার বিবরণ উল্লেখ করেছেন। সূরা আ'রাফ, ইউনুস, হুদ, আম্বিয়া, মু'মিনূন, শু'আরা, আনকাবুত, সাফ্ফাত ও সূরা কমরে এসবের আলোচনা রয়েছে। তাছাড়া এ বিষয়ে সূরা নূহ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরাও অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরা আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَّلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَلَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ.

অর্থাৎ—আমি তো নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট এবং সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের কোন ইলাহ নেই। আমি

তোমাদের জন্য মহাদিবসের শাস্তির আশংকা করছি। তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল, আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি।

সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নেই। আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাচ্ছি ও তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি এবং তোমরা যা জান না আমি তা আল্লাহর নিকট হতে জানি।

তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে তোমরা সাবধান হও এবং তোমরা অনুকম্পা লাভ কর।

তারপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে। তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করি এবং যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে ডুবিয়ে দেই। তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়। (৭ ঃ ৫৯-৬৪)

সূরা ইউনুসে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ . فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ . إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ .

অর্থাৎ—তাদেরকে তুমি নূহ-এর বৃত্তান্ত শোনাও। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর নিদর্শন দ্বারা আমার উপদেশ দান তোমাদের নিকট যদি দুঃসহ হয় তবে আমি তো আল্লাহর উপর নির্ভর করি, তোমরা যাদেরকে শরীক করেছ সেগুলোর সঙ্গে তোমাদের কর্তব্য স্থির করে নাও, পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাদের কর্ম নিষ্পন্ন করে ফেল এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

তারপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে নিতে পার, তোমাদের নিকট আমি তো কোন পারিশ্রমিক চাইনি, আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহর নিকট। আমি তো আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে আদিষ্ট হয়েছি।

আর তারা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে—তারপর তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করি ও যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করি। সুতরাং দেখ যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছে? (১০ ঃ ৭১-৭৩)

সূরা হূদ-এ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ اِنِّىْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ. اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ. اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ. فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَانَرَاكَ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِىَ الرَّاْىِ. وَمَا نَرٰي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِيْنَ. قَالَ يَاقَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتَانِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ. اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ.

وَيٰقَوْمِ لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا. اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا. اِنَّهُمْ مُلَاقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ. وَيٰقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ. اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ. وَلَا اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلَا اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا. اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ اَنْفُسِهِمْ اِنِّىْ اِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِيْنَ. قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ.

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِيْ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُّغْوِيَكُمْ. هُوَ رَبُّكُمْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ. اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ. قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَعَلَىَّ اِجْرَامِىْ وَاَنَا بَرِئٌ مِّمَّا تُجْرِمُوْنَ. وَاُوْحِىَ اِلٰى نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ.

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا. اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ. قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ. فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ. حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ. قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ

الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ وَمَا اٰمَنَ مَعَهُ اِلاَّ قَلِيْلٌ.

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسٰهَا. اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادٰى نُوْحُ نِ ابْنَهُ وَكَانَ فِىْ مَعْزِلٍ يّٰبُنَىَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَّعَ الْكٰفِرِيْنَ. قَالَ سَاٰوِىْ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلاَّ مَنْ رَّحِمَ. وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ. وَقِيْلَ يٰاَرْضُ ابْلَعِىْ مَاءَكِ وَيٰسَمَاءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِىِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ. قَالَ يٰنُوْحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اِنِّىْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ. قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهِ عِلْمٌ وَاِلاَّ تَغْفِرْلِىْ وَتَرْحَمْنِىْ اَكُنْ مِّنَ الْخَاسِرِيْنَ.

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ. وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ. تِلْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا. فَاصْبِرْ. اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ.

অর্থাৎ—আমি তো নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, আমি তোমাদের জন্য প্রকাশ্য সতর্ককারী। যাতে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত না কর; আমি তোমাদের জন্য এক মর্মন্তুদ শাস্তির আশংকা করি।

তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা যারা ছিল কাফির—বলল, আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই মানুষ দেখছি। অনুধাবন না করে তোমার অনুসরণ করছে তারাই, যারা আমাদের মধ্যে অধম এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাচ্ছি না, বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন,

অথচ এ বিষয়ে তোমরা জ্ঞানান্ধ হও, আমি কি এ বিষয়ে তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি, যখন তোমরা এটা অপছন্দ কর?

হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ যাঞ্চা করি না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহরই নিকট এবং মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়, তারা নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদের তাড়িয়ে দেই তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা চিন্তা করবে না?

আমি তোমাদেরকে বলি না, আমার নিকট আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার আছে, আর না অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত এবং আমি এও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। তোমাদের দৃষ্টিতে যারা হেয় তাদের সম্বন্ধে আমি বলি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কখনো মঙ্গল দান করবেন না, তাদের অন্তরে যা আছে, তা আল্লাহ সম্যক অবগত। তাহলে আমি অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব।

তারা বলল, হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে বচসা করেছ—তুমি আমাদের সাথে অতিমাত্রায় বচসা করছ। তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে আস। সে বলল, ইচ্ছা করলে আল্লাহই তা তোমাদের নিকট উপস্থিত করবেন এবং তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না।

আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে।

তারা কি বলে যে, সে তা রচনা করেছে? বল, আমি যদি তা রচনা করে থাকি তবে আমিই আমার অপরাধের জন্য দায়ী হব। তোমরা যে অপরাধ করছ তার জন্য আমি দায়ী নই।

নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল, যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার সম্প্রদায়ের অন্য কেউ কখনো ঈমান আনবে না। সুতরাং তারা যা করে সে জন্যে তুমি ক্ষোভ করো না।

তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর এবং যারা সীমালংঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না, তারা তো নিমজ্জিত হবে।

সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল এবং যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা তার নিকট দিয়ে যেত, তাকে উপহাস করত; সে বলত, তোমরা যদি আমাকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ। এবং তোমরা অচিরেই জানতে পারবে, কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।

অবশেষে যখন আমার আদেশ আসল এবং উনুন উথলে উঠল, আমি বললাম ঃ এতে উঠিয়ে নাও প্রত্যেক শ্রেণীর যুগল, যাদের বিরুদ্ধে পূর্ব-সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে। তার সঙ্গে ঈমান এনেছিল গুটি কতেক লোক।

সে বলল, এতে আরোহণ কর, আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি। আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

পর্বত-প্রমাণ ঢেউয়ের মধ্যে তা তাদের নিয়ে বয়ে চলল, নূহ তার পুত্র যে তাদের থেকে পৃথক ছিল, তাকে আহ্বান করে বলল, হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং কাফিরদের সঙ্গী হয়ো না।

সে বলল, আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নিব যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে। সে বলল, আজ আল্লাহর বিধান থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, যাকে আল্লাহ দয়া করবেন সে ব্যতীত। তারপর ঢেউ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

এরপর বলা হলো, হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে লও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। তারপর বন্যা প্রশমিত হলো এবং কার্য সমাপ্ত হলো, নৌকা জূদী পর্বতের উপর স্থিত হলো এবং বলা হলো জালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হোক।

নূহ তার প্রতিপালককে সম্বোধন করে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত এবং আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক।

তিনি বললেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়। সে অসৎ কর্মপরায়ণ। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করো না। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও।

সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে যাতে আপনাকে অনুরোধ না করি এ জন্য আমি আপনার শরণ নিচ্ছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা না করেন এবং আমাকে দয়া না করেন তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব।

বলা হলো, হে নূহ! অবতরণ কর আমার দেয়া শান্তিসহ এবং তোমার প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের প্রতি কল্যাণসহ। অপর সম্প্রদায় সমূহকে জীবন উপভোগ করতে দেব, পরে আমার পক্ষ থেকে মর্মন্তুদ শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে।

এ সমস্ত অদৃশ্য লোকের সংবাদ আমি তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করছি, যা এর আগে তুমি জানতে না এবং তোমার সম্প্রদায়ও জানত না। সুতরাং ধৈর্যধারণ কর, শুভ পরিণাম মুত্তাকীদেরই জন্য। (১১ ঃ ২৫-৪৯)

সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ.

অর্থাৎ—স্মরণ কর নূহকে, পূর্বে সে যখন আহ্বান করেছিল, তখন আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পরিজন বর্গকে মহান সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম, এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এ জন্য আমি তাদের সকলকেই নিমজ্জিত করেছিলাম। (২১ ঃ ৭৬-৭৭)

সূরা মুমিনূনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ. أَفَلَا تَتَّقُونَ. فَقَالَ الْمَلَؤُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ.

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا. إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ.

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَقُلْ رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ وَّإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ.

অর্থাৎ—আমি তো নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের নিকট। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?

তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ—যারা কুফরী করেছিল তারা বলল, এতো তোমাদের মত একজন মানুষই তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চাচ্ছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরেশতাই পাঠাতেন, আমরা তো আমাদের পূর্ব-পুরুষদের কালে এরূপ ঘটেছিল এমন কথা শুনিনি। এতো এমন লোক, একে উন্মত্ততা পেয়ে বসেছে। সুতরাং এর সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর।

নূহ বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করছে। তারপর আমি তার প্রতি ওহী নাযিল করলাম, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর, তারপর যখন আমার আদেশ আসবে ও উনুন উথলে উঠবে, তখন উঠিয়ে নিও প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে তাদের ব্যতীত। জালিমদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না, তারা তো নিমজ্জিত হবে।

যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করবে তখন বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন জালিম সম্প্রদায় থেকে।

আরো বলিও, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যা হবে কল্যাণকর; আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আমি তো তাদেরকে পরীক্ষা করেছিলাম। (২৩ ঃ ২৩-২৯)

সূরা শু'আরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ.

قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ. قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ.

قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ. قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ. فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.

অর্থাৎ—নূহের সম্প্রদায় রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল! অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটই আছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।

তারা বলল, আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ ইতরজনরা তোমার অনুসরণ করছে?

নূহ বলল, তারা কী করত তা আমার জানা নেই। তাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ, যদি তোমরা বুঝতে। মু'মিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়। আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। তারা বলল, হে নূহ! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও তবে নিশ্চয় তুমি প্রস্তরাঘাতে নিহতদের শামিল হবে।

নূহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অস্বীকার করছে। সুতরাং আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সাথে যে সব মু'মিন আছে তাদেরকে রক্ষা কর।

তারপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম বোঝাই নৌযানে। তারপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করলাম। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয় এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (২৬ ঃ ১০৬-১২২)

সূরা আনকাবূতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ.

অর্থাৎ—আমি তো নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল পঞ্চাশ বাদ এক হাজার বছর। তারপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে; কারণ তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী। তারপর আমি তাকে এবং যারা নৌযানে আরোহণ করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন। (২৯ ঃ ১৪-১৫)

সূরা সাফ্‌ফাতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ.

অর্থাৎ—নূহ আমাকে আহ্বান করেছিল, আর আমি কত উত্তম সাড়া দানকারী। তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহা সংকট থেকে এবং তার বংশধরদেরকে আমি বংশ পরম্পরায় বিদ্যমান রেখেছি। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবেই আমি সৎকর্ম পরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। সে ছিল আমার মু'মিন বান্দাদের অন্যতম। তারপর অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করেছিলাম। (৩৭ ঃ ৭৫-৮২)

সূরা কামারে আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ. وَلَقَدْ تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ.

অর্থাৎ—এদের আগে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যা আরোপ করেছিল। মিথ্যা আরোপ করেছিল আমার বান্দার প্রতি এবং বলেছিল, এতো এক পাগল। আর তাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল। তখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, আমি তো অসহায়, অতএব তুমি

প্রতিবিধান কর। ফলে আমি আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম প্রবল বারি বর্ষণে এবং মাটি হতে উৎসারিত করলাম প্রস্রবণ; তারপর সকল পানি মিলিত হলো এক পরিকল্পনা অনুসারে।

তখন আমি নূহকে আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেক নির্মিত এক নৌযানে, যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে; এটা পুরস্কার তার জন্য যে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আমি একে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য? (৫৪ : ৯-১৭)

সূরা নূহ-এ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلٰى قَوْمِهٖ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ . قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ. أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَأَطِيْعُوْنِ. يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى. إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

قَالَ رَبِّ إِنِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَّنَهَارًا. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِيْ إِلَّا فِرَارًا. وَإِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا أَصَابِعَهُمْ فِيْ أٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. ثُمَّ إِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. ثُمَّ إِنِّيْ أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ. إِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا.

يُّرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا. مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا. وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. وَاللّٰهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا . وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. لِتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا.

قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗ إِلَّا خَسَارًا. وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا. وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ أٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا. وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا. وَقَدْ أَضَلُّوْا كَثِيْرًا. وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ إِلَّا ضَلٰلًا. مِمَّا خَطِيْـٰٓـَٔاتِهِمْ أُغْرِقُوْا فَأُدْخِلُوْا نَارًا. فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْصَارًا.

وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا. إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِيْنَ إِلَّا تَبَارًا.

অর্থাৎ—নূহকে আমি প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি এ নির্দেশ দিয়ে—তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের প্রতি শাস্তি আসার পূর্বে।

সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী এ বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর; তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দেবেন এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। নিশ্চয় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না, যদি তোমরা তা জানতে।

সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবা-রাত্রি আহ্বান করেছি, কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে। আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করি যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তারা কানে আঙ্গুল দেয়, বস্ত্রাবৃত করে নিজেদেরকে ও জিদ করতে থাকে এবং অতিমাত্রায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। তারপর আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি প্রকাশ্যে, পরে আমি সোচ্চার প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে।

আমি বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন এবং তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।

তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না। অথচ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে। তোমরা কি লক্ষ্য করনি? আল্লাহ কিভাবে সাত স্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে চাঁদকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে।

তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে উদ্ভূত করেছেন তারপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত পথে।

নূহ বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি।

তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল এবং বলেছিল, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেব-দেবীকে, পরিত্যাগ করো না ওয়াদ, সূওয়া, য়াগূছ, য়াউক ও নাস্‌রকে। তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং জালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।

তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে প্রবিষ্ট করা হয়েছিল আগুনে, পরে তারা কাউকেও আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি।

নূহ আরো বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য থেকে কোন ঘরের লোককে অব্যাহতি দিও না। তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতকারী ও কাফির।

হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যারা মুমিন হয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর। (৭১ ঃ ১-২৮)

তাফসীরে আমরা এর প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছি। পরে আমরা এ বিক্ষিপ্ত তথ্যাবলী একত্র করে এবং হাদীস ও রিওয়ায়াতসমূহের আলোকে কাহিনীর মূল বিষয়-বস্তু একত্রে উল্লেখ করব। এ ছাড়া কুরআনের আরো বিভিন্ন স্থানে নূহ (আ)-এর আলোচনা এসেছে যাতে তাঁর প্রশংসা এবং তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

যেমন সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.

অর্থাৎ—তোমার নিকট আমি ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরগণ, ঈসা, আয়্যুব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের নিকট ওহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে যাবূর দিয়েছিলাম।

অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি এবং মূসার সঙ্গে আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছিলেন। সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণ আসার পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৫ ঃ ১৬৩-১৬৫)

সূরা আন'আমে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. كُلًّا هَدَيْنَا. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ.

وَكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ. وَإِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

অর্থাৎ—এবং এটা আমার যুক্তি-প্রমাণ যা ইবরাহীমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়; যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নীত করি; তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী।

এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব ও এদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম; পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আয়্যুব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও; আর এভাবেই আমি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি।

এবং যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম, এরা সকলেই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। আরো সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাঈল, আল-য়াসা'আ, ইউনুস ও লূতকে এবং প্রত্যেককে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্ব জগতের উপর এবং এদের পিতৃ-পুরুষ, বংশধর, এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে; তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। (৬ ঃ ৮৩-৮৭)

সূরা তাওবায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيْمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ. أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ.

অর্থাৎ—তাদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ ও ছামূদের সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদয়ান ও বিধ্বস্ত জনপদসমূহের অধিবাসীদের সংবাদ কি তাদের কাছে আসেনি? তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রসূলগণ এসেছিল। আল্লাহ এমন নন যে, তাদের উপর জুলুম করেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করে। (৯ ঃ ৭০)

সূরা ইবরাহীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ. وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ. لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللّٰهُ. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوْا أَيْدِيَهُمْ إِلٰى أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوْا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهٖ وَإِنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَا إِلَيْهِ مُرِيْبٍ.

অর্থাৎ—তোমাদের নিকট কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের, নূহের সম্প্রদায়ের, 'আদের ও ছামূদের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের ? তাদের বিষয় আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল এসেছিল, তারা তাদের হাত তাদের মুখে স্থাপন করত এবং বলত, যাসহ তোমরা প্রেরিত হয়েছ তা আমরা প্রত্যাখ্যান করি এবং আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে বিষয়ে, যার প্রতি তোমরা আমাদেরকে আহবান করছ। (১৪ ঃ ৯)

সূরা ইসরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ. إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا.

হে ঐ সব লোকের বংশধরগণ! যাদেরকে আমি নূহের সঙ্গে আরোহণ করিয়েছিলাম, সে তো ছিল পরম কৃতজ্ঞ বান্দা। (১৭ ঃ ৩)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ بَعْدِ نُوْحٍ وَكَفٰى بِرَبِّكَ بِذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا.

অর্থাৎ—নূহের পর আমি কত মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। তোমার প্রতিপালকই তার বান্দাদের পাপাচরণের সংবাদ রাখা ও পর্যবেক্ষণের জন্য যথেষ্ট। (১৭ ঃ ১৭)

সূরা আম্বিয়া, মুমিনূন, শু'আরা ও আনকাবূতে তাঁর ঘটনা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

সূরা আহযাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا.

অর্থাৎ—স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার কাছ থেকেও এবং নূহ, ইবরাহীম , মূসা, মারয়ামের পুত্র ঈসার কাছ থেকে। তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার। (৩৩ ঃ ৭)

সূরা সাদে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ . وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحَابُ لْئَيْكَةِ. اُولٰئِكَ الْاَحْزَابُ. اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ.

অর্থাৎ—এদের পূর্বেও রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল নূহের সম্প্রদায়, আদ ও বহু শিবিরের অধিপতি ফিরআউন। ছামূদ, লূত ও আয়কার অধিবাসী, তারা ছিল এক একটি বিশাল বাহিনী। এদের প্রত্যেকেই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিল। ফলে তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি হয়েছে বাস্তব। (৩৮ ঃ ১২-১৪)

সূরা গাফির তথা সূরা মুমিনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجَادَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّهُمْ اَصْحَابُ النَّارِ.

অর্থাৎ—এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অন্যান্য দলও মিথ্যা আরোপ করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে পাকড়াও করার অভিসন্ধি করেছিল এবং তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য। ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম এবং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি! এভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে সত্য হলো তোমার প্রতিপালকের বাণী—এরা জাহান্নামী। (৪০ ঃ ৫-৬)

সূরা শূরায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ. كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ اَللّٰهُ. يَجْتَبِىْ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ.

অর্থাৎ—তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা ওহী করেছি আমি তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি করো না। তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহবান করছ তা তাদের নিকট দুর্বল মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তার অভিমুখী তাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন। (৪২ ঃ ১৩)

সূরা কাফে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ. وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ. وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ. كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدٌ.

অর্থাৎ—এদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল নূহের সম্প্রদায়, রাস্‌স ও ছামূদ সম্প্রদায়, আদ, ফিরআউন ও লূত সম্প্রদায় এবং আয়কার অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়, তারা সকলেই রাসূলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিল। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হয়। (৫০ ঃ ১২-১৪)

সূরা যারিয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ

অর্থাৎ—আমি ধ্বংস করেছিলাম এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (৫১ ঃ ৪৬)

সূরা নাজমে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى

অর্থাৎ—আর এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও (আমি ধ্বংস করেছিলাম) তারা ছিল অতিশয় জালিম, অবাধ্য। (৫৩ ঃ ৫২) সূরা কামারে (৫০) তাঁর ঘটনা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

সূরা হাদীদে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ. وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُوْنَ.

অর্থাৎ—আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং আমি তাদের বংশধরগণের জন্য স্থির করেছিলাম নবুওত ও কিতাব কিন্তু তাদের অল্প কিছু লোক সৎপথ অবলম্বন করেছিল এবং অধিকাংশই ছিল সত্যত্যাগী। (৫৭ ঃ ২৬)

সূরা তাহরীমে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ. كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ.

অর্থাৎ—আল্লাহ কাফিরদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছেন, তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল; ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হলো, জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সঙ্গে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর। (৬৬ ঃ ১০)

কুরআন, হাদীস ও বিভিন্ন রিওয়ায়াতের তথ্য মোতাবেক আপন সম্প্রদায়ের সঙ্গে নূহ (আ)-এর যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল তার সারমর্ম উল্লেখ প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক বর্ণিত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর হাদীসে পূর্বেই আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, আদম (আ) ও নূহ (আ)-এর মধ্যে ব্যবধান ছিল দশ করন। তাঁরা সকলেই ইসলামের অনুসারী ছিলেন। আর আমরা এও উল্লেখ করেছি যে, করন বলতে হয় তো প্রজন্ম কিংবা যুগ বুঝানো হয়েছে। তারপর এ সৎকর্মশীলদের করনসমূহের পর এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়; যার ফলে সে যুগের অধিবাসীরা মূর্তিপূজার দিকে ঝুঁকে পড়ে। وَقَالُوْا لَاتَذَرُنَّ الخ-এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী তাঁর করন ছিল এই যে, (ওয়াদ, সূওয়া, য়াগূছ ইত্যাদি) এসব হলো নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের কয়েকজন পুণ্যবান ব্যক্তির নাম। এদের মৃত্যুর পর শয়তান তাদের সম্প্রদায়ের প্রতি মন্ত্রণা দেয় যে, এঁরা যে সব স্থানে বসতেন তোমরা সে সব স্থানে কিছু মূর্তি নির্মাণ করে তাদের নামে সে সবের নামকরণ করে দাও। তখন তারা তাই করে। কিন্তু তখনও এগুলোর পূজা শুরু হয়নি। তারপর যখন তাদের মৃত্যু হয় এবং ইল্ম লোপ পায় তখন থেকে এ সবের পূজা শুরু হয়। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়ের এ দেব-দেবীগুলো পরে আরবেও প্রচলিত হয়ে পড়ে। ইকরিমা, যাহ্হাক, কাতাদা এবং মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)-ও অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। ইব্ন জারীর (র) আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে মুহাম্মদ ইব্ন কায়স (র)-এর বরাতে বলেন, তারা ছিলেন আদম (আ) ও নূহ (আ)-এর মধ্যবর্তী কালের পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ। তাদের

বেশ কিছু অনুসারী ছিল। তারপর যখন তাদের মৃত্যু হয়, তখন তাদের অনুসারীরা বলল, আমরা যদি এঁদের প্রতিকৃতি তৈরী করে রাখি, তাহলে তাঁদের কথা স্মরণ করে ইবাদতে আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। তখন তারা তাদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করে রাখে। তারপর যখন তাদের মৃত্যু হয় এবং অন্য প্রজন্ম আসে; তখন শয়তান তাদের প্রতি এ বলে প্ররোচণা দেয় যে, লোকজন তাঁদের উপাসনা করত এবং তাঁদের ওসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত। তখন তারা তাঁদের পূজা শুরু করে দেয়। ইব্ন আবূ হাতিম উরওয়া ইব্ন যুবায়র সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উরওয়া ইব্ন যুবায়র বলেন, ওয়াদ য়াগূছ, য়াঊক, সূওয়া ও নাসর আদম (আ)-এর সন্তান। ওয়াদ ছিলেন এদের বয়সে সকলের চাইতে প্রবীণ এবং সর্বাধিক পুণ্যবান ব্যক্তি।

ইব্ন আবূ হাতিম বর্ণনা করেন যে, আবুল মুতাহ্যার বলেন, একদা আবূ জাফর আল বাকির সালাতরত অবস্থায় ছিলেন। তখন লোকজন য়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের কথা আলোচনা করছিল। সালাত শেষে তিনি বললেন, তোমরা য়াযীদ ইব্ন মুহাল্লাবের কথা বলছ। সে এমন স্থানে নিহত হয়, যেখানে সর্বপ্রথম গায়রুল্লাহর পূজা হয়েছিল। আবুল মুতাহ্যার বলেন, তারপর তিনি ওয়াদ সম্পর্কে বলেন, তিনি একজন পুণ্যবান এবং জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। মৃত্যুর পর বাবেলে জনতা তাঁর কবরের চতুর্পার্শ্বে সমবেত হয়ে শোক প্রকাশ করতে শুরু করে। ইবলীস তা দেখে মানুষের রূপ ধরে তাদের কাছে এসে বলল, এ ব্যক্তির জন্য তোমাদের হা-হুঁতাশ আমি লক্ষ্য করছি। আমি কি তোমাদের জন্য তাঁর অনুরূপ প্রতিকৃতি তৈরি করে দেব? তা তোমাদের মজলিসে থাকবে আর তোমরা তাঁকে স্মরণ করবে। তারা বলল, হ্যাঁ, দিন। ইবলীস তাদেরকে তার অনুরূপ প্রতিকৃতি তৈরি করে দিল। বর্ণনাকারী বলেন, আর তারা তা তাদের মজলিসে স্থাপন করে তাকে স্মরণ করতে শুরু করে। ইবলীস তাদেরকে তাঁকে স্মরণ করতে দেখে এবার বলল, আচ্ছা, আমি তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে এর একটি করে মূর্তি স্থাপন করে দেই? তাহলে নিজের ঘরে বসেই তোমরা তাঁকে স্মরণ করতে পারবে। তারা বলল, হ্যাঁ, দিন! বর্ণনাকারী বলেন, তখন ইবলীস প্রত্যেক গৃহবাসীর জন্য তাঁর একটি করে মূর্তি নির্মাণ করে দেয় আর তারা তা দেখে দেখে তাঁকে স্মরণ করতে শুরু করে। বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাঁকে দেবতা সাব্যস্ত করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁকে পূজা করতে শুরু করে। এ ওয়াদই সেই দেবতা; আল্লাহর পরিবর্তে সর্বপ্রথম যার পূজা করা হয়।

উপরোক্ত বক্তব্য প্রমাণ করে যে, এর প্রতিটি মূর্তিকেই কোন না কোন মানব গোষ্ঠী পূজা করেছিল। তাছাড়া বর্ণিত আছে যে, কালক্রমে তারা সে প্রতিকৃতিগুলোকে দেহবিশিষ্ট মূর্তিতে পরিণত করে। তারপর আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরই উপাসনা শুরু হয়ে যায়। এসবের উপাসনার অসংখ্য পদ্ধতি ছিল। তাফসীরের কিতাবে যথাস্থানে আমরা তা উল্লেখ করেছি। সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে যে, উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে তাদের হাবশায় দেখে আসা 'মারিয়া' নামক গির্জা এবং তার রূপ-সৌন্দর্য ও তাতে স্থাপন করে রাখা প্রতিকৃতির কথা উল্লেখ করলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ "তাদের নিয়ম ছিল তাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ কেউ মারা গেলে তাঁর কবরের উপর তারা একটি উপাসনালয় নির্মাণ করত। তারপর তাতে তাঁর প্রতিকৃতি স্থাপন করে রাখত। আল্লাহর নিকট তারা সৃষ্টির সব চাইতে নিকৃষ্ট জাতি।"

মোটকথা, বিকৃতি যখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে মূর্তিপূজার ব্যাপক প্রসার ঘটে তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও রসূল নূহ (আ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি এক লা-শরীক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবান জানান এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের উপাসনা করতে নিষেধ করেন। এ নূহ (আ)-ই সর্বপ্রথম রাসূল যাঁকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীর কাছে প্রেরণ করেন। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে নবী করীম (সা) থেকে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত শাফা'আতের হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "তারা আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, হে আদম! আপনি মানব জাতির পিতা। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, আপনার মধ্যে তাঁর রূহ সঞ্চার করেছেন, তাঁর আদেশে ফেরেশতারা আপনাকে সিজদা করে এবং তিনি আপনাকে জান্নাতে বসবাস করতে দেন। আপনার রবের কাছে আপনি আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করবেন কি? আমাদের অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছেন। তখন আদম (আ) বলবেন, আমার প্রতিপালক এত বেশি রাগান্বিত হয়েছেন যে, এত বেশি রাগান্বিত তিনি কখনো হননি এবং পরেও কখনো হবেন না। তিনি আমাকে বৃক্ষের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু আমি তা অমান্য করি। নাফসী! নাফসী! তোমরা অন্য কারো কাছে যাও, তোমরা নূহের কাছে যাও। তখন তাঁরা নূহ (আ)-এর নিকট গিয়ে বলবে, হে নূহ! আপনি পৃথিবীবাসীর কাছে প্রেরিত প্রথম রাসূল এবং আল্লাহ আপনাকে 'কৃতজ্ঞ বান্দা' আখ্যা দিয়েছেন। আমরা কী অবস্থায় এবং কেমন বিপদে আছি তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না? আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করবেন কি? তখন তিনি বলবেন, আমার রব আজ এত বেশি রাগান্বিত হয়েছেন যে, এত রাগ ইতিপূর্বে তিনি কখনো করেননি এবং পরেও করবেন না। নাফসী! নাফসী! বর্ণনাকারী এভাবে হাদীসটি সবিস্তারে বর্ণনা করেন যেমনটি ইমাম বুখারী (র) নূহ (আ)-এর কাহিনীতে তা উল্লেখ করেছেন।

যা হোক, আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে প্রেরণ করলে তিনি সম্প্রদায়-কে একমাত্র লা-শরীক আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাঁর সঙ্গে কোন প্রতিকৃতি, মূর্তি ও তাগূতের ইবাদত না করার এবং তাঁর একত্ব স্বীকার করে নেয়ার আহ্বান জানান এবং ঘোষণা দেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, কোন রব নেই। যেমন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরবর্তী সকল নবী-রাসূলকে এ আদেশ দান করেন, যারা সকলেই তাঁরই বংশধর ছিলেন। যেমন আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ "আর তার বংশধরদেরকেই আমি বংশ পরম্পরায় বিদ্যমান রেখেছি।" (৩৭ ঃ ৭৭) হযরত নূহ (আ) ও ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ.

"এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যে আমি নবুওত ও কিতাব রেখেছি।" (৫৭ ঃ ২৬) অর্থাৎ নূহ (আ)-এর পরে যত নবী এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁর বংশধর ছিলেন। এমনকি ইবরাহীম (আ)-ও।

সূরা নাহ্‌লে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

অর্থাৎ—আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (১৬ ঃ ৩৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَسْئَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ.

অর্থাৎ—তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য সাব্যস্ত করেছিলাম, যাদের ইবাদত করা যায়? (৪৩ ঃ ৪৫)

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

অর্থাৎ—আমি তোমার পূর্বে এমন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এ ওহী ব্যতীত যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। (২১ ঃ ২৫)

এ কারণেই নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন ঃ

اُعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ. اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

অর্থাৎ—(হে আমার সম্প্রদায়!) তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। আমি তোমাদের জন্য এক মহা দিনের শাস্তির আশংকা করছি। (৭ ঃ ৫৯)

সূরা হূদে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيْمٍ.

অর্থাৎ—তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত কর না। আমি তোমাদের জন্য এক মর্মান্তিক দিনের শাস্তির আশংকা করছি। (১১ ঃ ২৬)

তিনি আরো বলেন ঃ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ. اَفَلَا تَتَّقُوْنَ.

অর্থাৎ—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তোমরা কি সাবধান হবে না? (৭ ঃ ৬৫)

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা একথা জানিয়ে দেন যে, নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর প্রতি দাওয়াতের যত পদ্ধতি আছে তার সবই প্রয়োগ করেছেন। রাতে-দিনে, গোপনে-প্রকাশ্যে কখনো উৎসাহ দিয়ে, কখনো বা ভয় দেখিয়ে। কিন্তু এর কোনটিই তাদের মধ্যে কার্যকর ফল বয়ে আনতে পারেনি বরং তাদের অধিকাংশই গোমরাহী, সীমালঙ্ঘন এবং মূর্তিপূজায় অটল থাকে এবং সর্বক্ষণ তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে থাকে। তাঁকে ও তাঁর ঈমানদার সঙ্গীদেরকে

তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে থাকে এবং তাঁদেরকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলার ও দেশ থেকে বের করে দেয়ার ভয় দেখাতে থাকে। তারা তাঁদের ক্ষতিসাধন করে এবং এ ব্যাপারে সীমা ছাড়িয়ে যায়।

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ . قَالَ يٰقَوْمِ لَيْسَ بِيْ ضَلَالَةٌ وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّيْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ—তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলেছিল, আমরা তো তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। সে বলেছিল, হে আামর সম্প্রদায়! আমাতে কোন ভ্রান্তি নেই, আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। (অর্থাৎ তোমরা যে ধারণা করছ আমি ভ্রান্ত, আমি তা নই। বরং আমি সঠিক পথ ও হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি জগতসমূহের সে প্রতিপালকের রাসূল, যিনি কোন বস্তুকে 'হও' বললেই তা হয়ে যায়।) আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছি ও তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি এবং তোমরা যা জান না, আমি তা আল্লাহর নিকট হতে জানি। (৭ ঃ ৬০-৬২)

বলাবাহুল্য যে, একজন রাসূলের শান এমনিই হওয়া দরকার যে, তিনি হবেন বাকপটু। তাঁর ভাষা হবে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল, লোকদেরকে তিনি হিতোপদেশ দিবেন এবং আল্লাহ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান হবে সর্বাধিক।

নূহ (আ)-এর বক্তব্যের জবাবে তারা বলল ঃ

مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِيْنَ.

অর্থাৎ—আমরা তো তোমাকে আমাদের মতই দেখছি; অনুধাবন না করে তোমার অনুসরণ করছে তারাই, যারা আমাদের মধ্যে অধম এবং আমরা আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব দেখছি না, বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করি। (১১ ঃ ২৭)

নূহ (আ) মানুষ হয়ে রাসূল হওয়ায় তাঁর সম্প্রদায় বিস্মিত হয় এবং যারা তাঁর অনুসরণ করেছিল তাদেরকে তাচ্ছিল্য করে ও হেয়প্রতিপন্ন করে। কথিত আছে যে, নূহ (আ)-এর বিরোধী সম্প্রদায় ছিল নেতৃস্থানীয় আর তাঁর অনুসারীরা ছিল সমাজের দুর্বল শ্রেণীর লোক। যেমন ঃ রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস বলেছিলেন, নবী-রাসূলদের অনুসারীরা দুর্বল শ্রেণীরই হয়ে থাকেন। এর কারণ হলো—সত্য অনুসরণের ব্যাপারে তাদের সম্মুখে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না।

বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি بَادِيَ الرَّأْيِ -এর অর্থ হলো চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনা না করে স্রেফ তোমার দাওয়াত শুনেই তারা সাড়া দিয়েছে। কিন্তু এ কটাক্ষটি মূলত এমনই একটি গুণ যে কারণে তারা প্রশংসার্হ। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। কারণ প্রকাশ্য সত্য চাক্ষুস দর্শন ও চিন্তা-ভাবনার অপেক্ষা রাখে না বরং তা প্রকাশ পাওয়া মাত্র তা স্বীকার করে নিয়ে তাঁর অনুসরণ করাই আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই নবী করীম (সা) আবূ বকর সিদ্দীক

(রা)-এর প্রশংসা করে বলেছিলেন ঃ যাকেই আমি ইসলামের প্রতি আহবান করেছি প্রত্যেকেই দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিল। কিন্তু আবূ বকর এর ব্যতিক্রম। কারণ তিনি এতটুকু বিলম্বও করেন নি। আর এ কারণেই ছাকীফার দিনেও কোনরূপ চিন্তা-বিবেচনা না করেই দ্রুত তাঁর বায়আত সম্পন্ন হয়। কেননা, সাহাবাগণের কাছে অন্যদের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ছিল দিবালোকের মত স্পষ্ট। আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর খিলাফত সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়েও তা বাদ দিয়ে বলেছিলেনঃ "আল্লাহ ও ঈমানদারগণ আবূ বকর (রা) ছাড়া আর কারো ব্যাপারে রাযী হবেন না।"

নূহ (আ) ও তাঁর ঈমানদার অনুসারীদের উদ্দেশে তাঁর সম্প্রদায়ের কাফিরদের উক্তি وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِيْنَ-এর অর্থ হলো, তোমাদের ঈমান আনার পর আমাদের ওপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়নি। আমরা বরং তোমাদেরকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এর জবাবে নূহ (আ) বললেন ঃ

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتَانِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ. اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ.

অর্থাৎ— সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, অথচ এ বিষয়ে তোমরা জ্ঞানান্ধ হও, আমি কি এ বিষয়ে তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি, যখন তোমরা তা অপছন্দ কর। (১১ ঃ ২৮)

এই হলো তাদেরকে সম্বোধনে নূহ (আ)-এর কোমলতা অবলম্বন এবং সত্যের দাওয়াতের ক্ষেত্রে তাদের সাথে নম্রতার অভিব্যক্তি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى.

অর্থাৎ—তার সঙ্গে তোমরা নম্র কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। (২০ ঃ ৪৪)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ.

অর্থাৎ—তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা কর সদ্ভাবে। (১৬ ঃ ১২৫)

ঠিক এ ধারায়ই নূহ (আ) বলেছিলেন ঃ

اَرَاَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتَانِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ. اَنُلْزِمُكُمُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَارِهُوْنَ.

অর্থাৎ— তোমরা আমাকে বল, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট নিদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ (তথা নবুওত ও রিসালাত) দান

করে থাকেন, অথচ তোমরা এ বিষয়ে জ্ঞানান্ধ হও, (অর্থাৎ তোমরা তা বুঝতে না পার ও তার দিশা না পাও,) আমি কি এ বিষয়ে তোমাদেরকে বাধ্য করতে পারি (অর্থাৎ আমার কোন জোর চলে না,) যখন তোমরা তা অপছন্দ কর? (অর্থাৎ তোমরা যখন তা অপছন্দ কর তখন তোমাদের ব্যাপারে আমার কোন কৌশল চলে না।)

وَيَا قَوْمِ لاَ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً. اِنْ اَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّٰهِ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا. اِنَّهُمْ مُلَقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّىْ اَرَا كُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ.

অর্থাৎ—হে আমার সম্প্রদায়! এর পরিবর্তে আমি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহরই কাছে অর্থাৎ তোমাদের কাছে তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণকর বাণী পৌঁছানোর বিনিময়ে তোমাদের কাছে আমি কোন পারিশ্রমিক চাই না। তা চাই আমি একমাত্র আল্লাহর কাছে, যার প্রতিদান আমার জন্য তোমরা আমাকে যা দিবে তদপেক্ষা অনেক উত্তম ও স্থায়ী। (১১ ঃ ২৯)

وَمَا اَنَا بِطَارِدِ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ. এ আয়াত প্রমাণ করে যে, সম্প্রদায়ের লোকেরা নূহ (আ)-এর নিকট তাঁর দুর্বল শ্রেণীর অনুসারীদেরকে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি করেছিল এবং এ দাবি পূরণ করা হলে তারা তাঁর দলে ভিড়বে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু নূহ (আ) তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন ঃ اِنَّهُمْ مُلَقُوْا رَبِّهِمْ 'এরা এদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষ্যৎ করবে।' অর্থাৎ আমার ভয় হয়, যদি আমি তাদের তাড়িয়ে দেই; তাহলে আল্লাহ তা'আলার কাছে আমার বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ আনবে। তাই তিনি বললেন ঃ

وَيٰقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ. اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ.

অর্থাৎ—আর হে আমার সম্প্রদায়! আমি যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দেই, তবে আল্লাহর শাস্তি থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? তবুও কি তোমরা চিন্তা করবে না? (১১ ঃ ৩০)

আর এ কারণেই কুরায়শ কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আম্মার, সুহায়ব, বিলাল ও খাব্বাব (রা) প্রমুখ সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মুমিনকে তাঁর সান্নিধ্য থেকে তাড়িয়ে দেয়ার যখন দাবি করেছিল; তখন আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ কাজ করতে নিষেধ করে দেন। সূরা আন'আম ও সূরা কাহ্‌ফে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

وَلاَ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلاَ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ وَّلاَ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا. اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ اَنْفُسِهِمْ اِنِّىْ اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ.

অর্থাৎ—আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার আছে আর না অদৃশ্য সম্বন্ধে আমি অবগত এবং আমি এও বলি না যে, আমি ফেরেশতা বরং আমি বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ আমাকে যা অবগত করিয়েছেন তা ব্যতীত তাঁর ইল্‌মের কিছুই আমি জানি না, তিনি আমাকে যে কাজের শক্তি দান করেছেন; তা ব্যতীত কোন শক্তিই আমি রাখি না এবং তাঁর

ইচ্ছা ব্যতীত আমার নিজের কোন উপকার ও অপকারের ক্ষমতা আমার নেই। তোমাদের দৃষ্টিতে (আমার অনুসারীদের মধ্যকার) যারা হেয় তাদের সম্বন্ধে আমি একথা বলি না যে, আল্লাহ তাদেরকে কখনোই মঙ্গল দান করবেন না। তাদের অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ সম্যক অবগত। তাহলে আমি অবশ্যই জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হব। অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে আমি এ সাক্ষ্য দেই না যে, আল্লাহর নিকট কিয়ামতের দিন তাদের জন্য কোন কল্যাণ নেই। তাদের সম্বন্ধে আল্লাহই ভালো জানেন এবং তাদের অন্তরে যা আছে অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ তার প্রতিফল দান করবেন। ভালো হলে ভালো আর মন্দ হলে মন্দ। (১১ ঃ ৩১)

যেমন অন্যত্র তারা বলেছিল ঃ

أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ. قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ.

অর্থাৎ—আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব অথচ ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করছে? নূহ বলল, তারা কী করত তা আমার জানা নেই। তাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে! মুমিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয় আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (২৬ ঃ ১১১-১১৪)

নূহ (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে এ বাদানুবাদ চলে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَبِثَ فِيْهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا. فَأَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظَالِمُوْنَ.

অর্থাৎ—সে তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিল পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর। তারপর প্লাবন তাদেরকে গ্রাস করে। কারণ তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী। (২৯ ঃ ১৪)

অর্থাৎ এত দীর্ঘকাল ধরে দাওয়াত দেওয়া সত্ত্বেও তাদের অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং প্রত্যেক প্রজন্ম পরবর্তীদেরকে নূহ (আ)-এর প্রতি ঈমান না আনার এবং তাঁর সঙ্গে বিবাদ ও বিরুদ্ধাচরণের ওসীয়ত করে যেত। সন্তান বয়োপ্রাপ্ত ও বোধসম্পন্ন হলে পিতা একান্তে তাকে নূহের প্রতি জীবনে কখনো ঈমান না আনার ওসীয়ত করে দিত। তাদের সহজাত প্রকৃতিই ঈমান ও সত্যের বিরোধী ছিল।

এ জন্যই নূহ (আ) বলেছিলেন ঃ وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا فَاجِرًا তাঁরা কেবল দুষ্কৃতকারী ও কাফির জন্ম দিতে থাকবে। (৭১ ঃ ২৭)

আর এ কারণেই সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিল ঃ

قَالُوْا يَا نُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ. قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ.

অর্থাৎ—হে নূহ! তুমি আমাদের সঙ্গে বিতণ্ডা করেছ, তুমি বিতণ্ডা করেছ আমাদের সঙ্গে অতিমাত্রায়. সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর। সে বলল, ইচ্ছা করলে আল্লাহ্ই তোমাদের নিকট তা উপস্থিত করবেন এবং তোমরা তা ব্যর্থ করতে পারবে না। (১১ ঃ ৩২-৩৩)

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছি তা আনয়ন করার শক্তি আল্লাহর আছে। কোন কিছু তাঁকে ব্যর্থ করতে পারে না এবং কিছুই তাঁকে ব্যর্থকাম করতে পারে না বরং তিনি কোন বস্তুকে বলেন 'হও' সাথে সাথে তা হয়ে যায়।

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِىْ إِنْ أَرَدْتُّ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ أَنْ يُّغْوِيَكُمْ. هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

অর্থাৎ—আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের উপকারে আসবে না, যদি আল্লাহ তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান। তিনিই তোমাদের প্রতিপালক এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। (১১ ঃ ৩৪)

অর্থাৎ আল্লাহ কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তাকে পথে আনবার ক্ষমতা কারো নেই। তিনিই যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন, তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়; কে হিদায়াতের উপযুক্ত এবং কে বিভ্রান্ত হওয়ার যোগ্য সে সম্পর্কে জ্ঞানবান এবং পরম প্রজ্ঞা ও অকাট্য প্রমাণ তাঁরই।

وَأُوْحِيَ إِلٰى نُوْحٍ أَنَّهُ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِىْ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ.

অর্থাৎ—নূহের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছিল, যারা ঈমান এনেছে তারা ব্যতীত তোমার সম্প্রদায়ের আর কেউ কখনো ঈমান আনবে না। (এটা নূহের প্রতি তাঁর সম্প্রদায়ের শত্রুতা ও দুর্ব্যবহারের সান্ত্বনা বাক্য। অর্থাৎ তাদের আচরণ তোমার কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। কারণ সাহায্য নিকটে এবং আশ্চর্যজনক সংবাদ সম্মুখে আসছে।)

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ.

আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর এবং যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে তুমি আমাকে কিছু বলো না। তারা তো নিমজ্জিত হবে। (১১ ঃ ৩৬-৩৭)

এর কারণ হলো, নূহ (আ) যখন তাদের সংশোধন ও মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হন এবং বুঝতে পারেন যে, তাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই এবং সর্বপ্রকার আচরণ ও উচ্চারণে তাঁর নির্যাতন, বিরুদ্ধাচরণ ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার শেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, তখন তিনি তাদের

বিরুদ্ধে বদ দু'আ করেন। ফলে আল্লাহ তাঁর আহবানে সাড়া দেন এবং তাঁর দু'আ কবূল করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ. وَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ.

অর্থাৎ—নূহ আমাকে আহবান করেছিল আর আমি কত উত্তম সাড়া দানকারী। তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে আমি উদ্ধার করেছিলাম মহা সংকট থেকে। (৩৭ ঃ ৭৫-৭৬)

وَنُوْحًا اِذْ نَادٰى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ.

অর্থাৎ—স্মরণ কর নূহকে, পূর্বে সে যখন আহবান করেছিল তখন আমি তার আহবানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহা সংকট থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (২১ ঃ ৭৬)

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

অর্থাৎ—নূহ বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অস্বীকার করছে। সুতরাং তুমি আমার ও তাদের মধ্যে স্পষ্ট মীমাংসা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সঙ্গে যে সব মুমিন আছে তাদেরকে রক্ষা কর! (২৬ ঃ ১১৭-১১৮)

فَدَعَا رَبَّهٗ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ.

অর্থাৎ—নূহ তখন তাঁর প্রতিপালককে আহবান করে বলেছিল, আমি তো অসহায়। অতএব, তুমি প্রতিবিধান কর। (৫৪ ঃ ১০) رَبِّ انْصُرْنِيْ بِمَا كَذَّبُوْنِ

অর্থাৎ—হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে । (২৩ ঃ ৩৯)

مِمَّا خَطِيْئَاتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا. فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا. وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا. اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.

অর্থ তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল আগুনে, তারপর তারা কাউকেও আল্লাহ্র মুকাবিলার সাহায্যকারী পায়নি।

নূহ আরো বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।

তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতকারী ও কাফির। (৭১ ঃ ২৫-২৭)

মোটকথা, যখন তাদের কুফরী অনাচার-পাপাচারসমূহ ও নবীর বদ দু'আ একত্র হয় তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নৌকা নির্মাণ করার আদেশ করেন। সে এমন এক বিশাল জাহাজ যার কোন নজীর ছিল না। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে আগাম বলে রাখেন যে, যখন তাঁর আদেশ আসবে এবং অপরাধীদের প্রতি তাঁর অপ্রতিরোধ্য আযাব পতিত হয়ে যাবে; তখন যেন তিনি তাদের ব্যাপারে নমনীয়তা না দেখান। কেননা হতে পারে যে, নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ আযাব স্বচক্ষে দেখে তাদের ব্যাপারে তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক হবে। কারণ সংবাদ কখনো চাক্ষুস দেখার সমান হয় না। আর এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تُخَاطِبْنِى فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ.

অর্থাৎ—যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের ব্যাপারে তুমি আমাকে কিছু বলো না, তারা তো নিমজ্জিত হবে। সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল এবং যখনই তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা তার নিকট দিয়ে যেত তাকে উপহাস করত। (অর্থাৎ নূহ (আ) তাদেরকে যে আযাবের ভয় দেখিয়েছিলেন তা সংঘটিত হওয়া সুদূর পরাহত মনে করে তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করত) (১১ ঃ ৩৭-৩৮)

তার জবাবে নূহ (আ) বললেন ঃ

اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ.

অর্থাৎ—তোমরা যদি আমাদেরকে উপহাস কর তবে আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব যেমন তোমরা উপহাস করছ। অর্থাৎ তোমাদের কুফরীর উপর অটল থাকা এবং তোমাদের অবাধ্যতার জন্য যা তোমাদের জন্য আযাব ডেকে আনে--আমরাও তোমাদেরকে উপহাস করব। (১১ ঃ ৩৮)

فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ.

অর্থাৎ—তোমরা অচিরেই জানতে পারবে যে, কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি। (১১ ঃ ৩৯)

বলাবাহুল্য যে, দুনিয়াতে জঘন্যতম কুফরী ও চরম অবাধ্যতা তাদের মজ্জাগত বিষয় হয়ে গিয়েছিল। আখিরাতেও তাদের অবস্থা অনুরূপই হবে। কারণ, কিয়ামতের দিন তারা তাদের কাছে রাসূল আগমন করার বিষয়টিও অস্বীকার করবে।

যেমন ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ (কিয়ামতের দিন) নূহ (আ) ও তাঁর উম্মত উপস্থিত হবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি কি দীনের বাণী পৌঁছিয়েছিলে? নূহ (আ) বলবেন, জী হ্যাঁ, হে আমার রব! তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞাসা করবেন, নূহ কি তোমাদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছিল? তারা বলবে, না, আমাদের নিকট কোন নবীই আসেননি। তখন আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে বলবেন, তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কে? তিনি বলবেন, মুহাম্মদ (সা) ও

তাঁর উম্মত। তখন উম্মতে মুহাম্মদী এ সাক্ষ্য দেবে যে, 'নূহ (আ) তাঁর তাবলীগের দায়িত্ব পালন করেছেন।'

এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.

অর্থাৎ—এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি; যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। (২ ঃ ১৪৩) الوسط। অর্থ العدل। তথা ইনসাফ বা মধ্যপন্থা। মোটকথা, এ উম্মত তাঁর সত্যবাদী নবীর সাক্ষ্যের সপক্ষে এ সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছিলেন, তাঁর উপর সত্য নাযিল করেছিলেন এবং তাঁকে সত্যের অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছিলেন আর তিনি তাঁর উম্মতের নিকট পরিপূর্ণরূপে তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। দীনের ক্ষেত্রে তাদের জন্য উপকারী এমন কোন বিষয় সম্পর্কে তাদেকে আদেশ দিতে ছাড়েন নি এবং ক্ষতিকর এমন কোন বিষয় ছিল না, যা করতে তিনি নিষেধ করেননি। সকল নবীর শান এমনই হয়ে থাকে। এমনকি তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্পর্কে পর্যন্ত সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যদিও তাদের আমলে দাজ্জালের আবির্ভাবের কোন আশংকাই ছিল না। কওমের প্রতি দয়া অনুগ্রহবশত তিনি তা করেছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন উমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন জনসাধারণের মধ্যে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা'আলার শানে উপযুক্ত প্রশংসা বর্ণনা করেন। তারপর দাজ্জালের কথা উল্লেখ করে বললেন ঃ "তোমাদেরকে আমি তার ব্যাপারে সাবধান করছি।" এমন কোন নবী নেই যে, আপন সম্প্রদায়কে তার ব্যাপারে সাবধান করেন নি। নূহ্ (আ) ও আপন সম্প্রদায়কে তার ব্যাপারে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তবে তার ব্যাপারে তোমাদেরকে আমি এমন একটি কথা বলে দেই যা কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে বলেননি। তোমরা জেনে রেখ, সে এক-চক্ষুবিশিষ্ট। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এক-চক্ষুবিশিষ্ট নন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে যথাক্রমে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে এমন একটি কথা বলব যা কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে বলেন নি? সে হলো কানা। আর সে নিজের সাথে জান্নাত ও জাহান্নামের অনুরূপ কিছু নিয়ে আসবে। যাকে সে জান্নাত বলবে, আসলে তাই হবে জাহান্নাম। আর আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছি, যেমন নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিলেন।"

কোন কোন পূর্বসূরি আলিম বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন নূহ (আ)-এর দু'আ কবূল করেন, তখন তাঁকে নৌকা নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি বৃক্ষ রোপণ করার আদেশ দেন। ফলে নূহ (আ) একটি বৃক্ষ রোপণ করে একশ বছর অপেক্ষা করেন। তারপর পরবর্তী শতাব্দীতে তা কেটে কাঠ করে নেন। কারো কারো মতে, চল্লিশ বছর পরে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন যে, সে নৌকাটি শাল কাঠ দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, দেবদারু কাঠ দ্বারা। আর এটি হলো তাওরাতের বক্তব্য। ছাওরী

বলেন, আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-কে আরো নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন নৌকাটি দৈর্ঘে আশি হাত, প্রস্থে পঞ্চাশ হাত করে তৈরি করেন। তার ভিতরে ও বাইরে আলকাতরা দ্বারা প্রলেপ দেন এবং তার এমন সরু গলুই নির্মাণ করেন, যা পানি চিরে অগ্রসর হতে পারে। কাতাদা বলেন, তাঁর দৈর্ঘ ছিল তিনশ হাত আর প্রস্থ্ পঞ্চাশ হাত। আমি তাওরাতে এমনই দেখেছি।

হাসান বসরী (র) বলেন, দৈর্ঘ ছ'শ হাত আর প্রস্থ তিনশ হাত। ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত দৈর্ঘ এক হাজার দু'শ হাত প্রস্থ ছ'শ হাত। কারো কারো মতে, দৈর্ঘ দু'হাজার হাত আর প্রস্থ এক'শ হাত। এরা সকলেই বলেন, তার উচ্চতা ছিল ত্রিশ হাত আর তা ত্রিতল বিশিষ্ট ছিল।

প্রতি তলা দশ হাত করে। নিচের তলা কীট-পতঙ্গ ও জীব-জানোয়ারের জন্য, দ্বিতীয় তলা মানুষের জন্য আর উপর তলা পাখ-পাখালির জন্য। তার দরজা ছিল পাশে এবং উপর দিকে ঢাকনা দ্বারা আবৃত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ. فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا.

অর্থাৎ—নূহ বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করছে। তারপর আমি তার প্রতি ওহী নাযিল করলাম যে, তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার ওহী অনুযায়ী নৌযান নির্মাণ কর। অর্থাৎ তোমাকে দেয়া আমার আদেশ অনুযায়ী এবং তোমার নির্মাণ কার্য আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে তুমি নৌযান নির্মাণ কর যাতে তা নির্মাণে আমি তোমাকে সঠিক নির্দেশনা দিতে পারি।'

فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ فَاسْلُكْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ. وَلاَ تُخَاطِبْنِىْ فِى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا. اِنَّهُمْ مُغْرَقُوْنَ.

অর্থাৎ—তারপর যখন আমার আদেশ আসবে ও উনুন উথলে উঠবে; তখন তাতে তুলে নিও প্রতিটি জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়ে আছে তারা ব্যতীত। আর জালিমদের সম্বন্ধে তুমি আমাকে কিছু বলো না, তারা তো নিমজ্জিত হবে। (২৩ ঃ ২৭)

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-কে আগাম নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন যে, যখন তাঁর আদেশ আসবে এবং তাঁর শাস্তি আপতিত হবে, তখন যেন তিনি বংশ ধারা রক্ষার জন্য সে নৌকায় প্রত্যেক জীব, সকল প্রাণী ও খাদ্য-দ্রব্য প্রভৃতির এক এক জোড়া উঠিয়ে নেয় এবং নিজের সাথে কাফিরদের ব্যতীত নিজের পরিবার-পরিজনকে তুলে নেন। তাঁর পরিবারের যারা কাফির তাদেরকে এজন্য বাদ দেয়া হয়েছে যে, তাদের ব্যাপারে অপ্রতিরোধ্য বদ দু'আ কার্যকর হয়ে গেছে এবং তারা আযাবে নিপতিত হওয়া অবধারিত হয়ে গেছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ আদেশও দিয়ে রাখেন যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের মধ্যে আযাব এসে পড়লে যেন তিনি আল্লাহ্র নিকট কোন সুপারিশ না করেন।

জমহুর উলামার কাছে التنور। দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠকে বুঝানো হয়েছে। এ হিসাবে আয়াতের অর্থ হলো, যখন ভূমি সর্বদিক থেকে উৎসারিত হবে এমনকি আগুনের আধার উনুন থেকে পর্যন্ত পানির ফোয়ারা নির্গত হবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, التنور। হলো ভারতের একটি কূয়া। শা'বী কূয়াটি কুফার এবং কাতাদা (র) আরব উপত্যকায় অবস্থিত ছিল বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) বলেন, التنور। দ্বারা প্রভাতের আলো বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ সময়ে তুমি প্রতি জীবের এক এক জোড়া এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে নৌযানে তুলে নিও। তবে এ অভিমতটি 'গরীব' পর্যায়ের।

অন্যত্র আল্লাহ্ আ'আলা বলেন ঃ

حَتّٰى اِذَا جَاۤءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّوْرُ قُلْنَا احْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اٰمَنَ. وَمَا اٰمَنَ مَعَهٗ اِلَّا قَلِيْلٌ.

অর্থাৎ— এভাবে যখন আমার আদেশ আসল এবং উনুন উথলে উঠল; তখন আমি বললাম, এতে তুমি প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া এবং যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়েছে তারা ব্যতীত তোমার পরিবার-পরিজনকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আরোহণ করাও। আর অল্প সংখ্যক ব্যতীত কেউ ঈমান আনেনি।

এখানে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তাদের প্রতি আযাব আপতিত হলে যেন তিনি তাতে প্রত্যেক জীবের এক এক জোড়া তুলে নেন। আর আহলে কিতাবদের গ্রন্থে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-কে প্রতি হালাল পশুপাখির সাত জোড়া করে, আর নিষিদ্ধগুলোর নর-মাদা দুই জোড়া করে তুলে নেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু এ কথাটি কুরআনের اِثْنَيْنِ শব্দের অর্থের সাথে সংঘাতপূর্ণ, যদি একে আমরা কর্মকারক হিসেবে গণ্য করি। আর যদি একে زَوْجَيْنِ শব্দের তাকীদ রূপে সাব্যস্ত করে কর্মকারক উহ্য মানি; তাহলে কোন সংঘাত থাকে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

কেউ কেউ বলেন এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে যে, পক্ষীকুলের মধ্যে সর্বপ্রথম নৌকায় যা প্রবেশ করেছিল তাহলো টিয়া আর প্রাণীকুলের মধ্যে সর্বশেষে যা প্রবেশ করেছিল তাহলো গাধা এবং ইবলীস গাধার লেজের সাথে ঝুলে প্রবেশ করে।

ইব্‌ন আবূ হাতিম আসলাম (র) সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, নূহ (আ) নৌযানে প্রতি জীবের এক এক জোড়া তুলে নিলে তাঁর সংগীরা বললেন, সিংহের সঙ্গে আমরা কিভাবে বা গৃহপালিত প্রাণীরা কিভাবে নিরাপদ বোধ করবে? তখন আল্লাহ্ তা'আলা সিংহকে জ্বরাক্রান্ত করে দেন। পৃথিবীতে এটাই ছিল সর্বপ্রথম জ্বরের আবির্ভাব। তারপর তাঁরা ইঁদুরের ব্যাপারে অনুযোগ করে বললেন, "পাজিগুলো তো আমাদের খাদ্যদ্রব্য ও জিনিসপত্র সব নষ্ট করে ফেলল! তখন আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে সিংহ হাঁচি দেয়। এতে বিড়াল বের হয়ে আসে। বিড়াল দেখে ইঁদুররা সব আত্মগোপন করে।" এ হাদীসটি 'মুরসাল' পর্যায়ের। وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ এর অর্থ হলো, কাফির হওয়ার কারণে তোমার পরিবারের যাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে গেছে তাদের ব্যতীত অন্য সকলকে নৌকায় তুলে নিও। এদের মধ্যে নূহ (আ)-এর পুত্র য়ামও ছিল যে নিমজ্জিত হয়েছিল। এর আলোচনা পরে আসছে।

وَمَنْ اٰمَنْ এর অর্থ--তোমার উম্মতের যারা তোমার সাথে ঈমান এনেছে তাদেরকেও তুমি নৌকায় তুলে লও।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : وَمَا اٰمَنَ مَعَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلٌ অর্থাৎ- সম্প্রদায়ের মধ্যে নূহ (আ)-এর এত দীর্ঘ সময় অবস্থান এবং রাতে-দিনে নরম-গরম নানা প্রকার কথা ও কাজের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও অল্প সংখ্যক ব্যতীত কেউ ঈমান আনেনি।

নূহ (আ)-এর সঙ্গে নৌকায় যারা ছিল, তাদের সংখ্যা কত এ ব্যাপারে আলিমগণের মতভেদ আছে। ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নারী-পুরুষ মিলে তারা ছিলেন আশিজন। কা'ব ইব্ন আহবাব থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা ছিলেন বাহাত্তর জন। কারো কারো মতে দশজন। কেউ কেউ বলেন, তাঁরা ছিলেন নূহ, তাঁর তিন পুত্র ও য়াম-এর স্ত্রীসহ তাঁর চার পুত্রবধু, যে য়াম মুক্তির পথ থেকে সরে গিয়েছিল। তবে এ অভিমতটি স্পষ্ট আয়াতের পরিপন্থী। কারণ নূহ (আ)-এর সঙ্গে তাঁর পরিবারের লোকজন ব্যতীত অন্য একদল ঈমানদার লোকও ছিল বলে কুরআনে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। যেমন নূহ (আ) বলেছিলেন : وَنَجِّنِىْ وَمَنْ مَّعِىَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ। অর্থাৎ--"আমাকে ও আমার সঙ্গী মুমিনগণকে মুক্তি দাও।" (২৬ : ১১৮)

কেউ কেউ বলেন, তাঁরা ছিলেন সাতজন। আর নূহ (আ)-এর স্ত্রী তথা তাঁর সব ক'টি ছেলে হাম, সাম, য়াফিস ও য়াম—আহলে কিতাবদের মতে যার নাম কানআন এবং তাঁর এ ছেলেটিই ডুবে মরেছিল। এদের মা প্লাবনের আগেই মারা গিয়েছিল। কেউ কেউ বলেন, সেও নিমজ্জিতদের সঙ্গে ডুবে মরেছিল। তার কুফরীর কারণে সেও অনিবার্যরূপে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর আহলে কিতাবদের মতে সে নৌকায় ছিল। একথাটি সঠিক হলে বলতে হবে যে, সে প্লাবনের পরেই কুফরী করেছিল কিংবা তাকে কিয়ামত দিবসের জন্য অবকাশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু প্রথম অভিমতটিই যুক্তিসঙ্গত।

কারণ নূহ (আ) বলেছিলেন : لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا.

অর্থাৎ- তুমি পৃথিবীতে কাফিরদের একটি গৃহবাসীকেও অব্যাহতি দিও না। (৭১ : ২৬)

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ.

অর্থাৎ- যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আসন গ্রহণ করবে তখন বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায় থেকে উদ্ধার করেছেন। আরো বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমনভাবে অবতরণ করাও যা হবে কল্যাণকর, আর তুমিই শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। (২৩ : ২৮-২৯)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-কে তাঁর প্রতিপালকের প্রশংসা করার আদেশ দিয়েছেন। কারণ তিনি এ নৌযানকে তাঁর বশীভূত করে দিয়ে তা দিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেছেন, তাঁর ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিয়েছেন এবং যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল

এবং তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদের শাস্তি দানের মাধ্যমে তার প্রাণ জুড়িয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ. لِتَسْتَوُوْا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوْا سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ. وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.

অর্থাৎ– যিনি জোড়াসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেন এমন নৌযান ও পশু যাতে তোমরা আরোহণ কর। যাতে তোমরা তাদের পিঠে স্থির হয়ে বসতে পার। তারপর তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমরা তার উপর স্থির হয়ে বস এবং বল, পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। আমরা আমাদের প্রতিপালকের কাছে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব। (৪৩ ঃ ১২-১৪)

এভাবে যাবতীয় কাজের শুরুতে দু'আ করার আদেশ দেওয়া হয়ে থাকে, যাতে তা মঙ্গলজনক ও বরকতময় এবং তার শেষ পরিণাম শুভ হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) যখন হিজরত করেন তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বলেছিলেন ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا .

অর্থাৎ–বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে প্রবেশ করাও কল্যাণের সাথে এবং আমাকে বের করাও কল্যাণের সাথে এবং তোমার কাছ থেকে আমাকে দান কর সাহায্যকারী শক্তি। (১৭ ঃ ৮০) বলাবাহুল্য যে, নূহ (আ) এ উপদেশ মত কাজ করেন।

وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖهَا وَمُرْسٰهَا. اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

অর্থাৎ—এবং বলেন, তোমরা এতে আরোহণ কর, আল্লাহ্র নামে এর গতি ও স্থিতি, আমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ এর চলার শুরু এবং শেষ আল্লাহরই নামে। আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও দয়ালু হওয়ার সাথে সাথে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিদাতাও বটে। অপরাধী সম্প্রদায় থেকে তার শাস্তি রোধ করার সাধ্য কারো নেই যেমনটি আপতিত হয়েছিল তাদের প্রতি, যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করেছিল এবং তাকে বাদ দিয়ে অন্যের পূজা করেছিল। (১১ ঃ ৪১)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ

অর্থাৎ—পাহাড়তুল্য তরঙ্গমালার মধ্যে তা তাদেরকে নিয়ে চলল। (১১ ঃ ৪২)

তা এভাবে হয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ হতে এমন বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যা পৃথিবীতে ইতিপূর্বে কখনো দেখা যায়নি এবং এমন বৃষ্টি পরেও আর কখনো হবার নয়—যা ছিল

মশকের খোলা মুখের মত অঝোর ধারায়। আর আল্লাহ্ তা'আলা ভূমিকে আদেশ দেন, ফলে তা সর্বদিক থেকে উৎসারিত হয়ে উঠে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ . فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ . وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ . وَحَمَلْنَاهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ . تَجْرِيْ بِاَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ

অর্থাৎ– তখন নূহ তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, আমি তো অসহায়, অতএব, তুমি প্রতিবিধান কর। ফলে আমি উন্মুক্ত করে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারি বর্ষণে এবং মাটি থেকে উৎসারিত করলাম ঝর্ণাধারা। তারপর সকল পানি মিলিত হলো এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে । তখন নূহকে আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেক নির্মিত এক নৌযানে যা চলত আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে। এটা ছিল প্রতিশোধ তার পক্ষ থেকে যাকে (নূহকে) প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। (৫৪ ঃ ১০-১৪)

ইব্ন জারীর (র) প্রমুখ ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন যে, কিবতীদের বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী এ মহাপ্লাবন 'আব' মাসের ১৩ তারিখে শুরু হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِى الْجَارِيَةِ . لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّتَعِيَهَا اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ

অর্থাৎ– যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে, আমি তা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্যে এবং এজন্য যে, শ্রুতিধর কান তা সংরক্ষণ করে। (৬৯ ঃ ১১-১২)

অনেক মুফাস্সির বলেন, পানি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ার পনের হাত উপর পর্যন্ত উঁচু হয়েছিল। আহ্লি কিতাবদের অভিমতও এটাই। কেউ কেউ বলেন, আশি হাত। সে প্লাবনে সমগ্র পৃথিবীর সমভূমি, পাথুরে ভূমি, পাহাড়, পর্বত ও বালুকাময় প্রান্তর সবই প্লাবিত হয়েছিল, ভূপৃষ্ঠে ছোট-বড় কোন একটি প্রাণীও অবশিষ্ট ছিল না। ইমাম মালিক (র) যায়দ ইবন আসলাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সে যুগের অধিবাসীরা সমতল ভূমি ও পাহাড়-পর্বত সবকিছু পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) বলেন, পৃথিবীর প্রতিটি ভূখণ্ডেরই কেউ না কেউ মালিক ছিল। ইব্ন আবূ হাতিম এ দু'টি বর্ণনা দিয়েছেন।

وَنَادٰى نُوْحُ نِ ابْنَهُ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلٍ يَّا بُنَيَّ ارْكَبْ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مَّعَ الْكَافِرِيْنَ . قَالَ سَاٰوِيْ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِيْ مِنَ الْمَاءِ . قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَّحِمَ . وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ .

অর্থাৎ– নূহ তার পুত্র, যে তাদের থেকে পৃথক ছিল, তাকে আহ্বান করে বলল, হে আমার পুত্র! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং কাফিরদের সঙ্গী হয়ো না।

সে বলল, আমি এমন এক পর্বতে আশ্রয় নেব যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে। সে বলল, আজ আল্লাহর বিধান থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, যাকে আল্লাহ্ দয়া করবেন সে ব্যতীত। এরপর তরঙ্গ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো। (১১ ঃ ৪২-৪৩)

এ পুত্রই হলো সাম, হাম ও য়াফিছ-এর ভাই য়াম। কেউ কেউ বলেন, এর নাম কানআন। কাফির ও বদ-আমল হওয়ায় সে পিতার দীন-ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে ধ্বংসপ্রাপ্তদের সঙ্গে সেও ধ্বংস হয়ে যায়। অপরদিকে তার দীন-ধর্মের সমর্থক অনেক অনাত্মীয়ও তার পিতার সঙ্গে মুক্তিলাভ করেন।

وَقِيْلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِيْ مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ.

অর্থাৎ— এরপর বলা হলো, হে পৃথিবী! তুমি তোমার পানি গ্রাস করে নাও এবং হে আকাশ! ক্ষান্ত হও। এরপর বন্যা প্রশমিত হলো এবং কার্য সমাপ্ত হলো, নৌকা জূদী পর্বতের উপর স্থির হলো এবং বলা হলো, জালিম সম্প্রদায় ধ্বংস হোক। (১১ ঃ ৪৪)

অর্থাৎ প্লাবনে গাইরুল্লাহর পূজারীদের সকলে সমূলে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীকে তার পানি গ্রাস করে নেয়া এবং আকাশকে বারি বর্ষণ ক্ষান্ত করার আদেশ দেন। غِيْضَ الْمَاءُ অর্থ পানি পূর্বে যা ছিল তার চেয়ে কমে গেল। আর قُضِيَ الْأَمْرُ অর্থ আল্লাহ্ তা'আলা ইল্‌ম ও তাঁর নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে তাদের প্রতি যে আযাব ও ধ্বংস আপতিত হওয়ার কথা ছিল তা বাস্তবায়িত হলো। وَقِيْلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ.

অর্থাৎ- কুদরতের ভাষায় ঘোষণা দেয়া হলো যে), ওরা রহমত ও মাগফিরাত থেকে দূর হোক। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَكَذَّبُوْهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِى الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا. إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا عَمِيْنَ.

অর্থাৎ— তারপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে। ফলে আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা নৌকায় ছিল তাদেরকে উদ্ধার করি এবং যারা আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকেও নিমজ্জিত করি। তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়। (৭ ঃ ৬৪)

فَكَذَّبُوْهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِى الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ.

অর্থাৎ--আর তারা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে। তারপর তাকে ও তার সঙ্গে যাা নৌকায় ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং তাদেরকে স্থলাভিষিক্ত করি ও যারা আমার নিদর্শনসমূহকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করি। সুতরাং দেখ, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের পরিণাম কী হয়েছিল ? (১০ ঃ ৭৩)

وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا . إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِيْنَ.

অর্থাৎ--এবং আমি তাকে সাহায্য করেছিলাম সে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল, তারা ছিল এক মন্দ সম্প্রদায়। এজন্য তাদের সকলকেই আমি নিমজ্জিত করেছিলাম। (২১ ঃ ৭৭)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِيْنَ. إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً . وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

অর্থাৎ--তারপর আমি তাকে ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম বোঝাই নৌযানে। তারপর অবশিষ্ট সকলকে নিমজ্জিত করলাম। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয় এবং তোমার প্রতিপালক! তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (২৬ ঃ ১১৯-১২২)

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِيْنَ .

অর্থাৎ--তারপর আমি তাকে এবং যারা নৌকায় আরোহণ করেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং বিশ্বজগতের জন্য একে করলাম একটি নিদর্শন। (২৯ ঃ ১৫) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِيْنَ

তারপর অবশিষ্ট সকলকে আমি নিমজ্জিত করি। (৩৭-৮২)

وَلَقَدْ تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ . فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ . وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ .

অর্থাৎ--আমি একে রেখে দিয়েছি এক নিদর্শনরূপে। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! কুরআনকে আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, কে আছে উপদেশ গ্রহণের জন্য? (৫৪ ঃ ১৫-১৭)

مِمَّا خَطِيْئَاتِهِمْ أُغْرِقُوْا فَأُدْخِلُوْا نَارًا . فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْصَارًا . وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا . إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا .

অর্থাৎ--তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল আগুনে; তারপর তারা কাউকেও আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি।

নূহ আরো বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতকারী ও কাফির। (৭১ ঃ ২৫-২৭)

বলাবাহুল্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-এর বদদু'আ কবূল করেছিলেন। সমস্ত প্রশংসা ও অনুগ্রহ তাঁরই। ফলে তাদের একটি প্রাণীও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

ইমাম আবূ জাফর ইব্ন জারীর ও আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ হাতিম আপন আপন তাফসীরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-এর বরাতে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নূহের সম্প্রদায়ের কারো প্রতি যদি আল্লাহ্ দয়া করতেন, তাহলে অবশ্যই শিশুর মায়ের প্রতি দয়া করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে (পঞ্চাশ কম) এক হাজার বছর অবস্থান করেন এবং বৃক্ষ রোপণ করে একশ' বছর অপেক্ষা করেন। বৃক্ষটি বড় হয়ে পোক্ত হলে তা কেটে তা দিয়ে নৌকা নির্মাণ করেন। নৌকা নির্মাণকালে সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর নিকট দিয়ে অতিক্রম করত, তাকে ঠাট্টা করত এবং বলত, তুমি ডাঙ্গায় নৌকা নির্মাণ করছ, এ চলবে কিভাবে ? নূহ (আ) বলতেন, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।

যখন তিনি নৌকা নির্মাণ শেষ করলেন এবং পানি উৎসারিত হলো ও তা অলিতে-গলিতে ঢুকে পড়ল, তখন একটি শিশুর মা তার ব্যাপারে আশংকা বোধ করল। সে তাকে অত্যন্ত স্নেহ করত। অগত্যা শিশুটিকে নিয়ে সে এক পাহাড়ের এক-তৃতীয়াংশ উপরে গিয়ে উঠে। পানি বাড়তে বাড়তে তার পর্যন্ত পৌঁছুলে এবার সে শিশুটিকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে ওঠে। এবার পানি তার ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছুলে সে তার দু হাত দ্বারা শিশুটিকে উপরে তুলে ধরে। তারপর তারা দুজনই ডুবে যায়। আল্লাহ্ যদি তাদের কাউকে দয়া করতেন, তাহলে ঐ শিশুর মাকে অবশ্যই দয়া করতেন।

এ হাদীসটি 'গরীব' পর্যায়ের। কা'ব আল-আহবার ও মুজাহিদ প্রমুখ থেকে এর অনুরূপ কাহিনী বর্ণিত আছে। এ হাদীসটিও কা'ব আল-আহবারের ন্যায় কারো থেকে মওকূফ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের একটি গৃহবাসীকেও অবশিষ্ট রাখেননি। সুতরাং কোন কোন মুফাসসির কিভাবে ধারণা করেন যে, আওজ ইবন উনুক মতান্তরে ইব্ন আনাক নূহ (আ)-এর পূর্ব থেকে মূসা (আ)-এর আমল পর্যন্ত বেঁচে ছিল। অথচ তাঁরাই বলেন যে, সে ছিল সীমালংঘনকারী, উদ্ধত ও বিরুদ্ধাচারী কাফির। তাঁরা আরো বলেন যে, সে ছিল আদমের কন্যা আনাকের জারয সন্তান। সমুদ্রের তলদেশ থেকে মাছ ধরে এনে সে সূর্যের তাপে তা সিদ্ধ করত। নূহ (আ)-কে সে উপহাস ছলে বলত, তোমার এ ছোট্ট পেয়ালাটি কি হে? তাঁরা আরো উল্লেখ করেন যে, তার উচ্চতা ছিল তিন হাজার তিনশ তেত্রিশ হাত ছয় ইঞ্চি। এ ধরনের আরো অনেক অলীক কাহিনী রয়েছে। এ সংক্রান্ত বিবরণসমূহ এতই প্রসিদ্ধ যে, তাফসীর ও ইতিহাস ইত্যাদির বহু গ্রন্থে যদি এসব কথার উল্লেখ না থাকত; তাহলে আমরা তা আলোচনাই করতাম না। তাছাড়া এসব কথা যুক্তি এবং নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েতের পরিপন্থী।

যুক্তি বলে, আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-এর পুত্রকে তার কুফরীর কারণে ধ্বংস করবেন, অথচ তার পিতা হলেন উম্মতের নবী ও ঈমানদারদের প্রধান আর আওজ ইব্ন আনাক বা আনাককে ধ্বংস করবেন না, অথচ সে হলো চরম অত্যাচারী ও অবাধ্য; এটা হতেই পারে না। তাছাড়া অপরাধীদের কাউকে আল্লাহ দয়া করবেন না, এমনকি শিশুর মাকেও না, শিশুকেও না,

আর এ স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য, চরম পাপাচারী কাফির ও বিতাড়িত শয়তানকে অব্যাহতি দিবেন, এটা তো হতে পারে না!

নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়তের ব্যাপারে বলা যায়— আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِيْنَ "তারপর আমি অন্যদেরকে নিমজ্জিত করি।"

وَقَالَ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا. "সে আরো বলল, হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের কোন গৃহবাসীকে তুমি অব্যাহতি দিও না।" (৭১ঃ২৬)

তাছাড়া উক্ত মুফাসসিরগণ তার যে উচ্চতার কথা উল্লেখ করেছেন তা সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী, যাতে বলা হয়েছে নবী করীম (সা) বলেছেনঃ 'সৃষ্টির সময় আদম (আ)-এর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তারপর থেকে তা কমতে কমতে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে।

এ হলো নিষ্পাপ, সত্যবাদী এমন এক মহান সত্তার উক্তি, যিনি মনগড়া কোন কথা বলেন না, যা প্রত্যাদেশ হয় কেবল তা-ই বলেন। তাঁর মতে, আদম (আ) থেকে এ যাবত মানুষের উচ্চতা ক্রমেই কমছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে কমতে থাকবে।

তাঁর এ বক্তব্য প্রমাণ করে যে, আদমের সন্তানদের মধ্যে কাউকে আদম অপেক্ষা দীর্ঘ পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় তাঁর এ তথ্য বর্জন করে আহলি কিতাবদের সেসব মিথ্যাবাদী কাফিরদের অভিমত কিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত কিতাবসমূহকে পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলেছে এবং তার প্রচুর অপব্যাখ্যা করেছে? এ-ই যেখানে অবস্থা, সেখানে একান্তই তাদের নিজস্ব অভিমত এবং বর্ণনা সম্পর্কে তাদের উপর কতটুকু নির্ভর করা চলে? আমাদের ধারণা, আওজ ইব্ন আনাক সম্পর্কিত এ তথ্য তাদেরই একদল নাস্তিক ও পাপাচারীর স্বকপোলকল্পিক উক্তি, যারা ছিল নবীদের শত্রু। আল্লাহ্ ভালো জানেন।

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ) কর্তৃক তাঁর পুত্রের ব্যাপারে তাঁর প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করার এবং অবগতি লাভের উদ্দেশ্যে তার নিমজ্জিত হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করার কথা উল্লেখ করেন। প্রশ্ন করার কারণ হলো এই যে, আপনি আমার পরিবার-পরিজনকে আমার সাথে রক্ষা করার ওয়াদা করেছিলেন। আর এও তো তাদেরই একজন। অথচ সে নিমজ্জিত হলো। এর উত্তরে বলা হলো, সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়, যাদেরকে রক্ষা করার ওয়াদা আমি তোমাকে দিয়েছিলাম অর্থাৎ আমি কি তোমাকে এ কথা বলিনি যে, তোমার পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করবো তবে তাকে নয় যার বিরুদ্ধে পূর্বেই ধ্বংসের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তোমার এ পুত্র তো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ পূর্বেই তা আমি বলে দিয়েছিলাম যে, কুফরীর কারণে এ নিমজ্জিত হবে। এজন্যই তো ভাগ্য তাকে ঈমানদারদের পরিবেশ থেকে সরিয়ে নেয়। পরিণামে সে কাফির ও সীমালংঘন কারীদের দলের সঙ্গে নিমজ্জিত হয়েছে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰىٓ اُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ . وَاُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

অর্থাৎ– বলা হলো, হে নূহ! অবতরণ কর আমার প্রদত্ত শান্তিসহ এবং তোমার প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের প্রতি কল্যাণসহ; অপর সম্প্রদায়সমূহকে আমি জীবন উপভোগ করতে দেব, পরে আমার পক্ষ থেকে মর্মন্তুদ শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে। (১১ ঃ ৪৮)

এ হলো নূহ (আ)-এর প্রতি সে সময়কার আদেশ, যখন পানি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সরে গিয়েছিল, তা চলাচল ও অবস্থান উপযোগী হয়েছিল এবং দীর্ঘ ভ্রমণের পর জূদী পর্বতের পৃষ্ঠদেশে স্থির হয়ে থাকা নৌকা থেকে নেমে যাওয়ার সুযোগ হয়ে উঠেছিল। জূদী জযিরা অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ পর্বতের নাম। পর্বত সৃষ্টির অধ্যায়ে আমরা এর আলোচনা করে এসেছি।

بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكٰتٍ অর্থ হলো, তুমি নিরাপদে এবং তোমার প্রতি এবং তোমার ভবিষ্যত বংশধরদের প্রতি বরকতসহ অবতরণ কর। এখানে ভবিষ্যত বংশধর বলতে শুধু নূহ (আ)-এর বংশধর এজন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ) ব্যতীত তাঁর ঈমানদার সঙ্গীদের অন্য কারো বংশ ও উত্তরসুরি সৃষ্টি করেননি।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ .

আমি তার বংশধরকেই অবশিষ্ট রেখেছি। (৩৭ ঃ ৭৭) অতএব, যত আদম সন্তান আজ ভূ-পৃষ্ঠে আছে তারা সকলেই নূহ (আ)-এর তিন পুত্র সাম, হাম ও য়াফিস-এর বংশধর।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সাম আরবের আদি পুরুষ, হাম আবিসিনিয়ার আদি পুরুষ এবং য়াফিছ রূমের আদি পুরুষ।

আর ইমাম তিরমিযীও হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেছেন। শায়খ আবূ ইমরান ও ইব্ন আবদুল বার্‌র বলেন যে, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

উপরোক্ত হাদীসে রূম দ্বারা প্রথম রূম বুঝানো হয়েছে। এরা হলো গ্রীক জাতি। এদের বংশধারা রূমী ইব্ন লিবতী ইব্ন ইউনান ইব্ন য়াফিস ইব্ন নূহ (আ) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ নূহ (আ)-এর তিন পুত্র জন্মলাভ করে। সাম, য়াফিস ও হাম। আবার এ তিনজনের প্রত্যেকের তিনটি করে পুত্র জন্ম নেয়। সাম-এর পুত্ররা হলো আরব, ফারিস ও রূম। য়াফিস-এর পুত্ররা হলো তুর্ক, সাকালিবা ও য়াজূজ-মাজূজ এবং হামের পুত্ররা হলো কিব্‌ত, সূদান ও বারবার।

হাফিজ আবূ বকর বায্‌যার তাঁর মুসনাদে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "নূহের ঔরসে সাম, হাম ও য়াফিস জন্মগ্রহণ করেন। তারপর সামের ঔরসে আরব, ফারিস ও রূমরা জন্মগ্রহণ করে। এদের মধ্যে য়াফিছ-এর ঔরসে জন্ম নেয় য়াজূজ-মা'জূজ, তুর্ক ও সাকালিবা। এদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। আর হামের ঔরসে

জন্ম নেয় কিব্‌ত, বারবার ও সূদান। এ বর্ণনাটি মারফূ নাকি মুরসাল পর্যায়ের এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

কথিত আছে যে, নূহ (আ)-এর তিন পুত্রের জন্ম প্লাবনের পরেই হয়েছিল। প্লাবনের পূর্বে তার ঔরসে কানআনের জন্ম হয়েছিল, যে নিমজ্জিত হয়ে যায় এবং তার অপর পুত্র আবির-এর মৃত্যু প্লাবনের পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সঠিক কথা হলো, তাঁর তিন পুত্র তাঁর সঙ্গে নৌকায় ছিলেন। তাদের মাতা এবং স্ত্রীগণও তাদের সঙ্গে ছিলেন। এটাই তাওরাতের ভাষ্য। আরো বর্ণিত আছে যে, হাম নৌকায় তার স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করেন। ফলে নূহ (আ) তার জন্য বদ দু'আ করেন যেন তার এ বীর্য দ্বারা কুশ্রী সন্তান সৃষ্টি করা হয়। পরিণামে তাঁর একটি কালো সন্তান জন্ম নেয়। সে হলো সুদানের আদি পুরুষ কানআন ইব্‌ন হাম। বরং ঘটনাটি সম্পর্কে কথিত আছে যে, হাম তার পিতাকে ঘুমন্ত অবস্থায় বিবস্ত্র অবস্থায় দেখেও তার সতর আবৃত করে দেননি। পরে তার অপর দু'ভাই তা আবৃত করে দেন। এজন্য নূহ (আ) তার জন্য এ বদ দু'আ করেন, যেন তার শুক্রের বিকৃতি ঘটে এবং তার সন্তানগণ যেন তার ভাইদের দাস হয়ে থাকে।

ইমাম আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ হাওয়ারীগণ ঈসা ইব্‌ন মরিয়মকে বললেন, নূহ (আ)-এর নৌযানে ছিলেন এমন একজন লোককে আপনি আমাদের জন্য যদি পুনর্জীবিত করে দিতেন তাহলে তার কাছে আমরা নূহ (আ)-এর নৌযানের বিবরণ শুনতে পেতাম। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, ফলে ঈসা (আ) তাদেরকে নিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে একটি মাটির ঢিবির নিকট উপনীত হন এবং তা থেকে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে বললেন, তোমরা কি জান এগুলো কি? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। ঈসা (আ) বললেন, এ হলো নূহ-এর পুত্র হাম-এর পায়ের গিঁট। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তারপর তিনি হাতের লাঠি দ্বারা ঢিবিতে আঘাত করে বললেন, আল্লাহর আদেশে উঠে দাঁড়াও। সঙ্গে সঙ্গে তিনি (হাম ইব্‌ন নূহ) মাথা থেকে ধুলা-বালি ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চুল পাকা দেখে ঈসা (আ) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি এ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছিলেন? জবাবে হাম বললেন ঃ না, বরং যুবক অবস্থায়ই আমার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু আমি ধারণা করেছিলাম, এ বুঝি কিয়ামত তাতেই আমার চুল পেকে যায়।

ঈসা (আ) বললেন, আমাদেরকে নূহের নৌকার একটি বিবরণ দিন তো! জবাবে তিনি বললেন ঃ তার দৈর্ঘ ছিল এক হাজার দু'শ হাত আর প্রস্থ ছিল ছয়শ হাত। এটি ছিল তিনতলা বিশিষ্ট। একতলায় ছিল জীব-জানোয়ার ও হিংস্র পশ্বাদি। একতলায় মানুষ এবং আরেক তলায় পাখি। জীব-জানোয়ারের মল অধিক হয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা নূহ (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করলেন যে, তুমি হাতীর লেজটা উঁচিয়ে ধর। তিনি তা-ই করলেন। ফলে তার মধ্য থেকে একটি শূকর ও একটি শূকরী বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে তারা মল খেতে শুরু করে। আবার ইঁদুর যখন নৌকা ছিদ্র করতে শুরু করে দেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা নূহ-এর প্রতি প্রত্যাদেশ করেন যে, তুমি সিংহের দু'চক্ষুর মাঝখানে আঘাত কর। তিনি তাই করলেন। ফলে তার নাকের ছিদ্র থেকে একটি বিড়াল এ একটি বিড়ালী বের হয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে ইঁদুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তখন ঈসা (আ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, নূহ (আ) কিভাবে জানতে পেরেছিলেন যে, গোটা পৃথিবী নিমজ্জিত হয়ে গেছে? হাম বললেন ঃ সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি একটি কাক প্রেরণ করেছিলেন। কাকটি একটি মড়া দেখতে পেয়ে তা খেতে আরম্ভ করে। এ জন্য নূহ (আ) তার জন্য বদ দু'আ করেন, যেন সে সর্বদা ভীত থাকে। এ কারণেই কাক ঘড়-বাড়িতে থাকে না। তারপর তিনি কবুতর প্রেরণ করেন। কবুতরটি ঠোঁটে করে একটি যয়তুন পাতা এবং পায়ে করে কিছু কাদা মাটি নিয়ে আসে। এতে নূহ (আ) বুঝতে পারলেন যে, সমগ্র ভূ-ভাগ নিমজ্জিত হয়ে গেছে। তখন তিনি তার গলায় একটি সবুজ বেষ্টনী দিয়ে দেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন, যেন সে লোকালয়ে ও নিরাপদে থাকতে পারে। তখন থেকেই কবুতর ঘরে থাকতে শুরু করে।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তারপর হাওয়ারীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! একে আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে নিয়ে যাব কি? এ আমাদের সঙ্গে বসে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলবেন! ঈসা (আ) বললেন, এমন ব্যক্তি কিভাবে তোমাদের অনুগমন করবে যার রিযিক অবশিষ্ট নেই! ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, তারপর ঈসা (আ) বললেন, আল্লাহর আদেশে আপনি পূর্বাবস্থায় ফিরে যান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে রূপান্তরিত হয়ে যান। এটি একান্তই একটি 'গরীব' পর্যায়ের বর্ণনা।

আলবা ইব্‌ন আহমার ইকরিমা (রা) সূত্রে এবং তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নৌকায় নূহ (আ)-এর সঙ্গে আশিজন পুরুষ এবং তাঁদের পরিবার-পরিজন ছিলেন। নৌকায় তাঁরা একশ পঞ্চাশ দিন অবস্থান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে নৌকাটি মক্কা অভিমুখী করে দেন। ফলে তা বায়তুল্লাহ্‌র চতুষ্পার্শ্বে চল্লিশ দিন যাবত ঘুরতে থাকে। তারপর তাকে জূদীর দিকে ফিরিয়ে দিলে তথায় গিয়ে তা স্থিত হয়। তখন নূহ (আ) পৃথিবীর সংবাদ সংগ্রহের জন্য একটি কাক প্রেরণ করেন। কাকটি গিয়ে একটি মড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এতে তার ফিরতে বিলম্ব হয়ে যায়। ফলে নূহ (আ) এবার একটি পায়রা প্রেরণ করেন। পায়রা তার দু'পায়ে কাদা মাটি মাখা অবস্থায় একটি যয়তুন পাতা নিয়ে ফিরে আসে। এতে নূহ (আ) বুঝতে পারলেন যে, পানি নেমে গিয়েছে। তাই তিনি জূদী পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসেন এবং একটি পল্লী নির্মাণ করে তার আশিটি নামকরণ করে দেন। ফলে হঠাৎ একদিন তাদের মুখের বুলি আশিটি ভাষায় পরিণত হয়ে যায়। তার একটি হলো আরবী। তখন তাঁরা কেউ কারো ভাষা বুঝত না। নূহ (আ) একজনের কথা অপরজনকে বুঝিয়ে দিতেন।

কাতাদা (র) প্রমুখ বলেন, রজব মাসের দশম তারিখে তাঁরা নৌকায় আরোহণ করে একশ' পঞ্চাশ দিন ভ্রমণ করেন এবং জূদীর উপর স্থিত অবস্থায় তাদের নিয়ে নৌকাটি একমাস অবস্থান করে। আর মুহাররম মাসের আশুরা দিবসে তাঁরা নৌকা থেকে বেরিয়ে আসেন। ইব্‌ন জারীর (র) এর সমর্থনে একটি মারফূ হাদীসও বর্ণনা করেছেন। আর সেদিন তাঁরা রোযাও রেখেছিলেন।

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন কতিপয় ইহুদীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন। তাঁরা সেদিন আশুরার দিবসের রোযা রেখেছিল।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কিসের রোযা? তাঁরা বলল, সেই দিন যেদিন আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে উদ্ধার করেন এবং ফিরআউন ডুবে মরে। আর এদিনে (নূহ আ-এর) নৌকা জূদী পর্বতে স্থিত হয়। ফলে নূহ ও মূসা (আ) আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ রোযা রেখেছিলেন। একথা শুনে নবী করীম (সা) বললেন, "মূসা (আ)-এর উপর আমার হকই বেশি এবং এদিনে রোযা রাখার আমিই বেশি হকদার। আর সাহাবাদেরকে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যকার যারা আজ রোযা রেখেছে, তারা যেন তা পূর্ণ করে আর যারা খাদ্য গ্রহণ করেছে তারা যেন দিনের বাকি অংশে পানাহার না করে। সহীহ্ বুখারীতে অন্য সূত্রে হাদীসের সমর্থন রয়েছে। তবে এ প্রসঙ্গে নূহ (আ)-এর উল্লেখ গরীব পর্যায়ের।

পক্ষান্তরে, বেশ কিছু মূর্খ লোক এ কথা বর্ণনা করে থাকে যে, সেদিন তাঁরা তাঁদের সঙ্গে থাকা খাদ্য-দ্রব্যের অবশিষ্ট টুকু এবং শস্যাদি পিষে খেয়েছিলেন এবং নৌকার অন্ধকারে থাকার দরুন হ্রাসপ্রাপ্ত দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য সুরমা ব্যবহার করেছিলেন, এর কোনটিই সঠিক নয়। এসবই হলো বনী ইসরাঈল সূত্রে বর্ণিত ভিত্তিহীন কথা, যার উপর মোটেই নির্ভর করা যায় না এবং যার অনুসরণ করা চলে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন সে প্লাবন বন্ধ করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি ভূ-পৃষ্ঠের উপর এক ধরনের বায়ু প্রেরণ করেন। এতে পানি শান্ত হয়ে যায় ও পৃথিবীর ঝরনাসমূহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পানি হ্রাস পেতে শুরু করে। তাওরাতওয়ালাদের ধারণা মতে, নৌকার স্থিতি ছিল রজবের আঠার তারিখে এবং শাওয়ালের প্রথম তারিখে পর্বতসমূহের চূড়া দৃষ্টিগোচর হয়। এরপর চল্লিশদিন অতিবাহিত হওয়ার পরে নূহ (আ) নৌকার বাতায়ন খুলে ফেলেন। তারপর পানির অবস্থা দেখে আসার জন্য একটি কাক প্রেরণ করেন। কিন্তু সে আর ফিরে না আসায় তিনি একটি কবুতর প্রেরণ করেন। কবুতর এ সংবাদ নিয়ে ফিরে আসে যে, সে পা রাখার এতটুকু স্থানও পায়নি। নূহ (আ) হাত পেতে কবুতরটি ধরে নৌকায় ঢুকিয়ে রাখেন।

এরপর আরও সাতদিন অতিক্রান্ত হলে পানির অবস্থা দেখে আসার জন্য তিনি আবারও কবুতরটি প্রেরণ করেন। কিন্তু এবার আর সে সহসা ফিরে আসল না। সন্ধ্যার সময় পায়রাটি একটি যয়তূন পাতা মুখে করে ফিরে আসে। এতে নূহ (আ) বুঝতে পারলেন যে, এবার ভূপৃষ্ঠ থেকে পানি নেমে গেছে। এরপর আরো সাতদিন অবস্থান করে তিনি পায়রাটিকে আবারো প্রেরণ করেন। কিন্ত এবার সে আর তার নিকট ফিরে যায়নি। এতে নূহ (আ) বুঝতে পারলেন যে, এবার পানি শুকিয়ে গেছে। মোটকথা, আল্লাহ তা'আলার প্লাবন প্রেরণ এবং নূহ (আ)-এর কবুতর প্রেরণের মাঝে এক বছর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বছরের প্রথম তারিখ শুরু হলে ভূ-পৃষ্ঠ প্রকাশ পায় ও স্থলপথ আত্মপ্রকাশ করে এবং নূহ (আ) নৌকার ঢাকনা উন্মুক্ত করেন। ইব্ন ইসহাকের এ বর্ণনা হুবহু আহলি কিতাবদের হস্তস্থিত তাওরাতের বিবরণের অনুরূপ।

ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, পরবর্তী বছরের দ্বিতীয় মাসের ছাব্বিশ তারিখে বলা হলো ঃ

يَا نُوحُ اهْبِطْ مِنْهَا بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّنْ مَّعَكَ.
وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ.

অর্থাৎ– হে নূহ! অবতরণ কর আমার দেয়া শান্তিসহ এবং তোমার প্রতি ও যে সমস্ত সম্প্রদায় তোমার সঙ্গে আছে তাদের প্রতি কল্যাণসহ, অপর সম্প্রদায়সমূহকে জীবন উপভোগ করতে দেব, পরে আমার পক্ষ থেকে মর্মন্তুদ শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে। (১১ ঃ ৪৮)

আহলে কিতাবদের বর্ণনা মতে, আল্লাহ তা'আলা নূহ (আ)-এর সঙ্গে এ বলে কথা বলেছিলেন যে, তুমি, তোমার স্ত্রী, তোমার পুত্রগণ, তোমার পুত্রবধুগণ এবং তোমার সঙ্গে সকল প্রাণী নিয়ে নৌকা থেকে বের হয়ে পড়। যাতে তারা পৃথিবীতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে তারা বেরিয়ে যায় এবং নূহ (আ) আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশে পশু জবাই করার স্থান নির্ধারণ করেন এবং সকল প্রকার হালাল জীব-জানোয়ার ও হালাল পক্ষীকুল থেকে কিছু কিছু নিয়ে কুরবানী করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি পুনরায় পৃথিবীবাসীর উপর (এরূপ) প্লাবন আর দিবেন না এবং এ প্রতিশ্রুতির নিদর্শনস্বরূপ মেঘের মধ্যে ধনুক স্থাপন করে রেখেছেন যাকে রঙধনু বলা হয়। ইতিপূর্বে ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, রঙধনু হলো নিমজ্জিত হওয়া থেকে নিরাপত্তাস্বরূপ। মোটকথা, মেঘের মধ্যে এ ছিলাবিহীন রঙধনু স্থাপন করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ মেঘমালা থেকে প্রথমবারের ন্যায় আর প্লাবন হবে না।

পারস্য দেশীয় ও ভারত উপমহাদেশীয় কিছু সংখ্যক মূর্খ লোক প্লাবনের কথা অস্বীকার করেছে। আবার তাদেরই কেউ কেউ তা স্বীকার করে বলেছে যে, প্লাবন হয়েছিল বাবেল ভূখণ্ডে, আমাদের অঞ্চল পর্যন্ত তা পৌঁছেনি। তাদের দাবি হলো, কাইউমার্স তথা আদম (আ) থেকে এ পর্যন্ত পুরুষাণুক্রমে আমরা এদেশের উত্তরাধিকার ভোগ করে আসছি। এসব হলো অগ্নিপূজারী মজূসী ও শয়তানের অনুচর ধর্মদ্রোহীদের উক্তি।

এ হলো ভিত্তিহীন বাজে ধারণা, জঘন্য কুফরী ও চরম অজ্ঞতা এবং বাস্তবতার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন, আসমান-যমীনের রবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর। অথচ সর্বকালের সর্ব ধর্মের সকলে প্লাবন সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে একমত। আর এ ব্যাপারেও তাদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই যে, তা হয়েছিল বিশ্বব্যাপী এবং নূহ নবীর দু'আ এবং তাকদীরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের একটি প্রাণীকেও অবশিষ্ট রাখেননি।

নূহ (আ) সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا। "নিশ্চয়ই সে ছিল এক পরম কৃতজ্ঞ বান্দা।" কেউ কেউ বলেন, নূহ (আ) পানাহার ও পোশাক পরিধানসহ সকল কাজেই আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করতেন।[১]

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা সে বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে খাদ্য খেয়ে কিংবা পানীয় পান করে তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপন করে।" এভাবে ইমাম মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, আবূ উসামা (রা) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

---

১. গোটা সূরাটির অনুবাদ ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছে। - সম্পাদক

বলাবাহুল্য যে, شكور সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে যাবতীয় ইবাদত পালন করে অন্তর, রসনা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা। কারণ শোকর আদায় এসব পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। যেমন কবি বলেন ঃ

افادتكم النعماء مني ثلاثة - يدى ولسانى والضمير المحجبا

অর্থাৎ– আমার পক্ষ থেকে তিনটি নিয়ামত তোমাদেরকে উপকৃত করেছে। আমার হাত, আমার রসনা ও আমার সে হৃদয় যা দৃশ্যমান নয়।

নূহ (আ)-এর সাওম পালন

ইব্‌ন মাজাহ্ (র) নূহ (আ)-এর রোযা অধ্যায়ে বলেছেন যে, আবূ ফিরাস (র) বলেন, তিনি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি যে, নূহ (আ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাঁর দিন ব্যতীত সারা বছর সাওম পালন করতেন। এভাবে ইব্‌ন মাজাহ্ (র) অন্য সূত্রে এবং অন্য পাঠেও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নূহ (আ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ব্যতীত সারা বছর, দাঊদ (আ) বছরের অর্ধেক এবং ইবরাহীম (আ) প্রতি মাসে তিনদিন করে রোযা রাখতেন। 'সারা বছর রোযা, সারা বছর রোযাবিহীন।'

নূহ (আ)-এর হজ্জ

হাফিজ আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) হজ্জ করেন। এক পর্যায়ে তিনি উসফান উপত্যকায় এসে উপনীত হলে বললেন, আবূ বকর! এ কোন্ উপত্যকা? আবূ বকর (রা) বললেন, এ হলো উসফান উপত্যকা। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এ প্রান্তর দিয়ে নূহ (আ), হূদ (আ) ও ইবরাহীম (আ) তাঁদের লাল রঙের জওয়ান উটনীতে চড়ে অতিক্রম করেছেন। ওগুলোর লাগাম ছিল খেজুর গাছের ছালের তৈরি। তাদের পরনে তখন থাকতো চোগা ধরনের লুঙ্গি এবং গায়ে থাকতো চিত্র-বিচিত্র চাদর। তাঁরা আদিঘর কা'বায় হজ্জ পালন করতেন। বর্ণনাটি গরীব পর্যায়ের।

পুত্রের প্রতি নূহ (আ)-এর উপদেশ

ইমাম আহমদ (র) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বলেন, আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময়ে রেশমের ঘুণ্ডিযুক্ত পাড়বিশিষ্ট (অর্থাৎ অতি উন্নতমানের) জুব্বা পরিহিত এক বেদুঈন তথায় আগমন করে। এসে সে বলল, তোমাদের সঙ্গীটি অশ্বারোহীর পুত্র অশ্বারোহীদেরকে (অর্থাৎ বংশগত সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে) হীন করেছে আর রাখালের বাচ্চা রাখালদেরকে (অর্থাৎ বংশতগত নীচ লোকরেদকে) উপরে তুলে দিয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন ঃ একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) তার জুব্বা চেপে ধরে বললেন, তোমার গায়ে তো আমি নির্বোধের পোশাক দেখছি না! তারপর তিনি বললেন, ওফাতের সময় আল্লাহর নবী নূহ (আ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। তোমাকে আমি

দু'টি কাজ করার আদেশ দিচ্ছি এবং দুটি কাজ করতে নিষেধ করছি। তোমাকে আমি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর আদেশ দিচ্ছি। কারণ, সাত আসমান ও সাত যমীনকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে সাত আসমান ও সাত যমীনের চাইতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর পাল্লাটি ভারী হবে। আর যদি সাত আসমান ও সাত যমীন একটি খোলা মুখ আংটা হয় আর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী সে খোলা মুখ চাপ প্রয়োগে বন্ধ করতে চায়; তবে সে তা পারবে, কারণ সবকিছুর সংযুক্তি এর দ্বারাই হয়ে থাকে এবং এর উসিলায়ই সৃষ্টি জগতের সকলের জীবিকা প্রদান করা হয়ে থাকে। আর আমি তোমাকে শির্‌ক ও অহঙ্কার থেকে বারণ করছি।

বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে আমি বা অন্য কেউ একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! শির্‌ক কি তাতো আমরা জানি। কিন্তু অহংকার জিনিসটা কি? এই যে আমাদের কারো সুন্দর ফিতা যুগল বিশিষ্ট সুন্দর এক জোড়া জুতা থাকা কি অহংকার? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, না। বলেন, তাহলে কি উন্নতমানের পোশাক পরিধান করা অহংকার? আল্লাহর রাসূল বললেন, না। প্রশ্নকারী বললেন, তাহলে কি আরোহণের পশু থাকা? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না। প্রশ্নকারী আবার বললেন, তা হলে কারো একাধিক সঙ্গী-সাথী থাকা, যারা তার নিকট এসে বসে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, না। অবশেষে আমি বললাম কিংবা বলা হলো, তাহলে অহংকার কি হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ سفه الحق وغمض الناس অর্থাৎ— সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে হেয় জ্ঞান করা।

এ হাদীসটির সনদ যদিও সহীহ্, সিহাহ্ সিত্তার সংকলকগণ তা বর্ণনা করেননি।

আবুল কাসিম তাবারানী (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ পুত্রের প্রতি নূহ (আ)-এর উপদেশের মধ্যে এও ছিল যে, আমি তোমাকে দুটি স্বভাব অবলম্বন করার আদেশ দিচ্ছি এবং দু'টি স্বভাব থেকে তোমাকে বারণ করছি .....।

আবূ বকর, বায্‌যার ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীসটি হুবহু বর্ণনা করেছেন। তবে প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন আস (রা) থেকে বর্ণিত। যেমন আহমদ তাবারানী (র) তা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আহলে কিতাবগণ মনে করেন যে, নূহ (আ) যখন নৌকায় আরোহণ করেন; তখন তাঁর বয়স ছিল ছ'শ বছর। ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে পূর্বে আমরা এরূপ একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছি। তারপর তিনি তিনশ পঞ্চাশ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এ বক্তব্যে আপত্তি রয়েছে। তাছাড়া এ অভিমত ও কুরআনের প্রতিপাদ্যের মাঝে যদি সমন্বয় সাধন করা সম্ভব না হয়; তাহলে আহলে কিতাবদের অভিমতটি স্পষ্টতই ভ্রান্ত। কেননা কুরআন প্রমাণ করে যে, নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে নবুওতের পর ও প্লাবনের পূর্বে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিলেন। তারপর প্লাবন তাদেরকে পাপাচারী হিসাবে গ্রাস করে। তারপর তিনি কতকাল বেঁচেছিলেন তা আল্লাহই ভালো জানেন। নবুওত প্রাপ্তির সময় তাঁর বয়স ছিল চার শ'

আশি বছর এবং প্লাবনের পর তিনি তিনশ' পঞ্চাশ বছর বেঁচেছিলেন। এ মর্মে ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তথ্যটি যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে বলা যায় যে, তিনি এক হাজার সাতশ' আশি বছর আয়ু পেয়েছিলেন।

এদিকে নূহ (আ)-এর কবর সম্পর্কে ইব্ন জারীর ও আযরাকী আবদুর রহমান ইব্ন সাবিত থেকে বা অন্য কোন তাবেয়ী সূত্রে মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, নূহ (আ)-এর কবর হলো মসজিদুল হারামে। এ অভিমতটি সে অভিমত অপেক্ষা বেশি শক্তিশালী ও সুপ্রমাণিত যা পরবর্তী যুগের বেশ কিছু আলিম উল্লেখ করেন যাতে বলা হয়ে থাকে যে, নূহ (আ)-এর কবর সে ভূখণ্ডে অবস্থিত বর্তমানে যা 'কারক্-ই-নূহ' নামে পরিচিত এবং সেখানে তাঁর কবরকে কেন্দ্র করেই একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

হযরত হূদ (আ)-এর কাহিনী

হযরত হূদ (আ)-এর বংশ লতিকা হচ্ছে ঃ (১) হূদ ইব্ন শালিখ ইব্ন আরফাখশায ইব্ন সাম ইব্ন নূহ (আ); মতান্তরে হূদ—যার নাম ছিল আবির ইব্ন আরফাখশায ইব্ন সাম ইব্ন নূহ (আ)। অন্য মতে, হূদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইবন রাবাহ্ ইব্নুল-জারূদ ইব্ন আয ইব্ন আওস ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ (আ)। ইতিহাসবেত্তা ইবন জারীর (র) এই মতভেদের কথা উল্লেখ করেছেন। হূদ-এর গোত্রের নাম আদ (ইব্ন আওস ইব্ন সাম ইব্ন নূহ)। তারা ছিল আহ্কাফ অর্থাৎ বালুর টিবিপূর্ণ এলাকার অধিবাসী, যা ইয়ামানের ওমান ও হাজরা মাওতের টিলা অঞ্চলে অবস্থিত। এটি ছিল শাহ্র জলাশয়ের তীরবর্তী বসতি এলাকা। তাদের উপত্যকার নাম ছিল মুগীছ। উঁচু উঁচ খুঁটির উপর তাঁবু খাটিয়ে তারা বসবাস করত।

কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ .

অর্থাৎ—তুমি কি দেখনি, তোমার প্রতিপালক কি করেছিলেন, আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি—যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের (সূরা ফাজর ৬-৭)। এই আদ বংশ আদে ইরাম বা আদে উলা বলে পরিচিত। আদে সানী বা দ্বিতীয় আদ বংশের উদ্ভব হয় পরবর্তীকালে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে।

আদে উলা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ . الَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ .

অর্থাৎ—সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী ইরাম গোত্র, যার সমতুল্য কোন দেশে বানান হয়নি। (সূরা ফাজর ঃ ৬-৮)

এখানে দু'রকম অর্থ হতে পারে—এক, এই ইরাম বংশের সমতুল্য বংশ ইতিপূর্বে কখনও আসেনি। দুই, এদের প্রাসাদের ন্যায় সুউচ্চ প্রাসাদ ইতিপূর্বে কোথাও নির্মিত হয়নি। তবে প্রথম অর্থই সঠিক। তাফসীর গ্রন্থে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

যাদের ধারণা, ইরাম একটা ভ্রাম্যমাণ শহর—কখনও সিরিয়া, কখনও ইয়ামানে, কখনও হেজাজে, কখনও বা অন্য কোথাও এর অবস্থান হয়েছে। তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক ও অমূলক। সহীহ ইব্ন হিব্বান গ্রন্থে হযরত আবূ যর (রা) থেকে নবী-রাসূলগণের বর্ণনা প্রসংগে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে নবী করীম (সা) বলেন ঃ এঁদের মধ্যে আরব বংশোদ্ভূত নবী চারজন ঃ হূদ, সালিহ, শু'আয়ব এবং তোমার নবী হে আবূ যর! কেউ কেউ

বলেছেন, হূদ (আ)-ই সর্ব প্রথম আরবী ভাষায় কথা বলেন। পক্ষান্তরে ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র)-এর মতে, হূদের পিতাই প্রথমে আরবী ভাষায় কথা বলেছিলেন। কারো কারো মতে, হযরত নূহ (আ) প্রথমে আরবীতে কথা বলেন। কেউ কেউ সর্বপ্রথম আরবী ভাষীরূপে হযরত আদম (আ)-এর নাম উল্লেখ করেছেন আর এটাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত। এ ক্ষেত্রে ভিন্ন মতেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পূর্বকালের আরববাসীদেরকে 'আরাবুল আরিবা' বলা হয়। এরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। যথা 'আদ, ছামূদ, জুরহাম, তাসাম, জুদায়স, উমায়স, মাদয়ান, আমলাক, আবীল, জাসিম, কাহ্তান, বানূ-ইয়াকতান ইত্যাদি।

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধরদেরকে 'আরাবুল-মুসতা'রাবা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। হযরত ইসমাঈল (আ) সর্বপ্রথম উচ্চাংগের প্রাঞ্জল আরবী ভাষা ব্যবহার করেন। হারম শরীফ এলাকায় ইসমাঈল (আ)-এর আম্মা হাজেরার আশে-পাশে বসবাসকারী জুরহাম গোত্রের লোকজনের কাছ থেকে শিশু ইসমাঈল এই ভাষা শিখেছিলেন যার বর্ণনা পরে আসছে। তবে আল্লাহ তাঁকে সর্বোচ্চ মানের ভাষা-জ্ঞান দান করেছিলেন। আর এ ভাষায়ই রাসূলুল্লাহ (সা) কথা বলতেন।

হযরত নূহ নবীর মহা প্লাবনের পরে আদে উলা সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা আরম্ভ করে। তাদের মূর্তি ছিল তিনটা (১) সাদদা, (২) সামূদা ও (৩) হাররা। আল্লাহ তাদের মাঝে হূদ (আ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। যেমন সূরা আ'রাফে নূহ (আ)-এর কাহিনী শেষে আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ. أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ. فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ.

অর্থাৎ— 'আদ জাতির কাছে তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই, তোমরা কি সাবধান হবে না? তার সম্প্রদায়ের কাফির সর্দারগণ বলেছিল, আমরা তো দেখছি তুমি নির্বুদ্ধিতায় ডুবে রয়েছ আর তোমাকে তো আমরা মিথ্যাবাদী মনে করি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোন নির্বুদ্ধিতা নেই, আমি তো রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল। আমি আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজনের মাধ্যমে তোমাদেরকে সতর্ক করার জন্যে উপদেশ বাণী এসেছে? আর স্মরণ কর যে, আল্লাহ তোমাদেরকে নূহের সম্প্রদায়ের পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের অবয়বে অন্যলোক অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করেছেন। অতএব, তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। হয়ত তোমরা সফলকাম হবে।

তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এ উদ্দেশ্যে এসেছ যে, আমরা যেন শুধু এক আল্লাহর ইবাদত করি আর আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যাদের উপাসনা করত তা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে জিনিসের ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো! সে বলল, তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তো তোমাদের জন্যে শাস্তি ও গযব নির্ধারিত হয়েই আছে ; তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতগুলো (দেব-দেবীর) নাম সম্বন্ধে যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ সৃষ্টি করেছ! আল্লাহ এ সম্বন্ধে কোন সনদ পাঠাননি। সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। তারপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদেরকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করি; আর যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং মুমিন ছিল না তাদেরকে নির্মূল করেছিলাম। (সূরা আ'রাফ ঃ ৬৫-৭২)

সূরা হূদে নূহের কাহিনী শেষে আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا. قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُوْنَ. يَا قَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِيْ. أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ. قَالُوْا يَا هُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ.

إِنْ نَقُوْلُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوْءٍ. قَالَ إِنِّيْ أُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْا أَنِّيْ بَرِيْءٌ مِمَّا تُشْرِكُوْنَ. مِنْ دُوْنِهِ فَكِيْدُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ. إِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ. مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيْ

عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا . إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ.

وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَّالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ. أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ.

অর্থাৎ—'আদ জাতির প্রতি তাদের ভাই হূদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তোমরা তো কেবল মিথ্যা রচনাকারী। হে আমার সম্প্রদায়! এ জন্যে কোন পারিশ্রমিক আমি তোমাদের কাছে চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো তাঁরই কাছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি তবুও অনুধান করবে না? হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও। তারপর তাঁর দিকেই ফিরে এস। তিনি তোমাদের জন্যে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং আরও শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি করে দেবেন। অপরাধী হয়ে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না।

তারা বলল, হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসনি। তোমার কথায়ই আমরা আমাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করার নই। আর আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাসী নই। আমরা তো এটাই বলি যে, তোমার উপর আমাদের কোন উপাস্যের অশুভ নজর পড়েছে। হূদ বলল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আল্লাহ ছাড়া তোমরা আর যেসব শরীক বানিয়ে রেখেছ সে সবের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তোমরা সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাও এবং আমাকে মোটেই অবকাশ দিও না। আমি নির্ভর করি আল্লাহর উপর, যিনি আমার এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। কোন জীব-জন্তু এমন নেই যা তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নয়। নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক সরল পথে আছেন। তারপর তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলেও আমি যে পয়গামসহ তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলাম, তা আমি তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। এবং আমার প্রতিপালক ভিন্ন কোন সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। আর তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আমার প্রতিপালক নিশ্চয়ই সব কিছুর রক্ষণাবেক্ষণকারী।

পরে যখন আমার ফরমান এসে পৌঁছল, তখন আমি আমার রহমতের দ্বারা হূদকে এবং তার সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে রক্ষা করলাম এবং এক কঠিন আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করলাম। এই হল আদ জাতি, তারা তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে এবং তাঁর নবী-রাসূলগণকে অমান্য করেছিল এবং তারা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর

অনুসরণ করত। এই দুনিয়ায়ও তাদের উপর লা'নত হয়েছিল। আর তারা কিয়ামতের দিনও লা'নতগ্রস্ত হবে। জেনে রেখ, 'আদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রেখ, ধ্বংসই হলো হূদের সম্প্রদায় আদের পরিণাম। (সূরা হূদ ঃ ৫০-৬০)

সূরা المؤمنون এ নূহের জাতির কাহিনী শেষে আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. أَفَلَا تَتَّقُونَ. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ.

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ. قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً. فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.

অর্থাৎ—তারপর তাদের পরে অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিলাম এবং তাদেরই একজনকে তাদের প্রতি রাসূল করে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা কুফরী করেছিল ও আখিরাতের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করছিল এবং যাদেরকে আমি পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার দান করেছিলাম তারা বলেছিল ঃ এতো তোমাদের মত একজন মানুষই। তোমরা যা খাও, সেও তাই খায়, আর যা তোমরা পান কর, সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সে কি তোমাদের এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অসম্ভব। একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি-বাঁচি এখানেই। আর কখনও আমরা পুনরুত্থিত হব না। সে তো এমন এক ব্যক্তি, যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা কখনই তাকে বিশ্বাস করব না। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর; কারণ এরা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে।

আল্লাহ্ বললেন, অচিরেই এরা অনুতপ্ত হবেই। তারপর সত্য সত্যই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করল এবং আমি তাদেরকে তরংগ তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করেছিলাম। সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল জালিম সম্প্রদায়। (সূরা মু'মিনূন ঃ ৩১-৪১)

সূরা শু'আরায় নূহের কাহিনী শেষে আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَذَّبَتْ عَادُ نِ الْمُرْسَلِيْنَ. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلاَ تَتَّقُوْنَ. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ. فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ. وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ. اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ. وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ. وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ.

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ. وَاتَّقُوا الَّذِىْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ. اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ. وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ. اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ. قَالُوْا سَوَاۤءٌ عَلَيْنَاۤ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ. اِنْ هٰذَاۤ اِلاَّ خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ. فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

অর্থাৎ—আদ সম্প্রদায় নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে। যখন তাদের ভাই হূদ (আ) তাদেরকে বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তোমাদের জন্যে একজন বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এ জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো রাব্বুল আলামীনের কাছে আছে। তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানেই অর্থহীনভাবে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করছ? আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে? আর যখন তোমরা আঘাত হান, তখন তোমরা আঘাত হেনে থাক কঠোরভাবে।

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে সেই সব কিছুই দিয়েছেন যা তোমরা জান। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন জন্তু-জানোয়ার, সন্তান-সন্ততি, বাগ-বাগিচা এবং প্রস্রবণ। তোমাদের ব্যাপারে আমি এক মহাদিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি। তারা জবাব ছিল, তুমি নসীহত কর আর নাই কর, আমাদের জন্যে সবই সমান। এসব তো পূর্ববর্তীদেরই স্বভাব। আর আমরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবার লোক নই। তারপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল এবং আমরা তাদেরকে ধ্বংস করলাম। নিঃসন্দেহে এতে একটি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মুমিন নয়। এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো প্রবল পরাক্রমশালী এবং পরম দয়ালুও। (সূরা শু'আরা ঃ ১২৩-১৪০)

সূরা হা-মীম-আস্ সাজদায় আল্লাহর বাণী ঃ

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً . وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا

يَجْحَدُوْنَ . فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا. وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ.

অর্থাৎ— আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করত এবং বলত আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? তারা অশুভ দিনসমূহে কি লক্ষ্য করেনি যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী? আর তারা আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করত। তারপর আমি তাদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি-আস্বাদন করানোর জন্যে তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া তাদের উপর পাঠিয়েছিলাম। এবং পরকালের আযাব তো এ থেকেও অধিক লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ১৫-১৬)

সূরা আহকাফে আল্লাহর বাণী ঃ

وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ. اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ. اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ. قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ. فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا. بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ. كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ.

অর্থাৎ— স্মরণ কর, আদ-এর ভাই-এর কথা। যার পূর্বে এবং পরেও সতর্ককারীরা এসেছিল। সে তার আহকাফ বা বালুকাময় উচ্চ উপত্যকার অধিবাসী সম্প্রদায়কে এ মর্মে সতর্ক করেছিল যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কারো ইবাদত করো না। আমি তোমাদের ব্যাপারে এক ভয়াবহ দিনের আযাবের আশংকা করছি। তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের উপাস্য দেব-দেবীদের থেকে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে ব্যাপারে ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে আস।

সে বলল, এর জ্ঞান তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে, আমি যাসহ প্রেরিত হয়েছি কেবল তাই তোমাদের কাছে প্রচার করি। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা একটি মূর্খ সম্প্রদায়। পরে তারা যখন তাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল, তখন তারা বলতে লাগল—এতো মেঘপুঞ্জ, আমাদেরকে বৃষ্টি দিবে। না, বরং এটা তো তাই যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তিবাহী এক ঝড়। তার প্রতিপালকের নির্দেশে সে সবকিছু ধ্বংস করে দেবে। তারপর তারা এমন হয়ে গেল যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই রইলো না। বস্তুত অপরাধী সম্প্রদায়কে আমি এমনিভাবে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা আহকাফ ঃ ২১-২৫)

সূরা যারিয়াতে আল্লাহর বাণী ঃ

وَفِىْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ. مَا تَذَرُ مِنْ شَىْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ.

অর্থাৎ—আর নিদর্শন রয়েছে আদ জাতির ঘটনায়। যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম অকল্যাণকর বায়ু তা যে জিনিসের উপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল তাই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। (সূরা যারিয়াত ঃ ৪১-৪২)

সূরা নাজমে আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَنَّهُ اَهْلَكَ عَادَنِ الْاُوْلٰى وَثَمُوْدَ فَمَا اَبْقٰى. وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى. وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى. فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى. فَبِاَىِّ اٰلاَءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى.

অর্থাৎ।প্রথম আদকে তিনিই ধ্বংস করেছেন। এবং ছামূদ সম্প্রদায়কেও।কাউকেও তিনি বাকি রাখেননি। আর তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়কেও। ওরা ছিল অতিশয় জালিম ও অবাধ্য। উৎপাটিত আবাসভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। ওটাকে আচ্ছন্ন করে নিল কী সর্বগ্রাসী শাস্তি! তবে তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে? (সূরা নাজম ঃ ৫০-৫৫)

সূরা কামারে আল্লাহর বাণী ঃ

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ. اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ. تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.

অর্থাৎ— আদ সম্প্রদায় সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে কী কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! ওদের উপর আমি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা-বায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে। মানুষকে তা উৎখাত করেছিল। উন্মূলিত খেজুর কাণ্ডের মত। কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরা কামার ঃ ১৮-২২)

সূরা আল-হাক্কায় আল্লাহর বাণী ঃ

وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعٰى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ.

অর্থাৎ—আর 'আদ সম্প্রদায়, ওদের ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-বায়ু দ্বারা যা তিনি ওদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে। তখন (উক্ত

সম্প্রদায়) দেখতে পেতে ওরা সেখানে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর কাণ্ডের মত। এরপর ওদের কাউকে তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি? (সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ৬-৯)

সূরা আল-ফাজরে আল্লাহর বাণী ঃ

اَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ اَلَّتِىْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى الْبِلَادِ . وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ . وَفِرْعَوْنَ ذِى الْاَوْتَادِ . اَلَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ . فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ . فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ . اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ .

অর্থাৎ—তুমি কি লক্ষ্য করনি, তোমার প্রতিপালক আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি করেছিলেন—যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি, এবং ছামূদের প্রতি—যারা উপত্যকায় পাথর কেটে ঘর নির্মাণ করেছিল এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরআউনের প্রতি—যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল এবং সেখানে প্রচুর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। এরপর তোমার প্রতিপালক ওদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। (সূরা আল-ফাজর ঃ ৭-১৪)

এসব কাহিনী আমরা আমাদের তাফসীর গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। আদ জাতির আলোচনা কুরআন মজীদের সূরা বারাআত, সূরা ইবরাহীম, সূরা ফুরকান, সূরা আনকাবূত, সূরা সা'দ ও সূরা কাফে করা হয়েছে। এ সকল স্থানের সামগ্রিক আলোচনার সাথে অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্য মিলিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করব। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আদ জাতিই নূহ (আ)-এর প্লাবনের পরে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার সূচনা করে। তাদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণী ঃ

وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ فِى الْخَلْقِ بَسْطَةً .

অর্থাৎ—এ কথা স্মরণ কর যে, নূহের সম্প্রদায়ের পরে আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদের অবয়বে অধিক শক্তি দান করেছেন। অর্থাৎ সমসাময়িক কালে তারাই ছিল দৈহিত গঠন ও শক্তিতে শ্রেষ্ঠ।

সূরা মুমিনূনে আল্লাহ বলেন ঃ ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ .

অর্থাৎ—তারপর আমি অন্য এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করলাম। (সূরা মুমিনূন ঃ ৩১)

সঠিক মতানুসারে এরা হল হূদ (আ)-এর সম্প্রদায়। তবে অন্যরা বলেন, এরা ছামূদ জাতি। প্রমাণস্বরূপ তাঁরা কুরআনের এ আয়াত পেশ করেন ঃ

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً .

অর্থাৎ— সত্যি সত্যি এক বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল এবং আমি তাদেরকে শুকনো ঘাসের মত করে দিলাম। এখানে তাদের বক্তব্য হল, যে জাতিকে বিকট শব্দের দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল, তারা ছিল সালিহ (আ)-এর সম্প্রদায়, ছামূদ জাতি। পক্ষান্তরে আদ জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ .

অর্থাৎ—আদ জাতিকে ভয়াবহ প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়। তাদের এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করার পরও বলা যেতে পারে যে, আদ জাতির উপর বিকট শব্দ ও প্রচণ্ড বায়ু উভয় প্রকার আযাবই অবতীর্ণ হয়েছিল, যেমন মাদয়ানবাসী তথা আইকার অধিবাসীদের উপর বিভিন্ন প্রকার আযাব পতিত হয়েছিল। আর এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য নেই যে, আদ জাতি ছিল ছামূদ জাতির পূর্বসূরি।

মোটকথা, আদ সম্প্রদায় ছিল একটি অত্যাচারী কাফির, বিদ্বেষী, দাম্ভিক ও মূর্তিপূজারী আরব গোষ্ঠী। আল্লাহ্ তাদের মধ্য থেকেই একজনকে তাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে নিষ্ঠার সাথে এক আল্লাহর ইবাদত করার প্রতি আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে এবং তার বিরুদ্ধাচার করে এবং তাকে হেয়প্রতিপন্ন করে। ফলে, প্রবল পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করেন। নবী যখন তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এবং এক আল্লাহর ইবাদত করতে বলেন এবং উদ্বুদ্ধ করেন, এর দ্বারা ইহকাল ও পরকালে পুরস্কার পাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন এবং বিরুদ্ধাচরণে দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি ভোগের ব্যাপারে সতর্ক করে দেন তখন ঃ

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِيْ سَفَاهَةٍ .

সম্প্রদায়ের কাফির সর্দাররা বলল, আমরা তো দেখছি তুমি নির্বোধ অর্থাৎ আমরা যে সব মূর্তির পূজা করি তার স্থলে তুমি আমাদেরকে যেদিকে আহ্বান করছ তা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা এদের থেকে সাহায্য ও রুটি-রুজির আশা করি। তা ছাড়া তোমার রাসূল হওয়ার দাবিকেও আমরা মিথ্যা বলে মনে করি। জবাবে নবী বললেন ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِىْ سَفَاهَةٌ وَّلٰكِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ.

হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই, বরং আমি রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল অর্থাৎ তোমরা যে ধারণা ও বিশ্বাস নিয়ে বসে আছ ব্যাপারটা ঠিক তা নয়।

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّيْ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِيْنٌ.

(আমি আমার প্রতিপালকের বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি আর আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী। (৭ আ'রাফ ঃ ৬৬-৬৮)। বার্তা পৌঁছানোর মধ্যে মিথ্যা বলার অবকাশ নেই, এক্ষেত্রে মূল বার্তায় হ্রাস-বৃদ্ধি করার কোন সুযোগ নেই।

তা ছাড়া কোন বার্তার ভাষা হয়ে থাকে প্রাঞ্জল, সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থ জ্ঞাপক। যা হয়ে থাকে দ্ব্যর্থহীন ও পরস্পর বিরোধিতা মুক্ত। বিতর্কের অবকাশ সেখানে থাকে না। এভাবে আল্লাহর বার্তা পৌঁছে দেয়ার পরও তিনি নিজ জাতিকে সদুপদেশ দেন, তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন, তাদের সৎপথ প্রাপ্তির জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। তিনি তাঁর এ কাজের জন্যে তাদের থেকে কোন বিনিময় বা পারিশ্রমিক কামনা করেননি। বরং তিনি দাওয়াতী কাজে ও উপদেশ বিতরণে একনিষ্ঠ ও অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। তিনি কেবল তাঁর প্রেরণকারী মাওলার কাছেই পুরস্কারের আশা করতেন, কেননা দুনিয়া ও আখিরাতের সর্ব প্রকার মঙ্গল তাঁরই হাতে ঃ

قَالَ يَاقَوْمِى لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى الَّذِىْ فَطَرَنِىْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

নবী বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের নিকট থেকে আমি কোন বিনিময় চাই না। আমার পুরস্কার তো রয়েছে তাঁরই কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি তবুও অনুধাবন করবে না? (সূরা হূদ ঃ ৫১)

অর্থাৎ তোমাদের কি এতটুকু বিবেক-বুদ্ধি নেই যার দ্বারা ভাল-মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করতে পার এবং এ কথা বুঝতে সক্ষম হও যে, আমি তোমাদের এমন এক সুস্পষ্ট সত্যের দিকে আহ্বান করছি তোমাদের স্বভাবধর্মই যার সত্যতার সাক্ষ্যবহ। এটাই সেই সত্য দীন যা আল্লাহ ইতিপূর্বে নূহের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন এবং এর বিরোধিতাকারীদের খতম করে দিয়েছিলেন। আর এখন আমি তোমাদেরকে সেদিকেই আহ্বান করছি এবং এর বিনিময়ে তোমাদের থেকে কিছুই চাই না, বরং কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক আল্লাহর কাছেই এর পুরস্কারের প্রত্যাশা রাখি। এ কারণেই সূরা ইয়াসীনে জনৈক মু'মিনের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে ঃ

اِتَّبِعُوْا مَنْ لَايَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ - وَمَالِىَ لَا اَعْبُدُ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ.

অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না, আর যাঁরা হিদায়াতপ্রাপ্ত। আমি কেন সেই সত্তার ইবাদত করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর ইবাদত করব না? হূদ নবীর সম্প্রদায় তাকে জবাব দিল ঃ

يَا هُوْدُ مَاجِئْتَنَابِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِىْ اٰلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ - اِنْ نَقُوْلُ اِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْءٍ.

হে হূদ! তুমি আমাদের কাছে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসনি, তোমার মুখের কথায়ই আমরা আমাদের উপাস্য দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করতে পারি না। আমরা তো তোমাকে বিশ্বাসই করি না। আমরা তো এটাই বলি যে, তোমার উপর আমাদের কোন উপাস্যের অশুভ দৃষ্টি পড়েছে। (সূরা হূদ ঃ ৫৩)

তারা বলত, হে হূদ! তুমি তো এমন অলৌকিক কিছু নিয়ে আসনি, যা তোমার দাবির সত্যতার সপক্ষে সাক্ষ্য বহন করে। আর বিনা প্রমাণে আমরা কেবল তোমার মুখের কথায় আমাদের দেব-দেবীর উপাসনা ত্যাগ করব না। আমাদের ধারণা হচ্ছে, তুমি পাগল হয়ে গেছ, অর্থাৎ আমাদের কোন উপাস্য তোমার উপর ক্রুদ্ধ হওয়ায় তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে এবং এ কারণে তুমি পাগল হয়ে গেছ। তাদের উত্তরে নবী বললেন ঃ

اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْا اَنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ. مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَاتُنْظِرُوْنِ.

আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি, আর তোমরাও সাক্ষী থাক যে, আল্লাহ ব্যতীত তোমরা আর যা কিছুকে আল্লাহর শরীক কর, সে সবের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অতঃপর সকলে মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর এবং আমাকে কোনরূপ অবকাশ দিও না। (সূরা হূদ ঃ ৫৫)

এটা নবীর পক্ষ থেকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি চ্যালেঞ্জস্বরূপ। তাদের দেব-দেবী থেকে নিজেকে সম্পর্কহীন রাখার চূড়ান্ত ঘোষণা ও দেব-দেবীর অসারতা প্রতিপন্নকারী উক্তি। তিনি বলছেন, ঐসব দেব-দেবী না কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষতি; জড় পদার্থ ছাড়া ওগুলো আর কিছুই নয়, হুকুম একমাত্র আল্লাহর চলে এবং তিনিই সব কাজের নিয়ন্তা। তোমরা যা বিশ্বাস কর, ওরাই সাহায্য-উপকার করে। ওরাই ক্ষতি সাধন করে--এ বিশ্বাসের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই আমি এগুলোকে অভিসম্পাত দেই। فَكِيْدُوْنِىْ ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ.
অর্থাৎ—আমার বিরুদ্ধে তোমরা ষড়যন্ত্র পাকাও এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

অর্থাৎ তোমাদের সমস্ত শক্তি ও উপায়-উপকরণ দিয়ে আমার বিরুদ্ধে যা করার তা করতে পার। এ ব্যাপারে এক মুহূর্তও আমাকে অবকাশ দিও না; কেননা আমি তোমাদের কোন পরোয়া করি না, এতে আমি চিন্তিতও নই এবং তোমাদের প্রতি আদৌ কোন ভ্রূক্ষেপও করি না।

إِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

'আমি আল্লাহর উপর ভরসা রাখি, তিনি আমার রব, তোমাদেরও রব, এমন কোন প্রাণী নেই যে তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। বস্তুত আমার প্রতিপালকই সরল সঠিক পথে আছেন।'

অর্থাৎ আমার ভরসা একমাত্র আল্লাহরই উপর। তাঁর নিকটই আমি সাহায্যপ্রার্থী, তাঁর উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। যে ব্যক্তি তাঁর কাছে শরণ নেয়, তাকে তিনি ধ্বংস হতে দেন না। তাঁকে ছাড়া কোন সৃষ্টির পরোয়া আমি করি না, তিনি ছাড়া অন্য কারও উপর আমি নির্ভর করি না। তিনি ছাড়া কারও ইবাদতও আমি করি না। এই একটি মাত্র বাক্যই এ ব্যাপারে অকাট্য দলীল যে, হযরত হূদ (আ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আর তাঁর কওমের লোকেরা ভ্রান্তি ও মূর্খতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেব-দেবীর পূজা করত। তারা নবীর বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধন করতে পারেনি। এটা তার আনীত দীনের সত্যতার ও বিরোধীদের মত ও পথের ভ্রান্তির প্রমাণবহ। হূদের পূর্বে নূহ (আ)ও ঠিক এ দলীলই পেশ করেছিলেন যেমন ঃ

يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِىْ وَتَذْكِيْرِىْ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاَجْمِعُوْا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْا إِلَىَّ وَلَا تُنْظِرُوْنِ.

হে আমার সম্প্রদায়! আমার অবস্থিতি ও আল্লাহর নিদর্শনাবলী দ্বারা আমার উপদেশদান তোমাদের নিকট যদি দুঃসহ হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে আমি তো আল্লাহর উপরই নির্ভর করি। তোমরা যাদেরকে শরীক করেছ তাদেরসহ তোমাদের কর্তব্য স্থির কর। পরে যেন কর্তব্য বিষয়ে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। আমার সম্বন্ধে তোমাদের কর্ম নিষ্পন্ন করে ফেল এবং আমাকে অবকাশ দিও না। (সূরা ইউনুস ঃ ৭১)

হযরত ইবরাহীম খলীল (আ)-ও এরূপই বলেছিলেন ঃ

وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّىْ شَيْئًا . وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَيْئٍ عِلْمًا . أَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ . وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا . فَأَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ . إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ . وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ .

আমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর শরীক কর তাকে আমি ভয় করি না। সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত। তবে কি তোমরা অবধান করবে না? তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক কর আমি তাকে কেমন করে ভয় করব, অথচ তোমরা আল্লাহর শরীক করতে ভয় কর না— যে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে কোন সনদ দেননি? সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দুই দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি নিরাপত্তা তাদেরই জন্য, তারাই সৎপথ প্রাপ্ত। এবং এটা আগের যুক্তিপ্রমাণ যা ইবরাহীমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়, যাকে ইচ্ছে মর্যাদায় আমি উন্নীত করি; তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী। (সূরা আন্‌আম ঃ ৮০-৮৩)

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ . وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ . أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُوْنَ .

তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ যারা কুফরী করেছিল এবং আখিরাতের সাক্ষাৎকারকে অস্বীকার করেছিল এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার, তারা বলেছিল, এতো তোমাদের মত একজন মানুষই; তোমরা যা খাও, সে তো তাই খায় এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদেরই মত একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কি তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দেয়—তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে গেলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। (সূরা মুমিনূন ঃ ৩৩-৩৫)

একজন মানুষকে আল্লাহ রাসূলরূপে পাঠাবেন এটা তাদের কাছে অযৌক্তিক মনে হত। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের অনেক মূর্খ কাফির এ যুক্তিই উপস্থাপন করেছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ.

মানুষের জন্য এটা কি আশ্চর্যের বিষয় যে, আমি তাদেরই একজনের কাছে ওহী প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তুমি মানুষকে সতর্ক কর! (সূরা ইউনুস ঃ ২) এবং আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا - قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا.

যখন তাদের কাছে আসে পথনির্দেশ তখন লোকদেরকে ঈমান আনা থেকে বিরত রাখে তাদের এ উক্তি, আল্লাহ কি মানুষকেই রাসূল করে পাঠিয়েছেন? বল, ফেরেশতাগণ যদি নিশ্চিন্ত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত, তবে আমি আকাশ থেকে ফেরেশতাই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৯৪-৯৫)

এ কারণেই হূদ (আ) তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ.

তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদের সতর্ক করে। (সূরা আ'রাফ ঃ ৬৩)

মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কেননা আল্লাহই ভাল জানেন যে, তিনি রিসালতের দায়িত্ব কাকে দিবেন। আল্লাহর বাণী ঃ

أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَّعِظَامًا أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ. هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ. إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَّمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ. قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي.

সে কি তোমাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মাটি ও হাড়ে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব। একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমরা মরি-বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না। সে তো এমন এক ব্যক্তি যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করার পাত্র নই। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর; কারণ ওরা আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে। (সূরা মুমিনূন ঃ ৩৫-৩৯)

পুনরুত্থানকে তারা অযৌক্তিক মনে করত এবং মরে যাওয়ার পর দেহ মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে গেলে সেই দেহ যে পুনর্গঠিত হতে পারে, তা তাদের বিশ্বাস হত না। এ কথাকে তারা অসম্ভব বলে বিশ্বাস করত। তাদের মতে, মরা-বাঁচা যা কিছু তা এই দুনিয়ার জীবনেই, এর পর আর কোন জীবন নেই। এখানে এক প্রজন্ম মারা যাবে, অন্য প্রজন্ম আসবে। সৃষ্টিধারা এভাবেই চলতে থাকবে। এটা হল নাস্তিকদের বিশ্বাস। যেমন ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী অনেক মূর্খলোক বলে থাকে যে, মাতৃগর্ভ বের করে দেয় এবং পৃথিবী গ্রাস করে নেয়।

পক্ষান্তরে পুনর্জন্মবাদীরা বিশ্বাস করে যে, তারা মৃত্যুর পর তিন হাজার এক বছর পর আবার এই জগতেই ফিরে আসবে। এ সব ধারণাই অমূলক, কুফরী, মূর্খতা, ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। এর কোন দলীল-প্রমাণ বা যুক্তি নেই। আদম (আ)-এর সন্তানদের মধ্যকার মূর্খ, জ্ঞানহীন, কাফির, অনাচারী লোকরাই এ জাতীয় আকীদা পোষণ করে থাকে। আল্লাহর বাণী ঃ

وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوْا مَا هُمْ مُقْتَرِفُوْنَ.

এবং তারা এ উদ্দেশ্যে প্ররোচিত করে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের মন যেন তার প্রতি অনুরাগী হয় এবং ওতে যেন তারা পরিতুষ্ট হয় আর তারা যে অপকর্ম করে তারা যেন তাই করতে থাকে। (সূরা আন'আম ঃ ১১৩)

তাদেরকে উপদেশ হিসেবে আল্লাহ বলেন ঃ

أَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُوْنَ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ.

"তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছ নিরর্থক? আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এ মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে?" (সূরা শু'আরা ঃ ১২৮-১২৯)

অর্থাৎ তোমরা প্রতিটি উঁচু স্থানে বিরাট বিরাট প্রাসাদোপম সৌধ নির্মাণ করে থাক অথচ বসবাসের জন্যে এসব আড়ম্বরের কোনই প্রয়োজন নেই। যেহেতু তারা সবাই তাঁবুতে বসবাস করত। আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ- الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ.

অর্থাৎ- তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক কি করেছিলেন? আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিল স্তম্ভ বিশিষ্ট সুউচ্চ প্রাসাদের, যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয়নি। (সূরা ফাজর ঃ ৬-৮)

অতএব, দেখা যাচ্ছে 'আদে-ইরাম-ই হল আদে উলা—যারা স্তম্ভের উপর নির্মিত তাঁবুসমূহে বসবাস করত। যাদের ধারণা, ইরাম স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত একটি ভ্রাম্যমাণ শহর যা দেশ-দেশান্তরে স্থানান্তরিত হয়, তাদের বক্তব্য ভুল ও ভিত্তিহীন। আল্লাহর বাণী ঃ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ এর মধ্যে مَصَانِعَ অর্থ-কেউ বলেছেন প্রাসাদ; কেউ বলেছেন গোসলখানার গম্বুজ; কেউ বলেছেন জলাধার।

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ. وَاتَّقُوا الَّذِيْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ. اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ . وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ. اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

এবং যখন তোমরা আঘাত হান আঘাত হেনে থাক কঠোরভাবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন ঐসব, যা তোমরা জ্ঞাত রয়েছ। তোমাদেরকে দিয়েছেন গবাদি পশু এবং সন্তান-সন্ততি, উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণসমূহ; আমি তোমাদের জন্যে আশংকা করি মহা দিবসের শাস্তি। (সূরা শু'আরা ঃ ১৩০-১৩৫)

তারা আরো বলেছিল ঃ

قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এই উদ্দেশ্যে এসেছ যে, আমরা যেন শুধু আল্লাহর ইবাদত করি এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যার ইবাদত করত তা বর্জন করি? সুতরাং তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এস অর্থাৎ তোমার প্রতিশ্রুত শাস্তি নিয়ে এস। (সূরা আ'রাফ ঃ ৭০)

কেননা আমরা তোমার উপর ঈমান আনি না। তোমার আনুগত্য করব না এবং তোমাকে সত্য বলে বিশ্বাসও করি না। তারা বলল ঃ

سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ. اِنْ هٰذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ.

অর্থাৎ— তুমি উপদেশ দাও বা নাই দাও, আমাদের ক্ষেত্রে সবই সমান। এসব কথাবার্তা তো পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। আর আমরা শাস্তি পাবার যোগ্য নই।

خلق শব্দটিকে এখানে অন্য কিরাআত অনুযায়ী যবর যোগে خلق পড়া হয়ে থাকে, তখন তার অর্থ হবে اختلاق। অর্থাৎ মনগড়া ব্যাপার—যা তুমি নিয়ে এসেছ তা পূর্ববর্তী কিতাব থেকে ধার করা। বেশ ক'জন সাহাবী ও তাবেয়ী এরূপ তাফসীর করেছেন। পক্ষান্তরে, প্রসিদ্ধ কিরাআত মতে خ ও ل -এর উপর পেশ দিয়ে خلق পড়লে তার অর্থ হবে দীন। অর্থাৎ যে দীনের উপর আমরা আছি তা আমাদের বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষদেরই দীন; এ দীন আমরা ত্যাগ করব না। এতে কোন পরিবর্তন আনব না। এর উপরই অটল অবিচল থাকব। এখানে উভয় কিরাআতই তাদের সেই বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যাতে তারা বলেছে যে, আমরা শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত নই। নবী জানালেন ঃ

قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَّغَضَبٌ. اَتُجَادِلُوْنَنِيْ فِيْ اَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. فَانْتَظِرُوْا اِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ.

সে বলল, তোমাদের প্রতিপালকের শাস্তি ও ক্রোধ তো তোমাদের জন্য নির্ধারিত হয়েই আছে; তবে কি তোমরা আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও এমন কতকগুলো নাম সম্পর্কে যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ সৃষ্টি করেছ এবং যে সম্পর্কে আল্লাহ কোন সনদ পাঠান নি? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। (সূরা আ'রাফ ঃ ৭১)

অর্থাৎ এ জাতীয় কথার কারণে তোমরা আল্লাহর শাস্তি ও ক্রোধের পাত্র হয়ে গিয়েছ; এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতের মুকাবিলায় তোমরা সেই সব মূর্তির পূজা করছ, যা তোমরা নিজেদের হাতে তৈরি করে নামকরণ করেছ– ইলাহ্ বলে আখ্যায়িত করেছ। আর তোমাদের পূর্ব-পুরুষরাও এই কর্মই করেছে। তোমাদের এরূপ কর্মের কোন দলীল বা ভিত্তি নেই। সুতরাং হক কথা শুনতে ও মানতে যখন অস্বীকার করছ এবং বাতিলের উপর অটল থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, আর আমার সতর্ক করা না করা যখন সমান হয়ে গেছে, তা হলে এখন তোমরা আল্লাহর আযাব ও শাস্তির অপেক্ষায় থাক যা ঠেকানোর শক্তি কারও নেই। আল্লাহর বাণী ঃ

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ. قَالَ عَمَّا قَلِيْلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِيْنَ. فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ.

সে বলল ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর। কারণ, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে। আল্লাহ বললেন, অচিরেই তারা অবশ্যই অনুতপ্ত হবে। তারপর সত্যি সত্যিই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করল। আর আমি তাদেরকে তরংগ-তাড়িত আবর্জনায় পরিণত করে দিলাম। সুতরাং ধ্বংস হয়ে গেল জালিম সম্প্রদায়। (সূরা মু'মিনূন ঃ ৩৯-৪১)

আল্লাহর বাণী ঃ

قَالُوْا اَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ. قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ. وَاُبَلِّغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّىْ اَرٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ. فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا. بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ. رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ. تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوْا لَا يُرٰى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ. كَذٰلِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ.

অর্থাৎ—ওরা বলেছিল, তুমি কি আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীর পূজা থেকে নিবৃত্ত করতে এসেছ? তুমি সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ, তা নিয়ে এস! সে বলল, এর জ্ঞান তো কেবল আল্লাহর নিকট আছে। আমি যা সহ প্রেরিত হয়েছি কেবল তাই তোমাদের নিকট প্রচার করি। কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মূঢ় সম্প্রদায়। তারপর যখন ওদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে দেখল, তখন ওরা বলতে লাগল, এতো মেঘ। আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। (হূদ বলল) বরং এটা তাই যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলে। এতে রয়েছে এক ঝড়— মর্মন্তুদ শাস্তিবহ। আল্লাহর নির্দেশে এটা সবকিছু ধ্বংস করে দেবে। তারপর তাদের

পরিণাম হল এই যে, ওদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। অপরাধী সম্প্রদায়কে আমি এমনিভাবে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (সূরা আহকাফ ঃ ২২-২৫)।

আদ জাতির ধ্বংসের সংবাদ আল্লাহ্ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করেছেন, যার সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বিবরণ আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। যেমন আল্লাহর বাণী ঃ

فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَمَا كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ.

এর পর তাকে ও তার সংগীদেরকে আমার অনুগ্রহে উদ্ধার করেছিলাম, আর আমার নিদর্শনকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল আর যারা মুমিন ছিল না তাদেরকে নির্মূল করেছিলাম। (সূরা আ'রাফ ঃ ৭২)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوْدًا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْظٍ. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوْا بِاٰيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوْا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ. وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ. اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ. اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ.

যখন আমার নির্দেশ আসল তখন আমি হূদ ও তার সংগে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং রক্ষা করলাম তাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে। এই আদ জাতি তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন অস্বীকার করেছিল এবং অমান্য করেছিল তার রাসূলগণকে এবং ওরা প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারীর নির্দেশ অনুসরণ করত। এই দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিল লা'নতগ্রস্ত এবং লা'নতগ্রস্ত হবে তারা কিয়ামতের দিনেও। জেনে রেখ! আদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রেখ, ধ্বংসই হল হূদের সম্প্রদায় আদের পরিণাম। (সূরা হূদ ঃ ৫৮-৬০)

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً. فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ -

অতঃপর সত্যি সত্যিই এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে আঘাত করল। আর আমি তাদেরকে তরংগ-তাড়িত আবর্জনা সদৃশ করে দিলাম। (সূরা মু'মিনূন ঃ ৪১)

আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيَةً وَّمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

তারপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করল, সুতরাং আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। নিশ্চয় এ ঘটনার মধ্যে রয়েছে নিদর্শন—উপদেশ। তাদের অধিকাংশই ঈমানদার ছিল না। আর তোমার প্রতিপালকই অত্যধিক পরাক্রমশালী, দয়াময়।

আদ জাতির ধ্বংসের পূর্ণাংগ চিত্র আল্লাহ কুরআনে দিয়েছেন যথা ঃ

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ.

তারপর যখন তারা তাদের উপত্যকার দিকে আগত মেঘমালা দেখল, তখন বলল, এই তো মেঘ, আমাদের বৃষ্টি দান করবে। না, বরং ওটা তো তাই যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ। এ একটা ঝঞ্ঝা-বায়ু, যার মধ্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (৪৬ আহকাফ ঃ ২৪) এটা ছিল তাদের প্রতি আযাবের সূচনা। তারা দীর্ঘ দিন খরাগ্রস্ত ও দুর্ভিক্ষকবলিত ছিল এবং বৃষ্টির জন্যে অধীর হয়ে উঠেছিল। এমন এক পরিস্থিতিতে হঠাৎ আকাশের কোণে মেঘ দেখতে পেল। মনে করল—এই তো রহমতের বৃষ্টি আসছে। বস্তুত তা ছিল আযাবের বৃষ্টি। আল্লাহ জানালেন ঃ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ (অর্থাৎ এতো তাই যা তোমরা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছ।) অর্থাৎ শাস্তি আপতিত হওয়ার বিষয়। যেহেতু তারা বলেছিল فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ – (তুমি যার ওয়াদা করছ তা নিয়ে আস, যদি সত্যবাদী হও।) (৪৬ আহকাফ ঃ ২৪) এ জাতীয় আয়াত সূরা আ'রাফেও আছে।

এ আয়াতের তাফসীরে মুফাসসিরগণ ও অন্যান্য লেখক ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ইবন যাশ্শারের বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি এই ঃ হূদ (আ)-এর কওমের লোকেরা ঈমান গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়ে যখন কুফরীর উপর দৃঢ় হয়ে থাকল, তখন আল্লাহ তিন বছর যাবত তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ রাখেন। ফলে তারা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়। ঐ সময়ের নিয়ম ছিল যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিত, তখন তারা মুক্তির জন্যে আল্লাহর নিকট দু'আ করত এবং তা করা হত আল্লাহর ঘরের নিকট হারম শরীফে। সে যুগের মানুষের নিকট এটা ছিল একটি সুবিদিত রেওয়াজ। তখন সেখানে আমালিক জাতি বাস করত। আমালিকরা হল আমলীক ইব্‌ন লাওজ ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ (আ)-এর বংশধর। সেকালে তাদের সর্দার ছিল মু'আবিয়া ইব্‌ন বকর। মু'আবিয়ার মা ছিলেন আদ গোত্র সম্ভূত। তার নাম ছিল জালহায়া বিন্‌ত খায়বরী

আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায় সত্তরজনের একটি দলকে বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করতে হারম শরীফে পাঠায়। মক্কার উপকণ্ঠে মু'আবিয়া ইব্‌ন বকরের বাড়িতে গিয়ে তারা ওঠে। মু'আবিয়াও তাদেরকে আতিথ্য দেন। তারা সেখানে এক মাস অবস্থান করে। সেখানে তারা মদ পান করত ও মু'আবিয়ার দুই গায়িকার গান শুনত। নিজেদের দেশ থেকে মু'আবিয়ার কাছে যেতে তাদের এক মাস সময় লেগেছিল। এদের দীর্ঘদিন অবস্থানের ফলে আপন লোকদের দুর্গতির কথা ভেবে মু'আবিয়ার মনে করুণা হয় অথচ তাদেরকে ফিরে যাওয়ার কথা বলতেও তিনি সংকোচ বোধ করেন। তাই তিনি একটি কবিতা রচনা করে তাদেরকে দেন এবং গানের মাধ্যমে তা শুনাবার জন্যে গায়িকাদেরকেও নির্দেশ দেন। কবিতাটিতে তিনি আদ জাতির খরাজনিত দুরবস্থার বর্ণনা দিয়ে প্রতিনিধিদলকে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্যে অভিযুক্ত করে তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করেন।

তখন দলের সবাই তাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হল। সুতরাং সকলে হারম শরীফে গিয়ে উপস্থিত হল এবং গোত্রের লোকদের জন্যে দু'আ করতে লাগল। দু'আ পরিচালনা করল কায়ল ইব্ন আনায। তখন আল্লাহ সাদা, লাল ও কাল তিন ধরনের মেঘ সৃষ্টি করলেন। পরে আকাশ থেকে এ মর্মে ঘোষণা শোনা গেল ঃ কায়ল! এই মেঘগুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটি তোমার নিজের এবং তোমার গোত্রের লোকের জন্যে বেছে নাও। কায়ল বলল, আমি কালটা বেছে নিলাম। কেননা কাল মেঘে বৃষ্টি বেশি হয়। পুনরায় গায়বী আওয়াজে তাকে জানান হল, তুমি ছাই-ভস্ম পছন্দ করেছ—ধ্বংসটাকে বাছাই করে নিয়েছ। এ মেঘ আদ গোত্রের কাউকে রেহাই দেবে না; পিতা-পুত্র কাউকেই ছাড়বে না। এটা বনু লূদিয়া ছাড়া সবাইকে ধ্বংস করবে। বনু লূদিয়া আদ গোত্রেরই একটি শাখা। এরা মক্কায় বসবাস করত। তারা এ আযাবের আওতায় পড়েনি। মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক বলেন, দ্বিতীয় আদ বা ছামূদ জাতি এদেরই বংশধর। তারপর কায়ল ইব্ন আনায যে কাল মেঘটি পছন্দ করেছিল, আল্লাহ তা আদ গোত্রের দিকে প্রেরণ করেন। মেঘ মুগীছ নামক উপত্যকায় পৌঁছলে তা লোকদের দৃষ্টিগোচর হয়। মেঘ দেখেই তারা একে অপরকে আনন্দ বার্তা পৌঁছাতে থাকে যে, এই তো মেঘ এসে গেছে, এখনই বৃষ্টি হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ . رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ . تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا-

বরং এটা তো তাই যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। এটা একটা ঝঞ্ঝা। এর মধ্যে আছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তার প্রতিপালকের নির্দেশে তা সবকিছুকে ধ্বংস করে ফেলবে। (সূরা আহকাফ ঃ ২৪-২৫)

অর্থাৎ যেসব জিনিসকে ধ্বংস করার নির্দেশ আসবে তা সেসব জিনিসকেই ধ্বংস করবে। এ মেঘ যে আসলে একটি ঝঞ্ঝা-বায়ু এবং তার মধ্যে শাস্তি লুকিয়ে আছে, তা সর্ব প্রথম ফাহ্দ নাম্নী আদ গোত্রীয় এক মহিলার চোখে ধরা পড়ে। তা স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েই সে চীৎকার করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। চেতনা ফিরে আসার পর লোকজন জিজ্ঞেস করল, "ফাহ্দ! তুমি কি দেখেছিলে? সে বলল, দেখলাম একটা ঝঞ্ঝা-বায়ু, তার মধ্যে যেন অগ্নিশিখা জ্বলছে। তার অগ্রভাগে কয়েকজন লোক তা ধরে টেনে আনছে।" তারপর আল্লাহ তাদের উপর সে আযাব একটানা সাতরাত ও আটদিন যাবত অব্যাহত রাখেন। চিরদিনের জন্যে তারা সমূলে উৎখাত হয়ে যায়। তাদের একজন লোকও অবশিষ্ট রইলো না। হূদ (আ) মু'মিনদেরকে সংগে নিয়ে একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে চলে যান। এ ঝড়ের আঘাতে তাদেরকে স্পর্শ করেনি। বরং সে বাতাসের স্পর্শে তাঁদের ত্বক আরো কোমলতা লাভ করে এবং তাঁদের মনে স্ফূর্তি আসে। অথচ ঝঞ্ঝা-বায়ু আদ সম্প্রদায়ের উপরে আসমান-যমীন জুড়ে আঘাত হানছিল এবং পাথর নিক্ষেপ করে তাদেরকে বিনাশ করছিল। ইব্ন ইসহাক (র) এ ঘটনা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে হারিছ ইব্ন হাসান (র) মতান্তরে হারিছ ইব্ন য়াযীদ আল-বকরী (র) সূত্রে এ ঘটনার অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। হারিছ বলেন, আমি একদা 'আলা ইব্ন হায্রামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্যে রাসূল (সা)-এর দরবারে রওয়ানা হই। পথে

রাব্‌যা নামক স্থানে বনু তামীমের পথহারা এক বৃদ্ধাকে একাকী অবস্থায় দেখতে পাই। আমাকে দেখে সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমি একটি কাজে রাসূলুল্লাহর কাছে যেতে চাই, আমাকে আপনি তাঁর নিকট পৌছিয়ে দেবেন? হারিছ বলেন, আমি বৃদ্ধা মহিলাটিকে নিয়ে মদীনায় এসে পৌছলাম। মসজিদে পৌছে দেখি, লোকে-লোকারণ্য। মধ্যে একটি কাল পতাকা দুলছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে বিলাল (রা) একটি কোষবদ্ধ তলোয়ার হাতে দণ্ডায়মান। আমি জানতে চাইলাম, ব্যাপার কী? লোকজন জানাল, রাসূলুল্লাহ (সা) আমর ইবনুল আস (রা)-কে অভিযানে পাঠাতে যাচ্ছেন। রাবী বলেন, আমি তখন বসে পড়লাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে নবী করীম (সা) তাঁর ঘরে বা হাওদায় প্রবেশ করেন। আমি তখন তাঁর নিকট যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করি। তিনি অনুমতি দিলেন। ভিতরে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সালাম জানালাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের (বনু বকরের) মধ্যে ও বনু তামীমের মধ্যে কিছু ঘটেছে না কি? আমি বললাম— জী হ্যাঁ, তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আসার পথে আমি বনু তামীমের এক বৃদ্ধা মহিলাকে একাকী দেখতে পাই। সে তাকে আপনার নিকট নিয়ে আসার জন্যে আমাকে অনুরোধ জানায়। এখন সে এই দরজার কাছেই আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন। যখন সে ভিতরে প্রবেশ করল, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি আমাদের ও বনু তামীমের মধ্যে কোন সীমারেখা নির্ধারণ করে দিতে চান, তাহলে প্রান্তরকেই সীমা সাব্যস্ত করে দিন। কেননা এটা আমাদেরই ছিল। হারিছ বলেন, বৃদ্ধা মহিলাটি তখন তার স্বগোত্রের পক্ষে সোচ্চার হয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে ওঠে ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে আপনার মুযার গোত্রকে কোথায় নিয়ে ঠেকাচ্ছেন? হারিছ বলেন, আমি তখন বললাম, আমার দৃষ্টান্তটা হচ্ছে পুরাকালের সেই প্রবাদের মত, যাতে বলা হয়েছে ঃ معزى حملت حتفها ছাগলটি তার মৃত্যু ডেকে এনেছে। এই মহিলাকে আমিই উঠিয়ে নিয়ে এনেছি, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি যে, সে আমার শত্রুপক্ষ। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শরণ চাই, যেন আমি আদ গোত্রের প্রতিনিধির মত না হই।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, সে আবার কী? আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের কী হয়েছিল? তিনি এ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও কিছুটা রস আস্বাদন করতে চান। হারিছ বললেন, 'আদ সম্প্রদায় একবার দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। তখন কায়ল নামক জনৈক সর্দারকে তাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি করে পাঠায়। কায়ল মু'আবিয়া ইব্‌ন বকরের নিকট গিয়ে সেখানে একমাস পর্যন্ত অবস্থান করে। সেখানে সে মদপান করত এবং জারাদাতান নাম্নী মু'আবিয়ার দুটি দাসী তাকে গান শুনাত। এভাবে একমাস কেটে যাবার পর সে তিহামার এক পর্বতে গিয়ে দু'আ করল, হে আল্লাহ! আপনি জানেন, আমি কোন রোগীর চিকিৎসার জন্যে কিংবা কোন কয়েদীকে মুক্ত করার জন্যে আসিনি। হে আল্লাহ! আদ জাতিকে আপনি বৃষ্টি দান করুন, যা আপনার মর্জি হয়। তখন আকাশে কয়েকটি কাল মেঘখণ্ড দেখা দেয়। মেঘের মধ্য থেকে আওয়াজ এল, এর মধ্য থেকে যে কোন একটি তুমি বেছে নাও! সে একটি ঘন কাল মেঘখণ্ডের দিকে ইংগিত করল। তখন মেঘের মধ্য থেকে আওয়াজ এল, নাও, ছাই-ভস্ম ও বন্যা। আদ সম্প্রদায়ের

একজন লোককেও তা অবশিষ্ট রাখবে না। রাবী বলেন ঃ আমি যদ্দুর জানতে পেরেছি, আমার হাতের এ আংটির ফাঁক দিয়ে যতটুকু বায়ু প্রবাহিত হতে পারে, ততটুকু বায়ুই কেবল প্রেরিত হয়ে আদ সম্প্রদায়কে নির্মূল করে দেয়। এ বর্ণনার একজন রাবী আবূ ওয়াইল বলেন, বিবরণটি যথার্থ।

পরবর্তীকালে আরবের কোন নারী বা পুরুষ কোথাও কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করলে বলে দিত—তোমরা আদ জাতির প্রতিনিধিদের মত হয়ো না যেন। এ হাদীছ ইমাম তিরমিযী (র) যায়দ ইবনুল হুবাব সূত্রে এবং ইমাম নাসাঈ আসিম ইব্ন বাহদালা সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং এই একই সূত্রে ইব্ন মাজাও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইব্ন জারীর প্রমুখ মুফাসসির আদ জাতির আলোচনাকালে এ ঘটনার এবং এ হাদীসের উল্লেখ করেছেন। আদে আখির বা দ্বিতীয় আদের ধ্বংসের বর্ণনায়ও এই কাহিনীটির উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কয়েকটি দিক বিবেচনা করলে এ মতের সমর্থন মেলে। যথা ঃ (১) ইব্ন ইসহাক প্রমুখ ঐতিহাসিক এ ঘটনার বর্ণনায় মক্কার কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ হযরত ইবরাহীম (আ), বিবি হাজেরা ও ইসমাঈল (আ)-কে মক্কায় অভিবাসিত করার পূর্বে মক্কা শহরের প্রতিষ্ঠাই হয়নি।

তারপর জুরহুম গোত্র এসে সেখানে বসতি স্থাপন করে যা পরে বর্ণিত হবে। আর প্রথম আদ হচ্ছে ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বেকার জাতি। (২) এই ঘটনায় মু'আবিয়া ইব্ন বকর ও তার কবিতার উল্লেখ আছে। এই কবিতাটি প্রথম আদের পরবর্তী যুগে রচিত। প্রাচীন যুগের লোকের ভাষার সাথে এর কোন মিল নেই। (৩) এই ঘটনার মধ্যে যে মেঘের কথা এসেছে তাতে অগ্নি-শিখার উল্লেখ রয়েছে। আর প্রথম আদের ধ্বংসের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ইব্ন মাসউদ, ইব্ন আব্বাস প্রমুখ তাবিঈ ইমামগণ বলেছেন - صَرْصَرٌ অর্থ ঠাণ্ডা এবং - عَاتِيَةٍ অর্থ তীব্র।

আল্লাহর বাণী ঃ . سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ حُسُوْمًا

অর্থাৎ—পূর্ণ সাতরাত ও আটদিন এটা তাদের উপর অব্যাহতভাবে চাপিয়ে রাখা হয়। কারও মতে, এ আযাব শুরু হয়েছিল শুক্রবারে; কারও মতে বুধবারে।

আল্লাহর বাণী ঃ . فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে, তারা সেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খেজুর কাণ্ডের মত। (সূরা হাক্কা ঃ ৬-৭)

খেজুর গাছের মাথাবিহীন কাণ্ডের সাথে তাদের অবস্থার তুলনা করা হয়েছে। কেননা, প্রবল বায়ু এসে তাদেরকে শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে মাথা নিচের দিকে করে নিক্ষেপ করে। ফলে মাথা ভেংগে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে কেবল মাথাহীন দেহটি পড়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ. تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ.

(আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা-বায়ু নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে) অর্থাৎ এমন এক দিনে তাদের উপর ঝঞ্ঝা-বায়ু পাঠাই যা তাদের জন্যে দুর্ভাগ্য নিয়ে আসে এবং আযাব অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

যা মানুষকে উৎখাত করেছিল খেজুরের কাণ্ডের মত। (সূরা কামার ঃ ১৯-২০) যারা বলে থাকেন বুধবার হল চির দুর্ভাগ্যের দিন। আর এই ধারণা থেকেই তারা বুধবারকে অশুভ দিন বলে অভিহিত করে থাকেন। এটা তাদের ভুল ধারণা এবং এটা কুরআনের মর্মের পরিপন্থী। কেননা অপর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ.

অর্থাৎ—"আমি তাদের উপর ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রেরণ করি কয়েকটি অশুভ দিনে।" (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ১৬) এটা সুবিদিত যে, পর পর আটদিন পর্যন্ত এ ঝঞ্ঝা-বায়ু স্থায়ী থাকে। যদি দিনগুলোই অশুভ হত তাহলে সপ্তাহের সমস্ত দিনগুলোই অশুভ প্রতিপন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এমন কথা কেউ-ই বলেনি। সুতরাং এখানে (نحسات عليهم) অর্থ হচ্ছে ঐ দিনগুলো তাদের জন্যে অশুভ ছিল।

আল্লাহর বাণী ঃ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (আর নিদর্শন রয়েছে আদ জাতির ঘটনায়, যখন আমি তাদের উপর অকল্যাণকর বায়ু প্রেরণ করলাম।) (সূরা যারিয়াত ঃ ৪১) অর্থাৎ এমন বায়ু যা কোন মংগল বয়ে আনে না। কেননা যে বায়ু মেঘ উৎপাদন করতে পারে, আর না গাছাপালাকে ফলবান করতে পারে। তা তো বন্ধ্যাই বটে। তাতে কোন কল্যাণ নিহিত নাই। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন ঃ

مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.

যা কিছুর উপর দিয়েই তা প্রবাহিত হয়েছে তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে। (সূরা যারিয়াত ঃ ৪২)। অর্থাৎ সম্পূর্ণ জীর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর মত করে দিয়েছি যার দ্বারা কোনরকম কল্যাণ আশা করা যায় না।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور আমাকে পূবালী বায়ু দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। আর আদ জাতিকে পেছন দিক থেকে আসা বায়ু দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী ঃ

وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ. إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.

আদ এর ভাই [হূদ]-এর কাহিনী স্মরণ কর। আর এ রকম সতর্ককারী লোক তার পূর্বে ও পরে আগমন করেছিল, যখন সে উচ্চ উপত্যকায় নিজ জাতির জনগণকে এ মর্মে সতর্ক করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না। আমি তোমাদের উপর এক মহাদিবসের শাস্তির আশংকা বোধ করছি। (সূরা আহকাফ ঃ ২১)

এসব আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই আদ হল প্রথম আদ জাতি। কেননা, এদের প্রাসংগিক অবস্থা হূদের সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অবশ্য এ সম্ভাবনাও কিছুটা আছে যে, উপরোক্ত ঘটনায় যে জাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হল দ্বিতীয় 'আদ। এ মতের কিছু দলীল-প্রমাণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া হযরত আয়েশা (রা) থেকে একখানা হাদীসও এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে— যা আমরা পরে উল্লেখ করব। আর আল্লাহর বাণী ঃ

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا.

তারা যখন তাদের উপত্যকা অভিমুখী মেঘ দেখতে পেল তখন সবাই বলতে লাগল, এই তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। (সূরা আহকাফ ঃ ২৪)

কারণ, 'আদ জাতির লোকেরা আকাশে যখন মেঘের মত একটি আবরণ দেখতে পেল, তখন তাকে বৃষ্টি দানকারী মেঘ বলেই ধারণা করল; কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, সেটা ছিল আযাবের মেঘ। তারা এটাকে রহমত বলে বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু আসলে তা ছিল শাস্তি। তারা আশা করেছিল, এতে রয়েছে কল্যাণ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা পেল চূড়ান্ত পর্যায়ের অকল্যাণ। আল্লাহ বলেন, بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ বরং এটা হল ঐ জিনিস যা তোমরা তাড়াতাড়ি কামনা করছিলে অর্থাৎ আযাব। এরপর তার ব্যাখ্যা দেন ঃ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ অর্থাৎ এটা হল একটা ঝঞ্ঝা-বায়ু, এর মধ্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

এখানে আযাবের ব্যাখ্যা দু'রকম হতে পারে; এক. আযাব বলতে সেই প্রবল বেগে বয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা ঝঞ্ঝা-বায়ু বুঝান হয়েছে যা তাদের উপর পতিত হয়েছিল এবং সাতরাত ও আটদিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ফলে একজন লোকও বেঁচে থাকতে পারেনি। পাহাড়ে গর্ত-গুহায় প্রবেশ করে সেখান থেকেও তাদেরকে বের করে ধ্বংস করে দিয়েছে। এরপর শক্ত ও সুদৃঢ় প্রাসাদসমূহ ভেংগে তাদের লাশের উপর স্তূপ করে রেখেছে। তারা নিজেদের শক্তির অহংকারে মত্ত হয়ে বলে বেড়াত—'আমাদের চেয়ে শক্তিশালী আবার কে?' ফলে আল্লাহ তাদের উপর সেই জিনিস চাপিয়ে দেন, যা তাদের থেকে অধিক শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান। আর তা হল অশুভ বাতাস। দুই. এমনও হতে পারে যে, এই বাতাস শেষ পর্যায়ে কিছু মেঘ উৎপন্ন করে। তখন যারা মোটামুটি বেঁচেছিল তারা বলাবলি করছিল, এই মেঘের মধ্যে রহমত নিহিত রয়েছে এবং তা বেঁচে থাকা লোকদের রক্ষা করার জন্যে এসেছে। তখন আল্লাহ তাদের উপর আগুনের লেলিহান শিখা প্রেরণ করেন। একাধিক মুফাস্‌সির এরূপও ব্যাখ্যা করেছেন। এরূপ অবস্থা মাদ্‌য়ানবাসীদেরও হয়েছিল। প্রথমে ঠাণ্ডা বায়ু ও পরে আগুন দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। (সূরা মু'মিনূনে উল্লেখিত) বিকট আওয়াজসহ এরূপ বিভিন্ন বিপরীতধর্মী বস্তু দ্বারা শাস্তিদানই নিঃসন্দেহে কঠিনতম শাস্তি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইব্‌ন আবী হাতিম ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যে বাতাসে 'আদ জাতি ধ্বংস হয়েছিল তা ছিল একটি আংটি পরিমাণ স্থান দিয়ে নির্গত বায়ু মাত্র— যে টুকু আল্লাহ তাদের জন্যে খুলে দিয়েছিলেন। সে বায়ু খণ্ডটিই উপত্যকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং তথাকার লোকজন, জীব-জন্তু ও ধন-সম্পদ, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী

শূন্যে উঠিয়ে নিয়ে যায়। এ বায়ু দেখেই কওমে আদের শহরবাসীরা বলে উঠল ঃ هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا এইতো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। কিন্তু বাতাস তখন উপত্যকার মানুষ ও জীব-জন্তুগুলোকে শহরবাসীদের উপর ফেলে দেয়। তাবারানী ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ কওমে আদের উপর একটি আংটির সমপরিমাণ বাতাস উন্মুক্ত করে দেন। তা প্রথমে উপত্যকা ও পরে শহর এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত করেন। শহরবাসী তা দেখে বলল, هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِنَا -এই তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে— যা আমাদের উপত্যকার দিকে এগিয়ে আসছে। সেখানে ছিল পল্লী এলাকার অধিবাসিগণ। তখন উপত্যকাবাসীদেরকে উপর থেকে নিচে শহরবাসীদের উপর নিক্ষেপ করা হয়। ফলে সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়। ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেছেন, তাদের অহংকারী ধন-ভাণ্ডার দ্বার-প্রান্তে বের হয়ে আসে।

وما فتح الله على عاد من الريح الامثل موضع الخاتم فمرت باهل البادية فحملتهم و مواشيهم واموالهم بين السماء والارض - فلما راى ذالك اهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها قالوا هذا عارض ممطرنا .

উল্লেখিত হাদীসের নিম্নরূপ সমালোচনা করা হয়েছে ঃ(১) এ হাদীস মারফূ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে; (২) হাদীসের এক রাবী মুসলিম আল-মালাঈর ব্যাপারে মতভেদ আছে; (৩) হাদীসটি মুযতারাব পর্যায়ের। আল্লাহই সর্বজ্ঞ; (৪) আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে, 'আদ জাতি' আকাশে সুস্পষ্ট মেঘের ঘনঘটা দেখেছিল। (فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا) পক্ষান্তরে, এ হাদীসকে যদি উক্ত আয়াতের তাফসীরস্বরূপ ধরা হয়, তাহলে আয়াতের সাথে সংঘাত সৃষ্টি হয়। কেননা, হাদীসে অতি সামান্য (আংটি বরাবর) মেঘের কথা বলা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীস উক্ত বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করে দেয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন তীব্র গতিতে বাতাস বইত তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দু'আ পড়তেন ঃ

اللهم انى اسئلك خيرها وخير ما فيما وخير ما ارسلت به واعوذبك من شرها وشر ما فيها وشرما ارسلت به .

হে আল্লাহ! আপনার নিকট এর মধ্যে যা কিছু কল্যাণ নিহিত আছে এবং এ বায়ুর সাথে যে কল্যাণ প্রেরিত হয়েছে আমি আপনার নিকট তাই প্রার্থনা করি। এ বায়ুতে যে অনিষ্ট নিহিত আছে এবং এ বায়ুর সাথে যে অনিষ্ট প্রেরিত হয়েছে তা থেকে পানাহ্ চাই। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আকাশ যখন মেঘে ছেয়ে যেতো তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। তিনি একবার ঘরে প্রবেশ করতেন আবার বের হয়ে যেতেন। একবার সম্মুখে যেতেন আবার পিছনে আসতেন। যখন বৃষ্টি নামতো তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেত। হযরত আয়েশা (রা) এ পরিবর্তন লক্ষ্য করেন এবং এর কারণ কি তা জিজ্ঞেস করেন। জবাবে তিনি বলেন ঃ হে আয়েশা! এটা সেরূপ মেঘও তো হতে পারে যা দেখে আদ জাতি বলেছিল ঃ

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا.

উপত্যকার দিকে আগত মেঘমালা দেখে তারা বলল, এই তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাহ্ (র) ইব্‌ন জুরায়য (র) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র)ও হযরত আয়েশা (রা) থেকে হাদীসটি ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে কখনও মুখগহবর দেখা যায় এমন পরিপূর্ণ হাসি হাসতে দেখিনি; বরং তিনি সর্বদা মুচকি হাসতেন। যখন তিনি মেঘ কিংবা ঝড়ো বাতাস দেখতেন, তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। আমি একবার জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অন্য লোকেরা মেঘ দেখে বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। অথচ আমি দেখছি, মেঘ দেখলে আপনার চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আয়েশা! এর মধ্যে কোন আযাব রয়েছে কিনা—সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই। নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়কে বায়ু দ্বারা আযাব দেয়া হয়েছে। অন্য আর এক সম্প্রদায় আযাব দেখে বলেছিল,

هذا عارض ممطرنا (এই তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে।)

এই হাদীস থেকে অনেকটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঘটনা মূলত দুইটি। পূর্বেই আমি এদিকে ইংগিত দিয়েছি। সুতরাং এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী সূরা আহ্‌কাফের ঘটনাটি হবে দ্বিতীয় আদ সম্প্রদায় সম্পর্কে এবং কুরআনের অন্যান্য আয়াতের বর্ণনা প্রথম আদ সম্পর্কে। অনুরূপ হাদীস ইমাম মুসলিম (র) হারূন ইব্‌ন মা'রাফ থেকে এবং ইমাম বুখারী (র) ও আবূ দাউদ (র) ইব্‌ন ওহাব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন।

হূদ (আ)-এর হজ্জ সংক্রান্ত বর্ণনা হযরত নূহ (আ)-এর আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত হূদ (আ)-এর কবর ইয়ামান দেশে অবস্থিত কিন্তু অন্যরা বলেছেন, তাঁর কবর দামেশকে। দামেশকের জামে মসজিদের সম্মুখ প্রাচীরের একটি নির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কে কোন কোন লোকের ধারণা যে, এটা হযরত হূদ (আ)-এর কবর।

হযরত সালিহ্ (আ)-এর বর্ণনা

ছামূদ একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জাতি। তাদের পূর্ব-পুরুষ 'ছামূদ' এর নামানুসারে এ জাতির নামকরণ করা হয়েছে। ছামূদ-এর আর এক ভাই ছিল জুদায়স। তারা উভয়ে 'আবির ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ্'-এর পুত্র। এরা ছিল আরবে আরিবা তথা আদি আরব সম্প্রদায়ের লোক। হিজায ও তবূকের মধ্যবর্তী 'হিজ্র' নামক স্থানে তারা বসবাস করত। তবূক যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (স) এই পথ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন— এর বর্ণনা পরে আসছে। আদ জাতির পর ছামূদ জাতির অভ্যুদয় ঘটে। তাদের মত এরাও মূর্তি পূজা করত। এদেরই মধ্য থেকে আল্লাহ্ তাঁর এক বান্দা সালিহ্ (আ)-কে রাসূলরূপে প্রেরণ করেন। তাঁর বংশ লতিকা হচ্ছে ঃ সালিহ্ ইব্ন অবদ ইব্ন মাসিহ্ ইব্ন উবায়দ ইব্ন হাজির ইব্ন ছামূদ ইব্ন আবির ইব্ন ইরাম ইব্ন সাম ইব্ন নূহ (আ)। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে এবং মূর্তিপূজা ও শির্ক বর্জনের নির্দেশ দেন। ফলে কিছু সংখ্যক লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই কুফরীতে লিপ্ত থাকে এবং কথায়-কাজে তাঁকে কষ্ট দেয় এমনকি এক পর্যায়ে তাঁকে হত্যা করতেও উদ্যত হয়। তারা নবীর সেই উটনীটিকে হত্যা করে ফেলে যাকে আল্লাহ তা'আলা নবুওতের প্রমাণস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। তখন আল্লাহ তাদেরকে শক্তভাবে পাকড়াও করেন। এ প্রসংগে সূরা আ'রাফে আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِلَى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ. هٰذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِىْ أَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ. وَاذْكُرُوْا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّأَكُمْ فِى الْأَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا. فَاذْكُرُوْا اٰلَاءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُوْنَ أَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهِ. قَالُوْا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ. قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا إِنَّا بِالَّذِيْ اٰمَنْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يٰصٰلِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ. فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النّٰصِحِيْنَ.

ছামূদ জাতির নিকট তাদের স্ব-গোত্রীয় সালিহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহর এ উটনীটি তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন। একে আল্লাহর যমীনে চরে খেতে দাও এবং একে কোন ক্লেশ দিও না। দিলে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হবে। স্মরণ কর, 'আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে বাস-গৃহ নির্মাণ করছ। সুতরাং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না।

তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা সেই সম্প্রদায়ের ঈমানদার যাদের দুর্বল মনে করা হত তাদের বলল, তোমরা কি জান যে, সালিহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত? তারা বলল, 'তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী। দাম্ভিকেরা বলল, তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তখন তারা সেই উটনীটি বধ করে এবং আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, 'হে সালিহ্! তুমি রাসূল হলে আমাদের যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো।' তারপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে তাদের প্রভাত হল নিজ গৃহে অধঃমুখে পতিত অবস্থায়। তারপর সে তাদের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিয়েছিলাম কিন্তু তোমরা তো হিতাকাঙ্ক্ষীদেরকে পছন্দ কর না।' (সূরা আ'রাফ, ৭৩-৭৯)

সূরা হূদে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صَالِحًا. قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ. هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ. اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ. قَالُوْا يٰصٰلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا اَتَنْهٰنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ. قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَاٰتٰنِيْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ. فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ.

وَيٰقَوْمِ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ. فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ. ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ. فَلَمَّا جَاۤءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ. وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ. كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا. اَلَا اِنَّ ثَمُوْدَ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ. اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ.

ছামূদ জাতির নিকট তাদের স্বগোত্রীয় সালিহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর 'ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি তোমাদেরকে ভূমি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তাতেই তিনি তোমাদেরকে বসবাস করিয়েছেন। সুতরাং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন কর। আমার প্রতিপালক নিকটেই, তিনি আহ্বানে সাড়া দেন।' তারা বলল, 'হে সালিহ্! এর পূর্বে তুমি ছিলে আমাদের আশা-স্থল। তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করছ ইবাদত করতে তাদের, যাদের ইবাদত করত আমাদের পিতৃ-পুরুষরা? আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি সে বিষয়ে, যার প্রতি তুমি আমাদেরকে আহ্বান করছ।' সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, তবে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে, আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা করি? সুতরাং তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বাড়িয়ে দিচ্ছ।

হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র এ উটনীটি তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন। একে আল্লাহর যমীনে চরে খেতে দাও। একে কোন ক্লেশ দিও না, ক্লেশ দিলে আশু শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।' কিন্তু তারা ওকে বধ করল। তারপর সে বলল, তোমরা তোমাদের ঘরে তিনদিন জীবন উপভোগ করে লও। এই একটি প্রতিশ্রুতি যা মিথ্যা হবার নয়। এবং যখন আমার নির্দেশ আসল, তখন আমি সালিহ্ ও তার সংগে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম এবং রক্ষা করলাম সে দিনের লাঞ্ছনা হতে। তোমার প্রতিপালক তো শক্তিমান, পরাক্রমশালী। তারপর যারা সীমালংঘন করেছিল মহা নাদ তাদেরকে আঘাত করল, ফলে ওরা নিজ নিজ ঘরে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল। যেন তারা সেথায় কখনও বসবাস করেনি। জেনে রেখ! ছামূদ জাতি তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রেখ! ধ্বংসই হল ছামূদ জাতির পরিণাম (সূরা হূদ ঃ ৬১-৬৮)

সূরা হিজরে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ. وَاٰتَيْنٰهُمْ اٰيٰتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ. وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ. فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ. فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ.

হিজ্‌রবাসিগণও রাসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করেছিল। তারা পাহাড় কেটে ঘর তৈরি করত নিরাপদ বাসের জন্যে। তারপর প্রভাতকালে এক মহা নাদ তাদেরকে আঘাত করল। সুতরাং তারা যা অর্জন করেছিল তা তাদের কোন কাজে আসেনি। (সূরা হিজ্‌র ঃ ৮০-৮৪)

সূরা ইস্‌রায় আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَآ اَنْ نُّرْسِلَ بِالْاٰيٰتِ اِلَّآ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُوْنَ. وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا. وَمَا نُرْسِلُ بِالْاٰيٰتِ اِلَّا تَخْوِيْفًا.

পূর্ববর্তিগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে বিরত রাখে। আমি শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ ছামূদ জাতিকে উটনী দিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি জুল্‌ম করেছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের জন্যেই নিদর্শন প্রেরণ করি। (সূরা ইস্‌রা ঃ ৫৯)

সূরা শু'আরায় আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلاَ تَتَّقُوْنَ. اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ. فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ. وَمَاۤ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ. اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اَتُتْرَكُوْنَ فِىْ مَا هٰهُنَاۤ اٰمِنِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ . وَزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ. وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فَارِهِيْنَ. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ. وَلاَ تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ .

اَلَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُوْنَ . قَالُوْٓا اِنَّمَاۤ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ. مَاۤ اَنْتَ اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ . قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ. وَلاَ تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ. فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ . فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ . وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

ছামূদ সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। যখন ওদের স্বগোত্রীয় সালিহ্ তাদেরকে বলল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল। অতএব, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর, আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে কোন প্রতিদান চাই না; আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকটেই আছে। তোমাদেরকে কি নিরাপদে ছেড়ে রাখা হবে, যা এখানে আছে তাতে—উদ্যানে, প্রস্রবণে ও শস্যক্ষেত্রে এবং সুকোমল গুচ্ছবিশিষ্ট খেজুর বাগানে? তোমরা তো নৈপুণ্যের সাথে পাহাড় কেটে ঘর তৈরি করছ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না।

যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না তারা বলল, 'তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্যতম। তুমি তো আমাদের মত একজন মানুষ, কাজেই তুমি যদি সত্যবাদী হও একটি নিদর্শন উপস্থিত কর। সালিহ্ বলল, এই যে উটনী, এর জন্যে আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা, নির্ধারিত এক এক দিনে; এবং এর কোন অনিষ্ট সাধন করো না; করলে মহা দিবসের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। কিন্তু ওরা ওকে বধ করল, পরিণামে ওরা অনুতপ্ত হল। তারপর শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (সূরা শু'আরা ঃ ১৪১-১৫৯)

সূরা নামলে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا . أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَنِ يَخْتَصِمُونَ . قَالَ يَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ. لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ. قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ.

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ . قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ . فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.

আমি অবশ্যই ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের স্বগোত্রীয় সালিহ্‌কে পাঠিয়েছিলাম এ আদেশসহ, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, কিন্তু ওরা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ ত্বরান্বিত করতে চাচ্ছ? কেন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছ না, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার? তারা বলল, 'তোমাকে ও তোমার সংগে যারা আছে তাদের আমরা অমংগলের কারণ মনে করি।' সালিহ্ বলল, 'তোমাদের শুভাশুভ আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে, বস্তুত তোমরা এমন এক সম্প্রদায় যাদেরকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।'

আর সে শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎকর্ম করত না। তারা বলল, তোমরা আল্লাহ্‌র নামে শপথ গ্রহণ কর, 'আমরা রাতের বেলা তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে অবশ্যই আক্রমণ করব, তারপর তার অভিভাবককে নিশ্চয় বলব, তার পরিবার-পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।' তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কী হয়েছে—আমি অবশ্যই তাদেরকে ও তাদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। এই তো ওদের ঘরবাড়ি— সীমালংঘনের কারণে যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে; এতে জ্ঞানী-সম্প্রদায়ের জন্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এবং যারা মু'মিন ও মুত্তাকী ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। (সূরা নামল ঃ ৪৫-৫৩)

সূরা হা-মীম-আস-সাজদায় আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ . وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.

আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার তো এই যে, আমি তাদেরকে পথ-নির্দেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্তপথ অবলম্বন করেছিল। তারপর তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আঘাত হানল তাদের কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ। আমি উদ্ধার করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিল এবং তাকওয়া অবলম্বন করত। (সূরা হা-মীম-আস্-সাজদা ঃ ১৭ ঃ ১৮)

সূরা কামারে আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ . فَقَالُوْا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗ اِنَّا اِذًا لَّفِىْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ . ءَاُلْقِىَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابٌ اَشِرٌ . سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ . اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ . وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ . فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ . فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ . اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ . وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ .

ছামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারিগণকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। তারা বলেছিল, আমরা কি আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করব? তবে তো আমরা বিপথগামী এবং উন্মাদরূপে গণ্য হব। আমাদের মধ্যে কি ওরই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সে তো একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। আমি তাদের পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছি এক উটনী। অতএব, তুমি ওদের আচরণ লক্ষ্য কর এবং ধৈর্যশীল হও। এবং ওদেরকে জানিয়ে দাও যে, ওদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্যে প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে। তারপর তারা তাদের এক সংগীকে আহ্বান করল, সে ওকে ধরে হত্যা করল। কী কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! আমি ওদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা; ফলে ওরা হয়ে গেল খোঁয়াড় প্রস্তুতকারীর বিখণ্ডিত শুকনো শাখা-প্রশাখার মত। আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে; অতএব, উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরা কামার ঃ ২৩-৩২)

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَا . اِذِ انْبَعَثَ اَشْقٰهَا . فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا . فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا . فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا . وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا .

ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করেছিল। তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল, তখন আল্লাহ্র রাসূল তাদেরকে বলল, আল্লাহর উটনী এবং ওকে পানি পান করাবার ব্যাপারে সাবধান হও। কিন্তু তারা রাসূলকে অস্বীকার করে এবং ওকে কেটে ফেলে। তাদের পাপের জন্যে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন এবং এর পরিণামের জন্যে আল্লাহ্র আশংকা করার কিছু নেই। (সূরা শাম্স ঃ ১১-১৫)

আল্লাহ্ কুরআনের বহু স্থানে আদ ও ছামূদ জাতির উল্লেখ একসাথে পাশাপাশি করেছেন। যেমন সূরা বারাআত, সূরা ইবরাহীম, সূরা ফুরকান, সূরা সাদ, সূরা কাফ, সূরা নাজ্‌ম ও সূরা ফজ্‌র। বলা হয়ে থাকে যে, এই দুটি জাতি সম্পর্কে আহ্‌লিকিতাবরা কিছুই জানতো না এবং তাদের তাওরাত কিতাবেও এ সম্পর্কে কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু পবিত্র কুরআন থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হযরত মূসা (আ) এ দুই জাতি সম্পর্কে তাঁর সম্প্রদায়কে অবগত করেছিলেন। যেমন সূরা ইবরাহীমে আছে ঃ

وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ. وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ. لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ.

মূসা বলেছিল, তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও, তথাপি আল্লাহ অমুখাপেক্ষী এবং প্রশংসার্হ। তোমাদের নিকট কি সংবাদ আসেনি তোমাদের পূর্ববর্তীদের— নূহের সম্প্রদায়ের, আদের ও ছামূদদের এবং তাদের পরবর্তীদের? তাদের বিষয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের রাসূল এসেছিল (সূরা ইবরাহীম ঃ ৮-৯)

এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে সবগুলো কথাই মূসা (আ)-এর যা তিনি নিজের জাতির উদ্দেশে বলেছিলেন। কিন্তু আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় দুটি যেহেতু আরব জাতির অন্তর্ভুক্ত, তাই বনী ইসরাঈলরা এদের ইতিহাস ভালভাবে সংরক্ষণ করেনি এবং গুরুত্ব-সহকারে স্মরণও রাখেনি; যদিও মূসা (আ)-এর সময়ে বনী ইসরাঈলদের মধ্যে তাদের ঘটনা মশহুর ছিল। আমার তাফসীর গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর।

এখন ছামূদ জাতির অবস্থা ও তাদের ঘটনা বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর নবী হযরত সালিহ (আ)-কে ও যারা তাঁর উপর ঈমান এনেছিল তাদেরকে কিভাবে আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, আর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী, অত্যাচারী কাফিরদেরকে কিভাবে নির্মূল করেছিলেন এখন তা বর্ণনা করা হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ছামূদ সম্প্রদায় জাতিতে ছিল আরব। আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংস হবার পর ছামূদ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। তারা তাদের অবস্থা থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি। এ কারণেই তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহ্র এই উটনী তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন। একে আল্লাহ্র জমিতে চরে খেতে দাও এবং একে কোন ক্লেশ দিও না, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। স্মরণ কর, আদ জাতির পর তিনি তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে বাসগৃহ নির্মাণ করছ। সুতরাং আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটিয়ো না। (সূরা আ'রাফ ঃ ৭৩-৭৪)

অর্থাৎ আদ জাতিকে ধ্বংস করে তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করার উদ্দেশ্য এই যে, তাদের ঘটনা থেকে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তারা যে সব অন্যায় আচরণ করত তোমরা তা করবে না। এ যমীন তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দেয়া হয়েছে। এর সমভূমিতে তোমরা অট্টালিকা নির্মাণ করছ আর পাহাড় কেটে সুনিপুণভাবে তাতে ঘরবাড়ি তৈরি করছ। অতএব, এর অনিবার্য দাবি হিসেবে এসব নিয়ামতের শোকর আদায় কর, সৎকর্মে তৎপর থাক, একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহ্র বন্দেগী কর যাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর নাফরমানী ও দাসত্ব থেকে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে সাবধান থাক। কেননা, এর পরিণতি খুবই জঘন্য।

এ উদ্দেশ্যে নবী এ বাণী দ্বারা উপদেশ দিচ্ছেন ঃ

أَتُتْرَكُوْنَ فِيْمَا هٰهُنَا اٰمِنِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ.

তোমাদেরকে কি এ জগতের ভোগ-বিলাসের মধ্যে নিরাপদে রেখে দেয়া হবে? উদ্যানসমূহের মধ্যে ও ঝরনাসমূহের মধ্যে? শস্যক্ষেত্রের মধ্যে ও মঞ্জুরিত খেজুর বাগানের মধ্যে? (সূরা শু'আরা ঃ ১৪৬-১৪৮)

وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فَارِهِيْنَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ وَلَا تُطِيْعُوْا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ. اَلَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ.

তোমরা পাহাড় কেটে জাঁকজমকের ঘরবাড়ি নির্মাণ করছ। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর এবং সীমালংঘনকারীদের আদেশ মান্য করো না—যারা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে এবং শান্তি স্থাপন করে না। (সূরা শু'আরা ঃ ১৪১-১৪২)

নবী তাদেরকে আরও বললেন ঃ

يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ هُوَ اَنْشَاَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيْهَا.

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কবূল কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই। তিনিই তোমাদেরকে যমীন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যেই বসবাস করার সুবিধা দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যমীন থেকে উদ্ভাবন

করেছেন। তারপর তোমাদেরকেই যমীনের আবাদকারী বানিয়েছেন। অর্থাৎ পৃথিবীর যাবতীয় শস্য এবং ফল-ফলাদি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। এভাবে তিনিই তোমাদের সৃষ্টিকারী ও রিযিকদাতা। সুতরাং ইবাদত পাওয়ার হকদার একমাত্র তিনিই, অন্য কেউ নয়। فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ – অতএব, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তওবা কর। অর্থাৎ তোমাদের বর্তমান কর্মনীতি পরিহার করে তাঁর ইবাদতের দিকে ধাবিত হও; তোমাদের ইবাদত-ইসতিগ্ফার কবূল করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।

اِنَّ رَبِّىْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ . قَالُوْا يٰصَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هٰذَا .

'আমার প্রতিপালক নিকটেই আছেন, তিনি তওবা কবূল করবেন—এতে কোন সন্দেহ নেই। তারা বলল, হে সালিহ্! ইতিপূর্বে তোমার উপর আমাদের বড় আশা ছিল।' অর্থাৎ তোমার এই জাতীয় কথাবার্তা বলার পূর্বে আমাদের আশা ছিল যে, তুমি একজন প্রজ্ঞাবান লোক হবে। কিন্তু আমাদের সে আশা ভূ-লুণ্ঠিত হল–এখন তুমি আমাদেরকে এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে, আমরা যে দেবতাদের পূজা করছি সেগুলো বর্জন করতে ও বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে বলছ। এ জন্যেই তারা বলল ঃ

اَتَنْهٰنَا اَنْ نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا وَاِنَّنَا لَفِىْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا اِلَيْهِ مُرِيْبٍ . قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَاٰتٰنِىْ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُنِىْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِىْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ .

আমাদের বাপ-দাদারা যাদের পূজা করত, তুমি কি আমাদেরকে তাদের পূজা করতে নিষেধ করছো? তুমি আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছ, সে বিষয়ে আমরা অবশ্যই বিভ্রান্তিকর সন্দেহ পোষণ করি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কি ভেবে দেখেছো আমি যদি আমার প্রতিপালক প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণসহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি, আর তিনি যদি আমাকে তাঁর নিজ অনুগ্রহ দান করে থাকেন, তারপর আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা করি, তবে তাঁর শাস্তি থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বাড়িয়ে দিচ্ছো। (সূরা হূদ ঃ ৬২-৬৩)

এ হচ্ছে হযরত সালিহ্ (আ)-এর কোমল ভাষার প্রয়োগ ও সৌজন্যমূলক আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে কল্যাণের পথে আহ্বান। অর্থাৎ তোমাদের কী ধারণা—যদি আমি তোমাদেরকে যেদিকে আহ্বান জানাচ্ছি তা প্রকৃতপক্ষে সত্য হয়ে থাকে তবে আল্লাহ্র নিকট তোমাদের কি ওজর থাকবে এবং তখন তোমাদেরকে কিসে মুক্তি দেবে? অথচ তোমরা আমাকে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াতের কাজ পরিহার করতে বলছ আর তা কোনক্রমেই আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, এটি আমার অপরিহার্য কর্তব্য। আমি যদি তা ত্যাগ করি, তবে তাঁর পাকড়াও থেকে না তোমরা আমাকে বাঁচাতে পারবে; না অন্য কেউ, না কেউ আমাকে সাহায্য করতে সক্ষম হবে। সুতরাং তোমাদের ও আমার মধ্যে আল্লাহ্র ফয়সালা আসার পূর্ব পর্যন্ত আমি লা-শরীক এক আল্লাহ্র দিকে আহ্বানের কাজ চালিয়ে যেতে থাকব।

সালিহ্ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজন আরো বলেছিল ঃ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ। (তুমি তো একজন জাদুগ্রস্ত লোক) অর্থাৎ তোমার উপর জাদুর প্রভাব পড়েছে, তাই সকল দেবতাকে বাদ দিয়ে এক আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্যে তুমি যে আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছ তাতে তুমি কী বলছো তা তুমি নিজেই বুঝতে পারছো না।

অধিকাংশ আলিমই এই অর্থ করেছেন ঃ مُسَحَّرِيْنَ অর্থ مَسْحُوْرِيْنَ- । কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন যে, তোমার কাছে জাদু আছে, অর্থাৎ তুমি জাদুকর (ممن له سحر)। তারা এ কথা বলছে যে, তুমি একজন মানুষ, তোমার জাদু জানা আছে। তবে প্রথম অর্থই অধিকতর স্পষ্ট। যেহেতু পরেই তাদের কথা আসছে যে, তারা বলেছে ঃ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا তুমি তো আমাদের মতই মানুষ। فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ (তুমি কোন একটা নিদর্শন নিয়ে এসো যদি তুমি সত্যবাদী হয়ে থাক।) তারা নবীর কাছে দাবি জানায়, যে কোন একটা অলৌকিক জিনিস দেখিয়ে তিনি যেন নিজের দাবির সত্যতার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপিত করেন।

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ. وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ عَظِيْمٌ.

সালিহ্ বলল, এই উটনী, এর জন্যে আছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্যে আছে পানি পানের পালা—নির্দিষ্ট এক এক দিনের। তোমরা একে কোন কষ্ট দিও না, তাহলে তোমাদেরকে মহা দিবসের আযাব পাকড়াও করবে। (সূরা শু'আরা ঃ ১৫৩)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِىْ أَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে। আল্লাহ্র এ উটনী তোমাদের জন্যে একটি নিদর্শন। অতএব, একে আল্লাহ্র যমীনে চরে খেতে দাও। একে কোন ক্লেশ দিও না, দিলে মর্মন্তুদ শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। (সূরা আ'রাফ ঃ ৭৩)

আল্লাহ্র বাণী ঃ – وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا আমি শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ ছামূদ জাতিকে উটনী দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা তার প্রতি জুলুম করেছিল। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৫৯)

মুফাস্সিরগণ উল্লেখ করেন, ছামূদ সম্প্রদায়ের লোকেরা একবার এক স্থানে সমবেত হয়। ঐ সমাবেশে আল্লাহর নবী হযরত সালিহ্ (আ) আগমন করেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানান, উপদেশ দান করেন, ভীতি প্রদর্শন করেন, নসীহত করেন এবং তাদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দেন। উপস্থিত লোকজন তাঁকে বলল, ঐ যে একটা পাথর দেখা যায়, ওর মধ্য থেকে যদি অমুক অমুক গুণসম্পন্ন একটি দীর্ঘকায় দশ মাসের গর্ভবতী উটনী বের করে দেখাতে পার, তবে দেখাও। সালিহ্ (আ) বললেন ঃ তোমাদের বর্ণিত গুণসম্পন্ন উটনী যদি আমি বের

করে দেই তাহলে কি তোমরা আমার আনীত দীন ও আমার নবুওতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে? তারা সবাই বলল ঃ হ্যাঁ, বিশ্বাস করব। তখন তিনি এ কথার উপর তাদের থেকে অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। এরপর সালিহ্ (আ) সালাত আদায়ের জন্যে দাঁড়িয়ে যান এবং সালাত শেষে আল্লাহ্র নিকট তাদের আবদার পূরণ করার প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্ ঐ পাথরকে কেটে গিয়ে অনুরূপ গুণসম্পন্ন একটি উটনী বের করে দেয়ার নির্দেশ দেন। যখন তারা স্বচক্ষে এরূপ উটনী দেখতে পেল, তখন তারা সত্যি সত্যি এক বিস্ময়কর বিষয়, ভীতিপ্রদ দৃশ্য, সুস্পষ্ট কুদরত ও চূড়ান্ত প্রমাণই প্রত্যক্ষ করল। এ দৃশ্য দেখার পর উপস্থিত বহু লোক ঈমান আনে বটে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাদের কুফরী, গুমরাহী ও বৈরিতার উপর অটল হয়ে থাকল।

এ জন্যেই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ فَظَلَمُوْا بِهَا (তারা তার সাথে জুলুম করল) অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই মানতে অস্বীকার করল এবং সত্যকে গ্রহণ করল না। যারা ঈমান এনেছিল তাদের প্রধান ছিল জান্দা ইব্ন আমর ইব্ন মুহাল্লাত ইব্ন লবীদ ইব্ন জুওয়াস। এ ছিল ছামূদ সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা। সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গও ইসলাম গ্রহণে উদ্যত হয়, কিন্তু তিন ব্যক্তি তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখে। তারা হল ঃ যাওয়াব ইব্ন উমর ইব্ন লবীদ ও খাব্বাব—এ দুইজন ছিল তাদের ধর্মগুরু এবং রাবাব ইব্ন সামআর ইব্ন জাল্মাস। জানদা ইসলাম গ্রহণ করার পর আপন চাচাত ভাই শিহাব ইব্ন খলীফাকে ঈমান আনার জন্যে আহ্বান জানায়। সেও ছিল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোক এবং ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে সেও উদ্যত হয়। কিন্তু ঐ ব্যক্তিরা তাকে বাধা দিলে সে তাদের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মিহরাশ ইব্ন গানামা ইব্ন যুমায়ল নামক জনৈক মুসলমান কবি তাঁর কবিতায় বলেন ঃ

"আমর পরিবারের একদল লোক শিহাবকে নবীর দীন কবূল করার জন্যে আহ্বান জানায়। এরা সকলেই ছামূদ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লোক। শিহাবও সে আহ্বানে সাড়া দিতে উদ্যত হয়। যদি সে সাড়া দিত তাহলে নবী সালিহ্ (আ) আমাদের মাঝে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যেত। জুওয়াব তার সঙ্গীর সাথে সুবিচার করেনি। বরং হিজর উপত্যকার কতিপয় নির্বোধ লোক আলোর পথ দেখার পরেও মুখ ফিরিয়ে থাকে।"

এ কারণে হযরত সালিহ (আ) তাদেরকে বললেন ঃ هٰذِهٖ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً (এটি আল্লাহ্র উটনী, তোমাদের জন্যে নিদর্শন)। আল্লাহ্র উটনী শব্দটি বলা হয়েছে উটনীটির মর্যাদা নির্দেশের উদ্দেশ্যে। যেমন বলা হয় بيت الله আল্লাহ্র ঘর; عبد الله وআল্লাহ্র বান্দা। ولكم اية- তোমাদের জন্যে নিদর্শন। অর্থাৎ আমি তোমাদের কাছে যে দাওয়াত নিয়ে এসেছি এটা তার সত্যতার প্রমাণ।

فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ.

'একে আল্লাহ্র যমীনে চরে খেয়ে বেড়াতে দাও এবং এর অনিষ্ট সাধন করো না। অন্যথায় এক নিকটবর্তী আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।' তারপর অবস্থা এই দাঁড়াল যে, এ উটনীটি তাদের মধ্যে স্বাধীনভাবে যেখানে ইচ্ছা চরে বেড়াত, একদিন পর পর পানির ঘাটে

অবতরণ করত। যেদিন সে পানি পান করত সেদিন কূপের সমস্ত পানি নিঃশেষ করে ফেলত। তাই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের পালার দিনে পরের দিনের জন্যে প্রয়োজনীয় পানি উত্তোলন করে রাখত। কথিত আছে যে, সম্প্রদায়ের লোকজন ঐ উটনীটির দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ পান করত। لَهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ (এ উটনীটির জন্যে রয়েছে পানি পানের নির্দিষ্ট দিন এবং তোমাদের জন্যেও রয়েছে পানি পানের নির্দিষ্ট দিন)। আল্লাহ্ বলেন ঃ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ (আমি এ উটনী পাঠিয়েছি তাদের পরীক্ষার জন্যে) পরীক্ষা এই যে, তারা কি এতে ঈমান আনে, না কি কুফরী করে। আর প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা কি করবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। فَارْتَقِبْهُمْ (অতএব, তুমি তাদের আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখ) এবং প্রতীক্ষায় থাক وَاصْطَبِرْ (এবং ধৈর্য ধারণ কর) তাদের থেকে যে কষ্ট আসে তা সহ্য কর। অচিরেই তোমার নিকট সুস্পষ্ট খবর এসে পড়বে। وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ (এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্যে প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে। (সূরা কামার ঃ ২৭-২৮)

দীর্ঘ দিন যাবত এ অবস্থা চলতে থাকায় সম্প্রদায়ের লোকেরা অধৈর্য হয়ে পড়ে। এর থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যে তারা একদা সমবেত হয় ও পরামর্শ করে। তারা সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত করে যে, উটনীটিকে হত্যা করতে হবে। এর ফলে তারা উটনীটির কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবে এবং সমস্ত পানির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব তাদের প্রতিষ্ঠিত হবে। শয়তান তাদেরকে এ কাজের যুক্তি ও সুফল প্রদর্শন করল। আল্লাহ্র বাণী ঃ

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوْا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ.

অতঃপর তারা সেই উটনীটি বধ করে এবং আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে এবং বলে, হে সালিহ্! তুমি রাসূল হয়ে থাকলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা নিয়ে এসো। (সূরা আ'রাফ ঃ ৭৭)

যে লোক উটনী হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করে তার নাম কিদার ইব্ন সালিফ ইব্ন জানদা—সে ছিল সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা। সে ছিল গৌরবর্ণ, নীল চোখ ও পিঙ্গল চুল বিশিষ্ট। কথিত মতে, সে ছিল সালিফ-এর যারজ সন্তান। সায়বান নামক এক ব্যক্তির ঔরসে তার জন্ম হয়। কিদার একা হত্যা করলেও যেহেতু সম্প্রদায়ের সকলের ঐকমত্যে করেছিল তাই হত্যা করার দায়িত্ব সবার প্রতি আরোপিত হয়েছে।

ইব্ন জারীর (র) প্রমুখ মুফাস্সির লিখেছেন ঃ ছামূদ সম্প্রদায়ের দুই মহিলা- একজনের নাম সাদূক। সে মাহ্য়া ইব্ন যুহায়র ইব্ন মুখতারের কন্যা এবং প্রচুর ধন-সম্পদ ও বংশীয় গৌরবের অধিকারী। তার স্বামী ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে এবং নিজের চাচাত ভাই মিস্রা ইব্ন মিহ্রাজ ইব্ন মাহ্য়াকে বলে, যদি তুমি উটনীটি হত্যা করতে পার, তবে তোমাকে আমি বিবাহ করব। অপর মহিলাটি ছিল উনায়যা বিনত গুনায়ম ইব্ন মিজলায, তাকে উম্মে উছমান বলে ডাকা হতো। মহিলাটি ছিল বৃদ্ধা এবং কাফির। তার স্বামী ছিল সম্প্রদায়ের অন্যতম সর্দার যুওয়াব ইব্ন আমর। এই স্বামীর ঔরসে তার চারটি কন্যা ছিল।

মহিলাটি কিদার ইব্‌ন সালিফকে প্রস্তাব দেয় যে, সে যদি উটনীটি হত্যা করতে পারে তবে তার এ চার কন্যার মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে বিয়ে করতে পারবে। তখন ঐ যুবকদ্বয় উটনী হত্যার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সম্প্রদায়ের লোকদের সমর্থন লাভের চেষ্টা চালায়। সে মতে, অপর সাত ব্যক্তি তাদের ডাকে সাড়া দেয়। এভাবে তারা নয়জন ঐক্যবদ্ধ হয়। কুরআনে সে কথাই বলা হয়েছে ঃ

وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ-

আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং কোন সৎকর্ম করত না। (সূরা নামল ঃ ৪৮)

তারপর এই নয়জন গোটা সম্প্রদায়ের কাছে যায় এবং উটনী হত্যার উদ্যোগের কথা জানায়। এ ব্যাপারে সকলেই তাদেরকে সমর্থন করে ও সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। এরপর তারা উটনীর সন্ধানে বের হয়। যখন তারা দেখতে পেল যে, উটনীটি পানির ঘাট থেকে ফিরে আসছে, তখন তাদের মধ্যকার মিস্‌রা নামক ব্যক্তিটি যে পূর্ব থেকে ওঁৎ পেতে বসে ছিল সে একটি তীর তার দিকে ছুঁড়ে মারে, তীরটি উটনীটির পায়ের গোছা ভেদ করে চলে যায়। এদিকে মহিলারা তাদের মুখমণ্ডল অবারিত করে গোটা কবিলার মধ্যে উটনী হত্যার কথা ছড়িয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করতে থাকে। কিদার ইব্‌ন সালিফ অগ্রসর হয়ে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে উটনীটির পায়ের গোছার রগ কেটে দেয়। সাথে সাথে উটনীটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং বিকট শব্দে চিৎকার দিয়ে ওঠে। চিৎকারের মাধ্যমে সে তার পেটের বাচ্চাকে সতর্ক করে। কিদার পুনরায় বর্শা দিয়ে উটনীটির বুকে আঘাত করে এবং তাকে হত্যা করে। ওদিকে বাচ্চাটি একটি দুর্গম পাহাড়ে আরোহণ করে তিনবার ডাক দেয়।

আবদুর রজ্জাক (র) হাসান (র) থেকে বর্ণিত ঃ উটনীটির বাচ্চার ডাক ছিল এই ঃ يارب اين امى হে আমার রব! আমার মা কোথায়? এরপর সে একটি পাথরের মধ্যে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। কারো কারো মতে, লোকজন ঐ বাচ্চার পশ্চাদ্ধাবন করে তাকেও হত্যা করেছিল।

আল্লাহ্ বলেন ঃ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ.

অতঃপর তারা তাদের এক সংগীকে আহ্বান করল এবং সে এসে উটনীটিকে ধরে হত্যা করল। দেখ, কি কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী (সূরা কামার ঃ ২৯-৩০)

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِذِ انْبَعَثَ اَشْقَاهَا. فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا.

'ওদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য সে যখন তৎপর হয়ে উঠলো, তখন আল্লাহ্‌র রাসূল বলল, আল্লাহ্‌র উটনী ও তার পানি পান করার বিষয়ে সাবধান হও।' অর্থাৎ তোমরা একে ভয় করিও। কিন্তু তারা রাসূলকে অস্বীকার করল এবং উটনীটিকেও হত্যা করে ফেললো।

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوّٰهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا.

তাদের পাপের জন্যে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন এবং এর পরিণামের জন্য আল্লাহ্‌র আশঙ্কা করার কিছু নেই। (সূরা শামস্ ঃ ১২-১৫)

ইমাম আহ্মদ (র) আবদুল্লাহ ইব্ন নুমায়র (র) সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন যাম'আ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার ভাষণ দিতে গিয়ে উটনী ও তার হত্যাকারীর প্রসংগ উল্লেখ করেছিলেন ঃ إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগা সে যখন তৎপর হয়ে উঠল) যে লোকটি তৎপর হয়েছিল সে অত্যন্ত কঠিন, রূঢ় ও কওমের সর্দার। আবূ যাম'আর ন্যায় মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক লিখেছেন, ইয়াযীদ ইব্ন মুহাম্মদ আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হে আলী! আমি কি তোমাকে মানব গোষ্ঠীর সবচেয়ে বড় দুই হতভাগার কথা শুনাব? আলী (রা) বললেন, বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ একজন হল ছামূদ সম্প্রদায়ের সেই গৌরবর্ণ লোকটি, যে উটনী হত্যা করেছিল; আর দ্বিতীয়জন হল সেই ব্যক্তি যে তোমার এই স্থানে (অর্থাৎ মস্তকের পার্শ্বে) আঘাত করবে, যার ফলে এটা অর্থাৎ দাড়ি ভিজে যাবে। ইব্ন আবূ হাতিম (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. وَقَالُوْا يَاصَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ.

অতঃপর তারা সেই উটনী বধ করে এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করে এবং বলে, হে সালিহ্! তুমি রাসূল হয়ে থাকলে আমাদেরকে যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর। (সূরা আ'রাফ ঃ৭৭)

এই উক্তির মধ্যে তারা কয়েকটি জঘন্য কুফরী কথা বলেছে যথা ঃ (১) আল্লাহ যে উটনী তাদের জন্যে নিদর্শন রূপে পাঠিয়ে তাকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন, তারা তাকে হত্যা করে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে। (২) আযাব আনয়নের জন্যে তারা বেশি রকম তাড়াহুড়া করে। দুই কারণে তারা সে আযাবে গ্রেফতার হয়, (এক) তাদের উপর আরোপিত শর্ত– وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ (একে কোনরূপ কষ্ট দিও না, অন্যথায় অতি শীঘ্রই আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করবে।) অন্য এক আয়াতে আছে— عَذَابٌ عَظِيْمٌ. (ভয়াবহ আযাব), অপর এক আয়াতে আছে — عذاب اليم (পীড়াদায়ক আযাব)। এর প্রতিটিই যথার্থরূপে দেখা দেয়। (দুই) আযাব তাড়াতাড়ি এনে দেয়ার জন্যে তাদের পীড়াপীড়ি করা। (৩) তারা তাদের নিকট প্রেরিত রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথচ তিনি তাঁর নবুওতের দাবির সত্যতার পক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থিত করেছিলেন এবং তারাও তা নিশ্চিতরূপে জানতো। কিন্তু সত্যকে এড়িয়ে চলার মানসিকতা ও আযাবে গ্রেফতার হওয়ার যোগ্যতাই তাদেরকে ভ্রান্ত কুফরী পথে যেতে ও বিদ্বেষী হয়ে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ বলেন ঃ

فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ–ذَالِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ .

কিন্তু ওরা তাকে বধ করল। ফলে সালিহ্ বলল, তোমরা তোমাদের বাড়িতে তিনদিন জীবন উপভোগ করে নাও। এ এমন একটি ওয়াদা যা মিথ্যা হবার নয়। (সূরা হূদ ঃ ৬৫)

মুফাসসিরগণ লিখেছেন, উটনীটির উপর প্রথম যে ব্যক্তি হামলা করে তার নাম কিদার ইবন সালিফ (তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক।) প্রথম আঘাতেই উটনীটির পায়ের

গোছা কেটে যায় এবং সে মাটিতে পড়ে যায়। এরপর অন্যরা দৌড়ে গিয়ে তরবারি দ্বারা কেটে উটনীটির দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করে। উটনীটির সদ্য প্রসূত বাচ্চা এ অবস্থা দেখে দৌড়ে নিকটবর্তী এক পাহাড়ে গিয়ে ওঠে এবং তিনবার আওয়াজ দেয়। এজন্যে সালিহ্ (আ) তাদেরকে বললেনঃ تَمَتَّعُوْا فِىْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ . তোমরা তিনদিন পর্যন্ত তোমাদের ঘরবাড়িতে জীবন উপভোগ কর। অর্থাৎ ঘটনার ঐ দিন বাদ দিয়ে পরবর্তী তিনদিন। কিন্তু এত কঠোর সতর্কবাণী শুনানো সত্ত্বেও তারা এ কথা বিশ্বাস করল না। বরং ঐ রাত্রেই নবীকেও হত্যা করার ষড়যন্ত্র পাকায় এবং উটনীটির মত তাকেও খতম করার পরিকল্পনা করে। قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ . তারা পরস্পরে বলল, আল্লাহর নামে কসম কর যে, আমরা সালিহ্ ও তার পরিবারসহ লোকদের উপর রাত্রিবেলায় আক্রমণ চালাব। অর্থাৎ আমরা তার বাড়িতে হামলা করে সালিহ্‌কে তার পরিবার -পরিজনসহ হত্যা করব এবং পরে তার অভিভাবকরা যদি রক্তপণ চায় তবে আমরা হত্যা করার কথা অস্বীকার করব। এ কথাই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصَادِقُوْنَ .

পরে তার অভিভাবককে বলব, আমরা তার পরিবারের হত্যা প্রত্যক্ষ করিনি। (সূরা নামল ঃ ৪৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন ঃ

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ . فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ . فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا . اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ . وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ .

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি। অতএব দেখ, ওদের চক্রান্তের পরিণতি কি হয়েছে! আমি অবশ্যই ওদের এবং ওদের সম্প্রদায়ের সকলকে ধ্বংস করেছি। এই তো ওদের ঘরবাড়ি – সীমালংঘন করার কারণে যা জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। আর যারা মুমিন-মুত্তাকী ছিল তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছি। (সূরা নামল ঃ ৫০-৫৩)

ছামূদ জাতির ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছিল নিম্নরূপে ঃ যে কয় ব্যক্তি হযরত সালিহ্ (আ)-কে হত্যা করতে সংকল্পবদ্ধ হয়, আল্লাহ্ প্রথমে তাদের উপর পাথর নিক্ষেপ করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। পরে গোটা সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন। যে তিনদিন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছিল তার প্রথমদিন ছিল বৃহস্পতিবার। এই দিন আসার সাথে সাথে সম্প্রদায়ের সকলের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। যখন সন্ধ্যা হল তখন পরস্পর বলাবলি করল, 'জেনে রেখ, নির্ধারিত সময়ের প্রথম দিন শেষ হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন শুক্রবারে সকলের চেহারা লাল রঙ ধারণ করে। সন্ধ্যাকালে তারা বলাবলি করে যে, শুনে রেখ, নির্ধারিত সময়ের দুইদিন কেটে গেছে। তৃতীয় দিন শনিবারে সকলের চেহারা কাল রঙ ধারণ করে। সন্ধ্যাবেলা তারা বলাবলি করে যে, জেনে নাও, নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেছে। রবিবার সকালে তারা খোশবু লাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষায় থাকল— কি শাস্তি ও আযাব-গযব নাযিল হয় তা দেখার জন্যে। তাদের কোনই

ধারণা ছিল না যে, তাদেরকে কি করা হবে এবং কোন্ দিক থেকে আযাব আসবে। কিছু সময় পর সূর্য যখন উপরে এসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তখন আসমানের দিক থেকে বিকট আওয়াজ এলো এবং নিচের দিক থেকে প্রবল ভূকম্পন শুরু হল। সাথে সাথে তাদের প্রাণবায়ু উড়ে গেল, সকল নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল, শোরগোল স্তব্ধ হল এবং যা সত্য তাই বাস্তবে ঘটে গেল। ফলে সবাই লাশ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল।'

ইতিহাসবেত্তাগণ লিখেছেন, ছামূদ সম্প্রদায়ের এ আযাব থেকে একজন মাত্র মহিলা ছাড়া আর কেউই মুক্তি পায়নি। মহিলাটির নাম কালবা বিনত সালাকা, ডাকনাম যারীআ। সে ছিল কট্টর কাফির ও হযরত সালিহ্ (আ)-এর চরম দুশমন। আযাব আসতে দেখেই সে দ্রুত বের হয়ে দৌড়ে এক আরব গোত্রে গিয়ে উঠল এবং তার সম্প্রদায়ের উপর পতিত যে আযাব সে প্রত্যক্ষ করে এসেছে—তার বর্ণনা দিল। পিপাসায় কাতর হয়ে সে পানি পান করতে চাইল। কিন্তু পানি পান করার সাথে সাথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

আল্লাহর বাণী ঃ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا (যেন সেখানে তারা কোন দিন বসবাস করে নাই)। আল্লাহ বলেন ঃ اَلَا اِنَّ ثَمُوْدَ كَفَرُوْا رَبَّهُمْ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ . (জেনে রেখ, ছামূদ সম্প্রদায় তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছিল। জেনে রেখ, ধ্বংসই হল ছামূদ সম্প্রদায়ের পরিণাম) (সূরা হূদ ঃ ৬৮)। এটাই ছিল তাদের অদৃষ্ট লিখন।

ইমাম আহমদ (র), আবদুর রাজ্জাক (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার হিজর উপত্যকা দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলেন ঃ তোমরা আল্লাহর নিদর্শন অর্থাৎ মুজিযা দেখার আবদার করো না। সালিহ্ (আ)-এর সম্প্রদায় এরূপ আবদার জানিয়েছিল। সেই নিদর্শনের উটনী এই গিরিপথ দিয়ে পানি পান করার জন্যে যেত এবং পান করার পর এই পথ দিয়েই উঠে আসত فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوْهَا (তারা আল্লাহর হুকুমের অবাধ্য হল ও উটনীটিকে বধ করল)।

উটনী একদিন তাদের পানি পান করত এবং তারা একদিন উটনীর দুধ পান করত। পরে তারা উটনীটিকে বধ করে। ফলে এক বিকট আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করে। এতে ছামূদ সম্প্রদায়ের শুধু একজন লোক ব্যতীত আসমানের নিচে তাদের যত লোক ছিল সবাইকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেন। সেই লোকটি হারম শরীফে অবস্থান করছিল। সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করল, কে সেই লোকটি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তার নাম আবূ রাগাল। পরে হারম শরীফ থেকে বের হবার পর ঐ আযাব তাকে ধ্বংস করে, যে আযাব তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিল। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সংগৃহীত; কিন্তু হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয়টি কিতাবের কোনটিতেই এর কোন উল্লেখ নেই। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আবদুর রাজ্জাক (র) ইসমাঈল ইবন উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, একদা নবী করীম (সা) আবূ রাগালের কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, এই কবরবাসী কে? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সম্যক জানেন। তিনি বললেন, এটা আবূ রাগালের কবর, সে ছামূদ সম্প্রদায়ের লোক। আল্লাহর হারমে সে অবস্থান করছিল। সুতরাং আল্লাহর হারম আল্লাহর আযাব থেকে দূরে রাখে। পরে হারম থেকে সে

বেরিয়ে আসলে সেই আযাব তাকে ধ্বংস করে, যে আযাব তার সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছিল। তারপর এখানে তাকে দাফন করা হয় এবং তার সাথে স্বর্ণনির্মিত একটি ডালও দাফন করা হয়। এ কথা শুনে কাফেলার সবাই বাহন থেকে নেমে এসে তরবারি দ্বারা কবর খুঁড়ে স্বর্ণের ডাল বের করে নিয়ে আসে।

আবদুর রাজ্জাক (র) যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ রাগালের অপর নাম আবূ ছাকীফ। বর্ণনার এই সূত্রটি মুরসাল। এ হাদীস মুত্তাসিল সনদেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) তাঁর সীরাত গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) প্রমুখাৎ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর তাইফ গমনের সময় আমরাও সাথে ছিলাম। একটি কবর অতিক্রম করার সময় তিনি বললেন, এটি আবূ রাগালের কবর— যাকে আবূ ছাকীফও বলা হয়। সে ছামূদ সম্প্রদায়ের লোক। হারমে অবস্থান করায় তার উপর তাৎক্ষণিকভাবে আযাব আসেনি। পরে যখন হারম থেকে বেরিয়ে এই স্থানে আসে, তখন সেই আযাব তার উপর পতিত হয়, যে আযাব তার সম্প্রদায়ের উপর পতিত হয়েছিল। এখানেই তাকে দাফন করা হয়। এর প্রমাণ এই যে, তার সাথে স্বর্ণের একটি ডালও দাফন করা হয়েছিল। তোমরা তার কবর খুঁড়লে সাথে ঐ ডালটিও পাবে। তখনই লোকজন কবরটি খুঁড়ে ডালটি বের করে আনে। আবূ দাউদ (র) মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাফিজ আবুল হাজ্জাজ মায্যী একে হাসান ও 'আযীয' পর্যায়ের হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন।

আমার মতে, এ হাদীসটি বুজায়র ইব্ন আবূ বুজায়র একাই বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোন হাদীসের বর্ণনাকারী হিসেবে তাকে দেখা যায় না। এছাড়া ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়া ব্যতীত অন্য কেউ এটা বর্ণনা করেননি। শায়খ আবুল হাজ্জাজ বলেছেন, এ হাদীসকে মারফূ' বলা অমূলক, এটা আসলে আবদুল্লাহ ইব্ন আমরেরই একটি উক্তি। তবে পূর্বে বর্ণিত মুরসাল ও জাবিরের হাদীসে এর সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহর বাণী ঃ

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَّاتُحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ-

অতঃপর সালিহ্ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো আমার প্রতিপালকের বাণী তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তো হিতাকাঙ্ক্ষীদেরকে পছন্দ কর না। (সূরা আ'রাফ ঃ ৭৯)

সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পর হযরত সালিহ্ (আ) তাদেরকে উদ্দেশ করে যে কথা বলেছিলেন, এখানে তা জানান হয়েছে। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের এলাকা থেকে অন্যত্র যাওয়ার সময় বলেছিলেন ঃ يَا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ (হে আমার সম্প্রদায়! আমার রবের পয়গাম আমি তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে উপদেশও দিয়েছিলাম) অর্থাৎ তোমাদের হিদায়াতের জন্যে আমি আমার

সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলাম। কথায়, কাজে ও সদিচ্ছা দিয়ে তা একান্তভাবে কামনা করেছিলাম وَلَٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ . (কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষীদেরকে তোমরা পছন্দ কর না) অর্থাৎ সত্য তোমরা কবূল করনি আর না কবূল করতে প্রস্তুত ছিলে। এ কারণেই আজ তোমরা চিরস্থায়ী আযাবের মধ্যে পড়ে রয়েছ। এখন আমার আর করার কিছুই নেই। তোমাদের থেকে আযাব দূর করার কোন শক্তি আমার আদৌ নেই। আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া ও উপদেশ দেয়ার দায়িত্বই আমার উপর ন্যস্ত ছিল। সে দায়িত্ব আমি পালন করেছি। কিন্তু কার্যত সেটাই হয় যেটা আল্লাহ চান।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)ও অনুরূপভাবে বদর প্রান্তরে অবস্থিত কূপে নিক্ষিপ্ত নিহত কাফির সর্দারদের লাশগুলো সম্বোধন করে ভাষণ দিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধে নিহত কুরায়শ সর্দারকে বদরের কূপে নিক্ষেপ করা হয়। তিনদিন পর শেষরাতে ময়দান ত্যাগ করার সময় রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত কূপের নিকট দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'হে কূপবাসীরা! তোমাদের সাথে তোমাদের প্রভু যে ওয়াদা করেছিলেন তার সত্যতা দেখতে পেয়েছো তো? আমার সাথে আমার প্রভুর যে ওয়াদা ছিল তা আমি পুরোপুরি সত্যরূপে পেয়েছি।' রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন, "তোমরা হচ্ছ নবীর নিকৃষ্ট পরিজন। তোমরা তো তোমাদের নবীকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করছ। কিন্তু অন্য লোকেরা আমাকে সত্য বলে স্বীকার করেছে। তোমরা আমাকে দেশ থেকে বের করে দিয়েছ। অন্যরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছো, পক্ষান্তরে অন্যরা আমাকে সাহায্য করেছে—তোমরা তোমাদের নবীর কত জঘন্য পরিজন ছিলে!"

হযরত উমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন একদল লোকের সাথে কথা বলছেন, যারা লাশ হয়ে পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, "যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, আমি যেসব কথাবার্তা বলছি তা ওদের চেয়ে তোমরা মোটেই বেশি শুনছ না; কিন্তু তারা উত্তর দিচ্ছে না এই যা।"

ما انتم باسمع لما اقول منهم ولكن هم لايجيبون .

পরে যথাস্থানে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আসবে ইনশাআল্লাহ। কথিত আছে, হযরত সালিহ্ (আ) এ ঘটনার পর হারম শরীফে চলে যান এবং তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

ইমাম আহমদ ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সা) যখন উস্ফান উপত্যকা অতিক্রম করেন তখন জিজ্ঞেস করেন, হে আবূ বকর! এটা কোন্ উপত্যকা? আবূ বকর (রা) বলেন, এটা উস্ফান উপত্যকা। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এই স্থান দিয়ে হূদ ও সালিহ্ (আ) নবীদ্বয় অতিক্রম করেছিলেন। তাদের বাহন ছিল উটনী, লাগাম ছিল খেজুর গাছের ছাল দ্বারা তৈরি রশি, পরনে ছিল জোব্বা এবং গায়ে ছিল চাদর। হজ্জের উদ্দেশ্যে তালবিয়া (–لبيك) পড়তে পড়তে তাঁরা আল্লাহর ঘর তওয়াফ করছিলেন। এ হাদীসের সনদ হাসান পর্যায়ের। হযরত নূহ্ নবীর আলোচনায় তাবারানী থেকে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করা হয়েছে— সেখানে নূহ, হূদ ও ইবরাহীম (আ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

তবূক যুদ্ধের সময় ছামূদ জাতির আবাসভূমি হিজ্‌র উপত্যকা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গমন

ইমাম আহমদ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তাবূক অভিযানকালে রাসূলুল্লাহ (সা) সদলবলে হিজ্‌র উপত্যকায় অবতরণ করেন। যেখানে ছামূদ জাতি বসবাস করত। ছামূদ সম্প্রদায় যেসব কূপের পানি পান করত, লোকজন সেসব কূপের পানি ব্যবহার করে। এ পানি দিয়ে আটার খামীর তৈরি করে এবং যথারীতি ডেকচি উনুনে চড়ান। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নির্দেশ আসায় তারা ডেকচির খাদ্য ফেলে দিয়ে খামীর উটকে খেতে দেন। তারপর তিনি সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে যে কূপ থেকে আল্লাহর উষ্ট্রী পানি পান করত সে কূপের নিকট অবতরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) লোকজনকে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির বাসস্থানে যেতে নিষেধ করেন। তিনি বললেন, "আমার আশংকা হয় তোমাদের উপর না তাদের মত আযাব আপতিত হয়। সুতরাং তোমরা তাদের ঐ স্থানে প্রবেশ করো না।" ইমাম আহমদ (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে অন্য এক বর্ণনায় বলেন, হিজ্‌রে অবস্থানকালে রাসূল (সা) বলেছিলেন ঃ তোমরা আল্লাহর গযবে ধ্বংস প্রাপ্তদের ঐসব বাসস্থানে কান্নারত অবস্থায় ছাড়া যেয়ো না, যদি একান্তই কান্না না আসে তাহলে সেখানে আদৌ যেয়ো না। যে আযাব তাদের উপর এসেছিল, সেরূপ আযাব তোমাদের উপরও না পতিত হয়ে যায়। বুখারী ও মুসলিমে একাধিক সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় এভাবে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন ছামূদ জাতির এলাকা অতিক্রম করেন তখন মাথা ঢেকে রাখেন, বাহনকে দ্রুত চালান এবং কান্নারত অবস্থায় ব্যতীত কাউকে তাদের বাসস্থানে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। অন্য বর্ণনায় এতটুকু বেশি আছে যে, 'যদি একান্তই কান্না না আসে তবে কান্নার ভঙ্গী অবলম্বন কর এই ভয়ে যে, তাদের উপর যে আযাব এসেছিল, অনুরূপ আযাব তোমাদের উপরও না এসে পড়ে।'

ইমাম আহমদ (র) আমের ইবন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ তাবূক যুদ্ধে গমনকালে লোকজন দ্রুত অগ্রসর হয়ে হিজ্‌রবাসীর বাসস্থানে প্রবেশ করতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি লোকজনের মধ্যে ঘোষণা করে দেন الصلواة جامعة। অর্থাৎ সালাত আদায় করা হবে। আমের (রা) বলেন, এ সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি তখন নিজের বাহন উট থামাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ তোমরা কেন ঐসব লোকের বাসস্থানে প্রবেশ করছ, যাদের উপর আল্লাহ গযব নাযিল করেছেন। এক ব্যক্তি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আশ্চর্যজনক বস্তু হিসেবে এগুলো দেখছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি কি এর চেয়ে অধিক আশ্চর্যের কথা তোমাদেরকে বলবো না? তা হল এই যে, তোমাদের মধ্যেই এক ব্যক্তি তোমাদেরকে সেসব ঘটনা বলে দেয় যা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে এবং সেসব ঘটনার কথাও বলে যা ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে। অতএব, তোমরা সত্যের উপর অটল-অবিচল হয়ে থাক। তা না হলে আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিতে বিন্দুমাত্র পরোয়া করবেন না। শীঘ্রই এমন এক জাতির আবির্ভাব হবে যারা তাদের উপর আগত শাস্তি থেকে নিজেদেরকে বিন্দুমাত্র রক্ষা করতে পারবে না। এ হাদীসের সনদ 'হাসান' পর্যায়ের কিন্তু অন্য হাদীস গ্রন্থকারগণ এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। কথিত আছে যে, সালিহ্ (আ)-এর

সম্প্রদায়ের লোকজন দীর্ঘায়ু হতো। মাটির ঘর বানিয়ে তারা বাস করত। কিন্তু কারোর মৃত্যুর পূর্বেই তার ঘর বিনষ্ট হয়ে যেত। এ কারণে তারা পাহাড় কেটে প্রাসাদ নির্মাণ করত।

ইতিহাসবেত্তাগণ লিখেছেন, হযরত সালিহ্ (আ)-এর নিকট নিদর্শন দাবি করলে আল্লাহ্ ঐ কওমের জন্যে উটনী প্রেরণ করেন। একটি পাথর থেকে উটনীটি বের হয়ে আসে। এই উটনী ও তার পেটের বাচ্চার সাথে দুর্ব্যবহার করতে তাদেরকে তিনি নিষেধ করেন। দুর্ব্যবহার করলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাস্তি আসবে বলেও তিনি জানিয়ে দেন। তিনি আরও জানিয়ে দেন যে, শীঘ্রই এরা উটনীটিকে হত্যা করবে এবং এর কারণেই তারা ধ্বংস হবে। যে ব্যক্তি উটনীটিকে হত্যা করবে তিনি তার পরিচয়ও তুলে ধরেন। তার গায়ের রঙ হবে গৌর, চোখের রঙ নীল এবং তার চুল হবে পিঙ্গল বর্ণের। সম্প্রদায়ের লোকজন এই বৈশিষ্ট্যের কোন শিশু জন্মগ্রহণ করলে সাথে সাথে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গোটা জনপদে ধাত্রীদের নিয়োজিত করে। এই অনুসন্ধান দীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ ভাবে এক প্রজন্মের পর অন্য প্রজন্মের অবসান ঘটে।

তারপর এক সময়ে উক্ত সম্প্রদায়ের এক সর্দার ব্যক্তির পুত্রের সাথে আর এক সর্দার ব্যক্তির কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দেয়। সেমতে বিবাহও হয়। এই দম্পতির ঘরেই উটনীর হত্যাকারীর জন্ম হয়। শিশুটির নাম রাখা হয় কিদার ইব্ন সালিফ। সন্তানের পিতা-মাতা ও বাপ-দাদা সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী হওয়ার কারণে ধাত্রীদের পক্ষে তাকে হত্যা করা সম্ভব হলো না। শিশুটি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্য শিশুরা এক মাসে যতটুকু বড় হয় সে এক সপ্তাহে ততটুকু বড় হয়ে যায়। এভাবে সে সম্প্রদায়ের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সবাই তাকে নেতা হিসেবে মেনে চলে। এক পর্যায়ে তার মনের মধ্যে উটনী হত্যা করার বাসনার উদ্রেক হয়। সম্প্রদায়ের আরও আট ব্যক্তি এ ব্যাপারে তাকে অনুসরণ করে। এই নয়জন লোকই হযরত সালিহ্ (আ)-কেও হত্যা করার পরিকল্পনা করে। এরপর যখন উটনী হত্যার ঘটনা সংঘটিত হলো এবং সালিহ (আ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছাল, তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট যান। সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় লোকেরা নবীর কাছে এই কথা বলে ওজর পেশ করল যে, আমাদের নেতৃস্থানীয় কারো দ্বারা এ ঘটনা ঘটেনি। ঐ কয়েকজন অল্প বয়সী যুবক এ ঘটনাটি ঘটিয়েছে।

কথিত আছে যে, তখন সালিহ্ (আ)-এর প্রতিকার হিসারে উটনীটির বাচ্চাটিকে নিয়ে এসে তার সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। লোকজন বাচ্চাকে ধরে আনার জন্যে অগ্রসর হলে বাচ্চাটি পাহাড়ে উঠে যায়। লোকজনও পিছে পিছে পাহাড়ে উঠল। কিন্তু বাচ্চা আরও উপরে উঠে পাহাড়ের শীর্ষে চলে যায়, যেখানে তারা পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। বাচ্চা সেখানে গিয়ে চোখের পানি ফেলে কাঁদতে থাকে। তারপর সে হযরত সালিহ্ (আ)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনবার ডাক দেয়। তখন সালিহ্ (আ) সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তিনদিন পর্যন্ত বাড়িতে বসে জীবন উপভোগ কর—এ এমন এক ওয়াদা যা মিথ্যা হবার নয়। নবী তাদেরকে আরও জানালেন, আগামীকাল তোমাদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যাবে, পরের দিন রক্তিম এবং তৃতীয় দিন কালো রঙ ধারণ করবে। চতুর্থ দিনে এক বিকট শব্দ এসে তাদেরকে আঘাত হানে। ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে মরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। এ বর্ণনার সাথে কোন কোন দিক সম্পর্কে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে এবং কুরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনায় সংঘর্ষশীল, যা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে এসেছি। সঠিক তত্ত্ব আল্লাহ্ই জানেন।

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর ঘটনা

ইবরাহীম (আ)-এর নসবনামা নিম্নরূপ ঃ ইবরাহীম ইব্‌ন তারাখ (২৫০) ইব্‌ন নাহূর (১৪৮) ইব্‌ন সারূগ (২৩০) ইব্‌ন রাউ (২৩৯) ইব্‌ন ফালিগ (৪৩৯) ইব্‌ন আবির (৪৬৪) ইব্‌ন শালিহ্‌ (৪৩৩) ইবন আরফাখশাদ (৪৩৮) ইব্‌ন সাম (৬০০) ইবন নূহ্‌ (আ)। আহলে কিতাবদের গ্রন্থে এভাবেই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নসবনামার উল্লেখ করা হয়েছে। উপরে বন্ধনীর মধ্যে বয়স দেখান হয়েছে। হযরত নূহ্‌ (আ)-এর বয়স ইতিপূর্বে তার আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এখানে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে ইসহাক ইব্‌ন বিশ্‌র কাহিলীর 'আল মাবদা' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, ইবরাহীম (আ)-এর মায়ের নাম ছিল উমায়লা। এরপর তিনি ইবরাহীম (আ)-এর জন্মের এক দীর্ঘ কাহিনীও লিখেছেন। ফালবী লিখেছেন যে, ইবরাহীম (আ)-এর মায়ের নাম বূনা বিন্‌ত কারবানা ইব্‌ন কুরছী। ইনি ছিলেন আরফাখ্‌শাদ ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহের বংশধর।

ইব্‌ন আসাকির ইকরামা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কুনিয়াত বা উপনাম ছিল আবুয যায়ফান (ابو الضيفان)। বর্ণনাকারিগণ বলেছেন, তারাখের বয়স যখন পঁচাত্তর বছর তখন তার ঔরসে ইবরাহীম, নাহূর ও হারান-এর জন্ম হয়। হারানের পুত্রের নাম ছিল লূত (আ)। বর্ণনাকারীদের মতে, ইবরাহীম ছিলেন তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম। হারান পিতার জীবদ্দশায় নিজ জন্মস্থান কালদান অর্থাৎ বাবেলে (ব্যাবিলনে) মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিক ও জীবনীকারদের নিকট এই মতই প্রসিদ্ধ ও যথার্থ। ইব্‌ন আসাকির ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম (আ) গুতায়ে দামেশকের[১] বুরযা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, যা কাসিয়ূন পর্বতের সন্নিকটে অবস্থিত। অতঃপর ইব্‌ন আসাকির বলেন, সঠিক মত এই যে, তিনি বাবেলে জন্মগ্রহণ করেন। তবে গুতায়ে দামেশকে জন্ম হওয়ার কথা এ কারণে বলা হয় যে, হযরত লূত (আ)-কে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যখন তিনি এখানে আগমন করেছিলেন, তখন তিনি সেখানে সালাত আদায় করেছিলেন। ইবরাহীম (আ) বিবি সারাহ্‌কে এবং নাহূর আপন ভাই হারানের কন্যা মালিকাকে বিবাহ করেন। সারাহ্‌ ছিলেন বন্ধ্যা। তার কোন সন্তান হত না। ইতিহাসবেত্তাদের মতে, তারাখ নিজ পুত্র ইবরাহীম, ইবরাহীমের স্ত্রী সারাহ্‌ ও হারানের পুত্র লূতকে নিয়ে কালদানীদের এলাকা থেকে কানআনীদের এলাকার উদ্দেশে রওয়ানা হন। হারান নামক স্থানে তারা অবতরণ করেন। এখানেই তারাখের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল দু'শ পঞ্চাশ বছর। এই বর্ণনা থেকে প্রমাণ মেলে যে, ইবরাহীম (আ)-এর জন্ম হারানে হয়নি; বরং কাশদানী জাতির ভূখণ্ডই তার জন্মস্থান। এ স্থানটি হল বাবেল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা। এরপর তারা সেখান থেকে কানআনীদের আবাসভূমির

---

১. সিরিয়ার একটি এলাকার নাম - যেখানে প্রচুর পানি ও বৃক্ষ বিদ্যমান।

উদ্দেশে যাত্রা করেন। এটা হলো বায়তুল মুকাদ্দাসের এলাকা। তারপর তারা হারানে বসবাস আরম্ভ করেন। হারান হলো সেকালের কাশদানী জাতির আবাসভূমি। জাসীরা এবং শামও-এর অন্তর্ভুক্ত। এখানকার অধিবাসীরা সাতটি নক্ষত্রের পূজা করত। সেই জাতির লোকেরা দামেশক শহর নির্মাণ করেছিল। তারা এই দীনের অনুসারী ছিল। তারা উত্তর মেরুর দিকে মুখ করে বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপ বা মন্ত্রের দ্বারা সাতটি তারকার পূজা করত। এই কারণেই প্রাচীন দামেশকের সাতটি প্রবেশ দ্বারের প্রতিটিতে উক্ত সাত তারকার এক একটি তারকার বিশাল মূর্তি স্থাপিত ছিল। এদের নামে তারা বিভিন্ন পর্ব ও উৎসব পালন করত। হারানের অধিবাসীরাও নক্ষত্র ও মূর্তি পূজা করত। মোটকথা, সে সময় ভূ-পৃষ্ঠের উপর যত লোক ছিল তাদের মধ্য থেকে শুধু ইবরাহীম খলীল (আ), তার স্ত্রী (সারা) ও ভাতিজা লূত (আ) ব্যতীত সবাই ছিল কাফির। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দ্বারা সেসব দুষ্কৃতি ও ভ্রান্তি বিদূরিত করেন। কেননা, আল্লাহ্ তাঁকে বাল্যকালেই সঠিক পথের সন্ধান দেন। রাসূল হওয়ার গৌরব দান করেন এবং বৃদ্ধ বয়সে খলীল বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন।

আল্লাহর বাণী ঃ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ.

আমি তো ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৫১) অর্থাৎ তিনি এর যোগ্য ছিলেন।

আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا. إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ. إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ

اللّٰهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا . وَمَأْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّاصِرِيْنَ. فَاٰمَنَ لَهُ لُوْطٌ . وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ اِلٰى رَبِّىْ. اِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ. وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَاٰتَيْنَاهُ اَجْرَهُ فِى الدُّنْيَا. وَاِنَّهُ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيْنَ.

স্মরণ কর ইবরাহীমের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁকে ভয় কর; তোমাদের জন্যে এটাই শ্রেয়, যদি তোমরা জানতে। তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত কেবল মূর্তি পূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ; তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের পূজা কর তারা তোমাদের জীবনোপকরণের মালিক নয়। সুতরাং তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহর নিকট এবং তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন কর তবে জেনে রেখ, তোমাদের পূর্ববর্তীগণও নবীগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিল। বস্তুত সুস্পষ্টভাবে প্রচার করে দেয়া ব্যতীত রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই। ওরা কি লক্ষ্য করে না, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, তারপর তা পুনরায় সৃষ্টি করেন? এটা তো আল্লাহর জন্যে সহজ।

বল, পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? তারপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ তো সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। তোমরা তারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমরা আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না পৃথিবীতে অথবা আকাশে এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, সাহায্যকারীও নেই। যারা আল্লাহর নিদর্শন ও তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই আমার অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়, তাদের জন্যে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

উত্তরে ইবরাহীমের সম্প্রদায় শুধু এই বলল, 'তাকে হত্যা কর অথবা আগুনে পুড়িয়ে দাও।' কিন্তু আল্লাহ তাকে অগ্নি থেকে রক্ষা করলেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য। ইবরাহীম বলল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছ; পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে। পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। লূত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। ইবরাহীম বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করছি। তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আমি ইবরাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তার বংশধরদের জন্যে স্থির করলাম নবুওত ও কিতাব এবং আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম; আখিরাতেও সে নিশ্চয় সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হবে। (সূরা আনকাবুত ঃ ১৬-২৭)

তারপর আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তাঁর পিতার এবং সম্প্রদায়ের লোকদের বিতর্কের কথা উল্লেখ করেছেন। পরে আমরা ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। হযরত ইবরাহীম (আ) সর্ব প্রথম আপন পিতাকে ঈমানের দাওয়াত দেন। তার পিতা ছিল মূর্তিপূজারী। কাজেই কল্যাণের দিকে আহ্বান পাওয়ার অধিকার তারই সবচাইতে বেশি। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِبْرٰهِيْمَ. اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِيْ عَنْكَ شَيْئًا. يَا اَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَاءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا. يَا اَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ. اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا. يَا اَبَتِ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا.

قَالَ اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يَا اِبْرَاهِيْمُ. لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا. قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَاَسْتَغْفِرُلَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا. وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَاَدْعُوْا رَبِّىْ. عَسٰى اَلَّا اَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّىْ شَقِيًّا.

স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের কথা; সে ছিল সত্যনিষ্ঠ নবী। যখন সে তার পিতাকে বলল, 'হে পিতা! তুমি কেন তার ইবাদত কর যে শুনে না, দেখে না এবং তোমার কোন কাজেই আসে না? হে আমার পিতা! আমার নিকট তো এসেছে জ্ঞান, যা তোমার নিকট আসেনি; সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদত কর না। শয়তান তো দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশংকা করছি, তোমাকে দয়াময়ের শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শয়তানের বন্ধু হয়ে পড়বে।'

পিতা বলল, 'হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও তবে আমি পাথরের আঘাতে তোমার প্রাণনাশ করবই। তুমি চিরদিনের জন্যে আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও!' ইবরাহীম বলল, 'তোমার প্রতি সালাম। আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। আমি তোমাদের হতে ও তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত কর তাদের হতে পৃথক হচ্ছি। আমি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করি, আশা করি আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে আমি ব্যর্থকাম হব না। (সূরা মারয়াম ঃ ৪১-৪৮)

এখানে আল্লাহ ইবরাহীম (আ) ও তাঁর পিতার মধ্যে যে কথোপকথন ও বিতর্ক হয়েছিল তা উল্লেখ করেছেন। সত্যের দিকে পিতাকে যে কোমল ভাষায় ও উত্তম ভংগিতে আহ্বান করেছেন তা এখানে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি পিতার মূর্তি পূজার অসারতা তুলে ধরেছেন এভাবে যে, এগুলো তাদের উপাসনাকারীদের ডাক শুনতে পায় না, তাদের অবস্থানও দেখতে পায় না; তা হলে কিভাবে এরা উপাসকদের উপকার করবে? কিভাবে তাদের খাদ্য ও সাহায্য দান করে তাদের কল্যাণ করবে? তারপর আল্লাহ তাকে যে হিদায়াত ও উপকারী জ্ঞান দান করছেন তার ভিত্তিতে পিতাকে সতর্ক করে দেন, যদিও বয়সে তিনি পিতার চেয়ে ছোট।

يَا اَبَتِ اِنِّىْ قَدْ جَاءَنِىْ مِنَ الْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا.

হে আমার পিতা! আমার কাছে জ্ঞান এসেছে যা তোমার নিকট আসেনি; সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। অর্থাৎ এমন পথ যা অতি সুদৃঢ়, সহজ ও সরল। যে পথ অবলম্বন করলে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে। ইবরাহীম (আ) যখন পিতার নিকট এই সত্য পথ ও উপদেশ পেশ করলেন, তখন পিতা তা গ্রহণ করল না, বরং উল্টো তাঁকে ধমকাল ও ভয় দেখাল। সে বলল ঃ

اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِىْ يٰۤاِبْرٰهِيْمُ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَاَرْجُمَنَّكَ .

'(হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী থেকে বিমুখ? যদি তুমি নিবৃত্ত না হও, তবে আমি পাথরের আঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবোই।' কেউ কেউ বলেন, মৌখিকভাবে আবার কেউ কেউ বলেন, বাস্তবেই পাথর মারব। وَاهْجُرْنِىْ مَلِيًّا (চিরতরের জন্যে দূর হয়ে যাও) অর্থাৎ আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দীর্ঘকালের জন্যে চলে যাও। ইবরাহীম (আ) তখন বলেছিলেন ঃ سَلَامٌ عَلَيْكَ- (তোমার প্রতি সালাম) অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে কোন রকম কষ্টদায়ক ব্যবহার তুমি পাবে না। আমার তরফ থেকে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইবরাহীম অতিরিক্ত আরও বললেন, سَاَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّىْ اِنَّهٗ كَانَ بِىْ حَفِيًّا. (আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল)। ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বলেছেন حَفِيًّا অর্থ لَطِيْفًا অর্থাৎ দয়ালু। কেননা তিনি আমাকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন। একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করার তওফীক দিয়েছেন। একারণেই তিনি বললেন ঃ وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ - وَاَدْعُوْ رَبِّىْ عَسٰى اَنْ لَّاۤ اَكُوْنَ بِدُعَاءِ رَبِّىْ شَقِيًّا (আমি তোমাদেরকে পরিত্যাগ করছি এবং আল্লাহ ব্যতীত যাদের তোমরা পূজা করছ তাদেরও পরিত্যাগ করছি। আমি কেবল আমার পালনকর্তাকেই আহ্বান করি। আশা করি, আমার প্রতিপালককে আহ্বান করে আমি ব্যর্থকাম হব না। এই ওয়াদা অনুযায়ী ইবরাহীম পিতার জন্যে সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। পরে যখন জানলেন যে, তাঁর পিতা আল্লাহর দুশমন; তখন তিনি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেন। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَاۤ اِيَّاهُ . فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗۤ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ . اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ .

ইবরাহীম তার পিতার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল, তাকে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে; অতঃপর যখন এটা তার নিকট সুস্পষ্ট হল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন ইবরাহীম তার সম্পর্ক ছিন্ন করল। ইবরাহীম তো কোমল হৃদয় ও সহনশীল। (সূরা তাওবা ঃ ১১৪)

ইমাম বুখারী (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তাঁর পিতা আযরের সাক্ষাৎ হবে। আযরের চেহারা মলিন ও কালিমালিপ্ত দেখে ইবরাহীম (আ) বলবেন, আমি কি আপনাকে দুনিয়ায় বলিনি যে, আমার অবাধ্য হবেন না? পিতা বলবে, 'আজ আর আমি তোমার অবাধ্য হব না।' তখন ইবরাহীম (আ) বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, পুনরুত্থান দিবসে আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। কিন্তু আমার পিতা যেখানে আপনার দয়া ও

ক্ষমা থেকে দূরে থাকছে, সেখানে এর চেয়ে অধিক লাঞ্ছনা আর কি হতে পারে? আল্লাহ বলবেন, আমি কাফিরদের উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। তারপর বলা হবে ঃ হে ইবরাহীম! তোমার পায়ের নিচে কি? নিচের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখবেন, একটি জবাইকৃত পশু রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছে। তারপর পশুটির পাগুলি ধরে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

ইমাম বুখারী (র) 'কিতাবুত তাফসীরে' ভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসাঈও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায্যার (র) এটা আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করছেন— এসব বর্ণনায় ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযর বলে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ اٰزَرَ اَتَتَّخِذُ اَصْنَامًا اٰلِهَةً اِنِّيْ اَرٰكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

স্মরণ কর, ইবরাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল, আপনি কি মূর্তিকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেন? আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখছি। (সূরা আনআম ঃ ৭৪)

কুরআনের উক্ত আয়াত ও বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম আযর। কিন্তু অধিকাংশ বংশবিদদের মতে—যাদের মধ্যে ইব্ন আব্বাস (রা)-ও আছেন, ইবরাহীম (আ)-এর পিতার নাম তারাখ। আহলি কিতাবদের মতে, তারাখ একটি মূর্তির নাম। ইবরাহীম (আ)-এর পিতা এর পূজা করত এবং এরই নামানুসারে তাকে তারাখ উপাধি দেয়া হয়। কিন্তু প্রকৃত নাম আযর। ইব্ন জারীর লিখেছেন ঃ সঠিক কথা এই যে, আযর তার প্রকৃত নাম; অথবা আযর ও তারাখ দুটোই তার আসল নাম; কিংবা যে কোন একটা উপাধি এবং অপরটা নাম। ইবনে জারীরের এ বক্তব্যটি সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞাত। আল্লাহর বাণী ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ . فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَاٰ كَوْكَبًا . قَالَ هٰذَا رَبِّيْ . فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَا اُحِبُّ الْاٰفِلِيْنَ . فَلَمَّا رَاَ الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هٰذَا رَبِّيْ . فَلَمَّا اَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّمْ يَهْدِنِيْ رَبِّيْ لَاَكُوْنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلِّيْنَ . فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هٰذَا رَبِّيْ هٰذَآ اَكْبَرُ . فَلَمَّآ اَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ . اِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

وَحَآجَّهٗ قَوْمُهٗ قَالَ اَتُحَآجُّوْنِّيْ فِي اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنِ . وَلَآ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ رَبِّيْ شَيْـًٔا . وَسِعَ رَبِّيْ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا . اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ . وَكَيْفَ اَخَافُ مَآ اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَا لَمْ

يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنًا . فَأَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ . إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ . وَتِلْكَ حُجَّتُنَا اٰتَيْنٰهَا اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَاءُ . اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ .

এভাবে ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখাই, আর যাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। তারপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাকে আচ্ছন্ন করল, তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, 'এই তো আমার প্রতিপালক, এরপর যখন উহা অস্তমিত হল তখন সে বলল, যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না।' তারপর যখন সে চন্দ্রকে সমুজ্জ্বলরূপে উদিত হতে দেখল, তখন সে বলল, 'এই তো আমার প্রতিপালক,' যখন এটাও অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'আমাকে আমার প্রতিপালক সৎপথ প্রদর্শন না করলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব।' তারপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখল তখন সে বলল, এটাই আমার প্রতিপালক - এটিই সর্ববৃহৎ, যখন এটাও অস্তমিত হল তখন সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক কর তার সাথে আমার কোন সংশ্রব নেই। আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।'

তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল। সে বলল, তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর শরীক কর তাকে আমি ভয় করি না, সব কিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত। তবে কি তোমরা অবধান করবে না? তোমরা যাকে আল্লাহর শরীক কর আমি তাকে কিরূপে ভয় করব? অথচ তোমরা আল্লাহর শরীক করতে ভয় কর না, যে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে কোন সনদ দেননি; সুতরাং যদি তোমরা জান তবে বল, দু'দলের মধ্যে কোন্ দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী।' যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদের জন্যে, তারাই সৎপথ প্রাপ্ত। এবং এই হচ্ছে আমার যুক্তি-প্রমাণ যা ইবরাহীমকে দিয়েছিলাম তার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়; যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নীত করি; তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী। (সূরা আন'আম ঃ ৭৫-৮৩)

এখানে ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট বিতর্কের কথা বলা হয়েছে। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, এসব উজ্জ্বল নক্ষত্র মূলত জড় পদার্থ - যা কখনো উপাস্য হতে পারে না। আর আল্লাহর সাথে শরীক করে এগুলোর পূজাও করা যেতে পারে না। কেননা, এটা সৃষ্ট, প্রতিপালিত ও নিয়ন্ত্রিত। এরা উদিত হয় ও অস্ত যায় এবং অদৃশ্যও হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, মহান প্রতিপালক আল্লাহ, যার থেকে কোন কিছুই অদৃশ্য হতে পারে না। কিছুই তাঁর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকতে পারে না। বরং তিনি সর্বদা, সর্বত্র বিদ্যমান। তাঁর কোন ক্ষয় ও পতন নেই। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই। তিনি ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালক নেই। এভাবে ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম নক্ষত্রের ইলাহ্ হওয়ার অযোগ্যতা বর্ণনা করেন। কারো কারো মতে, এখানে নক্ষত্র বলতে যোহরা সেতারা তথা শুক্র গ্রহকে বুঝানো হয়েছে—যা অন্য সকল নক্ষত্রের চেয়ে অধিক উজ্জ্বল হয়। এ কারণেই পরবর্তীতে তিনি আরও অগ্রসর হয়ে চন্দ্রের

উল্লেখ করেন—যা নক্ষত্রের চেয়ে অধিক উজ্জ্বল ও ঝলমলে। এর পর আরও উপরের দিকে লক্ষ্য করে সূর্যের উল্লেখ করেন, যার অবয়ব সর্ব বৃহৎ এবং যার উজ্জ্বলতা ও আলোক বিকিরণ তীব্রতর। এভাবে ইবরাহীম (আ) স্পষ্টভাবে বুঝালেন যে, সূর্যও নিয়ন্ত্রিত ও অধীনস্থ- অন্যের নির্দেশ পালনে বাধ্য। আল্লাহর বাণী ঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. لاَ تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلَّهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না; চন্দ্রকেও নয়, বরং সিজদা কর সেই আল্লাহকে—যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবল তার ইবাদত কর। (সূরা হা-মীম আস্‌সাজদা ঃ ৩৭)

এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন فَلَمَّا رَاَ الشَّمْسَ بَازِغَةً (যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমান অর্থাৎ উদিত হতে দেখল।)

قَالَ هٰذَا رَبِّىْ هٰذَا اَكْبَرُ. فَلَمَّا اَفَلَتْ قَالَ يَاقَوْمِ اِنِّىْ بَرِىْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ. اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ اَتُحَاجُّوْنِّىْ فِى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانِ. وَلاَ اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ رَبِّىْ شَيْئًا.

আমার প্রতিপালক অন্যরূপ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর শরীক কর তাকে আমি ভয় করি না অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাদের ইবাদত তোমরা কর তাদের কোন পরোয়া আমি করি না। কেননা ওরা না পারে কোন উপকার করতে, না পারে কিছু শুনতে আর না পারে কিছু অনুধাবন করতে। বরং এরা হয় প্রতিপালিত ও নিয়ন্ত্রিত যেমন নক্ষত্র ইত্যাদি। না হয় নিজেদেরই হাতের তৈরি ও খোদাইকৃত।

নক্ষত্র সম্পর্কে ইবরাহীম (আ)-এর উপরোক্ত উপদেশ বাণী থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, এ সব কথা তিনি হারানের অধিবাসীদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন। কেননা, তারা নক্ষত্রের পূজা করত। এর দ্বারা ইব্‌ন ইসহাক (র) প্রমুখ যাঁরা মনে করেন যে, ইবরাহীম (আ) এ কথা তখন বলেছিলেন; যখন তিনি বাল্যকালে গুহা থেকে বের হয়ে আসেন। এতে তাদের অভিমত খণ্ডন হয়ে যায়। এই মত ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে নেয়া হয়েছে। যার কোন নির্ভরযোগ্যতা নেই। বিশেষ করে যখন তা সঠিক বর্ণনার পরিপন্থী হয়। অপরদিকে বাবেলবাসীরা ছিল মূর্তিপূজক। ইবরাহীম (আ) তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন। মূর্তি ভাঙ্গেন, অপদস্ত করেন এবং সেগুলোর অসারতা বর্ণনা করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا . ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا . وَمَأْوٰكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ.

ইবরাহীম বলল, তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে মূর্তিদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছো, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (সূরা আনকাবূত ঃ ২৫)

সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهٗ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهٖ عٰلِمِيْنَ. اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْٓ اَنْتُمْ لَهَا عٰكِفُوْنَ. قَالُوْا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ. قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ. قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ.

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ . فَجَعَلَهُمْ جُذٰذًا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ . قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ. قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗٓ اِبْرٰهِيْمُ. قَالُوْا فَأْتُوْا بِهٖ عَلٰٓى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ. قَالُوْٓا ءَاَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يٰٓاِبْرٰهِيْمُ. قَالَ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَسْئَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ.

فَرَجَعُوْٓا اِلٰٓى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْٓا اِنَّكُمْ اَنْتُمُ الظّٰلِمُوْنَ. ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ. لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰٓؤُلَآءِ يَنْطِقُوْنَ. قَالَ اَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يَضُرُّكُمْ. اُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ. اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ. قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ. وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ.

আমি তো এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক পরিজ্ঞাত। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, এই মূর্তিগুলো কী, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ? ওরা বলল, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণকে এগুলোর পূজা

করতে দেখেছি। সে বলল, তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পিতৃ-পুরুষগণও রয়েছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। ওরা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, নাকি তুমি কৌতুক করছ? সে বলল, না তোমাদের প্রতিপালক তো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, যিনি ওদের সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি অন্যতম সাক্ষী।

'শপথ আল্লাহর, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব।' তারপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল ওদের প্রধানটি ব্যতীত; যাতে তারা ওর দিকে ফিরে আসে। তারা বলল, আমাদের উপাস্যদের প্রতি এরূপ করল কে? সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী। কেউ কেউ বলল, এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি; তাকে বলা হয় ইবরাহীম। ওরা বলল, তাকে উপস্থিত কর লোকজনের সম্মুখে, যাতে তারা সাক্ষ্য দিতে পারে। তারা বলল, হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের উপাস্যদের প্রতি এরূপ করেছ? সে বলল, সে-ই তো এটা করেছে, এ-ই তো এগুলোর প্রধান। এ গুলোকে জিজ্ঞেস কর। যদি এগুলো কথা বলতে পারে। তখন ওরা মনে মনে চিন্তা করে দেখল এবং একে অপরকে বলতে লাগল, তোমরাই তো সীমালংঘনকারী?

অতপর ওদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং ওরা বলল, তুমি তো জানই যে, এরা কথা বলে না। ইবরাহীম বলল, তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত কর যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতিও করতে পারে না? ধিক্ তোমাদেরকে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদেরকে। তবে কি তোমরা বুঝবে না? ওরা বলল, একে পুড়িয়ে দাও, সাহায্য কর তোমাদের দেবতাগুলোকে, তোমরা যদি কিছু করতে চাও। আমি বললাম, হে আগুন তুমি ইবরাহীমের জন্য শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। ওরা তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৫১-৭০)

সূরা শু'আরায় আল্লাহর বাণী ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖ مَا تَعْبُدُوْنَ . قَالُوْا نَعْبُدُ اَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ. قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ. اَوْيَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْيَضُرُّوْنَ . قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ.

قَالَ اَفَرَئَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ. اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ. فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّلِّىْ اِلاَّ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ. اَلَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ. وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ . وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ. وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِيْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ. وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَلِىْ خَطِيْئَتِيْ يَوْمَ الدِّيْنِ. رَبِّ هَبْ لِىْ حُكْمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ.

ওদের নিকট ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা কর। সে যখন তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা কিসের ইবাদত কর? ওরা বলল, আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং আমরা

নিষ্ঠার সাথে ওদের পূজায় নিরত থাকব। সে বলল, তোমরা প্রার্থনা করলে ওরা কি শোনে? অথবা ওরা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে? ওরা বলল, না, তবে আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এরূপই করতে দেখেছি।

সে বলল, তোমরা কি তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ যার পূজা করছ—তোমরা এবং তোমাদের অতীত পিতৃ-পুরুষরা? ওরা সকলেই আমার শত্রু, জগতসমূহের প্রতিপালক ব্যতীত; যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়। এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন; এবং তিনিই আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তারপর পুনর্জীবিত করবেন। এবং আশা করি, তিনি কিয়ামত দিবসে আমার অপরাধসমূহ মার্জনা করে দেবেন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জ্ঞান দান কর এবং সৎকর্মপরায়ণদের শামিল কর। (সূরা শু'আরা ঃ ৬৯-৮৩)

সূরা সাফ্‌ফাতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ. أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ. فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ. مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ. قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ.

ইবরাহীম তো তার অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ কর, সে তার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত হয়েছিল বিশুদ্ধচিত্তে। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কেও জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা কিসের পূজা করছ? তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অলীক ইলাহ্‌গুলোকে চাও? জগতসমূহের প্রতিপালক সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কী? তারপর সে তারকারাজির দিকে একবার তাকাল এবং বলল, আমি অসুস্থ। অতঃপর ওরা তাকে পশ্চাতে রেখে চলে গেল। পরে সে সন্তর্পণে ওদের দেবতাগুলোর নিকট গেল। এবং বলল, তোমরা খাদ্য গ্রহণ করছ না কেন? তোমাদের কী হয়েছে যে তোমরা কথা বলনা? তখন সে তাদের উপর সবলে আঘাত হানল। তখন ঐ লোকগুলো তার দিকে ছুটে আসলো। সে বলল, তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরি কর তাও। ওরা বলল, এর জন্যে এক ইমারত তৈরি কর, তারপর একে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর। ওরা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল; কিন্তু আমি ওদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম। (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ৮৩-৯৮)

এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দেন যে, ইবরাহীম (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের মূর্তি পূজার সমালোচনা করেন এবং তাদের কাছে ওগুলোর অসারতা ও অক্ষমতার কথা তুলে ধরেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِىْ اَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ -

(এই মূর্তিগুলো কি? যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ?) অর্থাৎ এদের নিকট নিষ্ঠার সাথে বসে থাক ও কাতর হয়ে থাক। তারা উত্তর দিল; وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهُ عَابِدِيْنَ (আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে এদের পূজারীরূপে পেয়েছি।) তাদের যুক্তি এই একটাই যে, তাদের বাপ-দাদারা এরূপ দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করতো।

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ وَاٰبَاءُكُمْ فِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ

তিনি বললেন, তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছো। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُوْنَ . اَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ تُرِيْدُوْنَ . فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ .

যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা কিসের পূজা করছ? তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে অলীক ইলাহগুলোকে চাও? তা হলে জগতসমূহের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?

কাতাদা এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যখন তোমরা অন্যদের ইবাদত করছ, তখন যেদিন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবে সেদিন তিনি তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবেন বলে মনে কর?

ইবরাহীম (আ) তাদেরকে বলেছেন ঃ

هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ اِذْ تَدْعُوْنَ اَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ اَوْ يَضُرُّوْنَ . قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ .

তোমরা প্রার্থনা করলে ওরা কি শুনে? অথবা ওরা কি তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করতে পারে? ওরা বলল, না তবে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপই করতে দেখেছি। (সূরা শু'আরা ঃ ৭২-৭৪)

তারা স্বীকার করে নেয় যে, আহবানকারীর ডাক ওরা শোনে না, কারও কোন উপকারও করতে পারে না। অপকারও করতে পারে না। তারা এরূপ করছে কেবল তাদের মূর্খ পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ আনুগত্য হিসেবে। এ জন্যেই তিনি তাদেরকে বলে দেন যে ঃ

اَفَرَاَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ . اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمُ الْاَقْدَمُوْنَ . فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىْ اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ .

তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ যাদের পূজা করে আসছ তোমরা ও তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষেরা; কেননা রাব্বুল আলামীন ব্যতীত তারা সবাই আমার দুশমন। (সূরা শু'আরা ঃ ৭৫-৭৭)

তারা মূর্তির উপাস্য হওয়ার যে দাবি করত তা যে বাতিল ও ভ্রান্ত, উল্লিখিত আয়াতসমূহে তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা, হযরত ইবরাহীম (আ) ওগুলোকে পরিত্যাগ করেন ও

হেয়প্রতিপন্ন করেন। এতে যদি তাদের ক্ষমতা থাকত ক্ষতি করার তা হলে অবশ্যই তারা তাঁর ক্ষতি করত। অথবা যদি আদৌ কোন প্রভাবের অধিকারী হত, তবে অবশ্যই তাঁর উপর সে ধরনের প্রভাব ফেলত। -قَالُوْا اَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ اَمْ اَنْتَ مِنَ اللّٰعِبِيْنَ

(তারা বলল, তুমি কি আমাদের নিকট সত্যসহ আগমন করেছ, না কি তুমি কৌতুক করছ?) অর্থাৎ তারা বলেছে যে, হে ইবরাহীম! তুমি আমাদের নিকট যা কিছু বলছো, আমাদের উপাস্যদেরকে তিরস্কার করছো এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষদের সামালোচনা করছো এ সব কি তুমি সত্যি সত্যিই বলছ, নাকি কৌতুক করছ?

قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الَّذِىْ فَطَرَهُنَّ وَاَنَا عَلٰى ذَالِكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ.

(সে বলল, না তোমাদের প্রতিপালক তো তিনি, যিনি আসমান ও যমীনের প্রতিপালক, যিনি এগুলো সৃজন করেছেন; এবং আমিই এর উপর অন্যতম সাক্ষী। (অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট যা কিছু বলছি, সবই সত্য ও যথার্থ বলছি। বস্তুত তোমাদের উপাস্য সেই একজনই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং আসমান-যমীনেরও প্রতিপালক। পূর্ব-দৃষ্টান্ত ছাড়াই তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ইবাদতের যোগ্য একমাত্র তিনিই, তাঁর কোন শরীক নেই; এবং আমি নিজেই এর উপর সাক্ষী।

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ.

আল্লাহর কসম, তোমরা চলে গেলে আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্বন্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা অবলম্বন করব (সূরা আম্বিয়া ঃ ৫৫-৫৭)। অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করেন যে, লোকজন মেলায় চলে যাওয়ার পর তাদের উপাস্য মূর্তিগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কারো কারো মতে, ইবরাহীম (আ) এ কথা মনে মনে বলেছিলেন। ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেছেন যে, তাদের মধ্যে কয়েকজন ইবরাহীম (আ)-এর এ কথাটি শুনে ফেলেছিল। ইবরাহীম (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোকজন শহরের উপকণ্ঠে তাদের একটি নির্ধারিত বার্ষিক মেলায় মিলিত হতো। ইবরাহীম (আ)-এর পিতা তাঁকে মেলায় যাওয়ার জন্যে আহ্বান জানালে তিনি বলেছিলেন, 'আমি পীড়িত'। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى النُّجُوْمِ. فَقَالَ اِنِّىْ سَقِيْمٌ.

(সে নক্ষত্রের দিকে একবার তাকাল, তারপর বলল, আমি পীড়িত) তিনি কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললেন। যাতে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় আর তা হলো তাদের মূর্তিসমূহকে হেয়প্রতিপন্ন করা। মূর্তিপূজা খণ্ডনের ব্যাপারে আল্লাহর সত্য দীনের সাহায্য করা। আর ধ্বংস ও চরম লাঞ্ছনাই ছিল মূর্তিগুলোর যথার্থ পাওনা। এরপর সম্প্রদায়ের লোকজন যখন মেলায় চলে যায় এবং ইবরাহীম (আ) শহরেই থেকে যান তখন رَاغَ اِلٰى اٰلِهَتِهِمْ অর্থাৎ তিনি চুপিসারে দ্রুতপদে দেবতাদের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি দেখতে পান যে, মূর্তিগুলো একটি বিরাট প্রকোষ্ঠের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের সম্মুখে বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য নৈবেদ্যরূপে রাখা আছে। এ দেখে তিনি উপহাস ছলে বললেন ঃ

اَلَا تَاْكُلُوْنَ - مَالَكُمْ لَا تَنْطِقُوْنَ. فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ.

(তোমরা খাচ্ছ না কেন? কি হল তোমাদের, কথা বলছ না কেন? তারপর সে তাদের উপর তার ডান হাত দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানল।) কেননা, ডান হাতই অধিকতর শক্তিশালী ও দ্রুত ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। তাই তিনি নিজ হাতের কুঠারের প্রচণ্ড আঘাতে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا (ইবরাহীম মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে দিল) অর্থাৎ সবগুলোকে তিনি ভেঙ্গে চুরমার করে দিলেন إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. (তাদের মধ্যে বড়টা ব্যতীত, যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে।) কেউ কেউ বলেছেন; ইবরাহীম (আ) তাঁর কুঠারখানা বড় মূর্তির হাতে ঝুলিয়ে রেখে দেন। এতে এই ইঙ্গিত ছিল যে; তারা যেন মনে করে যে, তার সাথে ছোট মূর্তিগুলো পূজিত হওয়ার কারণে ওটাই ছোটগুলোর উপর ঈর্ষা বশত আক্রমণ করেছে। তারপর মেলা থেকে ফিরে এসে লোকজন তাদের উপাস্যদের এ অবস্থা যখন দেখল ঃ

قَالُوا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ.

(তখন তারা বলল, আমাদের উপাস্যদের সাথে এরূপ আচরণ কে করল? নিশ্চয়ই সে একজন সীমালংঘনকারী।) এ কথার মধ্যে তাদের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ ছিল, যদি তারা বুঝতে চেষ্টা করত! কেননা, তারা যে সব দেব-দেবীর উপাসনা করে, তারা যদি সত্যি উপাস্য হত, তা হলে যে তাদেরকে আক্রমণ করেছে তাকে তারা প্রতিহত করত। কিন্তু নিজেদের মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা ও চরম পথভ্রষ্টতার কারণে তারা বলল ঃ

مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ. قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهٗ اِبْرٰهِيْمُ.

(আমাদের উপাস্যদের সাথে এ আচরণ করল কে? নিশ্চয়ই সে এক জালিম। তাদের কতিপয় লোক বলল, আমরা এক যুবককে এদের বিষয়ে আলোচনা করতে শুনেছি, তাকে ইবরাহীম বলা হয়।) অর্থাৎ সে এদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করত, এদের নিয়ে সমালোচনা করত। সুতরাং সে-ই এসে এদেরকে ভেঙ্গেছে। ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেছেন يَذْكُرُهُمْ (সে এদের আলোচনা করত) দ্বারা ইবরাহীম (আ) ইতিপূর্বের কথা বলাই উদ্দেশ্য; অর্থাৎ—

وَتَاللّٰهِ لَاَكِيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ.

(আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর ব্যাপারে এক ব্যবস্থা নেব তোমরা ফিরে যাওয়ার পরে) – قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ – (তারা বলল, তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত কর, যাতে তারা দেখতে পারে) অর্থাৎ উপস্থিত জনতার মাঝে নেতৃবৃন্দের সম্মুখে তাকে হাযির কর; যাতে জনগণ তার বক্তব্য প্রদানকালে উপস্থিত থাকে এবং তার কথাবার্তা শুনতে পারে। এবং তাকে বদলাস্বরূপ যে শাস্তি দেওয়া হবে তা প্রত্যক্ষ করতে পারে। এটাই ছিল হযরত ইবরাহীম খলীলের প্রধানতম উদ্দেশ্য যে, সকল মানুষ উপস্থিত হলে তিনি সমস্ত মূর্তি পূজারীর সম্মুখে তাদের ধর্ম-কর্মের ভ্রান্তির প্রমাণ পেশ করবেন। যেমনটি মূসা (আ)-ও ফিরআউনকে বলেছিলেন ঃ

مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى –

(তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং যেই দিন পূর্বাহ্নে লোকজনকে সমবেত করা হবে। (সূরা তা-হা ঃ ৫৯)। তারপর যখন লোকজন জমায়েত হলো এবং ইবরাহীম (আ)-কে সেখানে হাযির করা হল, তখন তারা বলল ঃ

أَأَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِآلِهَتِنَا يَآ إِبْرٰهِيْمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا –

(হে ইবরাহীম! আমাদের দেব-দেবীর সাথে এই কাণ্ড কি তুমিই ঘটিয়েছ? সে বলল, এদের এই বড়টাই বরং এ কাজটি করেছে।) কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ করেছেন এভাবে—এটি আমাকে এগুলো ভাঙ্গার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে; অবশ্য কথাটাকে তিনি একটু ঘুরিয়ে বলেছেন। فَاسْئَلُوْهُمْ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ – (ওদের কাছেই জিজ্ঞেস কর যদি ওরা কথা বলতে পারে) ইবরাহীম (আ) এ কথার দ্বারা এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, ওরা যেন দ্রুত এই কথা বলে যে, এরা তো কথা বলতে পারে না। ফলত তারা স্বীকার করে নিবে যে, অন্যান্য জড়বস্তুর ন্যায় এগুলোও নিছক জড়বস্তু। فَرَجَعُوْا إِلٰى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُوْنَ (অতঃপর তারা মনে মনে চিন্তা করল এবং বলল; তোমরাই তো জালিম) অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে তিরস্কার ও ধিক্কার দিয়ে বলল, জালিম তো তোমরা নিজেরাই; এদেরকে তোমরা এমনিই ছেড়ে চলে গেলে, কোন পাহারাদার ও হিফাজতকারী রেখে গেলে না।

ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُؤُوْسِهِمْ

(তারপর তারা মাথা নত করে ঝুঁকে গেল) সুদ্দী (র)-এর অর্থ করেছেন, তারা ফিত্না ফ্যাসাদের দিকে ফিরে গেল। এ অর্থ অনুযায়ী উপরের 'তোমরাই জালিম' (إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُوْنَ)। এর অর্থ তোমরা এদের ইবাদত করার কারণে জালিম পদবাচ্য। কাতাদা (র) বলেছেন, ইবরাহীম (আ)-এর কথায় তারা অত্যধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। ফলে তাদের মাথা নত হয়ে যায়। তারপর তারা বলল لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ (তুমি তো জানই যে, এগুলো কথা বলে না) অর্থাৎ হে ইবরাহীম! তোমার তো জানা আছে যে, এরা কথা বলে না। সুতরাং এদের নিকট জিজ্ঞেস করার জন্যে তুমি কেন বলছ? এ সময় ইবরাহীম খলীল তাদের উদ্দেশ করে বলেন ঃ أَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ . وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

(তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন সব বস্তুর পূজা কর, যা না তোমাদের কোন উপকার করতে পারে; না কোন ক্ষতি করতে পারে? ধিক তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের উপাস্যদের জন্যে যাদেরকে তোমরা পূজা কর আল্লাহ ব্যতীত। তোমরা কি মোটেই জ্ঞান খাটাও না?) فَأَقْبَلُوْا إِلَيْهِ يَزِفُّوْنَ (তারপর তারা ইবরাহীমের দিকে তেড়ে আসলো।) মুজাহিদ বলেছেন, يَزِفُّوْنَ অর্থ يسرعون (দ্রুত ধেয়ে যাওয়া)। أَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ– (তোমরা কি সেই সব দেবতাদের পূজা কর যেগুলো তোমরা নিজেরাই খোদাই করে তৈরি কর?) অর্থাৎ তোমরা কিভাবে এমন সব মূর্তির পূজা কর, যেগুলো তোমরা স্বহস্তে কাঠ অথবা পাথর খোদাই করে নির্মাণ করে থাকো এবং নিজেদের ইচ্ছামত আকৃতি দান কর। وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ – (অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাদেরকে তোমরা তৈরি করে থাক) ما অক্ষরটি مصدريه ও হতে পারে; আবার موصوله

-ও হতে পারে। যেটাই হোক, এখানে যেকথা বলা উদ্দেশ্য তা হল এই যে, তোমরাও সৃষ্টি আর এই মূর্তিগুলোও সৃষ্টি। এখন একটি সৃষ্টি অপর একটি সৃষ্টির ইবাদত কিভাবে করতে পারে! কেননা, তোমরা তাদের উপাস্য না হয়ে তারা তোমাদের উপাস্য হবে এই অগ্রাধিকারের কোন ভিত্তি নেই। এটাও যেমন ভিত্তিহীন, তেমনি এর বিপরীতটা অর্থাৎ তোমার উপাস্য হওয়াও ভিত্তিহীন। কারণ, ইবাদত, উপাসনা পাওয়ার অধিকারী কেবল সৃষ্টিকর্তাই; এ ব্যাপারে কেউ তাঁর শরীক নেই।

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. (তারা বলল, এর জন্যে এক ইমারত তৈরি কর। তারপর একে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর। তারা ইবরাহীমের বিরুদ্ধে চক্রান্তের সংকল্প করেছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে অতিশয় হেয় করে দিলাম।) ইবরাহীম (আ)-এর সাথে তারা যখন যুক্তি ও বিতর্কে এঁটে উঠতে পারলো না, তাদের পক্ষে পেশ করার মত কোনই দলীল-প্রমাণ থাকল না, তখন তারা বিতর্কের পথ এড়িয়ে শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের পথ অবলম্বন করে—যাতে করে নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতা টিকিয়ে রাখতে পারে। সুতরাং আল্লাহ সুবহানুহূ তা'আলাও তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেয়ার কৌশল গ্রহণ করেন। আল্লাহ বলেন ঃ

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ.

তারা বলল, ইবরাহীমকে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবতাদেরকে সাহায্য কর যদি তোমরা কিছু করতে চাও। আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্যে শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও। তারা ইবরাহীমের ক্ষতি সাধন করতে চেয়েছিল; কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৬৮-৭০)

তারা বিভিন্ন স্থান থেকে সম্ভাব্য চেষ্টার মাধ্যমে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতে থাকে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা এ সংগ্রহের কাজে রত থাকে। তাদের মধ্যে কোন মহিলা পীড়িত হলে মানত করত যে, যদি সে আরোগ্য লাভ করে তবে ইবরাহীম (আ)-কে পোড়াবার লাকড়ি সংগ্রহ করে দেবে। এরপর তারা বিরাট এক গর্ত তৈরি করে তার মধ্যে লাকড়ি নিক্ষেপ করে অগ্নি সংযোগ করে। ফলে তীব্র দাহনে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা এত উর্ধ্বে উঠতে থাকে, যার কোন তুলনা হয় না। তারপর ইবরাহীম (আ)-কে মিনজানীক নামক নিক্ষেপণ যন্ত্রে বসিয়ে দেয়। এই যন্ত্রটি কুর্দী সম্প্রদায়ের হাযান নামক এক ব্যক্তি তৈরি করে। মিনজানীক যন্ত্র সে-ই সর্ব প্রথম আবিষ্কার করে। আল্লাহ তাকে মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে মাটির মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকবে। তারপর তারা ইবরাহীম (আ)-কে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে। তখন তিনি বলতে থাকেন ঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَلِلّٰهِ الْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

(আপনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, আপনি মহা পবিত্র, বাদশাহীর মালিক কেবল আপনিই, আপনার কোন শরীক নেই।) ইবরাহীম (আ)-কে মিনজানীকের পাল্লায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রেখে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। তখন তিনি বলেন حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (আমার জন্যে আল্লাহ্-ই যথেষ্ট, তিনি উত্তম অভিভাবক)। যেমন বুখারী শরীফে ইবন আব্বাস

(রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে ঃ ইবরাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন ঃ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. আর মুহাম্মদ (সা) তখন এ দু'আটি পড়েছিলেন যখন তাঁকে বলা হয়েছিল ঃ

اَنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ -

তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে ভয় কর; কিন্তু এটা তাদের ঈমানকে আরও দৃঢ় করে দিয়েছিল। আর তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি বড়ই উত্তম কর্ম-বিধায়ক। তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল। কোনরূপ ক্ষতি তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেনি। (সূরা আল-ইমরান ঃ ১৭৩-১৭৪)

আবূ ইয়া'লা (র) ..... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন তিনি এই দু'আটি পড়েন ঃ হে আল্লাহ! আপনি আকাশ রাজ্যে একা আর এই যমীনে আমি একাই আপনার ইবাদত করছি।

পূর্ববর্তী যুগের কোন কোন আলিম বলেন, জিবরাঈল (আ) শূন্যে থেকে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বলেছিলেন ঃ আপনার কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি? উত্তরে ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন, 'সাহায্যের প্রয়োজন আছে, তবে আপনার কাছে নয়।' ইবন আব্বাস ও সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত ঃ ঐ সময় বৃষ্টির ফেরেশতা (মীকাঈল) বলেছিলেন, আমাকে যখনই নির্দেশ দেওয়া হবে তখনই বৃষ্টি প্রেরণ করব। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশ বাণী অধিক দ্রুত গতিতে পৌঁছে যায়, قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ.

অর্থাৎ—আমি হুকুম করলাম, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের উপর শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও)। হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) سَلَامًا -এর অর্থ করেছেন, তাকে কষ্ট দিও না। ইব্ন আব্বাস (রা) ও আবুল আলিয়া (র) বলেছেন, আল্লাহ যদি وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ না বলতেন তাহলে ঠাণ্ডা ও শীতলতায় ইবরাহীম (আ)-এর কষ্ট হত। কা'বে আহবার বলেছেন, পৃথিবীর কোন লোকই ঐদিন আগুন থেকে কোনরূপ উপকৃত হতে পারেনি এবং ইবরাহীম (আ)-এর বন্ধনের রশি ছাড়া আর কিছুই জ্বলেনি। যাহ্হাক (র) বলেছেন, ঐ সময় হযরত জিবরাঈল (আ) ইবরাহীম (আ)-এর সঙ্গে ছিলেন এবং তাঁর শরীর থেকে ঘাম মুছে দিচ্ছিলেন এবং ঘাম নির্গত হওয়া ছাড়া আগুনের আর কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়নি। সুদ্দী (র) বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর সাথে ছায়া দানের ফেরেশতাও ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন প্রাচীর বেষ্টনীর মধ্যকার উক্ত গহবরে অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর চতুষ্পার্শ্বে আগুনের লেলিহান শিখা দাউ দাউ করছিল অথচ তিনি ছিলেন শ্যামল উদ্যানে শান্তি ও নিরাপদে। লোকজন এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করছিল; কিন্তু না তারা ইবরাহীম (আ)-এর নিকট যেতে পারছিল, আর না ইবরাহীম (আ) বেরিয়ে তাদের কাছে আসতে পারছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আপন পুত্রের এ অবস্থা দেখে একটি অতি উত্তম কথা বলেছিল, তা হল ঃ نعم الرب ربك يا ابراهيم হে ইবরাহীম! তোমার প্রতিপালক কতই না উত্তম প্রতিপালক।

ইব্ন আসাকীর (র) ইকরিমা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর মা পুত্রকে এ অবস্থায় দেখে ডেকে বলেছিলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি তোমার নিকট আসতে চাই। তাই আল্লাহর কাছে একটু বল, যাতে তোমার চারপাশের আগুন থেকে আমাকে রক্ষা করেন। ইবরাহীম (আ) বললেন, হ্যাঁ, বলছি। তারপর মা পুত্রের নিকট চলে গেলেন। আগুন তাঁকে স্পর্শ করল না। কাছে গিয়ে মাতা আপন পুত্রকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করলেন এবং পুনরায় অক্ষতভাবে সেখান থেকে বের হয়ে আসেন। মিনহাল ইব্ন আমর (রা) বর্ণনা করেছেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) আগুনের মধ্যে চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশ দিন অবস্থান করেন। এই সময় সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আ) বলেন ঃ আগুনের মধ্যে আমি যতদিন ছিলাম ততদিন এমন শান্তি ও আরামে কাটিয়েছি যে, তার চেয়ে অধিক আরামের জীবন আমি কখনও উপভোগ করিনি। তিনি আরও বলেন ঃ আমার গোটা জীবন যদি ঐরূপ অবস্থায় কাটত, তবে কতই না উত্তম হতো! এভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্প্রদায় শত্রুতাবশত প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল; কিন্তু তারা ব্যর্থকাম হল। তারা গৌরব অর্জন করতে চেয়েছিল, কিন্তু লাঞ্ছিত হল। তারা বিজয়ী হতে চেয়েছিল, কিন্তু পরাজিত হল। আল্লাহর বাণী ঃ

وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ.

(তারা চক্রান্ত করে ক্ষতি করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি তাদেরকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করে দেই।) অপর আয়াতে আছে فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (আমি তাদেরকে হীনতম করে দেই) এরূপে দুনিয়ার জীবনে তারা ক্ষতি ও লাঞ্ছনাপ্রাপ্ত হয় আর আখিরাতের জীবনে তাদের উপর আগুন না শীতল হবে, না শান্তিদায়ক হবে বরং সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (জাহান্নাম হল তাদের জন্যে নিকৃষ্ট আবাস ও ঠিকানা (সূরা ফুরকান ঃ ৬৬)

ইমাম বুখারী (র) উম্মু শারীক (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) গিরগিটি মারার আদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, ইবরাহীম (আ)-এর বিরুদ্ধে এটি আগুনে ফুঁক দিয়েছিল। ইমাম মুসলিম (র) ইব্ন জুরায়জ (র) সূত্রে এবং বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও ইব্ন মাজাহ্ (র) সুফিয়ান ইব্ন উয়ায়না (রা) সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র) আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, তোমরা গিরগিটি হত্যা কর; কারণ সে ইবরাহীম (আ)-এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল— তাই হযরত আয়েশা (রা) গিরগিটি হত্যা করতেন। ইমাম আহমদ (র) নাফি (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, জনৈক মহিলা হযরত আয়েশা (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করে একটি বর্শা দেখে জিজ্ঞেস করল ঃ এ বর্শা দ্বারা আপনি কি করেন? উত্তরে আয়েশা (রা) বললেন, এর দ্বারা আমি গিরগিটি নিধন করি। তারপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয় তখন সমস্ত জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ আগুন নিভাতে চেষ্টা করেছিল, কেবল এ গিরগিটি তা করেনি; বরং সে উল্টো আগুনে ফুঁক দিয়েছিল। উপরোক্ত হাদীস দু'টি ইমাম আহমদ (র) ভিন্ন আর কেউ বর্ণনা করেননি।

ইমাম আহমদ....ফাকিহ্ ইবনুল মুগীরার মুক্ত দাসী সুমামা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি একদা আয়েশা (রা)-এর গৃহে যাই। তখন সেখানে একটা বর্শা রাখা আছে দেখতে পাই। জিজ্ঞেস করলাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! এ বর্শা দিয়ে আপনি কী করেন? তিনি বললেন, এ দিয়ে আমি এসব গিরগিটি বধ করি। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বলেছেনঃ ইবরাহীম (আ)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন যমীনের উপর এমন কোন জীব ছিল না যারা আগুন নেভাতে চেষ্টা করেনি, কেবল এই গিরগিটি ব্যতীত। সে ইবরাহীম (আ)-এর উপরে আগুনে ফুঁক দেয়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে এগুলো হত্যা করতে আদেশ করেছেন। ইব্‌ন মাজাহ্ (র).... জারীর ইব্‌ন হাযিম (র) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে খোদায়ী দাবিদার এক দুর্বল বান্দার বিতর্ক প্রসঙ্গ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرٰهِمَ فِىْ رَبِّهٖ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ . اِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ. قَالَ اِبْرٰهِمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ. وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবরাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইবরাহীম বলল, তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বলল, আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদয় করান, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদয় করাও তো! অতঃপর যে কুফরী করেছিল, সে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৮)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সেই সীমালংঘনকারী প্রতাপশালী রাজার বিতর্কের কথা উল্লেখ করছেন, যে নিজে প্রতিপালক হওয়ার দাবি করেছিল। হযরত ইবরাহীম খলীল (আ) তার উপস্থাপিত যুক্তির অসারতা প্রমাণ করেন, তার মূর্খতা ও স্বল্পবুদ্ধিতা প্রকাশ করে দেন এবং নিজের দলীল দ্বারা তাকে নিরুত্তর করেন।

তাফসীরবিদ, ঐতিহাসিক ও বংশবিদদের মতে, এ রাজাটি ছিল ব্যাবিলনের রাজা। মুজাহিদ (র) তার নাম নমরূদ ইব্‌ন কিনআন ইব্‌ন কূশ ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যরা তার বংশলতিকা বলেছেন এভাবে— নমরূদ ইব্‌ন ফালিহ্ ইব্‌ন আবির ইব্‌ন সালিহ ইব্‌ন আরফাখশাদ ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ। মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেছেন, যেসব রাজা-বাদশাহ দুনিয়া জোড়া রাজত্ব করেছে, এ ছিল তাদের অন্যতম। ঐতিহাসিকদের মতে, এরূপ বাদশাহর সংখ্যা ছিল চার। দুজন মু'মিন ও দু'জন কাফির। মু'মিন দু'জন হলেন (১) যুলকারনায়ন ও (২) সুলায়মান (আ) আর কাফির দু'জন হল (১) নমরূদ ও (২) বুখ্‌ত নসর। ঐতিহাসিকদের মতে,

নমরূদ চারশ' বছরকালব্যাপী রাজত্ব করেছিল। ফলে সে জুলুম-অত্যাচার, দাম্ভিকতা ও সীমালংঘনের চরমে গিয়ে পৌঁছে এবং পার্থিব জীবনকেই সে চরম লক্ষ্য বলে বেছে নেয়। ইবরাহীম খলীল (আ) যখন তাকে এক ও লা-শরীক আল্লাহর ইবাদতের জন্যে আহ্বান জানালেন, তখন তার মূর্খতা, পথ-ভ্রষ্টতা ও উচ্চাভিলাষ তাকে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করতে প্ররোচিত করে। এ ব্যাপারে সে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় এবং নিজেই প্রতিপালক হওয়ার দাবি করে। হযরত ইবরাহীম (আ) যখন বললেন ঃ আমার প্রতিপালক তো তিনি, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। নমরূদ বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।

কাতাদা, সুদ্‌দী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) লিখেছেন, নমরূদ ঐ সময় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত দু' ব্যক্তিকে ডেকে আনে। অতঃপর একজনকে হত্যা করে ও অপরজনকে ক্ষমা করে দেয়। এর দ্বারা সে বোঝাতে চেয়েছে যে, সে একজনকে জীবন দান করল এবং অন্যজনের মৃত্যু ঘটাল। এ কাজটি ইবরাহীম (আ)-এর দলীলের কোন মুকাবিলাই ছিল না। বরং তা বিতর্কের সাথে সামঞ্জস্যহীন একটা উদ্ভট দুষ্কর্ম ছাড়া কিছুই নয়। কেননা, হযরত ইরবাহীম খলীল (আ) বিদ্যমান সৃষ্ট-বস্তুর দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণ করছেন। তিনি দেখাচ্ছেন যে, যেসব প্রাণী আমরা দেখতে পাই, তা এক সময় জন্মলাভ করেছে। আবার কিছু দিন পর সেগুলো মৃত্যুবরণ করছে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, এই কাজের একজন কর্তা আছেন, যিনি প্রাণীকে সৃষ্টি করছেন ও মৃত্যু দিচ্ছেন। কারণ কর্তা ছাড়া আপনা-আপনি কোন কিছু হওয়া অসম্ভব। সুতরাং বিশ্বজগতে প্রাণী অপ্রাণী যা কিছু আছে তা একবার অস্তিত্বে আসা ও আর একবার অস্তিত্ব লোপ পাওয়া, সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করা; নক্ষত্র, বায়ু, মেঘমালা ও বৃষ্টি পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজের জন্যে অবশ্যই একজন কর্তা আছেন। সে জন্যে ইবরাহীম (আ) বললেন ঃ

رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِ وَيُمِيْتُ (আমার প্রতিপালক তিনিই, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।) অতএব, এ মূর্খ বাদশাহর এই যে কথা— আমিও জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এর দ্বারা যদি এটা বোঝান হয় যে, সে-ই দৃশ্যমান জগতের কর্তা, তবে এটা বৃথা দম্ভ ও বাস্তবকে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ কথার দ্বারা যদি সেটাই বোঝান হয়ে থাকে, যার উল্লেখ মুজাহিদ, সুদ্‌দী ও ইব্‌ন ইসহাক (র) করেছেন, তাহলে এ কথার কোন মূল্যই নেই। কেননা ইবরাহীম (আ)-এর পেশকৃত দলীলের তাতে খণ্ডন হয় না।

বাদশাহ নমরূদের এই যুক্তির অসারতা উপস্থিত অনেকের কাছে অস্পষ্ট হওয়ায় এবং অনুপস্থিতদের নিকট অস্পষ্ট হওয়ার প্রবল আশংকা থাকায় হযরত ইবরাহীম (আ) আর একটি যুক্তি পেশ করেন, যার দ্বারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও নমরূদের মিথ্যা দাবি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ.

ইবরাহীম বলল, আল্লাহ তো সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করেন, তুমি একে পশ্চিম দিক থেকে উদিত করাও দেখি।

অর্থাৎ এই সূর্য আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে প্রত্যহ পূর্ব দিক থেকে উদিত হয় এবং নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিচালনা করেন। এই আল্লাহ এক, অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনিই সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা।

এখন তোমার জীবন দান ও মৃত্যু ঘটানোর দাবি যদি যথার্থ হয়, তবে এ সূর্যকে তুমি পশ্চিম দিক থেকে উদিত কর। কেননা, যিনি জীবন দান ও মৃত্যু ঘটাতে পারেন, তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছাকে কেউ বাধা দিতে পারে না, তাঁকে কেউ অক্ষম করতে পারে না; বরং সব কিছুর উপরই তাঁর কর্তৃত্ব চলে, সব কিছুই তাঁর নির্দেশ মানতে বাধ্য। অতএব, নিজের দাবি অনুযায়ী তুমি যদি প্রতিপালক হয়ে থাক, তাহলে এটা করে দেখাও। আর যদি তা করতে না পার তবে তোমার দাবি মিথ্যা। কিন্তু তুমিও জান এবং অন্যান্য প্রত্যেকেই জানে যে, এ কাজ করতে তুমি সক্ষম নও। এতো দূরের কথা, একটা সামান্য মশা সৃষ্টি করাও তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। এ যুক্তি প্রদর্শনের পরে নমরূদের ভ্রষ্টতা, মূর্খতা, মিথ্যাচার ও মূর্খ সমাজের কাছে তার দাম্ভিকতা স্পষ্ট হয়ে যায়। সে কোন উত্তর দিতে সক্ষম হল না, নীরব-নিশ্চুপ হয়ে রয়ে গেল।

আল্লাহ্ বলেন ঃ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ –

কাফির লোকটি হতভম্ব হয়ে গেল। আর জালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সুপথ দেখান না। (সূরা বাকারা ঃ ২৫৮)

সুদ্দী (র) লিখেছেন, নমরূদ ও ইবরাহীম (আ)-এর মধ্যে এ বিতর্ক হচ্ছে তিনি অগ্নি থেকে বের হয়ে আসার দিনের ঘটনা এবং সেখানে লোকের কোন জমায়েত ছিল না। কেবল দু'জনের মধ্যেই বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। আবদুর রাজ্জাক যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ নমরূদের নিকট সঞ্চিত খাদ্য ভাণ্ডার ছিল। লোকজন দলে দলে তার নিকট খাদ্য আনার জন্যে যেত। হযরত ইবরাহীম (আ)-ও এরূপ এক দলের সাথে খাদ্য আনতে যান। সেখানেই এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ফলে নমরূদ ইবরাহীম (আ)-কে খাদ্য না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়। ইবরাহীম (আ) শূন্যপাত্র নিয়ে বেরিয়ে আসেন। বাড়ির কাছে এসে তিনি দু'টি পাত্রে মাটি ভর্তি করে আনেন এবং মনে মনে ভাবেন বাড়ি পৌঁছে সাংসারিক কাজে জড়িয়ে পড়বেন। বাড়ি পৌঁছে বাহন রেখে তিনি ঘরে প্রবেশ করে দেওয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী সারাহ পাত্র দু'টির কাছে গিয়ে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দ্বারা তা ভর্তি দেখতে পান এবং তা দ্বারা খাদ্য তৈরি করেন। ঘুম থেকে জেগে হযরত ইবরাহীম (আ) রান্না করা খাদ্য দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এ তোমরা কোত্থেকে পেলে? সারাহ জানালেন, আপনি যা এনেছেন তা থেকেই তৈরি করা হয়েছে। এ সময় ইবরাহীম (আ) আঁচ করতে পারেন যে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ খাদ্য হিসেবে তাদেরকে এ রিয্ক দান করেছেন।

যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) বর্ণনা করেছেন যে, এই অহংকারী বাদশাহর নিকট আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। ফেরেশতা তাকে আল্লাহর উপর ঈমান আনতে বললে সে অস্বীকার করে। পুনরায় দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আহ্বান জানালে প্রত্যেক বারেই সে অস্বীকৃতি জানায় এবং বলে দেয়, তুমি তোমার বাহিনী একত্র কর, আর আমি আমার বাহিনী একত্র করি। পরের দিন সূর্যোদয়ের সময় নমরূদ তার সৈন্য-সামন্তের সমাবেশ ঘটালো। অপর দিকে আল্লাহ অগণিত মশা প্রেরণ করলেন। মশার সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, তাতে তারা সূর্যের মুখটি পর্যন্ত দেখতে সক্ষম হয়নি। আল্লাহ মশা বাহিনীকে তাদের উপর লেলিয়ে দেন। ফলে মশা তাদের রক্ত-মাংস খেয়ে সাদা হাড্ডি বের করে দেয়। একটি মশা নমরূদের নাকের ছিদ্রে প্রবেশ করে।

চারশ' বছর পর্যন্ত এই মশা তার নাকের ছিদ্রে অবস্থান করে দংশন করতে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে সে হাতুড়ি দ্বারা নিজের মাথা ঠুকাতে থাকে। অবশেষে এভাবেই আল্লাহ্ তাকে ধ্বংস করেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সিরিয়া ও মিসরে হিজরত এবং অবশেষে ফিলিস্তিনে স্থায়ী বসতি স্থাপন

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী ঃ

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي. إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.

লূত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করল। ইবরাহীম বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করছি। তিনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আমি ইবরাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং বংশধরদের জন্যে স্থির করলাম নবুওত ও কিতাব এবং আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম। আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্ম পরায়ণদের অন্যতম হবে (সূরা আনকাবূত ঃ ২৬-২৭)

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ. وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوَاتِ وَإِيتَاءَ الزَّكَوَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ.

এবং আমি তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে নিয়ে গেলাম, যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি বিশ্ববাসীর জন্যে এবং আমি ইবরাহীমকে দান করেছিলাম ইসহাক এবং পৌত্ররূপে ইয়াকূব, আর প্রত্যেককেই করেছিলাম সৎকর্মপরায়ণ; এবং তাদেরকে করেছিলাম নেতা; তারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করত, তাদেরকে ওহী প্রেরণ করেছিলাম সৎকর্ম করতে, সালাত কায়েম করতে এবং যাকাত প্রদান করতে; তারা আমারই ইবাদত করত। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭১-৭৩)

হযরত ইবরাহীম (আ) নিজের দেশ ও জাতিকে ত্যাগ করে আল্লাহর রাহে হিজরত করেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা, কোন সন্তান হত না এবং তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না বরং ভ্রাতুষ্পুত্র লূত ইব্ন হারান ইব্ন আযর তাঁর সংগে ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাঁকে একাধিক পুত্র সন্তান দান করেন এবং তাঁদের সকলেই পূণ্যবান ছিলেন। ইবরাহীম (আ)-এর বংশে নবুওত এবং কিতাব প্রেরণের ধারা চালু রাখেন। সুতরাং ইবরাহীম (আ)-এর পরে যিনিই নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন তাঁর বংশ থেকেই হয়েছেন এবং তাঁর পরে যে কিতাবই আসমান থেকে কোন

নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তা তাঁর বংশধরদের উপরই অবতীর্ণ হয়েছে। এ সব পুরস্কার আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন তাঁর ত্যাগ ও কুরবানী এবং আল্লাহর জন্যে দেশ, পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করার বিনিময়ে। এমন দেশের উদ্দেশে তিনি হিজরত করলেন যেখানে আল্লাহর ইবাদত এবং বান্দাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবানের সুযোগ ছিল। তাঁর সেই হিজরতের দেশটি হল শাম বা সিরিয়া। এ দেশ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন ঃ

إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيْهَا لِلْعَالَمِيْنَ -

' সে দেশের দিকে যেখানে আমি বিশ্ববাসীর জন্য বরকত রেখে দিয়েছি।' উবাই ইবন কা'ব আল আলিয়া, কাতাদা প্রমুখ এই মত পোষণ করেন। কিন্তু আওফীর সূত্রে ইব্ন 'আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত। উপরোক্ত আয়াতে (إِلَى الْأَرْضِ الَّتِيْ بَارَكْنَا فِيْهَا لِلْعَالَمِيْنَ) যে দেশের কথা বলা হয়েছে, সে দেশ হল মক্কা এবং সমর্থনে তিনি নিম্নের আয়াত উল্লেখ করেন ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ.

নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে স্থাপিত হয়েছে সেটাই হচ্ছে এ ঘর যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের জন্যে হিদায়াত ও বরকতময়। (সূরা আল-ইমরান ঃ ৯৬)

কা'ব আহবার (রা)-এর মতে, সে দেশটি ছিল হারান। ইতিপূর্বে আমরা আহ্‌লি কিতাবদের বরাত দিয়ে বলে এসেছি যে, হযরত ইবরাহীম (আ), তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লূত (আ), ভাই নাহুর স্ত্রী সারাহ্ ও ভাইয়ের স্ত্রী মালিকাসহ বাবিল থেকে রওয়ানা হন এবং হারানে পৌঁছে সেখানে বসবাস শুরু করেন। সেখানে ইবরাহীম (আ)-এর পিতা তারাখ-এর মৃত্যু হয়।

সুদ্দী (র) লিখেছেন, ইবরাহীম (আ) ও লূত (আ) সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন। পথে সারাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ হয়। সারাহ্ ছিলেন হারানের রাজকুমারী। তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের ধর্মকে কটাক্ষ করতেন। ইবরাহীম (আ) তাঁকে এই শর্তে বিবাহ করেন যে, তাঁকে ত্যাগ করবেন না। ইব্ন জারীর (র) এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন কিন্তু ঐতিহাসিকদের আর কেউ এ ব্যাপারে বর্ণনা করেন নি। প্রসিদ্ধ মতে, সারাহ্ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর চাচা হারান-এর কন্যা। যার নামে হারান রাজ্যের পরিচিতি। সুহায়লী (র) কুতায়বী ও নাক্‌ফাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, সারাহ্ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহোদর হারানের কন্যা লূত-এর ভগ্নি। এ মত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক। এ মত পোষণকারীরা দাবি করেছেন যে, ঐ সময় ভাতিজী বিবাহ করা বৈধ ছিল। কিন্তু এ দাবির পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, কোন এক সময়ে ভাতিজী বিবাহ করা বৈধ ছিল। যেমন ইহুদী পণ্ডিতরা বলে থাকেন তবুও এটা সম্ভব নয়। কেননা, নিরুপায় অবস্থায় কোন কিছু বৈধ হলেও তার সুযোগ গ্রহণ নবী-রাসূলগণের উন্নত চরিত্রের মর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

প্রসিদ্ধ মত হল, হযরত ইবরাহীম (আ) যখন বাবিল থেকে হিজরত করেন, তখন সারাহ্‌কে সাথে নিয়েই বের হয়েছিলেন যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ই সম্যক জ্ঞাত। আহ্‌লি কিতাবদের বর্ণনা মতে, হযরত ইবরাহীম (আ) যখন সিরিয়ায় যান তখন আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে জানান, তোমার পরে এই দেশটি আমি তোমার উত্তরসুরিদের আয়ত্তে দেব। এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশস্বরূপ তিনি তথায় কুরবানীর একটি কেন্দ্র নির্মাণ করেন এবং বায়তুল

মুকাদ্দাসের পূর্ব প্রান্তে তিনি নিজের থাকার জন্যে একটি গম্বুজ বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করেন। অতঃপর তিনি জীবিকার অন্বেষণে বের হন। এ সময় বায়তুল মুকাদ্দাস অঞ্চলে ছিল প্রচণ্ড আকাল ও দুর্ভিক্ষ, তাই সবাইকে নিয়ে তিনি মিসরে চলে যান। এই সাথে আহ্‌লি কিতাবরা সারাহ্ এবং তথাকার রাজার ঘটনা, সারাহ্কে নিজের বোন বলে পরিচয় দিতে শিখিয়ে দেয়া, রাজা কর্তৃক সারাহ্ (র)-এর খিদমতের জন্যে হাজেরাকে দান; অতঃপর সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করা এবং বরকতময় বায়তুল মুকাদ্দাস অঞ্চলে বহু জীব-জন্তু, দাস-দাসী ও ধন-সম্পদসহ প্রত্যাগমন করার কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন; হযরত ইবরাহীম (আ) তিনবার অসত্য উক্তি করেছিলেন। এর দুটি আল্লাহ সংক্রান্ত (১) তিনি বলেছিলেন ঃ إِنِّيْ سَقِيْمٌ—আমি পীড়িত; (২) আর একবার বলেছিলেন ঃ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا—এই বড় মূর্তিটিই এ কর্মটি করেছে। এবং তৃতীয় উক্তিটি করেছিলেন নিজের ব্যাপারে। ঘটনা এই; হযরত ইবরাহীম (আ) স্ত্রী সারাহ্সহ কোন এক জালিম বাদশাহর এলাকা অতিক্রম করছিলেন। বাদশাহর নিকট সংবাদ গেল যে, এই এলাকায় একজন লোক আছে যার সাথে রয়েছে এক পরমা সুন্দরী নারী। জালিম বাদশাহ্ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট লোক পাঠান। আগন্তুক এসে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সারাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, ইনি কে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ আমার বোন। এরপর হযরত ইবরাহীম (আ) সারাহ্র কাছে এসে বলেন, দেখ সারাহ্! এই ধরাপৃষ্ঠে আমি এবং তুমি ব্যতীত আর কোন মুমিন নেই। এই আগন্তুক তোমার সাথে আমার সম্পর্কের কথা জানতে চেয়েছে। আমি তাকে এই কথা বলে দিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। এখন আমাকে তুমি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করো না। এরপর ঐ জালিম বাদশাহ সারাহ্কে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লোক পাঠান।

সারাহ্ বাদশাহর দরবারে নীত হলে , বাদশাহ তাঁর প্রতি হাত বাড়ায়। সংগে সংগে সে খোদার গযবে পতিত হয়। বাদশাহ বলল, সারাহ্ আমার জন্যে দু'আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি সাধন করব না। সারাহ্ দু'আ করলেন। ফলে বাদশাহ ছাড়া পায়। কিন্তু দ্বিতীয়বার সে সারাহ্র প্রতি হাত বাড়ায়। এবারও সে পূর্বের ন্যায় কিংবা তদপেক্ষা কঠিনভাবে তাঁর প্রতি শাস্তি নেমে আসে। পুনর্বার বাদশাহ বলল, আমার জন্যে দু'আ কর। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করব না। সারাহ্ দু'আ করলে সে পুনরায় রক্ষা পায়। তখন বাদশাহ্ তার একান্ত সচিবকে ডেকে বলল, তুমি তো আমার কাছে কোন মানবী আননি, এনেছ এক দানবী। পরে বাদশাহ্ সারাহ্র খিদমতের জন্যে হাজেরাকে দান করল। সারাহ্ ইবরাহীম (আ)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে সালাত আদায়রত দেখতে পান। হযরত ইবরাহীম (আ) সালাতে থেকেই হাতের ইশারা দ্বারা ঘটনা জানতে চাইলেন। সারা বললেন, আল্লাহ অনাচারী কাফিরের চক্রান্ত নস্যাত করে দিয়েছেন এবং ঐ জালিম আমার খিদমতের জন্যে হাজেরাকে দিয়েছে।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, হে বেদুঈন আরব সন্তানগণ! এই হাজেরাই তোমাদের আদি মাতা। ইমাম বুখারী (র) এই একক সূত্রে হাদীসটি মওকূফ রূপে বর্ণনা করেছেন। হাফিজ আবূ বকর আল বায্যার (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) মাত্র তিনবার ব্যতীত কখনও অসত্য উক্তি করেন নি। ঐ তিনটি উক্তিই

ছিল আল্লাহ সংক্রান্ত। (১) নিজেকে إِنِّيْ سَقِيْمٌ (আমি পীড়িত বলা;) (২) بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ (এদের এ বড়টাই এ কাজ করেছে বলা;) (৩) হযরত ইবরাহীম কোন এক জালিম রাজার এলাকা দিয়ে সফর করার সময় কোন এক মঞ্জিলে অবতরণ করেন। জালিম রাজা তথায় আগমন করে। তাকে জানানো হয় যে, এখানে একজন লোক এসেছে যার সাথে এক পরমা সুন্দরী রমণী আছে। রাজা তখনই ইবরাহীম (আ)-এর নিকট লোক প্রেরণ করে। সে এসে মহিলাটি সম্পর্কে ইবরাহীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, সে আমার বোন। এরপর ইবরাহীম (আ) তাঁর স্ত্রীর কাছে আসেন এবং বলেন, একটি লোক তোমার সম্পর্কে আমার কাছে জিজ্ঞেস করেছে। আমি তোমাকে আমার বোন বলে পরিচয় দিয়েছি। এখন আমি আর তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন মুসলিম নেই। এ হিসেবে তুমি আমার বোনও বটে। সুতরাং রাজার কাছে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করো না যেন। রাজা তাঁর দিকে হাত বাড়াতেই আল্লাহর পক্ষ থেকে এক আযাব এসে তাকে পাকড়াও করে। রাজা বলল, তুমি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। তিনি দু'আ করেন। ফলে সে মুক্ত হয়। কিন্তু পরক্ষণে আবার তাঁকে ধরার জন্যে হাত বাড়ায়। এবারও আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্বের ন্যায় কিংবা তদপেক্ষা শক্তভাবে পাকড়াও হয়। রাজা পুনরায় বলল, আমার জন্যে আল্লাহর নিকট দু'আ কর, তোমার কোন ক্ষতি আমি করব না। সুতরাং দু'আ করায় সে মুক্তি পেয়ে যায়। এরূপ তিনবার ঘটে। অতঃপর রাজা তার সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ অনুচরকে ডেকে বললো, তুমি তো কোন মানবী আননি; এনেছ এক দানবী। একে বের করে দাও এবং হাজেরাকেও সাথে দিয়ে দাও। বিবি সারাহ্ ফিরে আসলেন। ইবরাহীম (আ) তখন সালাতে রত ছিলেন। সারাহ্‌র শব্দ পেয়েই তিনি তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কি? সারাহ্ বললেন, 'আল্লাহ জালিমের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছেন। আর সে আমার খিদমতের জন্যে হাজেরাকে দান করেছে।' বায্‌যার (র) বলেছেন, মুহম্মদ (র)-এর সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে হিশাম ব্যতীত কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। অন্যরা একে 'মওকূফ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ) তিনবার ছাড়া কখনও মিথ্যা কথা বলেননি। (১) কাফিররা যখন তাদের মেলায় যাওয়ার জন্যে আহবান জানায়, তখন তিনি বলেছিলেন, إِنِّيْ سَقِيْمٌ (আমি পীড়িত) (২) তিনি মূর্তি ভেঙ্গে বলেছিলেন, بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا (এদের মধ্যে এই বড়টিই এ কাজ করেছে); (৩) নিজের স্ত্রী সারাহ্‌র পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ انها اختى (এ আমার বোন)। বর্ণনাকারী বলেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) একবার কোন এক জনপদে প্রবেশ করেন। সেখানে ছিল এক জালিম রাজা। তাকে জানানো হল যে, এ রাত্রে ইবরাহীম এক পরমা সুন্দরী নারীসহ এখানে এসেছে। রাজা তাঁর কাছে দূত পাঠাল। দূত হযরত ইবরাহীম (আ)-কে জিজ্ঞেস করল। আপনার সাথী এ রমণীটি কে? ইবরাহীম (আ) বললেন, আমার বোন। দূত বলল, একে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিন। হযরত ইবরাহীম (আ) পাঠিয়ে দিলেন এবং বলে দিলেন যে, আমার উক্তিকে তুমি মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না যেন। কারণ রাজাকে আমি জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন হও। মনে কর যে, এ পৃথিবীর বুকে আমি এবং

তুমি ছাড়া আর কোন মু'মিন নেই। সারাহ্ রাজার দরবারে পৌঁছলে সে সারাহ্র দিকে অগ্রসর হল। সারাহ্ তখন অযূ করে সালাত আদায় করতে উদ্যত হলেন এবং নিম্নের দু'আটি পড়লেন

اللهم ان كنت تعلم انى امنت بك وبرسولك واحصنت فرجى الا على زوجى فلا تسلط على الكافر.

অর্থাৎ— 'হে আল্লাহ! আপনি অবশ্যই অবগত আছেন যে, আমি আপনার উপর ও আপনার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। আমার স্বামী ব্যতীত অন্য সবার থেকে আমার লজ্জাস্থানকে হিফাজত করেছি। অতএব, কোন কাফিরকে আমার উপর হস্তক্ষেপ করতে দেবেন না।'

জালিম রাজাকে তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এমনভাবে টুঁটি চেপে ধরা হলো যে, পায়ের সাথে পা ঘর্ষণ করে ছট্ফট্ করতে লাগলো। আবূয্ যিনাদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বলেন, সারাহ্ তখন পুনরায় দু'আ করেন, 'হে আল্লাহ! লোকটি এভাবে মারা গেলে লোকে বলবে আমিই তাকে হত্যা করেছি। অতএব, রাজা শাস্তি থেকে মুক্তিলাভ করল। কিন্তু পুনরায় রাজা তার দিকে অগ্রসর হলো। সারাহ্ও পূর্বের ন্যায় অযূ ও সালাত শেষে ঐ দু'আটি পড়লেন। রাজা পুনরায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ছট্ফট্ করতে থাকে। এ দেখে সারাহ্ বললেন, "হে আল্লাহ! এ যদি মারা যায় তবে লোকে বলবে ঐ মহিলাটিই তাকে হত্যা করেছে।" অতঃপর সে মুক্তি লাভ করে। এ ভাবে তৃতীয় বা চতুর্থ বারের পর জালিম রাজা তার লোকদেরকে ডেকে বলল, তোমরা আমার কাছে তো একটা দানবী পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের নিকট ফিরিয়ে দাও আর হাজেরাকেও এর সাথে দিয়ে দাও। বিবি সারাহ্ ফিরে এসে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে জানালেন, আপনি কি জানতে পেরেছেন, আল্লাহ্ কাফিরদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছেন এবং ঐ জালিম একজন দাসীকেও দান করেছে? কেবল ইমাম আহমদ (র) এই সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, অবশ্য সহীহ সনদের শর্ত অনুযায়ী। ইমাম বুখারী (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে মারফূ'ভাবে হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আবী হাতিম আবূ সাঈদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) যে তিনটি কথা বলেছিলেন তার প্রতিটিই আল্লাহ্র দীনের গ্রন্থি উম্মোচন করে। তাঁর প্রথম কথা ঃ إِنِّى سَقِيْمٌ (আমি পীড়িত), দ্বিতীয় কথা ঃ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا (বরং এদের বড়জনই এ কাজ করেছে), তৃতীয় কথা ঃ যখন রাজা তার স্ত্রীকে কামনা করেছিল তখন বলেছিলেন, هى اختى (সে আমার বোন) অর্থাৎ আল্লাহর দীনের সম্পর্কে বোন। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন—"এ জগতে আমি এবং তুমি ব্যতীত আর কোন মু'মিন নেই।" তাঁর এ কথার অর্থ হল, আমরা ব্যতীত আর কোন মু'মিন দম্পতি নেই। এ ব্যাখ্যা এ জন্যে প্রয়োজন, যেহেতু হযরত লূত (আ)-ও তখন তাদের সফরসংগী ছিলেন আর তিনি ছিলেন একজন নবী। বিবি সারাহ যখন জালিম বাদশাহর নিকট যাওয়ার জন্যে রওয়ানা হন, তখন থেকেই হযরত ইবরাহীম (আ) সালাত আদায়ে রত থাকেন এবং দু'আ করতে থাকেন, যেন আল্লাহ তাঁর স্ত্রীকে হিফাজত করেন এবং জালিমের কুমতলব ব্যর্থ করে দেন। বিবি সারাহ্ও অনুরূপ আমল করেন। আল্লাহর দুশমন তাকে ধরতে গেলে তিনি অযূ করে সালাত আদায়ান্তে দু'আ করেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ.

তোমরা ধৈর্য ও সালাত দ্বারা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। (২ বাকারা ঃ ৪৫)। এভাবে আল্লাহ তাঁর খলীল, হাবীব, রাসূল ও বান্দার খাতিরে তাঁর স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষা করলেন।

কোন কোন বিজ্ঞ আলিমের মতে, তিনজন মহিলা নবী ছিলেন (১) সারাহ্ (২) হযরত মূসা (আ)-এর মা, (৩) মারয়াম। কিন্তু অধিকাংশের মতে, তাঁরা তিনজন সিদ্দীকা (সত্যপরায়ণা) (আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন হোন) ছিলেন। আমি কোন কোন বর্ণনায় দেখেছি— বিবি সারাহ্ যখন ইবরাহীম (আ)-এর নিকট থেকে জালিম বাদশাহর কাছে যান, তখন থেকে তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ ইবরাহীম (আ) ও সারাহ্র মধ্যকার পর্দা উঠিয়ে নেন। ফলে রাজার কাছে তাঁর থাকাকালীন যা যা ঘটছিল সবই তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন। আল্লাহ্ এ ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে ইবরাহীম (আ)-এর হৃদয় পবিত্র থাকে, চক্ষু শীতল থাকে এবং তিনি অন্তরে প্রশান্তি বোধ করেন। কেননা, হযরত ইবরাহীম (আ) সারাহ্কে তার দীনের জন্যে, আত্মীয়তার সম্পর্কের জন্যে ও অনুপম সৌন্দর্যের জন্যে তাকে প্রগাঢ় মহব্বত করতেন। কেউ কেউ বলেছেন, বিবি হাওয়ার পর থেকে সারাহ্র যুগ পর্যন্ত তাঁর চাইতে অধিক সুন্দরী কোন নারীর জন্ম হয়নি। সকল প্রশংসা আল্লাহরই।

কোন কোন ইতিহাসবিদ লিখেছেন, এই সময়ে মিসরের ফিরআউন ছিল বিখ্যাত জালিম বাদশাহ জাহ্হাকের ভাই। সে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে মিসরের শাসনকর্তা ছিল। তার নাম কেউ বলেন সিনান ইব্ন আলওয়ান ইব্ন উবায়দ ইব্ন উওয়ায়জ ইব্ন আমলাক ইব্ন লাওদ ইব্ন সাম ইব্ন নূহ। ইব্ন হিশাম 'তীজান' নামক গ্রন্থে বলেছেন, যে রাজা সারাহ্র উপর লোভ করেছিল তার নাম আমর ইব্ন ইমরুল কায়স ইব্ন মাইলূন ইব্ন সাবা। সে মিসরের শাসনকর্তা ছিল। সুহায়লী (র) এ তথ্য বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ই সম্যক জ্ঞাত।

অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) মিসর থেকে তাঁর পূর্ববর্তী বাসস্থান বরকতের দেশ তথা বায়তুল মুকাদ্দাসে যান। তাঁর সাথে বহু পশু সম্পদ, গোলাম, বাঁদী ও ধন-সম্পদ ছিল। মিসরের কিবতী বংশোদ্ভূত হাজেরাও সাথে ছিলেন। এই সময় হযরত লূত (আ) তাঁর ধন-সম্পদসহ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আদেশক্রমে গাওর দেশে চলে যান। 'গাওরে-যাগার' নামে এ স্থানটি প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি সে অঞ্চলে ঐ যুগের প্রসিদ্ধ শহর সাদ্দূমে অবতরণ করেন। শহরের বাসিন্দারা ছিল কাফির, পাপাসক্ত ও দুষ্কৃতকারী। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে দৃষ্টি প্রসারিত করে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে তাকাতে বলেন এবং সু-সংবাদ দেন যে, এই সমুদয় স্থান তোমাকে ও তোমার উত্তরসুরিদেরকে চিরদিনের জন্য দান করব। তোমার সন্তানদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি করে দেব যে, তাদের সংখ্যা পৃথিবীর বালুকণার সংখ্যার সমান হয়ে যাবে। এই সুসংবাদ পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলিত হয়, বিশেষ করে এই উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ক্ষেত্রে। একটি হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ আমার সম্মুখে পৃথিবীর এক অংশকে ঝুঁকিয়ে দেন। আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত দেখে নিলাম। অচিরেই আমার উম্মতের রাজত্ব এই দেখান সীমানা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, কিছুদিন পর ঐ দুরাচার লোকেরা হযরত লূত (আ)-এর উপর চড়াও হয় এবং তাঁর পশু ও ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়ে তাঁকে বন্দী

করে রাখে। এ সংবাদ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি তিনশ' আঠারজন সৈন্য নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ করেন এবং লূত (আ)-কে উদ্ধার করেন, তাঁর সম্পদ ফিরিয়ে আনেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিপুল সংখ্যক শত্রুকে হত্যা করেন। শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেন ও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে তিনি দামেশকের পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছেন। শহরের উপকণ্ঠে বারযাহ্ নামক স্থানে সেনা ছাউনি স্থাপন করেন। আমার ধারণা— এই স্থানকে "মাকামে ইবরাহীম" বলার কারণ এটাই যে, এখানে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র সৈন্য বাহিনীর শিবির ছিল।

তারপর হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র সাহায্যপুষ্ট অবস্থায় বিজয়ীর বেশে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের শহরসমূহের শাসকবর্গ শ্রদ্ধাভরে ও বিনীতভাবে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।

হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল (আ)-এর জন্ম প্রসঙ্গ

আহ্লি কিতাবদের বর্ণনা মতে, হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্র নিকট সুসন্তানের জন্য দু'আ করেন। আল্লাহ্ তাঁকে এ বিষয়ে সুসংবাদ দানও করেন। কিন্তু এরপর বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁর বিশটি বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এ সময় একদিন সারাহ্ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বললেন, আমাকে তো আল্লাহ্ সন্তান থেকে বঞ্চিতই রেখেছেন। সুতরাং আপনি আমার বাঁদীর সাথে মিলিত হন। তার গর্ভে আল্লাহ্ আমাকে একটা সন্তান দিতেও পারেন। সারাহ্ হাজেরাকে ইবরাহীমের জন্যে হেবা করে দিলে ইবরাহীম (আ) তাঁর সাথে মিলিত হন। তাতে হাজেরা সন্তান-সম্ভবা হন। এতে আহ্লি কিতাবগণ বলে থাকেন, হাজেরা অনেকটা গৌরববোধ করেন এবং আপন মনিব সারাহ্র তুলনায় নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করতে থাকেন। সারাহ্র মধ্যে আত্মমর্যাদা বোধ জাগ্রত হয় এবং তিনি এ সম্পর্কে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট অভিযোগ করেন। জবাবে ইবরাহীম (আ) বললেন, "তার ব্যাপারে তুমি যে কোন পদক্ষেপ নিতে চাও নিতে পার।" এতে হাজেরা শংকিত হয়ে পলায়ন করেন এবং অদূরেই এক কূপের নিকটে অবতরণ করেন। সেখানে জনৈক ফেরেশতা তাঁকে বলে দেন যে, তুমি ভয় পেয় না; যে সন্তান তুমি ধারণ করেছ আল্লাহ্ তাকে গৌরবময় করবেন। ফেরেশতা তাঁকে বাড়িতে ফিরে যেতে বলেন এবং সুসংবাদ দেন যে, তুমি পুত্র-সন্তান প্রসব করবে। তাঁর নাম রাখবে ইসমাঈল। সে হবে এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব। সকল লোকের উপর তাঁর প্রভাব থাকবে এবং অন্য সবাই তাঁর দ্বারা শক্তির প্রেরণা পাবে। সে তার ভাইদের কর্তৃত্বাধীন সমস্ত এলাকার অধিকারী হবে। এসব শুনে হাজেরা আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। এই সুসংবাদ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অধঃস্তন সন্তান মুহাম্মদ (সা)-এর ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় প্রযোজ্য। কেননা, গোটা আরব জাতি তার দ্বারা গৌরবের অধিকারী হয়। পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত এলাকায় তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁকে আল্লাহ্ এমন উন্নত ও কল্যাণকর শিক্ষা এবং সৎকর্ম-কুশলতা দান করেন যা পূর্বে কোন উম্মতকেই দেওয়া হয়নি। আরব জাতির এ মর্যাদা পাওয়ার কারণ হচ্ছে তাদের রাসূলের [illegible] যিনি হচ্ছেন নবীকুল শিরোমণি। তাঁর রিসালাত হচ্ছে বরকতময়। তিনি হচ্ছেন [illegible] জন্যে রাসূল। তাঁর আনীত আদর্শ হচ্ছে পুণ্যতম আদর্শ। হাজেরা ঘরে যে[illegible]

ইসমাঈল (আ) ভূমিষ্ঠ হন। এ সময় ইবরাহীম (আ)-এর বয়স হয়েছিল ছিয়াশি বছর। এটা হচ্ছে ইসহাক (আ)-এর জন্মের তের বছর পূর্বের ঘটনা। ইসমাঈল (আ)-এর জন্মের পর আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সারাহ্‌র গর্ভে ইসহাক নামের সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেন। ইবরাহীম (আ) তখন আল্লাহর উদ্দেশে শোকরানা সিজদা আদায় করেন। আল্লাহ তাঁকে জানান যে, আমি তোমার দু'আ ইসমাঈলের পক্ষে কবুল করেছি। তাকে বরকত দান করেছি। তাঁর বংশের বিস্তৃতি দান করেছি। তার সন্তানদের মধ্য থেকে বারজন প্রধানের জন্ম হবে। তাঁকে আমি বিরাট সম্প্রদায়ের প্রধান করব। এটাও এই উম্মতের জন্যে একটা সুসংবাদ। বারজন প্রধান হলেন সেই বারজন খলীফায়ে রাশিদা— যাঁদের কথা জাবির ইবন সামূরা সূত্রে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে— যাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম (সা) বলেছেন, 'বারজন আমীর হবে।' জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এরপর একটা শব্দ বলেছেন, কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। তাই সে সম্পর্কে আমার পিতার কাছে জিজ্ঞেস করি। তিনি বললেন, রাসূলের সে শব্দটি হল كلهم من قريش অর্থাৎ 'তারা সবাই হবেন কুরায়শ গোত্রের লোক।' বুখারী ও মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ

لا يزال هذا الامر قائما وفى رواية عزيزا حتى يكون اثنا عشرة خليفة كلهم من قريش.

অর্থাৎ এই খিলাফত বারজন খলীফা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত বা শক্তিশালী থাকবে— এরা সবাই হবে কুরায়শ গোত্রের লোক। উক্ত বারজনের মধ্যে চারজন হলেন প্রথম চার খলীফা আবূ বকর (রা), উমর (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা); একজন উমর ইবন আবদুল আযীয (র); কতিপয় বনী আব্বাসীয় খলীফা। বারজন খলীফা ধারাবাহিকভাবে হতে হবে এমন কোন কথা নাই, বরং যে কোনভাবে বারজনের বিদ্যমান হওয়াটাই জরুরী। উল্লিখিত বারজন ইমাম রাফিজী সম্প্রদায়ের কথিত 'বার ইমাম' নয়— যাদের প্রথমজন আলী ইব্‌ন তালিব (রা) আর শেষ ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান আসকারী। এই শেষোক্ত ইমামের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস এই যে, তিনি সামেরার একটি ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ থেকে তিনি বের হয়ে আসবেন— এরা তার প্রতীক্ষায় আছে। কারণ এই ইমামগণ হযরত আলী (রা) ও তার পুত্র হাসান ইব্‌ন আলী (রা) অপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকামী হতে পারেন না। বিশেষ করে যখন স্বয়ং হাসান ইব্‌ন আলী (রা) যুদ্ধ পরিত্যাগ করে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর অনুকূলে খিলাফত ত্যাগ করেন। যার ফলে ফিৎনার আগুন নির্বাপিত হয়, মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়। অবশিষ্ট ইমামগণ তো অন্যদের শাসনাধীন ছিলেন। উম্মতের উপরে কোন বিষয়েই তাঁদের কোন আধিপত্য ছিল না। সামিরার ভূগর্ভস্থিত প্রকোষ্ঠ সম্পর্কে রাফিজীদের যে বিশ্বাস তা নিতান্ত অবাস্তব কল্পনা ও হেঁয়ালীপনা ছাড়া আর কিছুই নয়, এর কোন ভিত্তি নেই।

হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল (আ)-এর জন্ম হলে সারাহ্‌র ঈর্ষা পায়। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর নিকট আবেদন জানান, যাতে হাজেরাকে তার চোখের আড়াল করে দেন। সুতরাং ইবরাহীম (আ) হাজেরা ও তাঁর পুত্রকে নিয়ে বের হয়ে পড়েন এবং মক্কায় নিয়ে রাখেন। বলা হয়ে থাকে যে, ইসমাঈল (আ) তখন দুধের শিশু ছিলেন। ইবরাহীম (আ) যখন তাদেরকে

সেখানে রেখে ফিরে আসার জন্যে উদ্যত হলেন, তখন হাজেরা উঠে তার কাপড় জড়িয়ে ধরে বললেন, হে ইবরাহীম! আমাদেরকে এখানে খাদ্য-রসদহীন অবস্থায় রেখে কোথায় যাচ্ছেন? ইবরাহীম (আ) কোন উত্তর দিলেন না, বারবার পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও তিনি যখন জওয়াব দিলেন না, তখন হাজেরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আল্লাহ্ কি এরূপ করতে আপনাকে আদেশ করেছেন?' ইবরাহীম (আ) বললেন, 'হ্যাঁ'। হাজেরা বললেন ঃ 'তাহলে আর কোন ভয় নেই। তিনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না।' শায়খ আবূ মুহাম্মদ ইব্ন আবী যায়দ (র) 'নাওয়াদির' কিতাবে লিখেছেন ঃ সারাহ্ হাজেরার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে কসম করলেন যে, তিনি তাঁর তিনটি অঙ্গ ছেদন করবেন। ইবরাহীম (আ) বললেন, দু'টি কান ছিদ্র করে দাও ও খাৎনা করিয়ে দাও এবং কসম থেকে মুক্ত হয়ে যাও। সুহায়লী বলেছেন ঃ 'এই হাজেরাই সর্বপ্রথম নারী যার খাৎনা করা হয়েছিল, সর্বপ্রথম যার উভয় কান ছিদ্র করা হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম দীর্ঘ আঁচল ব্যবহার করেন।'

ইসমাঈল (আ) ও হাজেরাকে নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ফারান পর্বতমালা তথা মক্কা ভূমিতে হিজরত ও কা'বা গৃহ নির্মাণ

ইমাম বুখারী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ নারী জাতি সর্বপ্রথম কোমরবন্দ ব্যবহার শিখে ইসমাঈল (আ)-এর মায়ের নিকট থেকে। হাজেরা কোমরবন্দ ব্যবহার করতেন সারাহ্র দৃষ্টি থেকে নিজের পদচিহ্ন গোপন রাখার জন্যে।

হযরত ইবরাহীম (আ) হাজেরা ও ইসমাঈল (আ)-কে নিয়ে যখন মক্কায় যান, হাজেরা তখন তাঁর শিশু পুত্রকে দুধ পান করাতেন। মসজিদে হারমের উঁচু অংশে বায়তুল্লাহর কাছে যমযম কূপের নিকটে অবস্থিত একটি বড় গাছের নিচে তিনি তাঁদেরকে রেখে আসেন। মক্কায় তখন না ছিল কোন মানুষ, না ছিল কোন পানি। এখানেই তিনি তাঁদেরকে রেখে এলেন। একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর ও একটি মশকে কিছু পানিও রাখলেন। তারপর ইবরাহীম (আ) যেদিক থেকে এসেছিলেন, সেদিকে ফিরে চললেন। হাজেরাও তাঁর পিছু পিছু ছুটে যান এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ 'হে ইবরাহীম! আমাদেরকে এই শূন্য প্রান্তরে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? যেখানে নেই কোন মানুষজন, নেই কোন খাদ্য-পানীয়।' হাজেরা বার বার একথা বলা সত্ত্বেও ইবরাহীম (আ) তাঁর দিকে ফিরেও তাকালেন না। তখন হাজেরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আল্লাহ্ কি এরকম করতে আপনাকে আদেশ করেছেন?' ইবরাহীম (আ) বললেন, 'হ্যাঁ'। হাজেরা বললেন ঃ 'তাহলে আল্লাহ্ আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না।' একথা বলে হাজেরা ফিরে আসলেন এবং ইবরাহীম (আ)-ও চলে গেলেন। যখন তিনি 'ছানিয়া' (গিরিপথ) পর্যন্ত পৌঁছলেন, যেখান থেকে তাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং দু'হাত তুলে নিম্নোক্ত দু'আ পড়লেন ঃ

رَبَّنَا إِنِّىْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ .

'হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট। হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্যে যে, ওরা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব, তুমি কিছু লোকের অন্তর তাদের দিকে অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা ওদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দাও। যাতে ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।' (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৭)।

ইসমাঈল (আ)-এর মা ইসমাঈলকে নিজের স্তনের দুধ পান করাতেন এবং নিজে ঐ মশকের পানি পান করতেন। শেষে মশকের পানি ফুরিয়ে গেলে মা ও শিশু উভয়ে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েন। শিশুর প্রতি তাকিয়ে দেখেন, পিপাসায় তার বুক ধড়ফড় করছে কিংবা মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্ করছে। শিশু পুত্রের এ করুণ অবস্থা দেখে সহ্য করতে না পেরে মা সেখান থেকে উঠে গেলেন এবং নিকটবর্তী সাফা পর্বতে আরোহণ করলেন। সেখান থেকে প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখা যায় কিনা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। তারপর সাফা পর্বত থেকে হাজেরা নেমে নিম্ন ভূমিতে চলে আসলে তিনি তাঁর জামার আঁচলের একদিক উঠিয়ে ক্লান্ত-শ্রান্ত ব্যক্তির মত ছুটে চললেন। নীচু ভূমি পাড়ি দিয়ে তিনি মারওয়া পাহাড়ে ওঠেন। চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে দেখতে লাগলেন, কাউকে দেখা যায় কিনা। কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলেন না। এভাবে তিনি সাতবার আসা-যাওয়া করেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, এ জন্যেই লোকজন হজ্জ ও উমরায় উভয় পাহাড়ের মাঝে সাতবার সা'ঈ করে থাকেন। মারওয়া পাহাড়ে উঠে তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পান। তিনি তখন নিজেকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ চুপ কর! তারপর কান পেতে পুনরায় ঐ একই আওয়াজ শুনতে পেলেন। হাজেরা তখন বললেন, তোমার আওয়াজ শুনেছি, যদি সাহায্য করতে পার, তবে সাহায্য কর! এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন যে, যমযম কূপের স্থানে একজন ফেরেশতা দাঁড়িয়ে আছেন। ফেরেশতা নিজের পায়ের গোড়ালি দ্বারা কিংবা তার ডানা দ্বারা মাটিতে আঘাত করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত পানি বের হয়ে আসে। তখন হাজেরা এর চারপাশে আপন হাত দ্বারা বাঁধ দিয়ে হাউজের ন্যায় করে দিলেন এবং আঁজলা ভরে মশকে পানি তোলার পরও পানি উপচে পড়তে লাগল।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (সা) বলেছেন, ইসমাঈল (আ)-এর মাকে আল্লাহ রহম করুন। যদি তিনি যমযমকে বাঁধ না দিয়ে এভাবে ছেড়ে দিতেন কিংবা তিনি বলেছেন ঃ যদি তিনি আঁজলা ভরে পানি মশকে জমা না করতেন, তা হলে যমযম একটি কূপ না হয়ে প্রবহমান ঝর্ণায় পরিণত হত। তারপর হাজেরা পানি পান করলেন এবং শিশু-পুত্রকে দুধ পান করালেন। ফেরেশতা তাকে বললেন, আপনি ধ্বংসের কোন আশংকা করবেন না। কেননা, এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। একে এই শিশু ও তাঁর পিতা পুনঃনির্মাণ করবেন। আল্লাহ তাঁর পরিজনকে বিনাশ করবেন না। ঐ সময় আল্লাহর এ ঘরটি মাটির থেকে কিছু উঁচু ঢিবির মত ছিল। বন্যার পানির ফলে তার ডান ও বামদিকে ভাঙন ধরেছিল। হাজেরা এভাবে দিনযাপন করছিলেন। পরিশেষে জুরহুম গোত্রের [য়ামান দেশীয়] একদল লোক তাঁদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল। অথবা জুরহুম পরিবারের কিছু লোক ঐ পথ ধরে এদিকে আসছিল। তারা মক্কার নিচু ভূমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল যে, একটা পাখি চক্রাকারে উড়ছে।

তখন তারা বলাবলি করল, নিশ্চয় এ পাখিটি পানির উপরই উড়ছে অথচ আমরা এ উপত্যকায় বহুদিন কাটিয়েছি, এখানে কোন পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন মশকধারী লোক সেখানে পাঠান। তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল। ফিরে এসে সবাইকে পানির সংবাদ দিল। সংবাদ পেয়ে সবাই সেদিকে অগ্রসর হল। ইসমাঈল (আ)-এর মা ঐ সময় পানির নিকট বসা ছিলেন। তারা তাঁর নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করার অনুমতি চাইল। হাজেরা জবাব দিলেন ঃ হ্যাঁ, থাকতে পার, তবে এ পানির ওপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা তা মেনে নিল।

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন. এ ঘটনা ইসমাঈল (আ)-এর মাকে একটি সুযোগ এনে দিল। সেও মানুষের সাহচর্য চাচ্ছিল। এরপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার-পরিজনের কাছেও সংবাদ পাঠাল, তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল। পরিশেষে সেখানে তাদের কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হল। এদিকে ইসমাঈল (আ) যৌবনে উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন। যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের কাছে আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল। এরই মধ্যে ইসমাঈল (আ)-এর মা হাজেরার ইন্তিকাল হয়। ইসমাঈল (আ)-এর বিবাহের পর ইবরাহীম (আ) তাঁর পরিত্যক্ত পরিবারকে দেখার জন্যে এখানে আসেন। কিন্তু ইসমাঈল (আ)-কে পেলেন না। তখন তার স্ত্রীকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রী জানালেন, তিনি আমাদের জীবিকার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। তখন তিনি তাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন। সে জানায়, আমরা অতি কষ্টে, অভাব-অনটনে আছি। সে তাঁর কাছে নিজেদের দুর্দশার অভিযোগ করল। তখন ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমার স্বামী বাড়ি ফিরে এলে আমার সালাম জানাবে এবং তাঁকে দরজার চৌকাঠ বদলিয়ে ফেলতে বলবে।

ইসমাঈল (আ) বাড়ি ফিরে এলে তিনি যেন কিছু একটা ঘটনার আভাস পেলেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কাছে কি কোন লোক এসেছিল? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, এই এই আকৃতির একজন বৃদ্ধ লোক এসেছিলেন। তিনি আপনার সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। আমি তা জানিয়েছি। আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আমি বলেছি যে, আমরা খুব কষ্টে ও অভাবে আছি। ইসমাঈল (আ) জিজ্ঞেস করলেন, তিনি তোমাকে কোন উপদেশ দিয়েছেন কি? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ, আপনাকে তাঁর সালাম জানাতে বলেছেন ও আপনাকে দরজার চৌকাঠ বদলাতে বলেছেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, ইনি আমার পিতা। তোমাকে ত্যাগ করার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তুমি তোমার আপনজনদের কাছে চলে যাও। তখন তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং জুরহুম গোত্রের অন্য এক মহিলাকে বিবাহ করেন। ইবরাহীম (আ) দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের থেকে দূরেই রইলেন। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ) তাদেরকে পুনরায় দেখতে এলেন। কিন্তু এবারও তিনি ইসমাঈলকে বাড়িতে পেলেন না। পুত্রবধুর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি জানালেন, 'তিনি আমাদের জীবিকার অন্বেষণে বাইরে গেছেন।' ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমরা কেমন আছ, তোমাদের জীবনযাত্রা ও অবস্থা কেমন? জবাবে পুত্রবধু বললেন ঃ আমরা ভাল আছি ও স্বচ্ছন্দে আছি, সাথে সাথে

মহিলাটি আল্লাহ্‌র প্রশংসাও করলেন। ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, সাধারণত তোমাদের খাদ্য কী? তিনি বললেন ঃ গোশ্‌ত। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের পানীয় কি? তিনি বললেন, পানি। ইবরাহীম (আ) দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ ! এদের গোশ্‌ত ও পানিতে বরকত দান করুন।'

নবী করীম (সা) বলেছেন, ঐ সময় তাদের ওখানে খাদ্যশস্য উৎপাদিত হত না। যদি হত তা হলে তিনি তাদের জন্যে সে বিষয়েও দু'আ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, মক্কা ব্যতীত অন্য কোথাও কেউ শুধু গোশত ও পানি দ্বারা জীবন ধারণ করতে পারে না। কেননা, শুধু গোশত ও পানি জীবন যাপনের অনুকূল হতে পারে না। ইবরাহীম (আ) বললেন, তোমার স্বামী যখন বাড়িতে আসবে তখন আমার সালাম জানাবে ও দরজার চৌকাঠ অপরিবর্তিত রাখতে বলবে। ইসমাঈল (আ) যখন বাড়িতে আসলেন, তখন স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট কেউ এসেছিল কি? স্ত্রী বললেন ঃ হ্যাঁ, একজন সুন্দর আকৃতির বৃদ্ধলোক এসেছিলেন। স্ত্রী আগন্তুকের প্রশংসা করলেন। তিনি আপনার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি তাঁকে আপনার সংবাদ জানিয়েছি। তিনি আমাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কেও জানতে চেয়েছেন। আমি জানিয়েছি যে, আমরা ভাল আছি। ইসমাঈল (আ) বললেন, তিনি কি তোমাকে আর কোন উপদেশ দিয়েছেন? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ, তিনি আপনাকে সালাম জানিয়েছেন ও আপনার দরজার চৌকাঠ ঠিক রাখতে বলেছেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, ইনি আমার পিতা। তোমাকে স্ত্রীরূপে বহাল রাখতে আদেশ করেছেন।

পুনরায় ইবরাহীম (আ) এদের থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত দূরেই থাকলেন। তারপর ইবরাহীম (আ) পুনরায় তথায় আসলেন। দেখলেন, ইসমাঈল যমযম কূপের নিকটে বিরাট এক বৃক্ষের নিচে বসে তীর চাঁছছিলেন। পিতাকে দেখে তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে আসলেন। অতঃপর উভয়ে এমনভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন, যেমন সাধারণত পিতাপুত্রের মধ্যে হয়ে থাকে। এরপর ইবরাহীম (আ) বললেন, হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের আদেশ করেছেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, আল্লাহ যে আদেশ করেছেন তা বাস্তবায়িত করুন। ইবরাহীম (আ) বললেন, তুমি আমাকে সাহায্য করবে? ইসমাঈল (আ) বললেন ঃ নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সাহায্য করব। ইবরাহীম (আ) পার্শ্বে অবস্থিত উঁচু ঢিবিটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, আল্লাহ আমাকে এ স্থানটি ঘিরে একটি ঘর নির্মাণের আদেশ দিয়েছেন। তখন তাঁরা উভয়ে কা'বা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল (আ) পাথর আনতেন ও ইবরাহীম (আ) গাঁথুনী দিতেন। শেষে যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল (আ) 'মাকামে ইবরাহীম' নামে প্রসিদ্ধ পাথরটি আনলেন এবং সেখানে রাখলেন। ইবরাহীম (আ) তার উপর দাঁড়িয়ে ইমারত তৈরি করতে লাগলেন আর ইসমাঈল (আ) তাঁকে পাথর যোগান দিতে থাকেন। এ সময় তাঁরা উভয়ে নিম্নের দু'আটি পাঠ করেন- رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . হে আমাদের রব! আমাদের থেকে এ কাজ কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শোনেন ও জানেন। (সূরা বাকারা ঃ ১২৭)

এভাবে তারা দু'জনে কা'বাঘর নির্মাণ কাজ শেষ করেন এবং কাজ শেষে ঘরের চারদিকে তাওয়াফ করেন এবং উক্ত দু'আ পাঠ করেন। ইমাম বুখারী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ যখন ইবরাহীম (আ) ও তাঁর স্ত্রী সারাহ্র মধ্যে যা ঘটার ঘটে গেল, তখন তিনি ইসমাঈল (আ) ও তাঁর মাকে নিয়ে বের হয়ে যান। তাদের সাথে পানি ভর্তি একটি মশক ছিল। তারপর ইমাম বুখারী (র) পূর্বোল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ ঘটনার বিবরণ দেন। হাদীসটি ইব্ন আব্বাসের উক্তি। এর কিছু অংশ 'মারফু' আর কিছু 'গরীব' পর্যায়ের। ইব্ন আব্বাস (রা) সম্ভবত ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে এগুলো সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখ আছে যে, ইসমাঈল (আ) ঐ সময় দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিলেন। তাওরাত পন্থীরা বলেন, আল্লাহ্ ইবরাহীম (আ)-কে পুত্র ইসমাঈল (আ) ও তার কাছে আর যত দাস ও অন্যান্য লোক ছিল তাদের খাত্না্র নির্দেশ দেন। তিনি এ নির্দেশ পালন করেন এবং সবাইকে খাৎনা করান। এ সময় ইবরাহীম (আ)-এর বয়স হয়েছিল নিরানব্বই বছর ও ইসমাঈল (আ)-এর বয়স ছিল তের বছর। খাত্না করাটা ছিল আল্লাহ্র নির্দেশ পালনার্থে। এতে প্রতীয়মান হয়, অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবেই তিনি তা পালন করেন। এ কারণেই উলামায়ে কিরাম খাত্না করা ওয়াজিব বলেছেন—এ মতই সঠিক।

বুখারী শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ) আশি বছর বয়সে (ছুঁতারের) বাইসের (بالقدوم) সাহায্যে নিজের খাতনা করেন। আবদুর রহমান ইব্ন ইসহাক, আজলান, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ও ইমাম মুসলিম ভিন্ন ভিন্ন সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। উক্ত বর্ণনায় ব্যবহৃত 'কুদূম' শব্দটির অর্থ ধারাল অস্ত্র। কেউ কেউ এটি একটি স্থানের নাম বলেছেন। এসব হাদীসের শব্দের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। ইব্ন হিব্বান (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ নবী ইবরাহীম (আ) একশ' বিশ বছর বয়সে খাত্না করান। এর পরেও আশি বছর জীবিত থাকেন। এসব বর্ণনায় ইসমাঈল (আ)-কে 'যাবীহ্' বলে উল্লেখ করা হয়নি এবং এতে ইবরাহীম (আ)-এর তিনবার আগমনের কথা বলা হয়েছে। প্রথমবার আগমন করেন তখন, যখন হাজেরার মৃত্যু হয় ও ইসমাঈল (আ) বিবাহ করেন। শিশুকালে রেখে আসার পর থেকে ইসমাঈলের বিবাহ করা পর্যন্ত তিনি আর তাদের খোঁজ-খবর নেননি। বলা হয় যে, সফরকালে ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে যমীনের দূরত্ব সংকুচিত হয়ে যেত। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি যখন আসতেন তখন বিদ্যুতের গতিসম্পন্ন বাহন বুরাকে চড়ে আসতেন। এ যদি হয় তাহলে হযরত ইবরাহীম (আ) তাদের সংবাদ না নিয়ে কিভাবে দূরে পড়ে থাকতে পারেন? অথচ নিজের পরিজনের সংবাদ রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব; বিশেষ করে যে অবস্থায় তাদের রেখে এসেছিলেন। এসব ঘটনার কিছু অংশ ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে নেয়া। অবশ্য কিছু আছে মারফূ' হাদীস। তবে এতে 'যাবীহ্'-এর ঘটনার উল্লেখ নেই। কিন্তু তাফসীরের মধ্যে সূরা সাফ্ফাতে আমরা দলীলসহ উল্লেখ করেছি যে, 'যাবীহ' হলেন হযরত ইসমাঈল (আ)।

ইসমাঈল যাবীহুল্লাহ (আ)-এর ঘটনা

আল্লাহর বাণী ঃ

وَقَالَ اِنِّىْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ . رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ .
فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ . فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ يَا بُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى
الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى . قَالَ يَا اَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ .
سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ . فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ .
وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يَّا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ . اِنَّ
هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ . وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ . وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ .
سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ . كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ . اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ .
وَبَشَّرْنٰهُ بِاِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ . وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰى اِسْحَاقَ .
وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِيْنٌ .

এবং সে বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম, তিনি আমাকে অবশ্যই সৎপথে পরিচালিত করবেন; হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এক সৎকর্মপরায়ণ সন্তান দান কর।' তারপর আমি তাকে এক স্থির-বুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। অতঃপর সে যখন তার পিতার সঙ্গে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম (আ) বলল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবেহ্ করছি; এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলল, 'পিতা! আপনি যাতে আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।' যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইবরাহীম তার পুত্রকে কাত করে শায়িত করল, তখন আমি তাকে আহ্বান করে বললাম, 'হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে! এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।' নিশ্চয়ই এ ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম। আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও, তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী। (সূরা ঃ সাফ্‌ফাত ঃ ৯৯-১১৩)

এখানে আল্লাহ বলছেন যে, তাঁর একনিষ্ঠ বন্ধু নবী ইবরাহীম (আ) যখন নিজ সম্প্রদায় ও জন্মভূমি ত্যাগ করে যান, তখন তিনি আল্লাহর নিকট একটি নেককার পুত্র সন্তান প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তাঁকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করেন। তিনি হলেন ইসমাঈল (আ)। কেননা, তিনিই হলেন প্রথম পুত্র। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ছিয়াশি বছর বয়সে তাঁর জন্ম হয়। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ (সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হল) অর্থাৎ 'যখন যুবক হল ও পিতার ন্যায় নিজের কাজকর্ম করার বয়সে পৌছল।' মুজাহিদ এর অর্থ করেছেন ঃ সে যখন যুবক হল, স্বাধীনভাবে পিতার ন্যায় চেষ্টা-সংগ্রাম ও কাজকর্ম করার উপযোগী হল। যখন ইবরাহীম (আ) তাঁর স্বপ্ন থেকে বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ তাঁর পুত্রকে যবেহ্ করার হুকুম দিয়েছেন। হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে এক মারফূ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ رؤيا الانبياء وحى (নবীদের স্বপ্ন ওহী)। উবায়দ ইবন উমায়রও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ নির্দেশ ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবরাহীম খলীলের প্রতি এক বিরাট পরীক্ষা। কেননা, তিনি এই প্রিয় পুত্রটি পেয়েছিলেন তাঁর বৃদ্ধ বয়সে। তাছাড়া এ শিশুপুত্র ও তার মাকে এক জনমানবহীন শূন্য প্রান্তরে রেখে এসেছিলেন, যেখানে না ছিল কোন কৃষি ফসল, না ছিল তরুলতা। ইবরাহীম খলীল (আ) আল্লাহর নির্দেশ পালন করলেন। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে তাদেরকে সেখানে রেখে আসেন। আল্লাহ তাদেরকে মুক্তির ব্যবস্থা করলেন। এমন উপায়ে পানাহারের ব্যবস্থা করে দিলেন, যা ছিল তাদের ধারণাতীত। এরপর যখন আল্লাহ এই একমাত্র পুত্রধনকে যবেহ করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি দ্রুত সে নির্দেশ পালনে এগিয়ে আসেন। ইবরাহীম (আ) এ প্রস্তাব তাঁর পুত্রের সামনে পেশ করেন। যাতে এ কঠিন কাজ সহজভাবে ও প্রশান্ত চিত্তে করতে পারেন। চাপ প্রয়োগ করে ও বাধ্য করে যবেহ্ করার চাইতে এটা ছিল সহজ উপায়।

قَالَ يَابُنَىَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ . فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى .

ইবরাহীম বলল, 'বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি। এখন তোমার অভিমত কি বল।' ধৈর্যশীল পুত্র পিতার নির্দেশ পালন করার জন্যে খুশী মনে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তিনি বললেন, হে আমার পিতা! আপনি যে ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন। এ জবাব ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের আন্তরিকতার পরিচায়ক। তিনি পিতার আনুগত্য ও আল্লাহর হুকুম পালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ (যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং তার পুত্রকে কাত করে শুইয়ে দিল)। এ আয়াতাংশের কয়েকটি অর্থ বলা হয়েছে; (১) তাঁরা উভয়ে আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন ও মনোবল দৃঢ় করেন। (২) এখানে পূর্বের কাজ পরে ও পরের কাজ পূর্বে বলা হয়েছে। অর্থাৎ পিতা ইবরাহীম (আ) পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে উপুড় করে শোয়ালেন। (৩) ইবরাহীম (আ) পুত্রকে উপুড় করে শোয়ান এ জন্যে যে, যবেহ করার সময় তাঁর চেহারার উপর যাতে দৃষ্টি না পড়ে। ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, কাতাদা ও যাহ্হাক (র) এই মত পোষণ করেন। (৪) লম্বাভাবে চিত করে শায়িত করান, যেমন পশু যবেহ করার সময় শায়িত করান হয়। এ অবস্থায় কপালের এক অংশ মাটির সাথে লেগে থাকে। اسلما অর্থ ইবরাহীম (আ) যবেহ করার জন্যে বিসমিল্লাহ্ ও আল্লাহু আকবর বলেন। আর পুত্র মৃত্যুর জন্যে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করেন।

সুদ্দী (র) প্রমুখ বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ) গলায় ছুরি চালান কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্রও কাটল না। কেউ বলেছেন যে, গলার নিচে তামার পাত রাখা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও কাটা যায়নি। আল্লাহ্ই সম্যক অবগত।

এ সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় ঃ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا (হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যই পালন করলে) অর্থাৎ তোমাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ। আল্লাহর নির্দেশ পালন করার জন্যে তোমার আগ্রহ ও আনুগত্য প্রমাণিত হয়েছে। তুমি পুত্রকে কুরবানীর জন্যে পেশ করেছ। যেমন ইতিপূর্বে তুমি আগুনে নিজের দেহকে সমর্পণ করেছিলে এবং মেহমানদের জন্যে প্রচুর অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছিলে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (নিশ্চয়ই এ ছিল স্পষ্ট পরীক্ষা) প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আল্লাহর বাণী ঃ

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (আমি তাকে মুক্তি দিলাম এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে।)

অর্থাৎ একটি সহজ বিনিময় দ্বারা আমি ইবরাহীম (আ)-এর পুত্রকে যবেহ করা থেকে মুক্ত করে দিলাম। অধিকাংশ আলিমের মতে, এ বিনিময়টি ছিল শিং বিশিষ্ট একটি সাদা দুম্বা— যাকে ইবরাহীম (আ) ছাবীর পর্বতে একটি বাবলা বৃক্ষে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন। ইমাম ছাওরী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, ঐ দুম্বাটি জান্নাতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিচরণ করেছিল। সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেছেন ঃ দুম্বাটি জান্নাতে চরে বেড়াত। এক সময়ে এটা ছাবীর পর্বত ভেদ করে বের হয়ে আসে। তার শরীরে ছিল লাল বর্ণের পশম। ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত, শিংযুক্ত একটি দুম্বা ছাবীর পাহাড় থেকে নেমে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট হেঁটে আসে এবং ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ডাকতে থাকে। ইবরাহীম (আ) তাকে ধরে যবেহ করে দেন। এই দুম্বাটি হযরত আদম (আ)-এর পুত্র হাবিলও কুরবানী করেছিলেন এবং আল্লাহ তা কবূলও করেছিলেন। ইব্‌ন আবী হাতিম (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মুজাহিদ (র) বলেছেন, ইবরাহীম (আ) উক্ত দুম্বাকে মিনায় যবেহ করেন। উবায়দ ইবন উমায়র (রা)-এর মতে, স্থানটি ছিল মাকামে ইবরাহীম। ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা মতে এটা ছিল একটি পাহাড়ী ছাগল। কিন্তু হাসান (রা) থেকে বর্ণিত, এটা একটি বুনো ছাগল। দুম্বার নাম ছিল জুরায়র। সুতরাং ইব্‌ন আব্বাস ও হাসান (রা) থেকে বর্ণিত হওয়ার কথা ঠিক নয়; বরং এগুলো ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে গৃহীত। অবশ্য এ বিষয়ে কুরআনে যেভাবে বলা হয়েছে তাতে অন্য কোন দিক লক্ষ্যও করার প্রয়োজন থাকে না। কুরআনে একে ذِبْحٍ عَظِيمٍ 'মহান যবেহ' বলা হয়েছে এবং 'সুস্পষ্ট পরীক্ষা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে দুম্বার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ (র) সাফিয়া বিনত শায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনী সুলায়মের এক মহিলা আমাকে বলেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) উছমান ইব্‌ন তালহাকে ডেকে পাঠান; বর্ণনাকারী বলেন, উছমানকে জিজ্ঞেস করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আপনাকে কেন সংবাদ দিয়েছিলেন? উছমান বললেন, আমি যখন কা'বা ঘরে প্রবেশ করি তখন সেই দুম্বার দুটি শিং দেখতে পাই। এটা ঢেকে রাখার জন্যে তোমাকে বলতে আমি ভুলে যাই। তখন তিনি শিং দুটি

ঢেকে দেন। কেননা, আল্লাহর ঘরে এমন কিছু থাকা উচিত নয় যা মুসল্লিদের একাগ্রতা বিনষ্ট করে। সুফিয়ান (রা) বলেছেন, ইবরাহীমের দুম্বার শিং দু'টি সর্বদা কা'বা ঘরে সংরক্ষিত ছিল। যখন খানায়ে কাবায় আগুন লেগে যায় তখন শিং দু'টি পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণিত দুম্বাটির মাথা সর্বদা কা'বার মীযাবে (কার্ণিশে) ঝুলান থাকত এবং রৌদ্রে তা শুকিয়ে যায়। এই একটি কথাই প্রমাণ করে যে, হযরত ইসমাঈল (আ)-ই হলেন যাবীহুল্লাহ আর কেউ নয়। কেননা, তিনিই মক্কায় বসবাস করতেন। হযরত ইসহাক (আ) শিশুকালে মক্কায় এসেছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। আল্লাহই উত্তমরূপে অবগত।

কুরআন থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় বরং বলা যায় এ উদ্দেশ্যেই আয়াত নাযিল হয়েছে যে, ইসমাঈল (আ)-ই যাবীহুল্লাহ। কেননা, আল্লাহ্ কুরআনে প্রথমে যাবীহ্-এর ঘটনা উল্লেখ করে পরে বলেছেন ঃ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِيْنَ .

(আমি ইবরাহীমকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, সে ছিল নবী, সৎকর্মশীলদের একজন।)

বাক্যটিকে যারা একে حال বলেছেন, তাদের এরূপ ব্যাখ্যা স্বেচ্ছাভ্রমকল্পিত। ইসহাক (আ)-কে যাবীহুল্লাহ বলা ইসরাঈলী চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা তাদের কিতাবে এ স্থানে নিঃসন্দেহভাবে বিকৃতি করেছে। তাদের মতে, আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-কে আদেশ করেন তাঁর একক ও প্রথম পুত্র ইসহাককে যবেহ করতে। ইসহাক শব্দকে এখানে প্রক্ষিপ্তভাবে ঢুকান হয়েছে। এটা মিথ্যা ও অলীক। কেননা, ইসহাক একক পুত্রও নন, প্রথম পুত্রও নন। বরং একক ও প্রথম পুত্র ছিলেন ইসমাঈল (আ)। ইসরাঈলীরা আরবদের প্রতি হিংসার বশবর্তী হয়ে এমনটি করেছে। কারণ ইসমাঈল (আ) হলেন আরবদের পিতৃ-পুরুষ— যারা হিজাযের অধিবাসী এবং যাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সা) জন্মগ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে, ইসহাক (আ) হলেন ইয়াকূব (আ)-এর পিতা। ইয়াকূব (আ)-কে ইসরাঈলও বলা হত। বনী ইসরাঈলীরা তার দিকেই নিজেদেরকে সম্পর্কিত করে থাকে। তারা আরবদের এই গৌরব নিজেদের পক্ষে নিতে চেয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করে এবং মিথ্যা ও বাতিল কথার অনুপ্রবেশ ঘটায়। কিন্তু তারা বুঝল না যে, সম্মান ও মর্যাদার চাবিকাঠি আল্লাহর হাতে, যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। প্রাচীনকালের আলিমদের একটি দল ইসহাক (আ)-কে যাবীহুল্লাহ বলেছেন। তারা এ মত গ্রহণ করেছেন সম্ভবত কা'ব আহবারের বর্ণনা থেকে, কিংবা আহলি কিতাবদের সহীফা থেকে। রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি। সুতরাং এসব মতামতের দ্বারা আমরা কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনাকে ত্যাগ করতে পারি না। কুরআনের বর্ণনা থেকে ইসহাক (আ)-কে যাবীহুল্লাহ বলার কোনই অবকাশ নেই। বরং কুরআন থেকে যা বোঝা যায়— কুরআনের উক্তি ও সুস্পষ্ট বর্ণনা এই যে, তিনি হলেন ইসমাঈল (আ)। মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল কুরাজী (র) এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যাবীহুল্লাহ হযরত ইসমাঈল (আ), ইসহাক (আ) নয়।

কেননা আল্লাহ বলেছেন ঃ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوْبَ

আমি ইবরাহীমের স্ত্রী সারাহ্কে ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকূবের জন্মের সুসংবাদ দিলাম।

এখানে ইসহাকের জন্ম হওয়ার এবং তার থেকে পুত্র ইয়াকূবের জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই সাথে যদি ইয়াকূবের জন্মের পূর্বেই ইসহাককে বাল্যকালে যবেহের নির্দেশও দেয়া হয়, তবে পূর্বের সুসংবাদ আর সুসংবাদ থাকে কি করে? বরং এটা হয়ে যায় সুসংবাদের বিপরীত।

সুহায়লী (র) উপরোক্ত যুক্তি-প্রমাণের উপর প্রশ্ন করেছেন। তাঁর প্রশ্নের সারমর্ম এই ঃ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ একটি পূর্ণবাক্য এবং وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوْبُ একটি ভিন্ন বাক্য। পূর্ব বাক্যের সুসংবাদের আওতায় এটা আসে না। কেননা, এখানে يعقوب শব্দের উপর حرف جر با না এনে مكسور পড়া যাবে না - আরবীর নিয়ম অনুযায়ী। যেমন مررت بزيد ومن بعده عمرو বাক্যে عمرو -কে مكسور পড়া যায় না, পড়তে হলে با-কে পুনরায় উল্লেখ করে - بعمرو পড়তে হবে। অতএব আয়াতে - فلمومن ورء اسحاق يعقوب -এর মধ্যে يعقوب -এর পূর্বে উহ্য فعل এর مفعول হিসেবে منصوب পড়তে হবে। অর্থাৎ ووهبنا لا سحاق يعقوب, কিন্তু সুহায়লীর কথা প্রশ্নাতীত নয়, তাই ইসহাক (আ)-কেও যাবীহুল্লাহ বলা যাবে না। সুহায়লী তাঁর মতের সপক্ষে ভিন্ন আরও একটি দলীল দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আল্লাহর বাণী فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ (সে যখন ইবরাহীমের সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল) কিন্তু ইসমাঈল (আ) যেহেতু সে সময় ইবরাহীম (আ)-এর কাছে ছিলেন না, বরং শিশুকালে মায়ের সাথে মক্কা উপত্যকায় থাকতেন সুতরাং পিতার সাথে চলাফেরা করার প্রশ্নই উঠে না। এ দলীলও সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা, বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ঐ সময়ে বহুবার বুরাকে চড়ে মক্কায় গিয়েছেন এবং পুত্র ও পুত্রের মাকে দেখে পুনরায় চলে আসতেন। ইসহাক (আ)-কে যাবীহুল্লাহ বলার পক্ষে যাদের মতামত পাওয়া যায় তাদের মধ্যে কা'ব আহবার অন্যতম। হযরত উমর, আব্বাস, আলী, ইবন মাসঊদ (রা), মাসরূক, ইকরামা, সাঈদ ইবন জুবায়র, মুজাহিদ, আতা, শা'বী, মুকাতিল, উবায়দ ইবন উমর, আবূ মায়সারা, যায়দ ইবন আসলাম, আবদুল্লাহ ইবন শাকীক, যুহরী, কাসিম ইব্‌ন আবী বুরদাহ্ মাকহুল, উছমান ইবন হাজির, সুদ্‌দী, হাসান, কাতাদা, আবুল হুযায়ল, ইবন সাবিত (রা) প্রমুখ এই মত পোষণ করেন। ইবন জারিরও এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বেলায় এটা একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইবন আব্বাস (রা) থেকে দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে; তন্মধ্যে একটি মত উপরের অনুরূপ। কিন্তু তাঁর সঠিক মত ও অধিকাংশ সাহাবা, তাবিঈ ও আলিমদের মতে হযরত ইসমাঈল (আ)-ই যাবীহুল্লাহ। মুজাহিদ, সাঈদ, শা'বী, ইউসুফ ইবন মাহরান, আতা প্রমুখ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হলেন ইসমাঈল (আ)। ইবন জারীর (র) আতা ইব্‌ন আবী রেবাহর সূত্রে ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, যার পরিবর্তে দুম্বা যবেহ হয়েছে তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)। অথচ ইহুদীরা বলে থাকে ইসহাকের কথা। এটা তারা মিথ্যা বলে। ইমাম আহমদের পুত্র আবদুল্লাহ (র) বলেছেন, আমার পিতার মত এই যে, যাবীহুল্লাহ হযরত ইসমাঈল (আ)। ইবন আবী হাতিম (র) বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছি যে, যাবীহুল্লাহ কে? তিনি বলেছেন, যথার্থ কথা হল— তিনি হযরত ইসমাঈল (আ)। ইবন আবী

হাতিম (র) বলেন ঃ হযরত আলী, ইব্‌ন উমর, আবূ হুরায়রা (রা), আবুত্-তুফায়ল, সাঈদ ইবনুল মুসাফির, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, হাসান, মুজাহিদ, শা'বী, মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ও আবূ সালিহ সকলেই বলেছেন—যাবীহুল্লাহ হযরত ইসমাঈল (আ)। ইমাম বগবী (র)-ও উপরোক্ত মত রাবী ইব্‌ন আনাস (রা), কালবী ও আবূ আমর ইব্‌ন আলা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে রাসূল (সা)-কে সম্বোধন করল এভাবে; يا ابن الذبيحين হে দুই যাবীহার পুত্র! একথা শুনে রাসূল (সা) হেসে দিলেন। উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র)ও এই কথা বলেছেন। হাসান বসরী (র) বলেন, এ বর্ণনায় কোন সন্দেহ নেই। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব সূত্রে বর্ণনা করেন— তিনি বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) যখন খলীফা, তখন আমি সিরিয়ায় ছিলাম। আমি ইসমাঈলের যাবীহুল্লাহ্ হওয়ার পক্ষে খলীফার নিকট দলীল স্বরূপ এই আয়াত পেশ করলাম ;

فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ

(আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরে ইয়াকূবের জন্মের সুসংবাদ দিলাম)। তখন খলীফা উমর ইবন আবদুল আযীয বললেন, এটা তো একটা চমৎকার দলীল, এ দিকটা আমি লক্ষ্য করিনি। এখন দেখছি তুমি যা বলছ তাই সঠিক। অতঃপর খলীফা সিরিয়ায় বসবাসকারী এক লোককে ডেকে আনতে বলেন। ঐ লোকটি পূর্বে ইহুদী ছিল। পরে ইসলাম গ্রহণ করে এবং একজন ভাল মুসলমান হয়। লোকটি ইহুদী সম্প্রদায়ের আলিম ছিল। খলীফা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইবরাহীম (আ)-এর দুই পুত্রের মধ্যে কোন্ পুত্রকে যবেহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সে বলল, আল্লাহ্র শপথ ইসমাঈল (আ)-কে। হে আমীরুল মুমিনীন! ইহুদীরা একথা ভালরূপেই জানে। কিন্তু তারা আরবদের প্রতি হিংসা পোষণ করে এ কারণে যে, তাদের পিতৃপুরুষ এমন এক ব্যক্তি যার ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে এবং যবেহর নির্দেশ পেয়ে ধৈর্য ধরার কারণে যার সম্মান ও মর্যাদার উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণেই ইহুদীরা জেনে বুঝেই তাকে অস্বীকার করে এবং বলে যে, ইসহাককেই যবেহ করার আদেশ দেয়া হয়েছিল। কেননা, ইসহাক (আ) তাদের পিতৃপুরুষ। এ বিষয়ে আমরা দলীল-প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা আমাদের তাফসীরে উল্লেখ করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই।

ইসহাক (আ)-এর জন্ম

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী ঃ

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ . وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلٰى إِسْحٰقَ . وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِيْنٌ .

আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নবী, সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। আমি তাঁকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী। (সূরা সাফ্ফাত ঃ ১১২-১১৩)

মাদায়েন অঞ্চলের অধিবাসী লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের কুফরী ও পাপাচারের শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ফেরেশতাগণ সেখানে যাওয়ার পথে হযরত ইবরাহীম (আ) ও সারাহ্কে এ সুসংবাদ শুনিয়ে যান।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا . قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ . فَلَمَّا رَاٰى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً . قَالُوْا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحٰقَ . وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ . قَالَتْ يَا وَيْلَتٰى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًا . إِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ . قَالُوْا أَتَعْجَبِيْنَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ . إِنَّهُ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল। তারা বলল, 'সালাম'। সেও বলল, 'সালাম'। সে অবিলম্বে এক কাবাব করা বাছুর নিয়ে আসল। সে যখন দেখল, তাদের হাত সেটার দিকে প্রসারিত হচ্ছে না, তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করল এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতি সঞ্চার হলো। তারা বলল, ভয় করো না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। তখন তার স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল এবং সে হাসল। তারপর আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম। সে বলল, কি আশ্চর্য! সন্তানের জননী হব আমি, যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ। এটি অবশ্যই এক

অদ্ভুত ব্যাপার! তারা বলল, আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময় বোধ করছ? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ। (সূরা হূদ ঃ ৬৯-৭৪)

আল্লাহর বাণী ঃ

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ. اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا. قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ . قَالُوْا لاَ تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ. قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ . قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْقٰنِطِيْنَ . قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهِ اِلاَّ الضَّآلُّوْنَ. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ.

এবং ওদেরকে বল, ইবরাহীমের অতিথিদের কথা, যখন ওরা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম'। তখন সে বলেছিল, 'আমরা তোমাদের আগমনে আতংকিত।' তারা বলল, 'ভয় করিও না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভ সংবাদ দিচ্ছি।' সে বলল, 'তোমরা কি আমাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ? তোমরা কি বিষয়ে শুভ সংবাদ দিচ্ছ? ওরা বলল, 'আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি; সুতরাং তুমি হতাশ হইও না।' সে বলল, 'যারা পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে হতাশ হয়? (সূরা হিজ্‌র ঃ ৫১-৫৬)

আল্লাহর বাণী ঃ

هَلْ اَتَاكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ. اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا . قَالَ سَلٰمٌ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ. فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ. فَقَرَّبَهٗ اِلَيْهِمْ قَالَ اَلاَ تَاْكُلُوْنَ . فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً . قَالُوْا لاَ تَخَفْ. وَبَشَّرُوْهُ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ . فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ . قَالُوْا كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ.

'তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন ওরা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম'। উত্তরে সে বলল, 'সালাম'। এরা তো অপরিচিত লোক। তারপর ইবরাহীম তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মাংসল গরুর বাছুর ভাজা অবস্থায় নিয়ে আসল ও তাদের সামনে রাখল এবং বলল, 'তোমরা খাচ্ছ না কেন?' এতে ওদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। ওরা বলল, 'ভীত হয়ো না।' তারপর ওরা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল। তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে আসল এবং গাল চাপড়িয়ে বলল, এই বৃদ্ধা বন্ধ্যার সন্তান হবে? তারা বলল, তোমার প্রতিপালক এরূপই বলেছেন, তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (সূরা যারিয়াত ঃ ২৪-৩০)

এখানে মেহমান অর্থ ফেরেশতা— যারা মানুষের আকৃতি ধারণ করে এসেছিলেন, এরা সংখ্যায় ছিলেন তিনজন ঃ জিবরাঈল (আ), মীকাঈল (আ) ও ইসরাফীল (আ)। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বাড়িতে এলে তিনি মেহমানরূপে গণ্য করেন এবং মেহমানদের সাথে যে রকম আচরণ করা হয় সে রকম আচরণ করেন। সুতরাং তিনি তাঁর গোয়ালের সবচাইতে হৃষ্টপুষ্ট একটি বাছুর ভুনা করে তাদের সামনে পেশ করেন। কিন্তু তিনি আহারের প্রতি তাদের কোনই আগ্রহ দেখতে পেলেন না । কেননা, ফেরেশতাদের আহারের কোন প্রয়োজন হয় না। فنكرهم ইবরাহীম তাদেরকে অপরিচিত লোক মনে করলেন । وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ. 'তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলল, 'ভীত হয়ো না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। এ সময় স্ত্রী সারাহ্ আল্লাহর ক্রোধে লূতের সম্প্রদায়ের শাস্তির কথা শুনে আনন্দিত হন। সারাহ্ মেহমানদের সামনেই দণ্ডায়মান ছিলেন— যেমনি আরব ও অনারবদের মধ্যে নিয়ম প্রচলিত আছে। সারাহ্ যখন ঐ সংবাদ শুনে হেসে দেন তখন আল্লাহ তাকে সুসংবাদ দেন ঃ فَبَشَّرْنَاهَا بِاِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اِسْحَاقَ يَعْقُوْبَ .

(তারপর আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম) অর্থাৎ ফেরেশতারা তাকে এ বিষয়ে সুসংবাদ দেন। فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِىْ صَرَّةٍ (তখন তার স্ত্রী চিৎকার করতে করতে সম্মুখে আসল।) فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ (এবং নিজের গাল চাপড়িয়ে বলতে লাগল) অর্থাৎ যেভাবে মেয়ে লোকেরা অবাক হলে করে থাকে। وقالت يَاوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا (কী আশ্চর্য! আমি জননী হব, অথচ এখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ) অর্থাৎ আমার মত একজন বৃদ্ধা ও বন্ধ্যা মহিলা কী করে সন্তান জন্ম দিতে পারে! আর আমার স্বামীও এই বৃদ্ধ! এ অবস্থায় সন্তান হওয়ার সংবাদে তিনি আশ্চর্যবোধ করেন। তাই তিনি বলেন ঃ اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ (এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার।)

قَالُوْا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ. اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ .

(ওরা বলল, আল্লাহর কাজে আপনি বিস্ময়বোধ করছেন? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার অধিকারী ও সম্মানের অধিকারী।)

ইবরাহীম (আ)-ও এ সুসংবাদ পেয়ে ও স্ত্রীর খুশীর সাথে শরীক হয়ে এবং স্ত্রীর মনে দৃঢ়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেও আশ্চর্যবোধ করেন।

قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِىْ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ .قَالُوْا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقَانِطِيْنَ.

ইবরাহীম বলল, তোমরা কি আমাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কি বিষয়ে শুভ সংবাদ দিচ্ছ? তারা বলল, আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি। সুতরাং আপনি হতাশ হবেন না।

এই বাক্য দ্বারা সুসংবাদকে দৃঢ়তর করা হয়েছে। তারপর ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (আ) ও সারাহকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের (بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ) সুসংবাদ দিলেন। অর্থাৎ ইসহাক (আ) ও তার ভাইয়ের কথা। ইসমাঈল (আ)-কে আল্লাহ বিভিন্ন গুণের ও মর্যাদার অধিকারী বলে কুরআনে উল্লেখ করেছেন যেমন حَلِيْمٍ বা ধৈর্যশীল—যা তাঁর অবস্থার সাথে খুবই সামস্যপূর্ণ। তাছাড়া ওয়াদা পালনকারী এবং সহনশীল বলেও তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوْبَ.

(আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পর ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম।) এ আয়াত দ্বারাই মুহাম্মদ ইব্‌ন কা'ব আল কুরাজী (র) প্রমুখ দলীল পেশ করেছেন যে, যাকে যবেহ-এর হুকুম করা হয়েছিল তিনি হলেন ইসমাঈল (আ)—ইসহাক (আ) নন; কেননা ইসহাক (আ)-কে যবেহ করার হুকুম দেয়া যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। যেহেতু সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তিনি বেঁচে থাকবেন এবং তাঁর ইয়াকূব নামক একজন সন্তানও জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু ইসহাক يعقوب শব্দটি عقب শব্দ থেকে নির্গত যার অর্থ পরে হওয়া বা পরে আসা।

আহ্‌লি কিতাবদের মতে, ফেরেশতাদের সম্মুখে ভুনা করা বাছুরের সাথে রুটি, তিনটা মশক, ঘি ও দুধ আনা হয় এবং ফেরেশতাগণ তা খেয়েও ছিলেন। কিন্তু ফেরেশতাদের খাওয়ার মতটি এক চরম ভ্রান্তি বৈ কিছু নয়। কারও কারও মতে, ফেরেশতাগণ আহার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য তখন বাতাসে মিশে যায়। আহ্‌লি কিতাবদের মতে, আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-কে বলেন ঃ তোমার স্ত্রীকে সারা (سارا) বলে ডেকো না, বরং সে হচ্ছে (سارة) সারাহ্। আমি তাকে বরকত দান করব এবং তাকে পুত্র সন্তান দান করব। সে পুত্রকেও বরকতময় করব। তার বংশ থেকে অনেক গোত্র হবে এবং সে বংশে অনেক রাজা-বাদশাহর জন্ম হবে। একথা শুনে ইবরাহীম (আ) শুকরিয়া আদায়ের জন্যে সিজদায় পড়ে যান। তিনি মনে মনে চিন্তা করে হাসেন এবং বলেন, আমার বয়স যখন একশ'র উপরে এবং সারাহ্‌র বয়স নব্বই—এখন আমাদের সন্তান হবে! ইবরাহীম (আ) প্রার্থনা করেন, হে আল্লাহ! ইবরাহীম যদি আপনার সম্মুখে লালিত-পালিত হত! আল্লাহ বলেন ঃ হে ইবরাহীম! আমি আমার নিজের কসম করে বলছি, তোমার স্ত্রী সারাহ্ অবশ্যই পুত্র সন্তান প্রসব করবে। তার নাম হবে ইসহাক। সে দীর্ঘজীবী হবে এবং আমার আশিস ধন্য হবে সে এবং তার পরবর্তী বংশধররা। ইসমাঈলের ব্যাপারে তোমার প্রার্থনা কবুল করেছি। তাকে বরকত দান করেছি। আমি তাকে বড় করেছি ও যথেষ্ট সমৃদ্ধি দিয়েছি। তার বংশে বারজন বাদশাহর জন্ম হবে। তাকে আমি এক বিশাল বংশের প্রধান বানাব। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আল্লাহর বাণী ঃ

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوْبَ .

(আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম।) এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিবি সারাহ্ নিজ পুত্র ইসহাক ও ইসহাকের পুত্র ইয়াকূব (নাতি)-এর দ্বারা আনন্দ লাভ করবেন। অর্থাৎ ইবরাহীম (আ) ও সারাহ্‌র জীবদ্দশায় ইয়াকূবের জন্ম হবে

এবং তাকে দেখে উভয়ের চোখ জুড়াবে। যেমন জুড়াবে পুত্র ইসহাককে পেয়ে।

এই অর্থ যদি গ্রহণ করা না হয় তাহলে ইসহাকের সাথে তাঁর বংশের সবাইকে বাদ দিয়ে কেবল ইয়াকূবের উল্লেখ করার কোন অর্থ হয় না। যখনই নির্দিষ্টভাবে ইয়াকূবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তখনই নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে যে, ইবরাহীম (আ) ও সারাহ্ ইয়াকূবকে পেয়ে সেরূপ খুশী হবেন ও আনন্দ উপভোগ করবেন, যেরূপ খুশী ও আনন্দ উপভোগ করবেন তাঁর পিতা ইসহাকের জন্মের দরুন। আল্লাহর বাণী ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا.

আমি তাকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকূব। প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি। (সূরা আনআম ঃ ৮৪) আল্লাহর বাণী ঃ

فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ .

অতঃপর ইবরাহীম যখন তাদেরকে এবং আল্লাহ ব্যতীত তারা আর যাদের পূজা করত—তাদের সবাইকে পরিত্যাগ করল। তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব। (সূরা মারয়াম ঃ ৪৯)

এ আয়াতটি উল্লেখিত অভিমতকে আরও শক্তিশালী করেছে। বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীসও এই মতকে সমর্থন করে। আবূ যর (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একদা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বপ্রথম নির্মিত মসজিদ কোন্টি? তিনি বললেন, মসজিদুল হারম। আমি বললাম, তারপর কোন্টি? তিনি বললেন, মসজিদুল আক্সা। আমি বললাম, এ দু' মসজিদের নির্মাণের মধ্যে ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। আমি বললাম, এর পরবর্তী মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ কোন্টি? তিনি বললেন, এর পরে সব জায়গা সমান। যেখানেই সালাতের সময় হয় সেখানেই পড়ে নাও; কেননা সকল জায়গাই সালাত আদায়ের উপযুক্ত।

আহ্লি কিতাবদের মতে, হযরত ইয়াকূব (আ) মসজিদে আক্সা নির্মাণ করেন। এর অপর নাম মসজিদে ঈলিয়া— বায়তুল মুকাদ্দাস। এটাও উল্লেখিত হাদীসের বর্ণনার সত্যতার প্রমাণবহ। এ হিসাবে ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) কর্তৃক মসজিদুল হারম নির্মাণের চল্লিশ বছর পর ইয়াকূব (যার অপর নাম ইসরাঈল) (আ) কর্তৃক মসজিদে আক্সা নির্মাণের তথ্য পাওয়া যায়। এই সাথে আরও প্রমাণিত হয় যে, ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) যখন মসজিদুল হারম নির্মাণ করেন তখন ইসহাক (আ) বর্তমান ছিলেন। কেননা ইব্রাহীম (আ) যখন দু'আ করেছিলেন তখন বলেছিলেন—আল্লাহর বাণী ঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرٰهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ . رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَإِنَّهُ مِنِّىْ. وَمَنْ عَصَانِىْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ . رَبَّنَآ إِنِّىْٓ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِىْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ . رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً

مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ . رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ . وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ . اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَآءِ . رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ . رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ .

স্মরণ কর, ইবরাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! এই নগরীকে নিরাপদ করো এবং আমাকে ও আমার পুত্রগণকে প্রতিমা পূজা থেকে দূরে রেখ। হে আমার প্রতিপালক! এ প্রতিমাগুলো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সেই আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট, হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্যে যে, ওরা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব, তুমি কিছু লোকের অন্তর ওদের প্রতি অনুরাগী করে দাও এবং ফলাদি দ্বারা ওদের রিয্‌কের ব্যবস্থা করিও, যাতে ওরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো জান, যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কিছুই আল্লাহর নিকট গোপন থাকে না। প্রশংসা আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। আমার প্রতিপালক অবশ্যই প্রার্থনা শুনে থাকেন। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত কায়েমকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবূল কর। হে আমাদের প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে আমার পিতামাতাকে এবং মুমিনগণকে ক্ষমা করো! (১৪ ঃ ৩৫-৪১)

সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ (আ) সম্পর্কে হাদীসে যা বর্ণিত হয়েছে— অর্থাৎ তিনি যখন বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন তখন আল্লাহর নিকট তিনটি জিনিস চেয়েছিলেন। নিম্নের আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি ঃ

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ .

সুলায়মান বলল, হে আমার রব! আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন, যার অধিকারী আমি ছাড়া আর কেউ না হয়। (সূরা সাদ ঃ ৩৫)

সুলায়মান (আ)-এর আলোচনায়ও আমরা এ বিষয়ে উল্লেখ করব। এর অর্থ— তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসকে পুনঃনির্মাণ করেন। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় মসজিদের নির্মাণের মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধান। কিন্তু সুলায়মান (আ) ও ইবরাহীম (আ)-এর মধ্যে চল্লিশ বছরের ব্যবধানের কথা কেউ বলেন নি। কেবলমাত্র ইব্‌ন হিব্বান (র) তার 'তাকাসীম ও আনওয়া' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর আগে বা পরে অন্য কেউ এ মত পোষণ করেন নি।

বায়তুল আতীক বা কা'বাগৃহ নির্মাণ

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী :

وَاِذْ بَوَّاْنَا لِاِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ اَنْ لَّا تُشْرِكْ بِىْ شَيْـئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْقَآئِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ. وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّاْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ.

এবং স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই ঘরের স্থান, তখন বলেছিলাম, আমার সাথে কোন শরীক স্থির করো না, এবং আমার ঘরকে পবিত্র রাখিও তাদের জন্যে যারা তাওয়াফ করে এবং যারা (দাঁড়ায় সালাতে), রুকূ করে ও সিজদা করে। এবং মানুষের নিকট হজ্জ-এর ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটসমূহের পিঠে, এরা আসবে দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে। (সূরা : হজ্জ : ২৬-২৭)

আল্লাহর বাণী :

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ. فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ.

মানব জাতির জন্যে সর্বপ্রথম যে ঘরটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী। তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। যেমন মাকামে ইবরাহীম এবং যে কেউ সে স্থানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। এবং কেউ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন। (সূরা আলে-ইমরান : ৯৬-৯৮)

আল্লাহ্র বাণী :

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ . قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا . قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ . وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا . وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِمَ مُصَلًّى . وَعَهِدْنَآ اِلٰى اِبْرٰهِمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ .

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ. قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا. ثُمَّ اَضْطَرُّهٗ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ. وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

এবং স্মরণ কর, যখন ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলো সে পূর্ণ করেছিল, আল্লাহ্ বললেন, 'আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করছি।' সে বলল, আমার বংশধরদের মধ্য হতেও? আল্লাহ্ বললেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়' এবং সেই সময়কে স্মরণ কর, যখন কা'বা ঘরকে মানব জাতির মিলন-কেন্দ্র ও নিরাপত্তা স্থল করেছিলাম এবং বলেছিলাম, 'তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থান মাকামে ইব্‌রাহীমকেই সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর' এবং ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈলকে তাওয়াফকারী, ই'তিকাফকারী, রুকূ ও সিজদাকারীদের জন্যে আমার ঘরকে পবিত্র রাখতে আদেশ দিয়েছিলাম। স্মরণ কর, যখন ইব্‌রাহীম বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! একে নিরাপদ শহর করো। আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী তাদেরকে ফলমূল থেকে জীবিকা দান করো। তিনি বললেন, যে কেউ অবিশ্বাস করবে তাকেও কিছুকালের জন্যে জীবনোপভোগ করতে দেব। তারপর তাকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব এবং তা কত নিকৃষ্ট পরিণাম!

স্মরণ কর, যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল কা'বা গৃহের প্রাচীর তুলছিল, তখন তারা বলেছিল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এই কাজ গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।' হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত করো এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত করো। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। 'হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ করিও যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে; তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা ঃ ১২৪-১২৯)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় বন্ধু ও রাসূল এবং বহু সংখ্যক নবীর পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বায়তুল 'আতীক বা কা'বাঘর নির্মাণ করেন। এটাই সর্বপ্রথম মসজিদ যা সর্বসাধারণের ইবাদতের জন্যে নির্মাণ করা হয়। আল্লাহ এ ঘরের ভিত্তি স্থান নির্দিষ্ট করে দেন। হযরত আলী (রা) প্রমুখ সাহাবী বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ ওহীযোগে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে ঐ স্থান নির্দেশ করে দেন। ইতিপূর্বে আসমানের সৃষ্টি রহস্য অধ্যায়ে আমরা বলে এসেছি যে, কা'বাঘর বায়তুল মা'মূরের সোজা নিচে যমীনে

অবস্থিত। এমনকি যদি বায়তুল মা'মূর নিচে পতিত হতো তবে তা অবশ্যই কা'বাঘরের উপরেই পড়তো। শুধু তাই নয়, কোন কোন পূর্বসূরি আলিমের মতে, সাত আসমানের প্রতিটি ইবাদত গৃহ এই একই বরাবরে অবস্থিত। তাঁরা বলেছেন, প্রতিটি আসমানে একটি করে ঘর আছে। আসমানবাসীরা সেই ঘরে আল্লাহ্র ইবাদত করে থাকেন। আসমানবাসীদের জন্যে সেগুলো পৃথিবীর অধিবাসীদের কা'বারই অনুরূপ। তাই আল্লাহ্ ইব্রাহীম (আ)-কে পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্যে একটি ঘর নির্মাণ করতে আদেশ দেন, যেমনি আকাশের ফেরেশতাদের জন্যে ইবাদতখানা রয়েছে, আল্লাহ্ তাঁকে সে স্থান দেখিয়ে দেন। আকাশ ও যমীন সৃষ্টির পর থেকেই এই স্থানটিকে উক্ত ঘরের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। বুখারী ও মুসলিমে এ কথাই বর্ণিত হয়েছে যে, এই শহরকে আল্লাহ সেই দিনই 'হারম' বলে মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন, যেদিন তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং আল্লাহ্ প্রদত্ত মর্যাদায় এটা কিয়ামত পর্যন্ত তা হারমই থাকবে। কোন সহীহ্ বর্ণনায় কোন নবী থেকে এমন বর্ণনা পাওয়া যায়নি যে, ইব্রাহীম খলীলের নির্মাণের পূর্বে এ ঘরের কোন নির্মিতরূপ ছিল।

আয়াতে উল্লেখিত مَكَانَ الْبَيْتِ (ঘরের স্থান) শব্দ থেকে কেউ কেউ প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, এ ঘরের ভিত্তি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাঁদের এ দলীল যথার্থ নয়। কেননা, ঘরের স্থান বলে বোঝান হয়েছে সেই স্থানকে যা আল্লাহ্র জ্ঞানে নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট ছিল এবং তাঁরই কুদরতে হযরত আদম (আ) থেকে ইব্রাহীম খলীল (আ)-এর সময় পর্যন্ত সকল নবীর নিকট তা পরিচিত ছিল। আমরা আগেই বলেছি যে, হযরত আদম (আ) এ ঘরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করেছিলেন। ফেরেশতাগণ তাঁকে বলেছিলেন, আমরা আপনার পূর্বেই এ ঘর তওয়াফ করেছি। নূহের কিশতী এ ঘরের চারদিকে চল্লিশ দিন (বা তার কাছাকাছি সময়) ধরে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু এগুলো ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা বলেছি যে, ইসরাঈলী বর্ণনাকে আমরা সত্যও জানবো না, মিথ্যাও বলবো না। সুতরাং এর দ্বারা কোন প্রমাণ দেয়া যাবে না। তবে যদি তা সত্যের বিপরীত হয় তবে অবশ্যই তা পরিত্যাজ্য।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِىْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ .

নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের ইবাদতের জন্যে নির্মাণ করা হয়েছে, যা মক্কায় অবস্থিত তা অতি বরকতময় ও বিশ্ববাসীর হিদায়াতের মাধ্যম।

অর্থাৎ প্রথম ঘর যা সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে নির্মাণ করা হয়েছে, তা ছিল বরকতের জন্যে ও হিদায়াতের জন্যে। بَكَّة শব্দ দ্বারা ২টি অর্থ বোঝা যায় (১) মক্কা, (২) কা'বা যে জায়গার উপর দাঁড়িয়ে আছে তা'। فِيْهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ (এতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ।) কেননা, এটা নির্মাণ করেছেন ইব্রাহীম খলীল (আ)—যিনি তাঁর পরবর্তী সকল নবীর পিতা। নিজ বংশধরদের মধ্যে যারা তাঁকে অনুসরণ করেছে ও তাঁর রীতি-নীতি গ্রহণ করেছে, তাদের তিনি ইমাম। এ কারণেই আল্লাহ্ বলেছেন مَقَامُ إِبْرَاهِيْمَ (ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থান) অর্থাৎ যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি কা'বাঘর নির্মাণ করেছিলেন। কা'বা ঘরের দেওয়াল যখন তাঁর চাইতে উঁচু হয়ে যায়, তখন পুত্র ইসমাঈল (আ) এই প্রসিদ্ধ পাথরখানা এনে পিতার পায়ের নিচে স্থাপন করেন, যাতে তার উপর দাঁড়িয়ে দেওয়াল উঁচু করতে পারেন। ইব্ন আব্বাস

(রা)-এর দীর্ঘ হাদীসে এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ পাথরটি সেই প্রাচীনকাল থেকে হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতকাল পর্যন্ত কা'বার দেওয়াল সংলগ্ন ছিল। তিনি এটাকে কা'বা ঘর থেকে কিছু পিছিয়ে দেন। যাতে সালাত আদায়কারী ও তাওয়াফকারীদের অসুবিধা না হয়। এ ব্যাপারে হযরত উমর (রা)-এর পদক্ষেপকে সকলে মেনে নেন।

কেননা, যেসব বিষয়ে হযরত উমর (রা)-এর মতামত আল্লাহ্ তা'আলার আনুকূল্য লাভ করে তন্মধ্যে এটি একটি। কারণ, একদা তিনি রাসূল (সা)-এর নিকট বলেছিলেনঃ لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى কতই না ভাল হত, যদি মাকামে ইব্‌রাহীমকে আমরা সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ করতাম! তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى (তোমরা মাকামে ইব্‌রাহীমকে সালাতের স্থান রূপে গ্রহণ কর।) ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত ঐ পাথরের উপর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পায়ের দাগ অবশিষ্ট ছিল। আবূ তালিব তাঁর বিখ্যাত 'কাসীদায়ে লামিয়ায়' এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন ঃ

وثور ومن ارسى ثبيرا مكانه . - وراق لبر فى حراء ونازل

وبالبيت حق البيت من بطن مكة - وبالله ان الله ليس بغافل

وبالحجر المسود اذ يمسحونه - اذ اكتنفوه بالضحي والاصائل

وموطىء ابراهيم فى الصخر رطبة - على قدميه حافيا غيرناعل

অর্থাৎ–ছাওর পর্বতের কসম এবং যিনি ছাবীর পর্বতকে তার জায়গায় দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন তার কসম এবং যিনি হেরা পর্বতে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন ও অবতরণ করেছিলেন তার কসম। এই ঘরের কসম, মক্কাবাসীদের উপরে এই ঘরের হক রয়েছে। আল্লাহ্‌র কসম, তিনি কিছুমাত্র গাফিল নন। কসম হাজরে আসওয়াদের। যখন দিবসের প্রথমভাগে ও শেষভাগে লোকজন তাওয়াফকালে তাকে জড়িয়ে ধরে। কসম মাকামে ইব্‌রাহীমের, যার উপর তার পাদুকাবিহীন নগ্ন পায়ের স্মৃতিচিহ্ন এখনও বিদ্যমান রয়েছে।

অর্থাৎ হযরত ইব্‌রাহীম (আ) যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কা'বাঘর নির্মাণ করেছিলেন, সেই পাথরের উপর তাঁর পায়ের চিহ্ন অঙ্কিত হয়ে যায়।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيْلُ

(স্মরণ কর যখন ইব্‌রাহীম ও ইসমাঈল বায়তুল্লাহ্‌র প্রাচীর তুলছিল।) তখন তারা এই দু'আ পাঠ করেছিলেন ঃ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ—হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের এ কাজ গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে তাঁরা উভয়ে ছিলেন একান্ত নিষ্ঠাবান। তাই সর্বশ্রোতা ও সর্বজান্তা আল্লাহ্‌র নিকট তাঁরা দু'আ করছেন তাঁদের এ মহৎ কাজ ও প্রচেষ্টা কবুল করার জন্যে। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত কর। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা ঃ ১২৭-২৮)

মোটকথা, হযরত ইব্‌রাহীম খলীল (আ) বিশ্বের সবচেয়ে অধিক সম্মানিত মসজিদকে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। সে স্থানটি এমন একটি উপত্যকা, যেখানে কোন ফসল উৎপাদিত হয় না। তিনি তথাকার অধিবাসীদের জন্যে বরকতের দু'আ করেন। ফলের দ্বারা তাদের রিযিকের ব্যবস্থা করতে দু'আ করেন। যদিও সেখানে পানির স্বল্পতা এবং বৃক্ষ, ফল ও ফসলের শূন্যতা ছিল। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করেন এ স্থানকে সম্মানিত ও নিরাপদ স্থানে পরিণত করতে। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা শোনেন, দু'আ কবূল করেন, আহ্বানে সাড়া দেন ও প্রার্থিত বস্তু দান করেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ.

ওরা কি দেখে না, আমি হারমকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চতুষ্পার্শ্বে যে সব মানুষ আছে তাদের উপর হামলা করা হয়। (সূরা আনকাবূত ঃ ৬৭)

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا.

আমি কি ওদেরকে এক নিরাপদ হারমে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিযিক স্বরূপ? (সূরা কাসাস ঃ ৫৭)

হযরত ইব্‌রাহীম (আ) আল্লাহ্‌র কাছে তাদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করার জন্যে দু'আ করেন। অর্থাৎ তাদের স্বজাতির মধ্য থেকে তাদেরই উন্নত ভাষাশৈলীতে পারদর্শী কোন ব্যক্তিকে। যাতে করে দীন ও দুনিয়ার উভয় নিয়ামতের পূর্ণ অধিকারী হতে পারে। আল্লাহ্ তাঁর এ দু'আও কবূল করেন। তিনি তাদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরণ করেন। যিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না। তাঁর দীনকে পূর্ণতা দান করেন, যা ইতিপূর্বে কারও ক্ষেত্রে করেননি। তাঁর দাওয়াতকে সর্বকালে সর্বদেশে পৃথিবীর সকল ভাষাভাষীর জন্যে ব্যাপক ও বিস্তৃত করে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর দীনই বলবৎ থাকবে।

সকল নবীর মধ্যে এটা ছিল তাঁর একক বৈশিষ্ট্য, তাঁর ব্যক্তিত্বের মর্যাদা, তাঁর আনীত দীনের পূর্ণতা, জন্মভূমির গৌরব, ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব, উম্মতের উপর তার অশেষ দয়া ও মমতা, বংশ মর্যাদা এবং তাঁর আচার-আচরণ। এই কারণে হযরত ইব্‌রাহীম (আ) যখন দুনিয়াবাসীর জন্যে কা'বা নির্মাণ করেন তখন তা সম্মান ও মর্যাদায় সপ্তম আকাশের অধিবাসী ফেরেশতাগণের কা'বা বায়তুল মা'মূরের সমমর্যাদা লাভ করে। বায়তুল মা'মূরে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদত করে থাকেন এবং একবার যারা এ সুযোগ পান তাঁরা কিয়ামত অবধি আর দ্বিতীয়বার সে সুযোগ পান না। আমরা সূরা বাকারার তাফসীরে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় কথা এবং সংশ্লিষ্ট হাদীস ও বর্ণনাসমূহের উল্লেখ করেছি। আগ্রহী ব্যক্তি তা সেখানে দেখে নিতে পারেন। সে বর্ণনাসমূহের একটি হলো, সকল প্রশংসা আল্লাহরই। সুদ্দী বলেছেন,

আল্লাহ্ যখন ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-কে কা'বা নির্মাণের আদেশ করেন, তখন তাঁরা কা'বার স্থানটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। আল্লাহ্ তখন খাজুজ নামক একটি বায়ু প্রেরণ করেন। তার ছিল দু'টি পাখা ও সর্পাকৃতির মস্তক। সে বায়ু প্রাচীন কা'বার স্থানটি আবর্জনা মুক্ত করে দেয়। তখন ইব্রাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) তা অনুসরণ করে কোদাল দ্বারা মাটি খুঁড়ে সেখানে ভিত্তি স্থাপন করেন।

আল্লাহ বলেন ঃ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرٰهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ .

(যখন আমি ইব্রাহীমকে ঘরের স্থান নির্ধারণ করে দিলাম।) ভিত্তির উপর দেয়াল উঠানোর সময় ঘরের স্তম্ভ নির্মাণ করেন। ইব্রাহীম (আ) ইসমাঈল (আ)-কে বললেন, প্রিয় বৎস! এখন তুমি আমার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে 'হাজরে আস্ওয়াদ' নিয়ে এস। মূলত এটা ছিল শুভ্র ইয়াকূত পাথর, দেখতে উট পাখির ন্যায়। হযরত আদম (আ) এ পাথরসহ জান্নাত থেকে অবতরণ করেন। মানুষের পাপ-স্পর্শে এটা কাল হয়ে যায়। ইসমাঈল (আ) একটি পাথর নিয়ে পিতার নিকট এসে উক্ত হাজরে আসওয়াদকে রুকনে কা'বার নিকট দেখতে পান। পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, আব্বাজান! এ পাথরটি কে নিয়ে এসেছে? তিনি বললেন, এটা এমন একজন নিয়ে এসেছেন যিনি তোমার চাইতে অধিক গতিসম্পন্ন। এরপর উভয়ে পুনরায় নির্মাণ কাজে মনোনিবেশ করেন ও দু'আ পাঠ করতে থাকেন ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবূল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

ইবন আবূ হাতিম (র) বলেছেন, ইব্রাহীম (আ) পাঁচটি পাহাড়ের পাথর দ্বারা কা'বা নির্মাণ করেছিলেন। ইব্রাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ) যখন নির্মাণ কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন গোটা পৃথিবীর বাদশাহ যুলকারনাইন ঐ পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদেরকে এ কাজ করতে কে নির্দেশ দিয়েছে? জবাবে ইব্রাহীম (আ) বললেন, আল্লাহই আমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। যুলকারনাইন বললেন, আপনার কথার যথার্থতা কি করে বুঝবো? তখন পাঁচটি ভেড়া সাক্ষ্য দিল যে, আল্লাহ্ই এ নির্দেশ দিয়েছেন। তখন যুলকারনাইন ঈমান আনলেন এবং তার সত্যতা স্বীকার করে নিলেন।

আযরাকী (র) লিখেছেন, তিনি ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ্র (আ)-এ সাথে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। হযরত ইব্রাহীম খলীল (আ)-এর তৈরি কা'বা দীর্ঘকাল যাবত অক্ষত থাকে। পরবর্তীকালে কুরায়শগণ ঘরটি পুনর্নির্মাণ করে। তখন ঘরের উত্তর দিক থেকে যেই দিকে শাম দেশ অবস্থিত, হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তি থেকে কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয়, বর্তমানে সেই অবস্থার উপরেই কা'বাঘর আছে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) একবার তাঁকে বলেছিলেন, আয়েশা! তুমি তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের ব্যাপারটি ভেবে দেখেছ কি? তারা যখন কা'বা পুনঃনির্মাণ করে, তখন ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তি থেকে ছোট করে ফেলে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কেন তা ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর ফিরিয়ে আনেন না? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের লোকজন যদি নও-মুসলিম না হত,

ভিন্ন বর্ণনায়— যদি তোমার লোকজন জাহিলী যুগের কিংবা কুফরী যুগের কাছাকাছি সময়ের লোক না হত, তাহলে আমি কা'বার মধ্যে রক্ষিত সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে দিতাম, ঘরের দরজা নিচু করে যমীনের সমতলে নিয়ে আসতাম এবং (বাদ-পড়া) হিজর অংশ হাতীম[১] অংশটুকু বায়তুল্লাহ্র অন্তর্ভুক্ত করে দিতাম। পরবর্তীকালে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর শাসনামলে কা'বাঘর সেভাবেই পুনঃনির্মাণ করেন। যেদিকে রাসূলুল্লাহ (সা) ইংগিত করেছেন বলে তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছিলেন।

হিজরী ৭৩ সালে হাজ্জাজ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন যুবায়র (রা)-কে হত্যা করে তদানীন্তন খলীফা আবদুল-মালিক ইব্ন মারওয়ানের নিকট পত্র লিখে। আবদুল মালিকের সভাসদগণের ধারণা ছিল যে, ইব্ন যুবায়র (রা) আপন খেয়াল-খুশী মতেই কা'বার সংস্কার করেছিলেন। সুতরাং খলীফা তা ভেংগে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ মত খলীফার লোকজন কা'বার উত্তর-দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে, হাতীম অংশকে ভিতর থেকে বের করে দেয় এবং অন্যান্য পাথর কা'বা ঘরের ভিতরে রেখে দেয়াল উঠিয়ে দেয়। ফলে পূর্ব দিকের দরজা উঁচু হয়ে যায় এবং পশ্চিমের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়া হয়। বর্তমানে এই অবস্থায়ই আছে।

পরে আবদুল মালিক (র)-এর লোকজন যখন জানলো যে, ইব্ন যুবায়র (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা অনুসারে কা'বা সংস্কার করেছিলেন, তখন তারা দুঃখ প্রকাশ করে এবং অনুশোচনা করে যে, এরূপ করা না হলে ভাল হত। এরপর খলীফা মাহদী ইব্ন মানসূর খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে ইমাম মালিক ইব্ন আনাসের নিকট পরামর্শ চান যে, আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর ভিত্তির উপর কা'বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলে কেমন হয়? ইমাম মালিক (র) বলেন, এতে আমার আশংকা হয় যে, রাজা-বাদশাহ্রা কা'বাকে খেলার বস্তুতে পরিণত করবে। অর্থাৎ প্রত্যেক বাদশাহ তার ইচ্ছামত কা'বা ঘর সংস্কার করতে চাইবে। সুতরাং কা'বাকে সেই অবস্থার উপর বহাল রাখা হয় এবং আজও পর্যন্ত সেই একই অবস্থায় আছে।

---

১. কুরায়েশদের পুনঃনির্মাণকালে কা'বার বাদ পড়া অংশ হাতীম বা হিজরে ইসমাঈল নামে বিখ্যাত।

হযরত ইব্‌রাহীম খলীল (আ)-এর প্রশংসায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)

এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرٰهِيْمَ رَبُّهٗ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا. قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ.

স্মরণ কর, যখন ইব্‌রাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন এবং সেগুলো সে পূর্ণ করেছিল। আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা করছি, সে বলল, আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও? আল্লাহ বললেন, আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়। (সূরা বাকারা ঃ ১২৪)

আল্লাহ্ হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে যেসব কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলেন, তিনি সেসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্ তাঁকে মানব জাতির নেতৃত্ব দান করেন। যাতে তারা তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণ করতে পারে। ইব্‌রাহীম (আ) এই নিয়ামত তাঁর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে অব্যাহত রাখার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা শুনেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁকে যে নেতৃত্ব দেয়া হল তা জালিমরা লাভ করতে পারবে না, এটা কেবল তাঁর সন্তানদের মধ্যে আলিম ও সৎকর্মশীলদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَاٰتَيْنَاهُ اَجْرَهٗ فِى الدُّنْيَا. وَاِنَّهٗ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ-

আমি ইব্‌রাহীমকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং তার বংশধরদের জন্যে স্থির করলাম নবুওত ও কিতাব, আমি তাকে দুনিয়ায় পুরস্কৃত করেছিলাম। আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম হবে। (২৯ আন-কাবূত ঃ ২৭)

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ. كُلًّا هَدَيْنَا. وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمَانَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهَارُوْنَ. وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ.

وَاِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيْنَ. وَمِنْ اٰبَاءِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَاِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

এবং তাকে দান করেছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব ও ওদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম, পূর্বে নূহ্‌কেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম এবং তার বংশধর দাঊদ, সুলায়মান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও; আর এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি এবং যাকারিয়া, য়াহ্‌য়া, ঈসা এবং ইল্‌য়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম, এরা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। আরও সৎপথে পরিচালিত করেছিলাম ইসমাঈল, আল-য়াসা'আ, ইউনুস ও লূতকে; এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম বিশ্ব জগতের উপর প্রত্যেককে এবং এদের পিতৃ-পুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে; তাদেরকে মনোনীত করেছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলাম। (সূরা আনআম ঃ ৮৪-৮৭)

প্রসিদ্ধ মতে, وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ (তাঁর বংশধরদের) বলতে এখানে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে বুঝান হয়েছে। হযরত লূত (আ) যদিও হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর ভাতিজা তবুও অন্যদের প্রাধান্য হেতু তাঁকেও বংশধর হিসাবে বলা হয়েছে। অপর একদল আলিমের মতে, 'তাঁর' বলতে হযরত নূহ (আ)-কে বুঝান হয়েছে। পূর্বে আমরা নূহ (আ)-এর আলোচনায় এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِىْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ.

আমি নূহ এবং ইব্‌রাহীমকে রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম এবং তাদের বংশধরগণের জন্যে স্থির করেছিলাম নবুওত ও কিতাব। (সূরা হাদীদ ঃ ২৬)

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর পরে আসমান থেকে যত কিতাব যত নবীর উপর নাযিল হয়েছে, তাঁরা সকলেই নিশ্চিতভাবে তাঁর বংশধরদের অন্তর্ভুক্ত। এটা এমন একটা সম্মান যার কোন তুলনা হয় না। এমন একটা সুমহান মর্যাদা যার তুল্য আর কিছুই নেই। কারণ, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঔরসে দুই মহান পুত্র-সন্তানের জন্ম হয়। হাজেরার গর্ভে ইসমাঈল এবং সারাহ্‌র গর্ভে ইসহাক। ইসহাকের পুত্র ইয়াকূব তাঁর অপর নাম ছিল ইসরাঈল। পরবর্তী বংশধরগণ এই ইসরাঈলের নামেই বনী ইসরাঈল নামে অভিহিত হয়ে থাকে। এই ইসরাঈলী বংশে এতো বিপুল সংখ্যক নবীর আগমন ঘটে, যাদের সঠিক সংখ্যা তাঁদেরকে প্রেরণকারী আল্লাহ ব্যতীত আর কেউই জানেন না। অব্যাহতভাবে এই বংশেই নবী-রাসূলগণ আসতে থাকেন এবং হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) পর্যন্ত পৌঁছে সে ধারার সমাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) ইসরাঈল বংশের শেষ নবী। অপরদিকে হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সন্তানগণ আরবের বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে আরব ভূমিতেই বসবাস করতে থাকেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ নবী খাতামুল আম্বিয়া, বনী আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান, দুনিয়া ও আখিরাতের গৌরব রবি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন হাশিম আল কুরায়শী আল-মক্কী ওয়াল মাদানী ব্যতীত অন্য কোন নবীর আগমন ঘটেনি। ইনিই হলেন সেই মহামানব যাঁর দ্বারা সমগ্র মানব জাতি গৌরবান্বিত। আদি-অন্ত সকল মানুষের ঈর্ষার পাত্র।

সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

ساقوم مقاما يرغب الى الخلق كلهم حتى ابراهيم.

অর্থাৎ—'আমি এমন এক মর্যাদাপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হব যে, আমার কাছে পৌঁছার জন্যে প্রত্যেকেই লালায়িত হবে; এমনকি ইবরাহীম (আ)-ও।' এই বাক্যের দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা) প্রকারান্তরে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে অন্য সব মানুষের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতে হযরত ইবরাহীম (আ)-ই শ্রেষ্ঠ মানুষ ও সম্মানিত পুরুষ।

ইমাম বুখারী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) হাসান (রা)-কে কোলে নিয়ে বলতেন, আমি তোমাদের দুই ভাইয়ের জন্যে সেরূপ আশ্রয় চাই, যেরূপ আশ্রয় চেয়েছিলেন তোমাদের আদি পিতা ইবরাহীম (আ) ইসমাঈল ও ইসহাকের জন্যে। আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালেমাহ্ দ্বারা প্রত্যেক শয়তান ও বিষাক্ত সরীসৃপ থেকে এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর চোখের দৃষ্টি থেকে। সুনান হাদীসের গ্রন্থকারগণও মানসূর (র) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِى الْمَوْتٰى. قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ. قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعْيًا. وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার প্রতিপালক! কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও। তিনি বললেন, 'তবে কি তুমি বিশ্বাস করনি? সে বলল, কেন করব না, তবে এটি কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্যে। তিনি বললেন, তবে চারটি পাখি লও এবং সেগুলোকে তোমার বশীভূত করে লও। তারপর তাদের এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে স্থাপন কর। তারপর তাদেরকে ডাক দাও ওরা দ্রুতগতিতে তোমার নিকট আসবে। জেনে রেখো, আল্লাহ্ প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা ঃ ২৬০)

আল্লাহ্‌র নিকট হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই প্রশ্ন সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণ বহু কথা লিখেছেন, আমরা তাফসীর গ্রন্থে সে সবের বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সারকথা এই যে, ইবরাহীম (আ)-এর প্রার্থনা আল্লাহ্ কবূল করেন। আল্লাহ্ তাঁকে চার প্রকার পাখি সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। এই চার প্রকার পাখি কি কি ছিল সে বিষয়ে মুফাস্‌সিরগণের মতভেদ আছে। যাই হোক, উক্ত পাখিগুলোকে কেটে তাদের মাংস ও পাখা ইত্যাদি খণ্ড-বিখণ্ড করে সবগুলো মিলিয়ে মিশিয়ে চারটি ভাগে বিভক্ত করে এবং এক এক ভাগ এক এক পাহাড়ে রাখতে বলেন। তারপর প্রত্যেকটি পাখির নাম ধরে আল্লাহ্‌র নামে ডাকতে বলেন। ইব্‌রাহীম (আ) যখন একটি একটি করে পাখির নাম ধরে ডাকেন, তখন প্রত্যেক পাহাড় থেকে ঐ পাখির খণ্ডিত মাংস ও পাখা উড়ে এসে একত্রিত হতে থাকে এবং পূর্বে যেরূপ ছিল সেরূপ পূর্ণাঙ্গ পাখিতে পরিণত হতে থাকে। আর ইব্‌রাহীম (আ) সেই মহান সত্তার কুদরত ও ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেন, যিনি কোন কিছুকে হও

(কুন) বললে সাথে সাথেই তা হয়ে যায়। ইব্‌রাহীম (আ)-এর ডাকের সাথে ঐ পাখিগুলো তাঁর দিকে দৌড়িয়ে আসতে থাকে। উড়ে আসার চেয়ে দৌড়ে আসার মধ্যে আল্লাহ্‌র কুদরত অধিক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী ইব্‌রাহীম (আ) পাখিগুলোর মাথা কেটে নিজের হাতে রেখে দিয়েছিলেন। বাকি অংশ পাহাড় থেকে উড়ে আসলে তিনি মাথা ফেলে দিতেন। ফলে মাথাগুলো সংশ্লিষ্ট পাখির দেহের সাথে গিয়ে লেগে যেত। অতএব, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই। আল্লাহ মৃতকে জীবিত করতে পারেন এ ব্যাপারে ইব্‌রাহীম (আ)-এর ইল্‌মে ইয়াকীন (দৃঢ় বিশ্বাস) ছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি তা খোলা চোখে দেখতে চেয়েছিলেন মাত্র। যাতে 'ইলমে ইয়াকীন' 'আয়নুল ইয়াকীনে' উন্নীত হয়। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন ও আশা পূরণ করেন। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِي إِبْرَاهِيْمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ. أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. هَا أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ. مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا. وَاللّٰهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ.

হে কিতাবিগণ! ইব্‌রাহীম সম্বন্ধে কেন তোমরা তর্ক কর, অথচ তাওরাত ও ইন্‌জীল তো তার পরেই অবতীর্ণ হয়েছিল? তোমরা কি বুঝ না? দেখ, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে তোমরাই তো সে বিষয়ে তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আল্লাহ জ্ঞাত আছেন এবং তোমরা জ্ঞাত নও। ইবরাহীম ইহুদীও ছিল না, খৃস্টানও ছিল না; সে ছিল একনিষ্ঠ, আত্মসমর্পণকারী এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। যারা ইবরাহীমের অনুসরণ করেছিল তারা এবং এই নবী ও যারা ঈমান এনেছে মানুষের মধ্যে তারা ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম। আল্লাহ্ মু'মিনদের অভিভাবক। (সূরা আল-ইমরান ৬৫-৬৮)

ইয়াহূদ ও নাসারা প্রত্যেকেই দাবি করত যে, ইবরাহীম (আ) তাদেরই লোক। আল্লাহ্ তাদের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে ইবরাহীম (আ)-কে তাদের দলভুক্ত হওয়ার অপবাদ থেকে মুক্ত করেন। তিনি তাদের চরম মূর্খতা ও জ্ঞানের স্বল্পতা এই বলে প্রকাশ করে দেন যে, তাওরাত ও ইনজীল তো তার যুগের পরেই নাযিল হয়েছে।

وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ.

অর্থাৎ— তিনি কিভাবে তোমাদের ধর্মের লোক হবেন, যখন দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায়ের বহু যুগ পরে তাওরাত ইন্‌জীল নাযিল হয়েছে অর্থাৎ তোমাদের শরীয়ত এসেছে। এ কারণেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ তোমরা কি এ সামান্য বিষয়টিও বুঝ না?

আল্লাহ্ আরও বলেন ঃ

مَا كَانَ إِبْرَاهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلاَ نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا - وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

'ইবরাহীম ইহুদীও ছিল না, নাসারাও ছিল না, বরং সে ছিল একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণকারী। সে মুশরিকও ছিল না।' আল্লাহ্ এখানে স্পষ্ট বলেছেন যে, ইবরাহীম ছিলেন দীনে হানীফের উপর প্রতিষ্ঠিত। দীনে হানীফ বলা হয় স্বেচ্ছায় বাতিলকে পরিত্যাগ করে হককে গ্রহণ করা এবং আন্তরিকভাবে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। এই দীনে হানীফ ইহুদী, খৃস্টান ও মুশরিকদের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرٰهِمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِى الدُّنْيَا . وَإِنَّهُ فِى الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. وَوَصّٰى بِهَآ إِبْرٰهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ يٰبَنِىَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ . إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِىْ. قَالُوْا نَعْبُدُ إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ اٰبَآئِكَ إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰقَ إِلٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ.

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا أَوْنَصٰرٰى تَهْتَدُوْا . قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرٰهِمَ حَنِيْفًا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. قُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلٰى إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ أُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ. لاَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ. فَإِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآاٰمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِاهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِىْ شِقَاقٍ.

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ. وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. صِبْغَةَ اللّٰهِ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً وَّنَحْنُ لَهُ عٰبِدُوْنَ. قُلْ أَتُحَآجُّوْنَنَا فِى اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُوْنَ. أَمْ تَقُوْلُوْنَ إِنَّ إِبْرٰهِيْمَ وَإِسْمٰعِيْلَ وَإِسْحٰاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوْا هُوْدًا أَوْنَصٰرٰى. قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ব্যতীত ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ হতে আর কে বিমুখ হবে! পৃথিবীতে তাকে আমি মনোনীত করেছি; পরকালেও সে সৎ কর্মপরায়ণগণের অন্যতম। তার প্রতিপালক যখন তাকে বলেছিলেন, 'আত্মসমর্পণ কর', সে বলেছিল, 'জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসর্মপণ করলাম।' এবং ইবরাহীম ও ইয়াকূব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়ে বলেছিল, 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে এ দীনকে মনোনীত করেছেন। সুতরাং আত্মসমর্পণকারী না হয়ে তোমরা কখনও মৃত্যুবরণ করিও না।' ইয়াকূবের নিকট যখন মৃত্যু এসেছিল তোমরা কি তখন উপস্থিত ছিলে? সে যখন পুত্রগণকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার পরে তোমরা কিসের ইবাদত করবে?' তারা তখন বলেছিল, আমরা আপনার ইলাহ্-এর ও আপনার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের ইলাহ্-এরই ইবাদত করব। তিনি একমাত্র ইলাহ্ এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী।' সেই উম্মত অতীত হয়েছে– ওরা যা অর্জন করেছে তা ওদের, তোমরা যা অর্জন কর তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে কোন প্রশ্ন করা হবে না। তারা বলে, 'ইহুদী বা খৃস্টান হও, ঠিক পথ পাবে।' বল, বরং একনিষ্ঠ হয়ে আমরা ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করব এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্তে ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী। তোমরা যাতে ঈমান এনেছ তারা যদি সেরূপ ঈমান আনে তবে নিশ্চয় তারা সৎপথ পাবে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারা নিশ্চয়ই বিরুদ্ধভাবাপন্ন। তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্যে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। আমরা গ্রহণ করলাম আল্লাহ্র রং, রঙে আল্লাহ্ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? এবং আমরা তাঁরই ইবাদতকারী। বল, আল্লাহ্ সম্বন্ধে তোমরা কি আমাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? যখন তিনি আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক! আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের এবং আমরা তাঁর প্রতি অকপট। তোমরা কি বল যে, 'ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তার বংশধরগণ ইহুদী কিংবা খৃস্টান ছিল?

বল, 'তোমরা বেশি জান, না আল্লাহ্?' আল্লাহর নিকট হতে তার কাছে যে প্রমাণ আছে তা যে গোপন করে তার অপেক্ষা অধিকতর জালিম আর কে হতে পারে? তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন। (২ ঃ ১৩০-১৪০)

আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ইহুদী বা খৃস্টান হওয়ার অপবাদ থেকে মুক্ত করে সুস্পষ্টভাবে বলে দেন যে, তিনি একনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন এবং তিনি মুশরিকও ছিলেন না। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرٰهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ.

মানুষের মধ্যে ইবরাহীম (আ)-এর ঘনিষ্ঠতম তারা, যারা তাকে অনুসরণ করে।' তাঁর সময়ে যারা তাঁর অনুসারী ছিল এবং তার পরে যারা তাঁর দীন গ্রহণ করেছে। وَهٰذَا النَّبِيُّ (এবং এই নবী) অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা)। কেননা যেই দীনে-হানীফকে আল্লাহ ইবরাহীম (আ)-এর জন্যে মনোনীত করেছিলেন সেই দীনে-হানিফকেই তিনি মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য মনোনীত করেছেন। তদুপরি মুহাম্মদ (সা)-এর দীনকে তিনি পূর্ণতা দান করেছেন এবং তাঁকে এমন সব নিয়ামত দান করেছেন যা অন্য কোন নবী বা রাসূলকে ইতিপূর্বে দান করেননি।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ . دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا . وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لَا شَرِيكَ لَهُ . وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ .

বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সু-প্রতিষ্ঠিত দীন ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বল, আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশে। তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি এরূপই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম। (৬ ঃ ১৬১-১৬৩)

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

إِنَّ إِبْرٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلّٰهِ حَنِيفًا وَّلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ . اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ . وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ . ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرٰهِيمَ حَنِيفًا - وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ .

ইবরাহীম ছিল এক 'উম্মত' আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও সে নিশ্চয়ই সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (১৬ ঃ ১২০-১২৩)

ইমাম বুখারী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) কা'বা ঘরের মধ্যে প্রাণীর ছবি দেখে তাতে প্রবেশ করেননি। অতঃপর তাঁর হুকুমে সেগুলো মুছে ফেলা হয়। তিনি কা'বাঘরে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মূর্তির হাতে জুয়ার তীর দেখতে পান। এ দেখে তিনি বলেন, যারা এরূপ বানিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ নিপাত করুক। আল্লাহর কসম, তারা দু'জনের কেউই জুয়ার তীর বের করেন নি। আয়াতে উল্লিখিত উম্মাত (امة) অর্থ নেতা ও পথপ্রদর্শক। যিনি মঙ্গলের দিকে মানুষকে আহ্বান করেন এবং সে ব্যাপারে তাঁকে অনুসরণ করা হয়। قَانِتًا لِّلّٰهِ এর অর্থ সর্বাবস্থায়—চলাফেরার প্রতি মুহূর্তে আল্লাহকে ভয় করে চলা حَنِيفًا অর্থ অন্তর্দৃষ্টির সাথে আন্তরিক হওয়া।

شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . অর্থ সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে পালন কর্তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যথা অন্তর, জিহ্বা ও কর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে। اِجْتَبَاهُ। অর্থ

আল্লাহ তাঁকে নিজের জন্যে মনোনীত করেন। রিসালাতের দায়িত্ব দেয়ার জন্যে বাছাই করেন। নিজের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তাঁকে দান করেন।

আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا - وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.

দীনের ব্যাপারে সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কে উত্তম, যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে। আল্লাহ ইবরাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (৪ ঃ ১২৫)

এখানে আল্লাহ হযরত ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করার জন্যে উৎসাহিত করেছেন। কেননা, তিনি ছিলেন মজবুত দীন ও সরল পথের উপর সু-প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তাঁকে যা যা করার আদেশ দিয়েছিলেন তিনি তার সব কিছুই যথাযথভাবে পালন করেছেন। আল্লাহ নিজেই তাঁর প্রশংসায় বলেছেন وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (এবং ইবরাহীমের কিতাবে, সে পালন করেছিল তার দায়িত্ব (৫৩ ঃ ৩৭)। এ কারণেই আল্লাহ তাঁকে খলীল রূপে গ্রহণ করেন। খলীল বলা হয় সেই বন্ধুকে যার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা থাকে। যেমন কোন কবি বলেছেন ঃ

قد تخللت مسلك الروح منى- وبذا سمى الخليل خليلا

অর্থাৎ—আমার অন্তরকে সে ভালবাসা দিয়ে জয় করে নিয়েছে আর এ কারণেই অন্তরঙ্গ বন্ধুকে খলীল বলা হয়। অনুরূপভাবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-ও আল্লাহর খলীল হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। সহীহ্ বুখারী, মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে জুনদুব আল-বাজালী, আবদুল্লাহ ইবন আমর ও ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত।

রাসূল (সা) বলেছেন ঃ হে জনমণ্ডলী! জেনে রেখো আল্লাহ আমাকে তাঁর খলীলরূপে গ্রহণ করেছেন, যেভাবে তিনি ইবরাহীমকে খলীল রূপে গ্রহণ করেছিলেন ঃ

ايها الناس ان الله اتخذنى خليلا كما اتخذ ابرهيم خليلا.

জীবনের শেষ ভাষণে রাসূল (সা) বলেছিলেন ঃ

ايها الناس لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لا تخذت ابا بكر خليلا - ولكن صاحبكم خليل الله.

'হে জনগণ! পৃথিবীর অধিবাসীদের মধ্যে কাউকে যদি আমি খলীল হিসাবে গ্রহণ করতাম, তবে অবশ্যই আবূ বকর (রা)-কে আমার খলীল বানাতাম। কিন্তু তোমাদের এই সাথী আল্লাহর খলীল।'

এ হাদীস বুখারী ও মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা), ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইব্ন মাসউদ (রা) সূত্রে এ হাদীসখানা অন্যান্য কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারীতে আমর ইব্ন মায়মূন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত মু'আয (রা) ইয়ামানে গমন করেন। তখন সবাইকে নিয়ে ফজরের সালাত

আদায় করেন এবং কিরাআতে এ আয়াতে তিলাওয়াত করেনঃ واتخذ الله ابرهيم خليلا (আল্লাহ ইবরাহীমকে খলীলরূপে গ্রহণ করেন) তখন উপস্থিত একজন বললেন, ইবরাহীমের মায়ের চোখ কতই না শীতল হয়েছিল। ইব্‌ন মারদূয়েহ (র) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা রাসূল (সা)-এর কতিপয় সাহাবা তাঁর জন্য অপেক্ষমাণ দিলেন। এক পর্যায়ে তিনি বের হয়ে আসেন। কাছাকাছি এলে তিনি শুনতে পান—এরা যেন কিছু একটা বলাবলি করছেন। তখন সেখানে থেমে গিয়ে তিনি তাদের থেকে শুনতে পান যে, কেউ একজন বলছেন, কী আশ্চর্য! আল্লাহ তাঁরই সৃষ্টি মানুষের মধ্য থেকে 'খলীল' বানিয়েছেন—ইবরাহীম তাঁর খলীল। আর একজন বলছেন, কী আশ্চর্য! আল্লাহ মূসার সাথে কথাবার্তা বলেছেন। অপরজন বলছেন, ঈসা তো আল্লাহর রূহ্ ও কালিমাহ্। অন্য আর একজন বলছেন, আদম (আ)-কে আল্লাহ বাছাই করে নিয়েছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সম্মুখে আসেন এবং বলেন, আমি তোমাদের কথাবার্তা ও বিস্মিত হওয়ার কথা শুনতে পেয়েছি। ইবরাহীম (আ) আল্লাহর খলীল, তিনি তা-ই ছিলেন, মূসা (আ) আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন তিনিও তা-ই ছিলেন, ঈসা (আ) আল্লাহর রূহ্ ও কালিমাহ্ তিনি ঠিক তা-ই ছিলেন। আদম (আ)-কে আল্লাহ বাছাই করেছিলেন, এবং তিনি তেমনই ছিলেন। জেনে রেখ, আমি আল্লাহর হাবীব (পরম বন্ধু) এতে আমার কোন অহংকার নেই। জেনে রেখ, আমিই প্রথম সুপারিশকারী এবং আমার সুপারিশই প্রথম শোনা হবে, এতে আমার কোন অহংকার নেই। আমিই সে ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার কড়া নাড়বে। অতঃপর তা খুলে আমাকে ভিতরে প্রবেশ করানো হবে। তখন আমার সাথে থাকবে দরিদ্র মুমিনগণ; কিয়ামতের দিন প্রাথমিক যুগের ও শেষ যুগের সকল মানুষের মধ্যে সবচাইতে সম্মানিত আমিই, এতে আমার কোন অহংকার নেই। এই সনদে হাদীসটি 'গরীব' পর্যায়ের বটে। তবে অন্যান্য সনদে এর সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

হাকিম (র) তাঁর 'মুসতাদরাকে' ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উল্লেখ করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ তোমরা কি অস্বীকার করতে পারবে যে, খলীল হওয়ার সৌভাগ্য হযরত ইবরাহীম (আ)-এর। আল্লাহর সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য হযরত মূসা (আ)-এর এবং আল্লাহর দীদার লাভের সৌভাগ্য মুহাম্মদ (সা)-এর। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইসহাক ইব্‌ন বাশ্‌শার (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, আল্লাহ যখন ইবরাহীম (আ)-কে খলীলরূপে বরণ করে নেন, তখন তাঁর অন্তরের মধ্যে ভীতি গেঁড়ে বসে, এমনকি পাখি যেমন আকাশে ওড়ার সময় ডানা ঝাপটানোর আওয়াজ হয় তেমনি তাঁর অন্তর থেকে উৎপন্ন ভীতির আওয়াজ দূর থেকে শোনা যেত। উবায়দ ইবন উমায়র (রা) বলেন, ইবরাহীম (আ) সর্বদাই অতিথি আপ্যায়ন করতেন। একদিন তিনি অতিথির সন্ধানে ঘর থেকে বের হলেন । কিন্তু কোন অতিথি পেলেন না। অবশেষে ঘরে ফিরে এসে দেখেন একজন মানুষ ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওহে আল্লাহর বান্দা! আমার বিনা অনুমতিতে কে তোমাকে আমার ঘরে প্রবেশ করাল? লোকটি বলল, এ ঘরের মালিকের অনুমতিক্রমেই আমি এতে প্রবেশ করেছি। ইবরাহীম (আ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পরিচয় কী? সে বলল, আমি রূহ কবজকারী মালাকুল মওত। আমাকে আমার প্রতিপালক তাঁর এক বান্দার নিকট এই সু-সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, তাঁকে আল্লাহ খলীল রূপে গ্রহণ করেছেন। ইবরাহীম (আ) বললেন, সেই বান্দাটি কে? আল্লাহর কসম, এ সংবাদটি যদি আমাকে দিতে! তিনি কোন দূরতম এলাকায় অবস্থান করলেও আমি

তাঁর নিকট যেতাম এবং আমৃত্যু সেখানেই অবস্থান করতাম। মালাকুল মওত বললেন— আপনিই হচ্ছেন সেই বান্দা। ইবরাহীম (আ) বললেন, আমি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আপনিই। ইবরাহীম (আ) বললেন, আল্লাহ আমাকে কি কারণে তাঁর খলীলরূপে গ্রহণ করলেন? তিনি জবাব দিলেন, কারণ এই যে, আপনি মানুষকে দান করেন, তাদের কাছে কিছু চান না। ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর এই গুণের কথা উল্লেখ করে কুরআনের বহু স্থানে তাঁর প্রশংসা করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, কুরআনের পঁয়ত্রিশ জায়গায় এর উল্লেখ রয়েছে। তন্মধ্যে কেবল সূরা বাকারায় পনের জায়গায় তার উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইব্‌রাহীম (আ) সেই পাঁচজন উলুল-'আয্‌ম (দৃঢ় প্রতিজ্ঞ) নবীর অন্যতম, নবীগণের মধ্যে যাঁদের নাম আল্লাহ তা'আলা কুরআনের দুইটি সূরায় অর্থাৎ সূরা আহযাব ও সূরা শূরায় বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আয়াত দু'টি হলো ঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَإِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيْثَاقًا غَلِيْظًا .

স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম এবং তোমার নিকট থেকেও এবং নূহ, ইব্‌রাহীম, মূসা এবং ঈসা ইব্‌ন মারয়ামের নিকট থেকে। আমি তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার। (সূরা আহযাব ঃ ৭)

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا . وَالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ - وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ-

আল্লাহ তোমাদের জন্যে বিধিবদ্ধ করেছেন সেই দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ্‌কে, আর যা ওহীর মাধ্যমে পাঠিয়েছি তোমার নিকট এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ কথা বলে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে মতভেদ কর না। (সূরা শূরা ঃ ১৩)

উক্ত পাঁচজন উলুল আয্‌ম নবীদের মধ্যে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পরেই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্থান। (মি'রাজ রজনীতে) তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সপ্তম আকাশের উপরে বায়তুল মা'মূরে হেলান দেয়া অবস্থায় দেখেছিলেন। যেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা ইবাদত করার জন্যে প্রবেশ করেন এবং আর কখনও দ্বিতীয়বার সেখানে প্রবেশের সুযোগ তাঁদের আসে না। আর শূরায়ক ইব্‌ন আবূ নুমায়র হযরত আনাস (রা) সূত্রে মি'রাজ সম্পর্কের হাদীসে যে বর্ণনা করেছেন, ইবরাহীম (আ) ষষ্ঠ আকাশে এবং মূসা (আ) সপ্তম আকাশে ছিলেন, উক্ত হাদীসে রাবী শূরায়ক-এর ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন। সুতরাং প্রথম হাদীসই সঠিক ও বিশুদ্ধ।

ইমাম আহমদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

ان الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خليل.

একজন সম্মানিত পুত্র যার পিতাও ছিল সম্মানিত। তার পিতাও ছিল সম্মানিত এবং তার পিতাও ছিল সম্মানিত। এরা হল ইউসুফ, তার পিতা ইয়াকূব। তার পিতা ইসহাক এবং তার পিতা ইবরাহীম খলীল (আ)। ইমাম আহমদ (র) এ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত মূসা (আ) থেকে হযরত ইবরাহীম (আ) যে শ্রেষ্ঠ এ বিষয়টি নিম্নোক্ত হাদীসের দ্বারা প্রতীয়মান হয়। যেখানে বলা হয়েছে ঃ

واخرت الثالثة ليوم يرغب الى الخلق كلهم حتى ابراهيم .

অর্থাৎ 'তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি আমাকে দান করা হয়েছে তা সেইদিন দেয়া হবে, যেই দিন সমস্ত মানুষ আমার প্রতি আকৃষ্ট হবে, এমনকি ইবরাহীমও।'

এ হাদীস ইমাম মুসলিম উবাই ইব্ন কা'ব (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর তাহল 'মাকামে মাহ্মূদ'। রাসূল (সা) পূর্বেই তা জানিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে, 'কিয়ামতের দিন আমি হব বনী আদমের সর্দার এবং এতে আমার অহংকার নেই।' ঐ হাদীসে এর পর বলা হয়েছে যে, মানুষ সুপারিশ পাওয়ার জন্যে আদম (আ)-এর কাছে যাবে, তারপর নূহ, তারপরে ইব্রাহীম, তারপরে মূসা ও তারপরে ঈসা (আ)-এর কাছে যাবে। প্রত্যেকেই সুপারিশ করতে অস্বীকার করবেন। সবশেষে মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে যাবে। তখন তিনি বলবেন, 'আমিই এর যোগ্য। এটা আমারই কাজ।' বুখারী শরীফে বিভিন্ন জায়গায় এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ ইব্ন উমর আল আমরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করা হয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অধিক সম্মানিত মানুষ কে? রসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ অধিকতর মুত্তাকী ব্যক্তি। তাঁরা বললেন ঃ আমরা আপনাকে এ কথা জিজ্ঞেস করি নাই। পরে তিনি বললেন, তা হলে ইউসুফ; যিনি আল্লাহর নবী, তাঁর পিতাও আল্লাহর নবী, তাঁর পিতাও আল্লাহ্র নবী এবং তাঁর পিতা আল্লাহ্র খলীল। সাহাবাগণ বললেন ঃ আমরা এটাও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবদের উৎসসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? তবে শোন ঃ জাহিলী যুগে যারা উত্তম ছিল, ইসলামী যুগেও তারাই উত্তম, যদি তারা ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন হয়। বুখারী, নাসাঈ ও আহমদ (র) বিভিন্ন সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ হাশরের ময়দানে মানুষকে নগ্ন পায়ে, উলঙ্গ ও খাত্নাবিহীন অবস্থায় উঠান হবে। সর্বপ্রথম ইব্রাহীম (আ)-কে কাপড় পরান হবে। এরপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন ঃ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ

'যে অবস্থায় আমি প্রথমে সৃষ্টি করেছি ঐ অবস্থায়ই পুনরায় উঠাব।' (২১ আম্বিয়া ঃ ১০৪)

ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) উভয়েই এ হাদীসটি ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর এই বিশেষ ফযীলত ও সম্মানের কারণে তিনি 'মাকামে মাহ্মূদের

অধিকারীর' তুলনায় অধিক সম্মানিত হয়ে যাননি। যে মাকামে মাহমূদের জন্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই ঈর্ষান্বিত হবেন।

ইমাম আহমদ (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূল (সা)-কে সম্বোধন করে বলল, يا خير البرية (হে সৃষ্টিকুলের সেরা!) রাসূল (সা) বললেন, তিনি হলেন হযরত ইব্রাহীম (আ)। ইমাম মুসলিমও এ হাদীসটি বিভিন্ন মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী (র) একে সহীহ্ ও হাসান বলেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ কথাটি আপন পিতৃ-পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সম্মানার্থে বিনয় প্রকাশ স্বরূপ বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ অন্য নবীদের উপরে তোমরা আমাকে প্রাধান্য দিও না (لاتفضلوني على الانبياء)। তিনি আরও বলেছেন ঃ তোমরা আমাকে মূসার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো না। কারণ, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে। অতঃপর সর্বপ্রথম আমার হুঁশ ফিরে আসবে। কিন্তু আমি উঠে দেখতে পাব মূসা (আ) আল্লাহর আরশের স্তম্ভ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জানি না, মূসা (আ) কি আমার পূর্বেই হুঁশপ্রাপ্ত হবেন, না কি তূর পাহাড়ে বেহুঁশ হওয়ার বদলাস্বরূপ এ রকম করা হবে? এই সব বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মদ (সা)-এর কিয়ামতের দিন বনী আদমের শ্রেষ্ঠ সন্তান ও সর্দার হওয়াতে কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। কেননা, মুতাওয়াতির সূত্রে একথা প্রমাণিত যে, কিয়ামতের দিন তিনিই হবেন سيد ولد ادم তথা মানবকুল শ্রেষ্ঠ।

অনুরূপভাবে মুসলিম শরীফে উবাই ইব্ন কা'ব সূত্রে বর্ণিত হাদীস—'আমাকে যে তিনটি বিশেষত্ব দান করা হয়েছে তার তৃতীয়টি সেদিন দেয়া হবে, যেদিন সকল মানুষ আমার প্রতি আকৃষ্ট হবে। এমনকি ইব্রাহীমও।' এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পরেই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও উলুল-আয্ম রাসূল প্রমাণিত হবার কারণে সালাতের মধ্যে তাশাহ্হুদে ইব্রাহীম (আ)-এর উল্লেখ করতে মুসল্লীদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। যেমন বুখারী ও মুসলিমে কা'ব ইব্ন আজুরা (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে। কা'ব বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম তো আমরা জানি, কিন্তু আপনার প্রতি সালাত কীভাবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা বলবে ঃ

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.

(হে আল্লাহ্! মুহাম্মদের প্রতি ও তাঁর পরিবার বর্গের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন যেমনি আপনি ইবরাহীমের উপর ও তাঁর পরিবারবর্গের উপরে রহমত বর্ষণ করেছিলেন। আর মুহাম্মদের প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি বরকত দান করুন। যেমনি আপনি ইব্রাহীমের উপর ও তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি বরকত দান করেছিলেন। আপনি অত্যধিক প্রশংসিত ও সম্মানিত)।

আল্লাহ্র বাণী ঃ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ "আর ইব্রাহীম তার দায়িত্ব পূর্ণ করেছিল।" অর্থাৎ তাঁকে যত প্রকার হুকুম করা হয়েছিল তিনি তার সবগুলোই পালন করেছিলেন। ঈমানের সমস্ত গুণাগুণ ও সকল শাখা-প্রশাখা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। কোন বড় ও জটিল সমস্যাই তাঁকে কোন ছোট হুকুম পালনেও বাধা দিতে পারেনি এবং বড় ধরনের হুকুম পালনের ক্লান্তি তাকে ছোট ধরনের হুকুম পালনে বিরত রাখেনি। আবদুর রায্যাক (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নিম্নের আয়াত وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ . (স্মরণ কর, ইবরাহীমকে তার প্রতিপালক কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা নিলে তিনি সবগুলোই পূরণ করেন)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ইব্রাহীমকে মাথা সংক্রান্ত পাঁচ প্রকার, পবিত্রতা এবং দেহের অবশিষ্ট অংশ সংক্রান্ত পাঁচ প্রকার পবিত্রতার হুকুম দ্বারা পরীক্ষা করেছেন। মাথার পাঁচ প্রকার এই ঃ (১) গোঁফ কাটা (২) কুলি করা (৩) মিস্ওয়াক করা (৪) পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা (৫) মাথার চুলের সিঁথি কাটা। অবশিষ্ট শরীরের পাঁচ প্রকার হল (১) নখ কাটা (২) নাভীর নীচের পশম মুণ্ডন (৩) খাত্না করা (৪) বগলের পশম উঠান (৫) পেশাব-পায়খানার পর পানি দ্বারা শৌচ করা। ইব্ন আবূ হাতিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবদুর রায্যাক বলেন, সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিব, মুজাহিদ, শা'বী, নখঈ, আবূ সালিহ্ ও আবুল জালদও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ মানুষের স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা পাঁচটি (১) খাত্না করা (২) ক্ষৌর কর্ম করা (৩) গোঁফ কাটা (৪) নখ কাটা (৫) বগলের পশম উঠান। সহীহ মুসলিম ও সুনান গ্রন্থাদিতে আয়েশা (রা) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, স্বভাবগত পরিচ্ছন্নতা দশটি (১) গোঁফ ছাঁটা (২) দাড়ি লম্বা হতে দেয়া (৩) মিসওয়াক করা (৪) পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা (৫) নখ কাটা (৬) দেহের গ্রন্থি পানি দ্বারা ধোয়া (৭) বগলের পশম উঠান (৮) নাভীর নীচের অংশে ক্ষৌর করা। (৯) পানি দ্বারা ইসতিনজা করা (১০) খাত্না করা। খাত্নার সময়ে তাঁর (ইব্রাহীম (আ)-এর) বয়স সম্পর্কে আলোচনা পরে আসছে। যাই হোক নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সাথে ইবাদত-বন্দেগী হযরত ইবরাহীম (আ)-কে শরীরের যত্ন নেয়া, প্রত্যেক অংগ-প্রত্যংগের হক আদায় করা, সৌন্দর্য রক্ষা করা এবং যে জিনিসগুলো ক্ষতিকর ছিল যথা ঃ অধিক পরিমাণ চুল, বড় নখ, দাঁতের ময়লা ও দাগ দূর করা থেকে অমনোযোগী করে রাখত না। সুতরাং এ বিষয়গুলোও আল্লাহ্ কর্তৃক ইবরাহীমের প্রশংসা (وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ) (ইব্রাহীম তার কর্তব্য বাস্তবায়ন করেছে)-এর অন্তর্ভুক্ত।

জান্নাতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রাসাদ

হাফিজ আবূ বকর আল বায্যার (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ জান্নাতের মধ্যে মনি-মুক্তা দ্বারা নির্মিত একটি অতি মনোরম প্রাসাদ রয়েছে। কোন ভাংগাচুরা বা ফাটল তাতে নেই। আল্লাহ তাঁর খলীলের জন্যে এটি তৈরি করেছেন। আল্লাহ্র মেহমান হিসেবে তিনি তাতে থাকবেন। বায্যার (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর বায্যার (র) বলেন, এই হাদীসের বর্ণনাকারী হামমাদ ইব্ন সালামা

থেকে কেবল য়াযীদ ইব্‌ন হারুন ও নযর ইব্‌ন শুমায়লী মারফূ হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ঐ দু'জন বাদে অন্য সবাই মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই ত্রুটি না থাকলে হাদীসটি সহীহ্-এর শর্তে উত্তীর্ণ হতো, কিন্তু ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) এটি বর্ণনা করেননি।

ইবরাহীম (আ)-এর আকৃতি-অবয়ব

ইমাম আহমদ (র) জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার সম্মুখে পয়গম্বরগণকে পেশ করা হয়। তন্মধ্যে মূসা (আ) শানুয়া গোত্রের লোকদের অনুরূপ দেখতে পাই। ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ)-কে অনেকটা উরওয়া ইব্‌ন মাসউদের মত এবং ইব্‌রাহীম (আ)-কে অনেকটা দাহ্‌য়া কালবীর মত দেখতে পাই। এ সনদে ও এ পাঠে ইমাম আহমদ (র) একাই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র) আসওয়াদ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আমি ঈসা ইব্‌ন মারয়াম, মূসা ও ইব্‌রাহীম (আ)-কে দেখেছি। তন্মধ্যে ঈসা (আ) ছিলেন গৌরবর্ণ, চুল ঘন কাল, বক্ষদেশ প্রশস্ত। আর মূসা (আ) ছিলেন ধূসরবর্ণ ও বলিষ্ঠ দেহী। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ আর ইব্‌রাহীম (আ)? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমাদের সাথীর দিকে তাকাও অর্থাৎ তাঁর নিজের দিকে ইঙ্গিত করেন। ইমাম বুখারী মুজাহিদ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে শুনেছেন যে, লোকজন তাঁর সম্মুখে দাজ্জালের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছিল এবং বলছিল, দাজ্জালের চক্ষুদ্বয়ের মধ্যখানে লিখিত থাকবে কাফির (ك-ف-ر)। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এ কথা শুনি নাই। বরং তিনি বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ)-কে যদি দেখতে চাও, তবে তোমাদের সাথীর প্রতি তাকাও। আর মূসা (আ) হলেন, ঘনচুল, ধূসর রং বিশিষ্ট। তিনি একটি লাল উটের উপর উপবিষ্ট—যার নাকের রশি খেজুর গাছের ছালের তৈরি। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি তিনি এ অবস্থায় উপত্যকার দিকে নেমে আসছেন। বুখারী ও মুসলিম (র) এ হাদীসটি ভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী (র) 'কিতাবুল হজ্জ' ও 'কিতাবুল লিবাসে' এবং মুসলিম (র)ও আবদুল্লাহ ইব্‌ন আওন সূত্রে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-এর ইনতিকাল ও তাঁর বয়স প্রসঙ্গ

ইব্‌ন জারীর (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত ইব্‌রাহীম (আ) নমরূদ (ইব্‌ন কিনআন)-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, এই নমরূদই ছিল প্রসিদ্ধ বাদশাহ যাহ্‌হাক। সে দীর্ঘ এক হাজার বছর যাবত বাদশাহী করেছিল বলে মনে করা হয়ে থাকে। তার শাসন আমল ছিল জুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ। কোন কোন ইতিহাসবিদের মতে, এই নমরূদ ছিল বনূ রাসিব গোত্রের লোক। এই গোত্রেই হযরত নূহ (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন। নমরূদ ঐ সময় সমগ্র দুনিয়ার বাদশাহ ছিল। ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেছেন, একদা আকাশে একটি নক্ষত্র উদিত হয়। তার জ্যোতির সম্মুখে সূর্য ও চন্দ্র নিষ্প্রভ হয়ে যায়। এ অবস্থায় লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। নমরূদ বিচলিত হয়ে দেশের সব গণক ও জ্যোতির্বিদদের একত্র করে

এর কারণ জিজ্ঞেস করে। তারা জানাল, আপনার রাজত্বের মধ্যে এমন এক শিশুর জন্ম হবে যার হাতে আপনার বাদশাহীর পতন ঘটবে। নমরূদ তখন রাজ্যব্যাপী ঘোষণা দিল, এখন থেকে কোন পুরুষ স্ত্রীর কাছে যেতে পারবে না এবং এখন থেকে কোন শিশুর জন্ম হলে তাকে হত্যা করা হবে। এতদসত্ত্বেও হযরত ইব্রাহীম (আ) ঐ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ তাঁকে হিফাজত করেন ও পাপিষ্ঠদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন। তিনি তাঁকে উত্তমভাবে লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন। ক্রমশ বড় হয়ে তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন, যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্মভূমি ছিল 'সূস' কারও মতে বাবেল, কারও মতে কূছায়[১]-এর পার্শ্ববর্তী সাওয়াদ নামক এক গ্রাম। ইতিপূর্বে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আ) দামেশকের পূর্ব পার্শ্বে বারযাহ্ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। আল্লাহ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর হাতে নমরূদের পতন ঘটাবার পর তিনি প্রথমে হারানে এবং পরে সেখান থেকে শাম দেশে হিজরত করেন এবং সেখান থেকে ঈলিয়ায় গিয়ে বসবাস করেন। অতঃপর ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-এর জন্ম হয়। তারপর কিনআনের অন্তর্গত হিবরূন নামক স্থানে সারাহ্র ইনতিকাল হয়। আহলে কিতাবগণ উল্লেখ করেছেন, মৃত্যুকালে সারাহ্র বয়স হয়েছিল একশ' সাতাশ বছর। ইব্রাহীম (আ) সারাহ্র মৃত্যুতে অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং দুঃখ প্রকাশ করেন। বনূ হায়ছ গোত্রের আফরূন ইব্ন সাখার নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে চারশ' মিছকালের বিনিময়ে তিনি একটি জায়গা ক্রয় করেন এবং সারাহ্কে সেখানে দাফন করেন। এরপর ইব্রাহীম (আ)-এর পুত্র ইসহাককে রুফাকা বিনত বাতূঈল ইব্ন নাহূর ইব্ন তারাহ্-এর সাথে বিবাহ করান। পুত্রবধুকে আনার জন্যে তিনি নিজের ভৃত্যকে পাঠিয়ে দেন। সে রুফাকা ও তার দুধ-মা ও দাসীদেরকে উটের উপর সওয়ার করে নিয়ে আসে।

আহলি কিতাবদের বর্ণনা ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) অতঃপর কানতুরা নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেন এবং তাঁর গর্ভে যামরান, ইয়াকশান, মাদান, মাদয়ান, শায়াক ও শূহ্-এর জন্ম হয়। এদের প্রত্যেকের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কেও বিবরণ রয়েছে।

ইব্ন আসাকির বিভিন্ন প্রাচীন পণ্ডিতদের বরাতে ইবরাহীম (আ)-এর কাছে মালাকুল মওতের আগমন সম্পর্কে আহলে কিতাবদের উপাখ্যানসমূহ বর্ণনা করেছেন। সঠিক অবস্থা আল্লাহই ভাল জানেন। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর মত হযরত ইবরাহীম (আ)-ও আকস্মিকভাবে ইনতিকাল করেন। কিন্তু আহলে কিতাব ও অন্যদের বর্ণনা এর বিপরীত। তাঁরা বলেছেন, ইবরাহীম (আ) পীড়িত হয়ে একশ' পঁচাত্তর বছর মতান্তরে একশ' নব্বই বছর বয়সে ইনতিকাল করেন এবং আফরান হায়ছীর সেই জমিতে তাঁর সহধর্মিনী সারাহ্র কবরের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। ইসমাঈল (আ) ও ইসহাক (আ)

---

(১) মু'জামুল বুলদান কিতাবে এর নাম লেখা হয়েছে 'কূছা' كاف এর উপর পেশ, واو সাকিন, ثا এর উপর যবর ও শেষে আলিফে মাকসূরা ياء সহ লেখা হয়ে থাকে। যেহেতু এটা চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ। কূছায় নামে তিনটি জায়গা আছে (১) সাওয়াদুল ইরাকে (২) বাবেলে (৩) মক্কায়। ইরাকের কূছায় দুটি (১) কূছায় তারীক (২) কূছায় রীবী। এটাই ইব্রাহীম (আ)-এর স্মৃতি বিজড়িত স্থান এবং এখানেই তাঁর জন্ম হয়। এ দু'টি স্থানই বাবেলে অবস্থিত। এখানেই ইব্রাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। উক্ত দু'টি কূছায় বাবেলের দুই প্রান্তে অবস্থিত।

উভয়ে দাফনকার্য সম্পাদন করেন। ইবনুল-কালবী বলেছেন, ইবরাহীম (আ) দু'শ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। আবূ হাতিম ইব্ন হিব্বান তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে মুফাযযল... আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, হযরত ইবরাহীম (আ) বাটালীর সাহায্যে খাত্না করান। তখন তাঁর বয়স ছিল একশ' বিশ বছর। এরপর তিনি আশি বছর কাল জীবিত থাকেন। হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে এ হাদীসখানা 'মওকূফ'ভাবে বর্ণনা করেছেন।

তারপর ইব্ন হিব্বান (র) এ হাদীস যারা মারফূ'ভাবে বর্ণনা করেছেন তাদের বর্ণনাকে বাতিল বলে অভিহিত করেছেন, যেমন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম (সা) বলেছেন, ইবরাহীম (আ) যখন একশ' বিশ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন খাতনা করান এবং এরপর আশি বছর জীবিত থাকেন। আর তিনি কাদূম (ছুঁতারের বাইস) দ্বারা খাত্না করিয়েছিলেন। হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ) যখন খাত্না করান তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর। ইব্ন হিব্বান আবদুর রায্যাক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কাদূম একটা গ্রামের নাম। আমার জানা মতে 'সহীহ' গ্রন্থে যা এসেছে তা এই যে, ইবরাহীম (আ) যখন খাত্না করান তখন তিনি আশি বছর বয়সে পৌঁছেন। অন্য বর্ণনায় তাঁর বয়স ছিল আশি বছর। এ দু'টি বর্ণনার কোনটিতেই এ কথা নেই যে, তিনি পরে কত দিন জীবিত ছিলেন। আল্লাহই সম্যক অবগত। মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল 'তাফসীরে ওকী'র মধ্যে 'যিয়াদাত' থেকে উদ্ধৃত করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম পায়জামা পরিধান করেন, সর্বপ্রথম মাথার চুলে সিঁথি কাটেন, সর্বপ্রথম ক্ষৌর কর্ম করেন, সর্বপ্রথম খাত্না করান কাদূমের সাহায্যে। তখন তাঁর বয়স ছিল একশ' বিশ বছর এবং তারপরে আশি বছর জীবিত থাকেন। তিনিই সর্বপ্রথম অতিথিকে আহার করান, সর্বপ্রথম প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হন। এ মওকূফ হাদীসটি মারফূ' হাদীসেরই অনুরূপ। ইব্ন হিব্বান (র) এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন।

ইমাম মালিক (র) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন। ইবরাহীম (আ)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি অতিথিকে আহার করান এবং প্রথম মানুষ যিনি খাত্না করান, সর্বপ্রথম তিনিই গোঁফ ছাঁটেন, সর্বপ্রথম তিনিই প্রৌঢ়ত্বের শুভ্রতা প্রত্যক্ষ করেন। ইবরাহীম (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এটা কী? আল্লাহ বললেন, এ হল মর্যাদা। ইবরাহীম (আ) বললেন, হে প্রতিপালক! তা হলে আমার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করে দিন। ইয়াহয়া ও সাঈদ ব্যতীত অন্য সবাই আরও কিছু বাড়িয়ে বলেছেন যেমন ঃ তিনিই সর্বপ্রথম লোক যিনি গোঁফ ছোট করেন, সর্বপ্রথম ক্ষৌরকর্ম করেন, সর্বপ্রথম পায়জামা পরিধান করেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কবর, তাঁর পুত্র ইসহাক (আ)-এর কবর ও তাঁর পৌত্র ইয়াকূব (আ)-এর কবর 'মুরাব্বা' নামক গোরস্তানে যা হযরত সুলায়মান ইব্ন দাঊদ (আ) হিবরূন (Hebron) শহরে তৈরি করেছিলেন। বর্তমানে এর নাম বালাদুল খলীল (খলীলের শহর)।[১] বনী ইসরাঈলের যুগ থেকে আমাদের এই যুগ পর্যন্ত বংশ ও জাতি পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে এ কথাই চলে আসছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কবর মুরাব্বাতে অবস্থিত। সুতরাং কথাটা যে সঠিক, তা নিশ্চিতভাবে বলা চলে। তবে কোন নির্ভরযোগ্য সূত্রে তাঁর কবর কোন্‌টি তা নির্ণিত হয়নি।

---

১. সম্প্রতিকালে শহরটি খলিলীয়া নামে পরিচিতি।

সুতরাং ঐ স্থান্‌টির যত্ন করা এবং তার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা সকলের কর্তব্য, এ স্থানটি পদদলিত করা উচিত নয়। কেননা, হতে পারে যে স্থানটি পদদলিত করা হচ্ছে তারই নিচে হযরত ইবরাহীম খলীল বা তাঁর কোন পুত্রের কবর রয়েছে। ইব্‌ন আসাকির ওহব ইব্‌ন মুনাব্বিহ সূত্রে বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কবরের কাছে একটি প্রাচীন শিলা পাওয়া গিয়েছে, যার উপর নিম্নলিখিত কবিতা লেখা রয়েছে ঃ

الهى جهولا امله -- يموت من جا اجله
ومن دنا من حتفه - لم تغن عنه حيله
وكيف يبقى اخر - من مات عنه اوله
والمرء لا يصحبه - فى القبر الا عمله

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যে ব্যক্তির নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসে তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলি দিয়ে মৃত্যুর কাছে সে আত্মসমর্পণ করে। মৃত্যু যার দুয়ারে এসে যায় তাকে কোন কলাকৌশল আর বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। পূর্বের লোকই যখন গত হয়ে গেছে, তখন আর শেষের লোক টিকে থাকে কোন্ উপায়ে। মানুষ তার কবরের সাথী নিজের আমল ভিন্ন কাউকেই পাবে না।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান-সন্ততি প্রসঙ্গ

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম সন্তান ইসমাঈল (আ)। যিনি মিসরের কিবতী বংশীয়া হাজেরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী তাঁর চাচাত বোন সারাহর গর্ভের দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তারপর হযরত ইবরাহীম (আ) কিনআনের কান্‌তূরা বিনত ইয়াকতানকে বিবাহ করেন। তাঁর গর্ভে ছয়টি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হলেন (১) মাদ্‌য়ান (২) যামরান (৩) সারাজ (৪) য়াকশান (৫) নাশুক (৬) এনামটি অজ্ঞাত। এরপর হযরত ইবরাহীম (আ) হাজুন বিন্‌ত আমীনকে বিবাহ করেন। এই পক্ষে পাঁচটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন ঃ (১) কায়সান (২) সুরাজ (৩) উমায়স (৪) লূতান (৫) লাফিস। আবুল কাসিম সুহায়লী তার 'আত-তা'রীফ ওয়াল আ'লাম' গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবদ্দশায় যে সব বড় বড় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তন্মধ্যে লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা ও তাদের উপর আল্লাহর আযাবের ঘটনা অন্যতম। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ হযরত লূত (আ) ছিলেন হারান ইব্‌ন তারাহ-এর পুত্র। এই তারাহকেই আযরও বলা হত। যা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। হযরত লূত ছিলেন ইবরাহীম খলীল (আ)-এর ভাতিজা। ইবরাহীম, হারান ও নাজূর এরা ছিলেন তিন ভাই যা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। হারানের বংশধরকে বনূ হারান বলা হয়। কিন্তু আহলে কিতাবদের ইতিহাস এ মত সমর্থন করে না। হযরত লূত (আ) চাচা ইবরাহীম খলীল (আ)-এর নির্দেশক্রমে গওর যাগার অঞ্চলে সাদ্দুম শহরে চলে যান। এটা ছিল ঐ অঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র। অনেক গ্রাম, মহল্লা ও ক্ষেত-খামার এবং

ব্যবসায়কেন্দ্র এ শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল। এখানকার অধিবাসীরা ছিল দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, পাপাসক্ত, দুশ্চরিত্র, সংকীর্ণমনা ও জঘন্য কাফির। তারা দস্যুবৃত্তি করতো। প্রকাশ্য মজলিসে অশ্লীল ও বেহায়াপনা প্রদর্শন করত। কোন পাপের কাজ থেকেই তারা বিরত থাকত না। অতিশয় জঘন্য ছিল তাদের কাজ-কারবার। তারা এমন একটি অশ্লীল কাজের জন্ম দেয় যা ইতিপূর্বে কোন আদম সন্তান করেনি। তাহল, নারীদেরকে ত্যাগ করে তারা সমকামিতায় লিপ্ত হয়। হযরত লূত (আ) তাদেরকে এক ও লা-শরীক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানান এবং এসব ঘৃণিত অভ্যাস, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা বর্জন করতে বলেন। কিন্তু তারা তাদের ভ্রান্তি, বিদ্রোহ, পাপ ও কুফরের প্রতি অবিচল থাকে। ফলে, আল্লাহ তাদের উপর এমন কঠিন আযাব নাযিল করলেন যা ফেরাবার সাধ্য কারোরই নেই, এ ছিল তাদের ধারণাতীত ও কল্পনাতীত শাস্তি। আল্লাহ তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দিলেন। বিশ্বের বিবেকবানদের জন্যে তা একটি শিক্ষাপ্রদ ঘটনা হয়ে থাকল। এ কারণেই আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সূরা আ'রাফে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ. اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ. بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ. اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ. فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ اِلَّا امْرَاَتَهٗ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ. وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ.

এবং লূতকে পাঠিয়েছিলাম। সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা এমন কুকর্ম করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি; তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্যে নারী ছেড়ে পুরুষের কাছে গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, 'এদেরকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা অতি পবিত্র হতে চায়।' তারপর তাকে ও তার স্ত্রী ব্যতীত তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করেছিলাম, তার স্ত্রী ছিল পেছনে রয়ে থাকা লোকদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের উপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। সুতরাং অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য কর! (৭ ঃ ৮০-৮৪)

সূরা হূদে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا. قَالَ سَلٰمٌ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ. فَلَمَّا رَاٰ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً. قَالُوْا لَا تَخَفْ اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ. وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ. وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ. قَالَتْ يٰوَيْلَتٰى ءَاَلِدُ وَاَنَا عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِىْ شَيْخًا. اِنَّ هٰذَا لَشَىْءٌ عَجِيْبٌ. قَالُوْٓا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكٰتُهٗ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ - اِنَّهٗ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ؟

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ. وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ.

قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي. أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ. قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ. بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ. إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ. إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ. أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ.

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.

আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদসহ ইবরাহীমের নিকট আসল। তারা বলল, 'সালাম'। সেও বলল, 'সালাম', সে অবিলম্বে এক কাবাব করা বাছুর আনল। সে যখন দেখল, তাদের হাত ঐটির দিকে প্রসারিত হচ্ছে না। তখন তাদেরকে অবাঞ্ছিত মনে করল এবং তাদের সম্বন্ধে তার মনে ভীতি সঞ্চার হল। তারা বলল, 'ভয় করো না, আমরা লূতের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।' তখন তার স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল এবং সে হাসল। তারপর আমি তাকে ইসহাকের ও ইসহাকের পরবর্তী ইয়াকূবের সুসংবাদ দিলাম। সে বলল, 'কি আশ্চর্য! সন্তানের মা হব আমি যখন আমি বৃদ্ধা এবং এই আমার স্বামী বৃদ্ধ! এটা অবশ্যই এক অদ্ভুত ব্যাপার। তারা বলল, 'আল্লাহর কাজে তুমি বিস্ময় বোধ করছ? হে পরিবারবর্গ! তোমাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও কল্যাণ। তিনি প্রশংসার্হ ও সম্মানার্হ।'

তারপর যখন ইবরাহীমের ভীতি দূরীভূত হল এবং তার নিকট সুসংবাদ আসল তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে আমার সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল। ইবরাহীম তো অবশ্যই সহনশীল। কোমল-হৃদয়, সতত আল্লাহ অভিমুখী। হে ইবরাহীম! এ থেকে বিরত হও। তোমার প্রতিপালকের বিধান এসে পড়েছে। ওদের প্রতি তো আসবে শাস্তি যা অনিবার্য এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের নিকট আসল তখন তাদের আগমনে সে বিষণ্ন হল এবং নিজেকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল এবং বলল, 'এটি নিদারুণ দিন'! তার সম্প্রদায় তার নিকট উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটে আসল এবং পূর্ব থেকে তারা কু-কর্মে লিপ্ত ছিল।

সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এরা আমার কন্যা, তোমাদের জন্যে এরা পবিত্র। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় করো না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই?' তারা বলল, 'তুমি তো জান, তোমার কন্যাদেরকে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই; আমরা কি চাই তা তো তুমি জানই।' সে বলল, তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি নিতে পারতাম কোন শক্তিশালী আশ্রয়! তারা বলল, হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত ফেরেশতা। ওরা কখনই তোমার নিকট পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং তুমি রাতের কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড় এবং তোমাদের মধ্যে কেউ পেছন দিকে তাকাবে না, তোমার স্ত্রী ব্যতীত। ওদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। প্রভাত ওদের জন্যে নির্ধারিত কাল। প্রভাত কি নিকটবর্তী নয়? ত

ারপর যখন আমার আদেশ আসল তখন আমি জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং তাদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পাথর-কংকর যা তোমার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত ছিল। এটি জালিমদের থেকে দূরে নয়। (১১ ঃ ৬৯-৮৩)

সূরা হিজরে আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا. قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُوْنَ . قَالُوْا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ عَلِيْمٍ . قَالَ اَبَشَّرْتُمُوْنِيْ عَلٰى اَنْ مَّسَّنِىَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُوْنَ . قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ. قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖۤ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ. قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ. قَالُوْۤا اِنَّاۤ اُرْسِلْنَاۤ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ. اِلَّاۤ اٰلَ لُوْطٍ. اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ . اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنَاۤ اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ.

فَلَمَّا جَآءَ اٰلَ لُوْطِ نِ الْمُرْسَلُوْنَ. قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ. قَالُوْا بَلْ جِئْنٰكَ بِمَا كَانُوْا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ. وَاَتَيْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ. فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَاتَّبِعْ اَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ وَّامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُوْنَ. وَقَضَيْنَاۤ اِلَيْهِ ذٰلِكَ الْاَمْرَ اَنَّ دَابِرَ هٰۤؤُلَاۤءِ مَقْطُوْعٌ مُّصْبِحِيْنَ.

وَجَآءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ. قَالَ اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ . وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ. قَالُوْۤا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ. قَالَ هٰۤؤُلَاۤءِ بَنٰتِىْۤ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ. لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَفِىْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ. فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ. وَاِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُّقِيْمٍ. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

এবং ওদেরকে বল, ইবরাহীমের অতিথিদের কথা, যখন ওরা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম', তখন সে বলেছিল, 'আমরা তোমাদের আগমনে আতংকিত।' ওরা বলল, 'ভয় করো না, আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের শুভ সংবাদ দিচ্ছি।' সে বলল, তোমরা কি আমাকে শুভ সংবাদ দিচ্ছ আমি বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও? তোমরা কী বিষয়ে শুভ সংবাদ দিচ্ছ? ওরা বলল, 'আমরা সত্য সংবাদ দিচ্ছি, সুতরাং তুমি হতাশ হয়ো না।' সে বলল, যারা পথভ্রষ্ট তারা ব্যতীত আর কে তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে হতাশ হয়? সে বলল, 'হে প্রেরিতগণ! তোমাদের আর বিশেষ কি কাজ আছে?' ওরা বলল, 'আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়েছে তবে লূতের পরিবারবর্গের বিরুদ্ধে নয়, আমরা অবশ্যই ওদের সকলকে রক্ষা করব। কিন্তু তার স্ত্রীকে নয়। আমরা স্থির করেছি যে, 'সে অবশ্যই পেছনে রয়ে যাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত।'

ফেরেশতাগণ যখন লূত পরিবারের কাছে আসল, তখন লূত বলল, তোমরা তো অপরিচিত লোক। তারা বলল, 'না ওরা সে বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিল, আমরা তোমার নিকট তাই নিয়ে এসেছি; 'আমরা তোমার কাছে সত্য সংবাদ নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্যবাদী, সুতরাং তুমি রাতের কোন এক সময়ে তোমার পরিবারবর্গসহ বের হয়ে পড় এবং তুমি তাদের পশ্চাদানুসরণ কর এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পেছন দিকে না তাকায়; তোমাদেরকে যেখানে যেতে বলা হচ্ছে তোমরা সেখানে চলে যাও। আমি তাকে এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ দিলাম যে, প্রত্যুষে ওদেরকে সমূলে বিনাশ করা হবে।

নগরবাসিগণ উল্লসিত হয়ে উপস্থিত হল। সে বলল, 'ওরা আমার অতিথি; সুতরাং তোমরা আমাকে বে-ইজ্জত করো না। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর ও আমাকে হেয় করো না।' তারা বলল, 'আমরা কি দুনিয়াশুদ্ধ লোককে আশ্রয় দিতে তোমাকে নিষেধ করিনি?' লূত বলল, 'একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তবে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে। তোমার জীবনের শপথ, ওরা তো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে। তারপর সূর্যোদয়ের সময়ে মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল; এবং আমি জনপদকে উল্টিয়ে উপর নিচ করে দিলাম এবং ওদের উপর প্রস্তর-কংকর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে। তা লোক চলাচলের পথের পাশে এখনও বিদ্যমান। অবশ্যই এতে মুমিনদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন। (১৫ ঃ ৫১-৭৭)

সূরা শু'আরায় আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ نِ الْمُرْسَلِيْنَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ. إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ. وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. أَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ. وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ. قَالُوْا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ.

قَالَ إِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيْنَ. رَبِّ نَجِّنِيْ وَأَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ. فَنَجَّيْنٰهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِيْنَ. إِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِيْنَ.

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ. إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَآيَةً. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

লূতের সম্প্রদায় রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল, যখন ওদের ভাই লূত ওদেরকে বলল, তোমরা কি সাবধান হবে না? আমি তো তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছেই আছে। 'সৃষ্টির মধ্যে তোমরা তো কেবল পুরুষের সাথেই উপগত হও এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীলোক সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা বর্জন করে থাক। তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' ওরা বলল, ' হে লূত! তুমি যদি নিবৃত্ত না হও, তবে অবশ্যই তুমি নির্বাসিত হবে।'

লূত বলল, 'আমি তোমাদের এ কাজকে ঘৃণা করি।' হে আমার প্রতিপালক! 'আমাকে এবং আমার পরিবার-পরিজনকে, ওরা যা করে তা থেকে রক্ষা কর।' অতঃপর আমি তাকে এবং তার পরিবার-পরিজন সকলকে রক্ষা করলাম। এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল পেছনে রয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর অপর সকলকে ধ্বংস করলাম। তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের জন্যে এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট! এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু ওদের অধিকাংশই মুমিন নয়। তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (২৬ ঃ ১৬০-১৭৫)

সূরা নামলে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ. بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوْا أَخْرِجُوْا آلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ. إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُوْنَ. فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَهَا مِنَ الْغَابِرِيْنَ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ.

স্মরণ কর, লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা জেনেশুনে কেন অশ্লীল কাজ করছ? তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্যে নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়। উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু বলল, লূত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়। তারপর তাকে ও তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম, তার স্ত্রী ব্যতীত; তাকে করেছিলাম ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের উপর ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম; যাদের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক! (২৭ ঃ ৫৪-৫৮)

সূরা আনকাবূতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ. أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُوْنَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمُ

الْمُنْكَرَ. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ . قَالَ رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَي الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ . وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيْمَ بِالْبُشْرَى قَالُوْا إِنَّا مُهْلِكُوْا أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ . إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ . قَالَ إِنَّ فِيْهَا لُوْطًا. قَالُوْا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ.

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ. إِنَّا مُنَجُّوْكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ. إِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ. وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ.

স্মরণ কর লূতের কথা, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, ' তোমরা তো এমন অশ্লীল কাজ করছ; যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। তোমরাই তো পুরুষে উপগত হচ্ছ। তোমরাই তো রাহাজানি করে থাক এবং তোমরাই তো নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে ঘৃণ্য কাজ করে থাক।' উত্তরে তার সম্প্রদায় শুধু এই বলল, 'আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নিয়ে এসো যদি তুমি সত্যবাদী হও।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।' যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ সুসংবাদসহ ইবরাহীমের কাছে আসল, তারা বলেছিল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করব। এর অধিবাসীরা তো জালিম। ইবরাহীম বলল, এই জনপদে তো লূত রয়েছে। তারা বলল, 'সেখানে কারা আছে তা আমরা ভাল জানি; আমরা তো লূতকে ও তার পরিবার-পরিজনবর্গকে রক্ষা করবই; তার স্ত্রী ব্যতীত; সে তো পেছনে রয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত।'

এবং যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আসল, তখন তাদের জন্যে সে বিষণ্ন হয়ে পড়ল এবং নিজকে তাদের রক্ষায় অসমর্থ মনে করল। তারা বলল, ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমরা তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে রক্ষা করব, তোমার স্ত্রী ব্যতীত; সে তো পেছনে রয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এই জনপদবাসীদের উপর আকাশ থেকে শাস্তি নাযিল করব, কারণ তারা পাপাচার করেছিল। আমি বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি। (২৯ ঃ ২৮-৩৫)

সূরা সাফ্‌ফাতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ لُوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ . إِذْ نَجَّيْنٰهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِيْنَ . إِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغَابِرِيْنَ . ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِيْنَ . وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ وَبِالَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ .

লূতও ছিল রাসূলগণের একজন। আমি তাকে ও তার পরিবারের সকলকে উদ্ধার করেছিলাম--এক বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল পেছনে রয়ে যাওয়া লোকদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর

অবশিষ্টদেরকে আমি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলাম। তোমরা তো ওদের ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম করে থাক সকালে ও সন্ধ্যায়, তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? (৩৭ : ১৩৩-১৩৮)।

সূরা যারিয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মেহমান ও পুত্রের সুসংবাদের ঘটনা উল্লেখ করার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ . قَالُوْآ اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ . لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ . مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ . فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ . فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ . وَتَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ .

ইবরাহীম বলল, 'হে ফেরেশতাগণ! তোমাদের বিশেষ কাজ কী? ওরা বলল, 'আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। ওদের উপর নিক্ষেপ করার জন্যে মাটির শক্ত ঢেলা, যা সীমালংঘনকারীদের জন্যে চিহ্নিত, তোমার প্রতিপালকের কাছ থেকে। সেখানে যে সব মুমিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম এবং সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী আমি পাইনি। যারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে, আমি তাদের জন্যে তাতে একটি নিদর্শন রেখেছি। (৫১ : ৩১-৩৭)

সূরা ইনশিকাফে আল্লাহ্ বলেন :

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ . اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ . نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا كَذٰلِكَ نَجْزِىْ مَنْ شَكَرَ . وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ . وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ . فَذُوْقُوْا عَذَابِىْ وَنُذُرِ . وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ .

লূত সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছিল সতর্ককারীদেরকে, আমি ওদের উপর পাঠিয়েছিলাম পাথরবাহী প্রচণ্ড ঝড়। কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়। তাদেরকে আমি উদ্ধার করেছিলাম রাতের শেষাংশে আমার বিশেষ অনুগ্রহস্বরূপ; যারা কৃতজ্ঞ আমি তাদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। লূত ওদেরকে সতর্ক করেছিল আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে; কিন্তু ওরা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করল। ওরা লূতের কাছ থেকে তার মেহমানদেরকে দাবি করল, তখন আমি ওদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং আমি বললাম, 'আস্বাদন কর, আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম। ভোরে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করল এবং আমি বললাম, আস্বাদন কর, আমার শাস্তি এবং সতর্কবাণীর পরিণাম।' আমি কুরআন সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্যে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (৫৪ : ৩৩-৪০)

তাফসীর গ্রন্থে এ সব সূরার যথাস্থানে আমরা এই ঘটনার বিশদ আলোচনা করেছি। আল্লাহ হযরত লূত (আ) ও তাঁর সম্প্রদায় সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে কওমে নূহ, কওমে আদ ও কওমে ছামূদ-এর আলোচনায় সেসব উল্লেখ করেছি।

এখন আমরা সে সব কথার সার-সংক্ষেপ বর্ণনা করব, যা তাদের কর্মনীতি ও পরিণতি সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্য কামনা করি। তাহল, হযরত লূত (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে এক ও লা-শরীক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানান। সেইসব অশ্লীল কাজ করতে নিষেধ করেন যার উল্লেখ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা করেছেন। কিন্তু একজন লোকও তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি এবং তার উপর ঈমান আনেনি। নিষেধকৃত কর্ম থেকে কেউ বিরত থাকেনি। বরং তারা তাদের অবস্থার উপর অটল অবিচল হয়ে থাকে এবং নিজেদের ভ্রষ্টতা ও মূর্খতা থেকে বিরত থাকেনি। এমনকি তারা তাদের রাসূলকে তাদের সমাজ থেকে বহিষ্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

রাসূল যখন তাদেরকে উদ্দেশ করে উপদেশ দেন, তখন তারা বিবেক না খাটিয়ে এই এক উত্তরই দিতে থাকে যে, লূত পরিবারকে তোমরা তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। কেননা, তারা এমন মানুষ যারা পাক-পবিত্র সাজতে চায়। এ কথার মধ্য দিয়ে তারা লূত পরিবারের নিন্দা করতে গিয়ে তাদের চরম প্রশংসাই করেছে। আবার এটাকেই তারা বহিষ্কারের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে। চরম শত্রুতা ও ঘৃণা থাকার কারণেই তারা লূতকে এ কথা বলার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু আল্লাহ হযরত লূত (আ)-কে ও তাঁর পরিবারবর্গকে পবিত্র রাখলেন এবং সম্মানের সঙ্গে সেখান থেকে তাদেরকে বের করে আনলেন, তবে তাঁর স্ত্রীকে নয়। আর তাঁর সম্প্রদায়ের সবাইকে আপন বাসভূমিতে চিরস্থায়ীভাবে থাকতে দিলেন। তবে সে থাকা ছিল দুর্গন্ধময় সমুদ্র তরংগের আঘাতে লীন হয়ে। যা ছিল প্রকৃতপক্ষে উত্তপ্ত আগুন ও তাপ প্রবাহ এবং তার পানি তিক্ত ও লবণাক্ত।

তারা নবীকে এরূপ উত্তর তখনই দিয়েছে, যখন তিনি তাদেরকে জঘন্য পাপ ও চরম অশ্লীলতা যা ইতিপূর্বে বিশ্বের কোন লোক করেনি, তা থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলেছেন। এ কারণেই তারা বিশ্ববাসীর জন্যে উদাহরণ ও শিক্ষাপ্রদ হয়ে রয়ে গিয়েছে। এ পাপকর্ম ছাড়াও তারা ছিনতাই, রাহাজানি করত, পথের সাথীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করত। প্রকাশ্য মজলিসে বিভিন্ন রকম নির্লজ্জ কথা বলতো এবং লজ্জাজনক কাজে লিপ্ত হতো। যেমন সশব্দে বায়ু ত্যাগ করত। এতে কোন লজ্জা বোধ করত না। অনেক সময় বড় বড় জঘন্য কাজও করত। কোন উপদেশদানকারীর উপদেশ ও জ্ঞানী লোকের পরামর্শের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করতো না। এ জাতীয় কাজের মাধ্যমে তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তার চাইতেও অধম ও বিভ্রান্ত বলে পরিচয় দিত। তারা তাদের বর্তমান কাজ থেকে বিরত থাকেনি, বিগত পাপ থেকে অনুশোচনা করেনি এবং ভবিষ্যতে আত্মসংশোধনের ইচ্ছাও করেনি। অতএব, আল্লাহ তাদেরকে শক্ত হাতে পাকড়াও করলেন। তারা হযরত লূত (আ)-কে বলেছিল ঃ

ائْتِنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ .

(তুমি সত্যবাদী হয়ে থাকলে আল্লাহর আযাব আমাদের জন্যে নিয়ে এস) অর্থাৎ নবী তাদের যে কঠিন আযাবের ভয় দেখাচ্ছিলেন তারা সেই আযাব কামনা করছিল এবং ভয়াবহ শাস্তির

আবেদন জানাচ্ছিল। এই সময় দয়ালু নবী তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানান। তিনি বিশ্ব প্রভু ও রাসূলগণের ইলাহ্-এর নিকট অনাচারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফলে নবীর মর্যাদা হানিতে আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক হয়, নবীর ক্রোধের জন্যে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হন। নবীর প্রার্থনা কবূল করেন এবং তাঁর প্রার্থিত বস্তু দান করেন। আপন দূত ও ফেরেশতাগণকে প্রেরণ করেন। তারা আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আগমন করেন। তাকে এক জ্ঞানী পুত্রের সুসংবাদ দেন এবং তারা যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে এসেছেন সে বিষয়টিও তাঁকে জানান।

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ . قَالُوْا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ . لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ . مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ .

ইবরাহীম বলল, হে ফেরেশতাগণ! আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য কী? তারা বলল, আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। যাতে তাদের উপর শক্ত ঢেলা নিক্ষেপ করি, যা সীমালংঘনকারীদের শাস্তি দেয়ার জন্যে আপনার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত রয়েছে।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا اِنَّا مُهْلِكُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظَالِمِيْنَ . قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ .

আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে আসল, তখন তারা বলেছিল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের ধ্বংস করব। কারণ এর অধিবাসীরা জালিম। ইবরাহীম বলল, এই জনপদে তো লূতও আছে। তারা বলল, ওখানে কারা আছে সে সম্পর্কে আমরা ভালভাবে অবগত আছি। আমরা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে অবশ্যই রক্ষা করব, তবে তার স্ত্রীকে নয়। সে ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (২৯ ঃ ৩৯)

আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُّنِيْبٌ يَآ اِبْرٰهِيْمُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ اٰتِيْهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ .

(যখন ইবরাহীমের ভীতি দূর হল ও সুসংবাদ জানান হল, তখন সে লূতের প্রসঙ্গ নিয়ে আমার সাথে বিতর্ক করা আরম্ভ করল) কেননা, ইবরাহীম (আ) আশা করেছিলেন যে, তারা খারাপ পথ পরিহার করে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

তাই আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اِبْرٰهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرٰى يُجَادِلُنَا فِىْ قَوْمِ لُوْطٍ .

(নিশ্চয়ই ইবরাহীম বড়ই ধৈর্যশীল, কোমল হৃদয় ও একনিষ্ঠ ইবাদতকারী। হে ইবরাহীম! এ জাতীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাক। তোমার পালনকর্তার নির্দেশ এসে গেছে এবং তাদের উপর সে আযাব অবশ্যই পতিত হবে)। অর্থাৎ এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে কথা বল। কেননা, তাদের ধ্বংস ও নির্মূল করার আদেশ চূড়ান্ত হয়ে গেছে। তোমার পালনকর্তার নির্দেশ এসে গেছে। অর্থাৎ এ ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়ে গেছে। তাঁর এ নির্দেশ ও শাস্তি ফেরাবার ও প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই। এ নির্দেশ অপ্রতিরোধ্যভাবে আসবেই। (সূরা হূদ ঃ ৭৪-৭৫)

সাঈদ ইব্ন জুবায়র, সুদ্দী, কাতাদা ও মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ফেরেশতাদেরকে বলেছিলেন ঃ আপনারা কি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করবেন যেখানে তিনশ' মুমিন রয়েছে? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, যদি দুশ' থাকে? তারা বললেন না। ইবরাহীম বললেন, যদি চল্লিশ জন মুমিন থাকে? তারা বললেন না। তিনি বললেন, যদি চৌদ্দজন মুমিন থাকে? তারা বললেন তবুও না। ইব্ন ইসহাক লিখেছেন ঃ ইবরাহীম (আ) এ কথাও বলেছিলেন যে, যদি একজন মাত্র মুমিন থাকে তবে সেই জনপদ ধ্বংস করার ব্যাপারে আপনাদের মত কি? জবাবে তারা বললেন ঃ তবুও ধ্বংস করা হবে না। তখন তিনি বললেন, সেখানে তো লূত রয়েছে। قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا তারা বলল, 'সেখানে কে আছে তা আমাদের ভালভাবেই জানা আছে।'

আহলি কিতাবদের বর্ণনায় এসেছে যে, ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন, হে আল্লাহ! লূত সম্প্রদায়ের মধ্যে পঞ্চাশজন সৎকর্মশীল লোক থাকলেও কি আপনি তাদেরকে ধ্বংস করবেন? এভাবে উভয়ের কথোপকথন দশজন পর্যন্ত নেমে আসে। আল্লাহ বলেন, তাদের মধ্যে দশজন সৎকর্মশীল লোক থাকলেও আমি তাদেরকে ধ্বংস করব না।

আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيْئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا يَوْمٌ عَصِيْبٌ .

আর যখন আমার প্রেরিত ফেরেশতাগণ লূতের কাছে আগমন করল তখন তাদের আগমনে সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হল এবং বলতে লাগল, আজ অত্যন্ত কঠিন দিন। (সূরা হূদ ঃ ৭৭)

মুফাস্সিরগণ বলেছেন। এই ফেরেশতাগণ ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ), মীকাঈল (আ) ও ইসরাফীল (আ)। তাঁরা ইবরাহীম (আ)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসেন এবং সাদ্দূম শহরে এসে উপস্থিত হন। লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের পরীক্ষাস্বরূপ এবং তাদের শাস্তিযোগ্য হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণস্বরূপ তাঁরা সুদর্শন তরুণ বেশে হাযির হন। হযরত লূত (আ)-এর বাড়িতে তাঁরা অতিথি হিসাবে ওঠেন। তখন ছিল সূর্য ডোবার সময়। হযরত লূত (আ) তাদের দেখে ভীত হলেন। মনে মনে ভাবলেন, যদি তিনি আতিথ্য প্রদান না করেন, তবে অন্য কেউ তা করবে। তিনি তাদেরকে মানুষই ভাবলেন। দুশ্চিন্তা তাঁকে ঘিরে ধরল। তিনি বললেন, আজ একটা বড় কঠিন দিন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে মুজাহিদ, কাতাদা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) হযরত লূত (আ)-এর এ কঠিন পরীক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। হযরত লূত (আ) অন্যান্য সময়ে তাঁর সম্প্রদায়কে নিজের মেহমানদের কাছে ঘেঁষতে নিষেধ করতেন। এ কারণে তারা লূত (আ)-এর উপর শর্ত আরোপ করেছিল যে, তিনি নিজের বাড়িতে কাউকে মেহমান হিসেবে রাখবেন না। কিন্তু সেদিন তিনি এমন লোকদেরকেই মেহমানরূপে দেখতে পেলেন যাদেরকে সরিয়ে দেয়ার উপায়ও ছিল না।

কাতাদা (র) বলেন, হযরত লূত (আ) নিজের ক্ষেতে কাজ করছিলেন, এমন সময় মেহমানগণ তাঁর কাছে উপস্থিত হন এবং তাঁর বাড়িতে মেহমান হওয়ার আবেদন জানান। তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতে লজ্জাবোধ করেন এবং সেখান থেকে তাঁদেরকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হন এবং তাঁদের আগে আগে হাঁটতে থাকেন। তাঁদের সাথে তিনি এমন ইঙ্গিতপূর্ণ কথা বলতে থাকেন, যাতে তাঁরা এ জনপদ ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। হযরত লূত (আ) তাঁদেরকে বললেন, হে ভাইয়েরা! এই জনপদের লোকের চেয়ে নিকৃষ্ট ও দুশ্চরিত্র লোক ধরাপৃষ্ঠে আর আছে কিনা আমার জানা নেই। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তিনি আবার এ কথা উল্লেখ করেন। এভাবে চারবার তাঁদেরকে কথাটি বলেন। কাতাদা (র) বলেন, ফেরেশতাগণ এ ব্যাপারে আদিষ্ট ছিলেন যে, যতক্ষণ নবী তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা যেন তাদেরকে ধ্বংস না করেন।

সুদ্দী (র) বলেন, ফেরেশতাগণ ইবরাহীম (আ)-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লূতের সম্প্রদায়ের উদ্দেশে রওয়ানা হন। দুপুর বেলা তাঁরা সেখানে পৌঁছেন। সাদ্দূম নদীর তীরে উপস্থিত হলে হযরত লূত (আ)-এর এক মেয়ের সাথে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। বাড়িতে পানি নেয়ার জন্যে সে এখানে এসেছিল। লূত (আ)-এর ছিলেন দুই কন্যা। বড়জনের নাম রায়ছা এবং ছোট জনের নাম যা'রাতা। মেয়েটিকে তাঁরা বললেন ঃ ওহে! এখানে মেহমান হওয়া যায় এমন কারও বাড়ি আছে কি? মেয়েটি বললেন, আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত জনপদে প্রবেশ করবেন না। নিজের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে মেয়েটির অন্তরে লোকগুলোর প্রতি করুণার উদ্রেক হয়। বাড়ি এসে মেয়েটি পিতাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ পিতা নগর তোরণে কয়েকজন তরুণ আপনার অপেক্ষায় আছেন। তাঁদের মত সুদর্শন লোক আমি কখনও দেখিনি। আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদেরকে না লাঞ্ছিত করে! ইতিপূর্বে সম্প্রদায়ের লোকজন হযরত লূত (আ)-কে কোন পুরুষ লোককে মেহমান রাখতে নিষেধ করে দিয়েছিল। যা হোক, হযরত লূত (আ) তাদেরকে নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং নিজের পরিবারবর্গের লোকজন ছাড়া আর কেউ বিষয়টি জানতে পারেনি। কিন্তু লূতের স্ত্রী বাড়ি থেকে বের হয়ে জনপদের লোকদের কাছে খবরটি পৌঁছিয়ে দেয়। সে জানিয়ে দেয় যে, লূতের বাড়িতে এমন কতিপয় সুশ্রী তরুণ এসেছে যাদের ন্যায় সুন্দর লোক আর হয় না। তখন লোকজন খুশীতে লূত (আ)-এর বাড়ির দিকে ছুটে আসে।

আল্লাহর বাণী ঃ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ.

(ইতিপূর্বে তারা বিভিন্ন রকম পাপকর্মে লিপ্ত ছিল) অর্থাৎ বহু বড় বড় গুনাহর সাথে এই জঘন্য পাপ কাজও তারা চালিয়ে যেতো।

قَالَ يَا قَوْمِ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ .

লূত বলল, হে আমার সম্প্রদায়! এই যে আমার কন্যারা আছে যারা তোমাদের জন্যে পবিত্রতম।

এ কথা দ্বারা হযরত লূত (আ) তাঁর ধর্মীয় ও দীনী কন্যাদের অর্থাৎ তাদের স্ত্রীদের প্রতি ইংগিত করেছেন। কেননা, নবীগণ তাদের উম্মতের জন্যে পিতৃতুল্য। হাদীস ও কুরআনে এরূপই বলা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন ঃ اَلنَّبِيُّ أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ .

নবী মুমিনদের জন্যে তাদের নিজেদের চাইতেও ঘনিষ্ঠতর আর তাঁর স্ত্রীগণ মু'মিনদের মা। (৩৩ ঃ ৬)। কোন কোন সাহাবা ও প্রাচীন আলিমগণের মতে নবী মু'মিনদের পিতা।

উপরোক্ত আয়াতের অনুরূপ আর একটি আয়াত এই ঃ

أَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُوْنَ.

তোমরা বিশ্বের পুরুষদের কাছে গমন করছ। আর তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে যে স্ত্রীকুল সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে পরিত্যাগ করছ; বরং তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। (২৬ ঃ ১৬৫)

মুজাহিদ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, রাবী ইব্‌ন আনাস, কাতাদা, সুদ্দী ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) আয়াতের উক্তরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং এ ব্যাখ্যাই সঠিক। দ্বিতীয় মতটি অর্থাৎ তাঁর নিজের কন্যাগণ হওয়া ভুল। এটা আহলি কিতাবদের থেকে গৃহীত এবং তাদের কিতাবে অনেক বিকৃতি ঘটেছে। তাদের আর একটি ভুল উক্তি এই যে, ফেরেশতারা সংখ্যায় ছিলেন দুইজন এবং রাত্রে তাঁরা লূত (আ)-এর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করেন। এছাড়া আহলি কিতাবগণ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক অদ্ভুত মিথ্যা উপাখ্যান সৃষ্টি করেছে।

আল্লাহর বাণী ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُوْنِ فِيْ ضَيْفِيْ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ .

অতএব, আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার মেহমানদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে আমাকে হেয় কর না। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল মানুষ নেই? (১১ ঃ ৭৮)

এ আয়াতে হযরত লূত (আ) নিজ জাতিকে অশ্লীল কাজ থেকে বারণ করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি এ কথারও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তাদের সমাজের একজন লোকও সুস্থ রুচির বা ভাল স্বভাবের ছিল না; বরং সমাজের সমস্ত লোকই ছিল নির্বোধ, জঘন্য পাপাসক্ত ও নিরেট কাফির। ফেরেশতাগণও এটাই চাচ্ছিলেন যে, সম্প্রদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পূর্বেই নবীর

কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে তাঁরা কিছু শুনবেন। কিন্তু সম্প্রদায়ের অভিশপ্ত লোকেরা নবীর উত্তম কথার উত্তরে বলল ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِىْ بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَاِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ.

আপনি ভাল করেই জানেন, আপনার কন্যাদের দিয়ে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আপনি এও জানেন যে, আমরা কি চাচ্ছি। (১১ ঃ ৭৯)

তারা বলছে, হে লূত! আপনি অবগত আছেন যে, স্ত্রীদের প্রতি আমাদের কোন আকর্ষণ নেই। আমাদের উদ্দেশ্য কি, তা আপনি ভাল করেই জানেন। নবীকে উদ্দেশ করে তারা এরূপ কুৎসিৎ ভাষা ব্যবহার করতে আল্লাহকে একটুও ভয় পায়নি। যিনি কঠিন শাস্তিদাতা। এ কারণে হযরত লূত (আ) বলেছিলেন ঃ لَوْ اَنَّ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ .

হায়, তোমাদের উপর যদি আমার শক্তি থাকত অথবা যদি আমি নিতে পারতাম কোন শক্তিশালী আশ্রয়। (১১ ঃ ৮০)

অর্থাৎ তিনি কামনা করেছিলেন সম্প্রদায়কে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যদি হযরত লূতের থাকত, অথবা তাঁকে সাহায্যকারী ধনবল বা জনবল যদি থাকত তা হলে তাদের অন্যায় দাবির উপযুক্ত শাস্তি তিনি দিতে পারতেন।

যুহরী (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে মারফূরূপে হাদীস বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সন্দেহ প্রকাশের ব্যাপারে আমরা ইবরাহীম (আ)-এর চাইতে বেশি হকদার। আল্লাহ লূত (আ)-এর উপর রহম করুন। কেননা, তিনি শক্তিশালী অবলম্বনের আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। আমি যদি সেই দীর্ঘকাল জেলখানায় অবস্থান করতাম যেমনি ইউসুফ (আ) করেছিলেন তবে আমি অবশ্যই আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম। এ হাদীস আবুয যিনাদ ভিন্ন সূত্রেও বর্ণনা করেছেন এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, আল্লাহ লূত (আ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। কেননা, তিনি শক্তিশালী অবলম্বন অর্থাৎ আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করেছিলেন। এরপর থেকে আল্লাহ যত নবী প্রেরণ করেছেন তাঁদেরকে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী করে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর বাণী ঃ

وَجَاءَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبْشِرُوْنَ . قَالَ اِنَّ هٰؤُلَاءِ ضَيْفِىْ فَلَا تَفْضَحُوْنِ . وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَاتُخْزُوْنِ . قَالُوْا اَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِيْنَ . قَالَ هٰؤُلَاءِ بَنَاتِىْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ .

নগরবাসীরা উল্লসিত হয়ে উপস্থিত হলো। সে বলল, ওরা আমার মেহমান, সুতরাং তোমরা আমাকে বে-ইজ্জত করো না। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমাকে হেয় করো না। তারা বলল, হে লূত! আমরা কি তোমাকে দুনিয়া শুদ্ধ লোককে আশ্রয় দিতে নিষেধ করিনি? লূত বলল, তোমাদের একান্তই যদি কিছু করতে হয় তাহলে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে। (১৫ ঃ ৬৭)

হযরত লূত (আ) সম্প্রদায়ের লোকজনকে তাদের স্ত্রীদের কাছে যেতে আদেশ দেন এবং তাদের কু-অভ্যাসের উপর অবিচল থাকার মন্দ পরিণতির কথা জানিয়ে দেন যা অচিরেই তাদের

উপর পতিত হবে। কিন্তু কোন কিছুতেই তারা নিবৃত্ত হল না। বরং নবী যতই তাদেরকে উপদেশ দেন, তারা ততই উত্তেজিত হয়ে মেহমানদের কাছে পৌছার চেষ্টা করে। কিন্তু রাতের শেষে তকদীর তাদেরকে কোথায় পৌছিয়ে দেবে তা তাদের আদৌ জানা ছিল না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবনের কসম করে বলেন ঃ

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ .

তোমার জীবনের শপথ! ওরা তো মত্ততায় বিমূঢ় হয়েছে। (১৫ ঃ ৭২)

আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ . وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ . وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ -

লূত ওদেরকে আমার কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। কিন্তু ওরা সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতণ্ডা শুরু করল। তারা লূতের কাছ থেকে তার মেহমানদেরকে দাবি করল। তখন আমি ওদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং আমি বললাম, আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর পরিণাম। প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি তাদেরকে আঘাত করল। (৫৪ ঃ ৩৬-৩৮)

মুফাস্‌সির ও অন্যান্য আলিম বলেছেন, হযরত লূত (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে তাঁর ঘরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন এবং তাদেরকে বাধা দেন। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল। তারা তা খুলে ভিতরে প্রবেশ করতে উদ্যত হলো। আর হযরত লূত (আ) দরজার বাইরে থেকে তাদেরকে উপদেশ দিতে এবং ভিতরে যেতে বারণ করতে থাকেন। উভয় পক্ষের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। অবস্থা যখন সঙ্গীন হয়ে আসল এবং ঘটনা লূত (আ)-এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার উপক্রম হল; তখন তিনি বললেন, তোমাদের প্রতিহত করার শক্তি যদি আমার থাকত অথবা কোন শক্তিশালী অবলম্বনের আশ্রয় নিতে পারতাম তবে তোমাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করতাম। এ সময় ফেরেশতাগণ বললেন, يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ . "হে লূত! আমরা তোমার প্রতিপালক প্রেরিত ফেরেশতা। ওরা কখনই তোমার কাছে পৌছতে পারবে না।" (১১ ঃ ৮১)

মুফাস্‌সিরগণ উল্লেখ করেন, জিবরাঈল (আ) ঘর থেকে বেরিয়ে তাদের সম্মুখে আসেন এবং নিজ ডানার এক প্রান্ত দ্বারা হালকাভাবে তাদের চেহারায় আঘাত করেন। ফলে তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন, তাদের চোখ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে যায়। এমনকি চেহারায় চোখের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট রইলো না। তারপর তারা দেয়াল হাতড়িয়ে কোন মতে সেখান থেকে ফিরে যায়। আল্লাহর নবী লূত (আ)-কে ধমক দিতে দিতে বলতে থাকে— কাল সকালে আমাদের ও তার মধ্যে বোঝাপড়া হবে।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ . وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ .

ওরা লূতের কাছ থেকে তার মেহমানদেরকে দাবি করল। তখন আমি তাদের দৃষ্টিশক্তি লোপ করে দিলাম এবং আমি বললাম ঃ এখন আমার শাস্তি ও সতর্ক বাণীর পরিণাম আস্বাদন কর। প্রত্যুষে বিরামহীন শাস্তি ও তাদের উপর আঘাত হানল। (৫৪ ঃ ৩৭-৩৮)

ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ)-এর কাছে দু'টি প্রস্তাব পেশ করেন (১) পরিবার-পরিজন নিয়ে রাতের শেষে রওয়ানা হয়ে যাবেন (২) কেউ পেছনের দিকে ফিরে তাকাবেন না। অর্থাৎ সম্প্রদায়ের উপর যখন আযাব পতিত হবে এবং আযাবের শব্দ শোনা যাবে তখন কেউ যেন পশ্চাতে ফিরে না তাকায়। ফেরেশতাগণ আরও জানান যে, তিনি যেন সকলের পেছনে থেকে সবাইকে পরিচালনা করেন। الا امرءتك। এই বাক্যাংশের দু'টি অর্থ হতে পারে (১) যাওয়ার সময় তোমার স্ত্রীকে সাথে নেবে না। এ অবস্থায় امراءة। এর উপর যবর দিয়ে পড়তে হবে এবং فاسو باهلك থেকে সে ব্যতিক্রম হবে। (২) যাওয়ার পথে দলের কেউ পেছনের দিকে তাকাবে না কিন্তু কেবল তোমার স্ত্রীই এ নির্দেশ অমান্য করে পেছনের দিকে তাকাবে; ফলে সম্প্রদায়ের উপর যে আযাব আসবে ঐ আযাবে সেও গ্রেফতার হবে। এ অবস্থায় امرءة। وَلَا يَلْتَفِتْ اَحَدٌ থেকে মুস্‌তাস্‌না (ব্যতিক্রম) হবে। পেশ যুক্ত পাঠ (امرأتك) এ অর্থকে সমর্থন করে। কিন্তু প্রথম অর্থই অধিকতর স্পষ্ট।

সুহায়লী বলেন, লূত (আ)-এর স্ত্রীর নাম ওয়ালিহা এবং নূহ (আ)-এর স্ত্রীর নাম ওয়ালিগা। আগন্তুক ফেরেশতাগণ ঐসব বিদ্রোহী পাপিষ্ঠ, সীমালংঘনকারী নির্বোধ অভিশপ্ত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হবে এ সুসংবাদ লূত (আ)-কে শোনান, যারা পরবর্তী যুগের লোকদের জন্যে দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।

আল্লাহর বাণী ঃ اِنَّ مَوْعِدَكُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيْبٍ.

তাদের প্রতিশ্রুত সময় প্রভাত কাল। আর প্রভাত কাল খুব নিকটে নয় কি?

হযরত লূত (আ) নিজ পরিবারবর্গ নিয়ে বের হয়ে আসেন। পরিবারবর্গ বলতে তার দু'টি কন্যাই মাত্র ছিল। সম্প্রদায়ের অন্য কোন একটি লোকও তার সাথে আসেনি। কেউ কেউ বলেছেন, তার স্ত্রীও একই সাথে বের হয়েছিল। কিন্তু সঠিক খবর আল্লাহই ভাল জানেন। তাঁরা যখন সে এলাকা অতিক্রম করে চলে আসেন এবং সূর্য উদিত হয়, তখন আল্লাহর অলংঘনীয় নির্দেশ ও অপ্রতিরোধ্য আযাব তাদের উপর নেমে আসে। আহলি কিতাবদের মতে, ফেরেশতাগণ হযরত লূত (আ)-কে তথায় অবস্থিত একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে বলেন। কিন্তু হযরত লূত (আ)-এর নিকট তা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ঠেকে। তাই তিনি নিকটবর্তী কোন গ্রামে চলে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। ফেরেশতাগণ বললেন, তাই করুন। গ্রামে পৌঁছে সেখানে স্থিত হওয়া পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করবো এবং তারপরই আমরা আযাব অবতীর্ণ করব। আহলি কিতাবগণ বলেন, সে মতে হযরত লূত (আ) গওরযাগর নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে চলে যান এবং সূর্যোদয়ের সাথে সাথে তাদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে আসে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ مَّنْضُوْدٍ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ. وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ.

তারপর যখন আমার আদেশ আসল তখন আমি জনপদকে উল্টিয়ে দিলাম এবং ওদের উপর ক্রমাগত বর্ষণ করলাম পাথর, কংকর যা তোমার প্রতিপালকের কাছে চিহ্নিত ছিল। এটি জালিমদের থেকে দূরে নয়। (১১ ঃ ৮২)

মুফাসসিরগণ বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ) আপন ডানার এক প্রান্ত দিয়ে লূত সম্প্রদায়ের আবাসভূমি গভীর নিচু থেকে উপড়িয়ে নেন। মোট সাতটি নগরে তারা বসবাস করত। কারও মতে তাদের সংখ্যা চারশ', কারও মতে চার হাজার। সে এলাকার সমস্ত মানুষ, জীব-জন্তু, ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পদ যা কিছু ছিল সবকিছুসহ উঠিয়ে নেয়া হয়। উপরে আকাশের সীমানা পর্যন্ত উত্তোলন করা হয়। আসমানের এত কাছে নিয়ে যাওয়া হয় যে, সেখানকার ফেরেশতাগণ মোরগের ডাক ও কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পান। তারপর সেখান থেকে উল্টিয়ে নিচে নিক্ষেপ করা হয। মুজাহিদ (র) বলেন, সর্বপ্রথম যা নিচে এসে পতিত হয় তা হল তাদের উঁচু অট্টালিকাসমূহ। وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ (তাদের উপর পাথর কঙ্কর বর্ষণ করলাম) سِجِّيلٍ ফার্সী শব্দ, একে আরবীকরণ করা হয়েছে। অর্থ ঃ অত্যধিক শক্ত ও কঠিন। مَنْضُودٍ অর্থ ক্রমাগত। অর্থাৎ আকাশ থেকে একের পর এক যা তাদের উপর আসতে থাকে। مسومة অর্থ চিহ্নিত। প্রতিটি পাথরের গায়ে সেই ব্যক্তির নাম লেখা ছিল যার উপর তা পতিত হবার জন্যে নির্ধারিত ছিল। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ (তোমার প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত যা সীমালংঘনকারীদের জন্যে নির্ধারিত।)

আল্লাহর বাণী ঃ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا . فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ.

তাদের উপর শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম। যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল তাদের জন্যে এ বৃষ্টি কতই না নিকৃষ্ট! (২৬ ঃ ১৭৩)

আল্লাহর বাণী ঃ وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى فَغَشَّاهَا مَا غَشّٰى.

উৎপাটিত আবাসভূমিকে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। তারপর তা আচ্ছন্ন করে ফেলল কী সর্বগ্রাসী শাস্তি! (৫৩ ঃ ৫৩)

অর্থাৎ আল্লাহ সেই জনপদের ভূখণ্ডকে উপরে তুলে নিচের অংশকে উপরে ও উপরের অংশকে নিচে করে উল্টিয়ে দেন। তারপর শক্ত পাথর-কংকর বর্ষণ করেন অবিরামভাবে— যা তাদের সবাইকে ছেয়ে ফেলে। প্রতিটি পাথরের উপর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম লেখা ছিল। এ পাথরগুলো ঐ জনপদে উপস্থিত সকলের উপর পতিত হয়। অনুরূপ যারা তখন সেখানে অনুপস্থিত ছিল অর্থাৎ মুসাফির, পথিক ও দূরে অবস্থানকারী সকলের উপরই তা পতিত হয়। কথিত আছে যে, হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রী তার সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে থেকে যায়। অপর মতে বলা হয়েছে যে, সে তার স্বামী ও দুই কন্যার সাথে বেরিয়ে যায়। কিন্তু যখন সে আযাব ও শহর ধ্বংস হওয়ার শব্দ শুনতে পায়, তখন সে পেছনে সম্প্রদায়ের দিকে ফিরে তাকায় এবং আগের পরের আল্লাহ্র সকল নির্দেশ অমান্য করে। 'হায় আমার সম্প্রদায়'! বলে সে বিলাপ করতে থাকে। তখন উপর থেকে একটি পাথর এসে তার মাথায় পড়ে এবং তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলে। এভাবে সে নিজ সম্প্রদায়ের ভাগ্যের সাথে একীভূত হয়ে যায়। কারণ, সে ছিল

তার সম্প্রদায়ের ধর্মে বিশ্বাসী। তাদের সংবাদ সরবরাহকারিণী; হযরত লূত (আ)-এর বাড়িতে মেহমান আসলে সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে সে সংবাদ পৌঁছিয়ে দিত। আল্লাহ্ বলেন ঃ

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ. كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِيْنَ.

আল্লাহ কাফিরদের জন্যে নূহ ও লূতের স্ত্রীকে দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন। ওরা ছিল আমার বান্দাগণের মধ্যে দু'জন সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু ওরা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে, নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারল না। তাই ওদেরকে বলা হল, জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও ওতে প্রবেশ কর। (৬৬ ঃ ১০)

অর্থাৎ তারা নবীদের সাথে দীনের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, নবীর দীন গ্রহণ করেনি। এখানে এ অর্থ কিছুতেই নেয়া যাবে না যে, তারা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য কোনভাবে অশ্লীল কাজে জড়িত ছিল। কেননা, আল্লাহ্ কোন ব্যভিচারিণীকে কোন নবীর স্ত্রী হিসেবে নির্ধারণ করেননি। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-সহ অন্যান্য প্রাচীন ও পরবর্তীকালের ইমাম ও মুফাস্‌সিরগণ এ কথাই বলেছেন। তাঁরা বলেছেন, কোন নবীর কোন স্ত্রী কখনও ব্যভিচার করেননি। যারা এর বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন, তারা বিরাট ভুল করেছেন। 'ইফ্‌কের' ঘটনায় কতিপয় ব্যক্তি হযরত আয়েশা (রা)-এর প্রতি অপবাদ দিলে আল্লাহ্ তা'আলা আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা ঘোষণা করে যে আয়াত নাযিল করেন, তাতে ঐসব মু'মিন লোকদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করেন। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ. وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَا اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سُبْحَانَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ.

যখন তোমরা মুখে মুখে এ কথা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছজ্ঞান করছিলে। যদিও আল্লাহর কাছে এটা ছিল গুরুতর এবং তোমরা যখন এ কথা শুনলে তখন কেন বললে না— এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহ পবিত্র মহান। এতো এক গুরুতর অপবাদ। (২৪ ঃ ১৫-১৬)

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার নবীর স্ত্রী এ দোষে জড়িত হবে এ থেকে আপনি পবিত্র।

আল্লাহ বাণী ঃ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ . (আর এটা জালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়) অর্থাৎ এই শাস্তি বেশি দূরে নয় সেইসব লোকদের থেকে যারা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ন্যায় কুকর্মে লিপ্ত হবে। এই কারণে কোন কোন আলিম বলেছেন, পুরুষের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত ব্যক্তিকে 'রজম' বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে, চাই সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত। ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ, ইব্ন হাম্বল (র) প্রমুখ ইমাম এই মত পোষণ

করেন। তাঁরা বর্ণিত সেই হাদীস থেকেও দলীল গ্রহণ করেছেন যা ইব্‌ন আব্বাস (রা) কর্তৃক মুসনাদে আহমদে ও সুনান গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, এমন কোন লোক যদি তোমরা পাও, যে লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের অনুরূপ পাপ কাজে লিপ্ত, তখন সংশ্লিষ্ট উভয় ব্যক্তিকেই হত্যা কর। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, পুরুষের সাথে সমকামীকে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ফেলে দিয়ে তার উপর পাথর নিক্ষেপ করতে হবে; যেভাবে লূতের সম্প্রদায়ের সাথে করা হয়েছিল। তিনি দলীলরূপে নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেছেন ঃ

وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ (এটা জালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়) আল্লাহ তা'আলা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের গোটা এলাকাকে একটি দুর্গন্ধময় সমুদ্রে পরিণত করেন। ঐ সমুদ্রের পানি ও সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকার মাটি ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। এভাবে স্মরণীয় বিধ্বস্ত এলাকাটি পরবর্তীকালের সেইসব মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় ও উপদেশ গ্রহণের বস্তুতে পরিণত হয়েছে, যারা আল্লাহর অবাধ্য হয়, রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করে ও আপন মনিবের নাফরমানী করে। এ ঘটনা সে বিষয়েও প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَآيَةً. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

নিশ্চয় তাতে আছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। তোমার প্রতিপালক তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (২৬ ঃ ৮-৯)

আল্লাহর বাণী ঃ

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ . فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيْلٍ. إِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُقِيْمٍ . إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ.

তারপর সূর্যোদয়ের সময়ে এক মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল এবং আমি জনপদকে উল্টিয়ে উপর-নীচ করে দিলাম এবং তাদের উপর পাথর-কংকর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে নির্দশন রয়েছে পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের জন্যে। লোক চলাচলের পথের পাশে তা এখনও বিদ্যমান। এতে অবশ্যই রয়েছে মু'মিনদের জন্যে নির্দশন। (১৫ ঃ ৭৩-৭৭)

مُتَوَسِّمِيْنَ- বলা হয় সেসব লোকদেরকে যারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে থাকে। এখানে দূরদৃষ্টির অর্থ হল এই বিষয়ে চিন্তা করা যে, এ জনপদটি ও তার বাসিন্দারা আবাদ হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে আল্লাহ্ তা ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করে দিলেন। তিরমিযী ইত্যাদি কিতাবে মারফূ' হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

(اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله) মু'মিনের দূরদৃষ্টিকে তোমরা সমীহ করবে, কেননা সে আল্লাহপ্রদত্ত নূরের সাহায্যে দেখতে পায়। একথা বলে রাসূল (সা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন : إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ (দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মু'মিনদের জন্যে এতে নিদর্শন রয়েছে)। আল্লাহর বাণী : وَإِنَّهَا لَبِسَبِيْلٍ مُقِيْمٍ (পথের পাশে তা' এখনও বিদ্যমান) অর্থাৎ যাতায়াতের চালু পথে ঐ জনপদের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন অপর আয়াতে বলা হয়েছে :

وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيْنَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ- (তোমরা তো তাদের ধ্বংসাবশেষগুলো সকাল-সন্ধ্যায় অতিক্রম করে থাক। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? (৩৭ : ১৩৭-৩৮)। অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্যে আমি এতে একটি স্পষ্ট নিদর্শন রেখেছি। (২৯ : ৩৫)

আল্লাহর বাণী :

فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ . فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ . وَتَرَكْنَا فِيْهَا آيَةً لِلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ.

সেখানে যেসব মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম এবং সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত আর কোন মুসলিম গৃহ আমি পাইনি। যারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে আমি তাদের জন্যে এর মধ্যে একটি নির্দশন রেখেছি। (৫১ : ৩৫-৩৭)

অর্থাৎ লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের জনপদটিকে আমি শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্যে রেখে দিয়েছি সেইসব লোকের জন্যে যারা আখিরাতের আযাবকে ভয় করে। না দেখেই আল্লাহকে ভয় করে, মহান প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে, প্রবৃত্তি পরায়ণতা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহর নিষিদ্ধ জিনিস থেকে দূরে থাকে। তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকে এবং লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের মত হওয়ার ব্যাপারে অন্তরে ভয় রাখে (ومن تشبه بقوم فهو منهم) যে ব্যক্তি কোন জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে সে তাদের দলভুক্ত। সকল ব্যাপারে পূর্ণ সাদৃশ্য হতে হবে এমন কোন কথা নেই; বরং কোন কোন ব্যাপারে সাদৃশ্য থাকলেই হয়। যেমন কেউ কেউ বলেছেন, তোমরা যদি সম্পূর্ণরূপে কওমে লূত না হয়ে থাক, তবে কওমে লূত তোমাদের থেকে খুব বেশি পৃথক নয়। অতএব, যে লোক জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও আল্লাহ্-ভীরু, সে আল্লাহর যাবতীয় নির্দেশ মেনে চলবে এবং রাসূলের আদর্শকে অনুসরণ করবে, সে অবশ্যই হালাল স্ত্রী ও যুদ্ধবন্দী দাসী ভোগ করবে। শয়তানের পথে চলতে সে ভয় পাবে। অন্যথায় সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে এবং নিম্নোক্ত আয়াতের আওতায় এসে যাবে وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ بِبَعِيْدٍ (জালিমদের থেকে তা বেশি দূরে নয়।)

কওমে শু'আয়ব বা মাদ্য়ানবাসীর ঘটনা

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আ'রাফে কওমে লূতের কাহিনী শেষ করার পর বলেন ঃ

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا . قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ .
قَدْ جَاۤءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا . ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ . وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ
اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا . وَاذْكُرُوْۤا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلًا فَكَثَّرَكُمْ . وَانْظُرُوْا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ . وَاِنْ كَانَ طَاۤئِفَةٌ مِّنْكُمْ اٰمَنُوْا بِالَّذِىْۤ اُرْسِلْتُ بِهٖ
وَطَاۤئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْا حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا . وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ .
قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَاۤ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِىْ مِلَّتِنَا . قَالَ اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِيْنَ . قَدِ
افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجّٰنَا اللّٰهُ مِنْهَا . وَمَا
يَكُوْنُ لَنَاۤ اَنْ نَّعُوْدَ فِيْهَاۤ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَاۤءَ اللّٰهُ رَبُّنَا . وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا .
عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ
الْفٰتِحِيْنَ . وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا
لَّخٰسِرُوْنَ . فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ . اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا
شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا . اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ .
فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسٰلٰتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ
اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ .

মাদ্য়ানবাসীদের কাছে তাদের স্বগোত্রীয় শু'আয়বকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্

নেই। তোমাদের প্রতিপালক হতে তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে; লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না; তোমরা মু'মিন হলে তোমাদের জন্যে এটা কল্যাণকর। তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ভয় প্রদর্শনের জন্যে কোন পথে বসে থাকবে না, আল্লাহ্‌র পথে তাদেরকে বাধা দেবে না এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করবে না। স্মরণ কর, 'তোমরা যখন সংখ্যায় কম ছিলে আল্লাহ তখন তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কিরূপ ছিল, তা লক্ষ্য কর। আমি যাসহ প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল বিশ্বাস না করে তবে ধৈর্যধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলল, 'হে শু'আয়ব! তোমাকে ও তোমার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করবই অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে।' 'সে বলল, 'কী! আমরা তা ঘৃণা করলেও ?' তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ্ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই, তবে তো আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করব, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে আর তাতে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়; সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত। আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করি; 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যাভাবে মীমাংসা করে দাও; এবং তুমিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী প্রধানগণ বলল, 'তোমরা যদি শু'আয়বকে অনুসরণ কর তবে তোমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, ফলে তাদের প্রভাত হল নিজ ঘরে উপুড় হয়ে পতিত অবস্থায়। মনে হল, শু'আয়বকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেই নি। শু'আয়বকে যারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সে তাদের থেকে মুখ ফিরাল এবং বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তো তোমাদেরকে পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি; সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্যে কি করে আক্ষেপ করি!' (৭ঃ ৮৫-৯৩)

সূরা হূদের মধ্যেও লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা বলার পর আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا. قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِنِّىْ اَرٰكُمْ بِخَيْرٍ وَاِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ. وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاۤءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ. بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ. قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ اَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاۤؤُنَاۤ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْۤ اَمْوَالِنَا مَا نَشٰۤؤُا. اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ.

قَالَ يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا. وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ عَنْهُ. اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ. وَيٰقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ. وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ. وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْآ اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ. قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا. وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ. قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِىْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ. وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا. اِنَّ رَبِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ.

وَيٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ. سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ. وَارْتَقِبُوْآ اِنِّىْ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ. وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ. كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَآ اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ.

মাদ্য়ানবাসীদের নিকট তাদের স্ব-গোত্রীয় শু'আয়বকে পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। মাপে ও ওজনে কম করো না। আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধিশালী দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের জন্যে আশংকা করছি এক সর্বগ্রাসী দিনের শাস্তি। হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়-সংগতভাবে মাপবে ও ওজন করবে। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না, 'যদি তোমরা মুমিন হও তবে আল্লাহ্ অনুমোদিত যা বাকি থাকবে তোমাদের জন্যে তা উত্তম; আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।' ওরা বলল, 'হে শু'আয়ব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা যার ইবাদত করত, আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও না? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, সদাচারী।'

সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আমি যদি আমার প্রতিপালক-প্রেরিত স্পষ্ট প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকি এবং তিনি যদি তাঁর কাছ থেকে আমাকে উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করে থাকেন, তবে কি করে আমি আমার কর্তব্য হতে বিরত থাকব? আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি, আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না। আমি আমার

সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই। আমার কার্য-সাধন তো আল্লাহরই সাহায্যে; আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। 'হে আমার সম্প্রদায়! আমার সাথে বিরোধ যেন কিছুতেই তোমাদেরকে এমন অপরাধ না করায় যাতে তোমাদের উপর তার অনুরূপ বিপদ আপতিত হবে যা আপতিত হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়ের উপর, হূদের সম্প্রদায়ের উপর কিংবা সালিহ্র সম্প্রদায়ের উপর, আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে দূরে নয়। তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর; আমার প্রতিপালক পরম দয়ালু, প্রেমময়।' তারা বলল, 'হে শু'আয়ব! তুমি যা বল তার অনেক কথা আমরা বুঝি না এবং আমরা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বলই দেখছি। তোমার স্বজনবর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলতাম, আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও।' সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের কাছে কি আমার স্বজনবর্গ আল্লাহ্র চাইতে অধিক শক্তিশালী? তোমরা তাঁকে সম্পূর্ণ পেছনে ফেলে রেখেছ। তোমরা যা কর আমার প্রতিপালক তা পরিবেষ্টন করে আছেন।

'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি; তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কে মিথ্যাবাদী? সুতরাং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।' যখন আমার নির্দেশ আসল তখন আমি শু'আয়ব ও তার সঙ্গে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করেছিলাম, তারপর যারা সীমালংঘন করেছিল মহানাদ তাদেরকে আঘাত করল, ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে নতজানু অবস্থায় শেষ হয়ে গেল; যেন তারা সেখানে কখনও বসবাস করেনি। জেনে রেখ, ধ্বংসই ছিল মাদয়ানবাসীদের পরিণাম; যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল ছামূদ সম্প্রদায়। (১১ ঃ ৮৪-৯৫)

সূরা আল-হিজরে লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনার পর বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِيْنَ. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِيْنٍ.

আর 'আয়কাবাসীরাও[1] তো ছিল সীমালংঘনকারী। সুতরাং আমি ওদেরকে শাস্তি দিয়েছি, এরা উভয়ই[2] তো প্রকাশ্য পথের পাশে অবস্থিত। (১৫ ঃ ৭৮-৭৯)

সূরা শু'আরায় উক্ত ঘটনার পর আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَذَّبَ أَصْحَابُ لْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ. وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ.

---

১. আয়কা অর্থ গভীর অরণ্য। শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায় অরণ্যের অধিবাসী ছিল। আয়কা মাদায়নের পার্শ্বের অঞ্চল। উভয় অঞ্চলের জন্য তিনি নবী ছিলেন।

২. উভয় শব্দ দ্বারা লূত (আ) ও শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায়ের বসতির ধ্বংসস্তূপ বুঝানো হয়েছে।

وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ . وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ. قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ. اِنَّمَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ. فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ. قَالَ رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ. فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ. اِنَّ فِىْ ذَالِكَ لَاٰيَةً. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

আয়কাবাসীরা রাসূলগণকে অস্বীকার করেছিল যখন শু'আয়ব ওদেরকে বলেছিল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না ? আমি তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর। এর জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো জগতসমূহের প্রতিপালকের কাছেই আছে। মাপে পূর্ণমাত্রায় দেবে; যারা মাপে ঘাটতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না এবং ওজন করবে সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায়। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্ত বস্তু কম দিবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। এবং ভয় কর তাঁকে, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।' তারা বলল, তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত; আমাদের মত একজন মানুষ। আমরা মনে করি, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্যতম। তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের এক খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। সে বলল, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন তোমরা যা কর।' তারপর ওরা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, পরে ওদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল। এতো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি। এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু ওদের অধিকাংশই মুমিন নয়। এবং তোমার প্রতিপালক, তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (২৬ ঃ ১৭৬-১৯১)

মাদ্য়ানবাসীরা ছিল আরব জাতির অন্তর্ভুক্ত। মাদ্য়ান শহরে তারা বসবাস করত। মাদ্য়ান সিরিয়ার নিকটবর্তী মা'আন এলাকার একটি গ্রামের নাম। এর অবস্থান হিজাযের পার্শ্বে ও লূত সম্প্রদায়ের হ্রদের সন্নিকটে। লূতের সম্প্রদায়ের পরেই এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মাদ্য়ানবাসীরা ছিল মাদ্য়ান ইব্ন মাদ্য়ানে ইব্ন ইবরাহীম খলিলুল্লাহ্‌র সন্তান। শু'আয়ব ইব্ন মীকীল ইব্ন য়াশ্জান তাদের নবী। ইব্ন ইসহাক উপরোক্ত মত বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, শু'আয়ব (আ)-কে সুরিয়ানী ভাষায় বলা হয় বিনয়ূন। কিন্তু এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। শু'আয়ব (আ)-এর নসবনামায় বিভিন্ন মত দেখতে পাওয়া যায়। কেউ বলেন, শু'আয়ব ইব্ন য়াশ্খার ইব্ন লাবায় ইব্ন ইয়া'কূব। কেউ বলেছেন, শু'আয়ব ইব্ন নুওয়ায়ব ইব্ন আয়ফা ইব্ন মাদ্য়ান ইব্ন ইবরাহীম। কারও মতে, শু'আয়ব ইব্ন দায়ফূর ইব্ন আয়ফা ইব্ন ছাবিত ইব্ন মাদ্য়ান ইব্ন ইবরাহীম। এ ছাড়া আরও বিভিন্ন মত রয়েছে।

ইব্ন আসাকির (র) বলেন, হযরত লূত (আ)-এর কন্যা ছিলেন হযরত শু'আয়বের মা; মতান্তরে, তিনি ছিলেন তাঁর নানী। যে কয়জন লোক ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল

শু'আয়ব (আ) ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে হিজরত করেন ও তাঁর সাথে দামেশ্‌কে যান। ওহব ইব্‌ন মুনাব্বিহ্ বলেন, শু'আয়ব ও মালগাম দু'জনে হযরত ইব্‌রাহীম (আ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের দিন তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। উভয়ে তাঁর সাথে সিরিয়ায় হিজরতও করেন। সেখানে তিনি লূত (আ)-এর দুই কন্যাকে তাঁদের দু'জনের সাথে বিবাহ দেন। ইব্‌ন কুতায়বা এভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উপরোক্ত কোন মতই সন্দেহমুক্ত নয়।

আবূ উমর ইব্‌ন আবদুর বার (র) 'ইস্‌তি'আব' গ্রন্থে সালামা ইব্‌ন সা'দ আল আনাযী প্রসঙ্গে লিখেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর আনাযা পর্যন্ত তিনি তাঁর বংশ পঞ্জিকাও উল্লেখ করেন। রাসূল (সা) বললেন, কতই না উত্তম এ আনাযা গোত্র, তারা ছিল নির্যাতিত এবং এরাই সেই সাহায্যপ্রাপ্ত শু'আয়বের অনুসারী এবং মূসা (আ)-এর শ্বশুর গোষ্ঠী। এ বর্ণনা সঠিক হলে প্রমাণিত হয় যে, হযরত শু'আয়ব মূসা (আ)-এর সমগোত্রীয় এবং তিনি আদি আরবদের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁর কবীলার নাম আনাযা। তবে এরা আনাযা ইব্‌ন আসাদ ইব্‌ন রাবীআ ইব্‌ন নাযার ইব্‌ন মা'দ ইব্‌ন আদনান গোত্র নয়। কেননা, এই আনাযা উপরোক্ত আনাযার দীর্ঘকাল পরে এসেছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

সহীহ ইব্‌ন হিব্বান গ্রন্থে আম্বিয়া ও রসূলগণের বিবরণ অধ্যায়ে হযরত আবূ যর (রা)-এর বর্ণিত একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ নবীদের মধ্যে চারজন নবী আরবের যথা—হূদ, সালিহ্, শু'আয়ব ও তোমাদের নবী, হে আবূ যর! কোন কোন প্রাচীন বিজ্ঞ আলিম হযরত শু'আয়ব (আ)-কে 'খতীবুল আম্বিয়া' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা, তিনি তার সম্প্রদায়কে ঈমান গ্রহণের জন্যে যে দাওয়াত পেশ করেন তার শব্দ ও ভাষা ছিল অতি উচ্চাঙ্গের এবং বক্তব্য ও উপস্থাপনা ছিল অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। ইব্‌ন ইসহাক (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূল (সা) যখনই হযরত শু'আয়ব (আ)-এর উল্লেখ করতেন তখনই তিনি বলতেন ঃ তিনি ছিলেন খতীবুল আম্বিয়া (নবীগণের খতীব)। মাদ্‌য়ানবাসীরা ছিল কাফির, ডাকাতি ও রাহাজানি করত, পথচারীদেরকে ভয়-ভীতি দেখাত এবং আয়কার উপাসনা করত। আয়কা ছিল পার্শ্ববর্তী অরণ্যের একটি ঘন শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গাছের নাম। তাদের লেন-দেনের ক্ষেত্রে তারা ছিল অত্যন্ত জঘন্য। ওজনে এবং মাপে তারা খুবই কম দিত। পক্ষান্তরে কারও থেকে নেওয়ার সময় বেশি বেশি নিত। আল্লাহ্ তাদেরই মধ্য থেকে শু'আয়ব (আ)-কে তাদের রসূলরূপে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে আহ্বান জানান। মাপে ও ওজনে কম দেয়া এবং পথিকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি দুষ্কর্ম থেকে নিষেধ করেন। কিছু লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনল, কিন্তু অধিকাংশই কুফরীর উপর অটল থাকল। ফলে আল্লাহ তাদের উপর কঠিন আযাব নাযিল করেন।

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ.

মাদ্‌য়ানবাসীদের কাছে তাদের স্ব-গোত্রীয় শু'আয়বকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ্‌র দাসত্ব কবূল কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল এসে গেছে। (৭ ঃ ৮৫)

অর্থাৎ আমি তোমাদের নিকট যা কিছু বিধি-বিধান নিয়ে এসেছি তার সত্যতার উপর সুস্পষ্ট দলীল ও অকাট্য প্রমাণ এসে গেছে। আর তিনি যে আমাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন তার প্রমাণও এসে গেছে। এই দলীল ও প্রমাণ হল সেই সব মু'জিযা যা হযরত শু'আয়ব (আ)-এর হাতে আল্লাহ্ প্রকাশ করেন। সেই মু'জিযাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের কাছে না পৌঁছলেও আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ (بينة) থেকে মোটামুটি এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلاَحِهَا.

মাপে ও ওজনে পুরোপুরি দাও। মানুষের প্রাপ্য বস্তু কম দিও না এবং সমাজকে সংস্কারের পর ফিৎনা ফাসাদ সৃষ্টি করো না। (৭ ঃ ৮৫)

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাদেরকে জুলুমের পথ পরিহার করে ইনসাফের পথে চলার নির্দেশ দেন। অন্যথায় তাদেরকে কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেন। অতঃপর বলেন ঃ

ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ. وَلاَ تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ.

'তোমরা মু'মিন হলে এটাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর এবং ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে প্রতিটি রাস্তায় বসে থেকো না।' অর্থাৎ পথের উপর বসে পথিকদেরকে ভয় দেখিয়ে তাদের সম্পদ ও শুল্ক আদায় করো না। উপরোক্ত আয়াত (لاَ تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُوْنَ.) এর ব্যাখ্যায় সাহাবীদের বরাত দিয়ে সুদ্দী (র) বলেছেন যে, তারা পথিকদের থেকে তাদের পণ্য দ্রব্যের এক-দশমাংশ টোল আদায় করত। ইসহাক ইব্‌ন বিশর.... ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায় ছিল সীমালংঘনকারী, বিদ্রোহী— তারা রাস্তার উপরে বসে থাকত يَبْخَسُوْنَ النَّاسَ অর্থাৎ তারা মানুষের নিকট থেকে তাদের এক-দশমাংশ উসূল করত। এ প্রথা তারাই সর্বপ্রথম চালু করে।

وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِهٖ وَتَبْغُوْنَهَا عِوَجًا.

'আল্লাহ্‌র প্রতি যারা ঈমান পোষণ করে তাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দিও না আর আল্লাহ্‌র পথের মধ্যে বক্রতা তালাশ করো না।' আল্লাহ্ তাদেরকে দুনিয়ার ডাকাতি ও দীনের ডাকাতি উভয়টা থেকে নিষেধ করে দেন।

وَاذْكُرُوْا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيْلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ.

'স্মরণ কর, সেই সময়ের কথা যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেন, আর তোমরা লক্ষ্য করে দেখ, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কেমন হয়!' (৭ ঃ ৮৫-৮৬)

প্রথমে তারা সংখ্যায় কম ছিল, পরে আল্লাহ্ তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন— এই নিয়ামতের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। এরপর যদি তারা আল্লাহ্‌র প্রদর্শিত পথের বিরুদ্ধে যায় তাহলে সে জন্যে যে শাস্তি আসবে তার হুমকি দেয়া হয়। অন্য এক ঘটনায় তাদের উদ্দেশে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنِّيْ أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَّإِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيْطٍ.

'মাপে ও ওজনে কম দিও না, আমি তো তোমাদেরকে সচ্ছল অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। আমি তোমাদের উপর এক সামগ্রিক আযাব আসার আশংকা করছি।' অর্থাৎ তোমরা যে অপরাধে অভ্যস্ত হয়ে গেছ তার উপর অবিচল থেকো না, অন্যথায় তোমাদের ধন-সম্পদের বরকত আল্লাহ্ তা'আলা উঠিয়ে নেবেন, তোমাদেরকে অভাবগ্রস্ত করে দেবেন। উপরন্তু থাকবে পরকালের আযাব। আর যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই রকম উভয় শাস্তি একত্রিত হবে, সে ব্যক্তি মহা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এই কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রথমে হালকাভাবে ঐসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন এবং দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র নিয়ামত উঠিয়ে নেয়ার ভয় দেখিয়েছেন ও আখিরাতের শাস্তি থেকে হুঁশিয়ার করেছেন এবং কঠোরভাবে সাবধান করে দিয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহ্ নির্দেশের সুরে বলেন ঃ

وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَلَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. وَلَا تَعْثَوْا فِى الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ. بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ.

হে আমার সম্প্রদায়! ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপবে ও ওজন করবে। লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে আল্লাহ্ অনুমোদিত যা বাকি থাকবে তোমাদের জন্যে তাই উত্তম। আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই। (১১ ঃ ৮৪-৮৬)

ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও হাসান বসরী (র) بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ رزق الله خير لكم من اخذ اموال الناس অর্থাৎ— 'আল্লাহ্ যা কিছু রিযিক তোমাদেরকে দান করেন তা ঐসব সম্পদের তুলনায় অনেক ভাল যা তোমরা মানুষের থেকে জোরপূর্বক আদায় কর।'

ইব্‌ন জারীর (র) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন; ওজনে কম দিয়ে মানুষের সম্পদ নেয়ার চাইতে মাপ ও ওজন সঠিকভাবে পুরোপুরি দেওয়ার পর যা কিছু মুনাফা অবশিষ্ট থাকে, তা-ই তোমাদের জন্যে বহুগুণে উত্তম। ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। হাসান বসরী (র) যে ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নের আয়াত তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঃ

قُلْ لَا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ-

'বল, পবিত্র বস্তু ও অপবিত্র বস্তু সমান হয় না, যদিও অপবিত্র বস্তুর আধিক্য তোমার কাছে আকর্ষণীয় হোক না কেন।' অর্থাৎ হালাল জিনিস যদি কমও হয় তবুও তা তোমাদের জন্যে ভাল হারাম জিনিস থেকে, যদিও তা বেশি হয়। কেননা, হালাল জিনিস কম হলেও তা বরকতময়; পক্ষান্তরে হারাম জিনিস বেশি হলেও তা বরকত শূন্য।

আল্লাহ্ বলেছেন ঃ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

অর্থাৎ—'আল্লাহ্ সূদকে বিলুপ্ত করেন এবং দান-সাদকাকে বৃদ্ধি করেন।'

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সূদের মাল যতই বেশি হোক না কেন, ক্রমান্বয়ে তা ফুরিয়ে যায়। ইমাম আহমদ (র) তাঁর মুসনাদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। রসূল (সা) আরও বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্যে গ্রহণ ও বর্জনের ইখতিয়ার থাকে যতক্ষণ তারা আলাদা হয়ে না যায়। যদি তারা সততার সাথে বেচা-কেনা করে এবং পণ্যের দোষ-গুণ প্রকাশ করে দেয় তাহলে এ ব্যবসায়ে উভয়কে বরকত দান করা হয়। আর যদি তারা পণ্যের দোষ-গুণ গোপন রাখে এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাহলে উভয়ের থেকে এ বেচা-কেনায় বরকত উঠিয়ে নেয়া হয়। মোটকথা, হালাল মুনাফা কম হলেও তাতে বরকত হয়, কিন্তু হারাম মুনাফা বেশি হলেও তাতে বরকত থাকে না। এ কারণেই নবী শু'আয়ব (আ) বলেছিলেন ঃ

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

আল্লাহ্র অনুমোদিত যা-ই বাকি থাকে তা-ই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। আল্লাহ্র বাণী ঃ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ 'আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই' অর্থাৎ তোমাদেরকে আমি যা করার নির্দেশ দিয়েছি তোমরা তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে কর, আমাকে বা অন্যকে দেখাবার জন্যে নয়।

আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالُوْا يَا شُعَيْبُ أَصَلٰوتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَّفْعَلَ فِيْ أَمْوَالِنَا مَا نَشٰؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ.

তারা বলল, হে শু'আয়ব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃ-পুরুষরা যার ইবাদত করতো আমাদেরকে তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও না? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, সদাচারী। (১১ ঃ ৮৭)

শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায় এ কথাটি ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাসস্বরূপ বলেছে। তারা বলেছে, এই যে সালাত তুমি পড়ছ তা কি তোমাকে আমাদের বিরোধিতা করতে বলে যে, আমরা কেবল তোমার আল্লাহ্রই ইবাদত করব এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষগণ যাদের ইবাদত করত তাদেরকে ত্যাগ করে দেব? কিংবা তুমি যেভাবে চাও সেভাবে আমরা আমাদের লেনদেন করব আর যেভাবে চাও না সেভাবে আমাদের পছন্দনীয় লেনদেন করা ছেড়ে দেব? إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ। (নিশ্চয় তুমি একজন ধৈর্যশীল, সত্যপন্থী) এ প্রসঙ্গে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), মায়মূন ইব্ন মিহরান, ইব্ন জুরায়জ, যায়দ ইব্ন আসলাম (রা) এবং ইব্ন জারীর (র) বলেন, এ উক্তি তারা ঠাট্টা ও বিদ্রূপাত্মকভাবে করেছে।

قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا. وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ. اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ.

শু'আয়ব বলল, হে আমার সম্প্রদায়! এ ব্যাপারে তোমরা ভেবে দেখেছ কি, আমি যদি আমার পালনকর্তার সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, আর তিনি যদি আমাকে তাঁর কাছ থেকে উত্তম রিযিক দান করেন, তবে কি করে আমি আমার কর্তব্য থেকে বিরত থাকবো? আমি তোমাদেরকে যা নিষেধ করি, আমি নিজে তা করতে ইচ্ছা করি না। আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাই। আমার কার্য-সাধন তো আল্লাহ্‌রই সাহায্যে। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী। (১১ ঃ ৮৮)

এখানে হযরত শু'আয়ব (আ) কোমল ভাষায় কিন্তু সুস্পষ্ট ইংগিতে তাঁর সম্প্রদায়কে সত্যের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন। তিনি বলছেন—তোমরা কি একটু চিন্তা করে দেখেছ, হে মিথ্যাবাদীর দল! اِنْ كُنْتُ عَلٰي بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّىْ 'আমি যদি আমার রবের প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি।' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট নির্দেশের উপর যে, তিনি আমাকে তোমাদের নিকট রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন ঃ وَرَزَقَنِىْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا 'এবং তাঁর কাছ থেকে আমাকে উত্তম রিযিক দান করেছেন' উত্তম রিযিক অর্থ নবুওত ও রিসালাত। অর্থাৎ তোমরা যদি তা বুঝতে না পার, তবে তোমাদের ব্যাপারে আমার আর কি করার আছে ? এ কথাটি ঠিক তদ্রূপ যা নূহ (আ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন ঃ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ .

'যে কাজ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করি আমি সে কাজ নিজে করতে ইচ্ছা করি না।' অর্থাৎ তোমাদেরকে যে কাজ করতে আদেশ করি সে কাজ সর্বপ্রথম আমিই করি; আর যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করি তা থেকে সর্বপ্রথম আমি-ই বিরত থাকি। বস্তুত পক্ষে এটা একটা উৎকৃষ্ট ও মহান গুণ। এর বিপরীত আচরণ অত্যন্ত জঘন্য ও নিকৃষ্ট। বনী ইসরাঈলের শেষ দিকের আলিম ও ধর্মোপদেশদাতাগণ এই দোষে দুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ.

'তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের আদেশ দাও এবং নিজেদেরকে বিস্মৃত হও? অথচ তোমরাই তো কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না?' (২ ঃ ৪৪)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং তা নিয়ে সে ঘুরপাক খেতে থাকবে, যেমনটি গাধা আটা পেষার চাক্কি নিয়ে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। দোযখবাসীরা তার কাছে এসে জড়ো হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক! তোমার একি দশা, তুমি না সৎ কাজের আদেশ দিতে ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে? সে বলবে, হ্যাঁ, আমি সৎ কাজের আদেশ করতাম কিন্তু নিজে তা করতাম না এবং অসৎ কাজ থেকে

নিষেধ করতাম কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম। এ আচরণ নবীদের নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী—পাপিষ্ঠ ও দুর্বৃত্তদের নীতি। পক্ষান্তরে জ্ঞানী-গুণী উলামা যাঁরা না দেখেই আল্লাহকে ভয় করে চলে তাঁদের অবস্থা হয় সেই রকম, যেমন নবী শু'আয়ব (আ) বলেছেন ঃ

وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيْدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ.

অর্থাৎ—আমার যাবতীয় কর্মতৎপরতার উদ্দেশ্য হল, সাধ্য অনুযায়ী কথা ও কাজের সংশোধন ও সংস্কার করা। وَمَا تَوْفِيْقِىْ إِلاَّ بِاللّٰهِ. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ.

অর্থাৎ—'সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ই আমাকে সাহায্য ও ক্ষমতা দান করবেন। সকল বিষয়ে তাঁর উপরই আমি ভরসা রাখি এবং সকল ব্যাপারে তাঁর দিকেই আমি প্রত্যাবর্তন করি।' এ হল তারগীব বা উৎসাহ প্রদান। এরপর হযরত শু'আয়ব (আ) কিছুটা তারহীব বা ধমকের সুরে বলেন ঃ

وَيَا قَوْمِ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىْ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ. وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ.

হে আমার সম্প্রদায়! আমার বিরোধিতা যেন কিছুতেই তোমাদেরকে এমন অপরাধ না করায় যাতে তোমাদের উপর তার অনুরূপ বিপদ আসবে, যেরূপ বিপদ আপতিত হয়েছিল কওমে নূহ, কওমে হূদ কিংবা কওমে সালিহ্র উপর আর কওমে লূত তো তোমাদের থেকে খুব দূরে নয়। (১১ ঃ ৮৯)

অর্থাৎ আমার সাথে তোমাদের শত্রুতা এবং আমি যে দীন নিয়ে এসেছি তার সাথে বিদ্বেষ ভাব যেন তোমাদেরকে গুমরাহী, মূর্খতা ও শত্রুতার উপর অবিচল থাকতে বাধ্য না করে। এরূপ হলে তোমাদের উপর সেই ধরনের আযাব ও শাস্তি আসবে, যে ধরনের আযাব ও শাস্তি এসেছিল কওমে নূহ, কওমে হূদ ও কওমে সালিহ-এর মিথ্যাচারী বিরুদ্ধাচারীদের উপর।

وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ (কওমে লূত তো তোমাদের থেকে দূরে নয়) 'দূরে নয়' এই কথাটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে; (১) সময়ের দিক থেকে, অর্থাৎ কুফর ও জুলুমের কারণে কওমে লূতের উপর যে শাস্তি এসেছিল সে ঘটনা বেশি দিনের নয়। তাদের সব বর্ণনাই তোমাদের কাছে পৌঁছেছে। (২) স্থান ও অবস্থানের দিক দিয়ে। অর্থাৎ কওমে লূতের বিধ্বস্ত এলাকা তোমাদের বাসস্থান থেকে দূরে নয়। (৩) নীতি ও কর্মের দিক থেকে। অর্থাৎ কওমে লূত যেমন ডাকাতি-রাহাজানি করত, মানুষের ধন-সম্পদ জোরপূর্বক কেড়ে নিত এবং বিভিন্ন রকম গোপন ফাঁদ আঁটত, তোমরাও তাই করছ। অবশ্য উপরোক্ত তিনটি মতকে এখানে একত্রেও বলা যেতে পারে, যেমন কওমে লূত সময়ের দিক থেকে, অবস্থানের দিক থেকে এবং কর্মনীতির দিক থেকে দূরে নয়। অতঃপর ভয় ও আগ্রহ সৃষ্টি সমন্বিত আহ্বানস্বরূপ বলেন ঃ

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا إِلَيْهِ. إِنَّ رَبِّىْ رَحِيْمٌ وَّدُوْدٌ.

'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁর কাছে তওবা কর। আমার প্রতিপালক নিশ্চয় দয়ালু প্রেমময়।' (১১ ঃ ৯০)

অর্থাৎ তোমরা যেসব অপরাধে জড়িত আছ, তা বর্জন কর এবং দয়াময় প্রেমময় প্রতিপালকের নিকট তওবা কর। কেননা, যে ব্যক্তি তাঁর কাছে তওবা করে, তিনি তার তওবা কবূল করেন। কারণ সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহের চেয়ে বান্দাহ্‌র প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া অধিকতর।

قَالُوْا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا.

তারা বলল, হে শু'আয়ব! তুমি যা বল তার অধিকাংশই আমরা বুঝি না, আমরা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল—শক্তিহীন দেখতে পাচ্ছি। (১১ : ৯১)

ইব্‌ন আব্বাস, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও ছাওরী (রা) বলেছেন, হযরত শু'আয়ব (আ)-এর চোখে দৃষ্টিশক্তি ছিল না। মারফূ হাদীসে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র মহব্বতে নবী শু'আয়ব (আ) এতো অধিক পরিমাণ কান্নাকাটি করেন যে, তিনি অন্ধ হয়ে যান। আল্লাহ্ তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন। আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করলেন, হে শু'আয়ব! তোমার কান্নাকাটি কি জাহান্নামের ভয়ে, নাকি জান্নাতের লোভে ? শু'আয়ব (আ) বলেন, বরং আপনার মহব্বতেই কাঁদি। আমি যখন আপনাকে দেখব, তখন আমার প্রতি কি করা হবে তার পরোয়া আমি করি না। আল্লাহ্ তখন ওহীর মাধ্যমে জানালেন, হে শু'আয়ব! আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ খুবই আনন্দময় হবে। এ জন্যে আমি ইমরানের পুত্র মূসা কালীমুল্লাহকে তোমার খিদমতে নিয়োগ করেছি। এ হাদীস ওয়াহিদী ... শাদ্দাদ ইব্‌ন আমীন (রা) সূত্রে রসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত 'গরীব' হাদীস। খাতীব বাগদাদী (র) একে যয়ীফ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ.

তোমার আত্মীয়বর্গ না থাকলে আমরা তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করতাম। তুমি আমাদের উপর শক্তিশালী নও। (১১ : ৯১)

এটি ছিল তাদের কট্টর কুফরী ও জঘন্য শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ। এ কারণেই তারা বলেছেঃ ما نفقه كثيرا مما تقول (তুমি যা বল তার অধিকাংশই আমরা বুঝি না।) অর্থাৎ আমরা তা উপলব্ধি করি না। কেননা ওসব আমরা পছন্দ করি না, চাইও না। ওর প্রতি আমাদের কোন আগ্রহ নেই, আকর্ষণও নেই। ওদের এ কথাটি ঠিক কুরায়শ কাফিরদের সেই কথার সাথে মিলে যায়, যা তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উদ্দেশ করে বলেছিল :

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ وَفِيْ آذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُوْنَ.

ওরা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহ্বান করছো সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত। আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং আমাদের ও তোমার মাঝে রয়েছে অন্তরাল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর, আমরা আমাদের কাজ করি। (৪১ : ৫)

وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا (আমরা আমাদের মধ্যে তোমাকে দুর্বল দেখতে পাচ্ছি) অর্থাৎ নিঃসঙ্গ ও পরিত্যাজ্য وَلَوْلَا رَهْطُكَ অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যদি তোমার গোত্র ও আত্মীয়বর্গ না থাকত। لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ (তবে আমরা অবশ্যই তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করতাম। তুমি আমাদের উপর শক্তিশালী নও।)

يَا قَوْمِي أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ (হে আমার সম্প্রদায়! আমার আত্মীয়-স্বজন কি আল্লাহ্র চাইতেও তোমাদের উপর অধিক শক্তিশালী ?)। অর্থাৎ তোমরা আমার গোত্র ও স্বজনদেরকে ভয় কর এবং তাদের কারণে আমাকে খাতির করছ, অথচ আল্লাহ্র পাকড়াওকে ভয় করছ না এবং আল্লাহ্র রসূল হওয়ার কারণে আমাকে খাতির করছ না। ফলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আমার গোত্র ও আত্মীয়-স্বজনই তোমাদের উপর আল্লাহ্র চাইতে অধিক শক্তিশালী। وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا (আর আল্লাহকে তোমরা পশ্চাতে ফেলে রেখেছ) অর্থাৎ আল্লাহ্র দিকে তোমরা পিঠ দিয়ে রেখেছে। إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (তোমরা যা-ই কর, আমার প্রতিপালক তা পরিবেষ্টন করে আছেন।) অর্থাৎ তোমরা যা কিছু কাজ-কর্ম কর না কেন সে সব বিষয়ে আল্লাহ্ পূর্ণভাবে অবগত আছেন। যখন তাঁর কাছে ফিরে যাবে, তখন তিনি এর প্রতিফল দান করবেন।

وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ . وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ.

হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অবস্থানের উপর থেকে কাজ কর, আমি আমার কাজ করতে থাকি। অচিরেই জানতে পারবে যে, আযাব কার উপর আসে, যা তাকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বে? এবং আরও জানতে পারবে যে, মিথ্যাবাদী কে? তোমরা অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম। (সূরা হূদ ঃ ৯৩)

এটা স্বাভাবিক আদেশ নয় যে, তাদে রকে তাদের রীতি-নীতি ও অভ্যাস পদ্ধতির উপরে থাকার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে বরং এটা ধমকের সুরে কঠোর হুঁশিয়ারি বাণী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। শীঘ্রই জানতে পারবে যে, পরকালের শুভ পরিণতি কার ভাগ্যে জুটে এবং ধ্বংস ও বিনাশ কাকে গ্রাস করে। مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ (কার উপর লাঞ্ছনাকর আযাব আসে) এ আযাব দুনিয়ায় তাদের উপর পতিত আযাবকে বুঝান হয়েছে। وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ- (এবং তাদের উপর স্থায়ী আযাব চেপে বসবে)-এ আযাব হল আখিরাতের আযাব। وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ (আর কে মিথ্যাবাদী) অর্থাৎ যে বিষয়ে সংবাদ দেয়া হচ্ছে। সুসংবাদ ও সতর্কবাণী শুনান হচ্ছে সে বিষয়ে তোমাদের ও আমার মধ্যে কে মিথ্যাবাদী তা অতি শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ 'তোমরাও অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করতে থাকি।' নিম্নের আয়াতে এ আয়াতের সাদৃশ্য আছে, যাতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا . وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا . قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ. قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

إِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّٰهُ مِنْهَا. وَمَا يَكُوْنُ لَنَا أَنْ نَعُوْدَ فِيْهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا. رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ.

আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তাতে যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল বিশ্বাস না করে, তবে ধৈর্যধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানগণ বলল, 'হে শু'আয়ব! তোমাকে ও তোমার সাথে যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবই। অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতে হবে।' সে বলল, কী আমরা তা ঘৃণা করলেও? তোমাদের ধর্মাদর্শ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে উদ্ধার করার পর যদি আমরা তাতে ফিরে যাই তবে তো আমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করব। আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা না করলে আর ওতে ফিরে যাওয়া আমাদের কাজ নয়। সব কিছুই আমাদের প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত। আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করি; হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যায্যভাবে মীমাংসা করে দিন এবং আপনিই মীমাংসাকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (৭ ঃ ৮৭-৮৯)

শু'আয়ব (আ)-এর সম্প্রদায় তাদের ধারণা মতে ঈমান গ্রহণকারীদেরকে পূর্ব-ধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার কামনা করেছিল। নবী শু'আয়ব (আ) তাদের এ আশা প্রত্যাখ্যান করে বলেন ঃ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِيْنَ (আমরা যদি অপছন্দ করি তবুও কি?) অর্থাৎ এরা স্বেচ্ছায় তোমাদের ধর্মে ফিরে আসবে না। যদি ফিরে আসে তবে বুঝতে হবে শক্তি প্রয়োগের ফলে অসন্তুষ্টি ও অনিচ্ছায় ফিরে এসেছে। কেননা, আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে যে ব্যক্তি ঈমান আনে তার সে ঈমান কেউ কেড়ে নিতে পারে না, কেউ তাকে তা থেকে ফিরাতে পারে না, কারও পক্ষে তা সম্ভবও নয়। এ জন্যেই বলেছেন ঃ

قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِىْ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللّٰهُ مِنْهَا. وَمَا يَكُوْنُ لَنَا أَنْ نَعُوْدَ فِيْهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا.

'আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা অপবাদকারী হয়ে যাব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই। অথচ তিনি আমাদেরকে এ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আমাদের কাজ নয় ঐ ধর্মে ফিরে যাওয়া কিন্তু আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যদি চান। আমাদের প্রতিপালক প্রত্যেক বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহর প্রতিই আমরা ভরসা করছি।' অর্থাৎ আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই আমাদের রক্ষাকারী। সকল বিষয়ে তিনিই আমাদের আশ্রয় স্থল। অতপর হযরত শু'আয়ব (আ) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য কামনা করেন এবং তারা যে শাস্তির যোগ্য তার সত্বর আগমন কামনা করেন। তিনি বলেন ঃ

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ.

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মধ্যে ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দিন যথার্থ ফয়সালা। আপনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালা দানকারী।' (৭ ঃ ৮৯)

এভাবে হযরত শু'আয়ব (আ) তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। আর আল্লাহর রাসূলদের যারা অস্বীকার করে, অবাধ্য হয় ও বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের বিরুদ্ধে রসূলদের প্রার্থনা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সম্প্রদায়ের লোক যে নীতির উপর ছিল তার উপরই তারা অটল অবিচল হয়ে রইল ঃ

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُوْنَ.

তার সম্প্রদায়ের কাফির সর্দাররা বলল ঃ যদি তোমরা শু'আয়বের অনুসরণ কর, তবে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আল্লাহর বাণী ঃ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ.

'অনন্তর তাদেরকে ভূমিকম্প পাকড়াও করল। ফলে তারা সকাল বেলায় ঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল।' (৭ ঃ ৯০-৯১)

সূরা আ'রাফে বলা হয়েছে, ভূমিকম্প তাদেরকে পাকড়াও করেছিল। অর্থাৎ এক মহা কম্পন তাদের গোটা আবাসভূমিকে সজোরে আঘাত করে। ফলে তাদের দেহ থেকে তাদের রূহ্ উধাও হয়ে যায়। গোটা এলাকার জীব-জন্তু জড়-বস্তুর ন্যায় নিশ্চল হয়ে পড়ে। তাদের শবদেহগুলো নিথর হয়ে যত্রতত্র পড়ে থাকে। উক্ত জনগোষ্ঠীর উপর আল্লাহ বিভিন্ন প্রকার আযাব ও শাস্তি নাযিল করেন। যখন তারা বিভিন্ন প্রকার অন্যায় ও জঘন্য পাপাচারে লিপ্ত হলো, তখন আল্লাহ তাদের উপর মহাকম্পন পাঠালেন। যার ফলে সকল চলাচল মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যায়। বিকট আওয়াজ পাঠান যার ফলে অপর সকল আওয়াজ নীরব হয়ে যায়। আগুনের মেঘ পাঠান, যার লেলিহান শিখা চতুর্দিক থেকে তাদেরকে বেষ্টন করে ফেলে। কিন্তু বিভিন্ন সূরায় আলোচনার পূর্বাপরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেখানে যেমন প্রয়োজন আল্লাহ্ সেখানে ততটুকুই উল্লেখ করেছেন। সূরা আ'রাফের বক্তব্যে কাফির সর্দাররা আল্লাহর নবী ও তাঁর সাথীদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে। এলাকা থেকে বহিষ্কারের হুমকি দেয় অথবা তাদেরকে তাদের পূর্বের কুফরী ধর্ম গ্রহণ করতে হবে। এই পটভূমিতে আল্লাহ বলেন ঃ

فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ.

'অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত করল। ফলে তারা তাদের ঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল'।'

এখানে তাদের বহিষ্কারের হুমকি ও ধমকের মোকাবিলায় ভূমিকম্পের কথা এবং ভীতি প্রদর্শনের মোকাবিলায় ভয়ের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং পূর্বাপর আলোচনার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে। অপর দিকে সূরা হূদে বলা হয়েছে এক বিকট শব্দ তাদেরকে আঘাত করে।

ফলে তারা নিজেদের ঘর-বাড়িতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। এর কারণ ঐ সূরায় বর্ণিত হয়েছে যে, তারা নবীকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করে বলতো ঃ

أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَايَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَؤُا. إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ.

'তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা যেগুলোর ইবাদত করত আমরা তা বর্জন করি? কিংবা আমাদের ধনসম্পদ আমাদের ইচ্ছামত ব্যবহার না করি? তুমি তো অবশ্যই সহিষ্ণু, সদাচারী।' (১১ ঃ ৮৭)

সুতরাং আল্লাহর রসূলকে এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা বলার কারণে এখানে এই ভয়ানক বিকট শব্দের উল্লেখ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। সূরা শু'আরায় বলা হয়েছে যে, এক মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব তাদেরকে গ্রাস করেছিল। এর কারণ হল, তারা এ জাতীয় আযাব নিয়ে আসার জন্য তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। সুতরাং তাদের আগ্রহ অনুযায়ী সেই আযাবের কথা বলাই সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছে। কেননা তারা বলেছিল ঃ

إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ. قَالَ رَبِّيْ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

'তুমি তো জাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। তুমি আমাদেরই মত একজন মানুষ বৈ তো নও। আমাদের ধারণা, তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যদি সত্যবাদী হও, তবে আকাশের এক খণ্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। সে বলল, তোমরা যা কর, আমার পালনকর্তা সে সম্পর্কে ভাল জানেন।' (২৬ ঃ ১৮৫-১৮৯)

আল্লাহ বলেন ঃ

فَكَذَّبُوْهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

অতঃপর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করলো। ফলে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব পাকড়াও করল। নিশ্চয়ই সেটা ছিল এক ভীষণ দিবসের আযাব। (২৬ ঃ ১৯০)

কাতাদা (র) সহ কতিপয় মুফাসসিরের মতে, আয়কাবাসী ও মাদ্য়ানবাসী অভিন্ন সম্প্রদায় নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন দুইটি সম্প্রদায়। কিন্তু তাদের এ মত দুর্বল। এ মতের পক্ষে দুইটি যুক্তি পেশ করা হয়;

(১) আল্লাহর বাণী ঃ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ (আয়কাবাসীরা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছে। যখন শু'আয়ব তাদেরকে বলল....) এখানে 'তাদের স্বগোত্রীর শু'আয়ব' বলা হয়নি কিন্তু মাদয়ানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ঃ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا অর্থাৎ মাদয়ানবাসীদের কাছে তাদের স্বগোত্রীয় শু'আয়বকে রসূলরূপে পাঠালাম; (২) আয়কাবাসীদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ঃ 'মেঘাচ্ছন্ন দিবসের' (يَوْمُ الظُّلَّةِ)-

আযাব তাদেরকে গ্রাস করে। আর মাদয়ানবাসীদের শাস্তির কথা বলা হয়েছে যে, ভূমিকম্প ও মহানাদ (اَلرَّجْفَةُ وَالصَّيْحَةُ) তাদেরকে আঘাত হানে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, كَذَّبَ اَصْحَابُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ এর পরে না বলে বলা হয়েছে اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ شُعَيْبٌ কেননা, এখানে কথা বলা হয়েছে আয়কার অধিবাসীদের সম্বোধন করে, সুতরাং এ ক্ষেত্রে তাদের স্বগোত্রীয় বলা সংগতিপূর্ণ নয়। কিন্তু যেখানে গোত্রকে সম্বোধন (مَدْيَنَ)- করা হয়েছে, সেখানে 'তাদের স্বগোত্রীয়' বলাই যুক্তিসংগত। প্রকৃত পক্ষে এ একটি সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই ঃ يَوْمُ الظُّلَّةِ বা 'মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি' এই একটি স্বতন্ত্র শাস্তির উল্লেখ দেখেই যদি বলা হয় যে, এরা ভিন্ন সম্প্রদায়, তা হলে رَجْفَةٌ বা ভূমিকম্প এবং صَيْحَةٌ বা নাদ এ দু'টি স্বতন্ত্র শাস্তির থেকেও দলীল নেয়া যেতে পারে যে, এরাও দু'টি ভিন্ন সম্প্রদায়—যাদের এক দলের উপর ভূমিকম্প ও অপর দলের উপর নাদ-রূপে আযাব এসেছিল। কিন্তু এমন কথা কেউই বলেননি। তবে হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) হযরত শু'আয়ব নবীর আলোচনা প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইব্‌ন উছমান (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) বর্ণিত একটি মারফূ' হাদীসের উল্লেখ করেছেন ঃ

ان مدين واصحاب الايكة امتان بعث الله اليهما شعيبا عليه السلام.

অর্থাৎ মাদয়ানবাসী ও আয়কাবাসী দু'টি সম্প্রদায়। উভয়ের কাছে আল্লাহ হযরত শু'আয়ব (আ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করেন। কিন্তু এ হাদীসটি 'গরীব' পর্যায়ের। এর সনদে বিতর্কিত ব্যক্তিও রয়েছেন। সম্ভবত এটা হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-এর নিজস্ব উক্তি যা তিনি ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় বনী ইসরাঈলের কাহিনী সম্পর্কে প্রাপ্ত দুই উট বোঝাই পাণ্ডুলিপি থেকে নিয়ে থাকবেন।

এছাড়া লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তা'আলা আয়কাবাসীদের সেই সব দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করেছেন, যেগুলো মাদয়ানবাসীদের মধ্যেও ছিল। যেমন ঃ ওজনে ও মাপে কম দেওয়া ইত্যাদি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উভয়ে একই সম্প্রদায়ভুক্ত। বিভিন্ন প্রকার শাস্তি তাদের উপর পতিত হয়। অবশ্য বিভিন্ন সূরায় আলোচনার পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন রকম সম্বোধন করা হয়েছে।

আল্লাহর বাণী ঃ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ.

'মেঘাচ্ছন্ন দিবসের আযাব তাদেরকে গ্রাস করে নিল। এটা ছিল ভয়াবহ দিবসের শাস্তি। (সূরা শু'আরা ঃ ১৮৯)

মুফাসসিরগণ বলেছেন ঃ শু'আয়বের সম্প্রদায় প্রচণ্ড গরমে আক্রান্ত হয়। আল্লাহ সাত দিন পর্যন্ত তাদের উপর বায়ু প্রবাহ বন্ধ রাখেন। ফলে পানি, ছায়া ও ঝর্ণাধারা তাদের কোন কাজেই আসেনি। তখন তারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে চলে যায়। এক টুকরা মেঘ এসে তাদেরকে ছায়াদান করে। সম্প্রদায়ের সবাই ঐ মেঘের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। সকলে যখন সমবেত হল তখন আল্লাহ তাদের উপর অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ

করেন। গোটা এলাকাব্যাপী প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয় এবং আকাশ থেকে এক ভয়াবহ নাদ আসে। ফলে সকলের প্রাণ বায়ু উড়ে যায়, ঘরবাড়ি উজাড় হয় এবং নিজ নিজ ঘরের মধ্যে তারা উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। যারা শু'আয়ব (আ)-কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিল, তারা এরূপ নিশ্চিহ্ন হলো যে, এখানে যেন তারা কোন দিনই বসবাস করেনি। যারাই শু'আয়ব (আ)-কে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হল। পক্ষান্তরে, আল্লাহ শু'আয়ব (আ)-কে ও তাঁর সাথের মুমিনদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করেন।

আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دِيَارِهِمْ جَاثِمِيْنَ. كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا. اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ.

যখন আমার নির্দেশ এল, তখন আমি শু'আয়ব ও তার সঙ্গী ঈমানদারগণকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করেছিলাম, তারপর যারা সীমালংঘন করেছিল, মহানাদ তাদেরকে আঘাত হানলো। ফলে তারা নিজ নিজ ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। যেন তারা সেখানে কখনও বসবাসই করেনি। জেনে রেখো, ধ্বংস ছিল মাদ্‌য়ানবাসীদের পরিণাম যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল ছামূদ সম্প্রদায়। (১১ ঃ ৯৪-৯৬)

আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُوْنَ. فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِىْ دَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ. اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا. اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعَيْبًا كَانُوْا هُمُ الْخَاسِرِيْنَ.

তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসী প্রধানগণ বলল, তোমরা যদি শু'আয়বের অনুসরণ কর তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারপর এক ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত করল। ফলে তারা ঘরের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে রইল, যারা শু'আয়বকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিল। মনে হবে যেন এখানে তারা কখনও বসবাস করেনি। শু'আয়বকে যারা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করছিল, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।' (৭ ঃ ৯০-৯২)

এ কথাটি তাদেরই কথার পাল্টা হিসাবে বলা হয়েছে। কারণ তারা বলেছিল ঃ

لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَّخَاسِرُوْنَ.- (যদি তোমরা শু'আয়বের অনুগামী হও তবে অবশ্যই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৭ ঃ ৯০)

সম্প্রদায়ের ধ্বংসের পরে নবী শু'আয়ব (আ) দুঃখ করে যে কথা বলেছিলেন সে প্রসংগে আল্লাহর বাণী ঃ

يٰقَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّىْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ. فَكَيْفَ اٰسٰى عَلٰى قَوْمٍ كَافِرِيْنَ.

'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদের উপদেশ দিয়েছি। এখন আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্যে কী করে আক্ষেপ করি (৭ ঃ ৯৩)।

অর্থাৎ তাদের ধ্বংসের পরে তিনি তাদের এলাকা থেকে এই কথা বলে চলে আসেন যে, يَا قَوْمِي لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ (হে আমার সম্প্রদায়! আমি আমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছিয়ে দিয়েছি এবং তোমাদেরকে উপদেশ দান করেছি) অর্থাৎ পৌঁছিয়ে দেয়ার ও উপদেশ দেয়ার যে দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়েছিল তা আমি পূর্ণরূপে আদায় করেছি এবং তোমাদের হিদায়াতের জন্যে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার এসব প্রচেষ্টা তোমাদের কোন উপকারে আসেনি। কেননা যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথে চলে আল্লাহ তাকে হিদায়াত করেন না, আর তার কোন সাহায্যকারীও থাকে না। অতএব, এরপর আমি তোমাদের ব্যাপারে আক্ষেপ করব না। কেননা তোমরা উপদেশ গ্রহণ করনি, লাঞ্ছিত হবার দিনকে ভয় করনি। এ জন্যেই তিনি বলেছেন, 'কিভাবে আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্যে আক্ষেপ ও দুঃখ প্রকাশ করব! অর্থাৎ যা সত্য তা তোমরা মানছ না, সেদিকে প্রত্যাবর্তন করছ না এবং সেদিকে দৃষ্টিপাতও করতে প্রস্তুত নও। ফলে তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন আঘাত আসল, যা না যায় ফিরান আর না যায় প্রতিরোধ করা, আর না স্থগিত করা সম্ভব। কারও উপর পতিত হলে না সে এর থেকে রক্ষা পেতে পারে, না পলায়ন করে বাঁচতে পারে।

হাফিজ ইব্ন আসাকির (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, হযরত শু'আয়ব (আ) হযরত ইউসুফ (আ)-এর পরবর্তী কালের লোক। ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণিত, হযরত শু'আয়ব (আ) ও তাঁর সঙ্গী মুমিনগণ সকলেই মক্কা শরীফে ইনতিকাল করেন এবং তাঁদের কবর কা'বা গৃহের পশ্চিম পাশে দারুন-নাদওয়া ও দারে বনী-সাহ্মের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান-সন্ততি

ইতিপূর্বে আমরা হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ও ঘটনাপঞ্জি বর্ণনা করেছি। এরপর তাঁর সময়কালে সংঘটিত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ করেছি। অতঃপর কওমে শু'আয়ব অর্থাৎ মাদয়ানবাসীদের ঘটনা বর্ণনা করেছি। কারণ কুরআন মজীদের বহু স্থানে এ উভয় ঘটনাগুলো পাশাপাশি বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের ঘটনা বর্ণনার পরেই মাদয়ান বা আয়কাবাসীদের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কুরআনের অনুকরণে আমরা লূত (আ)-এর পরে শু'আয়ব (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছি। এখন আমরা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সন্তান-সন্ততি ও বংশধরদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। কেননা তাঁর বংশধরদের মধ্যেই আল্লাহ্ নবী ও কিতাব প্রেরণ সীমাবদ্ধ রাখেন। সুতরাং ইবরাহীম (আ)-এর পরে আগত প্রত্যেক নবীই তাঁর অধঃস্তন বংশধর।

হযরত ইসমাঈল (আ)

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর বেশ কয়েকজন পুত্র সন্তান ছিলেন যার উল্লেখ পূর্বেই আমরা করেছি। তবে তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন সে দু'জন যাঁরা ছিলেন মহান নবী। আবার এ দু'জনের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন ইসমাঈল (আ)। বিশুদ্ধ মতে যিনি ছিলেন যাবীহুল্লাহ। তিনিই ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম সন্তান। মাতা মিসরের কিবতী বংশের কন্যা হযরত হাজেরা। যারা হযরত ইসহাককে যাবীহুল্লাহ বলেছেন, তারা বনী ইসরাঈল থেকে এ মত প্রাপ্ত হয়েছেন। অথচ বনী ইসরাঈলগণ তাওরাত ও ইনজীলের মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে এবং এ ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাবের অপব্যাখ্যা দিয়েছে। তারা তাদের কাছে রক্ষিত আসমানী কিতাবের বক্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর প্রথম পুত্র কুরবানী করার নির্দেশ দেয়া হয়। অন্য বর্ণনা মতে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে যবেহ করার আদেশ দেয়া হয়। যেটাই ধরা হোক না কেন, এর দ্বারা হযরত ইসমাঈল (আ)-কেই বোঝানো হয়েছে। তাদের কিতাবে সুস্পষ্টভাবে রয়েছে যে, হযরত ইসমাঈল (আ) যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স ছিল ছিয়াশি বছর। আর যখন হযরত ইসহাক (আ)-এর জন্ম হয় তখন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বয়স একশ' বছরের উপরে। সুতরাং সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, ইসমাঈল (আ)-ই খলীলুল্লাহর প্রথম সন্তান। সুতরাং সর্বাবস্থায় তিনিই ছিলেন একক সন্তান। বাহ্যত তের বছরের অধিক কাল পর্যন্ত ইসমাঈল (আ) ছিলেন তাঁর একমাত্র সন্তান। এ সময়ের মধ্যে অন্য কোন সন্তানের জন্ম হয়নি। আর তাৎপর্যগত দিক থেকে একক এ হিসেবে যে, পিতা ইবরাহীম (আ) শিশু পুত্র ইসমাঈল (আ) ও তার মা হাজেরাকে নিয়ে হিজরত করেন এবং মক্কার ফারান পর্বতের উপত্যকায় উভয়কে নির্বাসিত করেন। তাঁদেরকে যখন তিনি রেখে আসেন তখন তাঁদের সাথে যৎসামান্য পানি ও রসদ ব্যতীত কিছুই ছিল না। এটা তিনি করেছিলেন আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রেখে। আল্লাহ তা'আলা আপন অনুগ্রহ ও করুণার দ্বারা তাঁদেরকে বেষ্টন করে নেন। বস্তুত তিনিই প্রকৃত অনুগ্রহকারী, সাহায্যকারী ও অভিভাবক। অতএব, প্রমাণিত হল যে, হযরত ইসমাঈল (আ)-ই বাহ্যিক ও তাৎপর্যগত উভয় দিক থেকে একক সন্তান। কিন্তু কে বুঝবে এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব এবং কে খুলবে এই শক্ত গিঁট। আল্লাহ যাকে গভীর তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন, তিনিই কেবল এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বিভিন্ন গুণাগুণের প্রশংসা করেছেন। যেমন ঃ তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, সহনশীল, ওয়াদা পালনকারী, সালাতের হেফাজতকারী। পরিবারবর্গকে সালাত আদায়ের নির্দেশ দানকারী—যাতে তারা আযাব থেকে রক্ষা পায় এবং মহান প্রভুর ইবাদতের দিকে মানুষকে আহ্বানকারী। আল্লাহর বাণী ঃ

فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلَامٍ حَلِيْمٍ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّىْ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّىْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى. قَالَ يٰاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ.

অতঃপর আমি তাকে এক ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দিলাম। তারপর সে যখন তার পিতার সাথে কাজ করবার মত বয়সে উপনীত হল, তখন ইবরাহীম বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বলল, হে আমার পিতা! আপনি যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন তা-ই করুন! আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। (৩৭ ঃ ১০১)

তিনি পিতার আহ্বানে সাড়া দেন এবং ওয়াদা করেন যে, তিনি ধৈর্যশীল হবেন। এ ওয়াদা তিনি পূরণও করেন এবং ধৈর্যধারণ করেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ. اِنَّا اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ. وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ.

স্মরণ কর, আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা। ওরা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। আমি তাদেরকে অধিকারী করেছিলাম এক বিশেষ গুণের তা ছিল পরলোকের স্মরণ। অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (৩৮ ঃ ৪৫-৪৭)

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ. وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ.

স্মরণ কর, ইসমাঈল, আল-য়াসা-আ ও যুল-কিফ্লের কথা, ওরা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন। (৩৮ ঃ ৪৮)।

আল্লাহর বাণী ঃ

وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصّٰبِرِيْنَ. وَاَدْخَلْنٰهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

এবং স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল কিফ্ল এর কথা তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। তাদেরকে আমি আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম। তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। (২১ ঃ ৮৫-৮৬)

আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ. وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ.

আমি তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করেছিলাম—ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরদের কাছে। (৪ ঃ ১৬৩)

আল্লাহর বাণী ঃ

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ.

তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকূব ও তার বংশধরদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। (২ ঃ ১৩৬)

অন্য অনেক সূরায় এ জাতীয় বহু আয়াত বিদ্যমান আছে। আল্লাহ বলেন ঃ

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ.

তোমরা কি বল যে, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরগণ ইহুদী কিংবা খৃস্টান ছিল? বল তোমরা কি বেশি জান, না আল্লাহ্? (২ ঃ ১৪০)

এসব আয়াতে আল্লাহ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর উত্তম গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁকে নবী ও রাসূল বানিয়েছেন এবং অজ্ঞ লোকেরা তাঁর প্রতি যেসব মিথ্যা ও অলীক কথা-বার্তা আরোপ করেছে তা থেকে তাঁর মুক্ত থাকার কথা ঘোষণা করেছেন। মুমিনদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন সেই সব বিধানের উপর বিশ্বাস রাখে যা ইসমাঈল (আ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল। নসব-নামা ও বংশ পঞ্জিকার পণ্ডিতগণ এবং মানব জাতির ঐতিহাসিক ঘটনা ও সভ্যতা বর্ণনাকারিগণ লিখেছেন যে, তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম ঘোড়ায় আরোহণকারী ব্যক্তি। এর পূর্বে ঘোড়া ছিল নেহায়েতই একটি বন্য প্রাণী। তিনি তা পোষ মানান ও তাতে আরোহণ করেন। সাঈদ ইব্ন ইয়াহ্‌য়া উমাবী (র) তাঁর 'মাগাযী' গ্রন্থে ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমরা ঘোড়া পুষবে এবং তার আদর-যত্ন করবে। কেননা এটা তোমাদের পিতা ইসমাঈল (আ)-এর মীরাছ বা উত্তরাধিকার। তদানীন্তন আরবরা ছিল বেদুঈন। হযরত ইসমাঈল (আ) আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে দাওয়াত দেন। তারা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। তিনিই সর্বপ্রথম প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় কথা বলেন। আদি আরবদের কাছ থেকে তিনি এ ভাষা শিখেছিলেন। তারা হল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বেকার জুরহুম, আমালিক ও ইয়ামানবাসী আরব যারা মক্কায় এসে বসবাস শুরু করেছিল।

ঐতিহাসিক উমাবী (র) মুহাম্মদ ইব্ন আলী ইব্ন হুসায়নের পূর্ব-পুরুষগণের বরাতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ 'স্পষ্ট আরবী ভাষায় যিনি সর্বপ্রথম কথা বলেন, তিনি ছিলেন ইসমাঈল (আ)। তখন তাঁর বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। আলী ইব্ন মুগীরা (র) এ কথা বর্ণনা করার সময় উপস্থিত জনৈক ইউনুস বললেন ঃ হে আবূ সাইয়ার! আপনি সত্য বলেছেন, আবূ জারীও আমার কাছে ঠিক এরূপই বর্ণনা করেছেন। ইতিপূর্বে আমরা বলে এসেছি যে, হযরত ইসমাঈল (আ) যৌবনে পদার্পণ করে আমালিকা সম্প্রদায়ের জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করেন এবং পরে পিতার নির্দেশক্রমে তাকে তালাক দেন। উমাবী ঐ মহিলার নাম বলেছেন আম্মারা বিনত সা'দ ইব্ন উসামা ইব্ন আকীল আল-আমালিকা। তারপর তিনি অপর এক

মহিলাকে বিবাহ করেন। পিতার আদেশ অনুযায়ী এই স্ত্রীকে তিনি বহাল রাখেন। এই স্ত্রীর নাম সায়্যিদা বিন্‌ত মাদাদ ইব্‌ন আমর আল-জুরহুমী। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত ইসমাঈল (আ)-এর ইনি ছিলেন তৃতীয় স্ত্রী। এই স্ত্রীর গর্ভে বারজন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেন। মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক (র) তাদের নাম বর্ণনা করেছেন।

যথা ঃ নাবিত (نابت), কায়যার (قيذر), আযবাল (ازبل), মীশী (ميشي), মাসমা (مسمع), মাশ (ماش), দাওসা (دوصا–), আযর (ازر), য়াতূর (يطور), নাবাশ (نبش), তায়মা (طيما) ও কায়যামা (قيذما)।

আহলি কিতাবগণ তাদের গ্রন্থাদিতেও এরূপই উল্লেখ করেছেন। তবে তাদের মতে, এই বারজন ছিলেন সমাজপতি যাদের সম্পর্কে পূর্বেই সুসংবাদ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের এ ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। হযরত ইসমাঈল (আ) মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী জুরহুম, আমালিক ও ইয়ামানবাসীদের প্রতি রসূলরূপে প্রেরিত হন। মৃত্যুকালে তিনি আপন ভাই ইসহাকের প্রতি ওসীয়ত করে যান। ইসমাঈল (আ) তাঁর কন্যা নাসমাকে তাঁর ভাতিজা ঈস ইব্‌ন ইসহাকের সাথে বিবাহ দেন। এই দম্পতির পুত্র সন্তানের নাম রূম। রূম-এর আওলাদদেরকে বানুল আসফার বলা হয়। কারণ, তাদের পিতা ঈস-এর গায়ের রং ছিল গেরুয়া। যাতে আরবীতে সুফর (صفر) বলা হয়ে থাকে। অপর বর্ণনা মতে, ঈস্‌-এর আরও দুই পুত্র ছিল— ইউনান ও আশবান। ইব্‌ন জারীর (র) এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি।

হযরত ইসমাঈল (আ)-কে হিজর নামক স্থানে মায়ের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ১৩৭ বছর। উমর ইবন আবদুল আযীয থেকে বর্ণিত ঃ ইসমাঈল (আ) মক্কার প্রচণ্ড গরম সম্পর্কে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন। আল্লাহ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানান যে, যেখানে তোমাকে দাফন করা হবে সে স্থানের দিকে আমি জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেব। কিয়ামত পর্যন্ত সেখানে জান্নাতের সুশীতল হাওয়া প্রবাহিত থাকবে।

হেজাযী আরবদের সকলেই নাবিত ও কায়জারের বংশ বলে নিজেদেরকে দাবি করে। পরবর্তীতে আমরা আরব জাতি, তাদের বংশ, গোত্র, সমাজ ও কবীলা ও তাদের কৃষ্টি, সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করব। হযরত ইসমাঈল (আ) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়ের যাবতীয় বর্ণনা এতে থাকবে। হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ) পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের উত্থান-পতন, তাদের নবীদের আলোচনা শেষে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করা হবে। অতঃপর বনী ইসরাঈলের যুগ এবং পরে আইয়ামে জাহিলিয়ার ঘটনাবলী এবং সবশেষে বিশ্বনবী (সা)-এর সীরাত মুবারক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইন্‌শাআল্লাহ্।

ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (আ)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর একশ' বছর বয়সকালে এবং ইসমাঈল (আ)-এর জন্মের চৌদ্দ বছর পর ইসহাক (আ)-এর জন্ম হয়। তাঁর মাতা সারাহ্কে যখন পুত্র হওয়ার সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তাঁর বয়স ছিল নব্বই বছর। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ.

আমি ইব্রাহীমকে ইসহাকের সু-সংবাদ দিয়েছিলাম— সে ছিল একজন নবী ও সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত। আমি ইব্রাহীমের প্রতি ও ইসহাকের প্রতি বরকত দান করেছিলাম। তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মশীল এবং কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী। (৬৭ ঃ ১১২-১১৩)

আল্লাহ্ কুরআনের অনেক আয়াতে ইসহাক (আ)-এর প্রশংসা করেছেন। আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত এ মর্মের হাদীসে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ একজন সম্মানিত ব্যক্তি, যাঁর পিতাও ছিলেন সম্মানিত, তাঁর পিতাও ছিলেন সম্মানিত এবং তাঁর পিতাও ছিলেন সম্মানিত। তিনি হলেন ইউসুফ ইব্ন ইয়া'কূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম। আহলি কিতাবগণ বলেন, ইসহাক (আ) তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে পিতার জীবদ্দশায় রুফাকা বিনত বাৎওয়াইলকে বিবাহ করেন। রুফাকা ছিলেন বন্ধ্যা। তাই ইসহাক (আ) সন্তানের জন্যে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেন। এরপর স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা হন এবং তিনি জময দুই পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তাদের প্রথমজন্মের নাম রাখা হয় 'ঈসূ' যাকে আরবরা 'ঈস' বলে তাকে। এই ঈস হচ্ছেন রূমের পিতা। দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সময় থাকে তার ভাইয়ের পায়ের গোড়ালি আঁকড়ে থাকতে দেখা যায়। এই কারণে তার নাম রাখা হয় ইয়া'কূব। কেননা এ শব্দটির মূল ধাতু (عقب) অর্থ গোড়ালি বা পশ্চাতে আগমনকারী। তাঁর অপর নাম ইসরাঈল, যার নামে বনী-ইসরাঈল বংশের নামকরণ করা হয়েছে।

কিতাবীগণ বলেন, হযরত ইসহাক (আ) ইয়াকূবের তুলনায় ঈসূকে অধিকতর ভালবাসতেন; কারণ তিনি ছিলেন প্রথম সন্তান। পক্ষান্তরে তাঁদের মা রুফাকা ইয়াকূবকে বেশি ভালবাসতেন; কেননা, তিনি ছিলেন কনিষ্ঠ। ইসহাক (আ) যখন বয়োবৃদ্ধ হন এবং তাঁর দৃষ্টি-শক্তি হ্রাস পায়, তখন তিনি পুত্র ঈসের নিকট একটি উত্তম আহার্য চান। তিনি একটি পশু শিকার করে রান্না করে আনার জন্যে ঈসকে নির্দেশ দেন। যা আহার করে তিনি তার জন্যে বরকত ও কল্যাণের দু'আ করবেন। ঈস শিকার কাজে পারদর্শী ছিলেন। তাই তিনি শিকারে বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে রুফাকা তার প্রিয় পুত্র ইয়াকূবকে পিতার দু'আ লাভের জন্যে পিতার

চাহিদা অনুযায়ী দু'টি উৎকৃষ্ট ছাগল ছানা যবেহ করে খাদ্য প্রস্তুত করে ভাইয়ের পূর্বেই পিতার সম্মুখে পেশ করার আদেশ দেন। খাদ্য তৈরি হবার পর মা রুফাকা ইয়াকূবকে ঈসের পোশাক পরিয়ে দেন এবং উভয় হাতে ও কাঁধের উপরে ছাগলের চামড়া জড়িয়ে দেন। কারণ ঈসের শরীরে বেশি পরিমাণ লোম ছিল, ইয়াকূবের শরীরে সেরূপ লোম ছিল না। তারপর যখন খাদ্য নিয়ে ইয়াকূব পিতার কাছে হাযির হলেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ আপনার ছেলে। তখন পিতা তাকে কাছে টেনে নেন ও আলিঙ্গন করেন। তবে তিনি মুখে ব্যক্ত করলেন যে, কণ্ঠস্বর তো ইয়াকূবের মত কিন্তু শরীর ও পোশাক ঈসের বলে মনে হয়। আহার শেষে তিনি দু'আ করলেন যে, ভাইদের মধ্যে তিনি যেন অধিকতর ভাগ্যবান হন, ভাইদের উপরে ও পরবর্তী বংশধরদের উপরে যেন তাঁর নির্দেশ ও প্রভাব কার্যকরী হয় এবং তিনি অধিক পরিমাণ জীবিকা ও সন্তানের অধিকারী হন।

পিতার নিকট থেকে ইয়াকূব চলে আসার পর তাঁর ভাই ঈস সেই খাদ্য নিয়ে পিতার কাছে হাযির হন যা খাওয়ানোর জন্যে তিনি তাকে আদেশ করেছিলেন। পিতা জিজ্ঞেস করলেন, বৎস! এ আবার তুমি কি নিয়ে এসেছ? ঈস বললেন ঃ এতো সেই খাদ্য যা আপনি খেতে চেয়েছিলেন। পিতা বললেন, এই কিছুক্ষণ পূর্বে কি তুমি খাদ্য নিয়ে আসনি এবং তা আহার করে কি তোমার জন্যে আমি দু'আ করিনি? ঈস বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, আমি আসিনি। তিনি তখন বুঝতে পারলেন যে, ইয়াকূবই আমার আগে এসে এ কাজ করে গেছে। তিনি ইয়াকূবের উপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেন। কিতাবীদের বর্ণনা মতে, এমনকি পিতার মৃত্যুর পর তাকে হত্যা করার হুমকিও দেন। তারপর পিতার নিকট দু'আ চাইলে পিতা তাঁর জন্যে ভিন্ন দু'আ করেন। তিনি দু'আ করলেন যেন ঈসের সন্তানরা শক্ত যমীনের অধিকারী হয়, তাদের জীবিকা ও ফল-ফলাদি যেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইয়াকূব (আ)-এর প্রতি ঈসের হুমকির কথা তাদের মার শ্রুতিগোচর হলে তিনি ইয়াকূব (আ)-কে তাঁর ভাই অর্থাৎ ইয়াকূবের মামা লাবানের কাছে চলে যেতে নির্দেশ দেন। লাবান হারানে বসবাস করতেন। ঈসের ক্রোধ প্রশমিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করার জন্যে তিনি তাঁকে পরামর্শ দেন। এ ছাড়া তিনি লাবানের কন্যাকে বিয়ে করতেও তাঁকে বলে দেন। এরপর তিনি তাঁর স্বামী ইসহাক (আ)-কে এ ব্যাপারে অনুমতি ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দান এবং তার জন্য দু'আ করতে বলেন। হযরত ইসহাক তাই করলেন। ইয়াকূব (আ) ঐ দিন বিকেলেই তাদের কাছ থেকে বিদায় নেন। তারপর যেখানে পৌঁছলে সন্ধ্যা হয় সেখানে একটি পাথর মাথার নিচে রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখেন, যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত একটি সিঁড়ি স্থাপিত রয়েছে। ফেরেশতাগণ সেই সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করছেন। আর আল্লাহ তাঁকে ডেকে বলছেন ঃ আমি তোমাকে বরকতে পরিপূর্ণ করব, তোমার সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করব, তোমাকে ও তোমার বংশধরদেরকে এই যমীনের অধিকারী বানাব। ঘুম থেকে জেগে এরূপ একটি স্বপ্নের জন্যে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং মানত করেন যে, আল্লাহ যদি আমাকে নিরাপদে পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেন তাহলে এই স্থানে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে একটি ইবাদতখানা নির্মাণ করব; যা কিছু রিযিক পাব তার এক-দশমাংশ আল্লাহ্‌র রাহে দান করব। তারপর সেই পাথরটি চেনার

সুবিধার্থে তার উপর কিছু তেল ঢেলে দেন। তিনি এই স্থানের নাম রাখেন বায়তুঈল অর্থাৎ বায়তুল্লাহ। এটাই বর্তমান কালের বায়তুল মুকাদ্দাস যা হযরত ইয়াকূব (আ) পরবর্তীকালে নির্মাণ করেছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে।

আহলি কিতাবগণ আরো বলেন যে, হযরত ইয়াকূব (আ) হারানে পৌঁছে মামার কাছে উপস্থিত হন। মামা লাবানের ছিল দুই কন্যা। বড়জনের নাম লায়্যা এবং ছোটজনের নাম রাহীল। রূপ-লাবণ্যে ছোটজনই শ্রেষ্ঠ। তাই ইয়াকূব মামার কাছে ছোটজনকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। মামা এই শর্তে বিবাহ দিতে রাযী হন যে, সাত বছর পর্যন্ত তাঁর মেষ পালের দেখাশোনা করতে হবে। সাত বছর অতীত হবার পর লাবান বিবাহের আয়োজন করেন। লোকজনকে দাওয়াত দেন এবং আপ্যায়িত করেন এবং রাতে জ্যেষ্ঠ কন্যা লায়্যাকে ইয়াকূবের নিকট বাসরঘরে প্রেরণ করেন। লায়্যা দেখতে কুৎসিত ও ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্না ছিলেন। সকাল বেলা ইয়াকূব তাঁর কাছে লায়্যাকে দেখতে পেয়ে মামার নিকট অভিযোগ করলেন যে, আপনি কেন আমার সাথে প্রতারণা করলেন? আমি তো আপনার কাছে রাহীলের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। উত্তরে মামা বললেন, এটা আমাদের সামাজিক রীতি নয় যে, জ্যেষ্ঠা কন্যাকে রেখে কনিষ্ঠা কন্যাকে বিয়ে দেব। এখন যদি তুমি এর বোনকে বিয়ে করতে চাও তবে আরও সাত বছর কাজ কর, তাহলে তাকেও তোমার সাথে বিয়ে দেব। সুতরাং ইয়াকূব (আ) আরও সাত বছর কাজ করলেন। তারপর তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যার সাথে কনিষ্ঠ কন্যাকেও ইয়াকূব (আ)-এর কাছে বিয়ে দেন। এরূপ দুই কন্যাকে একই ব্যক্তির সাথে বিবাহ দেওয়া তাদের শরীআতে বৈধ ছিল। পরবর্তীকালে তাওরাতের মাধ্যমে এ বিধান রহিত হয়ে যায়। এই একটি দলীলই রহিত হবার জন্যে যথেষ্ট। কেননা, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর কর্মই এটা বৈধ ও মুবাহ হওয়ার প্রমাণবহ। কারণ, তিনি ছিলেন মাসূম বা নিষ্পাপ। লাবান তাঁর উভয় কন্যার সাথে একটি করে দাসী দিয়েছিলেন। লায়্যার দাসীর নাম ছিল যুলফা এবং রাহীলের দাসীর নাম ছিল বালহা। লায়্যার যে ঘাটতি ছিল আল্লাহ্ তাকে কয়েকটি সন্তান দান করে সে ঘাটতি পূরণ করেন। সুতরাং লায়্যার গর্ভে ইয়াকূব (আ)-এর প্রথম সন্তান রূবীল দ্বিতীয় সন্তান শাম্‌উন, তৃতীয় সন্তান লাবী এবং চতুর্থ সন্তান য়াহূযা। রাহীলের কোন সন্তান হত না, তাই তিনি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন এবং নিজের দাসী বালহাকে ইয়াকূব (আ)-এর কাছে সমর্পণ করলেন। ইয়াকূব (আ) দাসীর সাথে মিলিত হলে এক পুত্র সন্তান জন্ম হয়। নাম রাখা হয় দান। বালহা দ্বিতীয়বার গর্ভ ধারণ করে এবং দ্বিতীয়বারও পুত্র সন্তান জন্ম হয়। এর নাম রাখা হয় নায়ফ্‌তালী। এবার লায়্যাও তাঁর দাসী যুলফাকে ইয়াকূব (আ)-এর কাছে সমর্পণ করেন। যুলফার গর্ভেও দুই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়; একজনের নাম হাদ এবং অপরজনের নাম আশীর। তারপর লায়্যা নিজেও সন্তান-সম্ভবা হন এবং পঞ্চম পুত্রের মা হন। এ পুত্রের নাম রাখা হয় আয়সাখার। পুনরায় লায়্যা গর্ভবতী হলে ষষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয় যার নাম রাখা হয় যাবিলূন। এরপর তিনি সপ্তম সন্তানরূপে এক কন্যা সন্তান প্রসব করেন যার নাম রাখা হয় দিনা। এভাবে লায়্যার গর্ভে ইয়াকূব (আ)-এর সাত সন্তানের জন্ম হয়। তারপর স্ত্রী রাহীল একটি পুত্র সন্তানের জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা কবূল করেন। ফলে আল্লাহ্‌র নবী ইয়াকূব (আ)-এর ঔরসে তাঁর গর্ভে এক সুন্দর সুশ্রী মহান পুত্র সন্তান জন্মলাভ করেন যাঁর নাম রাখা হয় ইউসুফ।

এ পরিবারের সকলেই হারানে বসবাস করতে থাকেন। ইয়াকূব (আ) মামার উভয় কন্যাকে বিবাহ করার পর আরও ছয় বছর পর্যন্ত তাঁর মেষ চরান। অর্থাৎ সর্বমোট বিশ বছর তিনি মামার কাছে অবস্থান করেন। তখন হযরত ইয়াকূব (আ) নিজ পরিবারবর্গের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্যে মামার কাছে অনুমতি চান। মামা তাঁকে বললেন, তোমার কারণে আমার ধন-সম্পদে অনেক বরকত হয়েছে। অতএব, আমার সম্পদের যে পরিমাণ ইচ্ছে, তুমি আমার কাছে চেয়ে নাও। ইয়াকূব (আ) বললেন, তাহলে এই বছরে আপনার বকরীর যতগুলো বাচ্চা হবে তা থেকে যেগুলোর রং হবে সাদা-কালো ফোঁটা বিশিষ্ট, সাদা-কালো মিশ্রিত, কালো অংশ বেশি ও সাদা অংশ কম কিংবা মাথার দু'দিকে টাকপড়া সাদা এ জাতীয় বাচ্চাগুলো আমাকে দিন। মামা তার দাবি মেনে নেন। সে মতে মামার ছেলেরা পিতার মেষ-পাল থেকে এ জাতীয় বকরীগুলো বেছে বেছে আলাদা করে নিলেন এবং সেগুলোকে পিতার মেষ-পাল থেকে তিন দিনের দূরত্বে নিয়ে যান। যাতে করে ঐ জাতীয় বাচ্চা জন্ম হতে না পারে। এ দেখে ইয়াকূব (আ) সাদা রং-এর তাজা বাদাম ও দালাব নামক ঘাস সংগ্রহ করলেন এবং সেগুলো ছিঁড়ে ঐসব বকরীর খাওয়ার পানিতে ফেললেন। উদ্দেশ্য এই যে, বকরী ঐ দিকে তাকালে ভীত হবে এবং পেটের মধ্যের বাচ্চা নড়াচড়া করবে। ফলে সে সব বাচ্চা উপরোক্ত রং-বিশিষ্ট হয়ে জন্মাবে। বস্তুত এটা ছিল একটি অলৌকিক ব্যাপার এবং ইয়াকূব নবীর অন্যতম মু'জিযা। এভাবে নবী ইয়াকূব (আ) প্রচুর সংখ্যক বকরী, পশু ও দাস-দাসীর মালিক হন এবং এ কারণে তাঁর মামার ও মামার ছেলেদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়, যেন ইয়াকূব (আ)-এর কারণে তারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন।

আল্লাহ্ ওহীযোগে ইয়াকূব (আ)-কে নির্দেশ দেন যে, তুমি তোমার জন্মভূমিতে নিজ জাতির কাছে চলে যাও। এ সময় আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করেন। অতঃপর ইয়াকূব (আ) নিজ স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের কাছে বিষয়টি পেশ করেন। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর আনুগত্যের পক্ষে সাড়া দেন। সুতরাং ইয়াকূব (আ) তাঁর পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদ সাথে নিয়ে রওয়ানা হয়ে পড়েন। আসার সময় স্ত্রী রাহীল তার পিতার মূর্তিসমূহ লুকিয়ে নিয়ে আসেন। তাঁরা যখন ঐ এলাকা অতিক্রম করেন তখন লাবান (রাহীলের পিতা) ও তাঁর সম্প্রদায় তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হন। লাবানকে না জানিয়ে আসার জন্যে তিনি ইয়াকূব (আ)-কে মৃদু ভর্ৎসনা করে বললেন, আমাকে জানিয়ে আসলে ধুমধামের সাথে কন্যাদের ও তাদের সন্তানদের বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে পারতাম। ঢোল-তবলা ও বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়ে আমোদ-ফুর্তি করে বিদায় দিতাম। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার মূর্তি কেন নিয়ে এসেছ? মূর্তির ব্যাপারে ইয়াকূব (আ) কিছুই জানতেন না। তাই তিনি অস্বীকার করে বললেন, আমরা তো মূর্তি আনিনি। লাবান তাঁর কন্যা ও দাসীদের অবস্থান স্থল ও জিনিসপত্র তল্লাশি করলেন কিন্তু কিছুই পেলেন না। রাহীল ঐ মূর্তিটি নিজ বাহনের পৃষ্ঠদেশে বসার স্থানে গদির নীচে রেখে দিয়েছিলেন। তিনি সে স্থান থেকে উঠলেন না এবং ওযর পেশ করে জানালেন যে, তিনি ঋতুবতী। সুতরাং তিনি তা উদ্ধার করতে ব্যর্থ হলেন।

অবশেষে শ্বশুর-জামাতা উভয়ে তথায় অবস্থিত জালআদ নামক একটি টিলার কাছে পরস্পরে এ মর্মে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে, ইয়াকূব (আ) লাবানের কন্যাদেরকে ত্যাগ করবেন না

এবং তাঁদের বর্তমানে অন্য কাউকে বিয়ে করবেন না এবং এই টিলা অতিক্রম করে লাবান ও ইয়াকূব কেউই অন্যের দেশে যাবেন না। অতঃপর খাবার পাক হল। উভয় পক্ষ একত্রে আহার করলেন এবং একে অপরকে বিদায় জানিয়ে প্রত্যেকে স্ব-স্ব দেশের পানে যাত্রা করলেন। ইয়াকূব (আ) সাঈর এলাকা পর্যন্ত পৌঁছলে ফেরেশতাগণ এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। ইয়াকূব (আ) সেখান থেকে একজন দূতকে তাঁর ভাই ঈসের নিকট প্রেরণ করেন, যাতে ভাই তাঁর প্রতি সদয় হন এবং কোমল আচরণ করেন। দূত ফিরে এসে ইয়াকূব (আ)-কে এই সংবাদ দিল যে, ঈস চারশ' পদাতিক সৈন্যসহ আপনার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ সংবাদ পেয়ে ইয়াকূব (আ) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। আল্লাহ্র কাছে দু'আ করেন, সালাত আদায় করেন, কাকুতি-মিনতি জানান এবং ইতিপূর্বে প্রদত্ত সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করেন এবং ঈসের অনিষ্ট থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এছাড়া তিনি তাঁর ভাইকে দেয়ার জন্যে বিপুল পরিমাণ উপঢৌকন তৈরি রাখলেন। উপঢৌকনের মধ্যে ছিল দু'শ' ছাগী, বিশটা ছাগল, দু'শ' ভেড়ী, বিশটা ভেড়া, ত্রিশটা দুধেল উটনী, চল্লিশটা গাই, দশটি ষাঁড়, বিশটি গাধী ও দশটা গাধা। তারপর তিনি এ পশুগুলোর প্রত্যেক শ্রেণীকে আলাদা আলাদাভাবে হাঁকিয়ে নেওয়ার জন্যে রাখালদেরকে নির্দেশ দেন এবং এর এক-একটি শ্রেণী থেকে আর একটি শ্রেণীর মাঝে দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ দেন। এরপর তাদেরকে বলে দেন যে, ঈসের সাথে প্রথমে যার সাক্ষাৎ হবে এবং ঈস বলবেন, তুমি কার লোক এবং এ পশুগুলো কার? তখন উত্তর দিবে, আপনার দাস ইয়াকূবের। মনিব-ঈসের জন্যে তিনি এগুলো হাদিয়াস্বরূপ পাঠিয়েছেন। এরপর যার সাথে দেখা হবে এবং তার পরে যার সাথে সাক্ষাৎ হবে সবাই ঐ একই উত্তর দিবে। আর তোমরা প্রত্যেকেই এ কথা বলবে যে, তিনি আমাদের পেছনে আসছেন।

সবাইকে বিদায় করার দুইদিন পর ইয়াকূব (আ)-সহ তাঁর দুই স্ত্রী, দুই দাসী এবং এগার পুত্র যাত্রা শুরু করেন। তিনি রাত্রিকালে পথ চলতেন এবং দিনের বেলা বিশ্রাম নিতেন। যাত্রার দ্বিতীয় দিন প্রভাতকালে ইয়াকূব (আ)-এর সম্মুখে জনৈক ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে দেখা দেন। ইয়াকূব (আ) তাঁকে একজন পুরুষ মানুষ বলে ধারণা করেন। ইয়াকূব (আ) তাঁকে পরাস্ত করার জন্যে অগ্রসর হন এবং ধস্তাধস্তির মাধ্যমে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইয়াকূব (আ) জয়ী হন। তবে ফেরেশতার দ্বারা ইয়াকূব (আ) তাঁর উরুতে আঘাত প্রাপ্ত হন। তখন তিনি খোঁড়াতে থাকেন। প্রভাতের আলো ফুটে উঠলে ফেরেশতা ইয়াকূব (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম কি? উত্তরে তিনি বললেন, আমার নাম ইয়াকূব (আ)। ফেরেশতা বললেন, এখন থেকে আপনার নাম হবে ইসরাঈল। ইয়াকূব (আ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পরিচয় কি এবং আপনার নাম কি? প্রশ্ন করার সাথেই ফেরেশতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তখন ইয়াকূব (আ) বুঝতে পারলেন যে, ইনি ফেরেশতা। পায়ে আঘাত পেয়ে ইয়াকূব (আ) খোঁড়া হয়ে আছেন। বনী-ইসরাঈলগণ এ কারণে উরু-হাঁটুর মাংসপেশী খান না।

তারপর ইয়াকূব (আ) দেখতে পান যে, তাঁর ভাই ঈস চারশ' লোকের এক বাহিনী নিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তিনি পরিবারবর্গকে পেছনে রেখে সম্মুখে যান। ঈস সম্মুখে উপস্থিত হলে তাকে দেখেই ইয়াকূব (আ) সাতবার তাঁকে সিজদা করেন। এই সিজদা ছিল সে যুগে সাক্ষাৎকালের সালাম বা অভিবাদন (সম্মান সূচক) এবং তাঁদের শরীআতে এ সিজদা বৈধ ছিল।

যেমন ফেরেশতারা হযরত আদম (আ)-কে সম্মানসূচক সিজদা করেছিলেন এবং হযরত ইউসুফ (আ)-কে তাঁর পিতা-মাতা ও ভাইয়েরা সিজদা করেছিলেন। এ সম্পর্কে আলোচনা সামনে আসবে। ইয়াকূব (আ)-এর এ আচরণ দেখে ঈস তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁকে আলিঙ্গন করে চুমো খেলেন এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তারপর চোখ তুলে তাকাতেই নারী ও বালকদেরকে দেখে ঈস ইয়াকূব (আ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, এদেরকে তুমি কোথায় পেলে? ইয়াকূব (আ) বললেন, আল্লাহ্ই আপনার দাসকে এসব দান করেছেন। এ সময় দাসীদ্বয় ও তাদের সন্তানরা ঈসকে সিজদা করল। এরপর লায়্যা ও তার সন্তানরা সিজদা করে এবং শেষে রাহীল ও তার পুত্র ইউসুফ এসে ঈসকে সিজদা করেন। এরপর ইয়াকূব (আ) তাঁর ভাইকে দেয়া হাদিয়াগুলো গ্রহণ করার জন্য বারবার অনুরোধ জানালে ঈস তা গ্রহণ করেন। এরপর ঈস সেখান থেকে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন, তখন তিনি আগে-আগে ছিলেন এবং ইয়াকূব ও তার পরিবার-পরিজন, দাস-দাসী ও পশু সম্পদসহ তার পিছে পিছে সাঈর পর্বতের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

সাহূর নামক স্থান অতিক্রমকালে তিনি সেখানে একটি ঘর নির্মাণ করেন এবং পশুগুলোর জন্যে ছাউনি তৈরি করেন। এরপর শাখীম এলাকার উর-শালীম (اورشليم) নামক গ্রামের সন্নিকটে অবতরণ করেন এবং শাখীম ইব্ন জামূর-এর এক খণ্ড জমি একশ' ভেড়ার বিনিময়ে ক্রয় করেন। সেই জমিতে তিনি তাঁবু স্থাপন করেন এবং একটি কুরবানীগাহ্ তৈরি করেন। তিনি এর নাম রাখেন 'ঈল-ইলাহে ইসরাঈল'। এই কুরবানীগাহটি আল্লাহ্ তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করার আদেশ দিয়েছিলেন। এটাই বর্তমান কালের বায়তুল মুকাদ্দাস। পরবর্তীকালে সুলায়মান ইব্ন দাঊদ (আ) এ ঘরের সংস্কার করেন। এটাই সেই চিহ্নিত পাথরের জায়গা যার উপর তিনি ইতিপূর্বে তেল রেখেছিলেন—যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

আহ্লি কিতাবগণ এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, যা ইয়াকূব (আ)-এর স্ত্রী লায়্যার পক্ষের কন্যা দীনা সম্পর্কিত। ঘটনা এই যে, শাখীম ইব্ন জামূর দীনাকে জোরপূর্বক তার বাড়িতে ধরে নিয়ে যায়। তারপর দীনার পিতা ও ভাইদের কাছে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। দীনার ভাইয়েরা জানাল যে, তোমরা যদি সকলে খাতনা করাও তাহলে আমাদের সাথে তোমাদের বৈবাহিক সম্পর্ক হতে পারে। কেননা, খাত্নাবিহীন লোকদের সাথে আমরা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করি না। শাখীমের সম্প্রদায়ের সবাই সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে খাতনা করাল। খাত্না করাবার পর তৃতীয় দিবসে তাদের ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয়। এই সুযোগে ইয়াকূব (আ)-এর সন্তানগণ তাদের উপর হামলা করে। শাখীম ও তার পিতা জামূরসহ সকলকে হত্যা করে ফেলে। হত্যার কারণ ছিল তাদের অসদাচরণ, তদুপরি তারা ছিল মূর্তিপূজারী, কাফির। এ কারণে ইয়াকূব (এ)-এর সন্তানরা তাদেরকে হত্যা করে এবং তাদের ধন-সম্পদ গনীমত হিসেবে নিয়ে নেয়।

এরপর ইয়াকূব (আ)-এর কনিষ্ঠ স্ত্রী রাহীল পুনরায় সন্তান-সম্ভবা হন এবং পুত্র বিন-য়ামীন জন্মগ্রহণ করেন। রাহীল বিন-য়ামীন প্রসব করতে গিয়ে খুবই কষ্ট পান। ফলে সন্তান ভূমিষ্ঠ

হওয়ার অব্যবহিত পরে রাহীলের ইনতিকাল হয়। ইয়াকূব (আ) আফরাছ অর্থাৎ বায়তু-লাহ্মে (বেথেলহামে) তাঁকে দাফন করেন। তিনিই তার কবরের উপর একটি পাথর রেখে দিয়েছিলেন যা আজও বিদ্যমান আছে। হযরত ইয়াকূব (আ)-এর সন্তানের মধ্যে বারজন পুত্র। এদের মধ্যে লায়্যার গর্ভে যাঁদের জন্ম হয় তাঁরা হচ্ছেন (১) রূবীল, (২) শাম'উন, (৩) লাবী, (৪) য়াহূযা, (৫) আয়াখার ও (৬) যায়িলূন। রাহীলের গর্ভে জন্ম হয় (৭) ইউসুফ ও (৮) বিন-য়ামীনের। রাহীলের দাসীর গর্ভে জন্ম হয় (৯) দান ও (১০) নায়ফতালী-এর। লায়্যা দাসীর গর্ভে জন্ম হয় (১১) হাদ ও (১২) আশীর-এর। অতঃপর হযরত ইয়াকূব (আ) কানআনের হিবরূন গ্রামে চলে আসেন এবং তথায় পিতার সান্নিধ্যে থাকেন। হযরত ইব্রাহীম (আ)-ও এখানেই বসবাস করতেন। রোগাক্রান্ত হয়ে হযরত ইসহাক (আ) একশ' আশি বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর পুত্রদ্বয় ঈস ও ইয়াকূব (আ) তাঁকে তার পিতার পূর্বোল্লেখিত তাদের কেনা জমিতে হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর কবরের পাশে সমাহিত করেন।

ইসরাঈলের জীবনে সংঘটিত আশ্চর্য ঘটনাবলী

ইসরাঈলের জীবনে যে সব আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হয় তন্মধ্যে ইউসুফ ইব্ন রাহীলের ঘটনা অন্যতম। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ কুরআনে একটি স্বতন্ত্র সূরা নাযিল করেছেন, যাতে মানুষ এর থেকে গবেষণা করে উপদেশ, শিষ্টাচার ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব লাভ করতে পারে।

الٓـر . تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ. اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ. وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ.

আলিফ-লাম-রা ঃ এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি এটি অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআন যাতে তোমরা বুঝতে পার। আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি, ওহীর মাধ্যমে তোমার নিকট কুরআন প্রেরণ করে; যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত। (১২ সূরা ইউসুফ ঃ ১-৩)

হরূফে মুকাত্তাআত সম্পর্কে আমরা সূরা বাকারার তাফসীরের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে কেউ জানতে চাইলে সেখানে দেখে নিতে পারেন। তারপর এ সূরা সম্পর্কে তাফসীরের মধ্যে আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। তার কিছুটা আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব।

তার সংক্ষিপ্ত-সার হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূলের উপর উচ্চাংগ আরবী ভাষায় যে মহান কিতাব নাযিল করেছেন তার প্রশংসা করছেন। এর পাঠ ও বক্তব্য এতই সুস্পষ্ট, যে কোন বুদ্ধিমান ধী-শক্তিসম্পন্ন লোক সহজেই তা অনুধাবন করতে পারে। সুতরাং আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে এ কিতাবই শ্রেষ্ঠ। ফেরেশতাকুলের শ্রেষ্ঠ ফেরেশতা। এটি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানবের উপর সর্বোত্তম সময়ে ও সর্বোৎকৃষ্ট স্থানে নাযিল করেছেন।

وهو اشرف كتاب نزل من السماء انزله اشرف الملئكة على اشرف الخلق فى اشرف زمان ومكان .

যে ভাষায় তা নাযিল হয়েছে তা অতি প্রাঞ্জল এবং তার বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আহ্সানুল কাসাস বা উত্তম বর্ণনার সম্পর্ক যদি অতীত কিংবা ভবিষ্যতের ঘটনার সাথে হয়, তবে তার অর্থ হবে মানুষ সে বিষয়ে যে মতভেদ করছে তন্মধ্যে সঠিক পন্থা কি স্পষ্টভাবে বলে দেয়া এবং ভুল ও বাতিল মতের খণ্ডন করা। আর যদি তার সম্পর্ক আদেশ ও নিষেধের সাথে হয় তাহলে তার অর্থ হবে ভারসাম্যপূর্ণ শরীআত ও বিধান, উত্তম পদ্ধতি এবং স্পষ্ট ও ন্যায়ানুগ ফয়সালা। অন্য আয়াতে এর দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ ঃ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْلاً সত্য ও ন্যায়ের দিক থেকে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ। (৬ ঃ ১১৫)

অর্থাৎ সংবাদ ও তথ্য দানের ক্ষেত্রে এটা সত্য আর আদেশ ও নিষেধের ক্ষেত্রে এটা ন্যায়নিষ্ঠ। এ কারণেই আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ.

আমি তোমার কাছে উত্তম কাহিনী বর্ণনা করছি ওহীর মাধ্যমে তোমার কাছে এ কুরআন প্রেরণ করেছি। যদিও এর আগে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত। (১২ ঃ ৩)

অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার কাছে ওহী প্রেরিত হচ্ছে সে বিষয়ে অনবহিত ছিলে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا. مَاكُنْتَ تَدْرِىْ مَاالْكِتَابُ وَلاَ الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ. صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ. اَلاَ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ.

এ ভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ্ তথা আমার নির্দেশ। তুমি তো জানতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি? বরং আমি একে করেছি আলো—যা দিয়ে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি। তুমি তো প্রদর্শন কর কেবল সরল পথ। সে আল্লাহ্র পথ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিক। জেনে রেখ, সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্রই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। (৪২ ঃ ৫২-৫৩)

আল্লাহ্ বলেন ঃ

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ. وَقَدْ اٰتَيْنَاكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا. مَنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهٗ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. خَالِدِيْنَ فِيْهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً.

এ ভাবেই আমি তোমার কাছে সেই সব ঘটনার সংবাদ দেই যা পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। আর আমি তোমাকে আমার কাছ থেকে উপদেশ দান করেছি। যে এর থেকে বিমুখ হবে সে কিয়ামতের দিন মহাভার বহন করবে। সেখানে তারা স্থায়ী হয়ে থাকবে। কিয়ামতের দিন এই বোঝা তাদের জন্যে কতই না মন্দ! (২০ ঃ ৯৯-১০১)

অর্থাৎ এই কুরআন বাদ দিয়ে যে ব্যক্তি অন্য কিতাবের অনুসরণ করবে, সে ব্যক্তিই এ সতর্কবাণীর যোগ্য হবে। মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী শরীফে হযরত আলী (রা) থেকে মারফূ' ও মওকূফ উভয়ভাবে বর্ণিত হাদীসে এ কথাই বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কুরআন বাদে অন্য কিছুতে হিদায়ত অন্বেষণ করবে তাকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করবেন। ইমাম আহমদ (র) জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, একদা হযরত উমর (রা) আহলি কিতাবদের থেকে প্রাপ্ত একখানি কিতাব নিয়ে রাসূল (সা)-এর কাছে আসেন এবং তা তাঁকে পড়ে শোনান। রাসূলুল্লাহ (সা) ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বললেন, 'ওহে ইবনুল-খাত্তাব! কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা না করেই কি তোমরা এতে নিমগ্ন হয়ে পড়েছ? সেই সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর হাতের মুঠোয় আমার জীবন। আমি তোমাদের কাছে এক উজ্জ্বল আলোকদীপ্ত পরিচ্ছন্ন দীন নিয়ে এসেছি। আহলি কিতাবদের কাছে যদি কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস কর এবং তারা কোন কিছুকে হক বলে তবে তোমরা তা মিথ্যা জানবে কিংবা তারা যদি কোন কিছুকে বাতিল বলে, তবে তোমরা তা সত্য বলে জানবে। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, যদি মূসা (আ) জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার আনুগত্য না করে তারও উপায় থাকতো না।'

এ হাদীছ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ (র) ভিন্ন এক সূত্রে এ হাদীসটি হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ

والذي نفسي بيده لو اصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم - انكم حظى من الامم وانا حظكم من النبين.

যে সত্তার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার কসম, তোমাদের মাঝে যদি নবী মূসা বর্তমানে থাকতেন আর আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা তাঁর অনুসরণ করতে, তবে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হতে। তোমরা আমারই উম্মত আর আমিই তোমাদের নবী।

এই হাদীসের সনদ ও মতন সূরা ইউসুফের তাফসীরে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটির কোন কোন বর্ণনায় এরূপ এসেছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) একদা জনসমক্ষে ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, হে জনমণ্ডলী! আমাকে সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যাপক কথা বলার শক্তি দান করা হয়েছে, চূড়ান্ত কথা বলার শক্তি দেওয়া হয়েছে, অতি সংক্ষেপ করার ক্ষমতা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। একটি সুস্পষ্ট উজ্জ্বল জীবন ব্যবস্থা আমাকে দেওয়া হয়েছে। অতএব, না বুঝে-শুনে নির্বোধের ন্যায় অন্য কিছুতে প্রবিষ্ট হয়ো না। নির্বোধ লোকদের কর্মকাণ্ড যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। অতঃপর তিনি সেই লিপিটি আনতে বলেন এবং একটি একটি করে এর প্রতিটি অক্ষর মুছে ফেলা হয়।

হযরত ইউসুফ (আ) ঘটনা

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَٰأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. قَالَ يَٰبُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا. إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

'স্মরণ কর, ইউসুফ তার পিতাকে বলেছিল, হে আমার পিতা! আমি এগারটি নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি—দেখেছি তাদেরকে আমার প্রতি সিজদাবনত অবস্থায়। সে বলল, আমার পুত্র! তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করো না; করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে। শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। এভাবে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবেন এবং তোমার প্রতি, ইয়াকূবের পরিবার-পরিজনের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি এর পূর্বে পূর্ণ করেছিলেন তোমার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি। তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১২ ঃ ৪-৬)

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বারজন পুত্র সন্তান ছিলেন। তাদের নামও আমরা উল্লেখ করেছি। বনী ইসরাঈলের সকলেই তাঁর সাথে সম্পৃক্ত। এই বার ভাইয়ের মধ্যে গুণ-গরিমায় ইউসুফ (আ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। উলামাদের এক দলের মতে, বার ভাইয়ের মধ্যে একমাত্র ইউসুফ (আ) ছিলেন নবী। অবশিষ্টদের মধ্যে কেউই নবী ছিলেন না। ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় তাঁর ভাইদের যে সব কর্মকাণ্ড ও উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে তা থেকে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে কতিপয় আলিমের মতে, অন্য ভাইরাও নবী ছিলেন। নিম্নোক্ত আয়াত থেকে তারা দলীল গ্রহণ করেন। যথা ঃ

قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ.

বল, আমরা আল্লাহতে এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে ঈমান এনেছি। (৩ ঃ ৮৪)

এই আলিমগণ মনে করেন যে, اسباط বা বংশধর বলতে ইয়াকূব (আ)-এর বাকি এগার পুত্রকে বুঝান হয়েছে। কিন্তু তাঁদের এই দলীল মোটেই শক্তিশালী নয়। কেননা اسباط শব্দ দ্বারা বনী ইসরাঈলের বংশকে বুঝানো হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে যাঁরা নবী ছিলেন যাঁদের প্রতি আসমান থেকে ওহী এসেছে, তাঁদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

ভ্রাতাদের মধ্যে হযরত ইউসুফ (আ)-ই যে কেবল নবী ছিলেন ইমাম আহমদ (র) বর্ণিত ইবন উমর (রা)-এর রেওয়ায়ত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন রাসূল (সা) বলেছেন ঃ

ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم.

'তিনি ছিলেন এক সম্মানিত পুরুষ যিনি আর এক সম্মানিত পুরুষের পুত্র। তিনিও আর এক সম্মানিত পুরুষের পুত্র, আবার তিনি আর এক সম্মানিত পুরুষের পুত্র—ইনি হলেন ইউসুফ (আ), যিনি ইয়াকূব নবীর পুত্র। আর তিনি ইসহাকের পুত্র এবং তিনি হযরত ইবরাহীমের পুত্র।'

ইমাম বুখারী (র) আবদুল ওয়ারিছের সূত্রে এককভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী আলোচনায় আমরা এ হাদীসের বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করেছি। এখানে তার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন নেই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই। মুফাস্সিরিনে কিরাম ও আলিমগণ বলেন, ইউসুফ (আ) যখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক মাত্র, তখন একদা স্বপ্নে দেখেন যেন এগারটি নক্ষত্র (اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا) যার দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে তাঁর এগার ভাইয়ের প্রতি এবং সূর্য ও চন্দ্র (وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) অর্থাৎ তার পিতা-মাতা তাঁকে সিজদা করছেন। স্বপ্ন দেখে তিনি শংকিত হন। ঘুম থেকে জেগে ওঠে পিতার কাছে স্বপ্নটি বর্ণনা করেন। পিতা বুঝতে পারলেন যে, অচিরেই তিনি উচ্চমর্যাদায় আসীন হবেন, দুনিয়া ও আখিরাতের উচ্চ মর্যাদায় ভূষিত হবেন; আর তাঁর পিতা-মাতা এবং ভাইগণ তাঁর অনুগত হবেন। পিতা তাঁকে এ স্বপ্নের কথা গোপন রাখতে বলেন এবং তা ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেন। যাতে তারা হিংসা না করে এবং ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে না পারে। ইয়াকূব (আ)-এর এই আশংকা আমাদের উপরের বক্তব্যকে সমর্থন করে। এ জন্যে কোন কোন বর্ণনায় আছে ঃ

استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها فان كل ذى نعمة محسود.

অর্থাৎ—'তোমরা তোমাদের প্রয়োজন পূরণে গোপনীয়তার সাহায্য গ্রহণ কর, কেননা প্রত্যেক নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিই হিংসার শিকার হয়ে থাকে।' আহলি কিতাবদের মতে, হযরত ইউসুফ (আ) স্বপ্নের বৃত্তান্ত পিতা ও ভাইদের সাক্ষাতে একত্রে ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু তাদের এ মত ভুল। وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ (এভাবেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন।) অর্থাৎ যেভাবে তোমাকে এই তাৎপর্যবহ স্বপ্ন দেখান হয়েছে যখন তুমি একে গোপন করে রাখবে তখন তোমার প্রতিপালক তোমাকে এর জন্যে মনোনীত করবেন। (يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ) অর্থাৎ বিভিন্ন রকম অনুগ্রহ ও রহমত তোমাকে বিশেষভাবে দান করবেন। وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْاَحَادِيْثِ (আর তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিবেন) অর্থাৎ কথার গূঢ়তত্ত্ব ও স্বপ্নের ব্যাখ্যা বোঝবার শক্তি দান করবেন—যা অন্য লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে

না। وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ (এবং তাঁর নিয়ামত তোমার উপর পূর্ণ করে দিবেন) অর্থাৎ ওহীরূপ নিয়ামত তোমাকে দান করবেন। وَعَلَى اٰلِ يَعْقُوْبَ (আর ইয়াকূবের পরিবারবর্গের উপর) অর্থাৎ তোমার ওসীলায় ইয়াকূবের পরিবারবর্গ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।

كَمَا اَتَمَّهَا عَلَى اَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ .

(যেমনিভাবে এর পূর্বে তোমার পিতৃ-পুরুষ ও ইবরাহীম ও ইসহাকের উপর তা পূর্ণ করেছিলেন) অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে নিয়ামতে পূর্ণ করবেন ও নবুওত দান করবেন। যেভাবে তা দান করেছেন তোমার পিতা ইয়াকূবকে, পিতামহ ইসহাককে ও প্র-পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহকে اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়)। অন্যত্র আল্লাহ বলেছেন, اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (আল্লাহই ভাল জানেন যে, রিসালাতের দায়িত্ব তিনি কাকে অর্পণ করবেন।)

এ কারণে রসূলুল্লাহ (সা)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হয় কোন্ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সম্মানিত? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ইউসুফ—যিনি নিজে আল্লাহর নবী, আর এক আল্লাহর নবীর পুত্র। তিনিও আল্লাহর নবীর পুত্র এবং তিনি আল্লাহ্র খলীলের পুত্র। ইবন জারীর ও ইবন আবী হাতিম (র) তাঁদের তাফসীরে এবং আবূ ইয়ালা ও বায্যার তাঁদের মুসনাদে জাবির (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট একবার এক ইহুদী আগমন করে—তাকে বুসতানাতুল ইহুদী বলে অভিহিত করা হতো। সে বলল, হে মুহাম্মদ! সেই নক্ষত্রগুলোর নাম কি, যেগুলোকে ইউসুফ (আ) সিজদাবনত দেখেছিলেন? রসূলুল্লাহ (সা) কোন প্রকার উত্তর না দিয়ে নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণ পর জিবরাঈল (আ) ঐ নামগুলোসহ অবতরণ করেন। রসূলুল্লাহ (সা) তখন লোকটিকে ডেকে আনেন ও জিজ্ঞেস করেন। আমি যদি ঐ নামগুলো তোমাকে বলতে পারি তাহলে কি তুমি ঈমান আনবে? সে বলল, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন, এগুলোর নাম হল জিরয়ান, তারিক, দিয়াল, যুল কাতিফান, কাবিস, উছাব, উমরদান, ফায়লাক, মুসবিহ, দারূহ, যুল-ফারা', দিয়া ও নূর। ইহুদী লোকটি বলল, আল্লাহর কসম, এগুলোই সেই নক্ষত্রসমূহের নাম। এ বর্ণনায় একজন রাবী হাকাম ইব্ন যুহায়রকে মুহাদ্দিসগণ যঈফ বলে অভিহিত করেছেন।

আবূ ইয়ালার বর্ণনায় আছে যে, ইউসুফ (আ) যখন তাঁর স্বপ্নের কথা পিতাকে শোনান তখন পিতা বলেছিলেন, 'এ বিষয়টি বিক্ষিপ্ত, আল্লাহ একে সমন্বিত করে বাস্তবে রূপ দান করবেন।' রাবী বলেন, সূর্য বলতে এখানে তাঁর পিতাকে এবং চন্দ্র বলতে তাঁর মাতাকে বুঝানো হয়েছে।

لَقَدْ كَانَ فِىْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖ اٰيٰتٌ لِّلسَّائِلِيْنَ. اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَاَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰى اَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ. اِنَّ اَبَانَا لَفِىْ ضَلَالٍ مُّبِيْنِ. اُقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِاطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا مِنْ بَعْدِهٖ قَوْمًا صَالِحِيْنَ. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ فِىْ غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ.

ইউসুফ এবং তার ভাইদের ঘটনায় জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। স্মরণ কর, তারা বলেছিল, ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়। অথচ আমরা একটি সুসংহত দল; আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই আছেন। ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন স্থানে ফেলে আস। ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট থাকবে। এরপর তোমরা ভাল লোক হয়ে যাবে। তাদের মধ্যে একজন বলল, ইউসুফকে হত্যা করো না এবং তোমরা যদি কিছু করতেই চাও তাকে কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ কর। যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে। (১২ ঃ ৭-১০)

এ কাহিনীতে যেসব নির্দশন, হিকমত, ইশারা-ইংগিত, উপদেশ ও স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ রয়েছে আল্লাহ তা অবহিত করেছেন। এরপর ইউসুফ ও তাঁর সহোদর ভাই বিন-য়ামীনের প্রতি পিতার স্নেহ-মমতার ব্যাপারে অন্য ভাইদের হিংসার কথা উল্লেখ করেছেন। এ হিংসার কারণ ছিল তারা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও পিতা ইউসুফ ও বিন-য়ামীনকে অধিক ভালবাসেন। তাদের দাবি এই যে, আমরা একটি সংহত দল হিসাবে ঐ দু'জনের চেয়ে আমরাই অধিক ভালবাসা পাওয়ার হকদার। إِنَّ أَبَانَا لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ (আমাদের পিতা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছেন) তিনি আমাদের থেকে ঐ দু'জনকে বেশি ভালবাসেন। অতঃপর তারা পরামর্শ করল, ইউসুফকে হত্যা করবে নাকি দূরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসবে, যেখান থেকে আর কোন দিন সে ফিরে আসতে পারবে না। এতে পিতার পূর্ণ স্নেহ-মমতা কেবল তাদের প্রতিই নিবদ্ধ থাকবে। অবশ্য পরবর্তীতে তারা তওবা করে নেয়ারও গোপন ইচ্ছা পোষণ করেছিল। এই সিদ্ধান্তের উপর যখন তারা ঐক্যবদ্ধ হল তখন (قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ) তাদের মধ্যে একজন বলল, মুজাহিদের মতে সেই ব্যক্তির নাম শামউন; সুদ্দীর মতে য়াহূযা এবং কাতাদা ও ইব্ন ইসহাকের মতে রাবীল—যে ছিল তাদের মধ্যে বয়সে বড়।

لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَأَلْقُوْهُ فِيْ غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ.

(ইউসুফকে হত্যা কর না বরং কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ কর। হয়ত কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে) إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ (যদি তোমরা কিছু করতেই চাও) অর্থাৎ তোমরা যা বলছ তা যদি একান্তই করতে চাও তবে আমার দেয়া প্রস্তাব গ্রহণ কর। তাকে হত্যা করা বা দূরে ফেলে আসার চাইতে এটা করাই উত্তম। ফলে তারা সবাই এ প্রস্তাবে একমত হয়।

قَالُوْا يَآ أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُوْنَ. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ. قَالَ إِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْ أَنْ تَذْهَبُوْا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُوْنَ. قَالُوْا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُوْنَ.

অতঃপর তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে তুমি আমাদেরকে বিশ্বাস করছ না কেন? যদিও আমরা তার শুভাকাঙ্ক্ষী? আগামীকাল তুমি তাকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ কর, সে ফল-মূল খাবে ও খেলাধুলা করবে। আমরা তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। সে বলল, এটা আমাকে কষ্ট দিবে যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশংকা করি, তোমরা তার

প্রতি অমনোযোগী হলে তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে। তারা বলল, আমরা একটি সংহত দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলে, তবে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হব। (১২ ঃ ১১-১৪)

পুত্ররা পিতার কাছে আবদার করল যে, তিনি যেন তাদের সাথে ভাই ইউসুফকে যেতে দেন। তাদের উদ্দেশ্য জানাল যে, সে তাদের সাথে পশু চরাবে, খেলাধুলা ও আনন্দ-ফূর্তি করবে। তারা অন্তরে এমন কথা গোপন করে রাখল, যে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক অবগত ছিলেন। বৃদ্ধ পিতা তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর দিলেন, হে পুত্রগণ! আমার কাছ থেকে সামান্য সময়ের জন্যেও তার বিচ্ছিন্ন হওয়া আমাকে বড়ই পীড়া দেয়। এছাড়া আমার আরও আশংকা হয় যে, তোমরা খেলাধুলায় মত্ত হয়ে পড়লে সেই সুযোগে নেকড়ে বাঘ এসে তাকে খেয়ে যাবে। আর তোমরা তা প্রতিহত করতে পারবে না অসতর্ক থাকার কারণে এবং সেও পারবে না অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে।

قَالُوْا لَئِنْ اَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذًا لَّخَاسِرُوْنَ.

(তারা বলল, যদি নেকড়ে বাঘে তাকে খেয়ে ফেলে, অথচ আমরা একটা সংহত দল, তাহলে তো আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হব।) অর্থাৎ বাঘ যদি তাঁর উপর আক্রমণ করে ও আমাদের মাঝ থেকে নিয়ে খেয়ে ফেলে কিংবা আমাদের অসতর্ক থাকার কারণে এরূপ ঘটনা ঘটে যায়, অথচ আমরা একটি সংহত দল তথায় বিদ্যমান, তা হলে তা আমরা অক্ষম ও দুর্ভাগা বলে পরিগণিত হব।

আহলি কিতাবদের মতে, হযরত ইয়াকূব (আ) পুত্র ইউসুফকে তাঁর ভাইদের পেছনে-পেছনে প্রেরণ করেন। কিন্তু ইউসুফ পথ হারিয়ে ফেলেন। পরে অন্য এক ব্যক্তি তাঁকে তাঁর ভাইদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। কিন্তু এটি তাদের একটি ভ্রান্তি বিশেষ। কেননা, ইয়াকূব (আ) ইউসুফকে এতই বেশি ভালবাসতেন যে, তিনি তাঁকে তাদের সাথে পাঠাতেই চাচ্ছিলেন না, সুতরাং তিনি তাঁকে একা পাঠাবেন কি করে?

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَاَجْمَعُوْٓا اَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ. وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ. وَجَآءُوْٓ اَبَاهُمْ عِشَآءً يَّبْكُوْنَ. قَالُوْا يٰٓاَبَانَآ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَآ اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِيْنَ. وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا. فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ. وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ.

অতঃপর ওরা যখন তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল, এমতাবস্থায় আমি তাকে জানিয়ে দিলাম, তুমি ওদেরকে ওদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দিবে যখন ওরা তোমাকে চিনবে না। ওরা রাতে কাঁদতে কাঁদতে পিতার নিকট আসল। তারা বলল, হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়ে প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের

মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু তুমি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবে না, যদিও আমরা সত্যবাদী। ওরা তার জামায় মিথ্যা রক্ত লেপন করে এনেছিল। সে বলল, না, তোমাদের মন তোমাদের জন্যে একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল। (সূরা ইউসুফ ঃ ১৫-১৮)

ইউসুফের ভাইয়েরা পিতাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তিনি ইউসুফ (আ)-কে তাদের সাথে পাঠিয়ে দেন। পিতার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলে তারা ইউসুফকে মুখে গালাগালি করতে থাকে এবং হাতের দ্বারা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দিতে থাকে। অবশেষে এক গভীর কূপে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে একমত হয় এবং কূপের মুখে যে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে পানি তোলা হয় সেই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে তারা ইউসুফ (আ)-কে কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেয়। তখন আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেয় যে, তোমাকে এ দুরবস্থা থেকে অবশ্যই উদ্ধার করা হবে এবং তাদের এই দুষ্কর্মের কথা এমন এক অবস্থায় তাদেরকে তুমি জানাবার সুযোগ পাবে, যখন তুমি হবে ক্ষমতাশালী আর তারা হবে তোমার মুখাপেক্ষী এবং ভীত-সন্ত্রস্ত। কিন্তু তারা টেরও পাবে না।

মুজাহিদ ও কাতাদা (র)-এর মতে, لَا يَشْعُرُوْنَ (তারা জানবে না) অর্থাৎ আল্লাহ ইউসুফ (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে এ বিষয়ে যা বলবেন তা তার ভাইয়েরা জানবে না। ইবন আব্বাস (রা)-এর মতে لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থ হল, তুমি তাদেরকে এমন এক সময়ে তাদের এ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানাবে যখন তারা তোমাকে চিনবে না। ইবন জারীর (র) এটা বর্ণনা করেছেন। ইউসুফ (আ)-কে কূপে নিক্ষেপ করে তারা তার জামায় কিছু রক্ত মেখে রাত্রিকালে কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে ফিরে এল। এ জন্যে কোন কোন প্রাচীন বিজ্ঞজন বলেছেন, অত্যাচারের অভিযোগকারীর কান্নাকাটিতে প্রতারিত হয়ো না। কেননা, বহু অত্যাচারীও এমন আছে যারা প্রতারণাপূর্ণ কান্নাকাটি করে থাকে। এ প্রসঙ্গে তারা ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের কান্নাকাটির কথা উল্লেখ করেন। ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা রাত্রিকালে অন্ধকারের মধ্যে কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে হাযির হয়। অন্ধকার রাত্রে আসার উদ্দেশ্য ছিল তাদের বিশ্বাস ঘাতকতাকে আড়ালে রেখে প্রতারণার চেষ্টা করা, ওজর প্রকাশ করা নয়।

قَالُوْا يَآ اَبَانَا اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا.

(তারা আরজ করল, হে পিতা! আমরা দৌড়ে প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালামাল অর্থাৎ কাপড়-চোপড়ের কাছে রেখে গিয়েছিলাম) فَاَكَلَهُ الذِّئْبُ (তখন তাকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলে) অর্থাৎ দৌড় প্রতিযোগিতার সময় যখন আমরা তার থেকে দূরে চলে যাই তখন তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে। وَمَا اَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِيْنَ (কিন্তু আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না। যদিও আমরা সত্য কথাই বলছি) অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-কে বাঘে খেয়েছে আমাদের এ সংবাদ আপনি বিশ্বাস করবেন না। আপনার কাছে ইতিপূর্বে আমরা কোন বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইনি, তবে এ ব্যাপারে আমাদেরকে কিভাবে বিশ্বাসঘাতক হিসেবে অভিযুক্ত করবেন। কারণ বাঘে খাওয়ার ব্যাপারে আপনি আশংকা প্রকাশ করেছিলেন। আর আমরা তাঁকে নিজেদের দায়িত্বে গ্রহণ করেছিলাম

যে, আমরা থাকতে তাঁকে বাঘে খেতে পারবে না। কেননা, আমরা সংখ্যায় অধিক। সুতরাং আমরা সত্যবাদী হিসেবে আপনার কাছে প্রমাণিত হতে পারিনি। সে কারণে আমাদেরকে সত্যবাদী না ভাবাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আসল ঘটনা তো এরূপই। وجاءوا على قميصه بدم كذب (তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত মাখিয়ে আসল) তারা একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করে জামায় রক্ত মাখিয়ে আনে। যাতে এই ধারণা দিতে পারে যে, তাঁকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। তারা রক্ত মাখিয়েছিল বটে কিন্তু জামা ছিঁড়তে ভুলে গিয়েছিল। বস্তুত মিথ্যার সমস্যাই হল ভুলে যাওয়া (آفة الكذب النسيان) তাদের উপর সন্দেহের লক্ষণাদি যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন তাদের এ কাজ পিতাকে আর প্রতারিত করতে পারেনি। কেননা, ইউসুফের মধ্যে শিশুকালেই যেসব মহৎ গুণাবলী ও নবীসুলভ লক্ষণাদি ফুটে উঠেছিল এবং যার দরুন পিতা তাঁকে অন্যদের তুলনায় অধিক ভালবাসতেন, এ কারণে ইউসুফের প্রতি অন্য ভাইদের হিংসা ও শত্রুতার ব্যাপারে তিনি অবহিত ছিলেন। পিতার কাছ থেকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে তাঁর চোখের আড়ালে নিয়ে তারা ইউসুফকে গায়েব করে দেয় এবং আসল ঘটনা ঢাকা দেওয়ার জন্য তারা কান্নার ভান করে পিতার কাছে আসলে পিতা বললেন ঃ

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا. فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ. وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰي مَا تَصِفُوْنَ.

বরং তোমরা নিজেরাই একটা বিষয় সাজিয়ে নিয়েছ সুতরাং আমি পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করছি। তোমরা যা কিছু বলছ সে বিষয়ে আল্লাহর কাছেই আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি।

আহলি কিতাবদের মতে, রুবীল পরামর্শ দিয়েছিল যে, ইউসুফকে কূপের মধ্যে রাখা হোক। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, অন্য ভাইদের অজান্তে তাকে পিতার কাছে ফিরিয়ে দিবে। কিন্তু ভাইয়েরা রুবীলকে ফাঁকি দিয়ে কাফেলার নিকট তাঁকে বিক্রি করে দেয়। দিনের শেষে যখন রুবীল ইউসুফ (আ)-কে উঠিয়ে আনতে যান, তখন তাঁকে কূপের মধ্যে পেলেন না। তখন তিনি চিৎকার করে উঠেন এবং নিজের জামা ছিঁড়ে ফেলেন। আর অন্য ভাইয়েরা একটা বকরী যবেহ্ করে ইউসুফ (আ)-এর জামায় রক্ত মাখিয়ে আনে। হযরত ইয়াকূব (আ) ইউসুফের খবর শুনে নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলেন ও কাল লুঙ্গি পরে নিলেন এবং দীর্ঘ দিন যাবত পুত্র-শোকে বিহবল থাকেন। তাদের এ ব্যাখ্যা ত্রুটিপূর্ণ এবং এ চিত্রায়ন ভ্রান্তি-প্রসূত।

অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ. قَالَ يَابُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ. وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً. وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ. وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ. وَقَالَ الَّذِى اشْتَرٰهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاَتِهٖ اَكْرِمِىْ مَثْوٰهُ عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا. وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهٗ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ. وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ . وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهُ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا . وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ.

এক যাত্রীদল আসল, তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল; সে তার পানির ডোল নামিয়ে দিল। সে বলে উঠল, কী সুখবর! এ যে এক কিশোর! ওরা তাকে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল; ওরা যা করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত ছিলেন। ওরা তাকে বিক্রি করল স্বল্পমূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে। মিসরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল, সে তার স্ত্রীকে বলল, 'সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর, সম্ভবত সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা ওকে পুত্ররূপেও গ্রহণ করতে পারি।' এবং এভাবে আমি ইসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেয়ার জন্যে। আল্লাহ্ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়। সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল, তখন আমি তাকে 'হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম। এবং এভাবেই আমি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি। (১২ ঃ ১৯-২২)

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে যখন কূপে ফেলা হয় তখনকার ঘটনা বর্ণনা করছেন যে, তিনি আল্লাহ্র তরফ থেকে বিপদমুক্তি ও তাঁর করুণার প্রতীক্ষা করছিলেন। তখন একটি যাত্রীদল এসে উপস্থিত হলো।

আহলি কিতাবগণ বলেন, গমনকারী ঐ কাফেলার সাথে মালামাল ছিল পেস্তা, খেজুর ও তারপিন। তারা সিরিয়া থেকে মিসরে যাচ্ছিল। ঐ স্থানে এসে তারা একজনকে উক্ত কূয়া থেকে পানি আনার জন্যে পাঠায়। সে কূয়ার মধ্যে বালতি ফেললে ইউসুফ তা আঁকড়ে ধরেন। লোকটি তাঁকে দেখেই বলে উঠল يَا بُشْرٰى (কী আনন্দের ব্যাপার!) -هٰذَا غُلَامٌ (এতো একটি কিশোর) وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً (এবং তারা তাকে পণ্যদ্রব্য হিসেবে লুকিয়ে রাখল)। অর্থাৎ তাদের অনান্য ব্যবসায়িক পণ্যের সাথে একেও একটি পণ্য বলে দেখালো। وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ (তারা যা কিছু করছিল আল্লাহ তা ভালরূপেই জানেন) অর্থাৎ ইউসুফের সাথে তার ভাইদের আচরণ এবং কাফেলা কর্তৃক পণ্যের মাল হিসেবে লুকিয়ে রাখা সবই আল্লাহ দেখছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি এর পরিবর্তন করছিলেন না। কেননা এর মধ্যেই নিহিত ছিল বিরাট তাৎপর্য এবং এটা ছিল পূর্ব নির্ধারিত। আর মিসরীয়দের জন্যে এই কিশোর ছিলেন রহমতস্বরূপ, যে কিশোর আজ সেখানে প্রবেশ করছেন বন্দী কৃতদাস রূপে, পরবর্তীতে ঐ কিশোরই হবে সে দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। এই কিশোরের সাহায্যেই তারা দুনিয়ায় ও আখিরাতে সীমা-সংখ্যাহীন কল্যাণ লাভ করবে। ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা যখন জানল যে, একটি কাফেলা ইউসুফ (আ)-কে কূয়া থেকে তুলে নিয়েছে, তখন তারা কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করল এবং বলল, এ ছেলেটি আমাদের গোলাম, পালিয়ে এসেছে। তখন তারা ইসুফ (আ)-কে ভাইদের কাছ থেকে কিনে নিল। بِثَمَنٍ بَخْسٍ (স্বল্প মূল্যে) স্বল্পমূল্যে মানে কম মূল্য, কেউ কেউ এর অর্থ মেকী মুদ্রা বলেছেন।

دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ وَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزَّاهِدِيْنَ (মাত্র কয়েকটি দিরহামের বিনিময়ে এবং এ ব্যাপারে তারা ছিল নির্লোভ) ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস (রা) নাওফুল বাকালী, সুদ্দী,

কাতাদা ও আতিয়্যাতুল আওফী (র) বলেন, তারা বিশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে। ইউসুফ (আ)-এর প্রত্যেক ভাই ভাগে দুই দুই দিরহাম করে পায়। মুজাহিদের মতে, তারা বাইশ দিরহামে এবং ইকরামা ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের মতে চল্লিশ দিরহামে বিক্রি করে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

وَقَالَ الَّذِى اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِى مَثْوَاهُ.

(মিসরের যে লোকটি তাকে ক্রয় করেছিল সে তার স্ত্রীকে বলেছিল, একে উত্তম ভাবে থাকার ব্যবস্থা কর।) অর্থাৎ যত্ন সহকারে রাখ। عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا (সম্ভবত এ আমাদের কল্যাণে আসবে কিংবা আমরা একে পুত্র বানিয়ে রাখব।) এটা ছিল আল্লাহর বিশেষ রহমত, করুণা ও অনুগ্রহ—যে ব্যবস্থার মাধ্যমে তিনি তাঁকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ দান করতে চেয়েছিলেন।

আহলি কিতাবরা বলে, মিসরের যে ব্যক্তি ইউসুফ (আ)-কে খরীদ করেছিলেন তিনি ছিলেন মিসরের 'আযিয' অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী। ইব্ন ইসহাকের মতে, তাঁর নাম আতফীর ইবন রূহায়ব। ঐ সময় মিসরের বাদশাহ ছিলেন রায়্যান ইবন ওলীদ, তিনি ছিলেন আমালিক বংশোদ্ভূত। ইবন ইসহাকের মতে, আযীযের স্ত্রীর নাম রাঈল বিনত রা'আঈল (راعيل بنت رعاييل) অন্যদের মতে যুলায়খা। বলাবাহুল্য, যুলায়খা তার উপাধি ছিল। ছা'লাবী আবু হিশাম রিফাই (র) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আযীযের স্ত্রীর নাম ফাকা বিন্‌ত য়ানূস। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ইউসুফ (আ)-কে মিসরে নিয়ে বিক্রি করেছিল তার নাম মালিক ইবন যা'আর ইবন নুওয়ায়ব ইবন আফাকা ইবন মাদয়ান ইবন ইবরাহীম। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইবন ইসহাক (র) ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ মানব জাতির মধ্যে তিনজন লোক সব চাইতে দূরদর্শী : (১) মিসরের আযীয যখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন একে সযত্নে রাখ; (২) সেই বালিকা যে তার পিতাকে মূসা (আ) সম্পর্কে বলেছিল; يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِيْنُ. -(হে পিতা! তাকে কাজে নিযুক্ত করুন। কারণ আপনার মজুর হিসেবে সে ব্যক্তিই উত্তম হবে যে হবে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। (২৮ কাসাস ঃ ২৬) : (৩) হযরত আবূ বকর (রা), যখন তিনি হযরত উমর (রা)-কে খলীফা নিযুক্ত করেন।

কথিত আছে, 'আযীয' ইউসুফ (আ)-কে বিশ দীনারের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর সম ওজনের মিশক, সম ওজনের রেশম ও সম ওজনের রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করেছিলেন। আল্লাহ্ই সম্যক জ্ঞাত।

আল্লাহর বাণী : وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى الْأَرْضِ (এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম) যেমন এই আযীয ও তাঁর স্ত্রীকে ইউসুফ (আ)-এর সেবাযত্নে ও সাহায্য-সহযোগিতার জন্য নির্ধারণ করার মাধ্যমে মিসরের বুকে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (এবং তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিলাম) অর্থাৎ স্বপ্নের তত্ত্বজ্ঞান ও তার ব্যাখ্যা والله غالب على أمره (আল্লাহ্ তাঁর কার্য-সম্পাদনে অপ্রতিহত)

অর্থাৎ আল্লাহ যখন কোন সিদ্ধান্ত নেন, তখন তা বাস্তবায়িত হয়েই থাকে। কেননা, তিনি তা বাস্তবায়নের জন্যে এমন উপায় নির্ধারণ করে দেন, যা মানুষের কল্পনার বাইরে। এ কারণেই আল্লাহ বলেছেন ঃ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ (কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।)

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ. وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ.

সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং এভাবেই আমি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।

এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইতিপূর্বের সমস্ত ঘটনা হযরত ইউসুফ (আ)-এর পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তির পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। অর্থাৎ ৪০ বছর বয়সের পূর্বে। কেননা, চল্লিশ বছর বয়সকালে নবীদের প্রতি ওহী প্রেরিত হয়।

কত বছর বয়সে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তি ঘটে, সে ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম মালিক, রাবীআ, যায়দ ইবন আসলাম ও শা'বী বলেন, পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তি বলতে বালেগ হওয়া বুঝায়। সাঈদ ইবন জুবায়রের মতে, তা আঠার বছর। দাহ্হাকের মতে বিশ বছর; ইকরিমার মতে পঁচিশ বছর; সুদ্দীর মতে ত্রিশ বছর; ইবন আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদা (রা)-এর মতে তেত্রিশ বছর এবং হাসান বসরী (র)-এর মতে চল্লিশ বছর। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত হাসান বসরী (র)-এর মতকে সমর্থন করে।

যথা : حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً (যখন সে যৌবন প্রাপ্ত হল এবং চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হল)। আল্লাহ বলেন ঃ

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهٗ رَبِّىْ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ. اِنَّهٗ لَايُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ. كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ. اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ. وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ. قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْءًا اِلَّا اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. قَالَ هِىَ رَاوَدَتْنِىْ عَنْ نَفْسِىْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا. اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ. وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ. فَلَمَّا رَاٰ قَمِيْصَهٗ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ اِنَّهٗ مِنْ كَيْدِكُنَّ اِنَّ. كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ. يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرِىْ لِذَنْبِكِ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِيْنَ.

সে যে স্ত্রীলোকের ঘরে ছিল সে তার থেকে অসৎকর্ম কামনা করল এবং দরজাগুলো বন্ধ করে দিল ও বলল, 'এসো'। সে বলল, 'আমি আল্লাহর শরণ নিচ্ছি। তিনি আমার প্রভু; তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে থাকতে দিয়েছিল, সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় না।' সে রমণী তো তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও ওর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ত যদি না সে তার প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত। তাকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্যে এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। ওরা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল এবং স্ত্রীলোকটি পেছন থেকে তার জামা ছিঁড়ে ফেলল। তারা স্ত্রীলোকটির স্বামীকে দরজার কাছে পেল। স্ত্রীলোকটি বলল, 'যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে তাকে কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন মর্মন্তুদ শাস্তি ব্যতীত আর কি দণ্ড হতে পারে?' ইউসুফ (আ) বলল, 'সেই আমা থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিল।' 'স্ত্রীলোকটির পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, যদি ওর জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তবে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী। কিন্তু ওর জামা যদি পেছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তবে স্ত্রী লোকটি মিথ্যা বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী। গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পেছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়েছে, তখন সে বলল, এটি তোমাদের নারীদের ছলনা, ভীষণ তোমাদের ছলনা! হে ইউসুফ! তুমি এটি উপেক্ষা কর এবং হে নারী! তোমার অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তুমি অপরাধী। (১২ ঃ ২৩-২৯)

আযীযের স্ত্রী হযরত ইউসুফের প্রতি আসক্ত হয়ে নিজ কামনা চরিতার্থ করার জন্যে কিভাবে যে ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিল এখানে আল্লাহ তা উল্লেখ করেছেন। আযীযের স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত রূপসী, ঐশ্বর্যশালী, উচ্চ সামাজিক মর্যাদার এবং ভরা যৌবনের অধিকারিণী। তিনি মূল্যবান জলুসপূর্ণ পোশাক পরিধান ও অঙ্গ-সজ্জা করে ইউসুফ (আ)-কে আপন কক্ষে রেখে ভবনের সমস্ত দরজা বন্ধ করে তাকে আহ্বান জানান। সর্বোপরি তিনি ছিলেন মন্ত্রীর স্ত্রী। ইবন ইসহাকের মতে, এই মহিলাটি ছিলেন মিসরের বাদশাহ রায়্যান ইবনুল ওলীদের ভাগ্নী। অপরদিকে হযরত ইউসুফ (আ) ছিলেন অত্যধিক রূপ-সৌন্দর্যে দীপ্তিমান নওজোয়ান। কিন্তু তিনি ছিলেন নবী বংশোদ্ভূত একজন নবী। তাই আল্লাহ তাঁকে এই অশ্লীল কাজ থেকে হেফাজত করেন এবং নারীদের ছলনা থেকে রক্ষা করেন। এর ফলে তিনি সহীহায়নের হাদীসে বর্ণিত সর্বাপেক্ষা মুত্তাকী সাত শ্রেণীর লোকের অন্যতম সর্দার বলে প্রতিপন্ন হন।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে দিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সে দিন সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়া দান করবেন ঃ

(১) ন্যায়পরায়ণ শাসক (২) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রু ঝরায় (৩) যে ব্যক্তি সালাত শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসার পর পুনরায় মসজিদে না যাওয়া পর্যন্ত তার অন্তর মসজিদের সাথে বাঁধা থাকে (৪) সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরে মহব্বত করে। আল্লাহর উদ্দেশেই তারা একত্র হয় এবং আল্লাহর উদ্দেশেই তারা বিচ্ছিন্ন হয় (৫) যে ব্যক্তি এমন গোপনীয়তার সাথে সাদকা করে যে, তার ডান হাত কি দিল বাম হাত তার খবর রাখে না (৬) ঐ যুবক যে তার উঠতি বয়স আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে কাটায়। (৭) ঐ পুরুষ যাকে কোন সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত মহিলা কু-কর্মের প্রতি আহ্বান করে কিন্তু সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি। (বুখারী ও মুসলিম)

মোটকথা, আযীযের স্ত্রী ইউসুফ (আ)-এর প্রতি আসক্ত হয়ে ও অত্যধিক লোভাতুর হয়ে আপন কামনা চরিতার্থ করার জন্যে আহ্বান জানায়। ইউসুফ (আ) বললেন : مَعَاذَ اللّٰهِ (আল্লাহর পানাহ্ চাই) اِنَّهُ رَبِّىْ (তিনি তো আমার মনিব) অর্থাৎ মহিলার স্বামী—এ বাড়ির মালিক আমার মনিব। اَحْسَنَ مَثْوَاىَ অর্থাৎ তিনি আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছেন ও আমাকে মর্যাদার সাথে তার কাছে থাকার বন্দোবস্ত করেছেন। اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ (জালিমরা কখনও সফলকাম হয় না) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَا بُرْهَانَ رَبِّهِ (মহিলাটি ইউসুফের প্রতি আসক্ত হয়েছিল এবং সেও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তো যদি না সে আপন প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত।) তাফসীরে আমরা এ আয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি।

মুফাসসিরগণ এ স্থলে যত কথা বলেছেন, তার অধিকাংশই আহলি কিতাবদের গ্রন্থাদি থেকে গৃহীত। সুতরাং সেগুলো উপেক্ষা করাই শ্রেয়। এখানে যে কথাটি বিশ্বাস করা প্রয়োজন তা এই যে, আল্লাহ হযরত ইউসুফ (আ)-কে এ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে হিফাজত করেন ও পবিত্র রাখেন এবং ঐ মহিলার কবল থেকে তাঁকে রক্ষা করুন।

তাই তিনি বলেছেন ঃ

وَكَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ.

'তাকে মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখার জন্য এভাবে নিদর্শন দেখিয়েছিলাম সে তো ছিল আমার বিশুদ্ধচিত্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।' وَاسْتَبَقَا الْبَابَ (তারা উভয়ে দৌড়ে দরজার দিকে গেল) অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ) মহিলার কবল থেকে বাঁচার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে দরজার দিকে ছুটে গেলেন এবং মহিলা তার পেছনে পেছনে গেল وَاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ (তারা উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল) তখন চট করে মহিলাটি কথা বলতে আরম্ভ করল এবং তাকে ইউসুফের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করল ঃ

قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْءًا اِلَّا اَنْ يُسْجَنَ اَوْعَذَابٌ اَلِيْمٌ.

'মহিলাটি বলল, যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ কিংবা কোন কঠিন শাস্তি ব্যতীত আর কি দণ্ড হতে পারে?'

মহিলা নিজেই অপরাধী অথচ সে অভিযুক্ত করছে ইউসুফ (আ)-কে এবং নিজের পূতচরিত্র ও কলুষমুক্ত হওয়ার কথা বলছে। এ কারণে ইউসুফ বললেন : هِىَ رَاوَدَتْنِىْ عَنْ نَفْسِىْ (এ মহিলাই আমাকে ফুসলাতে চেষ্টা করেছে) প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি সত্য কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا (মহিলার পরিবারের জনৈক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল)।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, যে সাক্ষ্য দিয়েছিল সে ছিল একান্তই দোলনার এক শিশু। আবূ হুরায়রা (রা), হিলাল ইবন আসাফ, হাসান বসরী, সাঈদ ইবন জুবায়র ও যাহ্হাক থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইবন জারীরও এ মতই গ্রহণ করেছেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে এ ব্যাপারে মারফূ হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং অন্যরা তা মওকূফরূপে বর্ণনা করেছেন।

কেউ কেউ বলেছেন, সাক্ষ্যদাতা ছিল মহিলার স্বামীর নিকটআত্মীয় একজন পুরুষ। আবার কেউ বলেছেন, সে ছিল মহিলার নিকটাত্মীয় একজন পুরুষ। সাক্ষ্যদাতা পুরুষ বলে অভিমত পোষণকারীদের মধ্যে রয়েছেন ইবন আব্বাস (রা), ইকরিমা, মুজাহিদ হাসান, কাতাদা, সুদ্দী, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক ও যায়দ ইবন আসলাম (র)।

যে সাক্ষ্য দিল ঃ إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ.

(যদি ওর জামার সম্মুখ দিকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তবে মহিলাটি সত্য কথা বলেছে এবং পুরুষটি মিথ্যাবাদী)। কারণ, তখন বোঝা যাবে ইউসুফ (আ) মহিলাকে ধরতে গিয়েছেন; আর মহিলা প্রতিরোধ করেছে— যার ফলে জামার সম্মুখ দিকে ছিঁড়ে গেছে। إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ (আর যদি তাঁর জামা পিছন দিক থেকে ছেঁড়া হয়ে থাকে তবে মহিলাটি মিথ্যা বলেছে এবং পুরুষটি সত্যবাদী)। কারণ, তখন প্রমাণিত হবে যে, ইউসুফ (আ) মহিলার কবল থেকে পালাতে চেয়েছেন এবং মহিলা তাঁকে ধরার জন্যে পেছনে পেছনে ছুটেছে ও তাঁর জামা টেনে ধরার কারণে পেছন দিকে ছিঁড়ে গেছে। আর বাস্তবেও তাই ঘটেছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَلَمَّا رَاٰى قَمِيْصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ. إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ.

'গৃহস্বামী যখন দেখল যে, তার জামা পেছন দিক থেকে ছেঁড়া রয়েছে। তখন সে বলল, এ হল তোমাদের নারীদের ছলনা। বস্তুত ভীষণ তোমাদের ছলনা।' অর্থাৎ এ যা কিছু ঘটেছে তা তোমাদের নারীদের কূট-কৌশল— তুমিই তাকে ফুসলিয়েছ এবং অন্যায়ভাবে তার ওপর দোষারোপ করছ।

এরপর মহিলার স্বামী এ ব্যাপারটির নিষ্পত্তিকল্পে বলেন ঃ يُوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هٰذَا

(ইউসুফ! এ বিষয়টিকে তুমি উপেক্ষা কর) অর্থাৎ কারও নিকট এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করো না। কারণ, এ জাতীয় বিষয় গোপন করাই বাঞ্ছনীয় ও উত্তম। অপর দিকে তিনি মহিলাকে তার অপরাধের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করার নির্দেশ দেন। কেননা, বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তওবা করে তখন আল্লাহ তার তওবা কবূল করেন। ঐ সময় মিসরবাসী যদিও মূর্তিপূজা করত, কিন্তু তারা বিশ্বাস করত যে, যে সত্তা পাপ মোচন করেন এবং পাপের শাস্তি দেন তিনি এক ও লা-শরীক আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নন। এ জন্যে স্ত্রী লোকটিকে তার স্বামী ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলেন; তবে কিছু কিছু কারণে তিনি মহিলার অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা উপলব্ধি করেন। কেননা, মহিলা এমন কিছু প্রত্যক্ষ করেছিল যা দেখে মনকে দাবিয়ে রাখা খুবই কঠিন (অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর রূপ)। তবে ইউসুফ (আ) ছিলেন পাক-পবিত্র ও নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী।

اِسْتَغْفِرِىْ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِيْنَ.

তুমি তোমার অপরাধের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর। কারণ নিশ্চিতভাবে তুমিই অপরাধী।

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِى الْمَدِيْنَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَنْ نَفْسِهِ. قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا. إِنَّا لَنَرٰهَا فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ

إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ . وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هٰذَا بَشَرًا. إِنْ هٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ.

قَالَتْ فَذٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ. وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ .وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِينَ. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

নগরের কতিপয় নারী বলল, আযীযের স্ত্রী তার যুবক দাস থেকে অসৎকর্ম কামনা করছে; প্রেম তাকে উন্মত্ত করেছে, আমরা তো তাকে দেখছি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। স্ত্রীলোকটি যখন ওদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল, তখন সে ওদেরকে ডেকে পাঠাল, ওদের জন্যে আসন প্রস্তুত করল, ওদের প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দিল এবং ইউসুফ (আ)-কে বলল, ওদের সম্মুখে বের হও। তারপর ওরা যখন তাকে দেখল তখন তারা ওর গরিমায় অভিভূত হল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। ওরা বলল, 'অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা।'

সে বলল, 'এ-ই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দা করেছ; আমি তো তা থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছি; কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে, আমি তাকে যা আদেশ করেছি সে যদি তা না করে, তবে সে কারারুদ্ধ হবেই এবং হীনদের অন্তর্ভুক্ত হবে। ইউসুফ বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! এই নারীগণ আমাকে যার প্রতি আহ্বান করছে তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। আপনি যদি ওদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন তবে আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।' তারপর তার প্রতিপালক তার আহ্বানে সাড়া দিলেন এবং তাকে ওদের ছলনা থেকে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (১২ : ৩০-৩৪)

এখানে আল্লাহ উল্লেখ করছেন সে সব কথা, যা শহরের মহিলা সমাজ তথা আমীর, ওমরাহ ও অভিজাত লোকদের স্ত্রী-কন্যাগণ আযীযের স্ত্রী সম্পর্কে নিন্দাবাদ করছিল। নিজের ক্রীতদাসের প্রতি প্রেমে উন্মত্ত হয়ে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ছলনা করার জন্য তারা তাকে ভর্ৎসনা করছিল। দাসের প্রতি এরূপ আসক্ত হওয়া তার মত অভিজাত মহিলার পক্ষে মোটেই শোভনীয় ছিল না। তাই তারা বলছিল إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (আমরা তাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি) অর্থাৎ সে অপাত্রে প্রেম নিবেদন করছে। فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ (আযীযের স্ত্রী যখন তাদের চক্রান্তের কথা শুনল) অর্থাৎ তার প্রতি শহরের মহিলাদের ভর্ৎসনার কথা শুনল এবং দাসের প্রতি প্রেম নিবেদন করার কারণে তাকে নিন্দাবাদ

করার কথা জানল। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আযীযের স্ত্রী এ ব্যাপারে ছিল অক্ষম। তাই সে ইচ্ছে করল তার ওযর ঐ মহিলাদের সামনে প্রকাশ করতে। তখন তারা বুঝবে যে, এই যুবক দাস তেমন নয় যেমন তারা ধারণা করেছে এবং এ সেসব দাসের মত নয়, যেসব দাস তাদের কাছে আছে। সুতরাং সে শহরের মহিলাদের নিমন্ত্রণ করল এবং সকলকে বাড়িতে ডেকে আনল। সে একটি ভোজ সভার আয়োজন করল। ভোজসভায় যে সব খাদ্য-দ্রব্য পরিবেশন করা হয় তার মধ্যে এমন কিছু দ্রব্য ছিল যা ছুরি দিয়ে কেটে খেতে হয়, যেমন লেবু ইত্যাদি। উপস্থিত প্রত্যেককে একটি করে ছুরি দেয়া হল। আযীযের স্ত্রী পূর্বেই ইউসুফ (আ)-কে উৎকৃষ্ট পোশাক পরিয়ে প্রস্তুত রেখেছিল। তখন তিনি ছিলেন পূর্ণ যৌবনে দীপ্তিমান। এ অবস্থায়. মহিলাটি ইউসুফ (আ)-কে তাদের সম্মুখে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দিলে তিনি বের হয়ে আসেন। ইউসুফ (আ)-কে তখন পূর্ণিমার চাঁদের চাইতেও অধিকতর সুন্দর দেখাচ্ছিল। فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ (যখন তারা তাকে দেখল তখন ওরা তাঁর গরিমায় অভিভূত হলো) অর্থাৎ তারা ইউসুফ (আ)-এর সৌন্দর্য-দর্শনে বিস্মিত হয়ে ভাবল, কোন আদম সন্তান তো এ রকম রূপ-লাবন্যের অধিকারী হতে পারে না। ইউসুফ (আ)-এর সৌন্দর্যের দীপ্তিতে অভিভূত হয়ে তারা চেতনা হারিয়ে ফেলে। এমনকি আপন আপন হাতে রক্ষিত ছুরি দ্বারা নিজেদের হাত কেটে ফেলে। অথচ যখমের কোন অনুভূতিই তাদের ছিল না।

وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا . إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ .

মহিলারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এতো মানুষ নয়, এ তো মহিমান্বিত ফেরেশতা!

মি'রাজ সংক্রান্ত হাদীসে এসেছে, 'আমি ইউসুফের কাছ দিয়ে গেলাম, দেখলাম সৌন্দর্যের অর্ধেকই তাকে দেওয়া হয়েছে।

সুহায়লী (র) ও অন্যান্য ইমাম বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আ)-কে অর্ধেক সৌন্দর্য দেয়া হয়েছিল—এ কথার অর্থ হল আদম (আ)-এর যে সৌন্দর্য ছিল তার অর্ধেক ইউসুফ (আ)-কে দেয়া হয়েছিল। কারণ আল্লাহ নিজ হাতে আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। সুতরাং তিনিই ছিলেন সবার চাইতে বেশি সুন্দর। এ জন্যে জান্নাতবাসী আদম (আ)-এর দৈহিক মাপ ও সৌন্দর্য নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর ইউসুফ (আ)-এর সৌন্দর্য ছিল আদম (আ)-এর সৌন্দর্যের অর্ধেক। এ দু'জনের মাঝখানে আর কোন সৌন্দর্যবান ব্যক্তি হবে না। যেমন হযরত হাওয়া (আ)-এর পরে হযরত ইবরাহীম খলীল (আ)-এর স্ত্রী সারাহ্ ভিন্ন আর কেউ হাওয়ার সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। ইবন মাসউদ (রা) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর চেহারায় বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল দ্যুতি ছিল। যখন কোন মহিলা কোন কাজে তাঁর কাছে আসত তখন তিনি নিজের চেহারা ঢেকে রাখতেন। অন্যরা বলেছেন, লোকজন যাতে চেহারা দেখতে না পায়, সে জন্যে হযরত ইউসুফ (আ) বোরকা পরিহিত থাকতেন। এ কারণেই যখন আযীযের স্ত্রী ইউসুফ (আ)-এর প্রেমে আসক্ত হয় এবং অন্যান্য মহিলা তার রূপ-দর্শনে আংগুল কাটার ন্যায় ঘটনা ঘটায় ও হতভম্ব হয়ে যায়, তখন আযীযের স্ত্রী বলেছিল ঃ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ (এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার জন্যে তোমরা আমাকে তিরস্কার করছ।) অতঃপর মহিলাটি হযরত ইউসুফ (আ)-এর পূত-চরিত্র হওয়ার কথা স্বীকার

করে বলে ঃ وَلَقَدْ رَاوَدْتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ (আমি তা থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছি কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে অর্থাৎ রক্ষা করেছে)। وَلَئِنْ لَّمْ يَفْعَلْ مَا اٰمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوْنًا مِّنَ الصَّاغِرِيْنَ. (এ যদি আমার কথা না শুনে তবে তাকে কয়েদ করা হবে এবং লাঞ্ছিত করা হবে) এ সময় অন্যান্য মহিলা ইউসুফ (আ)-কে তাঁর মনিব-পত্নীর প্রস্তাব মেনে নিতে উৎসাহ যোগায়; কিন্তু তিনি তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, তাঁর দেহে নবুওতের ধমনী প্রবাহিত ছিল। তিনি রাব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা করেন ঃ

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ اِلَيْهِ وَاِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُنْ مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ.

'হে আমার রব! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান জানায় তার চাইতে কারাগারই বরং আমার কাছে অধিক প্রিয়। আপনি যদি ওদের ছলনা থেকে আমাকে রক্ষা না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং তখন তো আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।' (১২ ঃ ৩৩)

অর্থাৎ আপনি যদি আমার উপর দায়িত্ব ছেড়ে দেন, তাহলে আমি অক্ষম দুর্বল। নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ কোনটির উপরই আমার কোন হাত নেই— আল্লাহ যা চান তাই হয়। আমি দুর্বল, তবে আপনি যতটুকু শক্তি-সামর্থ্য দেন এবং আপনার পক্ষ থেকে যতটুকু হিফাজত দান করেন তাই আমি পেয়ে থাকি। এ জন্যেই আল্লাহ বলেন ঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

আল্লাহ তার প্রার্থনা কবূল করলেন। তার উপর থেকে মহিলাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (১২ ঃ ৩৪)

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَاَوُا الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتّٰى حِيْنٍ. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيٰنِ. قَالَ اَحَدُهُمَا اِنِّيْ اَرٰنِيْ اَعْصِرُ خَمْرًا. وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْ اَرٰنِيْ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ. نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهِ. اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ. قَالَ لاَ يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهِ اِلاَّ نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهِ قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا. ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ اِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ. مَاكَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ. ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُوْنَ.

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. مَاتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ اِلاَّ اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا

مِنْ سُلْطَانٍ. إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ.

নিদর্শনাবলী দেখার পর তাদের মনে হল যে, তাকে কিছুকালের জন্যে কারারুদ্ধ করতে হবে। তার সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। ওদের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আংগুর নিংড়িয়ে রস বের করছি এবং অপরজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আমার মাথার উপর রুটি বহন করছি এবং পাখি তা থেকে খাচ্ছে। আমাদেরকে তুমি এর তাৎপর্য জানিয়ে দাও, আমরা তোমাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখেছি।'

ইউসুফ বলল, 'তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা আসার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের তাৎপর্য জানিয়ে দেব। আমি যা তোমাদেরকে বলব তা আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা হতে বলব। যে সম্প্রদায় আল্লাহে বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি; আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকূবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এটা আমাদের ও সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

'হে কারাসঙ্গীরা! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? তাকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতকগুলো নামের ইবাদত করছ, যে নাম তোমাদের পিতৃপুরুষ ও তোমরা রেখেছ; এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ পাঠাননি। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্র। তিনি আদেশ দিয়েছেন অন্য কারও ইবাদত না করতে, কেবল তাঁর ব্যতীত; এটাই সরল দীন কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।

'হে কারাসঙ্গী দ্বয়! তোমাদের একজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তার মনিবকে মদ্য পান করাবে এবং অপরজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে শূলবিদ্ধ হবে; তারপর তার মাথা থেকে পাখি আহার করবে। যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে! (সূরা ইউসুফ ঃ ৩৫-৪১)

আযীয ও তার স্ত্রী সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেছেন, ইউসুফের পবিত্রতা প্রকাশ পাওয়ার পর কিছুদিনের জন্যে তাকে জেলে রাখা তাদের কাছে সংগত বলে মনে হল। কারণ, এতে ঐ ব্যাপারে লোকজনের চর্চা কমে যাবে এবং এটাও বোঝা যাবে যে, ইউসুফ (আ)-ই অপরাধী যার কারণে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এভাবে অন্যায়ভাবে তাঁকে জেলখানায় পাঠান হল। অবশ্য ইউসুফ (আ)-এর জন্যে আল্লাহ্ এটাই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করলেন। কেননা, জেলে থাকায় তিনি তাদের সংসর্গ ও সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকার সুযোগ পান।

ইমাম শাফিঈর বর্ণনা মতে, সূফী সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এ ঘটনা থেকে দলীল গ্রহণ করে বলেছেন ঃ না পাওয়াটাই এক প্রকার হিফাজত।

আল্লাহ্র বাণী ঃ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. (তার সাথে আরও দুই যুবক জেলখানায় প্রবেশ করল।) এদের মধ্যে একজন ছিল বাদশার দরবারের সাকী, তার নাম বানূ বলে কথিত আছে। অপরজন বাদশার রুটি প্রস্তুতকারী অর্থাৎ খাদ্যের দায়িত্বশীল—তুর্কী ভাষায় যাকে বলে আলজাশেনকীর। কথিত আছে তার নাম ছিল মাজলাছ। বাদশাহ এ দু'জনকে কোন এক ব্যাপারে অভিযুক্ত করে কারাগারে আবদ্ধ করেন। জেলখানায় ইউসুফ (আ)-এর আচার-আচরণ, স্বভাবচরিত্র, সাধুতা, নীতি-আদর্শ, ইবাদত- বন্দেগী ও সৃষ্টির প্রতি করুণা দেখে তারা দু'জনেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। এ দুই কারাবন্দী যুবক তাদের নিজ নিজ অবস্থান অনুযায়ী স্বপ্ন দেখে। মুফাস্সিরগণ বলেছেন, তারা একই রাত্রে এ স্বপ্ন দেখেছিল। সাকী দেখে, পাকা আংগুরে ভর্তি তিনটি গোছা, সেখান থেকে সে আংগুর ছিঁড়ে রস নিংড়িয়ে পেয়ালা ভরে বাদশাহ্কে পরিবেশন করছে। অপর দিকে রুটি প্রস্তুতকারী দেখে, তার মাথার উপর রুটি ভরা তিনটি ঝুড়ি রয়েছে। আর পাখিরা এসে উপরের ঝুড়ি থেকে রুটি ঠুকরিয়ে খাচ্ছে। স্বপ্ন দেখার পর দু'জনেই নিজ নিজ স্বপ্নের বৃত্তান্ত ইউসুফ (আ)-এর কাছে ব্যক্ত করে তারা এর ব্যাখ্যা জানতে চাইল এবং বলল ঃ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ (আমরা আপনাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি।) ইউসুফ তাদেরকে জানালেন যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত ও অভিজ্ঞ।

قَالَ لَا يَأْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيْلِهِ.

(ইউসুফ বলল, তোমরা প্রত্যহ নিয়মিত যে খাদ্য খাও তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে এর তাৎপর্য জানিয়ে দেব।) এ আয়াতের অর্থ কেউ এভাবে করেছেন যে, তোমরা দু'জনে যখনই কোন স্বপ্ন দেখবে, তা বাস্তবে পরিণত হবার পূর্বেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দেব। এবং যেভাবে আমি ব্যাখ্যা দেব সেভাবেই তা বাস্তবায়িত হবে। আবার কেউ এর অর্থ বলেছেন যে, তোমাদেরকে যে খাদ্য দেয়া হয় তা পরিবেশন হওয়ার আগেই আমি বলে দেব কি খাদ্য আসছে, তা মিষ্টি না টক।

যেমন হযরত ঈসা (আ) বলেছিলেন ঃ

وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ.

(আমি তোমাদেরকে বলে দেব কি খাদ্য তোমরা খেয়েছ এবং বাড়িতে কি রেখে এসেছ) হযরত ইউসুফ (আ) তাদেরকে জানালেন যে, এ জ্ঞান আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন। কেননা, আমি তাঁকে এক আল্লাহ্ বলে বিশ্বাস করি ও আমার পূর্ব পুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করি مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ (আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়)। ذَالِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا (এটা আমাদের উপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ) কেননা তিনিই আমাদেরকে এ পথ প্রদর্শন করেছেন। وَعَلَى النَّاسِ- (এবং মানুষের উপরও) কেননা, আল্লাহ্ আমাদেরকে আদেশ করেছেন, মানুষকে এদিকে আহ্বান করার। তাদেরকে সত্য পথে আনার চেষ্টা করার ও সত্য পথ প্রদর্শন করার। আর এ সত্য সৃষ্টিগতভাবে তাদের মধ্যে বিদ্যমান এবং তাদের স্বভাবজাত।

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ- (কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না)। এরপর হযরত ইউসুফ (আ) তাদেরকে আল্লাহ্‌র একত্বের প্রতি ঈমান আনার জন্যে তাদেরকে দাওয়াত দেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদতের নিন্দা করেন। মূর্তির অসারতা, অক্ষমতা ও হেয় হওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

يَا صَاحِبَىِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ اِلَّا اَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاءُكُمْ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ-

হে আমার কারাসঙ্গী দ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ্? তাকে ছেড়ে তোমরা কেবল কতকগুলো নামের ইবাদত করছ—যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃ-পুরুষ রেখেছ। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ কোন প্রমাণ নাজিল করেননি। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহ্‌রই।

অর্থাৎ তিনি তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে যেরূপ ইচ্ছা করেন সেরূপই বাস্তবায়িত করেন। যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। اَمَرَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ (তিনি হুকুম করেছেন ঃ তাঁকে ব্যতীত কারও ইবাদত কর না) তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ (এটাই সরল দীন অর্থাৎ সরল ও সঠিক পথ।) وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা অবগত নয়।)

অর্থাৎ সঠিক পথ তাদের সম্মুখে প্রকাশিত ও স্পষ্ট হওয়ার পরও তারা সে পথে চলতে পারে না। কারাগারের এ দুই যুবককে এমন একটি পরিবেশে দাওয়াত দান হযরত ইউসুফ (আ)-এর পূর্ণ কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। কেননা, তাদের অন্তরে ইউসুফ (আ)-এর প্রভাব ও মহত্ত্ব আসন গেড়ে বসেছিল। যা তিনি বলবেন, তা গ্রহণ করার জন্যে তারা ছিল উদ্গ্রীব। সুতরাং তারা যে বিষয়ে জানতে চেয়েছে তার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানানোই তিনি সঙ্গত মনে করেছেন। তাঁর প্রতি আরোপিত সে গুরুদায়িত্ব পালনের পর তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান করে বলেন ঃ

يَاصَاحِبَىِ السِّجْنِ اَمَّا اَحَدُكُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّهٗ خَمْرًا.

(হে আমার জেলখানার সাথীরা। তোমাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল : তোমাদের দু'জনের মধ্যে একজন আপন মনিবকে মদ্য পান করাবে) সে লোকটি ছিল সাকী।

وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِهٖ.

আর দ্বিতীয়জনকে শূলে চড়ান হবে, এবং পাখিরা তার মাথা থেকে আহার করবে। সে ব্যক্তিটি ছিল রুটি প্রস্তুতকারী। قُضِىَ الْاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيَانِ (যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছিলে তার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে) অর্থাৎ যা বলে দেয়া হল তা অবশ্যম্ভাবীরূপে কার্যকর হবে এবং যেভাবে বলা হল সেভাবেই হবে। এ জন্যে হাদীসে এসেছে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা যতক্ষণ করা না হবে ততক্ষণ তা ঝুলন্ত থাকে। যখন ব্যাখ্যা করা হয় তখন তা বাস্তবায়িত হয়।

الرؤيا على رجل طائر مالم تعبر فاذا عبرت وقعت .

ইবন মাসউদ, মুজাহিদ ও আবদুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত ঃ কয়েদী দু'জন স্বপ্নের কথা বলার পরেও ইউসুফ (আ)-এর ব্যাখ্যা দানের পরে বলেছিল, আসলে আমরা কোন স্বপ্নই দেখি নাই। তখন হযরত ইউসুফ (আ) বলেছিলেন قُضِىَ الْأَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيَانِ- (যে বিষয়ে তোমরা জিজ্ঞাসা করেছ সে বিষয়ের ফয়সালা চূড়ান্ত হয়ে গেছে।)

وَقَالَ لِلَّذِىْ ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ.

(যে ব্যক্তি সম্পর্কে ইউসুফের ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে। তাকে সে বলে দিল : তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলবে। কিন্তু শয়তান তাকে প্রভুর কাছে তার বিষয় বলার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রইল। (১২ ঃ ৪২)

আল্লাহ জানান যে, যে ব্যক্তির প্রতি ইউসুফ (আ)-এর ধারণা হয়েছিল যে, সে মুক্তিলাভ করবে— সে ব্যক্তি ছিল সাকী اُذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ (তোমার মনিবের নিকট আমার কথা বলবে।)

অর্থাৎ আমি যে বিনা অপরাধে জেলখানায় আছি এ বিষয়ে বাদশাহর কাছে আলোচনা করিও। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করা বৈধ এবং তা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

আল্লাহ বাণী : فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ

(শয়তান তাকে তার প্রভুর নিকট তার কথা বলার বিষয় ভুলিয়ে দিল) অর্থাৎ যে মুক্তি লাভ করল তাকে ইউসুফ যে অনুরোধ করেছিলেন তা বাদশাহর কাছে আলোচনা করতে শয়তান তাকে ভুলিয়ে দিল। মুজাহিদ, মুহাম্মদ ইবন ইসহাক প্রমুখ আলিম এ কথাই বলেছেন। এটাই সঠিক এবং এটাই আহলি কিতাবগণের বক্তব্য।

فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ .

(ফলে ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রইল) بضع শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার জন্যে ব্যবহৃত হয়; কারও মতে সাত পর্যন্ত, কারও মতে পাঁচ পর্যন্ত। কারও মতে দশের নিচে যে কোন সংখ্যার জন্যে এর ব্যবহার হয়। ছা'লাবী এসব মতামত বর্ণনা করেছেন। বলা হয়ে থাকে بضع نسوة এবং بضعة رجال ব্যাকরণবিদ ফাররার মতে, দশের নিচের সংখ্যার জন্যে بضع এর ব্যবহার বৈধ নয় বরং তার জন্যে نيف শব্দ ব্যবহার করা হয়।

আল্লাহ বলেন : فَلَبِثَ فِى السِّجْنِ بِضْعَ سِنِيْنَ- সে কারাগারে কয়েক বছর রইল

আল্লাহর বাণী ঃ فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ. لِلّٰهِ الْأَمْرُ (৩০ ঃ ৪)

উক্ত দু'খানা আয়াত দ্বারা ফাররার মতামত রদ হয়ে যায়। ফাররার মতে بضع-এর ব্যবহার হবে এভাবে যথা ঃ بضعة عشر بضعة عشرون থেকে تسعين পর্যন্ত। কিন্তু بضع و الف- এবং بضع ومائة বলা যাবে না। জওহারী বলেন, عشر (দশ)-এর ঊর্ধ্বের ক্ষেত্রে بضع-এর ব্যবহার হবে না। সুতরাং بضع عشر বলা যাবে কিন্তু بضعة وعشرون وتسعون বলা যাবে না। জওহারীর এ মতও সঠিক নয়। কেননা হাদীসে এসেছে ঃ

الايمان بضع وستون وفى رواية وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق.

ঈমানের ষাটের উপরে, ভিন্ন রেওয়ায়তে সত্তরের উপরে শাখা আছে; তন্মধ্যে সর্ব উপরের শাখা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলা এবং সর্বনিম্নের শাখা পথের উপর থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেওয়া। (সহীহ্ বুখারী) কেউ কেউ বলেছেন فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ এর صغير (সর্বনাম) ইউসুফ নির্দেশ করেছে। কিন্তু তাদের এ মত অত্যন্ত দুর্বল। যদিও এ মত ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইকরিমার বলে বর্ণনা করা হউক না কেন। ইব্ন জারীর এ প্রসঙ্গে যে হাদীসের উল্লেখ করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। ইবরাহীম ইব্ন ইয়াযীদ আল-খাওযী আল-মাক্কী (র) এ হাদীসের সনদে একক বর্ণনাকারী। অথচ তার বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য। অপর দিকে হাসান ও কাতাদা (র)-এর মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। আর এ স্থলে তো তা আরও বেশি অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

সহীহ ইব্ন হিব্বানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর কারাগারে অধিককাল পর্যন্ত আবদ্ধ থাকার কারণ সম্পর্কে এক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ইউসুফের প্রতি রহম করুন, তিনি যদি اُذْكُرْنِىْ عِنْدَ رَبِّكَ "তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলবে" কথাটি না বলতেন, তবে তাকে অতদিন কারাগারে থাকতে হত না। আল্লাহ তা'আলা হযরত লূত (আ)-এর প্রতিও রহম করুন; কারণ তিনি তাঁর কওমকে বলেছিলেন--তোমাদের মুকাবিলায় আমার যদি আজ শক্তি থাকত কিংবা কোন শক্ত অবলম্বনের আশ্রয় পেতাম। (لَوْاَنَّ لِىْ بِكُمْ قُوَّةً اَوْ اٰوِىْ اِلٰى رُكْنٍ شَدِيْدٍ) এরপর আল্লাহ যত নবী প্রেরণ করেছেন তাদেরকে বিপুল সংখ্যক লোক বিশিষ্ট গোত্রেই প্রেরণ করেছেন।

কিন্তু এ হাদীস এই সনদে মুনকার। তাছাড়া মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আলকামা সমালোচিত রাবী। তাঁর বেশ কিছু একক বর্ণনায় বিভিন্ন রকম দুর্বলতা রয়েছে। বিশেষত এ শব্দগুলো একান্তই মুন্কার। ইমাম বুখারী ও মুসলিমের হাদীসও উক্ত হাদীসকে ভুল প্রতিপন্ন করে।

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّىْ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ. يٰاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِىْ فِىْ رُءْيَاىَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ. قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ. وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ.

وَقَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ.
يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
وَّسَبْعِ سُنْبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّاُخَرَ يٰبِسٰتٍ لَّعَلِّىْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَعْلَمُوْنَ. قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا. فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِىْ سُنْبُلِهٖٓ
اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ. ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ
لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ. ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ
وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ.

রাজা বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী ওদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।' ওরা বলল, 'এটা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্ন-ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।' দু'জন কারাবন্দীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হল, সে বলল, আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও। সে বলল, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে তুমি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দাও। যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে যেতে পারি ও যাতে তারা অবগত হতে পারে। ইউসুফ বলল, 'তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে। তারপর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শীষ সমেত রেখে দিবে, এবং এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর, এ সাত বছর যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে লোকে তা খাবে, কেবল সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে তা ব্যতীত। এবং এরপর আসবে এক বছর, সে বছর মানুষের জন্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে। (১২ ঃ ৪৩-৪৯)

এখানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর কারাগার থেকে সসম্মানে বের হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। তা এভাবে যে, মিসরের বাদশাহ রায়্যান ইব্‌ন নূহ উপরোক্ত স্বপ্নটি দেখেন। তার বংশ লতিকা হচ্ছে ঃ রায়্যান ইবনুল ওলীদ ইব্‌ন ছারওয়ান ইব্‌ন আরাশাহ ইব্‌ন ফারান ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আমলাক ইব্‌ন লাউয ইব্‌ন সাম। আহলি কিতাবগণ বলেন ঃ বাদশাহ স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি এক নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ সেখান থেকে সাতটি মোটাতাজা গাভী উঠে এসে নদী তীরের সবুজ বাগিচায় চরতে শুরু করে। অতঃপর ঐ নদী থেকে আরও সাতটি দুর্বল ও শীর্ণকায় গাভী উঠে এসে পূর্বের গাভীদের সাথে চরতে থাকে। এরপর এ দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা গাভীদের কাছে গিয়ে সেগুলোকে খেয়ে ফেলে। এ সময় ভয়ে বাদশাহর ঘুম ভেঙে যায়। কিছুক্ষণ পর বাদশাহ পুনরায় ঘুমিয়ে পড়েন। এবার আবার স্বপ্নে দেখেন, একটি ধান গাছে সাতটি সবুজ শীষ। আর অপর দিকে আছে সাতটি শুকনো ও শীর্ণ শীষ। শুকনো শীষগুলো সবুজ সতেজ শীষগুলোকে খেয়ে ফেলছে। বাদশাহ এবারও ভয়ে ভীত হয়ে ঘুম

থেকে জেগে উঠেন। পরে বাদশাহ্ পারিষদ ও সভাসদবর্গের কাছে স্বপ্নের বর্ণনা দিয়ে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু তারা কেউই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিল না। বরং। قَالُوْا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ (তারা বলল, এটা তো অর্থহীন স্বপ্ন) অর্থাৎ এটা হয়ত রাত্রিকালের স্বপ্ন বিভ্রাট। এর কোন ব্যাখ্যা নেই। এছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানে আমরা পারদর্শীও নই। তাই তারা বলল ঃ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيْلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِيْنَ (আর আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দানে অভিজ্ঞ নই।) এ সময় সেই কয়েদিটির ইউসুফ (আ)-এর কথা স্মরণে পড়ল যে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেছিল এবং যাকে হযরত ইউসুফ (আ) অনুরোধ করেছিলেন তাঁর মনিবের নিকট ইউসুফ (আ)-এর কথা আলোচনা করতে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সে ঐ কথা ভুলে রয়েছিল। মূলত এটা ছিল আল্লাহ্ নির্ধারিত তকদীর এবং এর মধ্যে আল্লাহর নিগূঢ় রহস্য নিহিত ছিল। ঐ মুক্ত কয়েদী যখন বাদশাহর স্বপ্নের কথা শুনল ও এর ব্যাখ্যা প্রদানে সকলের অক্ষমতা দেখল, তখন ইউসুফ (আ)-এর কথা ও তাঁর অনুরোধের কথা স্মরণ পড়ল। আল্লাহ্ তাই বলেছেন ঃ وَقَالَ الَّذِيْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ (দু'জন কারাবন্দীর মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি লাভ করেছিল এবং দীর্ঘকাল পরে যার স্মরণ হয়েছিল, সে বলল,) بَعْدَ أُمَّةٍ অর্থ প্রচুর সময়ের পর অর্থাৎ কয়েক বছর পর। ইব্ন আব্বাস (রা) ইকরিমা (রা) ও দাহ্হাক (র)-এর কিরাআত অনুযায়ী (وَادَّكَرَ بَعْدَ أَمَةٍ)-এর অর্থ بعد النسيان ভুলে যাওয়ার পর স্মরণ হল, মুজাহিদের কিরাআত بعد امة মীমের উপর সাকিন; এর অর্থও ভুলে যাওয়া ((الرجل) امه – يامه – امها امها। অর্থ লোকটি ভুলে গেছে। কবি বলেছেন ঃ

امهت وكنت لا انسى حديثا – كذاك الدهر يزرى بالعقول.

অর্থাৎ— 'আমি ইদানীং অনেক কথা ভুলে যাই। অথচ ভুলে যাওয়ার দোষ আমার মধ্যে ছিল না। এভাবেই যুগের বিবর্তন জ্ঞানকে কলংকিত করে দেয়।' পারিষদবর্গ ও বাদশাহকে উদ্দেশ করে সে বলল, أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيْلِهِ فَأَرْسِلُوْنِ (আমি আপনাদেরকে এ স্বপ্নের তাৎপর্য জানাতে পারব। সুতরাং আমাকে পাঠিয়ে দিন) অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর কাছে। তারপর ইউসুফ (আ)-এর কাছে গিয়ে সে বলল ঃ

يُوْسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيْقُ أَفْتِنَا فِيْ سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَّأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّيْ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ –

'হে ইউসুফ ! হে সত্যবাদী! সাতটি মোটাতাজা গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষকে অপর সাতটি শুষ্ক শীষ খেয়ে ফেলছে—এ স্বপ্নের আপনি ব্যাখ্যা বলে দিন। যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে বলতে পারি এবং তারাও জানতে পারে।' (১২ ঃ ৪৬)

আহলি কিতাবদের মতে, বাদশাহর কাছে সাকী ইউসুফ (আ)-এর আলোচনা করে। বাদশাহ্ ইউসুফ (আ)-কে দরবারে ডেকে এনে স্বপ্নের বৃত্তান্ত তাঁকে জানান এবং ইউসুফ (আ) তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে শুনান। এটা ভুল। আহলি কিতাবদের পণ্ডিত ও রাব্বানীদের মনগড়া

কথা। সঠিক সেটাই যা আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন। যা হোক, সাকীর কথার উত্তরে ইউসুফ (আ) কোন শর্ত ছাড়াই এবং আশু মুক্তি দাবি না করেই তাৎক্ষণিকভাবে বাদশাহর স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে শুনালেন এবং বলে দিলেন, প্রথম সাত বছর স্বচ্ছন্দময় হবে এবং তারপরের সাত বছর দুর্ভিক্ষ থাকবে।

ثُمَّ يَأْتِى مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ.

(এরপর আসবে এক বছর। সে বছরে মানুষের জন্যে প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে) ফলে প্রচুর ফসল ফলবে ও মানুষ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে। وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (সে বছরে তারা প্রচুর রস নিংড়াবে) অর্থাৎ আখ, আঙ্গুর, যয়তুন, তিল ইত্যাদির রস বের করবে— তাদের অভ্যাস অনুযায়ী। স্বপ্নের ব্যাখ্যার সাথে হযরত ইউসুফ (আ) সচ্ছলতার সময় ও দুর্ভিক্ষকালে তাদের করণীয় সম্পর্কে পথনির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, প্রথম সাত বছরের ফসলের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ শীষসহ সঞ্চয় করে রাখবে। পরের সাত বছরে সঞ্চিত ফসল অল্প অল্প করে খরচ করবে। কেননা এরপরে ফসলের জন্যে বীজ পাওয়া দুষ্কর হতে পারে। এ থেকে হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِى بِهِ. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْئَلْهُ مَابَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِى قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. إِنَّ رَبِّى بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ. قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ. قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّى لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِى كَيْدَ الْخَائِنِينَ. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِى. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَارَحِمَ رَبِّى. إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَحِيمٌ.

রাজা বলল, তোমরা ইউসুফকে আমার নিকট নিয়ে এস। দূত যখন তাঁর নিকট উপস্থিত হল তখন সে বলল, তুমি তোমার প্রভুর নিকট ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, এবং যে নারীগণ হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী? আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবগত। রাজা নারীগণকে বলল, 'যখন তোমরা ইউসুফ থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছিলে, তখন তোমাদের কী হয়েছিল! তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! আমরা ওর মধ্যে কোন দোষ দেখিনি। আযীযের স্ত্রী বলল, এক্ষণে সত্য প্রকাশ হল। আমিই তার থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছিলাম— সে তো সত্যবাদী। সে বলল, আমি এটা বলেছিলাম, যাতে সে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। সে বলল, আমি আমাকে নির্দোষ মনে করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্মপ্রবণ। কিন্তু সে নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১২ : ৫০-৫৩)

বাদশাহ যখন হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, সঠিক সিদ্ধান্ত ও অনুধাবন ক্ষমতার সম্যক পরিচয় পেলেন, তখন তাঁকে তাঁর দরবারে উপস্থিত করার আদেশ দেন। যাতে করে তিনি তাঁকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত করতে পারেন। দূত যখন ইউসুফ (আ)-এর কাছে আসে তখন হযরত ইউসুফ (আ) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি জেলখানা থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত বের হবেন না, যতক্ষণ না প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারে যে, তাঁকে অন্যায়ভাবে ও শত্রুতাবশত কারাগারে আবদ্ধ করা হয়েছিল এবং মহিলারা তাঁর প্রতি যে দোষ আরোপ করেছে তা সম্পূর্ণ অমূলক অপবাদ, তিনি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই তিনি বললেন ঃ اِرْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ (তুমি তোমার প্রভুর কাছে চলে যাও) অর্থাৎ বাদশাহর কাছে।

فَاسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِيْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّىْ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ

(এবং তাকে জিজ্ঞেস কর, যেসব মহিলা নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী? আমার প্রতিপালক তো তাদের ছলনা সম্পর্কে সম্যক অবগত।) কেউ কেউ এখানে اِنَّ رَبِّىْ-এর অর্থ মনিব ও প্রভু বলেছেন। অর্থাৎ আমার মনিব আযীয আমার পবিত্রতা এবং আমার প্রতি আরোপিত অপবাদ সম্পর্কে ভাল করেই জানেন। সুতরাং বাদশাহকে গিয়ে বল, তিনি ঐ মহিলাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন যে, তারা যখন আমাকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিল, তখন আমি কত দৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা করেছিলাম। মহিলাদের কাছে জিজ্ঞেস করা হলে তারা বুঝবে যে, প্রকৃত ঘটনা কি ছিল এবং আমিই-বা কী ভাল কাজ করেছিলাম? وَقُلْنَ حَاشَا لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ (তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মহিমা! আমরা ইউসুফের মধ্যে কোন দোষ দেখিনি) ঐ সময় قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيْزِ (আযীযের স্ত্রী বলল) তিনি ছিলেন যুলায়খা। اَلْاٰنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ (এক্ষণে সত্য প্রকাশিত হল) অর্থাৎ যেটা বাস্তব ও সত্য তা প্রকাশিত ও সুস্পষ্ট হয়ে গেল। আর সত্যই অনুসরণযোগ্য। اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ (আমিই তার থেকে অসৎকর্ম কামনা করেছিলাম। বস্তুত সে-ই সত্যবাদী।) অর্থাৎ সে দোষমুক্ত। সে আমার কাছে অসৎকর্ম কামনা করেনি এবং তাকে মিথ্যা, জুলুম, অন্যায় ও অপবাদ দিয়ে কারাবন্দী করা হয়েছে।

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَائِنِيْنَ.

আমি এটি বলছিলাম যাতে সে জানতে পারে যে, তার অগোচরে আমি তার বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।

কারো কারো মতে, এটা হযরত ইউসুফ (আ)-এর কথা। তখন অর্থ হবে ঃ আমি এ বিষয়টি যাঁচাই করতে চাই এ উদ্দেশ্যে, যাতে আযীয জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার সাথে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আবার কারো কারো মতে, এটা যুলায়খার উক্তি। তখন অর্থ হবে এই যে, আমি একথা স্বীকার করছি এ উদ্দেশ্যে, যাতে আমার স্বামী জানতে পারে যে, আমি মূলত তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কোন কাজ করিনি। এটা অবশ্য তার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আমার সাথে কোন অশ্লীল কাজ সংঘটিত হয়নি। পরবর্তীকালের অনেক ইমামই এই মতকে সমর্থন করেন। ইব্‌ন জারির ও ইব্‌ন আবী হাতিম (র) প্রথম মত ব্যতীত অন্য কিছু বর্ণনাই করেননি।

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্মপ্রবণ। কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

কেউ বলেছেন, এটা ইউসুফ (আ)-এর উক্তি, আবার কেউ বলেছেন যুলায়খার উক্তি। পূর্বের আয়াতের দুই ধরনের মতামত থাকায় এ আয়াতেও দুই প্রকার মতের সৃষ্টি হয়েছে। তবে এটা যুলায়খার বক্তব্য হওয়াটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত।

আল্লাহর বাণী ঃ

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ. وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.

রাজা বলল, ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব। তারপর রাজা যখন তার সাথে কথা বলল, তখন রাজা বলল, আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাশালী ও বিশ্বাসভাজন হলে। ইউসুফ বলল, 'আমাকে দেশের ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন! আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ।' এভাবে ইউসুফ (আ)-কে আমি সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। সে সেদেশে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি; আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না। যারা মুমিন এবং মুত্তাকী তাদের পরলোকের পুরস্কারই উত্তম। (১২ ঃ ৫৪-৫৭)

ইউসুফ (আ)-এর উপর যে অপবাদ দেয়া হয়েছিল তা থেকে যখন তাঁর মুক্ত ও পবিত্র থাকার কথা বাদশাহর কাছে সুস্পষ্ট হল তখন তিনি বললেন ঃ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي- (ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি তাকে আমার একান্ত সহচর করে রাখব) অর্থাৎ আমি তাঁকে আমার বিশেষ পারিষদ ও রাষ্ট্রীয় উচ্চমর্যাদা দিয়ে আমার পারিষদভুক্ত করে রাখব। তারপর বাদশাহ যখন ইউসুফ (আ)-এর সাথে কথা বললেন, এবং তাঁর কথাবার্তা শুনে তাঁর অবস্থাদি সম্যক জানলেন, তখন বললেন ঃ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ (আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাশীল ও বিশ্বাসভাজন হলে)

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ. إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ.

(ইউসুফ বলল ঃ আমাকে রাজ্যের ধন-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন; আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও সুবিজ্ঞ।) হযরত ইউসুফ (আ) বাদশাহর কাছে ধন-ভাণ্ডারের উপর তদারকির দায়িত্বভার চাইলেন। কারণ, প্রথম সাত বছর পর দুর্ভিক্ষের কালে সংকট সৃষ্টি হওয়ার আশংকা

ছিল। সুতরাং সে সময় আল্লাহর পছন্দ অনুযায়ী মানুষের কল্যাণ সাধন ও তাদের প্রতি সদয় আচরণ করার ব্যাপারে যাতে ত্রুটি না হয়, সে লক্ষ্যে তিনি এই পদ কামনা করেন। বাদশাহকে তিনি আশ্বস্ত করেন যে, তাঁর দায়িত্বে যা দেয়া হবে তা তিনি বিশ্বস্ততার সাথে সংরক্ষণ করবেন এবং রাজস্ব বিষয়ে উন্নতি ও উৎকর্ষ বিধানে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় দেবেন। এতেই প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি নিজের আমানতদারী ও দায়িত্ব পালনের প্রতি দৃঢ় আস্থাশীল, সে তার যোগ্য পদের জন্য আবেদন করতে পারে।

আহলি কিতাবদের মতে, ফিরআউন (মিসরের বাদশাহ) ইউসুফ (আ)-কে পরম মর্যাদা দান করেন এবং সমগ্র মিসর দেশের কর্তৃত্ব তাঁর হাতে তুলে দেন। নিজের বিশেষ আংটি ও রেশমী পোশাক তিনি তাঁকে পরিয়ে দেন, তাঁকে স্বর্ণের হারে ভূষিত করে এবং মসনদের দ্বিতীয় আসনে তাঁকে আসীন করেন। তারপর বাদশাহর সম্মুখেই ঘোষণা করা হলো ঃ 'আজ থেকে আপনিই দেশের প্রকৃত শাসক। কেবল নিয়মতান্ত্রিক প্রধানরূপে রাজ সিংহাসনের অধিকারী হওয়া ছাড়া অন্য কোন দিক দিয়েই আমি আপনার চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী নই। তারা বলেন, ইউসুফ (আ)-এর বয়স তখন ত্রিশ বছর এবং এক অভিজাত বংশীয়া মহিলা ছিলেন তাঁর স্ত্রী।

বিখ্যাত তাফসীরবিদ ছালাবী বলেছেন, মিসরের বাদশাহ আযীযে মিসর কিতফীরকে পদচ্যুত করে ইউসুফ (আ)-কে সেই পদে বসান। কথিত আছে, কিতফীরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী যুলায়খাকে বাদশাহ ইউসুফের সাথে বিবাহ দেন। ইউসুফ (আ) যুলায়খাকে কুমারী অবস্থায় পান। কেননা, যুলায়খার স্বামী স্ত্রী সংসর্গে যেতেন না। যুলায়খার গর্ভে ইউসুফ (আ)-এর দুই পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তাদের নাম আফরাইম ও মানশা। এভাবে ইউসুফ (আ) মিসরের কর্তৃত্ব লাভ করে সে দেশে ন্যায়বিচার কায়েম করেন এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছেই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

কথিত আছে, ইউসুফ (আ) যখন কারাগার থেকে বের হয়ে বাদশাহর সম্মুখে আসেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ত্রিশ বছর। বাদশাহ সত্তুরটি ভাষায় তাঁর সাথে কথা বলেন। যখন যে ভাষায় তিনি কথা বলেন, ইউসুফ (আ) তখন সেই ভাষায়ই তার উত্তর দিতে থাকেন। অল্প বয়স হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এ অসাধারণ যোগ্যতা দেখে বাদশাহ বিস্মিত হন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আল্লাহর বাণী ঃ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى الْأَرْضِ

(এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করি।) অর্থাৎ কারাগারের সংকীর্ণ বন্দী জীবন শেষে তাকে মুক্ত করে মিসরের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাচলের ব্যবস্থা করে দিই। يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ (সে তথায় যেখানে ইচ্ছা নিজের জন্যে স্থান করে নিতে পারত) অর্থাৎ মিসরের যে কোন জায়গায় স্থায়িভাবে থাকার ইচ্ছা করলে সম্মান ও মর্যাদার সাথে তা করার সুযোগ ছিল। نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

(আমি যাকে ইচ্ছা তাকে আমার রহমত দান করি এবং সৎ কর্মশীলদের বিনিময় আমি বিনষ্ট করি না।) অর্থাৎ এই যা কিছু করা হল তা একজন মু'মিনের প্রতি আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ বিশেষ। এ ছাড়াও মু'মিনের জন্যে রয়েছে পরকালীন প্রভূত কল্যাণ ও উত্তম প্রতিদান।

এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ .

(যারা মু'মিন এবং মুত্তাকী তাদের আখিরাতের পুরস্কারই উত্তম।) কথিত আছে, যুলায়খার স্বামী ইতফীরের মৃত্যুর পর বাদশাহ ইউসুফ (আ)-কে তার পদে নিযুক্ত করেন এবং তার স্ত্রী যুলায়খাকে ইউসুফ (আ)-এর সাথে বিয়ে দেন। ইউসুফ (আ) নিজেকে একজন সত্যবাদী ও ন্যায়নিষ্ঠ উযীর হিসেবে প্রমাণিত করেন।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, মিসরের বাদশাহ ওলীদ ইব্ন রায়্যান ইউসুফ (আ)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

জনৈক কবি বলেছেন ঃ

وراء مضيق الخوف متسع الامن – واول مفروح به غاية الحزن

فلا تيأسن فالله ملك يوسفا – خزائنه بعد الخلاص من السجن

অর্থ ঃ ভয়-ভীতির সংকীর্ণতার পরে থাকে নিরাপত্তার প্রশস্ততা আর আনন্দ স্ফূর্তির পূর্বে থাকে চূড়ান্ত পেরেশানী ও চিন্তা। অতএব, তুমি নিরাশ হয়ো না। কেননা আল্লাহ হযরত ইউসুফ (আ)-কে অন্ধ কারাগার থেকে মুক্ত করে তাঁর ধন-ভাণ্ডারের মালিক করে দিয়েছিলেন।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ . وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِأَخٍ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيْكُمْ . أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيْ أُوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ . فَإِنْ لَمْ تَأْتُوْنِيْ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ . قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُوْنَ . وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوْا بِضَاعَتَهُمْ فِيْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا إِذَا انْقَلَبُوْا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং তার কাছে উপস্থিত হল। সে ওদেরকে চিনল; কিন্তু ওরা তাকে চিনতে পারল না এবং সে যখন ওদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে বলল, 'তোমরা আমার কাছে তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছ না যে, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই? আমি উত্তম মেযবান? কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আস তবে আমার কাছে তোমাদের জন্যে কোন বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না।' তারা বলল, 'তার বিষয়ে আমরা তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব।' ইউসুফ তার ভৃত্যদেরকে বলল, 'ওরা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও--যাতে স্বজনদের কাছে প্রত্যাবর্তনের পর তারা বুঝতে পারে যে, এটা প্রত্যর্পণ করা হয়েছে; তাহলে তারা পুনরায় আসতে পারে।' (সূরা ইউসুফ ঃ ৫৮-৬২)

এখানে আল্লাহ্ হযরত ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের মিসরে আগমনের বিষয়ে জানাচ্ছেন যে, দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে যখন সমগ্র দেশ ও জাতি তার করাল গ্রাসে পতিত হয়, তখন খাদ্য সংগ্রহের জন্যে তারা মিসরে আগমন করে। ইউসুফ (আ) ঐ সময় মিসরের দীনী ও দুনিয়াবী সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ভাইয়েরা ইউসুফ (আ)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাদের চিনে ফেলেন কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারল না। কারণ ইউসুফ (আ) এত বড় উচ্চ পদ-মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন এটা তাদের কল্পনারও অতীত ছিল। তাই তিনি তাদেরকে চিনলেও তারা তাঁকে চিনতে পারেনি।

আহলি কিতাবদের মতে, ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সিজদা করে। এ সময় ইউসুফ (আ) তাদেরকে চিনে ফেলেন। তবে তিনি চাচ্ছিলেন, তারা যেন তাঁকে চিনতে না পারে। সুতরাং তিনি তাদের প্রতি কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন এবং বলেন, তোমরা গোয়েন্দা বাহিনীর লোক— আমার দেশের গোপন তথ্য নেয়ার জন্যে তোমরা এখানে এসেছ! তারা বলল, আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাই! আমরা তো ক্ষুধা ও অভাবের তাড়নায় পরিবারবর্গের জন্যে খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছি। আমরা একই পিতার সন্তান। বাড়ি কিনআন। আমরা মোট বার ভাই। একজন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, সর্ব কনিষ্ঠজন পিতার কাছেই আছে। এ কথা শুনে ইউসুফ (আ) বললেন, আমি তোমাদের বিষয়টি অবশ্যই তদন্ত করে দেখব। আহলি কিতাবরা আরও বলে যে, ইউসুফ (আ) ভাইদেরকে তিনদিন পর্যন্ত বন্দী করে রাখেন। তিনদিন পর তাদেরকে মুক্তি দেন, তবে শামউন নামক এক ভাইকে আটক করে রাখেন। যাতে তারা অপর ভাইটিকে পরবর্তীতে নিয়ে আসে। আহলি কিতাবদের এ বর্ণনার কোন কোন দিক আপত্তিকর। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ (ইউসুফ যখন তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিলেন) অর্থাৎ তিনি কাউকে এক উট বোঝাইর বেশি খাদ্য রসদ প্রদান করতেন না। সে নিয়ম অনুযায়ী তাদের প্রত্যেককে এক উট বোঝাই রসদ প্রদান করলেন। قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ (তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইটিকে আমার কাছে নিয়ে এসো) ইউসুফ (আ) তাদেরকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তারা বলেছিল, আমরা বার ভাই ছিলাম। আমাদের মধ্যকার একজন চলে গেছে। তার সহোদরটি পিতার কাছে রয়েছে।

ইউসুফ (আ) বললেন, আগামী বছর যখন তোমরা আসবে তখন তাকে সাথে নিয়ে এসো। أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ (তোমরা কি দেখছ না, আমি মাপে পূর্ণ মাত্রায় দেই এবং মেহমানদেরকে সমাদর করি?) অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে উত্তমভাবে মেহমানদারী করেছি, তোমাদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করেছি। এ কথা দ্বারা তিনি অপর ভাইকে আনার জন্যে তাদেরকে উৎসাহিত করেন। যদি তারা তাকে না আনে তবে তাদেরকে তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ.-

যদি তাকে আমার কাছে নিয়ে না আস, তাহলে আমার কাছে তোমাদের কোন বরাদ্দ থাকবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না।

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে রসদও দেব না। আমার কাছে ঘেঁষতেও দেব না। তাদেরকে প্রথমে যেভাবে বলেছিলেন এটা তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাকে হাযির করার জন্যে তিনি এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। قَالُوْا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ (তারা বলল ঃ আমরা তার সম্পর্কে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব।) অর্থাৎ আমাদের সাথে তাকে আনার জন্যে এবং আপনার কাছে হাযির করার জন্যে সম্ভাব্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাব وَاِنَّا لَفَاعِلُوْنَ (এবং আমরা তা অবশ্যই করব) অর্থাৎ তাকে আনতে আমরা অবশ্যই সক্ষম হব। তারপর হযরত ইউসুফ (আ) তাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য এমনভাবে তাদের মালামালের মধ্যে রেখে দেয়ার জন্যে ভৃত্যদেরকে নির্দেশ দেন যাতে তারা তা টের না পায়।

لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا اِذَا انْقَلَبُوْا اِلَى اَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ .

যাতে স্বজনদের কাছে প্রত্যাবর্তনের পর তারা বুঝতে পারে যে তা প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। তাহলে তারা পুনরায় আসতে পারে। মূল্য ফেরত দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউ বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আ)-এর ইচ্ছা ছিল, যখন তারা দেশে গিয়ে তা লক্ষ্য করবে তখন তা ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। অন্য কেউ বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আ) আশংকা করছিলেন যে, দ্বিতীয়বার আসার মত অর্থ হয়তো থাকবে না। কারও মতে, ভাইদের নিকট থেকে খাদ্য দ্রব্যের বিনিময় গ্রহণ করা তাঁর কাছে নিন্দনীয় বলে মনে হচ্ছিল।

তাদের পণ্যমূল্য কি জিনিস ছিল সে ব্যাপারে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। পড়ে সে সম্পর্কে আলোচনা আসছে। আহলি কিতাবদের মতে তা ছিল রৌপ্য ভর্তি থলে। এ মতই যথার্থ মনে হয়।

فَلَمَّا رَجَعُوْا اِلَى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يَاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَا اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ . قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَا اَمِنْتُكُمْ عَلَى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ . فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ . وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ . قَالُوْا يَاَبَانَا مَا نَبْغِىْ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ اِلَيْنَا . وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ . ذٰلِكَ كَيْلٌ يَّسِيْرٌ . قَالَ لَنْ اُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَاْتُنَّنِىْ بِهٖ اِلَّا اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ . فَلَمَّا اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ . وَقَالَ يٰبَنِىَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ . وَمَا اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ . اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ . عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ . وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ . وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ . مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰهَا . وَاِنَّهُ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ .

'তারপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে আসল তখন তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্যে বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে; সুতরাং আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন; যাতে আমরা রসদ পেতে পারি। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।' সে বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে তার সম্বন্ধে সেরূপ বিশ্বাস করব, যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম তার ভাই সম্বন্ধে? আল্লাহ্ই রক্ষণাবেক্ষণে শ্রেষ্ঠ এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' যখন ওরা ওদের মালপত্র খুলল তখন ওরা দেখতে পেল ওদের পণ্যমূল্য ওদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে।

ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি প্রত্যাশা করতে পারি? এতো আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে; পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্য-সামগ্রী এনে দেব এবং আমরা আমাদের ভ্রাতার রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উট বোঝাই পণ্য আনব; যা এনেছি তা পরিমাণে অল্প। পিতা বলল, 'আমি ওকে কখনই তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা ওকে আমার কাছে নিয়ে আসবেই, অবশ্য যদি তোমরা একান্ত অসহায় হয়ে না পড়।' তারপর যখন ওরা তার কাছে প্রতিজ্ঞা করল, তখন সে বলল, 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি, আল্লাহ্ তার বিধায়ক।'

সে বলল, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না। ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। বিধান আল্লাহরই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক এবং যখন তারা তাদের পিতা তাদেরকে যেভাবে আদেশ করেছিল সে-ভাবেই প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের কোন কাজে আসল না; ইয়াকূব কেবল তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল। কারণ আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটি অবগত নয়। (১২ ঃ ৬৩-৬৮)।

মিসর থেকে তাদের পিতার কাছে ফিরে আসার পরের ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা এখানে বর্ণনা করছেন ঃ পিতাকে তারা বলে ঃ مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ (আমাদের জন্যে বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।) অর্থাৎ এ বছরের পরে আপনি যদি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে না পাঠান তবে আমাদের বরাদ্দ দেওয়া হবে না। আর যদি আমাদের সাথে পাঠান তাহলে বরাদ্দ বন্ধ করা হবে না।

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَاأَبَانَا مَا نَبْغِي.

(যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল তাদের পণ্যমূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল, পিতা! আমরা আর কি চাইতে পারি?) অর্থাৎ আমাদের পণ্যমূল্যটাও ফেরত দেওয়া হয়েছে। এরপর আমরা আর কি আশা করতে পারি? وَنَمِيرُ أَهْلَنَا (পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে খাদ্য-সামগ্রী এনে দেবো যাতে তাদের বছরের ও বাড়ি

ঘরের সংস্থান হতে পারে।) وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ (আমরা আমাদের ভাইকে রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং অতিরিক্ত আনতে পারব) তার কারণে كَيْلَ بَعِيرٍ (আর এক উট বোঝাই পণ্য।)

আল্লাহ্ বলেন ঃ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (যা এনেছি তা পরিমাণে অল্প) অর্থাৎ অন্য সন্তানটি গেলে যা পাওয়া যেতো তার তুলনায় যা আনা হয়েছে তা অল্প। হযরত ইয়াকূব (আ) আপন পুত্র বিনয়ামীনের ব্যাপারে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ছিলেন। কারণ তার মাঝে তিনি তার ভাই ইউসুফ (আ)-এর ঘ্রাণ পেতেন, সান্ত্বনা লাভ করতেন এবং তিনি থাকায় ইউসুফকে কিছুটা ভুলে থাকতেন। তাই তিনি বললেন ঃ

لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ.

(পিতা বলল ঃ আমি তাকে কখনই তোমাদের সাথে পাঠাব না। যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেই। অবশ্য যদি তোমরা বিপদে পরিবেষ্টিত হয়ে একান্ত অসহায় হয়ে না পড়।) অর্থাৎ তোমরা সকলেই যদি তাকে আনতে অক্ষম হয়ে পড়, তবে ভিন্ন কথা।

فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ.

(অতঃপর যখন তারা তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করল তখন তিনি বললেন ঃ আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্ তার বিধায়ক)। পিতা ইয়াকূব (আ) পুত্রদের থেকে অঙ্গীকারনামা পাকাপোক্ত করে নেন। তাদের থেকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আদায় করেন এবং পুত্রের ব্যাপারে সম্ভাব্য সাবধানতা অবলম্বন করেন। কিন্তু কোন সতর্কতাই তাদেরকে ঠেকাতে পারল না (ولن يغنى حذر ان قدر)। হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর নিজের ও তাঁর পরিবার-পরিজনের খাদ্য-সামগ্রীর প্রয়োজন না হলে কখনও তাঁর প্রিয় পুত্রকে পাঠাতেন না। কিন্তু তক্দীরেরও কিছু বিধান রয়েছে। আল্লাহ্ যা চান তাই নির্ধারণ করেন, যা ইচ্ছা তাই গ্রহণ করেন। যে রকম ইচ্ছা সে রকম আদেশ দেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, সুবিজ্ঞ। অতঃপর পিতা আপন পুত্রদেরকে শহরে প্রবেশের সময় এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন বরং বিভিন্ন প্রবেশদ্বার দিয়ে যেতে বলেন। এর কারণ হিসেবে ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ ইব্ন কা'ব, কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন, যাতে তাদের উপর কারও কুদৃষ্টি না পড়ে, সে জন্যে তিনি এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেননা তাদের অবয়ব ও চেহারা ছিল অত্যধিক আকর্ষণীয় ও সুশ্রী। ইব্রাহীম নাখ্ঈ (র) বলেছেন, এরূপ নির্দেশ দেওয়ার কারণ হল, তিনি তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দিতে চেয়েছিলেন এ উদ্দেশ্যে যে, হয়ত তারা কোথাও ইউসুফ (আ)-এর সংবাদ পেয়ে যেতে পারে কিংবা এভাবে তারা বেশি সংখ্যক লোকের কাছে ইউসুফ (আ)-এর সন্ধান জিজ্ঞেস করতে পারে। কিন্তু প্রথম মতই প্রসিদ্ধ। এ কারণেই তিনি বললেন, وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারি না।)

আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ . مَا كَانَ يُغْنِىْ عَنْهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا حَاجَةً فِىْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضَاهَا . وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ .

যখন তারা তাদের পিতা যেভাবে আদেশ দিয়েছিলেন সেভাবেই প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্‌র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের কোনই কাজে আসল না। ইয়াকূব কেবল তার মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিল এবং সে অবশ্যই জ্ঞানী ছিল। কারণ, আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়ে অবগত নয়। (সূরা ইউসুফ ঃ ৬৮)

আহলি কিতাবদের মতে, হযরত ইয়াকূব (আ) পুত্রদের কাছে আযীযের উদ্দেশে হাদিয়াস্বরূপ পেস্তা, বাদাম, আখরোট, তারপিন তেল, মধু ইত্যাদি প্রেরণ করেন। এছাড়া প্রথম বারের ফেরত পাওয়া দিরহাম ও আরও অর্থ সংগ্রহ করে তারা মিসরের উদ্দেশে যাত্রা করে।

وَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ اِنِّىْ اَنَا اَخُوْكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِىْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ . قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُوْنَ. قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ. قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ. قَالُوْا فَمَا جَزَاؤُهٗ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ. قَالُوْا جَزَاؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَاؤُهٗ. كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ . فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ. كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ . مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّا اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ. نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ. وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ. قَالُوْا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ. فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا . وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ. قَالُوْا يٰاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهٗ. اِنَّا نَرٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ. قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗ اِنَّا اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ .

ওরা যখন ইউসুফের সম্মুখে উপস্থিত হল, তখন ইউসুফ তার সহোদরকে নিজের কাছে রাখল এবং বলল, 'আমিই তোমার সহোদর, সুতরাং তারা যা করত তার জন্যে দুঃখ করো না।'

তারপর সে যখন ওদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিল, তখন সে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র রেখে দিল। তারপর এক আহ্বায়ক চিৎকার করে বলল, 'হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয়ই চোর।' তারা ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা কী হারিয়েছ?' তারা বলল, 'আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি; যে ওটা এনে দেবে সে এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি এর জামিন।' তারা বলল, 'আল্লাহ্র শপথ! তোমরা তো জান, আমরা এ দেশে দুষ্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।' তারা বলল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও তবে তার শাস্তি কী?' তারা বলল, 'এর শাস্তি যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে-ই তার বিনিময়।' এভাবে আমরা সীমালংঘনকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

তারপর সে তার সহোদরের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে তাদের মালপত্র তল্লাশি করতে লাগল, পরে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বের করল। এভাবে আমি ইউসুফের জন্যে কৌশল করেছিলাম। রাজার আইনে তার সহোদরকে সে আটক করতে পারত না, আল্লাহ্ ইচ্ছা না করলে। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে সর্বজ্ঞানী। তারা বলল, 'সে যদি চুরি করে থাকে তার সহোদরও তো পূর্বে চুরি করেছিল।' কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখল এবং তাদের কাছে প্রকাশ করল না; সে মনে মনে বলল, 'তোমাদের অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যা বলছ সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।' ওরা বলল, 'হে আযীয! এর পিতা আছেন— অতিশয় বৃদ্ধ; সুতরাং এর স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। আমরা তো আপনাকে দেখছি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন। সে বলল, যার কাছে আমরা আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহ্র শরণ নিচ্ছি। এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব।' (১২ : ৬৯-৭৯)

এখানে আল্লাহ্ উল্লেখ করছেন সে সব অবস্থার কথা যখন ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা তাঁর সহোদর বিনয়ামীনকে নিয়ে মিসরে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল। ইউসুফ (আ) তাঁকে একান্তে কাছে নিয়ে জানান যে, তিনি তাঁর আপন সহোদর ভাই। তাঁকে তিনি এ কথা গোপন রাখতে বলেন এবং ভাইদের দুর্ব্যবহারের ব্যাপারে সান্ত্বনা দেন এবং অন্য ভাইদের বাদ দিয়ে কেবল বিনয়ামীনকে কাছে রাখার জন্যে ইউসুফ (আ) বাহানা অবলম্বন করেন। সুতরাং তিনি নিজের পানপাত্র বিনয়ামীনের মালপত্রের মধ্যে গোপনে রেখে দেয়ার জন্যে ভৃত্যদেরকে আদেশ দেন। উক্ত পানপাত্রটি পানি পান এবং লোকজনকে তাদের খাদ্যদ্রব্য মেপে দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হত। এরপর তাদের মধ্যে ঘোষণা দেয়া হয় যে, তারা বাদশাহর পানপাত্র চুরি করেছে, যে ব্যক্তি তা ফিরিয়ে দেবে তার জন্যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘোষণাকারী তার জন্যে যিম্মাদার হল। কিন্তু তারা ঘোষণাকারীর দিকে তাকিয়ে এ কথা বলে তাদের প্রতি আরোপিত দোষ প্রত্যাখ্যান করল যে,

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِيْنَ.

(আল্লাহর কসম, তোমরা তো জানো, আমরা এদেশে দুষ্কৃতি করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।) অর্থাৎ আপনারা যে আমাদেরকে চুরির দোষে অভিযুক্ত করেছেন, আমরা যে সেরূপ নই তা আপনারা খুব ভাল করেই জানেন।

قَالُوْا فَمَا جَزَاءُهٗ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِيْنَ - قَالُوْا جَزَاءُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَاءُهٗ كَذَالِكَ نَجْزِى الظَّالِمِيْنَ.

'তারা বলল, তোমরা যদি মিথ্যাবাদী হও তা হলে এর কি শাস্তি হবে? তারা বলল, 'এর শাস্তি— যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে সে-ই তার বিনিময়। আমরা এভাবেই সীমালংঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।

এটা ছিল তাদের শরীয়তের বিধান যে, যার মাল চুরি করবে, তার কাছেই চোরকে অর্পণ করা হবে। كَذَٰلِكَ نَجْزِى الظَّالِمِيْنَ (এভাবেই আমরা সীমালংঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।) আল্লাহ বলেন :

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاءِ أَخِيْهِ.

(অতঃপর সে তার সহোদরের মালপত্র তল্লাশির পূর্বে ওদের মালপত্র তল্লাশি করতে লাগল। পরে তার সহোদরের মালপত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বের করল) এরূপ করার কারণ হল, অপবাদ থেকে বাঁচা এবং সন্দেহমুক্ত কৌশল অবলম্বন করা। আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ.

(এ ভাবে আমি ইউসুফের জন্যে কৌশল করিয়ে দিয়েছিলাম। অন্যথায় বাদশাহর আইনে তার সহোদরকে সে আটক করতে পারত না।) অর্থাৎ তারা যদি নিজেরা এ কথা স্বীকার না করত যে, যার মালপত্রের মধ্যে পাওয়া যাবে, সে-ই তার বিনিময় হবে; তবে মিসরের বাদশাহর প্রচলিত আইনে তাকে ইউসুফ (আ) আটকে রাখতে পারতেন না।

إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ، نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَّشَاءُ.

(তবে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাহলে ভিন্ন কথা। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি) অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে। وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيْمٌ (প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপরে রয়েছেন সর্বজ্ঞানী।) কেননা ইউসুফ (আ) ছিলেন তাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী। মতামত দান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দৃঢ়তা ও বিচক্ষণতায় তিনি ছিলেন অধিক পারঙ্গম। আর এ ব্যাপারে তিনি যা কিছু করেছেন তা আল্লাহর নির্দেশক্রমেই করেছেন। কারণ, এর উপর ভিত্তি করেই সৃষ্ট পরিবেশে পরবর্তীতে তার পিতা ও পরিবারবর্গ এবং প্রতিনিধি দলের সেদেশে আগমনের সুযোগ হয়। যা হোক, ভাইয়েরা যখন বিনয়ামীনের মালপত্রের মধ্য থেকে পানপাত্র বের করা প্রত্যক্ষ করল তখন তারা বলল : إِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ (সে যদি চুরি করে থাকে তবে তার সহোদরও তো ইতিপূর্বে চুরি করেছিল।) সহোদয় বলতে তারা ইউসুফ (আ)-কেই বুঝাচ্ছিল। কথিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আ) একবার তাঁর নানার একটি মূর্তি চুরি করে এনে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন, ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অধিক স্নেহ-ভালবাসার টানে তার ফুফু তার ছোটবেলায় নিজের কাছে রেখে লালন-পালন করার জন্যে কৌশল হিসেবে ইসহাকের একটি কোমরবন্দ গোপনে ইউসুফ (আ)-এর কাপড়ের মধ্যে বেঁধে রাখেন। ইউসুফ (আ) তা টের পাননি। পরে কোমরবন্দটির সন্ধান করা হলে ইউসুফের কাপড়ের মধ্যে তা পাওয়া যায়। তাদের কথায় এ দিকেই ইংগিত ছিল। কেউ কেউ বলেছেন ঃ ইউসুফ ঘর থেকে খাদ্য নিয়ে গোপনে ভিক্ষুকদেরকে আহার করাতেন। এছাড়া এ প্রসঙ্গে আরও বিভিন্ন ঘটনা বিভিন্নজনে বলেছেন। এজন্যেই ঃ

قَالُوْا إِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهِ.

(তারা বলল, সে যদি চুরি করে থাকে, তবে ইতিপূর্বে তার সহোদরও তো চুরি করেছিল কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার ইউসুফ নিজের মনের মধ্যে গোপন করে রাখল।) সেই গোপন কথাটি এই : أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ (তোমাদের অবস্থা তো হীনতর এবং আল্লাহ ঐ বিষয়ে খুবই অবহিত যা তোমরা ব্যক্ত করছ।) ইউসুফ (আ) এ কথা মনে মনে বললেন, প্রকাশ করলেন না। তিনি সহনশীলতার সাথে তাদেরকে ক্ষমা ও উপেক্ষা করেন এবং সেই সুযোগে তারা দয়া ও করুণা লাভের উদ্দেশ্যে বলল ঃ

يَا أَيُّهَا الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا. فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ - قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُوْنَ.

তারা বলল, হে আযীয! এর পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ। সুতরাং এর স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন। আমরা আপনাকে একজন মহানুভব ব্যক্তি হিসেবে দেখছি। সে বলল : যার কাছে আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। এরূপ করলে আমরা অবশ্যই জালিমে পরিণত হব। (১২ ঃ ৭৮-৭৯)

অর্থাৎ আমরা যদি অপরাধীকে ছেড়ে দেই এবং নিরপরাধকে আটক রাখি তাহলে সেটা হবে সীমালংঘন। এটা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বরং মাল যার কাছে পাওয়া গেছে তাকেই আমরা আটকে রাখব। আহলি কিতাবদের মতে, এই সময়ই ইউসুফ (আ) তাদের কাছে নিজের পরিচয় ব্যক্ত করেন। কিন্তু এটা তাদের মারাত্মক ভুল, প্রকৃত ব্যাপার তারা মোটেই বুঝেনি। আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا. قَالَ كَبِيْرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوْا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِيْ يُوْسُفَ. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتّٰى يَأْذَنَ لِيْ أَبِيْ أَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ. وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ. إِرْجِعُوْا إِلٰى أَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ. وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِيْنَ. وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْ أَقْبَلْنَا فِيْهَا وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ. عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَّأْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا. إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ. وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ. قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا أَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ. قَالَ

إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. يَابَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْئَسُوا مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ. إِنَّهُ لَا يَايْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ.

তারপর যখন তারা তার নিকট হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হল, তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। ওদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল, সে বলল, তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করেছিলে। সুতরাং আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্যে কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই বিচারকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 'তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বলবে, হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অবহিত ছিলাম না। যে জনপদে আমরা ছিলাম তার অধিবাসীদের জিজ্ঞাসা করুন এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও। আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।

ইয়াকূব বলল, না, তোমাদের মন তোমাদের জন্যে একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ তাদেরকে এক সঙ্গে আমার কাছে এনে দিবেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' সে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, 'আফসোস ইউসুফ এর জন্যে।' শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট। তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ! আপনি তো ইউসুফ এর কথা ভুলবেন না যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হবেন, অথবা মৃত্যুবরণ করবেন।' সে বলল, 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা, আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর কাছে নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর কাছ থেকে জানি যা তোমরা জান না। 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর আশিস থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। কারণ আল্লাহর আশিস হতে কেউই নিরাশ হয় না, কাফিরগণ ব্যতীত। (১২ ঃ ৮০-৮৭)

আল্লাহ ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, যখন তারা বিনয়ামীনকে ইউসুফ (আ)-এর হাত থেকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পারস্পরিক পরামর্শের জন্যে একটু দূরে সরে গিয়ে মিলিত হল। তখন তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ রূবীল বলল ঃ

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ.

(তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করেছিলে) অর্থাৎ অবশ্য কিন্তু তোমরা সে অঙ্গীকার রক্ষা কর নাই। বরং তাতে ত্রুটি করেছ। যেমন তোমরা ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারেও ত্রুটি করেছিলে। এখন আমার

সামনে এমন কোন উপায় নেই যা নিয়ে পিতার সামনে দাঁড়াব। فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ (সুতরাং আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করব না) অর্থাৎ আমি এ দেশেই স্থায়িভাবে থেকে যাব حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي (যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন।) অর্থাৎ তার কাছে যাওয়ার। أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي (অথবা আল্লাহ আমার জন্যে কোন ব্যবস্থা করেন।) যেমন পিতার কাছে ভাইকে ফিরিয়ে নেয়ার কোন উপায় যদি বের করে দেন। وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (তিনিই শ্রেষ্ঠ ফয়সালাদানকারী)। ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ (তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল, হে পিতা! আপনার পুত্র চুরি করেছে।) অর্থাৎ তোমরা যা প্রত্যক্ষ করেছ তাই পিতার কাছে গিয়ে বল। وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অবহিত ছিলাম না।) وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا (যে জনপদে আমরা ছিলাম, তার অধিবাসীদের আপনি জিজ্ঞেস করুন এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকেও) অর্থাৎ আমরা আপনাকে এই সংবাদ দিলাম যে, আমাদের ভাই চুরি করে ধরা পড়েছে এটা মিসরে সর্বত্র রটে গেছে এবং যে কাফেলার সাথে আমরা এসেছি তাদের এ ঘটনাটি জানা আছে। কেননা, তখন তারা সেখানে আমাদের সাথেই ছিল। وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।) قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ (ইয়াকূব বলল, না তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়।) অর্থাৎ তোমরা যা বলছ আসল ঘটনা তা নয়। সে চুরি করেনি। কেননা, তার স্বভাব-চরিত্র এ রকম নয়। বরং এটা তোমাদেরই একটা সাজান গল্প। অতএব, ধৈর্য অবলম্বনই শ্রেয়।

ইবন ইসহাক (র) প্রমুখ বলেছেন, ইউসুফ (আ)-এর ব্যাপারে সীমালংঘনের পরে তার ভাইয়েরা যখন বিনয়ামীনের সাথেও অসদ-ব্যবহার করতে শুরু করে তখন পিতা ইয়াকূব (আ) উপরোক্ত কথা বলেন। প্রাচীনকালের কোন কোন পণ্ডিতের উক্তি جزاء السيئة بعدها 'মন্দের পরবর্তী প্রতিফল মন্দই হয়ে থাকে।' অতঃপর হযরত ইয়াকূব (আ) বলেন : عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا (হয়তো আল্লাহ তাদেরকে এক সঙ্গে আমার কাছে এনে দেবেন।) অর্থাৎ ইউসুফ, বিনয়ামীন ও রূবীলকে। إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ (নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ।) অর্থাৎ প্রিয়জনদের বিরহে আমি যে অবস্থায় পতিত হয়েছি তা তিনি সম্যক অবগত الْحَكِيمُ। (প্রজ্ঞাময়) অর্থাৎ তিনি যা ফয়সালা ও বাস্তবায়ন করবেন তা অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে করবেন। চূড়ান্ত কৌশল ও অলংঘনীয় দলীলের অধিকারী একমাত্র তিনিই। وَتَوَلَّى عَنْهُمْ (এবং সে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।) অর্থাৎ ইয়াকূব (আ) পুত্রদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন : وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ (হায়! আফসোস ইউসুফের জন্যে।) পূর্বের দুঃখের সাথে নতুন দুঃখের উল্লেখ করছেন এবং যে ব্যথাটি সুপ্ত ছিল তা পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। জনৈক কবি বলেছেন ঃ

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى - ما الحب الا للحبيب الاول

'তুমি কামনার বশে তোমার হৃদয়কে যেথায় ইচ্ছা ফিরাতে পারো। কিন্তু প্রেমের বেলায় প্রথম প্রেমিকই আসল।'

অন্য এক কবি বলেছেন ঃ

لقد لامنى عند القبور علي البكا - رفيقى لتذراف الدموع السوافك

فقال اتبكى كل قبر رأيته - لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك

فقلت له ان الاسى يبعث الاسى - فدعنى فهذا كله قبر مالك

গোরস্তানের কবরসমূহের কাছে গিয়ে আমার ক্রন্দন ও অশ্রুপাত দেখে আমার বন্ধু আমাকে তিরস্কার করল। সে বলল ঃ লিওয়া (বালির ঢিবি) ও দাকাদিকের (শক্তভূমির) মধ্যবর্তী যত কবর আছে তার মধ্যে যে কবরই নজরে পড়বে, সে কবরের পাশেই কি তুমি এভাবে কাঁদতে থাকবে? আমি তাকে বললাম, দুঃখই দুঃখীজনকে পরিচালিত করে। আমাকে আমার কাজের উপর ছেড়ে দাও। এখানে যত কবর আছে সবই আমার প্রেমাস্পদ মালিকের কবর।

আল্লাহর বাণী : وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ (শোকে তার চোখ দু'টি সাদা হয়ে যায়) অর্থাৎ অতিরিক্ত কান্নাকাটির ফলে। فَهُوَ كَظِيْمٌ (এবং সে ছিল অসহনীয় মনস্তাপে কাতর।) অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর জন্য অতিশয় শোক, তাপ ও অধীর আগ্রহে তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন। পুত্রগণ যখন পিতাকে সন্তান হারাবার শোকে কাতর অবস্থায় দেখল তখন قَالُوْا (তারা বলল) অর্থাৎ পিতার প্রতি করুণাবশে ও মমতাবোধে বলল ঃ

تَا اللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْتَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ.

'আপনি তো ইউসুফকে ভুলবেন না, যতক্ষণ না মুমূর্ষু হবেন কিংবা মৃত্যুবরণ করবেন।) অর্থাৎ তারা বলছে, আপনি সর্বক্ষণ ইউসুফ (আ)-কে স্মরণ করছেন ও শোক প্রকাশ করছেন। ফলে দিন দিন আপনার শরীর শিথিল হয়ে যাচ্ছে ও শক্তি ক্ষয়ে যাচ্ছে। এর চাইতে বরং নিজের প্রতি কিছুটা লক্ষ্য রাখলেই আপনার জন্য ভাল হতো।

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْ بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ . وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

ইয়া'কূব বলল, 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর নিকট থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না।' অর্থাৎ পিতা তার পুত্রদেরকে বলছেন ঃ আমি যে দুঃখ-যাতনার মধ্যে আছি তার অনুযোগ না তোমাদের কাছে করছি, না অন্য কারও কাছে বরং আমার অনুযোগ আল্লাহর কাছেই ব্যক্ত করছি আর আমি জানি যে, আল্লাহ্ আমাকে এ অবস্থা থেকে মুক্তি দেবেন ও উদ্ধার করবেন। আমি আরও জানি যে, ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবে পরিণত হবে এবং স্বপ্ন অনুযায়ী আমি ও তোমরা তার উদ্দেশে সিজদাবনত হবো। তাই তিনি বলেন : وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (আমি আল্লাহর কাছ থেকে জানি যা তোমরা জান না।) তারপর তিনি পুত্রগণকে ইউসুফ (আ) ও তার ভাইকে সন্ধান করার জন্যেও জনসমাজে তাঁদের ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যে উৎসাহিত করেন ঃ

يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ. إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ.

হে পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা আল্লাহর রহমত থেকে কাফির ব্যতীত কেউ নিরাশ হয় না।

অর্থাৎ কঠিন অবস্থার পর মুক্তি পাওয়ার আশা থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা, বিপদ ও সংকটের পর তা থেকে আল্লাহর রহমতে উদ্ধার পাওয়ার ব্যাপারে কেবলমাত্র কাফিররাই নিরাশ হতে পারে।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَاأَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ . قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ. . قَالُوا ءَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ. قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ. يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ.

যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল তখন বলল, 'হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা তুচ্ছ পণ্য নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের রসদ পূর্ণমাত্রায় দিন এবং আমাদেরকে দান করুন; আল্লাহ্ দাতাগণকে পুরস্কৃত করে থাকেন। সে বলল, তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে? যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ? ওরা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলল, আমিই ইউসুফ এবং এ আমার সহোদর: আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে ব্যক্তি মুত্তাকী এবং ধৈর্যশীল, আল্লাহ্ সেরূপ সৎকর্ম পরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।' ওরা বলল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম। সে বলল, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রাখবে। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস।' (১২ ঃ ৮৮-৯৩)

এখানে আল্লাহ্ ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের পুনরায় ইউসুফ (আ)-এর কাছে গমন এবং খাদ্যের বরাদ্দ ও অনুদান পাওয়ার আবেদন ও সেই সাথে বিনয়ামীনকে তাদের কাছে প্রত্যর্পণর অনুরোধ সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يَا اَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ.

(যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল তখন বলল, হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি।) বিপন্ন হওয়ার কারণ দুর্ভিক্ষ, দুরবস্থা ও সন্তানাদির সংখ্যাধিক্য। وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ (এবং আমরা সামান্য কিছু পণ্য নিয়ে এসেছি।) অর্থাৎ অতি নগণ্য পণ্যমূল্য—যা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি ছাড়া আমাদের থেকে গ্রহণ করার মত নয়। নগণ্যের ব্যাখ্যায় কেউ বলেছেন, রদ্দী মুদ্রা; কেউ বলেছেন, কম পরিমাণ মুদ্রা আবার কেউ বলেছেন, বাদাম, কফি বীজ ইত্যাদি। ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তা ছিল কয়েকটি খড়ের বস্তা ও রশি এবং এ রকম আরও কিছু।

فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ.

(আপনি আমাদের বরাদ্দ পূর্ণমাত্রায় দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ দাতাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন।)

সুদ্দী বলেছেন, এখানে দান বলতে তাদের নগণ্য পণ্যমূল্য গ্রহণ করা বুঝানো হয়েছে। ইবন জুরায়জ বলেন, এখানে দান করুন বলতে বুঝানো হয়েছে, আমাদের ভাইকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিন। সুফয়ান ইবন উওয়ায়না বলেন, আমাদের নবীর জন্যে সাদকা গ্রহণ যে হারাম করা হয়েছে, তার দলীল নেয়া হয়েছে এই আয়াত থেকে। ইবন জারীর (রা) এটি বর্ণনা করেছেন। শেষে হযরত ইউসুফ (আ) যখন দেখলেন, তাদের অবস্থা এই; যা কিছু তারা নিয়ে এসেছে তা ছাড়া আর কিছুই তাদের কাছে নেই, তখন তিনি নিজের পরিচয় দিলেন, তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন এবং তাদের ও নিজের প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। এ সময় হযরত ইউসুফ (আ)-এর কপালের একদিকে যে তিল ছিল তা আনাবৃত করে দেখালেন, যাতে তারা তাঁকে শনাক্ত করতে পারে। তিনি বললেন :

هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُوْنَ. قَالُوْا.

(তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলে? যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ। তারা বলল;) এ কথা শুনে তারা অতি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল এবং বারবার ইউসুফের প্রতি তাকাতে থাকে। কিন্তু তারা বুঝে উঠতে পারছিল না যে, এ ব্যক্তিই সে। ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَا اَخِىْ (তবে কি তুমিই ইউসুফ? সে বলল, আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর ভাই।) অর্থাৎ আমি সেই ইউসুফ যার সাথে তোমরা ঐ আচরণ করেছিলে এবং পূর্বে যার প্রতি অত্যাচার করেছিলে। هٰذَا اَخِىْ (এই আমার ভাই) কথাটি পূর্বের কথাকে জোরালো করার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে এবং এদের দুই ভাইয়ের প্রতি তাদের মনে যে হিংসা লুক্কায়িত ছিল আর যেসব ষড়যন্ত্র অপকৌশল তাদের বিরুদ্ধে পাকিয়েছিল সে দিকে এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই তিনি বলেছেন : قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا। (আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।) অর্থাৎ আমাদের প্রতি আল্লাহর কৃপা, দান, অনুকম্পা বর্ষিত হয়েছে। আমাদেরকে তিনি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর এটা আমাদেরকে দিয়েছেন তার প্রতি আমাদের আনুগত্য, তোমাদের নিপীড়নে ধৈর্যধারণ, পিতার সাথে সদাচরণ ও আমাদের প্রতি পিতার মহব্বত ও স্নেহের বদৌলতে।

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا.

(যে ব্যক্তি মুত্তাকী ও ধৈর্যশীল। আল্লাহ্ সেরূপ সৎকর্ম পরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। তারা বলল, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।)

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে মর্যাদা দান করেছেন, অনুগ্রহ করেছেন যা আমাদের প্রতি করেন নি। وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ (আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম।) অর্থাৎ পূর্বে তোমার সাথে যা করেছি তাতে আমরাই ছিলাম অপরাধী। আর এখন তো তোমার সম্মুখেই আমরা আসামীর কাঠগড়ায় হাযির। قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (সে বলল, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।) অর্থাৎ তোমরা যা কিছু করেছ তার কোন প্রতিশোধ আমি নেব না। এরপর আরও বাড়িয়ে বললেন : يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু)। কারও কারও মতে لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ এর উপর ওয়াকফ (অর্থাৎ তোমাদের উপর কোন অভিযোগ নেই) এবং الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ আলাদা বাক্য (অর্থাৎ আল্লাহ আজ তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন); কিন্তু এ মত দুর্বল। প্রথম মতই সঠিক।

তখন হযরত ইউসুফ (আ) নিজের গায়ের জামা তাদের কাছে দিয়ে বললেন, এটা অন্ধ পিতার চোখের ওপর রেখে দিও। এতে আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। এ ছিল প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, নবুওতের আলামত ও বিরাট এক মু'জিযা। শেষে তিনি ভাইদেরকে তাদের পরিবার-পরিজনসহ সসম্মানে মিসরে চলে আসার জন্যে বলে দেন ।

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ. قَالُوا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ. قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

তারপর যাত্রীদল যখন বের হয়ে পড়ল তখন তাদের পিতা বলল, 'তোমরা যদি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর তবে বলি, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন। তারপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হল এবং তার মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখল তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পেল। সে বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে জানি, যা তোমরা জান না? ওরা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আমরা তো অপরাধী।' সে বলল, 'আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১২ ঃ ৯৪-৯৮)

আবদুর রাজ্জাক (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ -এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, কাফেলা যখন মিসর থেকে যাত্রা করে তখন একটি প্রবল বায়ু-প্রবাহ ইউসুফ (আ)-এর জামার ঘ্রাণ ইয়াকূব (আ)-এর কাছে নিয়ে পৌঁছায়।

فَقَالَ إِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْ لَا اَنْ تُفَنِّدُوْنَ.

(সে বলল, আমি অবশ্যই ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি –যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না কর।')

ছাওরী, শু'বা (র) প্রমুখ বলেছেন, আট দিনের পথের দূরত্ব থেকেই তিনি এই ঘ্রাণ পান। হাসান বসরী (র) ও ইবন জুরায়জ মক্কী (র) বলেছেন, ইয়াকূব (আ) ও কাফেলার মধ্যকার দূরত্ব ছিল আশি ফারসাখের[১] এবং ইউসুফ (আ)-এর নিখোঁজকাল থেকে ঘ্রাণ পাওয়া পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান আশি বছর। لَوْ لَا اَنْ تُفَنِّدُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যদি বল যে, অতি বৃদ্ধ হওয়ার ফলে আমি প্রলাপোক্তি করছি। ইবন আব্বাস (রা), আতা, মুজাহিদ, সাঈদ ইবন জুবায়র ও কাতাদা (র) বলেছেন ঃ تفندون অর্থাৎ تسفهون তোমরা আমাকে নির্বোধ সাব্যস্ত করো। মুজাহিদ ও হাসান (র) বলেছেন ঃ تفندون অর্থ تهدمون তোমরা যদি আমাকে অতিশয় বৃদ্ধ সাব্যস্ত করো। قَالُوْا تَاللّٰهِ إِنَّكَ لَفِيْ ضَلَالِكَ الْقَدِيْمِ.

তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ! আপনি তো আপনার পুরনো বিভ্রান্তির মধ্যেই রয়েছেন।' কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন, তারা এ কথা দ্বারা একটি শক্ত কথাই বলেছে। আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ اَلْقَاهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا.

(তারপর যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হল এবং তার মুখমণ্ডলের উপর জামাটি রাখল তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন।) অর্থাৎ অতি স্বাভাবিকভাবেই কেবল মুখমণ্ডলের উপর ইউসুফ (আ)-এর জামাটি রাখার সাথেই দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। অথচ তিনি তখন ছিলেন অন্ধ। ঐ সময় তিনি তাঁদেরকে বললেনঃ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ إِنِّيْ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না।) অর্থাৎ আমি জানি যে, আল্লাহ ইউসুফকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন, আমার চক্ষু তার দ্বারা ভাল হয়ে যাবে এবং প্রশান্তি দান করবেন।

قَالُوْا يَا اَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِيْنَ.

(তারা বলল, হে পিতা! আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। কেননা অবশ্যই আমরা ছিলাম অপরাধী।) তারা অপরাধমূলক যেসব কাজ ইতিপূর্বে করেছে এবং পিতা ও তাঁর পুত্র ইউসুফ (আ)-এর কাছ থেকে তার মুকাবিলায় যে ব্যবহার পেয়েছে এবং ইউসুফ (আ)-কে তারা যা করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সেসব ব্যাপারে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে তারা পিতার কাছে আবেদন জানায়। তাদের নিয়ত যখন তওবা করা অথচ তখনো তা কার্যকর হয়নি তখন আল্লাহ তাদেরকে তওবা করার তাওফীক দান করেন এবং পিতা তাদের আবেদনে সাড়া দেন এবং বলেন ঃ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ. إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

১. ফারসাখ বলতে প্রায় আট কিলোমিটার বোঝায়।

ইবন মাসউদ (রা), ইবরাহীম আত্‌তায়মী, আমর ইবন কায়স, ইবন জুরায়জ (র) প্রমুখ বলেছেন—হযরত ইয়াকূব (আ) পুত্রদের পক্ষে ইসতিগফার করার জন্যে শেষ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। ইবন জারীর মুহারিব ইবন দীছার (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ হযরত উমর (রা) মসজিদে নববীতে এসে জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন ঃ

اللهم دعوتى فاجبت وامرتنى فاطعت وهذا السحر فاغفرلى.

'হে আল্লাহ্! 'আপনি আমাকে আহ্বান করেছেন, আমি সাড়া দিয়েছি; আপনি আমাকে হুকুম করেছেন, অমি তা মেনে নিয়েছি। এখন রাতের শেষ প্রহর; অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।' হযরত উমর (রা) গভীরভাবে উক্ত শব্দের প্রতি লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন যে, আওয়াজটি আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-এর ঘর থেকে আসছে। তিনি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। আবদুল্লাহ বলেন ঃ হযরত ইয়াকূব (আ) পুত্রদের পক্ষে প্রার্থনা করার জন্যে শেষ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেন— তিনি বলেছিলেন: سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ (আমি অচিরেই তোমাদের জন্যে আমার প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।) অপর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন : وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ (যারা শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনা করে।)

সহীহ হাদীসে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমাদের প্রতিপালক প্রতিরাতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন— কে আছে তওবাকারী? আমি তার তওবা কবূল করব। কোন প্রার্থী আছে কি? আমি তাকে দান করব। আছে কোন প্রার্থনাকারী? আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করব।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর পুত্রদের পক্ষে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে জুমআর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। ইবন জারীর (রা) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ এটি আমার ভাই ইয়াকূব (আ)-এর তার ছেলেদের উদ্দেশে বলেছিলেন। سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ দ্বারা অর্থ - حتى نأتى ليلة الجمعة যতক্ষণ না জুমআর রাত আসে। উক্ত সনদে এ হাদীসটি খুবই অপরিচিত। হাদীসটি মারফূ হওয়ার ব্যাপারেও বিতর্ক রয়েছে। বরং এটা ইবন আব্বাস (রা)-এর মওকূফ হাদীস বা নিজস্ব উক্তি হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ. وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا. وَقَالَ يٰاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَاىَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّىْ حَقًّا. وَقَدْ اَحْسَنَ بِىْ اِذْ اَخْرَجَنِىْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِخْوَتِىْ اِنَّ رَبِّىْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ. اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ. رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ. فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِىّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ. تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ.

তারপর তারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হল, তখন সে তার পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করল এবং বলল, আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন। এবং ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে বসাল এবং তারা সকলে তার সম্মানে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। সে বলল, 'হে আমার পিতা! এ হচ্ছে আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার প্রতিপালক একে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করবার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ। হে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্ম পরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর। (১২ ঃ ৯৯-১০১)

এখানে দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রিয়জনদের সাথে পুনঃমিলনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বিচ্ছেদের সময়সীমা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত আছে। কারও মতে, আশি বছর। কারও মতে, তিরাশি বছর। এ দু'টি মতের কথা হাসান (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে। কাতাদা (র)-এর মতে, পঁয়ত্রিশ বছর। কিন্তু মুহাম্মদ ইবন ইসহাকের মতে, বিচ্ছেদের কাল মাত্র আঠার বছর। আহলি কিতাবদের মতে, এই সময় ছিল চল্লিশ বছর। তবে ঘটনার উপর দৃষ্টিপাত করলে বিচ্ছেদকাল খুব বেশি বলে মনে হয় না। কেননা, মহিলাটি যখন ইউসুফকে ছলনা দিয়েছিল তখন অনেকের মতে তিনি মাত্র সতের বছরের যুবক। তিনি আত্মরক্ষা করলেন। ফলে কয়েক বছর জেলখানায় থাকেন। ইকরিমা প্রমুখের মতে, জেলখানায় থাকার সময়সীমা সাত বছর। এরপর প্রাচুর্যের সাত বছর অতিক্রান্ত হয়। তারপর মানুষ দুর্ভিক্ষের সাত বছরে পতিত হয়। এর প্রথম বছরে ইউসুফ (আ)-এর ভাইয়েরা খাদ্যের জন্য মিসরে আসে। দ্বিতীয় বছরে তারা বিনয়ামীনকে নিয়ে আসে। আর তৃতীয় বছরে ইউসুফ (আ) নিজের পরিচয় দেন এবং পরিবার-পরিজনকে নিয়ে আসতে বলেন। ফলে সে বছরেই ইউসুফ (আ)-এর গোটা পরিবার মিসরে তাঁর কাছে চলে আছে। এ হিসেবে মিলনকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১৭+৭+৭+৩=৩৪ বছর। فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ (তারপর যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল তখন সে তার পিতা-মাতাকে আলিঙ্গন করল।) অর্থাৎ ভাইদের থেকে আলাদা হয়ে ইউসুফ (আ) কেবল তাঁর পিতা-মাতার সাথে একান্তে মিলিত হন। وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ (এবং বলল ঃ আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।) কারো কারো মতে, এখানে বর্ণনা ঘটনানুক্রমিক নয়। ঘটনা ছিল, প্রথমে তিনি তাদেরকে মিসরে প্রবেশের জন্য স্বাগত সম্ভাষণ জানান, তারপর তাদেরকে আলিঙ্গন করেন। ইবন জারীর (রা) এ ব্যাখ্যাকে দুর্বল বলেছেন। তাঁর এ মন্তব্যকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ইমাম সুদ্দী (র) বলেছেন, যে, ইউসুফ (আ) নিজে অগ্রসর হয়ে পিতা-মাতার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পথে যেখানে তাঁরা অবতরণ করেছিলেন সেখানে তাঁদের তাঁবুতে গিয়ে তাদের আলিঙ্গন করেন। তারপর সেখান থেকে যাত্রা করে মিসরের প্রবেশ দ্বারের সন্নিকটে পৌঁছলে ইউসুফ (আ) বললেন ঃ اُدْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ (আল্লাহর ইচ্ছায় আপনারা নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।) তবে বলা যেতে পারে যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উক্তরূপ কথা সংযোজন না করেও পারা যায় এবং এর কোন প্রয়োজনও নেই। যেমন

ادخلوا مصر অর্থ اسكنوا مصر বা قيموا مر অর্থাৎ আপনারা মিসরে বসবাস করুন কিংবা মিসরে অবস্থান করুন। إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِيْنَ (আল্লাহ চাহেন তো নিরাপদ অবস্থায় থাকবেন।) এ ব্যাখ্যা খুবই সঠিক ও সুন্দর।

আহলি কিতাবদের মতে, হযরত ইয়াকূব (আ) যখন বিলবীস এলাকায় জাশির নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন হযরত ইউসুফ (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন। ইয়াকূব (আ) নিজের আগমনবার্তা পৌঁছানোর জন্যে য়াহূযাকে আগেই পাঠিয়ে দেন। তারা আরও বলেছেন, মিসরের বাদশাহ ইয়াকূব (আ)-এর পরিবারকে অবস্থান গ্রহণ এবং তাদের গৃহপালিত সমস্ত পশু ও মালপত্র নিয়ে থাকার জন্যে সম্পূর্ণ জাশির এলাকা তাদেরকে ছেড়ে দেন। একদল মুফাস্‌সির উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ) যখন হযরত ইয়াকূব (আ) তথা ইসরাঈল-এর অন্যান্য সংবাদ শুনলেন, তখন তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে দ্রুত বের হয়ে আসেন। সেই সাথে ইউসুফ (আ)-এর সহযোগিতা ও আল্লাহর নবী ইসরাঈলের সম্মানার্থে বাদশাহ ও তার সৈন্যরা এগিয়ে আসে। ইসরাঈল বাদশাহর জন্যে দু'আ করেন। নবী ইয়াকূব (আ)-এর আগমনের বরকতে আল্লাহ মিসরবাসীর উপর থেকে অবশিষ্ট বছরগুলোর দুর্ভিক্ষ তুলে নেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইয়াকূব নবীর সাথে তাঁর পুত্রগণ ও পুত্রদের সন্তান ও পরিজনসহ মোট কত লোক মিসরে এসেছিলেন সে ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। আবূ ইসহাক সাবিঈ (র) ইবন মাসঊদ (রা)-এর বরাতে বলেন, এদের সংখ্যা ছিল তেষট্টি। মূসা ইবন উবায়দা (রা) আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দার বরাতে বলেছেন, তিরাশিজন। আবূ ইসহাক মাসরুক (রা) সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, এরা যখন মিসরে প্রবেশ করেন তখন এদের সংখ্যা ছিল তিনশ' নব্বই। কিন্তু এঁরা যখন মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে মিসর থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন তাদের যুদ্ধক্ষম যুবকের সংখ্যাই ছিল ছয় লক্ষের উপরে। আহলি কিতাবদের মতে, তারা সংখ্যায় ছিল সত্তরজন। তারা এদের নামও উল্লেখ করেছে। আল্লাহর বাণী : وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ (এবং ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে বসাল।) কেউ কেউ বলেছেন, ইউসুফের মা ঐ সময় জীবিত ছিলেন না। তাওরাতের পণ্ডিতগণের মতও তাই। কোন কোন মুফাস্‌সির বলেছেন, ঐ সময় আল্লাহ তাঁকে জীবিত করে দেন। অপর এক দলের মতে, ইউসুফ (আ)-এর খালার নাম ছিল লাইলী। খালাকে মায়ের স্থানে গণ্য করা হয়েছে। ইবন জারীর (র) ও অন্যরা বলেছেন, কুরআনের সুস্পষ্ট দাবি হল, ঐ সময় তাঁর মা জীবিত ছিলেন। সুতরাং এর বিরুদ্ধে আহলি কিতাবদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় এবং এটাই শক্তিশালী মত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে উঠানোর অর্থ তাদেরকে নিজের কাছে সিংহাসনে বসান। وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا (এবং তারা সকলে তার সম্মানে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল)। অর্থাৎ তাঁর পিতা-মাতা ও এগার ভাই ইউসুফ (আ)-এর সম্মানার্থে সিজদা করেন। এ রকম সিজদা করা তাদের শরীয়তে ও পরবর্তী নবীদের শরীয়তে বৈধ ছিল: কিন্তু আমাদের শরীয়তে এটা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। هٰذَا تَأْوِيْلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ (সে বলল, হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা।) অর্থাৎ এটা সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা যা পূর্বে আমি আপনাকে শুনিয়েছিলাম যে, এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্র আমাকে সিজদা করছে। আপনি আমাকে এ স্বপ্ন গোপন রাখার জন্যে বলেছিলেন এবং তখন আমাকে কিছু প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا. وَقَدْ أَحْسَنَ بِيْ إِذْ أَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ.

'আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কেননা, তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন।'

অর্থাৎ দুঃখ-কষ্ট ও সংকীর্ণতার পরে আমাকে শাসক বানিয়েছেন। মিসরের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আদেশ কার্যকরী করার ক্ষমতা দান করেছেন। وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ (আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে এনে দিয়েছেন।)

অর্থাৎ গ্রাম থেকে তারা ইবরাহীম খলীলুল্লাহর দেশের আরাবাত নামক এক নিভৃত মরু পল্লীতে বসবাস করতেন। مِنْ بَعْدِ اَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخْوَتِي (শয়তান আমার ও ভাইদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করার পর।) অর্থাৎ তারা যেসব নির্যাতনমূলক আচরণ করেছিল— যার বর্ণনা পূর্বে দেয়া হয়েছে তারপর। اِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ (নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তা নিপুণতার সাথেই সম্পন্ন করেন।) অর্থাৎ তিনি যখন কোন কিছু করার ইচ্ছা করেন তখন তা বাস্তবায়নের উপায় বের করেন ও এমন সহজ-সরল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করেন যা মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। বরং তিনি নিজেই তা নির্ধারণ করেন এবং তাঁর নিজ কুদরতে সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করেন। اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ (তিনিই তো সর্বজ্ঞ।) সকল বিষয়ে অবগত الْحَكِيمُ। (প্রজ্ঞাময়)। অর্থাৎ পরিকল্পনা গ্রহণে, পদ্ধতি নির্ধারণে ও বাস্তবায়নে তিনি প্রজ্ঞাশীল।

আহলি কিতাবদের মতে, হযরত ইউসুফ (আ)-এর কর্তৃত্বে যত খাদ্য রসদ ছিল তা তিনি মিসরবাসী ও অন্যদের কাছে সকল প্রকার জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করেন। যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, যমীন, আসবাবপত্র ইত্যাদি; এমনকি তাদের জীবনের বিনিময়েও বিক্রি করেছেন। ফলে তারা সবাই ক্রীতদাসে পরিণত হয়। এরপর তিনি তাদের ব্যবহারের জন্যে তাদের জমি-জিরাত ছেড়ে দেন এবং তাদেরকে এই শর্তে মুক্তি দেন যে, তারা যে সব ফসল ও ফল উৎপন্ন করবে তার এক-পঞ্চমাংশ রাজস্ব দেবে। এটাই পরবর্তীকালে মিসরের স্থায়ী প্রথায় পরিণত হয়।

সা'লাবী (র) বলেছেন, দুর্ভিক্ষের সময়ে হযরত ইউসুফ (আ) ক্ষুধার্তদের কথা ভুলতে পারতেন না। দুর্ভিক্ষকালে তিনি কখনও পেট ভরে খেতেন না। প্রত্যহ দুপুরে তিনি মাত্র এক লুকমা খাবার খেতেন। তাঁর দেখাদেখি ঐ সময়ে অন্যান্য দেশের রাজরাজড়ারা-ও এই নীতি অনুসরণ করেন। আমি বলি, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা)-ও তাঁর আমলে দুর্ভিক্ষের বছরে পেট ভরে আহার করেন নি। দুর্ভিক্ষের পর সচ্ছলতা ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি এ নিয়ম পালন করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, দুর্ভিক্ষ কেটে যাওয়ার পর জনৈক বেদুঈন হযরত উমর (রা)-কে জানায় যে, দুর্ভিক্ষ দূর হয়েছে। আপনি এখন মুক্ত স্বাধীন।

এরপর হযরত ইউসুফ (আ) যখন দেখলেন যে, তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ হয়েছে, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন উপলব্ধি করলেন যে, এই পৃথিবীর কোনই স্থায়িত্ব নেই। এর উপরে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হবে। আর পূর্ণতার পরেই আসে ক্ষয়ের পালা (وما بعد التمام الا النقصان) তখন তিনি আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। আল্লাহর অনেক অনুগ্রহ ও করুণার কথা স্বীকার করলেন এবং মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দান এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত রাখার জন্য দু'আ করেন। তার এ দু'আ ছিল এমন পর্যায়ের, যেমন

অন্যান্য সময় দু'আর মধ্যে বলা হয় اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين (হে আল্লাহ! আমাদেরকে মুসলিমরূপে জীবিত রাখুন এবং মুসলিমরূপে মৃত্যু দান করুন) অর্থাৎ যখন আপনি আমাদেরকে মৃত্যু দিবেন, তখন যেন আমরা মুসলমান থাকি। এমনও বলা যায় যে, তিনি এ দু'আ করেছিলেন মৃত্যু-শয্যায় থাকা অবস্থায়। যেমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মৃত্যু-শয্যায় থেকে প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর রূহকে ঊর্ধ জগতে উঠিয়ে নিতে ও নবী-রাসূল ও সালিহীনদের অন্তর্ভুক্ত করতে। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন ঃ اللهم فى الرفيق الاعلى এ দু'আ তিনবার বলার পর তিনি ইনতিকাল করেন।

এমনও হতে পারে, হযরত ইউসুফ (আ) শরীর ও দেহের সুস্থ থাকা অবস্থার উপর ইসলামের সাথে মৃত্যু কামনা করেছিলেন। আর এটা তাঁদের শরীয়তে বৈধ ছিল। হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত ঃ ما تمنى نبى قط الموت قبل يوسف অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ)-এর পূর্বে কোন নবী মৃত্যু কামনা করেননি। কিন্তু আমাদের শরীয়তে মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে, ফিৎনা-ফাসাদের সময় তা জায়েয আছে। যেমন ইমাম আহমদ (র) হযরত মু'আয (রা)-এর দু'আ সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি যখন কোন সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলতে চান তখন ঐ পরীক্ষায় আমাকে না ফেলেই আপনার কাছে উঠিয়ে নিন। فاذا اردت بقوم فتنة فتوفنا اليك غير مفتونين অন্য এক হাদীসে আছে ঃ হে আদম সন্তান! ফিৎনায় জড়িয়ে পড়ার চেয়ে মৃত্যুই তোমার জন্যে শ্রেয়।

হযরত মারয়াম (আ) বলেছিলেন ঃ يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا

(হায়, আমি যদি এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। (সূরা মারয়াম ঃ ২৩) হযরত আলী (রা) ইবন আবি তালিবও মৃত্যু কামনা করেছিলেন তখন, যখন রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমে ওঠে, ফিৎনা-ফাসাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, হত্যা-সন্ত্রাস বিস্তার লাভ করে এবং সর্বত্র সমালোচনার চর্চা হতে থাকে। সহীহ্ বুখারী সংকলক ইমাম আবূ আবদুল্লাহ বুখারী (র)-ও মৃত্যু কামনা করেছিলেন, যখন তাঁর বিরোধীরা সর্বত্র বিরোধিতার বিভীষিকা ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং তিনি অত্যধিক মানসিক যাতনায় ভুগছিলেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় মৃত্যু কামনা সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র) তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে আছে— রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لا يتمنى احدكم الموت لضر نزل به اما محسنا فيزداد واما مسيئا فلعله يستعتب ولكم ليقل اللهم احينى ما كانت الحيوة خيرا لى وتوفنى اذا كانت الوفاة خيرالى.

বিপদে ও দুঃখে পড়ে তোমরা মৃত্যু কামনা করো না। কেননা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি যদি নেককার হয়, তাহলে তার নেকী বেড়ে যাবে। আর যদি সে পাপিষ্ঠ হয় তাহলে তার পাপ কমে যাবে। বরং এ রকম বলা উচিত যে, হে আল্লাহ! যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্যে কল্যাণকর

হয় ততদিন আমাকে জীবিত রাখুন! আর মৃত্যু যখন আমার জন্যে মঙ্গলময় হয় তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন।

এখানে ضر বলতে মানুষের দেহের রোগ বা অনুরূপ অবস্থা বোঝান হয়েছে, দীন সম্পর্কীয় নয়। এটা স্পষ্ট যে, হযরত ইউসুফ (আ) মৃত্যু কামনা করেছিলেন তখন, যখন তিনি মৃত্যু-শয্যায় শায়িত কিংবা তার নিকটবর্তী হয়েছিলেন। ইবন ইসহাক (র) আহলি কিতাবদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত ইয়াকূব (আ) মিসরে পুত্র ইউসুফ (আ)-এর কাছে সতের বছর থাকার পর ইনতিকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি ইউসুফ (আ)-এর কাছে ওসীয়ত করে যান যে, তাঁকে যেন তাঁর পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম (আ) ও ইসহাক (আ)-এর পাশে দাফন করা হয়। সুদ্দী (র) লিখেন যে, হযরত ইউসুফ (আ) ধৈর্যের সাথে এ ওসীয়ত পালন করেন। পিতার মৃতদেহ তিনি সিরিয়ায় পাঠিয়ে দেন এবং পিতা ইসহাক (আ) ও পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-র কবরের পাশে একই গুহায় তাঁকে দাফন করা হয়।

আহলি কিতাবদের মতে, হযরত ইয়াকূব (আ) যখন মিসরে যান তখন তাঁর বয়স ছিল একশ' ত্রিশ বছর। তাদের মতে, তিনি মিসরে সতের বছর জীবিত থাকেন। (১৩০+১৭= ১৪৭ বছর)। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বয়স লিখেছে সর্বমোট একশ' চল্লিশ বছর। এ কথা তাদের কিতাবে লিখিত আছে। নিঃসন্দেহে এটা তাদের ভুল। এটা হয় লিপিগত ভুল কিংবা তাদের হিসেবের ভুল অথবা তারা চল্লিশের উপরের খুচরা বছরগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু এ রকম করা তাদের নীতি নয়। কেননা, অনেক স্থানে তারা খুচরা সংখ্যাসহ উল্লেখ করেছে। এখানে কিভাবে এর ব্যতিক্রম করল তা বোধগম্য নয়।

আল্লাহ্ কুরআনে বলেন ঃ

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي. قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَاءِكَ إِبْرٰهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَّاحِدًا وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ.

তবে কি তোমরা উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকূবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বলল ঃ আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা বলল ঃ আমরা আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের ইবাদত করব। তিনি একক উপাস্য। আর আমরা সবাই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণকারী। (সূরা বাকারা ঃ ১৩৩)

হযরত ইয়াকূব (আ) আপন সন্তানদেরকে যে খালিস দীনের প্রতি ওসীয়ত করেন, তা হল দীন ইসলাম। যে দীনসহ সমস্ত নবীকে তিনি প্রেরণ করেছেন। আহলি কিতাবরা উল্লেখ করে, হযরত ইয়াকূব (আ) তাঁর পুত্রদেরকে একজন একজন করে ওসীয়ত করেন এবং তাদের অবস্থা ভবিষ্যতে কেমন হবে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। পুত্র ইয়াহুযাকে তিনি তাঁর বংশ থেকে এক মহান নবীর আগমনের সু-সংবাদ দেন। বংশের সবাই তাঁর আনুগত্য করবে। তিনি হলেন সায়্যিদিনা ঈসা ইবন মারয়াম (আ)। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

আহলি কিতাবদের বর্ণনা মতে, হযরত ইয়াকূব (আ)-এর মৃত্যুতে মিসরবাসী সত্তর দিন পর্যন্ত শোক পালন করে। হযরত ইউসুফ (আ) চিকিৎসাবিদদেরকে উৎকৃষ্ট সুগন্ধি দ্বারা পিতার

মরদেহকে অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ দিলে তারা তাই করে। এভাবে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়। অতঃপর হযরত ইউসুফ (আ) মিসরের বাদশাহর কাছে এই মর্মে মিসরের বাইরে যাওয়ার অনুমতি চান যে, তিনি পিতাকে পিতৃ-পুরুষদের পাশে দাফন করবেন। বাদশাহ অনুমতি দিলেন। ইউসুফ (আ)-এর সাথে মিসরের গণ্যমান্য ও প্রভাবশালী লোকদের এক বিরাট দল গমন করে। হিবরূন (হেব্রন) নামক স্থানে পৌছে পিতাকে সেই গুহায় দাফন করেন, যে গুহাটি হযরত ইবরাহীম (আ) 'ইফরূন ইব্‌ন সাখার-এর কাছ থেকে খরীদ করে নিয়েছিলেন। সাতদিন তথায় অবস্থান করার পর সকলেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পিতার মৃত্যুতে ইউসুফ (আ)-এর ভাইগণ ইউসুফ (আ)-কে অত্যধিক সান্ত্বনা দেন ও সম্মান দেখান। ইউসুফ (আ)-ও তাদেরকে সম্মানিত করেন এবং প্রত্যাবর্তনের পর উত্তমভাবে তাদেরকে মিসরে থাকার ব্যবস্থা করেন। এরপর আসে হযরত ইউসুফ (আ)-এর অন্তিমকাল। মৃত্যুকালে তিনি স্ব-বংশীয়দেরকে ওসীয়ত করে যান যে, তারা যখন মিসর থেকে বের হয়ে যাবেন তখন যেন তাঁর লাশও মিসর থেকে সাথে করে নিয়ে যান এবং বাপ-দাদার কবরের পাশে তাঁকেও যেন দাফন করা হয়। ফলে মৃত্যুর পরে হযরত ইউসুফ (আ)-এর লাশ সুগন্ধি দ্বারা আবৃত করে একটি সিন্দুকে পুরে মিসরে রেখে দেওয়া হয়। হযরত মূসা (আ) যখন বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন ঐ সিন্দুকও নিয়ে আসেন এবং তার পিতৃ-পুরুষদের পাশে দাফন করেন। পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। আহলি কিতাবদের মতে, মৃত্যুকালে হযরত ইউসুফ (আ)-এর বয়স হয়েছিল একশ' দশ বছর। আহলি কিতাবদের এই লেখাটি আমি দেখেছি এবং ইবন জারীর (র)ও তা নকল করেছেন। মুবারক ইবন ফুযালা হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ ইউসুফ (আ)-কে যখন কূয়ায় নিক্ষেপ করা হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল সতের বছর। পিতার কাছ থেকে অনুপস্থিত ছিলেন আশি বছর এবং পিতার সাথে মিলনের পরে জীবিত ছিলেন তেইশ বছর। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল (১৭+৮০+২৩) একশ' বিশ বছর। অন্যদের মতে, মৃত্যুকালে তিনি তাঁর ভাই ইয়াহুযাকে ওসীয়ত করে যান।

হযরত আইয়ূব (আ)-এর ঘটনা

ইবন ইসহাক (র) বলেন, হযরত আইয়ূব (আ) ছিলেন রোমের বাসিন্দা। তাঁর বংশপঞ্জি নিম্নরূপ ঃ আইয়ুব ইব্‌ন মূস, ইব্‌ন যারাহ ইবনুল ঈস ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম আল-খলীল (আ)। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর বংশ তালিকা এভাবে ঃ আইয়ূব ইবন মূস ইবন রাবীল ইবনুল ঈস ইবন ইসহাক ইবন ইয়াকূব (আ)। কোন কোন ঐতিহাসিক অন্যরূপ লিখেছেন। ইবন আসাকির (র) লিখেছেন, আইয়ূব নবীর মা ছিলেন হযরত লূত (আ)-এর কন্যা। কেউ কেউ বলেছেন, হযরত আইয়ূব (আ)-এর পিতা সেই ঈমানদারদের একজন যারা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপের দিন ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু প্রথম মতটাই অধিক প্রসিদ্ধ। কেননা, তিনি ছিলেন ইবরাহীম (আ)-এর অধঃস্তন বংশধর। এ বিষয়ে আমরা নিম্নোক্ত আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিত লিখেছি। যথা ঃ

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ.

আর তার (ইবরাহীমের) বংশধরদের মধ্যে রয়েছে দাউদ, সুলায়মান, আইয়ূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূন। (৬ ঃ ৮৪)

সঠিক মত এই যে ذريته বলতে ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের বোঝানো হয়েছে; নূহ (আ)-এর বংশধর নয়। হযরত আইয়ূব (আ) সেসব নবীর অন্যতম যাদের নিকট ওহী পাঠানো হয়েছে বলে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ.

'তোমার কাছে 'ওহী' প্রেরণ করেছি যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীগণের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তার বংশধরগণ, 'ঈসা, আইয়ূব, হারূন এবং সুলায়মানের কাছে ওহী প্রেরণ করেছিলাম। (৪ ঃ ১৬৩)

অতএব, বিশুদ্ধ মত এই যে, হযরত আইয়ূব (আ) ছিলেন 'ঈসা ইবন ইসহাক (আ)-এর বংশধর। তাঁর স্ত্রীর নামের ব্যাপারেও বিভিন্ন মত পাওয়া যায়। কারও মতে, লায়্যা বিনত ইয়াকূব। কারও মতে, রুহমাহ বা রাহিমাহ বিন্‌ত আফরাইম। কারও মতে, মানশা বিনত ইউসুফ ইবন ইয়াকূব। শেষোক্ত মতই বেশি প্রসিদ্ধ। এই কারণে আমরা এখানে এই মতেরই উল্লেখ করেছি। হযরত আইয়ূব (আ)-এর ঘটনা বলার পর আমরা বনী ইসরাঈলের অন্যান্য

নবী সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَاَيُّوْبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ.

এবং স্মরণ কর, আইয়ূবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি। তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। তার দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করে দিলাম, তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সঙ্গে তাদের মত আরো দিয়েছিলাম আমার বিশেষ রহমতরূপে এবং ইবাদতকারীদের জন্যে উপদেশস্বরূপ। (২১ ঃ ৮৩-৮৪)

সূরা সাদে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّوْبَ. اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ. اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ. هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ. وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا. نِعْمَ الْعَبْدُ. اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ.

স্মরণ কর, আমার বান্দা আইয়ূবকে, যখন সে তার প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিল, শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। আমি তাকে বললাম, তুমি তোমার পা দিয়ে ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীতল পানি আর পানীয়। আমি তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও আমার অনুগ্রহস্বরূপ ও বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্যে উপদেশ স্বরূপ। আমি তাকে আদেশ করলাম, এক মুঠো তৃণ লও ও তা দিয়ে আঘাত কর এবং শপথ ভঙ্গ করো না। আমি তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী। (৩৮ ঃ ৪১-৪৪)

ইবন আসাকির (র) কালবী (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, সর্বপ্রথম প্রেরিত নবী হযরত ইদরীস (আ)। তারপরে নূহ, তারপর ইবরাহীম (আ)। তারপর ইসমাঈল, তারপর ইসহাক, তারপর ইয়াকূব, তারপর ইউসুফ (আ)। তারপর লূত, তারপর হূদ, তারপর সালিহ, তারপর শু'আয়ব, তারপর মূসা ও হারূন, তারপর ইলয়াস, তারপর আল-য়াসা, তারপর উরফী ইবন সুওয়ায়লিখ ইবন আফরাইম ইবন ইউসুফ ইবন ইয়াকূব (আ)। তারপর ইউনুস (আ) ইবন মাত্তা— ইয়াকূবের বংশধর। তারপর আইয়ূব ইবন যারাহ ইবন আমূস ইবন লায়ফারাম ইবনুল 'ঈস ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম (আ)। উক্ত ক্রমধারায় কোন কোন নামের ক্ষেত্রে আপত্তি আছে। কেননা হূদ ও সালিহ (আ) সম্পর্কে প্রসিদ্ধ মত এই যে, তাঁদের আগমন নূহ (আ)-এর পরে ও ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে হয়েছিল।

ঐতিহাসিক ও তাফসীরকারগণ বলেছেন, হযরত আইয়ূব (আ) ছিলেন সে কালের একজন বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি। সকল প্রকার সম্পদের অধিকারী ছিলেন তিনি। যথা চতুষ্পদ ও গৃহ-পালিত

পশু। দাস-দাসী এবং হাওরান অঞ্চলের বুছায়না এলাকার বিশাল জমির মালিকানা ছিল তার হস্তগত।

ইবন আসাকির (র) বর্ণনা করেন, হযরত আইয়ূব (আ)-এর ঐ সব সম্পদ ছাড়াও আরও ছিল প্রচুর সন্তান ও পরিবার-পরিজন। পরে এ সব কিছু তাঁর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নানা প্রকার দৈহিক ব্যাধি দ্বারা তাকে পরীক্ষায় ফেলা হয়। শরীরের সর্ব অংগে রোগ ছিল এত ব্যাপক যে, জিহবা ও হৃৎপিণ্ড ব্যতীত কোন একটি স্থানও অক্ষত ছিল না। এ দুই অংগ দ্বারা তিনি আল্লাহর যিকির করতেন। এতসব মুসীবত সত্ত্বেও তিনি ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখান। রাত-দিন সকাল-সন্ধ্যা সর্বক্ষণ আল্লাহর যিকিরে রত থাকেন। রোগ দীর্ঘ স্থায়ী হওয়ায় বন্ধু-বান্ধব, আপনজন তাঁর কাছ থেকে সরে যেতে থাকে। অবশেষে তাঁকে শহরের বাইরে এক আবর্জনাময় স্থানে ফেলে রাখা হয়। একে একে সবাই তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একমাত্র স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ তার খোঁজ-খবর রাখত না। স্বামীর অধিকার, তার পূর্বের ভালবাসা ও অনুগ্রহের কথা মনে রেখে স্ত্রী তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকেন। স্ত্রী তাঁর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। পেশাব-পায়খানায় সাহায্য করতেন এবং অন্যান্য খিদমতে আঞ্জাম দিতেন। স্ত্রীও ক্রমশ দুর্বল হতে থাকেন। অর্থের দৈন্য দেখা দেয়। ফলে মানুষের বাড়িতে কাজ করে সেই পারিশ্রমিক দ্বারা স্বামীর আহার্য ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হন। তবুও তিনি অসীম ধৈর্যের পরিচয় দেন। সম্পদ ও সন্তানাদি হারান। স্বামীর করুণ অবস্থা, অর্থের অভাব ও মানুষের সাহায্য-সহানুভূতির অনুপস্থিতি— এ সব প্রতিকূল অবস্থাকে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করেন। অথচ সম্পদ-ঐশ্বর্য, বন্ধু-বান্ধব ইতিপূর্বে সবই তাঁদের করায়ত্ত ছিল। সহীহ হাদীসে আছে— রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون. ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان دينه صلابة زيد فى بلائه.

সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় নবীগণের। তারপর সত্যপন্থী লোকদের, এরপর দীনদারীর স্তর ভেদে পর্যায়ক্রমে এ পরীক্ষা চলে। যদি সে দৃঢ়তার সঙ্গে দীনের আনুগত্য করতে থাকে তবে তার পরীক্ষাও কঠোরতর হয়।' উল্লেখিত বিপদ-আপদ হযরত আইয়ূব (আ)-এর ক্ষেত্রে যতই বৃদ্ধি পেয়েছে ততই তার ধৈর্য, সহনশীলতা, আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি তাঁর ধৈর্য ও মুসীবত পরবর্তীকালে প্রবাদে পরিণত হয়ে যায়। ওহাব ইবন মুনাব্বিহ ও অন্য অনেকে ইসরাঈলী উলামাদের বরাতে হযরত আইয়ূব (আ)-এর সম্পদ ও সন্তানাদি নিঃশেষিত হওয়া ও দেহের রোগ সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনা দান করেছেন। আল্লাহ এগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

মুজাহিদ (র) বলেছেন, পৃথিবীতে হযরত আইয়ূব (আ)-এরই সর্বপ্রথম বসন্ত রোগ হয়। ঐতিহাসিকগণ হযরত আইয়ূব (আ)-এর পরীক্ষাকালের স্থায়িত্ব সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। ওহাবের মতে, তাঁর পরীক্ষাকাল ছিল তিন বছর— এর কমও নয়, বেশিও নয়। আনাস (রা) বলেন, সাত বছর কয়েক মাস পর্যন্ত তার পরীক্ষা চলে। এই সময়ে তাঁকে বনী ইসরাঈলের একটি আবর্জনাময় স্থানে ফেলে রাখা হয়। বিভিন্ন রকম কীট তার দেহের উপর

দিয়ে চলাচল করত। অতঃপর আল্লাহ তাঁকে এ মুসীবত থেকে উদ্ধার করেন। বিপুলভাবে তাকে পুরস্কৃত করেন এবং তার প্রশংসাও করেন।

হুমায়দ (র) বলেছেন, হযরত আইয়ূব (আ) আঠার বছর যাবত মুসীবতে আবদ্ধ ছিলেন। সুদ্দী (র) বলেছেন, আইয়ূব (আ)-এর দেহ থেকে মাংস খসে পড়ে এমনকি তাঁর হাড় ও শিরা ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর স্ত্রী তাঁর দেহের নিচে ছাই বিছিয়ে দিতেন। এ অবস্থা যখন দীর্ঘ দিন ধরে চলতে থাকে, তখন একদা স্ত্রী বললেন, হে আইয়ূব! আপনি যদি আপনার প্রতিপালকের কাছে দু'আ করতেন তাহলে তিনি এ বিপদ থেকে আপনাকে উদ্ধার করতেন। তদুত্তরে আইয়ূব (আ) বললেন, আমি সত্তর বছর সুস্থ দেহে জীবন যাপন করেছি, এখন তার জন্যে সত্তর বছর সবর করলেও তা নগণ্যই হবে। স্বামীর মুখে এ কথা শুনে স্ত্রী ঘাবড়ে যান। তখন থেকে তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মানুষের কাজকর্ম করে আইয়ূব (আ)-এর আহার্যের বন্দোবস্ত করতেন।

কিছুদিন পর লোকজন যখন জানল যে, এই মহিলাটি আইয়ূব (আ)-এর স্ত্রী। তখন আর তারা তাঁকে কাজে নিতো না। তাদের ভয় হল যে, এরূপ মেলামেশার দ্বারা আইয়ূবের রোগ হয়ত তাদের মধ্যে সংক্রামিত হতে পারে। একদা স্ত্রী কোথাও কাজ খুঁজে না পেয়ে অবশেষে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যার কাছে খুব উন্নতমানের খাদ্যের বিনিময়ে নিজের চুলের দুইটি বেনীর একটি বিক্রি করে দেন। উক্ত খাদ্য নিয়ে তিনি আইয়ূব (আ)-এর কাছে উপস্থিত হন। আইয়ূব (আ) এমন খাদ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ খাদ্য কোথায় পেয়েছ? স্ত্রী জানালেন, অন্যের কাজ করে এ খাদ্য সংগ্রহ করেছি। পরের দিনও স্ত্রী কোথাও কাজ না পেয়ে অবশিষ্ট বেনীটিও খাদ্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দেন। উক্ত খাদ্য আইয়ূব (আ)-এর কাছে নিয়ে আসলে এবারও তিনি অসন্তুষ্ট হন এবং কসম করেন যে, কোথা থেকে কিভাবে এ খাদ্য তিনি পেলেন, না বলা পর্যন্ত তিনি তা খাবেন না। তখন স্ত্রী নিজ মাথা থেকে ওড়না তুলে দেখান। আইয়ূব (আ) স্ত্রীর মাথা মুণ্ডিত দেখে আল্লাহর কাছে দু'আ করেন :

أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ .

হে আমার প্রতিপালক! আমি দুঃখে-কষ্টে পতিত হয়েছি, আর আপনি তো সকল দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৩)

ইবন আবী হাতিম (র) আবদুল্লাহ ইবন উবায়দ ইবন উমায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আইয়ূব (আ)-এর দুই ভাই ছিল। একদা তারা তাদের ভাইকে দেখতে আসে। কিন্তু আইয়ূব (আ)-এর দেহের দুর্গন্ধের কারণে তারা তাঁর কাছে যেতে সক্ষম হলো না। দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। তখন একজন অপর জনকে বলল ঃ আইয়ূবের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে বলে যদি আল্লাহ জানতেন, তাহলে তিনি এভাবে তাকে এরূপ কঠিন পরীক্ষায় ফেলতেন না। তাদের এ কথায় তিনি এতই মর্মাহত হন যে, এমনটি আর কখনও হননি। অতঃপর তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! আপনি যদি জানেন যে, এমন একটি রাতও যায়নি, যে রাত্রে আমি পেট ভরে খানা খেয়েছি অথচ আমার জানা মতে, কোন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত অবস্থায় থেকেছে, তা হলে আমার সত্যতা প্রকাশ করুন।' তখন আকাশ থেকে তাঁর কথার সত্যতা ঘোষণা করা হয়

এবং ঐ দুই ভাই তা শ্রবণও করে। অতঃপর তিনি পুনরায় বললেন, 'হে আল্লাহ্! আপনি যদি জানেন যে, বস্ত্রহীন লোকের খবর পাওয়ায় আমি কখনও দুটি জামা গ্রহণ করিনি তাহলে আমার সত্যতা প্রকাশ করুন।' তখন আকাশ থেকে তাঁর সত্যতা ঘোষণা করা হয়— যা ঐ দুই ভাই শ্রবণ করেছিল। অতঃপর তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ্! আপনার ইয্যতের কসম, এরপর সিজদায় পড়ে যান এবং বলেন, হে আল্লাহ! আপনার ইযযতের কসম, আমার মুসীবত দূর না করা পর্যন্ত আমি মাথা উঠাব না।' সত্যই বিপদমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর মাথা উঠাননি।

ইবন আবী হাতিম (র) ও ইবন জারীর (র) উভয়ে আনাস ইবন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, 'নবী করীম (সা) বলেছেন, আল্লাহর নবী আইয়ূব (আ)-এর রোগ আঠার বছর যাবত স্থায়ী ছিল। কাছের ও দূরের সকল লোক তাঁকে পরিত্যাগ করে যায়। কিন্তু দুই ব্যক্তি পরিত্যাগ করেনি। তারা ছিল তাঁর দুই ভাই। এ দুই ভাই ছিল তাঁর খুবই আদরের পাত্র। সকালে ও বিকেলে তারা আইয়ূব (আ)-এর কাছে আসত। একদিন এক ভাই অপরজনকে বলে, দেখ— আল্লাহ জানেন যে, আইয়ূব এমন কোন পাপ করেছে যা অন্য কোন লোক কখনও করেনি। অপরজন বলল, কি সে পাপ? সে বলল, আজ আঠারটি বছর সে রোগে ভুগছে। আল্লাহ তাকে রহমত করেননি। রোগ থেকে মুক্তি দেননি। বিকেলে যখন তারা আসল, তখন দ্বিতীয় ভাইটি আর ধৈর্য ধরতে পারল না। আইয়ূব (আ)-এর কাছে তা বলে দিল। হযরত আইয়ূব (আ) বললেন, তুমি কি বলছ, তা আমি বুঝি না। তবে আল্লাহ জানেন, একদা আমি দুই ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম— যারা পরস্পর ঝগড়া করছিল এবং আল্লাহর যিকির করছিল। আমি বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করলাম এবং তারা যে অনুপযুক্ত পরিবেশে আল্লাহর যিকির করেছে সে জন্যে তাদের পক্ষ থেকে আমি কাফ্ফারা আদায় করি।

হযরত আইয়ূব (আ) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে যেতেন। প্রয়োজন শেষ হলে স্ত্রী তাঁর হাত ধরে আনতেন ও স্ব-স্থানে রাখতেন। একদা স্বামীর কাছে আসতে স্ত্রীর দেরি হয়। এ সময়ে আল্লাহ আইয়ূব (আ)-এর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ. (হে আইয়ূব! তোমার পা দ্বারা মাটিতে আঘাত কর। এই তো গোসলের ও পান করার ঠাণ্ডা পানি) বেশ কিছু সময় দেরি করে স্ত্রী আজ আইয়ূব (আ)-এর কাছে আসলেন ও তাঁকে দেখতে লাগলেন। হযরত আইয়ূব (আ) পূর্বের চেয়েও অধিক সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যবান হয়েছেন। তিনি এ অবস্থায় স্ত্রীর সম্মুখে আসলেন। স্ত্রী তাকে চিনতে না পেরে বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকতময় করুন। এখানে আল্লাহর নবী রোগগ্রস্ত অবস্থায় অবস্থান করছিলেন তাঁকে কি তুমি দেখেছ? আল্লাহর কসম, ঐ নবী রোগে পড়ার পূর্বে যখন সুস্থ ছিলেন, তখন তাঁর যে চেহারা ছিল সে চেহারার সাথে তোমার চেহারার ন্যায় অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ চেহারার লোক আমি আর কাউকে দেখিনি। হযরত আইয়ূব (আ) বললেন, আমিই সেই লোক। হযরত আইয়ূব (আ)-এর বাড়িতে দু'টি উঠান ছিল। একটি গম মাড়ানোর এবং আরেকটি যবের। আল্লাহ দুই খণ্ড মেঘ পাঠিয়ে দেন। একটি খণ্ড গমের উঠানের উপর এসে স্বর্ণ বর্ষণ করে। পর্যাপ্ত বর্ষণের ফলে তা পরিপূর্ণ হয়ে গড়িয়ে যেতে থাকে। অপর খণ্ডটি যবের উঠানের উপর রৌপ্য বর্ষণ করে—যা পরিপূর্ণ হয়ে গড়িয়ে যেতে থাকে। উপরোক্ত সকল বর্ণনা ইবন জারীর (র)-এর। ইবন হিব্বান (র) ও তাঁর সহীহ গ্রন্থে উপরোক্ত

সমুদয় ঘটনা ইব্ন ওহাব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের মারফূ বর্ণনা একান্তই 'গরীব' পর্যায়ের। এটা মওকূফ হওয়াই সঠিক। ইবন আবী হাতিম (র) ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, আল্লাহ হযরত আইয়ূব (আ)-কে জান্নাতের পোশাক পরিধান করান। আইয়ূব (আ) জান্নাতী পোশাক পরে একটু দূরে গিয়ে পথের পাশে বসে থাকেন। তারপর তাঁর স্ত্রী যখন সেখানে আসেন, তখন তিনি তাঁকে চিনতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর বান্দা! এখানে রোগগ্রস্ত যে লোকটি ছিল তাঁকে সম্ভবত কুকুরে বা বাঘে নিয়ে গেছে। এভাবে লোকটির সাথে কিছু সময় ধরে স্ত্রী কথা বলতে থাকেন। লোকটি বলল, সম্ভবত আমিই সেই আইয়ূব। স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! আপনি কি আমার সাথে উপহাস করছেন ? তখন তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। আমিই তো আইয়ূব। আল্লাহ আমার সুস্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ হযরত আইয়ূব (আ)-কে পূর্বের সম্পদ ও সন্তান অবিকল ফিরিয়ে দেন এবং সেই সাথে সমপরিমাণ অতিরিক্ত দান করেন। ওহাব ইবন মুনাব্বিহ (র) বলেন, আল্লাহ তাঁকে ওহীর মাধ্যমে জানান ঃ আমি তোমার সন্তানাদি ও ধন-সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছি এবং আরও সমপরিমাণ দান করেছি, এখন এই পানি দ্বারা তুমি গোসল কর। কারণ এর দ্বারা তুমি আরোগ্য লাভ করবে। তোমার আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে কুরবানী দাও এবং তাদের জন্যে ক্ষমা চাও। কেননা, তোমার ব্যাপারে তারা আমার অবাধ্যতা করেছে। ইব্ন আবী হাতিম (র) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবন আবী হাতিম (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে আরো বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ আইয়ূব (আ)-কে রোগ থেকে মুক্তি দেয়ার পর তাঁর প্রতি স্বর্ণ বর্ষণ করেন। আইয়ূব (আ) তা অঞ্জলি ভরে উঠিয়ে কাপড় ভর্তি করতে থাকেন। তখন অদৃশ্যলোক থেকে তাঁকে বলা হল, হে আইয়ূব! তুমি কি তৃপ্ত হওনি? আইয়ূব (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! কে এমন আছে, যে আপনার রহমতে তৃপ্ত হয়ে কে তা চাওয়া বন্ধ করতে পারে? অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ আবূ দাউদ তায়ালিসী (র) সূত্রে, আবদুস সামাদ (র) কাতাদা (র) থেকে এবং ইবন হিব্বান (র) আবদুস সামাদ (র) থেকে। এ হাদীস সহীহ-এর শর্তে উত্তীর্ণ। অবশ্য, 'সিহাহ সিত্তার কোন গ্রন্থে এটা বর্ণিত হয়নি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। ইমাম আহমদ (র) আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, জনৈক লোকের মাধ্যমে আইয়ূব (আ)-এর কাছে কতগুলো স্বর্ণ-পাত্র পাঠান হয়। তিনি সেগুলো নিজের কাপড়ে ভরে রাখতে থাকেন। তখন আওয়াজ হল, হে আইয়ূব! যা তোমাকে দেয়া হয়েছে তা কি তোমার জন্যে যথেষ্ট নয়? আইয়ূব বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আপনার অনুগ্রহ থেকে কে হাত গুটাতে পারে? হাদীসটি উক্ত সূত্রে মওকূফ। তবে অন্য সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এটা মারফূ রূপেও বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ একদা আইয়ূব (আ) বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করছিলেন। এমন সময় তাঁর সামনে এক ঝাঁক স্বর্ণের পঙ্গপাল পতিত হল। তিনি সেগুলো হাতে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে ডেকে বললেন, হে আইয়ূব! তুমি যা দেখতে পাচ্ছো তা থেকে আমি কি তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেইনি? তিনি উত্তর দিলেন, অবশ্যই আমার প্রতিপালক কিন্তু আমি

আপনার বরকতের অমুখাপেক্ষী নই। বুখারী (র) আবদুর রাযযাক (র) সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর বাণী : اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ-(তুমি তোমার পা দ্বারা আঘাত কর।) আইয়ূব (আ) নির্দেশ মোতাবেক আপন পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করলেন। আল্লাহ সেখান থেকে একটি ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেন। যার পানি ছিল সুশীতল। আল্লাহ তাঁকে এই পানি দ্বারা গোসল করতে ও তা পান করতে হুকুম দেন। আইয়ূব (আ) তাই করলেন। ফলে তাঁর সমস্ত ব্যথা বেদনা ও তাঁর দেহের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল রোগ-শোক ও ক্ষত দূর হয়ে গেল। আল্লাহ তাঁকে সু-স্বাস্থ্য দান করেন, তাঁর চেহারাকে সুদর্শন চেহারায় পরিবর্তন করে দেন। এ ছাড়া তাঁকে প্রচুর ধন-সম্পদও দান করেন। এমনকি স্বর্ণের পঙ্গপালও বর্ষণ করেন। তাঁকে আল্লাহ সন্তান-সন্ততিও প্রদান করেন। আল্লাহ বলেন : وَاٰتَيْنَاهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ (তাকে তার পরিবারবর্গ ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সমপরিমাণও দিলাম)। কারও কারও মতে, আল্লাহ আইয়ূব (আ)-এর পূর্বের সন্তানদেরকে জীবিত করে দেন। আর কারও মতে, পূর্বের সন্তানদের বিনিময়ে আল্লাহ আইয়ূব (আ)-কে সওয়াব দান করেন এবং তাদের স্থলে সমসংখ্যক সন্তান দুনিয়ায় দান করেন। আর এ সকলকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার সাথে একত্র করবেন। رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا (আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ।) অর্থাৎ আমি তাঁর যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলাম। وَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ (এবং তার উপর যে মুসীবত চেপে ছিল তা থেকে তাকে মুক্ত করলাম।) অর্থাৎ এটা ছিল তাঁর প্রতি আমার রহমত, কৃপা ও অনুগ্রহ। وَذِكْرٰى لِلْعَابِدِيْنَ (এবং ইবাদতকারীদের জন্যে উপদেশস্বরূপ) অর্থাৎ এটা ঐ ব্যক্তির জন্যে উপদেশস্বরূপ যে তার দেহ, সম্পদ কিংবা সন্তানের ব্যাপারে পরীক্ষায় পতিত হবে। তার জন্যে আল্লাহর নবী আইয়ূব (আ) আদর্শ হয়ে থাকবেন। কেননা, আল্লাহ আইয়ূব (আ)-কে তার চাইতেও অনেক বড় পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেন এবং বিনিময়ে পুরস্কার আশা করেন। ফলে আল্লাহ তাঁকে মুক্তি দেন। উপরোক্ত আয়াত (رَحْمَةً مِّنَّا) থেকে যারা এ অর্থ নিয়েছেন যে, এটা তার স্ত্রীর নাম (رَحْمَةً)- তাদের এরূপ দলীল গ্রহণ সম্পূর্ণ বাতিল ও ভ্রান্তিপূর্ণ। যাহ্হাক (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ আইয়ূব (আ)-এর স্ত্রীকে যৌবন ফিরিয়ে দেন এবং স্ত্রীকে পূর্বাপেক্ষা অধিক সুশ্রী করে দেন; এমনকি আরও ছাব্বিশজন পুত্র সন্তানও তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। রোগ থেকে মুক্তি লাভের পর আইয়ূব (আ) সত্তর বছর জীবিত ছিলেন। তিনি রোম দেশে বসবাস করতেন এবং দীনে হানীফ তথা সত্য ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর পরবর্তী লোকজন ইবরাহীম (আ)-এর দীনের মধ্যে বিকৃতি ঘটায়। আল্লাহর বাণী ঃ

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهٖ وَلَا تَحْنَثْ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. نِعْمَ الْعَبْدُ. اِنَّهٗ اَوَّابٌ.

হে আইয়ূব! তুমি স্ব-হস্তে তৃণশলা ধারণ কর এবং তা দ্বারা স্ত্রীকে প্রহার কর। তবুও কসম ভঙ্গ করো না। আমরা আইয়ূবকে ধৈর্যশীল পেয়েছি। কতই না উত্তম বান্দা সে! নিঃসন্দেহ সে ছিল আমার অভিমুখী। (সূরা সাদ ঃ ৪৪)

অর্থাৎ এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে আইয়ূব (আ)-এর প্রতি বিশেষ রেয়াত। তিনি স্ত্রীকে একশ' কোড়া মারার শপথ করেছিলেন। এর কারণ হিসেবে কেউ বলেছেন, স্ত্রী চুল বিক্রি করায় তিনি এই শপথটি করেছিলেন। কেউ বলেছেন যে, একদা শয়তান নবীর স্ত্রীর কাছে চিকিৎসকের বেশ ধরে গিয়ে আইয়ূব (আ)-এর ব্যাধির নির্দিষ্ট ঔষধের বর্ণনা দিয়েছিল। স্ত্রী তাঁর কাছে এসে উক্ত ঔষধের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এটা শয়তানের কাজ। তখন তিনি কসম করেন যে, স্ত্রীকে একশ' কোড়া মারবেন। রোগ মুক্তির পর আল্লাহ তাঁকে জানালেন যে, শস্যের গোছার মত এক গোছা তৃণ একত্রে বেঁধে একবার স্ত্রীকে মার। এতে একশ' কোড়া মারা হয়েছে বলে গণ্য হবে। এতেই কসমের কাফফ্‌ারা হয়ে যাবে। কসম ভাঙ্গার গুনাহ হবে না। এটা হল মুক্তির সহজ ব্যবস্থা এবং এমন ব্যক্তির কসম থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায়, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর আনুগত্য করে। বিশেষ করে একজন ধৈর্যশীল সতী-সাধ্বী, সত্যপন্থী নেককার স্ত্রী লোকের ক্ষেত্রে। এজন্যে আল্লাহ এই সুযোগ দেয়ার কারণ হিসেবে সাথে সাথেই উল্লেখ করেছেন ঃ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ (আমি তাকে সবরকারীরূপে পেয়েছি। কত ভাল বান্দা সে! নিশ্চয়ই সে আল্লাহর ইবাদতকারী)। বহু সংখ্যক ফিকাহবিদ এই রেয়াতকে আয়মান ও নুযুর (শপথ ও মানত) অধ্যায়ে দলীলরূপে প্রয়োগ করেছেন। কিছু সংখ্যক ফকীহ এর ব্যাপ্তি আরও বাড়িয়ে দিয়ে শপথ থেকে বাঁচার উপায় ও বাহানা অধ্যায় সংযোজন করেছেন (كتاب الحيل فى الخلاص من الايمان)। তাঁরা দলীল হিসেবে এ আয়াতকেই পেশ করেছেন এবং রকমারি মাসআলা বের করেছেন। আমরা তার কিছু অংশ 'কিতাবুল আহকামে' যখন পৌছব ইনশাল্লাহ তখন আলোচনা করব।

ইব্‌ন জারীর (র) প্রমুখ ইতিহাসবেত্তা লিখেছেন যে, হযরত আইয়ূব (আ) তিরানব্বই বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। কারও মতে, তিনি এর চেয়ে বেশিদিন জীবিত ছিলেন। মুজাহিদ (র) সূত্রে লায়ছ বর্ণনা করেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ দলীল হিসেবে ধনীদের বিরুদ্ধে সুলায়মান (আ)-কে, দাস-দাসীদের বিরুদ্ধে ইউসুফ (আ)-কে এবং মুসীবত ও বিপদগ্রস্তদের মুকাবিলায় আইয়ূব (আ)-কে পেশ করবেন। ইব্‌ন আসাকির (র)ও সমঅর্থবোধক বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুকালে হযরত আইয়ূব (আ) তাঁর পুত্র হাওমালকে ওসীয়ত করে যান। তার পরে বিশর ইবন আইয়ূব তার স্থলাভিষিক্ত হন। অনেকের ধারণা মতে, এই বিশরই কুরআনে বর্ণিত যুল-কিফ্‌ল। এদের ধারণা হিসেবে তিনি নবী এবং পঁচাত্তর বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। কিছু লোক যখন আইয়ূব (আ)-এর পুত্র বিশরকে যুল-কিফ্‌ল বলেছেন, তখন আমরা যুল-কিফ্‌ল-এর কাহিনীই এখন আলোচনা করব।

যুল-কিফ্ল-এর ঘটনা

একদল মনে করেন, যুল-কিফ্ল হযরত আইয়ূব (আ)-এর পুত্র। আল্লাহ তা'আলা সূরা আম্বিয়ায় আইয়ূব (আ)-এর ঘটনা বর্ণনাশেষে বলেন ঃ

وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِيْنَ. وَاَدْخَلْنَاهُمْ فِىْ رَحْمَتِنَا اِنَّهُمْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

এবং ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফ্লের কথা স্মরণ কর, তারা প্রত্যেকেই ছিল সবরকারী। আমি তাদেরকে আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। (২১ ঃ ৮৫-৮৬)

সূরা সাদেও আইয়ূব (আ)-এর ঘটনা বলার পরে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ. اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ. وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ. وَاذْكُرْ اِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ. وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ.

স্মরণ কর, আমার বান্দা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও সূক্ষ্মদর্শী। আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণের অধিকারী করেছিলাম অর্থাৎ পরকালের স্মরণ। অবশ্যই তারা ছিল আমার মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ কর, ইসমাঈল, আল-ইয়াসা'আ ও যুল-কিফ্লের কথা। এরা প্রত্যেকেই ছিল সজ্জন। (সূরা সাদ ঃ ৪৫-৪৮)

কুরআনের এসব আয়াতে উল্লেখিত মহান নবীগণের সাথে যুল-কিফ্লের নামও প্রশংসা একত্রে উল্লেখ থাকায় স্পষ্টত বোঝা যায় যে, তিনিও নবী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এ মতই প্রসিদ্ধ। এটা অনেকেরই ধারণা, যুল-কিফ্ল নবী ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একজন পুণ্যবান ও ন্যায়পরায়ণ শাসক। ইব্ন জারীর (র) এ ব্যাপারে মতামত প্রকাশে বিরত রয়েছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ইব্ন জারীর (র) ও ইব্ন আবূ নাজীহ্ (র) মুজাহিদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, যুল-কিফ্ল নবী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একজন পুণ্যবান ব্যক্তি—তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত নবীর পক্ষ থেকে তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, তিনি সম্প্রদায়ের লোকজনের দেখাশোনা করবেন এবং ন্যায়-নীতির সাথে তাদের বিচার-মীমাংসা করবেন। এই কারণে তাকে যুল-কিফ্ল (জিম্মাদার) নামে অভিহিত করা হয়।

ইব্ন জারীর (র) ও ইব্ন আবী হাতিম (র) মুজাহিদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ হযরত ইয়াসা'আ যখন বয়োবৃদ্ধ হন তখন তিনি ভাবলেন, যদি আমার জীবদ্দশায় একজন লোককে

সমাজের বুকে কাজ করার জন্যে দায়িত্ব দিতে পারতাম এবং কিভাবে সে দায়িত্ব পালন করে তা স্বচক্ষে দেখতে পারতাম, তাহলে মনে শান্তি পেতাম। এরপর তিনি লোকজনকে জড়ো করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে তিনটি কাজ করার অঙ্গীকার করলে তাকে আমি আমার স্থলাভিষিক্ত করব। কাজ তিনটি এই ঃ দিনে সওম পালন করবে, রাতে জেগে ইবাদত করবে এবং কখনও রাগান্বিত হতে পারবে না। এ কথার পর বাহ্যদৃষ্টিতে সাধারণ বলে গণ্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল—আমি পারব। তখন তিনি বললেন, তুমি কি দিনে সওম করতে, রাত্রে জেগে ইবাদত করতে ও রাগান্বিত না হয়ে থাকতে পারবে? সে বলল, হ্যাঁ, পারব। এরপর সেদিনের মত সবাইকে বিদায় দিলেন। পরের দিন পুনরায় লোকদেরকে জড়ো করে আবার সেই প্রস্তাব রাখেন। সবাই নিরব থাকল, কিন্তু ঐ লোকটি দাঁড়িয়ে বলল, আমি পারব। অতঃপর নবী আল-ইয়াসা'আ ঐ ব্যক্তিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন।

ইবলীস তখন শয়তানদেরকে ডেকে বলল, ঐ ব্যক্তিকে পথভ্রষ্ট করার দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে। কিন্তু তারা সকলে তাতে ব্যর্থ হলো। তখন ইবলীস বলল ঃ আচ্ছা আমিই তার দায়িত্ব নিলাম। পরে ইবলীস এক বৃদ্ধ দরিদ্রের বেশে লোকটির কাছে আসে। সে এমন সময়ই আসল, যখন তিনি দুপুরের বিশ্রামের জন্যে শয্যা গ্রহণ করেছিলেন। আর তিনি ঐ বিশেষ সময় ছাড়া দিনে বা রাতের অন্য কোন সময়ই নিদ্রা যেতেন না। তিনি ঘুমাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় ইবলীস এসে দরজা ধাক্কা দেয়। ভিতর থেকে তিনি বললেন, দরজায় কে? ইবলীস বলল, আমি একজন অসহায় মজলুম বৃদ্ধ লোক। তিনি দরজা খুলে দিলেন। বৃদ্ধ তার ঘটনা বলতে লাগল। সে জানাল, আমার সাথে আমার গোত্রের লোকের বিবাদ আছে। তারা আমার উপর এই এই জুলুম করেছে। বৃদ্ধ তার ঘটনার বিবরণ দিতে দিতে বিকাল হয়ে গেল। দুপুরের নিদ্রার সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। তিনি বলে দিলেন, সন্ধ্যার পরে আমি যখন দরবারে বসব তখন তুমি এসো। তোমার হক আমি আদায় করে দেব। বৃদ্ধ চলে গেল, সন্ধ্যার পরে দরবারে বসে বৃদ্ধ আসছে কিনা তাকিয়ে দেখলেন কিন্তু তাকে উপস্থিত পেলেন না। তালাশ করেও তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

পরের দিন সকালে বিচার আসনে বসে বৃদ্ধের জন্যে অপেক্ষা করেও তাকে দেখলেন না। মজলিস শেষে তিনি যখন দুপুরের শয্যা গ্রহণে গেলেন তখন বৃদ্ধ এসে দরজায় ধাক্কা দিল। ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, দরজায় কে? বলা হল, অসহায় এক মজলুম বৃদ্ধ। দরজা খুলে দেয়া হল। বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, যখন আমি দরবারে বসব তখন তুমি আসবে? সে বলল, আমার গোত্রের লোকেরা অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির। যখন তারা জানল যে, আপনি দরবারে বসা। তখন তারা আমাকে আমার হক প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু যখন আপনি দরবার ছেড়ে উঠে যান তখন তারা সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। তিনি বললেন, এখন চলে যাও। সন্ধ্যার পরে যখন দরবারে বসব তখন এসো। কিন্তু বৃদ্ধের সাথে কথা বলতে বলতে তার আজকের দুপুরের নিদ্রাও আর হল না। রাত্রে দরবারে বসে বৃদ্ধের অপেক্ষা করলেন কিন্তু তাকে দেখা গেল না। অধিক রাত্রি হওয়ায় তন্দ্রা তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। তিনি বাড়ির একজনকে বললেন, আমার দারুণ নিদ্রা পাচ্ছে। এখন আমি ঘুমাবো। সুতরাং কেউ যদি দরজার কাছে আসতে চায় তাকে আসতে দিও না। একথা বলে যাওয়ার পর মুহূর্তেই বৃদ্ধ সেখানে উপস্থিত

হল। পাহারাদার লোকটি বলল, পিছু হটো, পিছু হটো। বৃদ্ধ বলল, আমি হুজুরের কাছে গতকাল এসেছিলাম এবং আমার সমস্যার কথা বলেছিলাম। কিন্তু পাহারাদার বলল, কিছুতেই দেখা করা যাবে না। আল্লাহর কসম! আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন কোন লোককে তার কাছে যেতে না দিই। এভাবে পাহারাদার তাকে নিবৃত্ত করলো।

বৃদ্ধ তখন ঘরের পানে তাকিয়ে দেওয়ালের এক স্থানে একটি ছিদ্রপথ লক্ষ্য করল। ইবলীসরূপী ঐ বৃদ্ধ উক্ত ছিদ্রপথ দিয়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল এবং ভিতরের দিক থেকে দরজা ধাক্কা দিল। শব্দ শুনে যুল-কিফ্ল-এর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি বললেন, ওহে, আমি কি তোমাকে এ সময় আসতে বারণ করিনি? সে বলল, আমি আমার নিজ প্রচেষ্টায় এসেছি। আপনি তো আমাকে আসতে দেননি। লক্ষ্য করে দেখুন, কিভাবে আমি এসেছি। তিনি দরজার কাছে এসে দেখলেন, তা সেভাবেই বন্ধ রয়েছে যেভাবে তিনি বন্ধ করেছিলেন। অথচ সে ঘরের ভিতরে তার কাছেই রয়েছে। তিনি এতক্ষণে তাকে চিনতে পারলেন এবং বললেন, তুমি তো আল্লাহর দুশমন। সে বলল, হ্যাঁ, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আপনি আমাকে পরাজিত ও নিরাশ করে দিয়েছেন। আপনাকে রাগান্বিত করার জন্যে আমি এসব কাজ করেছি— যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। অতঃপর আল্লাহ এই ব্যক্তির নাম রাখেন যুল-কিফ্ল। কারণ তিনি যে কাজ করার জিম্মাদারী গ্রহণ করেছিলেন তা পূরণ করেছেন।

ইব্ন আবী হাতিম (র) ও ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবন হারিছ, মুহাম্মদ ইবন কায়স, ইবন হুজায়রা আল-আকবর ও অন্যান্য আরও ঐতিহাসিক থেকেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। ইব্ন আবী হাতিম (র) কাতাদা (র) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-কে এই মিম্বরের উপর থেকে বলতে শুনেছি যে, যুল-কিফ্ল নবী ছিলেন না। বরং তিনি একজন নেককার লোক ছিলেন। প্রত্যহ একশ' রাকাত সালাত আদায় করতেন। তাঁর সম্প্রদায়ের নবীর কাছ থেকে তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এবং নবীর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন এবং প্রত্যহ একশ' রাকাত করে সালাত আদায় করেন। এজন্যে তাঁর নাম রাখা হয় যুল-কিফ্ল। ইব্ন জারীরও কাতাদা (র) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবূ মূসা আশ'আরী (রা) সূত্রে এ বর্ণনা মুনকাতি পর্যায়ের।

ইমাম আহমদ (র) ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে একবার নয় দুইবার নয়, সাতবার নয় বরং তার চেয়ে বেশিবার শুনেছি ঃ কিফ্ল বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির নাম। এমন কোন গুনাহের কাজ নেই যা সে করেনি। একদা তার কাছে এক মহিলা আসে, সে তাকে উপভোগ করার উদ্দেশ্যে ষাটটি দীনার দেয়। যখন সে স্বামী-স্ত্রীর মতো তাকে উপভোগে উদ্যত হলো তখন মহিলাটি কম্পিত বদনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। কিফ্ল তাকে জিজ্ঞেস করল, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমার প্রতি বলপ্রয়োগ করছি? মহিলাটি বলল, না। বরং কাঁদার কারণ এই যে, আমি কখনও এ কাজ করিনি। অভাব-অনটনই আমাকে এ কাজে বাধ্য করেছে। কিফ্ল বলল, এ কাজ কখনও করনি, এই প্রথমবার? অতঃপর তিনি নেমে গেলেন এবং বললেন, যাও, দীনারগুলো তোমারই। এরপর বললেন, আল্লাহর কসম! কিফ্ল আর কখনও আল্লাহর নাফরমানী করবে না। ঐ রাত্রেই কিফ্ল মারা যান। সকাল বেলা তার দরজায় লিখিত দেখা যায়, আল্লাহ কিফ্লকে ক্ষমা করে

দিয়েছেন। তিরমিযী (র)ও আ'মাশ সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে 'হাসান' বলে অভিহিত করেছেন। কেউ কেউ একে ইব্ন উমরের 'মওকূফ' বর্ণনা বলে অভিহিত করেছেন। হাদীসটি অত্যন্ত 'গরীব' পর্যায়ের। তাছাড়া এর সনদে আপত্তি আছে। কেননা এর একজন বর্ণনাকারী সা'আদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেছেন لا اعرفه। আমি তাকে চিনি না, এই একটা মাত্র হাদীসেই তার উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য ইব্ন হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। এই সা'আদ থেকে কেবল আবদুল্লাহ ইবন আবদুল্লাহ আর-রাযী ব্যতীত অন্য কেউ হাদীস বর্ণনা করেননি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কথা

তাওরাত কিতাব নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন জাতিকে ব্যাপক আযাবে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে। কুরআনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى.

(আমি পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করার পর মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। (সূরা কাসাস ঃ ৪৩)। যেমন ইব্ন জারীর, ইব্ন আবী হাতিম ও বায্যার (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ তাওরাত নাযিল হওয়ার পর আল্লাহ পৃথিবীতে কোন আসমানী কিংবা যমীনী আযাব দ্বারা কোন জাতিকে সম্পূর্ণ নির্মূল করেননি। কেবল সেই একটি মাত্র জনপদের লোককেই করেছেন যাদেরকে তিনি বানরে পরিণত করেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُوْلٰى.

বায্যার এ হাদীসকে মারফূ বলে বর্ণনা করেছেন কিন্তু সঠিক এই যে, এটা 'মওকূফ' পর্যায়ের হাদীস। সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সমস্ত মানব গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। তারা সকলেই মূসা (আ)-এর যুগের পূর্বেকার লোক। সেই সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে আসহাবুর রস্স। সূরা ফুরকানে আল্লাহ বলেন ঃ

وَعَادًا وَّثَمُوْدًا وَاَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا.

আমি আদ, ছামূদ, রাস্সবাসী এবং তাদের অন্তর্বর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। এদের প্রত্যেকের জন্যেই আমি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি এবং প্রত্যেককেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছি। (সূরা ফুরকান ঃ ৩৮-৩৯)

সূরা ক্বাফে আল্লাহ বলেন ঃ

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ. وَّاَصْحَابُ الْاَيْكَةِ. قَوْمُ تُبَّعٍ وكُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدُ.

তাদের পূর্বেও সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে নূহের সম্প্রদায়, রস্স ও ছামূদ সম্প্রদায়, আদ, ফিরআউন ও লূত সম্প্রদায় এবং আয়কার অধিবাসী ও তুব্বা সম্প্রদায়। ওরা সকলেই

রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলেছে। ফলে তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত হয়েছে। (সূরা ক্বাফ ঃ ১২-১৪)

এ আয়াত ও এর পূর্বের আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও নির্মূল হয়েছে। এ বক্তব্য দ্বারা ইব্‌ন জারীর (র)-এর মতামত প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। কেননা, তাঁর মতে, উক্ত সম্প্রদায় হচ্ছে আসহাবুল উখদূদ বা অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিরা— যাদের কথা সূরা বুরূজে বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌ন জারীর (র)-এর মতামত প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণ এই যে, ইব্‌ন ইসহাক (র)সহ এক দলের মতে, অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিদের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল হযরত ঈসা মাসীহ্ (আ)-এর পরে। কিন্তু ইব্‌ন ইসহাকের এ মতও বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। ইব্‌ন জারীর (রা) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আসহাবুর রস্‌স হল ছামূদ জাতির জনপদসমূহের মধ্য হতে একটি জনপদের অধিবাসী।

হাফিজ ইব্‌ন আসাকির (র) তার ইতিহাস গ্রন্থের শুরুতেই দামেশকের প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে আবুল কাসিম আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইবন জারদাদ প্রমুখের ইতিহাসের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, আসহাবুর রস্‌স হাযূর নামক স্থানে বসবাস করত। আল্লাহ তাদের মাঝে হান্‌যালা ইব্‌ন সাফওয়ান (আ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা নবীকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে হত্যা করে ফেলে। অতঃপর আদ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন ইরাম ইবন সাম ইব্‌ন নূহ আপন পুত্রকে নিয়ে রস্‌স ছেড়ে চলে যান এবং 'আহ্‌কাফে' গিয়ে অবস্থান করেন। আল্লাহ রস্‌স-এর অধিবাসীদের ধ্বংস করেন। তারা সমগ্র ইয়ামানে এবং অন্যান্য স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তাদেরই একজন জায়রূন ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন 'আদ ইব্‌ন আওস ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন সাম ইব্‌ন নূহ্ দামিশকে চলে যান এবং দামেশক নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর নাম রাখেন জায়রূন। এটাই সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত ইরাম নগরী। গোটা দামেশকে এই স্থানের চেয়ে অধিক পাথর নির্মিত প্রাসাদ আর কোথাও ছিল না। আল্লাহ হূদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাবাহ্ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌ন হালূদ ইব্‌ন আদকে আদ জাতির কাছে অর্থাৎ আহ্‌কাফে বসবাসকারী আদের বংশধরদের কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা নবীকে মিথ্যাবাদী ঠাওরায়। ফলে আল্লাহ তাদেরকে বিনাশ করে দেন। এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আসহাবুর রস্‌স সম্প্রদায়ের আগমন হয়েছিল আদ জাতির বহুযুগ পূর্বে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইব্‌ন আবী হাতিম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রস্‌স আযার বাইজানের একটি কূপের নাম। ছাওরী ইকরিমা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রস্‌স একটি কূপ— যার মধ্যে তারা তাদের নবীকে দাফন করেছিল। ইব্‌ন জুরায়জ ইকরিমার উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, আসহাবুর রস্‌স ফাল্‌জ নামক স্থানে বসবাস করত। তাদেরকে আসহাবে ইয়াসীনও বলা হয়। কাতাদা (র) বলেন, ফাল্‌জ ইয়ামামার একটি জনপদের নাম। আমি বলতে চাই যে, ইকরিমার মত অনুযায়ী আসহাবুর রস্‌স যদি আসহাবু ইয়াসীন হয়, তবে তারা ব্যাপক আযাবে ধ্বংস হয়েছে।

আল্লাহ তাদের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ.

এটা ছিল কেবলমাত্র একটি মহা নাদ, ফলে ওরা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। (ইয়াসীন ঃ ২৯)

এদের ঘটনা রস্‌স-এর ঘটনার পরে আলোচনা করা হবে। পক্ষান্তরে এরা যদি আসহাবে ইয়াসীন না হয়ে অন্য কোন সম্প্রদায় হয়ে থাকে, যা স্পষ্টতই বোঝা যায়, তবে তারাও সমূলে ধ্বংস হয়েছে। সে যাই হোক না কেন, তা ইব্‌ন জারীরের মতের বিরোধী। আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান আন নরকাশ উল্লেখ করেছেন যে, আসহাবুর রস্‌সদের একটি কূপ ছিল। তারা সে কূয়ায় পানি পান করত ও যমীনে সিঞ্চন করত। তাদের একজন ন্যায়পরায়ণ উত্তম চরিত্রের অধিকারী বাদশাহ ছিলেন। বাদশাহ মারা গেলে তারা দারুণ মর্মাহত হয়। কিছুদিন যাওয়ার পর শয়তান ঐ বাদশাহর রূপ ধারণ করে তাদের কাছে আসে এবং বলে আমি মরিনি, বরং কিছুদিনের জন্যে গায়েব হয়ে ছিলাম তোমরা কি কর তা দেখার জন্যে। এতে তারা অত্যধিক খুশী হল। সে বলল, তোমরা তোমাদের ও আমার মাঝে একটি পর্দা টাঙ্গিয়ে দাও। সেই সাথে এ সংবাদও দিল যে, সে কখনো মরবে না। অনেকেই তার এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করল। এভাবে তারা ফিৎনায় পতিত হয়। তারা তার ইবাদত-উপাসনা করতে শুরু করে। আল্লাহ এদের মধ্যে এক নবী প্রেরণ করেন। নবী তাদেরকে জানান যে, এ হল শয়তান— পর্দার আড়ালে থেকে সে মানুষের সাথে কথা বলে। তিনি সবাইকে তার ইবাদত করতে নিষেধ করেন এবং এক ও লা-শারীক আল্লাহর ইবাদত করার আদেশ দেন।

সুহায়লী (র) বলেন, ঐ নবীর কাছে ঘুমের মধ্যে আল্লাহ ওহী প্রেরণ করতেন। তার নাম ছিল হানজালা ইব্‌ন সাফওয়ান (আ)। সম্প্রদায়ের লোকজন তাঁর উপর আক্রমণ করে হত্যা করে এবং তাঁর লাশ কূপের মধ্যে ফেলে দেয়। ফলে কূয়ার পানি শুকিয়ে যায়। এলাকাবাসী সুখে-স্বাচ্ছন্দে থাকা সত্ত্বেও এ ঘটনার পর তারা পানির অভাবে পিপাসায় কাতর হয়। তাদের গাছপালা শুকিয়ে যায়, ফল-ফলাদি উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। বাড়িঘর বিনষ্ট হয়। এভাবে তারা সুখের পরে দুরবস্থায় পতিত হয়, সামাজিক ঐক্য ও সংহতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং অবশেষে তারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এখন তাদের বাড়িঘরে জিন-ভূত ও বন্য পশু বসবাস করে। সেখান থেকে এখন ধ্বনিত হয় জিনের শোঁ শোঁ শব্দ, বাঘের গর্জন ও হায়েনার আওয়াজ।

ইব্‌ন জারীর (র) মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল কুরাজী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, কিয়ামতে প্রথম যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে হবে একজন কৃষ্ণকায় লোক। এই কৃষ্ণকায় লোকটি সংশ্লিষ্ট ঘটনা নিম্নরূপ ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোন এক জনপদে একজন নবী প্রেরণ করেন। জনপদের কোন লোকই নবীর উপর ঈমান আনল না। কেবল ঐ কৃষ্ণকায় লোকটি একাই ঈমান আনল। এলাকাবাসী নবীর উপর অত্যাচার চালায়। তারা একটি কুয়া খনন করে নবীকে তার মধ্যে ফেলে দেয় এবং বিরাট এক পাথর দ্বারা কুয়াটির মুখ বন্ধ করে দেয় এবং এ অবস্থায় কৃষ্ণকায় লোকটি জঙ্গল থেকে কাঠ এনে বিক্রি করত। বিক্রিলব্ধ টাকা দ্বারা খাদ্য ও পানীয় ক্রয় করে ঐ কুয়ায় গিয়ে পাথর সরিয়ে নিয়ে নবীর কাছে খাদ্য পানীয় নামিয়ে দিতেন এবং তারপরে পাথর দ্বারা মুখ বন্ধ করে রাখতেন। পাথরটি উঠাতে ও নামাতে আল্লাহ তাকে সাহায্য করতেন। আল্লাহর যতদিন মঞ্জুর ছিল ততদিন এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। অতঃপর একদিন সে নিয়মানুযায়ী কাষ্ঠ সংগ্রহ করল এবং একত্র করে রশি দ্বারা বাঁধল। যখন তা উঠিয়ে আনার সংকল্প করল হঠাৎ সে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। সুতরাং অবসাদগ্রস্ত দেহে

সে ঘুমিয়ে গেল। এদিকে আল্লাহ সাত বছর যাবত তার শ্রবণ শক্তি বন্ধ করে দেন। ফলে সে এক ঘুমে সাত বছর কাটিয়ে দেয়। সাত বছর পর ঘুম ভাঙলে আড়মোড়া দিয়ে পাশ ফিরে শোয়। আল্লাহ আবারও সাত বছরের জন্যে তার শ্রবণ শক্তি বন্ধ রাখেন।

সাত বছর পর আবার তার ঘুম ভাঙে। এবার সে কাষ্ঠের বোঝা বহন করে নিয়ে আসে। সে মনে মনে ভাবল, আমি হয়ত দিনের কিছু সময় ঘুমিয়েছি। বস্তিতে এসে সে পূর্বের ন্যায় কাষ্ঠ বিক্রি করে খাদ্য পানীয় ক্রয় করে। সে উক্ত খাদ্য-পানীয় নিয়ে সেই কুয়ার কাছে গেল। কিন্তু তথায় সে কোন কুয়া দেখতে পেল না। ঘটনা ছিল এই যে, নবীকে কুয়ায় নিক্ষেপ করার কিছুকাল পর এলাকাবাসী তাদের এ কর্মের পরিণতি চিন্তা করে এবং তার কিছু আভাস-ইঙ্গিত পেয়ে নবীকে তারা কুয়া থেকে বের করে আনে। তাঁর প্রতি ঈমান আনে ও তাঁকে সত্যবাদীরূপে গ্রহণ করে। নবী তাদের কাছে ঐ কৃষ্ণকায় লোকটির খবর জিজ্ঞেস করেন। তারা কৃষ্ণকায় লোকটির কোন সংবাদ জানে না বলে জানায়। আল্লাহর ঐ নবী এরপর ইন্তিকাল করেন। নবীর ইন্তিকালের পর আল্লাহ উক্ত কৃষ্ণকায় লোকটিকে ঘুম থেকে জাগ্রত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ঐ কৃষ্ণকায় লোকটিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ হাদীস মুরসাল পর্যায়ের। এতে কিছু সন্দেহের অবকাশ আছে। ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা সম্ভবত মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব আল কুরাজি (র)-এর উক্তি।

ইব্ন জারীর (র) এ ঘটনা উল্লেখ করার পর নিজেই এর প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই ঘটনা সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে কুরআনে বর্ণিত আসহাবুর রস্স বলা ঠিক নয়। কেননা কুরআনে বলা হয়েছে— আসহাবুর রস্সকে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন। পক্ষান্তরে এই জনগোষ্ঠী পরবর্তীতে নবীর উপর ঈমান আনে। কিন্তু ইব্ন জারীরের উক্ত দলীলের এই উত্তর দেয়া যায় যে, হয়ত তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করেছিলেন। পরে তাদের সন্তানরা কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করে। ইব্ন জারীর (র) অতঃপর এই মত পোষণ করেন যে, আসহাবুল উখদূদ (অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিরা)-ই আসহাবুর রস্স। কিন্তু তার এ মত অত্যন্ত দুর্বল। দুর্বল হওয়ার কারণ আসহাবুল উখদূদের আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ আসহাবুল উখদূদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা তওবা না করলে আখিরাতে কঠোর শাস্তি ভোগ করবে, তাদের ধ্বংস হওয়ার কথা বলা হয়নি। পক্ষান্তরে, আসহাবুর রস্স-এর ধ্বংস হওয়ার কথা কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইয়াসীন সূরায় বর্ণিত জনপদবাসীর কাহিনী

আল্লাহর বাণী ঃ

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُوْنَ. قَالُوْا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ.

قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّآ اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ. وَمَا عَلَيْنَآ اِلاَّ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ.
قَالُوْا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ
اَلِيْمٌ. قَالُوْا طَآئِرُكُمْ مَّعَكُمْ. اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ. وَجَآءَ مِنْ
اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ. اِتَّبِعُوْا مَنْ لاَّ
يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ.

وَمَالِيَ لاَ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ. ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖ اٰلِهَةً اِنْ
يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَّلاَ يُنْقِذُوْنِ. اِنِّيْ اِذًا لَّفِيْ
ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ. اِنِّيْ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ. قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ. قَالَ يٰلَيْتَ
قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ. بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ. وَمَآ اَنْزَلْنَا
عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ. اِنْ كَانَتْ اِلاَّ
صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ.

তাদের কাছে উপস্থিত কর এক জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত; তাদের কাছে তো এসেছিল রসূলগণ। যখন তাদের নিকট পাঠালাম দু'জন রসূল, কিন্তু তারা ওদেরকে মিথ্যাবাদী বলল; তখন আমি ওদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা এবং ওরা বলেছিল, 'আমরা তো তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।' তারা বলল, 'তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ, দয়াময় আল্লাহ তো কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলছ।'

ওরা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক জানেন— আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি। 'স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব।' তারা বলল, 'আমরা তোমাদের অমঙ্গলের কারণ মনে করি, যদি তোমরা বিরত না হও তোমাদেরকে অবশ্যই পাথরের আঘাতে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ হতে তোমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি অবশ্যই আপতিত হবে।' ওরা বলল, তোমাদের অমঙ্গল তোমদেরই সাথে; এটা কি এ জন্যে যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? বস্তুত তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসল, সে বলল, 'হে আমার সম্পদায়! রসূলগণের অনুসরণ কর। অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথ প্রাপ্ত।

আমার কি যুক্তি আছে যে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তাঁর 'ইবাদত করব না? আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য ইলাহ্ গ্রহণ করব ? দয়াময় আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে ওদের সুপারিশ আমার কোন কাজে আসবে না এবং ওরা আমাকে উদ্ধার করতেও পারবে না। এরূপ করলে আমি অবশ্যই-স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়ব।' 'আমি তো তোমাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছি, অতএব তোমরা আমার কথা শোন।' তাকে বলা হল, 'জান্নাতে প্রবেশ কর।' সে বলে উঠল, 'হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত— 'কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত

করেছেন।' আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ হতে কোন বাহিনী প্রেরণ করি নাই এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিল না। এটা ছিল কেবলমাত্র মহানাদ। ফলে ওরা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। (সূরা ইয়াসীন ঃ ১৩-২৯)

পূর্বকালের ও পরবর্তীকালের বহুসংখ্যক আলিমের মতে, উক্ত জনপদটি ছিল এন্টিয়ক। ইব্ন ইসহাক (র) একথা ইব্ন আব্বাস (রা) কা'ব আল আহ্বার এবং ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে বুরায়দা ইব্ন হাসীব, ইকরিমা, কাতাদা, যুহরী (র) প্রমুখ থেকেও এই মতটি বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন ইসহাক হযরত ইব্ন আব্বাস (রা), কা'ব ও ওহাব থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ঐ জনপদের এক বাদশাহ ছিল, নাম ইনতীখাস ইব্ন ইন্তীহাস। সে ছিল মূর্তিপূজারী। আল্লাহ্ তার প্রতি সাদিক, সাদূক ও শালূম নামক তিনজন রাসূল প্রেরণ করেন। কিন্তু বাদশাহ তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, উল্লেখিত তিনজনই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ছিলেন। কিন্তু কাতাদা (র)-এর মতে, তাঁরা তিনজন ছিলেন ঈসা মাসীহ্ (আ)-এর প্রেরিত দূত। ইব্ন জারীর (র)ও একথা শুআয়ব আল জুব্বায়ী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উক্ত প্রেরিত তিনজনের প্রথম দু'জনের নাম শামঊন ও ইউহান্না এবং তৃতীয়জনের নাম বূলাস, আর উক্ত জনপদটি ছিল ইনতাকিয়া বা এন্টিয়ক।

এ মতটি অত্যধিক দুর্বল। কেননা ঈসা মাসীহ যখন ইনতাকিয়ার অধিবাসীদের কাছে তিনজন হাওয়ারী প্রেরণ করেন, তখন ঐ শহরের বাসিন্দারাই সে সময় সর্বপ্রথম মাসীহ্র প্রতি ঈমান আনে। এ কারণে ইনতাকিয়া শহরটি সেই চারটি শহরের অন্যতম, যে চারটি শহরে নাসারাদের গীর্জা প্রতিষ্ঠিত ছিল। শহরগুলো এই ইনতাকিয়া, কুদ্স, আলেকজান্দ্রিয়া ও রূমিয়া বা পরবর্তীকালের কনস্টান্টিনিপল। এ চার শহরের কোনটিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। কিন্তু কুরআনে বর্ণিত উক্ত জনপদের অধিবাসীরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। যেমন তাদের কাহিনীর শেষভাগে আছে, জনপদবাসী যখন রাসূলগণের সমর্থনকারী লোকটিকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন ঃ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ (সে ছিল একটি মহানাদ যার আঘাতে তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে যায়।) কিন্তু যদি এরূপ ধারণা করা হয় যে, কুরআনে বর্ণিত রাসূলকে প্রাচীন কালের কোন এক সময়ে ইনতাকিয়ায় পাঠানো হয়েছিল, অধিবাসীরা তাদেরকে অস্বীকার করলে আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়। পরবর্তীকালে জনপদটি পুনরায় আবাদ হয় এবং মাসীহ্র আমলে প্রেরিত দূতগণের প্রতি তারা ঈমান আনে। তবে এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী উপরোক্ত জটিলতা থাকে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

কুরআনে বর্ণিত উক্ত ঘটনাকে মাসীহ্র প্রেরিত হাওয়ারীদের ঘটনা বলে অভিহিত করার মতটি একান্তই দুর্বল— এর কারণ উপরে বলা হয়েছে। তা ছাড়া এ ঘটনা সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্যের দিকে লক্ষ্য করলে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, তারা ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।

আল্লাহ্ বলেন ঃ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا (তুমি তাদের কাছে দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর) অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! তোমার সম্প্রদায়ের কাছে বল, হে মুহাম্মদ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ (সেই জনপদের অধিবাসীদের কথা) অর্থাৎ নগরবাসীদের কথা।

إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ (যখন সেখানে রাসূলগণ আগমন করেছিল। আমি তাদের কাছে দু'জন রাসূল প্রেরণ

করেছিলাম। কিন্তু ওরা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের দ্বারা।)

অর্থাৎ তৃতীয় একজনের দ্বারা পূর্বের দু'জনকে রিসালাতের ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম فَقَالُوْا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُوْنَ (তারা সবাই বলল, আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি।) জনগণ রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করল এই বলে যে, তোমরাও তো আমাদেরই মত সাধারণ মানুষ। পূর্ববর্তী কাফির জাতিসমূহও তাদের কাছে প্রেরিত নবীদেরকে এই একইভাবে উত্তর দিত। মানুষ আবার নবী হতে পারে, এটা ছিল তাদের কাছে এক অসম্ভব ব্যাপার। রাসূলগণ তাদেরকে বলেন ঃ আল্লাহ্ জানেন যে, আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত রাসূল। যদি আমরা মিথ্যা দাবি করে থাকি, তবে তিনি আমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন। وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ (স্পষ্টভাবে আল্লাহ্‌র কথা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব।)

অর্থাৎ যে বাণী নিয়ে আমরা প্রেরিত হয়েছি তা তোমাদের জানিয়ে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব। তারপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সুপথ দেখাবেন, যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করবেন। قَالُوْا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ (তারা বলল, আমরা তোমাদের অশুভ মনে করি) অর্থাৎ তোমরা যে পয়গাম নিয়ে এসেছ তা আমরা অকল্যাণকর মনে করি। لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ (যদি তোমরা বিরত না হও তবে অবশ্যই আমরা তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করব।)

অর্থাৎ কথার দ্বারা আঘাত করবো, কিংবা কার্যত হত্যাই করবো। তবে পরের আয়াতটি প্রথম অর্থেরই সমর্থন করে। وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ (এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।) এ কথা দ্বারা তারা রাসূলগণকে হত্যার ও লাঞ্ছিত করার হুমকি দেয়। قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ (রাসূলগণ বলল, তোমাদের অকল্যাণ তোমাদেরই সাথে) অর্থাৎ তোমাদের উপরই তা প্রত্যাবর্তিত হবে। -ءَاِنْ ذُكِّرْتُمْ (এটা কি এই কারণে যে, তোমাদেরকে সৎ উপদেশ দেওয়া হচ্ছে?) অর্থাৎ তোমাদেরকে আমরা সত্য পথের উপদেশ ও সে দিকে আহ্বান জানাবার কারণেই কি তোমরা আমাদেরকে হত্যার ও লাঞ্ছিত করার ভয় দেখাচ্ছ? بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ (বরং তোমরাই এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়) ফলে না তোমরা সত্যকে গ্রহণ করছ আর না গ্রহণ করার ইচ্ছা করছো। وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى (অতঃপর নগরীর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসলো।)

অর্থাৎ রাসূলগণকে সাহায্য করার ও তাদের প্রতি নিজের ঈমান প্রকাশ করার জন্যে।

قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ -اِتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْئَلُكُمْ اَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ.

(সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলগণের অনুকরণ কর! অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না এবং যাঁরা সৎপথ প্রাপ্ত'।) অর্থাৎ তারা তো তোমাদেরকে কেবল প্রকৃত সত্য গ্রহণের আহ্বান করেন। এর কোন বিনিময় ও পারিশ্রমিক কামনা করেন না। অতঃপর তিনি তাদেরকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে মেনে নেয়ার জন্যে

আহ্বান করেন এবং এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সকলের ইবাদত উপাসনা ত্যাগ করার আবেদন জানান। যারা দুনিয়ায় বা আখিরাতে কোন উপকার করতে অক্ষম।

إِنِّيْ إِذًا لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ. এরূপ করলে আমি অবশ্যই স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পড়বো।

অর্থাৎ যদি আমি এক আল্লাহর ইবাদত পরিত্যাগ করি এবং তাঁর সাথে অন্যের ইবাদতও করি। অতঃপর ঐ ব্যক্তি রাসূলগণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ إِنِّيْ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ. (আমি তোমাদের রবের উপর ঈমান আনলাম, অতএব তোমরা আমার কথা শোন!) কেউ এর অর্থ করেছেন এভাবে যে, আমার কথা মনোযোগ সহকারে শোন এবং আমার ঈমান আনার ব্যাপারে তোমরা তোমাদের রবের নিকট সাক্ষী দিও। কিন্তু অন্যরা এর অর্থ করেছেন এভাবে যে, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা শুনে রাখ, আমি আল্লাহর রাসূলগণের প্রতি প্রকাশ্য ঈমান ঘোষণা করছি। এ কথা বলার পরে সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে হত্যা করে। কারও কারও মতে, পাথর নিক্ষেপে; কারও কারও মতে, টুকরো-টুকরো করে আবার কারও কারও মতে, একযোগে সকলে তাঁর উপর হামলা করে হত্যা করে। ইব্ন ইসহাক (র) ইব্ন মাসউদ-এর বরাতে লিখেছেন যে, তারা তাঁকে পায়ে পিষে তাঁর নাড়িভুঁড়ি বের করে ফেলে। ছাওরী (র) আবূ মিজলাম (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, ঐ ব্যক্তির নাম হাবীব ইব্ন মুরী। তারপর কেউ বলেছেন, তিনি ছিলেন ছুঁতার। কেউ বলেছেন, রশি প্রস্তুতকারী; কারও কারও মতে, তিনি ছিলেন জুতা প্রস্তুতকারী; কারও কারও মতে তিনি ছিলেন ধোপা। কথিত আছে যে, তিনি তথাকার একটি গুহায় ইবাদতে রত থাকতেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেছেন, হাবীবুন নাজ্জার কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে হত্যা করে। এই জন্যে আল্লাহ বলেছেন ঃ اُدْخُلِ الْجَنَّةَ (তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর) অর্থাৎ সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তাঁকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করান। জান্নাতের শ্যামলিমা ও আনন্দ সম্ভার দেখে তিনি বলে উঠলেন ঃ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ. (হায়, আমার সম্প্রদায় যদি জানত যে, আমার রব আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সম্মানিতদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।) অর্থাৎ আমি যাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলাম, তারা যদি তাঁর প্রতি ঈমান আনত! ফলে তারা সে পুরস্কার লাভ করত, যে পুরস্কার আমি লাভ করেছি।

ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, ঐ ব্যক্তি তাঁর জীবিতকালে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এই বলে নসীহত করেন যে, يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ (হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ কর।) এবং মৃত্যুর পর এই বলে নসীহত করেন ঃ

يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ.

'হায়, আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত যে, কী কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।' ইব্ন আবী হাতিম (র) এটা বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে কাতাদা (র) বলেছেন, মুমিন যদি কারও সাথে সাক্ষাৎ করে, তবে অবশ্যই যেন তাকে নসীহত করে। আর আল্লাহর কোন অনুগ্রহ যদি সে দেখতে পায় তবে যেন সে তা গোপন না রাখে।

يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ

'হায়, আমার সম্প্রদায় যদি জানত যে, আল্লাহ্ আমাকে কী কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন ও সম্মানিত করেছেন।' আল্লাহর যে অনুগ্রহ ও করুণা সে প্রত্যক্ষ করেছে ও যে নিয়ামত সে ভোগ করছে তার উপর সে আক্ষেপ করে বলছে যে, আল্লাহ্ যদি আমার সম্প্রদায়কে এ অবস্থাটা জানিয়ে দিতেন তাহলে কতই না উত্তম হত! কাতাদা (র) বলেছেন, আল্লাহ্ তাঁর এ আক্ষেপ পূরণ করেননি। তাঁকে হত্যা করার পর আল্লাহ্ তাঁর সম্প্রদায়কে যে শাস্তি দেন তা হল এই ঃ إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ. (সে ছিল একটি মহানাদ। অতঃপর তারা নিথর নিস্তব্ধ হয়ে যায়।)

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ.

'আমি তার মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং প্রেরণের প্রয়োজনও ছিল না।' অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দানের জন্যে আকাশ থেকে কোন বাহিনী তাদের বিরুদ্ধে পাঠাবার প্রয়োজন আমার নেই। ইব্ন ইসহাক (র) এরূপ অর্থ ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ ও কাতাদা (র) বলেছেন, তাদের বিরুদ্ধে কোন সৈন্য পাঠান নাই, এর অর্থ অন্য কোন রাসূল পাঠান নাই। ইব্ন জারির (র) বলেন, প্রথম অর্থই উত্তম ও অধিক শক্তিশালী। এ কারণেই বলা হয়েছে وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ অর্থাৎ তারা যখন আমার রাসূলগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং আমার ওলী ও বন্ধুকে (অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তিকে) হত্যা করেছে, তখন তাদের শাস্তি দানের জন্যে কোন বাহিনী পাঠাবার কোন প্রয়োজন আমার ছিল না। إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُوْنَ (তা ছিল শুধু একটি মহানাদ যার ফলে তারা ধ্বংস হয়ে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল।)

মুফাসসিরগণ বলেছেন, আল্লাহ্ তাদের বিরুদ্ধে জিবরাঈল (আ)-কে পাঠান। জিবরাঈল (আ) তাদের নগর তোরণের চৌকাঠ দুটি ধরে একটি মাত্র চিৎকার ধ্বনি দেন। ফলে নগরবাসী স্তব্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের কথাবার্তার আওয়াজ ও চলাফেরার গতি বন্ধ হয়ে নীরব নিস্তব্ধ হয়ে যায়, পলক মারার মত একটি চক্ষুও অবশিষ্ট ছিল না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, আলোচ্য জনপদ ইনতাকিয়া নয়। কেননা এরা আল্লাহর রাসূলগণকে অস্বীকার করার ফলে ধ্বংস হয়ে যায়। আর ইনতাকিয়ার অধিবাসীরা মাসীহ্র প্রেরিত হাওয়ারী দূতদের প্রতি ঈমান ও আনুগত্য প্রদর্শন করে। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, ইনতাকিয়া-ই প্রথম নগরী যেখানকার অধিবাসীরা ঈসা মাসীহ (আ)-এর উপর ঈমান এনেছিল। তবে এ ক্ষেত্রে তাবারানী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তিন লোক অগ্রগামী অর্থাৎ সকলের আগে ঈমান এনেছে। তন্মধ্যে মূসা (আ)-এর প্রতি সর্বাগ্রে ঈমান আনেন ইউশা ইব্ন নূন; ঈসা (আ)-এর উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনেন সাহিবে ইয়াসীন অর্থাৎ সূরা ইয়াসীনে বর্ণিত লোকটি এবং মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি সর্বাগ্রে ঈমান আনেন আলী ইব্ন আবী তালিব। এ হাদীস দু'টি প্রামাণ্য নয়। কারণ এ হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী হুসায়ন মুহাদ্দিসদের নিকট পরিত্যক্ত। তাছাড়া সে একজন চরমপন্থী শী'আ। সে একাই এ হাদীস বর্ণনা করেছে, অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। এটা তার একান্তই দুর্বল হওয়ার প্রমাণ। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

ইউনুস (আ)-এর বর্ণনা

সূরা ইউনুসে আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَآ اِيْمَانُهَآ اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ. لَمَّآ اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ.

অর্থাৎ— তবে ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যতীত কোন জনপদবাসী কেন এমন হল না যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত? তারা যখন বিশ্বাস করল, তখন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে হীনতাজনক শাস্তি হতে মুক্ত করলাম এবং কিছুকালের জন্যে জীবনোপভোগ করতে দিলাম। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৮)

সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ বলেন ঃ

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ—এবং স্মরণ কর যুন-নূন-এর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তার জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করব না। অতঃপর সে অন্ধকার থেকে আহবান করেছিল, তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; তুমি পবিত্র, মহান, আমি তো সীমালংঘনকারী। তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৭-৮৮)

সূরা সাফ্‌ফাতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ. اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ. فَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهُوَ مُلِيْمٌ. فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ. لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ. فَنَبَذْنٰهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ. وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ.

অর্থাৎ—ইউনুসও ছিল রাসূলগণের একজন। স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে পৌঁছল। অতঃপর সে লটারীতে যোগদান করল এবং পরাভূত হল। পরে এক বৃহদাকার মৎস্য তাকে গিলে ফেলল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। সে যদি

আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত থাকতে হত এটার উদরে। অতঃপর ইউনুসকে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন। পরে আমি তার উপর এক লাউ গাছ উদ্‌গত করলাম। (সাফ্‌ফাত ১৩৯-১৪৬)

সূরায়ে সাফ্‌ফাতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِيْنٍ .

অর্থাৎ-তাকে (ইউনুস) আমি এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। ফলে তারা ঈমান এনেছিল। আর আমি তাদেরকে কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম। (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৪৭-১৪৮)

সূরায়ে কলমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ. لَوْلَا تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ. فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ.

অর্থাৎ-অতএব, তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য হয়ো না, সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌঁছলে সে লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হত উন্মুক্ত প্রান্তরে। পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। (সূরা কলম ঃ ৪৮-৫০)

উল্লেখিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা তৎকালীন মাওসিল প্রদেশের নিনোভা নামক জায়গার অধিবাসীদের নিকট ইউনুস (আ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি তাদেরকে মহান আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করেন। তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তারা তাদের কুফরী ও অবাধ্যতায় নিমগ্ন থাকে। অতঃপর যখন নবীর বিরুদ্ধে তাদের অবাধ্যতা ও নাফরমানী দীর্ঘায়িত হয় তখন তিনি তাদের মধ্য হতে বের হয়ে পড়েন এবং তিন দিন পর তাদের প্রতি আযাব নাযিল হবে বলে সতর্ক করে দেন।

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইবন জুবাইর, কাতাদা (র) প্রমুখ মনীষী বলেন, ইউনুস (আ) যখন তাঁর উম্মতদের মধ্য হতে চলে গেলেন এবং তাঁর সম্প্রদায় আল্লাহ তা'আলার আযাব তাদের উপর অত্যাসন্ন বলে নিশ্চিত হল, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে তাওবার অনুভূতি সৃষ্টি করেন এবং তারা তাদের নবীর প্রতি কৃত অপকর্মের জন্যে লজ্জিত হয়ে পড়ে। তারপর তারা দৈন্যের প্রতীক মোটা কাপড় পরে নিল এবং প্রত্যেকটি পশু শাবককে তাদের মা থেকে পৃথক করে দিল। অন্যদিকে নিজেরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কাতর হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। করুণস্বরে তারা ফরিয়াদ করতে লাগল। অনুনয় বিনয় করতে লাগল। নিজেদেরকে প্রতিপালকের প্রতি সমর্পণ করে দিল। ছেলে-মেয়ে স্ত্রী-পুরুষ সকলেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি করতে লাগল। প্রতিটি জীব-জন্তু জানোয়ার কাতরাতে লাগল।

উট ও তার বাচ্চাগুলো চিৎকার করতে লাগল। গাভী, গরু ও বাছুরগুলো হাম্বা হাম্বা রব ছাড়তে লাগল। ছাগল ও তার ছানাগুলো ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতে লাগল। এক প্রচণ্ড ও ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরত, রহমত ও করুণাবশে তাদের উপর থেকে আযাব রহিত করে দিলেন। আল্লাহ তা'আলার আযাব তাদের মাথার উপর এসে গিয়েছিল এবং রাতের তিমির রাশির ন্যায় মাথার উপর ঘুরছিল। এ ঘটনার দিকে ইংগিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ.

অর্থাৎ- তবে ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় ব্যতীত কোন জনপদবাসী কেন এমন হল না যারা ঈমান আনত এবং তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসত? অর্থাৎ কেন তুমি অতীতে বসবাসকারী এমন সম্প্রদায় পেলে না, যারা পরিপূর্ণভাবে ঈমান এনেছিল? এতে বোঝা যায় পরিপূর্ণরূপে কেউ ঈমান আনয়ন করেনি। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كَافِرُوْنَ .

অর্থাৎ–যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি, তখনই এটার বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে, তোমারা যা সহকারে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। (সূরা সাবা ঃ ৩৪) পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِلَّا قَوْمَ يُوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ .

অর্থাৎ-“তবে ইউনুস (আ)-এর সম্প্রদায় ব্যতীত, তারা যখন পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করল, তখন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে হীনতাজনক শাস্তি থেকে মুক্ত করলাম এবং কিছু কালের জন্যে জীবনোপভোগ করতে দিলাম।” অর্থাৎ তারা পরিপূর্ণভাবে ঈমান এনেছিল।

তাফসীরকারদের মধ্যে এ বিষয়টি নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে যে, এ ধরনের ঈমান কি আখিরাতেও তাদের কোন উপকারে আসবে এবং আখিরাতের আযাব থেকে তাদেরকে মুক্তি করবে? যেমন পার্থিব জীবনে এই ঈমান তাদেরকে পার্থিব শাস্তি থেকে রক্ষা করেছে? এ ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে, তবে বাক্যের বাচনভঙ্গিতে প্রকাশ্যতর মত হচ্ছে, হ্যাঁ, অর্থাৎ আখিরাতেও এই ঈমান উপকারে আসবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَمَّا اٰمَنُوْا। অর্থাৎ–যখন তারা ঈমান আনলে। আবার আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ فَاٰمَنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلٰى حِيْنٍ.

অর্থাৎ—[তাকে ইউনুস (আ)] আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম এবং তারা ঈমান এনেছিল। ফলে আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিয়েছিলাম।

অর্থাৎ এ আয়াতে উল্লেখিত কিছু কালের জন্যে জীবনোপভোগ ও আখিরাতে আযাব রহিত হবার মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

যে সকল লোকের হিদায়াতের জন্যে ইউনুস (আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের সংখ্যা সুনিশ্চিত এক লাখ ছিল। তবে তাফসীরকারগণের মধ্যে এক লাখের অতিরিক্ত সংখ্যা সম্বন্ধে মতানৈক্য রয়েছে। সাকহুল (র)-এর বর্ণনা মতে এ সংখ্যাটি ছিল দশ হাজার। তিরমিজী, ইবন জারীর তাবারী (র) ও ইবন আবূ হাতিম (র) প্রমুখ উবাই ইবন কা'ব (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা)-কে وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ আয়াতাংশের তাফসীর সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, তারা এক লাখের ঊর্ধ্বে বিশ হাজার ছিল। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তারা ছিলেন ১ লাখ ৩০ হাজার।"

অন্য এক সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৩০ হাজারের ঊর্ধ্বে। অন্য এক সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে ১ লাখ ৪০ হাজারের ঊর্ধ্বে বলে বর্ণনা রয়েছে। সাঈদ ইবন জুবাইর (রা) বলেন, "তারা সর্বসাকল্যে ১ লাখ ৭০ হাজার ছিল।"

এ সংখ্যা মাছ সংক্রান্ত ঘটনার পূর্বে ছিল, না কি পরে এ ব্যাপারেও তাফসীরকারগণের মতভেদ রয়েছে। এ লোকসংখ্যা একটি সম্প্রদায়ের নাকি পৃথক পৃথক দুইটি সম্প্রদায়ের এ নিয়েও মতভেদ আছে। এই তিনটি বিষয়ে তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, যখন ইউনুস (আ) আপন সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তার নিজ জনপদ ত্যাগ করে অন্যত্র রওয়ানা হলেন, তখন তিনি সাগর পার হবার জন্যে অন্যদের সাথে নৌকায় উঠলেন। নৌকাটি কিছুক্ষণ পর যাত্রীদের নিয়ে উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে পড়লো। নৌকাটি ঘুরপাক খেতে লাগলো এবং ডুবুডুবু অবস্থায় পতিত হলো। তাফসীরকারদের বর্ণনা মতে, তাদের সকলের ডুবে মরার উপক্রম হল। তাফসীরকারগণ বলেন, নাবিক ও যাত্রীরা মিলে পরামর্শ করল এবং লটারীর মাধ্যমে পলাতক অপরাধী সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌছতে তারা মনস্থ করল। তারা স্থির করল, লটারীতে যার নাম উঠবে অন্যদেরকে রক্ষা করার জন্যে তাকে নৌকা থেকে ফেলে দিতে হবে। লটারীতে আল্লাহর নবী ইউনুস (আ)-এর নাম উঠলো। এতে তারা তাঁকে নৌকা থেকে ফেলে দেবার সিদ্ধান্তে না পৌছে পুনরায় লটারী করে কিন্তু এবারও তাঁর নাম উঠে। আল্লাহর নবী অন্যদেরকে রক্ষা করার জন্যে আপন কাপড় খুলে ঝাঁপ দেবার জন্যে তৈরি হলেন কিন্তু নাবিক ও যাত্রীরা তাঁকে বাধা দিল বরং তারা পুনরায় লটারী করলো এবং তৃতীয় বারেও আল্লাহ তা'আলার কোন মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাঁরই নাম ওঠে। আল্লাহ তা'আলা এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেন ঃ

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ.

অর্থাৎ—ইউনুস (আ)ও ছিল রাসূলদের একজন। স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই নৌযানে পৌছল। তারপর সে লটারীতে যোগদান করল ও পরাভূত হল। পরে এক বিরাট মাছ তাকে গিলে ফেলল তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। (৩৭ সাফফাত ঃ ১৩৯-৪২)

লটারীতে ইউনুস (আ)-এর নাম উঠার ফলে তাকে নদীতে ফেলে দেয়া হল তখন আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে সবুজ সাগর থেকে একটি বিরাট মাছ প্রেরণ করেন যা তাঁকে গিলে ফেলে।

অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা মাছকে হুকুম দেন যেন সে তার অস্থি মাংস কিছু না খায়, কেননা এটা রিযিক নয়। তারপর মাছটি তাঁকে ধরে নিয়ে সমস্ত সাগরময় ঘুরে বেড়ায়। কেউ কেউ বলেন, এ মাছটিকে তার চাইতে বড় আকারের আরেকটি মাছ গিলে ফেলে। তাফসীরকারগণ বলেন, যখন তিনি মাছের পেটে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি নিজকে মৃত বলেই মনে করছিলেন। এবং তিনি নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়া দিয়ে এগুলো নড়ছে দেখে নিশ্চিত হন যে, তিনি জীবিত রয়েছেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদায় পড়লেন এবং বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমি এমন এক স্থানে আপনার দরবারে সিজদা করলাম, যেরূপ স্থানে এর আগে আর কেউই কোনদিন সিজদা করেনি।"

ইউনুস (আ)-এর মাছের পেটে অবস্থানের মেয়াদ নিয়ে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। মুজালিদ (র) আল্লামা শা'বী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দিনের প্রথম প্রহরে মাছ তাঁকে গিলেছিল আর শেষ প্রহরে বমি করে ডাঙ্গায় নিক্ষেপ করেছিল। কাতাদা (র) বলেন, 'তিনি মাছের পেটে তিনদিন অবস্থান করেছিলেন।' জাফর সাদিক (র) বলেন, 'সাত দিন তিনি মাছের পেটে অবস্থান করেছিলেন।' কবি উমাইয়া ইবন আবূ সালত এই অভিমতের অনুকূলে বলেন ঃ

وانت بفضل منك نجيت يونسا– وقد بات فى اضعاف حوت لياليا –

অর্থাৎ–'হে আল্লাহ! তুমি অনুগ্রহ করে ইউনুস (আ)-কে মুক্তি দিয়েছিলে। অথচ তিনি মাছের পেটে কয়েক রাত কাল যাপন করেছিলেন।' সাঈদ ইবন আবুল হাসান (র) ও আবূ মালিক (র) বলেন, ইউনুস (আ) মাছের পেটে ৪০ দিন অবস্থান করেছিলেন। তবে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন যে, কত সময় মাছের পেটে অবস্থান করেছিলেন। মোদ্দাকথা, যখন মাছটি তাকে নিয়ে সাগরের তলদেশে ভ্রমণ করছিল এবং উত্তাল তরঙ্গমালায় বিচরণ করছিল, তখন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশে নিবেদিত মৎস্যকুলের তাসবীহ শুনতে পেলেন এমনকি শস্য দানা ও আটির স্রষ্টা, সাত আসমান ও সাত যমীনের প্রতিপালক, এদের মধ্যে ও মাটির নিচে যা কিছু রয়েছে এদের প্রতিপালকের জন্যে নিবেদিত পাথরের তাসবীহও তিনি শুনতে পান। তখন তিনি মুখে ও তার অবস্থার দ্বারা যে আকৃতি জানান সে প্রসঙ্গে ইজ্জত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী, গোপন কথা ও রহস্য সম্বন্ধে অবগত; অভাব-অনটন ও মুসীবত থেকে উদ্ধারকারী, ক্ষীণতম শব্দও শ্রবণকারী, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গোপন সম্পর্কেও অবগত, বড় থেকে বড় বিষয়েও সম্যক জ্ঞাত আল্লাহ তা'আলা তাঁর আল-আমীন উপাধি লাভকারী রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ সুস্পষ্ট কিতাবে ইরশাদ করেন আর তিনিও তো সর্বাধিক সত্যভাষী বিশ্ব জগতের প্রতিপালক ঃ

وَذَا النُّوْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِى الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ–এবং স্মরণ কর যূননূন তথা মাছের অধিকারী ইউনুস (আ)-এর কথা, যখন সে ক্ষুব্ধ মনে বের হয়ে গিয়েছিল এবং ভেবেছিল আমি তার জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করব না। তারপর সে

অন্ধকার থেকে আহ্বান করেছিল, "তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; তুমি পবিত্র, মহান, আমি তো সীমালংঘনকারী।" তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে উদ্ধার করেছিলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৭-৮৮)

আয়াতাংশ فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ-এর অর্থ হচ্ছে, ইউনুস (আ) ভেবেছিলেন যে, আমি কখনও তার জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করব না। আবার কেউ কেউ বলেন نقدر শব্দটি تقدير থেকে নিষ্পন্ন। আর এই ব্যাখ্যাটি প্রসিদ্ধতর। একজন প্রসিদ্ধ কবি বলেন ঃ

فلا فلاعائد ذالك الزمان الذي مضى تباركت ما يقدر يكن فلك الامر.

অর্থাৎ—যে যুগ চলে গেছে তা আর কোন দিনও ফিরে আসবে না। তুমি বরকতময় তোমার জন্য যা নির্ধারিত তা-ই ঘটে থাকে। হুকুম তো তোমারই।

আয়াতাংশ فَنَادٰى فِى الظُّلُمَاتِ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) ও সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র প্রমুখ মুফাস্‌সির বলেন, আয়াতে উল্লেখিত ظُلُمَات দ্বারা মাছের পেটের অন্ধকার, সমুদ্রের অন্ধকার এবং রাতের অন্ধকারকে বুঝানো হয়েছে। সালিম ইবনে আবুল জাদ (র) বলেন, যে মাছটি ইউনুস (আ)-কে গিলে ফেলেছিল, অন্য একটি মাছ আবার ওটাকে গিলে ফেলে। তাই এই দুই ধরনের অন্ধকার যুক্ত হয়েছিল। তৃতীয় অন্ধকার অর্থাৎ সমুদ্রের অন্ধকারের সাথে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَوْلَا اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ لَلَبِثَ فِىْ بَطْنِهٖ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ .

অর্থাৎ–সে যদি আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত তাহলে তাকে পুনরুত্থিত দিবস পর্যন্ত তার পেটে থাকতে হত। (সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৪৩-১৪৪)

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে—সে যদি সেখানে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও তার মহিমা ঘোষণা না করত, অনুনয় বিনয় সহকারে আপন ক্রটি স্বীকার না করত, কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি ঝুঁকে না পড়ত তবে সে সেখানেই অর্থাৎ মাছের পেটে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত থাকত এবং মাছের পেট থেকেই তাকে পুনরুত্থিত করা হত। সাঈদ ইবনে জুবাইর (রা) হতে বর্ণিত দুইটি বর্ণনার একটি উপরোক্ত বর্ণনার মর্মার্থ প্রকাশ করে।

কেউ কেউ বলেন, আয়াতটির অর্থ হচ্ছে– মাছ তাঁকে গিলে ফেলার পূর্বে যদি তিনি আল্লাহ্ তা'আলার অধিক স্মরণকারী, মুসল্লী ও আনুগত্য স্বীকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতেন। উপরোক্ত তাফসীরের সমর্থকদের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা), সাঈদ ইবন জুবাইর (রা), যাহ্‌হাক, সুদ্দী, আতা ইবন সাঈর, হাসান বসরী (র) ও কাতাদা (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইবন জারীর (র)ও এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমদ (র) ও কোন কোন সুনান গ্রন্থের সংকলক কর্তৃক আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েতও এর প্রমাণ বহন করে। বর্ণনাটি হচ্ছে এই যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে সম্বোধন করে বলেন, হে বালক! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শেখাব। এগুলো তুমি সংরক্ষণ করবে। আল্লাহ তা'আলা তোমার হেফাজত করবেন। আল্লাহ্

তা'আলার হুকুমের প্রতি লক্ষ্য রাখলে আল্লাহ্ তা'আলাকে তোমার প্রতি সন্তুষ্ট পাবে। সচ্ছলতার সময় আল্লাহ্ তা'আলাকে চিনলে তোমার সংকটকালে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে চিনবেন।

ইবন জারীর তাবারী (র) তার তাফসীর গ্রন্থে এবং বায্যার (র) তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা মাছের পেটে ইউনুস (আ)-কে বন্দী করতে ইচ্ছে করলেন, তখন তিনি মাছকে নির্দেশ দিলেন যে, ইউনুস (আ)-কে ধর, তবে তার শরীর জখম করবে না এবং তার হাড়ও ভাঙবে না। মাছ যখন তাঁকে নিয়ে সাগরের তলদেশে চলে গেল ইউনুস (আ) তখন ছিলেন মাছের পেটে। আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং মনে মনে বলতে লাগলেন, একি ব্যাপার? আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, এগুলো হচ্ছে সাগরের প্রাণীদের তাসবীহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, মাছের পেটে অবস্থান কালেই তিনি তাসবীহ পড়তে লাগলেন। তখন ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! এই জনমানবহীন স্থানে আমরা একটি আওয়াজ শুন্তে পাচ্ছি। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন, এ আমার বান্দা ইউনুস (আ)। সে আমার নাফরমানী করেছে তাই আমি তাকে সাগরের মাছের পেটে কয়েদ করেছি। ফেরেশতারা বললেন, "তিনি কি ঐ সৎবান্দা নন, যার নেক আমল প্রতি দিনই আপনার দরবারে পৌছত?" আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ 'হ্যাঁ'।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাঁর জন্যে সুপারিশ করলেন। সুপারিশ মঞ্জুর করে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাগরের কিনারে ফেলে দেবার জন্যে মাছকে নির্দেশ দিলেন। সেই মতে মাছ তাঁকে সাগরের কিনারায় ফেলে চলে গেল। এই অবস্থার কথাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَهُوَ سَقِيْمٌ, অর্থাৎ সে ছিল রুগ্ন। (সূরা সাফ্ফাত ঃ ১৪৩)

এটা হলো ইব্ন জারীর (র)-এর ভাষ্য। বায্যার (র) বলেন, এ সনদ ছাড়া আর কোন সনদে এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। ইব্ন হাতীম (র) তাঁর তাফসীরে বলেন, আনাস ইব্নে মালিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, ইউনুস (আ) মাছের পেটে অবস্থানরত অবস্থায় নিম্ন বর্ণিত শব্দমালার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করেন ঃ اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

অর্থাৎ–হে আল্লাহ! তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৭)

এই দু'আর গুনগুন আওয়াজ আল্লাহ তা'আলার আরশে পৌছলে ফেরেশতাগণ বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! জনমানবহীন ভূমি থেকে যে ক্ষীণ আওয়াজ আসছে তা যেন পরিচিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তোমরা কি এ শব্দ চেন না? তারা বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তিনি কে? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, আমার বান্দা ইউনুস। তাঁরা বললেন, আপনার বান্দা সেই ইউনুস (আ) যাঁর আমল সব সময়ই গ্রহণীয়রূপে আপনার দরবারে উত্থিত হতো? তারা আরো বললেন, হে আমাদের প্রতিপালক! তিনি স্বাচ্ছন্দ্যের সময় যে আমল করতেন এর বিনিময়ে আপনি কি দুঃখের সময় তাঁর প্রতি সদয় হবেন না? এবং সংকট থেকে তাঁকে উদ্ধার করবেন না? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ হ্যাঁ। তখন মাছকে তিনি নির্দেশ দিলেন। তখন মাছ তাকে এক

তৃণহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ করল। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে অতিরিক্তি বর্ণনায় রয়েছে, সেখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জন্যে একটি লাউ গাছ জন্মালেন এবং তাঁর জন্যে একটি পোকামাকড় ভোজী বন্য ছাগলের ব্যবস্থা করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, প্রাণীটি তাঁর জন্যে গা এলিয়ে দিত এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে তৃপ্ত করে দুধ পান করাতো যাবৎ না সেখানে ঘাসপাতা গজিয়ে ওঠে। **প্রসিদ্ধ কবি উমাইয়া ইবন আবূ সালত এ সম্পর্কে একটি কবিতা বলেন ঃ**

فانبت يقطينا عليه برحمة - من الله لو لا الله اصبح ضاويا.

অর্থাৎ–আল্লাহ্ তা'আলা দয়াপরবশ হয়ে তাঁর জন্যে একটি লাউগাছ জন্মালেন; নচেৎ তিনি দুর্বলই থেকে যেতেন।

বর্ণনাটি গরীব পর্যায়ের। তবে পূর্বোক্ত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসের দ্বারা এটি সমর্থিত। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَاَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِيْنٍ.

অর্থাৎ–অতঃপর ইউনুস (আ)-কে আমি নিক্ষেপ করলাম এক তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল রুগ্ন। পরে আমি তার উপর একটি লাউগাছ উদ্গত করলাম। (সূরা সাফফাত ঃ ১৪৫-১৪৬)

আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) বলেন سَقِيْمٌ –এর অর্থ হচ্ছে দুর্বলদেহী যেন পাখির ছানা যার পালক গজায়নি। ইব্ন আব্বাস (রা), সুদ্দী এবং ইব্ন যায়েদ (র) سَقِيْمٌ-এর ব্যাখ্যায় বলেন– যেন সদ্য প্রসূত নেতিয়ে পড়ে থাকা গুঁই সাপের বাচ্চা।

আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসঊদ (রা) ও ইবন আব্বাস (রা), ইকরিমা, মুজাহিদ (র) সাঈদ ইবন জুবায়ের (র) প্রমুখ মুফাস্সিরের মতে, يَقْطِيْنٌ -এর অর্থ লাউ গাছ।

উলামায়ে কিরামের কেউ কেউ বলেন, লাউগাছ উদগত করার মধ্যে প্রচুর হিকমত রয়েছে। যেমন লাউ গাছের পাতা খুবই কোমল, সংখ্যায় বেশি, ছায়াদার, মাছি তার নিকটে যায় না, তার ফল ধরার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তা খাওয়া যায়, কাঁচা ও রান্না করে খাওয়া যায়, বাকল ছাড়া ও বাকলসহ এবং বীচিও খাওয়া যায়। তার মধ্যে অনেক উপকারিতাও রয়েছে। এটা মস্তিষ্কের শক্তি বর্ধক এবং তাতে অন্য অনেক গুণাগুণ রয়েছে। আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা পূর্বেই বিবৃত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে একটি বন্য ছাগলের ন্যায় প্রাণীকে নিয়োজিত রেখেছিলেন যা তাকে তার দুধ খাওয়াত, মাঠে চরত এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর কাছে আসত। এটা তাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার রহমত, নিয়ামত ও অনুগ্রহ রূপে গণ্য।

এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ–"তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে উদ্ধার করলাম দুশ্চিন্তা থেকে ।" অর্থাৎ যে সংকটে তিনি পতিত হয়েছিলেন তা থেকে। এভাবেই আমি মু'মিনদের উদ্ধার করে

থাকি। অর্থাৎ যারা আমার কাছে ফরিয়াদ করে ও আশ্রয় প্রার্থনা করে তাদের প্রতি এ-ই আমার চিরাচরিত রীতি।

ইবন জারীর (র) আবূ ওক্কাসের পৌত্র সাদ ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, 'ইউনুস (আ) ইবন মাত্তার দু'আয় ব্যবহৃত আল্লাহ্ তা'আলার নাম নিয়ে দু'আ করা হলে তিনি তাতে সাড়া দেন এবং কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দান করেন।' বর্ণনাকারী বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা)! এটা কি শুধু ইউনুস (আ)-এর জন্যে খাস ছিল, না কি সকল মুসলমানের জন্যেও?' উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ এটা ইউনুস (আ)-এর জন্যে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্যে- যদি তারা এ দু'আ করে। তুমি কি আল্লাহর বাণী লক্ষ্য করনি। যাতে তিনি বলেছেন ঃ

فَنَادٰى فِى الظُّلُمَاتِ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ .

কাজেই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবে তার জন্যে শর্ত হচ্ছে ইউনুস (আ) যে দু'আ করেছেন সে দু'আ করা। অন্য এক সূত্রে সাদ ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ইউনুস (আ)-এর দু'আর শব্দ মালায় দু'আ করে তার দু'আ কবূল করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এ হাদীসের দ্বারা وكذالك ننجى المؤمنين -এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি সাদ ইবন মালিক (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন আমি উসমান ইবন আফ্ফান (রা)-এর সাথে মসজিদে দেখা করলাম এবং তাঁকে আমি সালাম দিলাম। তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট মনে হল কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। আমি উমর (রা)-এর নিকট গেলাম এবং বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! সালামের সম্বন্ধে কি কিছু ঘটে গেছে? তিনি বললেন 'না' তবে ব্যাপার কি? আমি বল্লাম কিছুই নয় তবে আমি উসমান (রা)-এর সাথে এই মাত্র মসজিদে দেখা করলাম, তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট মনে হল কিন্তু আমার সালামের উত্তর দেননি। বর্ণনাকারী বলেন, উমর (রা) উসমান (রা)-এর নিকট একজন লোক পাঠালেন এবং তাঁকে ডাকলেন, অতঃপর তিনি বললেন- তুমি আমার ভাইয়ের সালামের উত্তর কেন দিলে না? উসমান (রা) বললেন, 'না' আমি এরূপ কাজ করিনি। সাদ (রা) বল্লেন, না তিনি এরূপ করেছেন। এতে দু'জনই শপথ করে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, পরে যখন উসমান (রা)-এর স্মরণ হয় তখন তিনি বললেন- হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহর কাছে আমি তওবা করছি। তুমি আমার সাথে এই মাত্র দেখা করেছিলে কিন্তু আমি মনে মনে এমন একটি কথা নিয়ে নিজে চিন্তামগ্ন ছিলাম যা আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শুনেছি। আল্লাহ্র কসম! যখনই আমি এটা স্মরণ করি তখনই এটা যেন আমার চোখ, মুখ ও অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সাদ (রা) বললেন, আমি আপনাকে একটি হাদীস সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছি, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন আমাদের সামনে উত্তম দু'আ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন এমন সময় এক বেদুঈন আসল এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অন্যদিকে নিবিষ্ট করে

ফেললো। রাসূলুল্লাহ (সা) উঠে দাঁড়ালেন, আমিও রাসূল (সা)-এর অনুসরণ করলাম। যখন আমার আশঙ্কা হলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমি পৌঁছে যাওয়ার পূর্বে, তিনি আপন ঘরে পৌঁছে যাবেন, তখন আমি মাটিতে জোরে পা দিয়ে আঘাত করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং বললেন, কে হে? আবূ ইসহাক নাকি? জবাবে আমি বললাম, হ্যাঁ, আমিই হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! তিনি বললেন, কি জন্য এই আওয়াজ? বললাম, মারাত্মক কিছুই না, আল্লাহ্র শপথ! আপনি আমাদের কাছে উত্তম দু'আ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। ইতিমধ্যে বেদুঈনটি আসল ও আপনার কথায় ব্যাঘাত ঘটাল।

তিনি বললেন হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মৎস্য-সহচরের মাছের পেটে অবস্থানকালীন দু'আ। দু'আটি হচ্ছে ঃ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

যখনই কোন মুসলিম কোন বিষয়ে আপন প্রতিপালকের কাছে কখনও এই দু'আ করে তখনই তা কবূল করা হয়। এ হাদীসটি ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ ইবন সাদ সূত্রে তিরমিযী ও নাসাঈ (র) বর্ণনা করেছেন।

ইউনুস (আ)-এর মর্যাদা

সূরায়ে সাফ্ফাতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন إِنَّ يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ—নিশ্চয় ইউনুস ছিল রাসূলদের একজন (৩৭ সাফ্ফাত ঃ ১৩৯)

অনুরূপভাবে সূরায়ে নিসা ও আনআমে তাঁকে আম্বিয়ায়ে কিরামের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁদের উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ননা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

ولا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى.

অর্থাৎ–কারো একথা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস (আ) ইবন মাত্তা থেকে উত্তম।

ইমাম বুখারী (র) সুফিয়ান আছ ছাত্তরী (র) ও ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

وما ينبغي لعبد ان يقول انى خير من يونس بن متى ونسبه الى ابيه.

অর্থাৎ–'কারো একথা বলা উচিত নয় যে, আমি ইউনুস (আ) ইবন মাত্তা থেকে উত্তম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ বাক্যে ইউনুস (আ)-কে তাঁর পিতার দিকে সম্পর্কিত করেছেন।' ইমাম মুসলিম (র) ও আবূ দাউদ (র) অন্য এক সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইমাম আহমদ (র) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

وما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى

তাবারানীর বর্ণনায় عند الله শব্দটি অতিরিক্ত রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট উত্তম। বর্ণনাটির সনদ ত্রুটিমুক্ত।

ইমাম বুখারী (র) ও মুসলিম (র)... আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

لا ينبغى لعبد ان يقول انا خير من يونس بن متى.

ইমাম বুখারী (র) ও মুসলিম (র) অন্য এক সূত্রে সারা জাহানের উপর মূসা (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করায় জনৈক ইহুদীর জনৈক মুসলমান কর্তৃক প্রহৃত হবার ঘটনা আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তবে ইমাম বুখারী (র) হাদীসের শেষাংশে বলেন ঃ

ولا اقول ان احدا خير من يونس بن متى

অর্থাৎ— কেউ যেন ইউনুস (আ) থেকে নিজেকে উত্তম বলে মনে না করে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ لا ينبغى لاحد ان يفضلنى على يونس بن متى.

অর্থাৎ— আমাকে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে) ইউনুস (আ) ইবন মাত্তা থেকে উত্তম মনে করা সমীচীন নয়।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

لا تفضلونى على الانبياء ولا على يونس من متى

অর্থাৎ—'আমাকে অন্যান্য নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না, ইউনুস (আ)-এর উপরও নয়।'

এটা অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) বিনয় প্রকাশের জন্যে বলেছেন। আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর প্রতি ও অন্যান্য নবী-রাসূলের প্রতি বর্ষিত হোক!

মূসা কালীমুল্লাহ্ (আ)-এর বিবরণ

তিনি হচ্ছেন মূসা ইবন ইমরান ইবন কাহিছ ইবন আযির ইবন লাওয়ী ইবন ইয়াকূব ইবন ইসহাক ইবন ইবরাহীম (আ)।

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল করীমের বিভিন্ন জায়গায় সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে মূসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর বর্ণনাকালে তাফসীরের কিতাবে আমি তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এখানে মূসা (আ)-এর ঘটনার আদ্যোপান্ত কিতাব ও সুন্নতের আলোকে আমি বর্ণনা করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ্। ইসরাঈলী বর্ণনাসমূহ থেকে এ সম্পর্কে যে সব বর্ণনা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং আমাদের পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামও এগুলো বর্ণনা করেছেন তা এখানে পেশ করব।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا -

অর্থাৎ–স্মরণ কর, এ কিতাবে উল্লেখিত মূসার কথা, সে ছিল বিশুদ্ধচিত্ত এবং সে ছিল রাসূল ও নবী। তাকে আমি অহ্বান করেছিলাম তুর পর্বতের দক্ষিণ দিক হতে এবং আমি অন্তরংগ আলাপে তাকে নৈকট্যদান করেছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারুনকে নবীরূপে। (সূরা মরিয়ম ঃ ৫২)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

طسم. تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ -

অর্থাৎ–ত্বাসীন মীম; এই আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি তোমার নিকট মূসা ও ফিরআউনের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি মুমিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশে। ফিরআউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীবৃন্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল। ওদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্বদান করতে ও উত্তরাধিকারী করতে এবং তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে। ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা ওদের নিকট তারা আশঙ্কা করতো। (সূরা কাসাস ঃ ১-৬)

সুরায়ে মরিয়মে মূসা (আ)-এর ঘটনা সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করে সূরায়ে কাসাসে কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। এখানে মূসা (আ) ও ফিরআউনের ঘটনা যথাযথভাবে বর্ণনা করেছেন যেন এর শ্রোতা ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী। ফিরআউন দেশে (মিসরে) পরাক্রমশালী হয়েছিল; স্বৈরাচারী হয়েছিল এবং নাফরমান ও বিদ্রোহী হয়েছিল, পার্থিব জগতকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল; মহা পরাক্রমশালী প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, সেখানকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিল। আবার তাদের মধ্য থেকে একশ্রেণী (বনী ইসরাঈল)-কে হীনবল করেছিল; তারা ছিলেন বনী ইসরাঈলের একটি দল এবং এঁরা ছিলেন আল্লাহ্র নবী ইয়াকূব ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ)-এর বংশধর। সেই যামানায় তাঁরাই ছিলেন পৃথিবীর সর্বোত্তম অধিবাসী। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর এমন এক বাদশাহ্কে আধিপত্য দান করেছিলেন যে ছিল জালিম, অত্যাচারী, কাফির ও দুশ্চরিত্র। সে তাদেরকে তার দাসত্ব ও সেবায় নিয়োজিত রাখতো এবং তাদেরকে নিকৃষ্টতম কাজকর্ম ও পেশায় নিয়োজিত থাকতে বাধ্য করত। উপরন্তু সে তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। সে ছিল একজন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। তার এই অমানবিক কর্মকাণ্ডের পটভূমি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

বনী ইসরাঈলগণ ইবরাহীম (আ) হতে প্রাপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন। যে বংশধর থেকে এমন এক যুবকের আবির্ভাব ঘটবে যার হাতে মিসরের বাদশাহ্ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। আর এটা এজন্য যে, মিসরের তৎকালীন বাদশাহ্ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী হযরত সারাহ্-এর সম্ভ্রম নষ্ট করতে মনস্থ করেছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সম্ভ্রম রক্ষা করেন। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

এ সুসংবাদটি বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিবতীরা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করত। ধীরে ধীরে তা ফিরআউনের কানে যায়। সুতরাং তার কোন পরামর্শদাতা কিংবা পারিষদ রাত্রিকালীন গল্পচ্ছলে এ প্রসঙ্গটি তুলে। তখন বাদশাহ বনী ইসরাঈলের পুত্রগণকে হত্যার নির্দেশ দিল। কিন্তু ভাগ্যের লিখন কে খণ্ডাতে পারে?

সুদ্দী (র) ইবন আব্বাস, ইবন মাসঊদ (রা) ও প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণনা করেন, একদিন ফিরআউন স্বপ্নে দেখল, যেন একটি অগ্নিশিখা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে এসে মিসরের বাড়ি-ঘর ও কিবতীদের সকলকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিল, কিন্তু মিসরে বসবাসরত বনী

ইসরাঈলের কোন ক্ষতি করল না। ফিরআউন জেগে উঠে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। জ্যোতিষী ও জাদুকরদেরকে সমবেত করল এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল। তারা তখন বলল, এই যুবক বনী ইসরাঈল বংশে জন্মগ্রহণ করবে এবং তারই হাতে মিসরবাসী ধ্বংস হবে। এ কারণেই ফিরআউন বনী ইসরাঈলের পুত্রগণকে হত্যা করতে এবং নারীদের জীবিত রাখতে নির্দেশ দিল। এই জন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে; এবং তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে, আর ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে, যা এদের নিকট তারা আশঙ্কা করত।

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে হীনবল করা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতি হচ্ছে যে, তিনি শিগগিরই হীনবলকে শক্তিশালী করবেন, পরাভূতকে বিজয়ী করবেন এবং অবনমিতকে শক্তিমান করবেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সবকিছুই বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْٓ إِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا.

অর্থাৎ–যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হত তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বনী ইসরাঈল সমন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হল যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। (সূরা আরাফ ঃ ১৩৭)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنَّاتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ. وَنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ. كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ.

অর্থ্যাৎ–তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস উপকরণ, যা তাদের আনন্দ দিত এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। (সূরা দুখান ঃ ২৫) অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে। এ সম্বন্ধে অন্যত্র আরো বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

মোটকথা, ফিরআউন সম্ভাব্য সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করল যাতে মূসা (আ) দুনিয়াতে না আসতে পারে। সে এমন কিছু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীকে নিযুক্ত করল যাতে তারা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে গর্ভবতী নারীদের সন্ধান করে ও তাদের প্রসবের নির্ধারিত সময় সম্বন্ধে অবগত হয়। আর যখনই কোন গর্ভবতী নারী পুত্র সন্তান প্রসব করত, তখনই এসব হত্যাকারী তাদেরকে হত্যা করে ফেলত।

কিতাবীদের ভাষ্য হচ্ছে এই যে, ফিরআউন পুত্র-সন্তানদেরকে এ উদ্দেশ্যে হত্যা করার হুকুম দিত যাতে বনী ইসরাঈলের শান-শওকত হ্রাস পেয়ে যায়।

সুতরাং কিবতীরা যখন তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে প্রয়াস পাবে কিংবা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে তখন তারা তা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হবে না।

এ ভাষ্যটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তাদের পুত্র-সন্তানদের এরূপ হত্যা করার হুকুম দেয়া হয়েছিল মূসা (আ)-এর নবুওতপ্রাপ্তির পর, জন্মলগ্নে নয়।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ .

অর্থাৎ-তারপর মূসা আমার নিকট হতে সত্য নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হলে তারা বলল, মূসার প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। (সূরা মুমিন ঃ ২৫) আর এজন্যেই বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-কে বলেছিল ঃ – قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا

অর্থাৎ-আমাদের নিকট তোমার আসার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও। (সূরা আ'রাফ ঃ ১২৯)

সুতরাং বিশুদ্ধ অভিমত হচ্ছে এই যে, মূসা (আ) -এর দুনিয়ায় আগমন ঠেকাবার জন্যেই ফিরআউন বনী ইসরাঈলের পুত্র-সন্তানদের প্রথমে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিল। তাকদীর যেন বলছিল, হে বিপুল সেনাবাহিনীর অধিকারী! পরম ক্ষমতা ও রাজত্বের অধিপতি বিধায় অহংকারী পরাক্রমশালী সম্রাট! ঐ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অপ্রতিহত এবং অবিচল মহাশক্তির অধিকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, যেই সন্তানটি থেকে পরিত্রাণের আশায়, অগণিত, অসংখ্য নিষ্পাপ পুত্র-সন্তান তুমি হত্যা করছ সেই সন্তান তোমার ঘরেই প্রতিপালিত হবে, তোমার ঘরেই সে লালিত-পালিত হবে, তোমার ঘরেই তোমার খাদ্য খেয়ে ও পানীয় পান করে বড় হয়ে উঠবে, তুমিই তাকে পালক-পুত্র হিসেবে গ্রহণ করবে ও তাকে লালন করবে অথচ তুমি এ রহস্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হবে না। অবশেষে তার হাতেই তোমার দুনিয়া ও আখিরাত সর্বস্ব বিনাশ হয়ে যাবে। কারণ সে যা কিছু প্রকাশ্য সত্য নিয়ে আসবে তুমি তার বিরোধিতা করবে, এবং তার কাছে যে ওহী নাযিল হবে, তুমি তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে– এটা এজন্য যাতে তুমি এবং গোটা জগদ্বাসী জানতে পারে যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা আঞ্জাম দিয়ে থাকেন, তিনিই মহাপরাক্রমশালী একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী ও তাঁর শক্তি ও ইচ্ছাকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না।

একাধিক তাফসীরকার এরূপ বর্ণনা করেছেন– কিবতীরা ফিরআউনের কাছে এমর্মে অভিযোগ করে যে, বনী ইসরাঈলের পুত্র-সন্তান হত্যা করার কারণে তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে এবং তারা আশঙ্কা করতে বাধ্য হচ্ছে যে, ছোটদেরকে হত্যা করার কারণে বড়দের সংখ্যাও ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকবে। ফলে কিবতীদেরকে ঐ সব নিকৃষ্ট কাজ করতে হবে যেগুলো বনী ইসরাঈল করতে বাধ্য ছিল। এরূপ অভিযোগ ফিরআউনের কাছে পৌঁছার পর ফিরআউন এক বছর পর পর পুত্র-সন্তানদের হত্যা করতে নির্দেশ দিল। তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেন, যে বছর পুত্র-সন্তানদের হত্যা না করার কথা সেই বছর হারূন (আ) জন্মগ্রহণ করেন। অন্যদিকে যে বছরে পুত্র-সন্তানদের হত্যা করার কথা সে বছরে মূসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন।

সুতরাং মূসা (আ)-এর আম্মা মূসা (আ)-কে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাই তিনি গর্ভবতী হওয়ার প্রথম দিন থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে লাগলেন এবং গর্ভের কথা প্রকাশ হতে দিলেন না। যখন তিনি সন্তান প্রসব করলেন, একটি সিন্দুক তৈরি করার জন্যে তাঁকে সংগোপনে নির্দেশ প্রদান করা হল। তিনি সিন্দুকটিকে একটি রশি দিয়ে বেঁধে রাখলেন। তাঁর বাড়ি ছিল নীলনদের তীরে। তিনি তাঁর সন্তানকে দুধ পান করাতেন এবং যখনই কারো আগমনের আশংকা করতেন তাকে সিন্দুকে রেখে সিন্দুক সমেত তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিতেন। আর রশির এক প্রান্ত তিনি নিজে ধরে রাখতেন। যখন শত্রুরা চলে যেত তখন তিনি তাকে টেনে নিজের কাছে নিয়ে আসতেন। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهِ. فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ. اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ. فَالْتَقَطَهٗ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا. اِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خَاطِئِيْنَ. وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّىْ وَلَكَ. لَا تَقْتُلُوْهُ عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ -

অর্থাৎ—মূসার মায়ের অন্তরে আমি ইংগিতে নির্দেশ করলাম, "শিশুটিকে বুকের দুধ পান করাতে থাক।" যখন তুমি তার সম্পর্কে কোন আশংকা করবে, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করবে এবং ভয় করবে না, দুঃখও করবে না। আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলদের একজন করব। অবশেষে ফিরআউনের লোকজন তাকে উঠিয়ে নিল। এর পরিণাম তো এই ছিল যে, সে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবে। ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনী ছিল অপরাধী। ফিরআউনের স্ত্রী বলল, এই শিশু আমার ও তোমার নয়ন প্রীতিকর। একে হত্যা করবে না, সে আমাদের উপকারে আসতে পারে। আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি। প্রকৃতপক্ষে তারা এর পরিণাম বুঝতে পারেনি। (সূরা কাসাস ঃ ৭-৯)

মূসার মায়ের কাছে যে ওহী পাঠানো হয়েছিল, তা ছিল ইলহাম ও নির্দেশনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِىْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ. ثُمَّ كُلِىْ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسْلُكِىْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا -

অর্থাৎ-তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে তার অন্তরে ইংগিতে নির্দেশ দিয়েছেন, ঘর তৈরি কর পাহাড়ে, গাছপালায় ও মানুষ যে ঘর তৈরি করে তাতে। এরপর প্রত্যেক ফল থেকে কিছু কিছু আহার কর এবং তোমার প্রতিপালকের সহজপথ অনুসরণ কর। (সূরা নাহল ঃ ৬৮)

এ ওহী নবুওতের ওহী নয়। ইব্‌ন হাযম (র) ও ইল্‌ম আকাইদ বিশারদগণের অনেকেই এটাকে মনে করেন, কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত হল প্রথম অভিমতটিই। আর এটিই আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মত বলে আবুল হাসান আল আশ'আরী (র) বর্ণনা করেছেন।

সুহায়লী বলেছেন, মূসা (আ)-এর মায়ের নাম ছিল আয়ারেখা। আবার কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম ছিল আয়াযাখ্ত। মোদ্দাকথা হল, উপরোক্ত কাজের দিকনির্দেশনা তাঁর অন্তরে দেয়া হয়েছিল। তাঁর অন্তরে ইলহাম করা হয়েছিল যে, তুমি ভয় করো না এবং দুঃখিত হয়ো না। কেননা, যদিও সন্তানটি তার হাতছাড়া হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা তা শিগগিরই ফেরত দেবেন। আর আল্লাহ তাঁকে অচিরেই রাসূল হিসেবে মনোনীত করবেন। তিনি আল্লাহ' তা'আলার কিতাবকে দুনিয়া এবং আখিরাতে সমুন্নত করবেন। অতএব, মূসা (আ)-এর মা তাই করলেন যেভাবে তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন। একদিন তিনি তাকে ছেড়ে ছিলেন কিন্তু রশির প্রান্ত নিজের কাছে আটকে রাখতে ভুলে গেলেন। মূসা (আ) নীলনদের স্রোতে ভেসে গেলেন। তারপর ফিরআউনের বাড়ির ঘাটে গিয়ে পৌঁছলেন। ফিরআউনের লোকজন তাকে উঠিয়ে নিল। এটার পরিণাম তো এই ছিল যে, তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হবেন।

কেউ কেউ বলেন, لِيَكُوْنَ এর মধ্যে لام অক্ষরটি পরিণাম জ্ঞাপক। এটি আয়াতাংশের فَالْتَقَطَهُ এর সাথে সম্পৃক্ত হলে এ অর্থই স্পষ্ট। কিন্তু যদি বাক্যের মর্মার্থের সাথে তা সংযুক্ত হয়ে থাকে তাহলে لام -কে অন্যান্য لام -এর ন্যায় কারণ নির্দেশক বলে মনে করতে হবে। তাতে বাক্যের মর্ম দাঁড়াবে ফিরআউনের লোকজন তাকে উঠিয়ে নেবার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যাতে সে তাদের শত্রু কিংবা দুঃখের কারণ হবে। এ সম্ভাবনাটির সমর্থন মিলছে আয়াতে উল্লেখিত— إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوا خَاطِئِيْنَ. আয়াতাংশ থেকে।

অর্থাৎ–ফিরআউন তার দুষ্ট উযীর হামান এবং তাদের অনুচররা ভ্রান্তির মধ্যে ছিল, তাই তারা এই শাস্তি ও হতাশার যোগ্য হয়ে পড়ে।

তাফসীরকারগণ আরো উল্লেখ করেন যে, দাসীরা তাকে একটি বন্ধ সিন্দুকে দরিয়া থেকে উদ্ধার করে কিন্তু তারা তা খুলতে সাহস পায়নি। তারা ফিরআউনের স্ত্রী আসিযা (রা) বিনতে মুযাহিস ইবন আসাদ ইব্ন আর-রাইয়ান ইবনুল ওলীদ-এর সামনে বন্ধ সিন্দুকটি রাখল।

এই ওলীদই ছিল ইউসুফ (আ)-এর যুগে মিসরের ফিরআউন। তৎকালীন মিসরের অধিপতিদের উপাধি ছিল ফিরআউন। আবার কেউ কেউ বলেন, আসিয়া ছিলেন বনী ইসরাঈল বংশীয় এবং মূসা (আ)-এর গোত্রের মহিলা। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন মূসা (আ)-এর ফুফু। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সুহায়লীও এরূপ বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

মারয়াম (রা) বিনতে ইমরানের ঘটনায় আসিয়া (রা)-এর গুণাবলী ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। কিয়ামতের দিন বেহেশতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীদের সাথে তাঁরা দুইজনও অন্তর্ভুক্ত হলেন।

আসিয়া যখন সিন্দুকটির দরজা খুললেন ও পর্দা হটালেন তখন দেখলেন মূসা (আ)-এর চেহারা নবুওতের উজ্জ্বল নূরে ঝলমল করছে। মূসা (আ)-কে দেখামাত্র আসিয়ার হৃদয়মন তার প্রতি স্নেহমমতায় ভরে উঠল। ফিরআউন আসার পর জিজ্ঞাসা করল, 'ছেলেটি কে?' এবং সে তাকে যবেহ করার নির্দেশ দিল। কিন্তু আসিয়া ফিরআউনের কাছ থেকে তাঁকে চেয়ে নিলেন এবং এভাবে তাঁকে ফিরআউনের কবল থেকে রক্ষা করলেন। আসিয়া বললেন ঃ قُرَّةُ عَيْنٍ

لِّیْ وَلَكَ- অর্থাৎ এই শিশুটি তোমার ও আমার চোখ জুড়াবে। ফিরআউন বলল, এটা তোমার জন্যে হতে পারে, কিন্তু আমার জন্যে নয়। একে দিয়ে আমার কোনই প্রয়োজন নেই। কথা বাড়ালে বিপত্তিই বাড়ে। আসিয়া বলেছিলেন ঃ عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَا অর্থাৎ—"সে আমাদের উপকারে আসতে পারে।" আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সে আশা পূর্ণ করেছিলেন। দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মূসা (আ)-এর দ্বারা হিদায়াত দান করেছেন এবং আখিরাতে তাঁকে মূসা (আ)-এর কারণে স্বীয় জান্নাতে স্থান দেবেন। আবার তিনি বলেছিলেন ঃ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا অর্থাৎ—"আমরা তাকে সন্তান হিসেবেও গ্রহণ করতে পারি।" তারা তাঁকে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন; কেননা তাদের কোন সন্তান ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ অর্থাৎ তারা জানে না যে, তাকে সিন্দুক থেকে উঠিয়ে নেওয়ার জন্যে ফিরআউন পরিবারকে নিযুক্ত করে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউন ও তার সৈন্যদের প্রতি কিরূপ মহা আযাব অবতীর্ণ করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তী আয়াতে ঘটনার পরবর্তী অংশ বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاَصْبَحَ فُؤَادُ اُمِّ مُوْسٰى فَارِغًا. اِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ لَوْلَا اَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَقَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّيْهِ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نَاصِحُوْنَ. فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ—মূসার মায়ের হৃদয় অস্থির হয়ে পড়েছিল, যাতে সে আস্থাশীল হয় তজ্জন্য আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় তো প্রকাশ করেই দিত। সে মূসার বোনকে বলল, এর পিছনে ফিছনে যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে দূর হতে তাকে দেখছিল। পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীর দুধপানে তাকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার বোন বলল, "তোমাদের কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব, যারা তোমাদের হয়ে তাকে লালন-পালন করবে এবং তার মঙ্গলকামী হবে।" তারপর আমি তাকে ফেরত পাঠালাম তার মায়ের নিকট যাতে তার চোখ জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। (সূরা কাসাস ঃ ১০-১৩)

আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র), ইকরামা (র), সায়ীদ ইবন জুবাইর (রা) প্রমুখ বলেন, "মূসা (আ)-এর মায়ের অন্তর দুনিয়ার অন্যান্য চিন্তা ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র মূসা (আ)-কে নিয়ে চিন্তায় অস্থির ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাঁকে ধৈর্য দান না করতেন ও তাঁর হৃদয়ে দৃঢ়তা দান না করতেন তাহলে ব্যাপারটি তিনি প্রকাশ করে দিতেন এবং অন্যের কাছে প্রকাশ্যে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে ফেলতেন। তিনি তাঁর বড় মেয়ে, মূসা (আ)-এর বোনকে তার পেছনে পেছনে গিয়ে খবরাখবর নেয়ার জন্যে পাঠালেন। মুজাহিদ (র) বলেন, সে দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল। আর কাতাদা (র) বলেন, তিনি এমনভাবে তাঁর প্রতি লক্ষ্য করছিলেন যেন এ ব্যাপারে তাঁর কোন আগ্রহ নেই। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ 'তারা তা বুঝতে পারছিল না।' ঘটনা হল এই, যখন ফিরআউনের ঘরে মূসা (আ)-এর থাকা সাব্যস্ত হলো তখন ফিরআউনের লোকজন তাকে দুধ পান করাবার চেষ্টা করল কিন্তু তিনি কারো বুকের দুধ গ্রহণ করলেন না বা অন্য কোন খাদ্যও গ্রহণ করলেন না। তারা তাঁর ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল এবং তাঁকে যে প্রকারেই হোক না কেন তারা যে কোন খাদ্য খাওয়াতে চেষ্টা করল কিন্তু তারা তাতে ব্যর্থ হল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "পূর্ব থেকেই আমি অন্যের বুকের দুধ গ্রহণ থেকে তাকে বিরত রেখেছিলাম।" তারা তাঁকে ধাত্রী ও অন্যান্য নারীসমেত বাজারে পাঠালো যাতে তারা এমন লোক খুঁজে বের করতে পারে, যে তাকে দুধ পান করাতে সক্ষম হয়। তারা তাঁকে নিয়ে ছিল ব্যস্ত এবং বাজারের লোকজনও তাদের দিকে লক্ষ্য করে রয়েছে– এমন সময় মূসা (আ)-এর বোন মূসা (আ)-এর দিকে তাকালেন কিন্তু তিনি তাঁকে চিনেন বলে পরিচয় প্রকাশ করলেন না, বরং বললেন ঃ

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَهْلِ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَهُمْ لَهٗ نَاصِحُوْنَ.

অর্থাৎ— তোমাদের কি আমি এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব, যারা তোমাদের হয়ে তাকে লালন-পালন করবে এবং তার মঙ্গলকামী হবে ?

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, "মূসা (আ)-এর বোন যখন তাদেরকে এরূপ বললেন তখন তারা তাকে বলল, তুমি কেমন করে জান যে, তারা তার মঙ্গলকামী ও তার প্রতি মেহেরবান হবে? তিনি বললেন ঃ বাদশাহর বেগমের ছেলের উপকার সাধনে সকলেই আগ্রহী। তখন তারা তাকে ছেড়ে দিল এবং তার সাথে তারা তাদের বাড়িতে গেল। তখন মূসা (আ)-এর মা মূসা (আ)-কে কোলে তুলে নিলেন ও তাঁকে নিজ বুকের দুধ খেতে দিলেন। মূসা (আ) মায়ের স্তন মুখে নিলেন, চুষতে আরম্ভ করলেন এবং দুধ পান করতে লাগলেন। এতে তারা সকলে অতীব খুশি হল। এক ব্যক্তি এ সুসংবাদ আসিয়াকে গিয়ে জানাল। তিনি মূসা (আ)-এর মাকে তাঁর নিজ মহলে ডেকে পাঠালেন এবং সেখানে অবস্থান করে তাঁকে উপকৃত করতে আসিয়া (রা) আহ্বান জানালেন। কিন্তু মূসা (আ)-এর মা তাতে রাযী হলেন না বরং বললেন, আমার স্বামী ও ছেলে-মেয়ে রয়েছে তাই আমি তাদেরকে ছেড়ে মহলে থাকতে পারি না, তবে আপনি যদি তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দেন তাহলে আমি তাকে দুধ পান করাতে পারি। তখন আসিয়া মূসা (আ)-কে তাঁর মায়ের সাথে যেতে দিলেন। তিনি তাঁর জন্যে বহু মূল্যবান উপঢৌকন দিলেন ও তাঁর খোরপোশের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন। মূসার মা মূসা (আ)-কে নিয়ে নিজ ঘরে ফিরে গেলেন এবং এভাবে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় মা-ছেলের মিলন ঘটালেন। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى اُمِّهٖ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ.

আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম। যাতে তার চোখ জুড়ায়, সে দুঃখ না করে এবং বুঝতে পারে যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য।

মূসা-জননীর কাছে মূসা (আ)-কে ফেরত প্রদানের মাধ্যমে একটি প্রতিশ্রুতি এভাবে পূর্ণ হল। আর এটাই নবুওতের সুসংবাদের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ—'তাদের অধিকাংশই এটা

জানে না।' যেই রাতে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর সাথে কথোপকথন করেন সেই রাতেও এরূপ ইহসান প্রদর্শনের কথা আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرٰى. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلٰى أُمِّكَ مَا يُوحٰى أَنِ اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّى وَعَدُوٌّ لَّهٗ. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ. وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِيْ.

অর্থাৎ- এবং আমি তো তোমার প্রতি আরো একবার অনুগ্রহ করেছিলাম, যখন আমি তোমার মাকে জানিয়েছিলাম যা ছিল জানাবার এই মর্মে যে, তুমি তাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখ তারপর এটাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও যাতে দরিয়া এটাকে তীরে ঠেলে দেয়, এটাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু নিয়ে যাবে। আমি আমার নিকট হতে তোমার উপর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হও। (সূরা তা-হা ঃ ৩৭)

শেষোক্ত আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় কাতাদা (র) প্রমুখ তাফসীরকার বলেন, যাতে আমার সামনে তুমি ভাল ভাল খাবার খেতে পার ও অতি উত্তম পোশাক পরতে পার। আর এগুলো সব আমার হেফাজত ও সংরক্ষণের দ্বারা সম্ভব হয়েছে, অন্য কারো এরূপ করার শক্তি, সামর্থ্য নেই। আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন ঃ

إِذْ تَمْشِىْ أُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ. فَرَجَعْنٰكَ إِلٰى أُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ. وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا.

অর্থাৎ–যখন তোমার বোন এসে বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব কে এই শিশুর ভার নেবে? তখন আমি তোমাকে তোমার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে দুঃখ না পায়; এবং তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে; অতঃপর আমি তোমাকে মনঃপীড়া হতে মুক্তি দেই। আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি। (সূরা তা-হা ঃ ৪০)

পরীক্ষার ঘটনাসমূহ যথাস্থানে ইনশাআল্লাহ্ তুলে ধরা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا. وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ. وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِىْ مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ. قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. إِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ. قَالَ رَبِّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهٗ إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ.

অর্থাৎ–যখন মূসা (আ) পূর্ণ যৌবনে উপনীত ও পরিণত বয়স্ক হল তখন আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম; এইভাবে আমি সৎ কর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কার প্রদান করে থাকি। সে নগরীতে প্রবেশ করল, যখন এর অধিবাসীরা ছিল অসতর্ক। সেখানে সে দু'টি লোককে সংঘর্ষে লিপ্ত দেখল– একজন তার নিজ দলের এবং অপরজন তার শত্রুদলের। মূসা (আ)-এর দলের লোকটি তার শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে মূসা (আ)-এর সাহায্য প্রার্থনা করল, তখন মূসা (আ) তাকে ঘুষি মারল; এভাবে সে তাকে হত্যা করে বসল। মূসা (আ) বললেন, এটা শয়তানের কাণ্ড। সেতো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। তারপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সে আরো বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। (সূরা কাসাস ঃ ১৪-১৭)

যখন আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেন, তিনি তার মায়ের কাছে তাকে ফেরত দিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করেছেন তারপর তিনি উল্লেখ করতে শুরু করলেন যে, যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করেন এবং শারীরিক গঠন ও চরিত্রে উৎকর্ষ মণ্ডিত হল এবং অধিকাংশ উলামার মতে, যখন ৪০ বছর বয়সে উপনীত হন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হিকমত ও নবুওতের জ্ঞান দান করেন। যে বিষয়ে তাঁর মাতাকে পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

অর্থাৎ–"আমি তাকে তোমার নিকট ফেরত দেব এবং তাকে রাসূলদের একজন করব।" তারপর আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর মিসর থেকে বের হয়ে মাদায়ান শহরে গমন এবং সেখানে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অবস্থানের কারণ বর্ণনা শুরু করেন এবং মূসা (আ) ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে যে সব কথোপকথন হয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যেরূপ মর্যাদা দান করেছেন তার প্রতিও ইংগিত করেছেন। যার আলোচনা একটু পরেই আসছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا
অর্থাৎ –"সে নগরীতে প্রবেশ করল যখন তার অধিবাসীবৃন্দ ছিল অসতর্ক।"

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা), সাঈদ ইবন জুবাইর (রা), ইক্‌রিমা (র), কাতাদা ও সুদ্দী (র) বলেন, তখন ছিল দুপুর বেলা। অন্য এক সূত্রে বর্ণিত; আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, এটা ছিল মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়। সেখানে তিনি দু'জনকে সংঘর্ষে লিপ্ত পেলেন– একজন ছিল ইসরাঈলী এবং অন্যজন ছিল কিবতী। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা), কাতাদা (র), সুদ্দী (র), মুহম্মদ ইবন ইসহাক (র) এ মত পোষণ করেন। মূসা (আ)-এর দলের লোকটি শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে মূসা (আ)-এর সাহায্য প্রার্থনা করল। বস্তুত ফিরআউনের পালক-পুত্র হবার কারণে মিসরে মূসা (আ)-এর প্রতিপত্তি ছিল। মূসা (আ) ফিরআউনের পালক-পুত্র হওয়ায় এবং তার ঘরে লালিত-পালিত হওয়ায় বনী ইসরাঈলদেরও সম্মান বৃদ্ধি পায়। কেননা, তারা মূসা (আ)-কে দুধ পান করিয়েছিল–এ হিসাবে তারা ছিল মূসা (আ)-এর মামা গোত্রীয়। যখন ইসরাঈল বংশীয় লোকটি মূসা (আ)-এর সাহায্য প্রার্থনা করল

তখন তিনি তার সাহায্যে এগিয়ে আসলেন। মুজাহিদ (র) فَوَكَزَهُ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ তিনি তাকে ঘুষি দিলেন। কাতাদা (র) বলেন, তিনি তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে কিবতীটি মারা যায়। আর এই কিবতীটি ছিল কাফির ও মুশরিক। মূসা (আ) তাকে প্রাণে বধ করতে চাননি, বরং তিনি তাকে সাবধান ও নিরস্ত্র করতে চেয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও মূসা (আ) বললেন ঃ

قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ. قَالَ رَبِّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَغَفَرَلَهُ. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ. قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ. فَأَصْبَحَ فِى الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِى اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. قَالَ لَهُ مُوْسٰى إِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَّبْطِشَ بِالَّذِىْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَامُوْسٰى أَتُرِيْدُ أَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيْدُ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْأَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى قَالَ يَامُوْسٰى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ إِنِّىْ لَكَ مِنَ النَّاصِحِيْنَ. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ.

অর্থাৎ–মূসা বলল, “এটা শয়তানের কাণ্ড। সেতো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তিকারী। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি, সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। তারপর তিনি তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সে আরো বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, (অর্থাৎ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি দিয়েছ) আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। তারপর ভীত-সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হল। হঠাৎ সে শুনতে পেল, পূর্বদিন যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে তার সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে। মূসা তাকে বলল, তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি। তারপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে ধরতে উদ্যত হল, তখন সে ব্যক্তি বলে উঠল, হে মূসা! গতকাল তুমি যেমন একজনকে হত্যা করেছ সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাচ্ছ! তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না? নগরীর দূর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসল ও বলল, হে মূসা! পারিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করবার পরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি বাইরে চলে যাও, আমি তো তোমার মঙ্গলকামী। ভীত-সতর্ক অবস্থায় সে সেখান থেকে বের হয়ে পড়ল এবং বলল, “হে আমার প্রতিপালক! তুমি জালিম সম্প্রদায় হতে আমাকে রক্ষা কর।” (কাসাস ঃ ১৫-২১)

বস্তুত আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মূসা (আ) মিসর শহরে ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। পাছে তারা জেনে ফেলে যে, নিহত ব্যক্তির

যে মামলাটি তাদের কাছে উত্থাপন করা হয়েছে তাকে বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির সাহায্যার্থে মূসা (আ)-ই হত্যা করেছেন। তা হলে তাদের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, মূসা (আ) বনী ইসরাঈলেরই একজন। এতে পরবর্তীতে বিরাট অনর্থ ঘটে যেতে পারে। এজন্যই তিনি ঐদিন ভোরে এদিক ওদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলাফেরা করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, আগের দিন যে ইসরাঈলীটির তিনি সাহায্য করেছিলেন ঐ ব্যক্তি আজও অন্য একজনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে মূসা (আ)-কে সাহায্যের জন্য আহ্বান করছে। মূসা (আ) তাকে তার ঝগড়াটে স্বভাবের জন্য ভর্ৎসনা করলেন এবং বললেন, তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি। তারপর তিনি মূসা (আ) ও ইসরাঈলী ব্যক্তিটির শত্রু কিবতীটিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন যাতে তিনি কিবতীটিকে প্রতিহত করতে পারেন এবং ইসরাঈলীকে তার কবল থেকে রক্ষা করতে পারেন। তারপর তাকে তিনি আক্রমণের জন্য উদ্যত হলেন ও কিবতীটির দিকে অগ্রসর হলেন। তখন লোকটি বলে উঠল ঃ

يَا مُوْسٰى اَتُرِيْدُ اَنْ تَقْتُلَنِىْ كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْاَمْسِ اِنْ تُرِيْدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ .

হে মূসা! গতকাল তুমি যেমন একব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাচ্ছ! তুমি তো পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হতে চাচ্ছ, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না।

কেউ কেউ বলেন, এ উক্তিটি ইসরাঈলীয়—যে মূসা (আ)-এর পূর্বদিনের ঘটনাটি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল, সে যখন মূসা (আ)-কে কিবতীটির দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তখন সে ধারণা করল, তিনি তার দিকেও আসবেন—কেননা, তিনি তাকে প্রথমেই এই বলে ভর্ৎসনা করেছেন যে, اِنَّكَ لَغَوِىٌّ مُّبِيْنٌ তুমি তো একজন বিভ্রান্ত লোক। এজন্যেই সে মূসা (আ)-কে এ কথাটি বলে এবং পূর্বের দিন যে ঘটনা ঘটেছিল সে তা প্রকাশ করে দিল। তখন কিবতী মূসা (আ)-কে ফিরআউনের দরবারে তলব করাণোর উদ্দেশ্যে চলে যায়। তবে এ অভিমতটি শুধু এ উক্তিকারীরই। অন্য কেউ তা উল্লেখ করেননি। এ উক্তিটি কিবতীটিরও হতে পারে। কেননা, সে যখন মূসা (আ)-কে তার দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তাঁকে ভয় করতে লাগল এবং মূসা (আ)-এর মেযাজ থেকে ইসরাঈলী পক্ষে চরম প্রতিশোধের আশঙ্কা করে নিজ দূরদর্শিতার আলোকে সে উপরোক্ত উক্তিটি করেছিল। যেন সে বুঝতে পেরেছিল যে, সম্ভবত এ ব্যক্তিটিই গতকালের নিহত ব্যক্তিটির হত্যাকারী। অথবা সে ইসরাঈলীটির মূসা (আ)-এর কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করা থেকেই সে ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরেছিল এবং উপরোক্ত বাক্যটি বলেছিল। আল্লাহই মহা জ্ঞানী।

মূলত ফিরআউনের কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছিল যে, মূসা (আ)-ই গতকালের খুনের জন্য দায়ী। তাই ফিরআউন মূসা (আ)-কে গ্রেফতার করার জন্যে লোক পাঠাল, কিন্তু তারা মূসা (আ)-এর নিকট পৌঁছার পূর্বেই শহরের দূরবর্তী প্রান্ত থেকে সংক্ষিপ্ততর রাস্তা দিয়ে একজন হিতাকাঙ্ক্ষী মূসা (আ)-এর নিকট পৌঁছে দরদমাখা সুরে বললেন, হে মূসা (আ) ! ফিরআউনের পারিষদবর্গ আপনাকে হত্যা করার সলাপরামর্শ করছে। কাজেই আপনি এখনই এই শহর থেকে বের হয়ে পড়ুন। আমি আপনার একজন হিতাকাঙ্ক্ষী অর্থাৎ আমি যা বলছি, সে ব্যাপারে। মূসা

(আ) তাৎক্ষণিকভাবে মিসর থেকে বের হয়ে পড়েন কিন্তু তিনি রাস্তাঘাট চিনতেন না তাই বলতে থাকেন رَبِّ نَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জালিম সম্প্রদায় থেকে রক্ষা করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ. وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدَانِ. قَالَ مَا خَطْبُكُمَا. قَالَتَا لَا نَسْقِىْ حَتّٰى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَاَبُوْنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ. فَسَقٰى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلّٰى اِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ.

অর্থাৎ.–যখন মূসা মাদায়ান অভিমুখে যাত্রা করল তখন বলল, আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরলপথ প্রদর্শন করবেন। যখন সে মাদায়ানের কূপের নিকট পৌঁছল, দেখল একদল লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পিছনে দু'জন নারী তাদের পশুগুলোকে আগলাচ্ছে। মূসা (আ) বলল, 'তোমাদের কি ব্যাপার?' তারা বললেন, 'আমরা আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ রাখালরা তাদের পশুগুলোকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা অতি বৃদ্ধ।' মূসা (আ) তখন তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাল, তারপর তিনি ছায়ার নিচে আশ্রয় গ্রহণ করে বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার কাঙ্গাল। (সূরা কাসাস ঃ ২২-২৪)

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা আপন বান্দা, রাসূল ও কালীম মূসা (আ)-এর মিসর থেকে বের হয়ে যাবার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ফিরআউনের সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি তাকে দেখে ফেলে নাকি, এই ভয়ে চতুর্দিকে তাকাতে তাকাতে মূসা (আ) শহর থেকে বের হয়ে পড়লেন, কিন্তু কোথায় যাবেন বা কোন্ দিকে যাবেন তিনি কিছুই জানেন না। তিনি ইতিপূর্বে মিসর থেকে আর কোনদিন বের হননি। যখন তিনি মাদায়ানে যাবার পথ ধরতে পারলেন– তখন তিনি বলে উঠলেন, আমি আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সোজা রাস্তা প্রদর্শন করবেন। অর্থাৎ সম্ভবত আমি এবার মনযিলে মকসুদে পৌঁছতে পারব। এভাবে বাস্তবে ঘটেছিলও তাই। এ পথই তাঁকে মনযিলে মকসুদে পৌঁছায়। কি সে মনযিলে মকসুদটি? মাদায়ানে একটি কূয়া ছিল যার পানি সকলে পান করত। মাদায়ান হলো সেই শহর যেখানে আল্লাহ তা'আলা 'আইকাহ' বাসীদের ধ্বংস করেছিলেন আর তারা ছিল শুয়ায়ব (আ)-এর সম্প্রদায়।

উলামায়ে কিরামের একটি মত অনুযায়ী মূসা (আ)-এর যুগের পূর্বে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। যখন মূসা (আ) মাদায়ানের পানির কূপে পৌঁছলেন, সেখানে একদল লোক পেলেন যারা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পেছনে দু'জন নারীকে পেলেন যারা তাদের ছাগলগুলোকে আগলাচ্ছে, যাতে এগুলো সম্প্রদায়ের ছাগলগুলোর সাথে মিশে না যায়।

কিতাবীদের মতে, সেখানে সাতজন নারী ছিল। এটাও তাদের ভ্রান্ত ধারণা। তারা সাতজন হতে পারে তবে তাদের মধ্য হতে দু'জন পানি পান করাতে এসেছিল। তাদের বর্ণনা বিশুদ্ধ হলেই কেবল এ ধরনের সামঞ্জস্যসূচক উত্তর গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এটা স্পষ্ট যে, শুয়ায়ব (আ)-এর কেবল দু'টি কন্যাই ছিল। মূসা (আ)-এর প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, আমরা আমাদের দুর্বলতার জন্যে রাখালদের পানি পান করাবার পূর্বে আমরা আমাদের পানির কাছে পৌঁছতে পারি না। আর এসব পশু নিয়ে আমাদের আসার কারণ হচ্ছে– আমাদের পিতার বৃদ্ধাবস্থা ও দুর্বলতা। তখন মূসা (আ) তাদের পশুগুলোকে পানি পান করালেন।

তাফসীরকারগণ বলেন, রাখালরা যখন তাদের জানোয়ারগুলোর পানি পান করানো শেষ করত, তখন তারা কূয়ার মুখে একটি বড় ও ভারী পাথর রেখে দিত। তারপর এই দুই নারী আসতেন এবং লোকজনের পশুগুলোর পানি পান করার পর যা উচ্ছিষ্ট থাকত তা হতে আপন বকরীগুলোকে পানি পান করাতেন। কিন্তু আজ মূসা (আ) আসলেন এবং একাই পাথরটি উঠালেন। তারপর তিনি তাদেরকে ও তাদের বকরীগুলোকে পানি পান করালেন এবং পাথরটি পূর্বের জায়গায় রেখে দিলেন।

আমীরুল মুমিনীন উমর (রা) বলেন, পাথরটি দশজনে উঠাতে পারত। তিনি একবালতি পানি উঠালেন এবং তাতে দু'জনের প্রয়োজন মিটে যায়। পুনরায় তিনি গাছের ছায়ায় ফিরে গেলেন। তাফসীরকারগণ বলেন, এটা সামার গাছের ছায়া। ইবন জারীর তাবারী (র) ইবন মাসউদ (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি এই গাছটিকে সবুজ ও ছায়াদার দেখেছেন। মূসা (আ) বলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই অবতীর্ণ করবেন আমি তার কাঙ্গাল।"

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, মূসা (আ) মিসর থেকে মাদায়ান ভ্রমণকালে শাক-সবজি ও গাছের পাতা ব্যতীত অন্য কিছু খেতে পাননি। তাঁর পায়ে তখন জুতা ছিল না। জুতা না থাকায় দুই পায়ের তলায় যখম হয়ে গিয়েছিল। তিনি গাছের ছায়ায় বসলেন। তিনি ছিলেন সৃষ্টিকুলের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ব্যক্তি। অথচ ক্ষুধার কারণে তাঁর পেট পিঠের সাথে লেগে গিয়েছিল এবং তাঁর দেহে এর প্রভাব দৃশ্যমান ছিল। আর তখন তিনি এক টুকরো খেজুরের পর্যন্ত মুখাপেক্ষী ছিলেন। قَالَ رَبِّ إِنِّيْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ এ আয়াত প্রসঙ্গে আতা ইবন সাইব (র) বলেন ঃ তিনি নারীদেরকে শুনিয়ে এ দু'আটি করেছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِيْ يَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَاتَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ. قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ. قَالَ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمَانِيَ حِجَجٍ. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. وَمَا أُرِيْدُ أَنْ

أَشُقَّ عَلَيْكَ. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ. قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ. وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ.

অর্থাৎ–নারী দ্বয়ের একজন শরমজনিত পায়ে তার নিকট আসল এবং বলল, "আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন, আমাদের জানোয়ারগুলোকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য, তারপর মূসা (আ) তাঁর নিকট এসে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে সে বলল, ভয় করো না তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল থেকে বেঁচে গিয়েছ। তাদের একজন বলল, হে পিতা! তুমি একে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।" সে মূসা (আ)-কে বলল, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই এ শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে– যদি তুমি দশবছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। মূসা (আ) বলল, 'আমার ও আপনার মধ্যে এ চুক্তিই রইল।' এ দু'টি মেয়াদের কোন একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী। (২৮ কাসাস ঃ ২৫-২৮)

মূসা (আ) গাছের ছায়ায় বসে যখন বললেন

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ.

তখন নারীদ্বয় তা শুনতে পান এবং তারা দু'জন তাদের পিতার কাছে গেলেন। কথিত আছে, তাঁদের এরূপ ত্বরান্বিত প্রত্যাবর্তনে শুয়ায়ব (আ) তার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা যখন তাঁকে মূসা (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে জানালেন, তখন শুয়ায়ব (আ) তাদের একজনকে মূসা (আ)-কে ডেকে আনতে পাঠালেন। তাঁদের একজন আযাদ নারীসুলভ শরম জড়িত পায়ে তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন, আমার পিতা পানি পান করানোর পারিশ্রমিক দেয়ার জন্যে আপনাকে ডাকছেন। তিনি কথাটি স্পষ্ট করে বললেন, যাতে মূসা (আ) তার কথায় কোনরূপ সন্দেহ না করেন। এটা ছিল তার লজ্জা ও পবিত্রতার পূর্ণতার প্রমাণ। যখন মূসা (আ) শুয়ায়ব (আ)-এর কাছে আগমন করলেন এবং তাঁর মিসর ও ফিরআউন থেকে তার পলায়ন করে আসার যাবতীয় ঘটনা শুয়ায়ব (আ)-এর কাছে বর্ণনা করলেন– তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'তুমি ভয় করো না, তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে এসেছ, এখন আর তুমি তাদের রাজ্যে নও।'

এই বৃদ্ধ কে? এ নিয়ে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, "তিনি হচ্ছেন শুয়ায়ব (আ)।" এটাই অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারীর কাছে সুপ্রসিদ্ধ অভিমত। হাসান বসরী (র) ও মালিক ইবন আনাস (র) এ মত পোষণ করেন। এ ব্যাপারে একটি হাদীসেও সুস্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। তবে এর সনদে কিছু সন্দেহ রয়েছে। অন্য একজন প্রকাশ্যভাবে বলেছেন যে, শুয়ায়ব (আ) তার সম্প্রদায় ধ্বংস হবার পরও অনেকদিন জীবিত ছিলেন। অতঃপর মূসা (আ) তাঁর যুগ পান এবং তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন।

ইব্ন আবূ হাতিম (র) প্রমুখ হাসান বসরী (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মূসা (আ)-এর ঘটনা সংশ্লিষ্ট এ ব্যক্তির নাম শুয়ায়ব, তিনি মাদায়ানে কূয়ার মালিক ছিলেন কিন্তু তিনি মাদায়ানের নবী শুয়ায়ব নন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন শুয়ায়ব (আ)-এর ভাতিজা। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন শুয়ায়ব (আ)-এর চাচাত ভাই। কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন শুয়ায়বের সম্প্রদায়ের একজন মুমিন বান্দা। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন একজন লোক যার নাম ইয়াসরূন। কিতাবীদের গ্রন্থাদিতে এরূপ বিবরণ রয়েছে। তাদের ভাষ্য মতে, ইয়াসরূন ছিলেন একজন বড় ও জ্ঞানী জ্যোতিষী। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) ও আবূ উবায়দা ইবন আবদুল্লাহ (র) তাঁর নাম ইয়াসরূন বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ উবায়দা আরো বলেন, তিনি ছিলেন শুয়ায়ব (আ)-এর ভাতিজা। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এ বর্ণনায় বাড়িয়ে বলেন, তিনি ছিলেন মাদায়ানের লোক।

মোটকথা, যখন শুয়ায়ব (আ) মূসা (আ)-কে আতিথ্য ও আশ্রয় দান করলেন, তখন তিনি তাঁর সমস্ত কাহিনী শুয়ায়ব (আ)-এর কাছে বর্ণনা করলেন। তখন শুয়ায়ব (আ) তাঁকে সুসংবাদ দিলেন যে, তিনি জালিমদের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছেন। তখন দুই কন্যার একজন তাঁর পিতাকে বললেন, হে আমার পিতা! তাঁকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তোমার বকরী চরাবার জন্যে নিযুক্ত কর। তারপর সে তাঁর প্রশংসা করে বলল যে, মূসা (আ) শক্তিশালী এবং আমানতদারও বটে। উমর (রা), আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা), কাযী শুরায়হ (র), আবূ মালিক (র), কাতাদা (র), মুহম্মদ ইবন ইসহাক (র) প্রমুখ বলেন,"শুয়ায়ব (আ)-এর কন্যা যখন মূসা (আ) সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করলেন, তখন তাঁর পিতা তাঁকে বললেন, তুমি তা কেমন করে জানলে?" জবাবে তিনি বললেন, তিনি এমন একটি পাথর উত্তোলন করেছেন যা উত্তোলন করতে দশজন লোকের প্রয়োজন। আবার আমি যখন তাঁর সাথে বাড়ি আসছিলাম, আমি তার সামনে পথ চলছিলাম, এক পর্যায়ে তিনি বললেন, "তুমি আমার পেছনে পেছনে চল, আর যখন বিভিন্ন রাস্তার মাথা দেখা দেবে তখন তুমি কঙ্কর নিক্ষেপের মাধ্যমে আমাকে পথ নির্দেশ করবে।"

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন, তিন ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অতি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন (১) ইউসুফ (আ)-এর ক্রেতা—যখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন, "সম্মান-জনকভাবে তার থাকবার ব্যবস্থা কর।"

(২) মূসা (আ)-এর সঙ্গিনী—যখন তিনি বলেছিলেন, "হে আমার পিতা! তুমি তাকে মজুর নিযুক্ত কর, কারণ তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।"

(৩) আবূ বকর সিদ্দীক (রা) যখন তিনি উমর (রা) ইবন আল খাত্তাবকে খলীফা মনোনীত করেন। অতঃপর শুয়ায়ব (আ) বলেন ঃ

إِنِّىْ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِىْ ثَمَانِىَ حِجَجٍ. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىْ

ان شاء الله من الصالحين .

অর্থাৎ- সে বলল, "আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চাহে তো তুমি আমাকে সদাচারী রূপে পাবে।"

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আবূ হানীফা (র)-এর কিছু সংখ্যক অনুসারী দলীল পেশ করেন যে, যদি কেউ বলে, আমি দুটি দাসের মধ্যে একটি, কিংবা কাপড় দু'টির একটি, অনুরূপভাবে অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রেও দু'টির একটি বিক্রি করব তাহলে এরূপ বলা শুদ্ধ হবে। কেননা, শুয়ায়ব (আ) বলেছিলেন إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ। অর্থাৎ- আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে। আসলে এ যুক্তি যথার্থ নয়; কেননা, বিয়ের ক্ষেত্রটি হচ্ছে পরস্পর সম্মতির ব্যাপার, ব্যবসায়ের মত লেনদেনের ব্যাপার নয়। আল্লাহ তা'আলাই সম্যক জ্ঞাত।

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা ইমাম আহমদ (র)-এর অনুসারিগণ প্রচলিত প্রথা অনুসারে আহার ও বাসস্থানের বিনিময়ে মজুর নিযুক্তির বৈধতার প্রমাণ বলে পেশ করেন। ইবন মাজাহ্ (র) তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে باب استجار الاجير অর্থাৎ শ্রমিক নিয়োগ শিরোনামে পেটেভাতে মজুর নিযুক্তির বৈধতা প্রমাণার্থে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন–এ হাদীসটিও প্রসঙ্গক্রমে তারা উল্লেখ করেছেন। উতবা ইব্ন নুদ্র (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূল (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। রাসূল (সা) সূরা কাসাস পাঠ করলেন। তিনি যখন মূসা (আ)-এর ঘটনায় পৌঁছলেন তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই মূসা (আ) আট বছর কিংবা দশ বছর পেটেভাতে এবং চরিত্রের পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে কায়িক শ্রম করেছেন। তবে হাদীসটি দুর্বল বিধায় এর দ্বারা দলীল পেশ করা যায় না। অন্য এক সূত্রে ইবন আবূ হাতিম (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ. وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ.

অর্থাৎ–মূসা (আ) তাঁর ভাবী শ্বশুরকে বলেন, আপনি যে চুক্তির কথা বলেছেন তাই স্থির হল, তবে দুই মেয়াদের মধ্যে যে কোনটাই আমি পূর্ণ করব, আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী। এতদসত্ত্বেও মূসা (আ) দু'টির মধ্যে দীর্ঘতমটি পূর্ণ করেন অর্থাৎ পূর্ণ ১০ বছর তিনি মজুরি করেন।

ইমাম বুখারী (র) সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) সূত্রে বর্ননা করেন, তিনি বলেন, হীরার অধিবাসী একজন ইহুদী আমাকে প্রশ্ন করল, اى الا جلين قضى موسى। অর্থাৎ মূসা (আ) কোন্ মেয়াদটি পূরণ করেছিলেন? বললাম, আমি জানি না, তবে আরবের মহান শিক্ষিত লোকটির কাছে জিজ্ঞাসা করব। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর নিকট এসে তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, দু'টির মধ্যে যেটা অধিক ও বেশি পছন্দনীয় সেটাই তিনি পূরণ করেছিলেন। কেননা, আল্লাহর নবী যা বলেন তা অবশ্যই করেন।

ইমাম নাসাঈ (র)ও অন্য এক সূত্রে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

ইব্ন জারীর তাবারী (র)ও অন্য এক সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, "একদিন আমি জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, "মূসা (আ) কোন্ মেয়াদটি পূর্ণ করেছিলেন? তখন তিনি বলেন, যেটা বেশি পরিপূর্ণ সেটাই তিনি পূরণ করেছিলেন।" ইমাম আল বায্যার (র) অন্য এক সূত্রে আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হতে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেছেন।

ইমাম সানীদ (র) মুজাহিদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) একদিন এ ব্যাপারে জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। পুনরায় জিবরাঈল (আ) এ সম্বন্ধে ইসরাফীল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন। ইসরাফীল (আ) মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, যেটি অধিক পরিপূর্ণ ও অধিক কল্যাণকর।

ইবন জারীর তাবারী (র)-ও অন্য এক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মূসা (আ) কোন্ মেয়াদটি পূরণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যেটা অধিক পরিপূর্ণ সেটাই তিনি পূরণ করেছিলেন। ইমাম আল বাযযার (র) ও ইবন আবূ হাতিম (র) আবুযর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একদিন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, মূসা (আ) কোন্ মেয়াদটি পূরণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যেটা অধিক পরিপূর্ণ ও অধিক কল্যাণকর। তিনি বলেন, "যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন্ কন্যাটিকে মূসা (আ) বিয়ে করেছিলেন, তখন বলে দাও, ছোট কন্যাটিকে।"

ইমাম আল বায্যার (র) ও ইবন আবূ হাতিম (র) অন্য এক সূত্রে উতবা ইবন নুদর (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, মূসা (আ) জীবিকা নির্বাহ ও চরিত্রের হেফাজতের জন্যে মজুরি করেছেন। এরপর তিনি যখন মেয়াদ পূরণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন্ মেয়াদটি ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন রাসূলুল্লাহ (সা) প্রতি উত্তরে বলেন, যেটি অধিক পরিপূর্ণ ও অধিক কল্যাণকর।

যখন মূসা (আ) শুয়ায়ব (আ) হতে বিদায় গ্রহণের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তার স্ত্রীকে বলেন, তাঁর পিতার নিকট থেকে কিছু বকরী চেয়ে নিতে যাতে তারা এগুলো দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। তাই এ বছর যতগুলো বকরী মায়ের রংয়ের ভিন্ন রং-এ জন্ম নিয়েছে সেগুলি তাকে দান করলেন। তাঁর বকরীগুলো ছিলো কালো ও সুন্দর। মূসা (আ) লাঠি নিয়ে গেলেন এবং একদিক থেকে এগুলোকে পৃথক করলেন। অতঃপর এগুলোকে পানির চৌবাচ্চার কাছে নিয়ে গেলেন এবং পানি পান করালেন। মূসা (আ) চৌবাচ্চার পাশে দাঁড়ালেন। কিন্তু একটি বকরীও পানি পান শেষ করে নিজ ইচ্ছায় ছুটে আসল না। যতক্ষণ না তিনি একটি একটি করে মৃদু প্রহার করেন। বর্ণনাকারী বলেন, দুই-একটি ব্যতীত বকরীগুলো প্রতিটি যমজ, বকনা এবং মায়ের রংয়ের অন্য রং-এর বাচ্চা জন্ম দেয়। এগুলোর মধ্যে চওড়া বুক, লম্বা বাঁট, সংকীর্ণ বুক, একেবারে ছোট বাঁট এবং হাতে ধরা যায় না এরূপ বাঁটের অধিকারী বকরী ছিল না। অর্থাৎ সবগুলোই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যদি তোমরা সিরিয়া পৌঁছতে পারতে তাহলে তোমরা এখনও ঐ জাতের বকরী দেখতে পেতে। এসব বকরী হচ্ছে সামেরীয়। এ হাদীসটি মরফূ' হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

ইব্ন জারীর তাবারী (র) আনাস ইবনে মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আল্লাহর নবী মূসা (আ) তাঁর নিয়োগকর্তাকে মেয়াদপূর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তখন

তিনি বললেন, 'প্রতিটি বকরীই তোমার, যা তার মায়ের রং-এ জন্ম নেবে। মূসা (আ) মানুষের একটি আকৃতি পানিতে দাঁড় করিয়ে রাখলেন যখন বকরীগুলো মানুষের আকৃতি দেখল, ভয় পেয়ে গেল এবং ছুটাছুটি করতে লাগল। একটি ব্যতীত সবগুলোই চিত্রা বাচ্চা জন্ম দিল। মূসা (আ) ঐ বছরের সব বাচ্চা নিয়ে নিলেন। এ বর্ণনাটির রাবীগণ বিশ্বস্ত। অনুরূপ ঘটনা হযরত ইয়াকূব (আ) সম্পর্কেও পূর্বে বর্ণিত আছে। আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ نَارًا. قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ. فَلَمَّآ اَتٰىهَا نُوْدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يّٰمُوْسٰٓى اِنِّيْٓ اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ. فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ. يٰمُوْسٰٓى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ. اُسْلُكْ يَدَكَ فِيْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذٰنِكَ بُرْهَانٰنِ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ. اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ.

মূসা (আ) যখন তাঁর মেয়াদ পূর্ণ করবার পর সপরিবারে যাত্রা করল, তখন সে তূর পর্বতের দিকে আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারবর্গকে বলল, 'তোমরা অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য খবর আনতে পারি অথবা এক খণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড আনতে পারি, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। যখন মূসা (আ) আগুনের নিকট পৌঁছুল, তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষের দিক হতে তাকে আহ্বান করে বলা হল, হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক। আরও বলা হল, 'তুমি তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর,' তারপর যখন সে এটাকে সাপের মত ছুটোছুটি করতে দেখল, তখন পেছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরে তাকাল না। তাকে বলা হল, হে মূসা! সম্মুখে আস, ভয় করো না, তুমি তো নিরাপদ। তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র সমুজ্জ্বল নির্দোষ হয়ে। ভয় দূর করবার জন্য তোমার হাত দু'টি নিজের দিকে চেপে ধর। এ দু'টি তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ, ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের জন্য। ওরা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (সূরা কাসাস ঃ ২৯-৩২)

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মূসা (আ) পূর্ণতর মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূরণ করেছেন। মুজাহিদ (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রথম তিনি ১০ বছর পূরা করেন, পরে আরো দশ বছর। আয়াতে উল্লেখিত وَسَارَ بِاَهْلِهٖ এর অর্থ হচ্ছে, মূসা (আ) তাঁর শ্বশুরের নিকট থেকে সপরিবারে রওয়ানা হলেন। একাধিক মুফাসসির ও অন্যান্য উলামা বর্ণনা করেন যে, মূসা (আ) তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সাথে মুলাকাতের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেন। তাই তিনি গোপনে মিসরে গিয়ে তাঁদের সাথে দেখা করতে মনস্থ করলেন। যখন তিনি সপরিবারে রওয়ানা হলেন

তখন তাঁর সাথে ছিল ছেলে-মেয়ে ও বকরীর পাল। যা তিনি তাঁর অবস্থানকালে অর্জন করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন, ঘটনাচক্রে তাঁর যাত্রার রাতটি ছিল অন্ধকার ও ঠাণ্ডা। তাঁরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন, পরিচিত রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করেও তারা আগুন জ্বালাতে ব্যর্থ হন। অন্ধকার ও ঠাণ্ডা তীব্র আকার ধারণ করল। এ অবস্থায় হঠাৎ তিনি দূরে অগ্নিশিখা দেখতে পেলেন যা তূর পর্বতের এক অংশে প্রজ্বলিত ছিল। এটা ছিল তূর পর্বতের পশ্চিমাংশ যা ছিল তাঁর ডান দিকে। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, 'তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি আগুন দেখতে পেয়েছি।' আল্লাহই ভাল জানেন।

সম্ভবত এ আগুন শুধু তিনিই দেখেছেন অন্য কেউ দেখেননি; কেননা, এই আগুন প্রকৃত পক্ষে নূর ছিল, যা সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, 'আমি হয়ত সেখান থেকে সঠিক রাস্তার সন্ধান পেতে পারব। কিংবা আগুনের কাষ্ঠখণ্ড নিয়ে আসবো যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। সূরায়ে তা-হার আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. إِذْ رَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى.

অর্থাৎ–মূসার বৃত্তান্ত তোমার নিকট পৌঁছেছে কি? সে যখন আগুন দেখল তখন তার পরিবারবর্গকে বলল, তোমরা এখানে থাক, আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তোমাদের জন্য তা হতে কিছু জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব অথবা আমি তার নিকট কোন পথনির্দেশ পাব। (সূরা তা-হা : ৯-১০)

এতে প্রমাণিত হয় যে, সেখানে অন্ধকার ছিল এবং তারা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا. سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ.

অর্থাৎ–স্মরণ কর, সে সময়ের কথা যখন মূসা (আ) তার পরিবারবর্গকে বলেছিল– আমি আগুন দেখেছি, সত্বর আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য কোন খবর আনব অথবা তোমাদের জন্য আনব জ্বলন্ত অঙ্গার যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। (সূরা নামল ঃ ৭)

বাস্তবিকই তিনি তাঁদের নিকট সেখান থেকে সুসংবাদ নিয়ে এসেছিলেন, সে কী সুসংবাদ! তিনি সেখানে উত্তম পথনির্দেশ পেয়েছিলেন, কী উত্তম পথনির্দেশ! তিনি সেখান থেকে নূর নিয়ে এসেছিলেন, কী চমৎকার সে নূর! অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِيْنَ.

অর্থাৎ–যখন মূসা (আ) আগুনের নিকট পৌঁছল, তখন উপত্যকার দক্ষিণ পার্শ্বে পবিত্র ভূমিস্থিত এক বৃক্ষ হতে তাকে আহ্বান করে বলা হল, হে মূসা! আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক। (সূরা কাসাস ঃ ৩০)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَلَمَّا جَاءَهَا نُوْدِيَ أَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا. وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অর্থাৎ–অতঃপর সে যখন তাঁর নিকট আসল তখন ঘোষিত হল, ধন্য যারা রয়েছে এ আলোর মধ্যে এবং যারা রয়েছে তার চতুষ্পার্শ্বে, জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পবিত্র ও মহিমান্বিত। (সূরা নামল ঃ ৮)

অর্থাৎ যিনি যা ইচ্ছা তা করেন এবং যা ইচ্ছা নির্দেশ করেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন يَا مُوسٰى إِنَّهُ أَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ হে মূসা! আমি তো আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

সূরা তা-হায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ يَا مُوْسٰى. إِنِّيْ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ. إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰى إِنَّنِيْ. أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِيْ. وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ. إِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيْهَا لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدٰى.

অতঃপর যখন সে আগুনের নিকট আসল তখন আহ্বান করে বলা হল, 'হে মূসা! আমিই তোমার প্রতিপালক। অতএব তোমার পাদুকা খুলে ফেল, কারণ তুমি পবিত্র তুওয়া উপত্যকায় রয়েছ। এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব, যা ওহী প্রেরণ করা হচ্ছে তুমি তা মনোযোগের সাথে শুন! আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। অতএব, আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, আমি এটা গোপন রাখতে চাই যাতে প্রত্যেকেই নিজ কর্মানুযায়ী ফল লাভ করতে পারে। সুতরাং, যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে এটাতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। (সূরা তা-হা ঃ ১১-১৬)

প্রাচীন যুগের ও পরবর্তীকালের একাধিক মুফাসসির বলেন, মূসা (আ) যে আগুন দেখলেন তার কাছে পৌঁছতে তিনি মনস্থ করলেন। সেখানে পৌঁছে সবুজ কাঁটা গাছে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেলেন। এ আগুনের মধ্যকার সবকিছু দাউ দাউ করে জ্বলছে অথচ গাছের শ্যামলিমা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। অবাক হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। আর এই গাছটি ছিল পশ্চিমদিকের পাহাড়ে তাঁর ডানদিকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلٰى مُوْسٰى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ.

মূসাকে যখন আমি বিধান দিয়েছিলাম তখন তুমি পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। (সূরা কাসাস ঃ ৪৪)

মূসা (আ) যে উপত্যকায় ছিলেন তার নাম হচ্ছে তূওয়া। মূসা (আ) কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন। আর এই গাছটি ছিল পশ্চিম পার্শ্বে তাঁর ডানদিকে। সেখানে অবস্থিত তূওয়া নামক পবিত্র উপত্যকায় তাঁর প্রতিপালক তাঁকে আহ্বান করলেন। প্রথমত তিনি তাকে ঐ পবিত্র স্থানটির সম্মানার্থে পাদুকা খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন এবং বিশেষ করে ঐ পবিত্র রাতের সম্মানার্থে।

কিতাবীদের মতে, মূসা (আ) এই নূরের তীব্রতার কারণে দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নিজের চেহারার উপর হাত রাখলেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্বোধন করে বলেন, 'নিশ্চয়ই আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক।'

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّنِىْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِىْ . وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ .

অর্থাৎ— 'আমি জগতসমূহের প্রতিপালক, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। শুধু তাঁর জন্যেই ইবাদত ও সালাত নির্ধারিত, অন্য কেউ এর যোগ্য নয়। আর আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর।' অতঃপর তিনি সংবাদ দেন যে, এই পৃথিবী স্থায়ী বাসস্থান নয় বরং স্থায়ী বাসস্থান হচ্ছে কিয়ামত দিবসের পরের বাসস্থান যার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব অবশ্যম্ভাবী, যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ আমল অনুসারে ভাল ও মন্দ কর্মফল ভোগ করতে পারে। এই আয়াতের মাধ্যমে উক্ত বাসস্থান লাভের জন্য আমল করার এবং মাওলার নাফরমান ও প্রবৃত্তির পূজারী এবং অবিশ্বাসী বান্দাদের থেকে দূরে থাকার জন্যে মূসা (আ)-কে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। অতঃপর তাকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। যিনি কোন বস্তুর সৃষ্টির পূর্বে নির্দেশ দেন 'হয়ে যাও' তখন তা হয়ে যায়।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يَا مُوْسٰى قَالَ هِىَ عَصَاىَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ وَلِىَ فِيْهَا مَآرِبُ أُخْرٰى . قَالَ أَلْقِهَا يَامُوْسٰى . فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِىَ حَيَّةٌ تَسْعٰى .

অর্থাৎ—"হে মূসা! তোমার ডান হাতে এটা কী? অর্থাৎ এটা কি তোমার লাঠি নয়, 'তোমার কাছে আসার পর থেকে যা তোমার পরিচিত?' তিনি বললেন, 'এটা আমার লাঠি যা আমি সম্যক চিনি, এটাতে আমি ভর দেই এবং এটা দ্বারা আঘাত করে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা ঝরিয়ে থাকি। আর এটা আমার অন্যান্য কাজেও লাগে।' আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'হে মূসা! তুমি এটা নিক্ষেপ কর।' অতঃপর তিনি এটা নিক্ষেপ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে এটা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল।"

এটা একটি বিরাট অলৌকিক ব্যাপার এবং একটি অকাট্য প্রমাণ যে, যিনি মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেছেন, তিনি যখন কোন বস্তু সৃষ্টির পূর্বে বলেন كُنْ (হয়ে যাও) তখন তা 'হয়ে যায়'। তিনি তার ইচ্ছা মুতাবিক কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন।

কিতাবীদের মতে, মিসরীয়দের মূসা (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার আশঙ্কা থাকায় তাঁর সত্যতা প্রমাণের জন্যে মূসা (আ) আপন প্রতিপালকের কাছে কোন প্রমাণ প্রার্থনা করেন। তখন মহান প্রতিপালক তাঁকে বললেন - 'তোমার হাতে এটা কী?' তিনি বললেন, 'এটা আমার লাঠি।' আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'এটাকে ভূমিতে নিক্ষেপ কর।' অতঃপর তিনি এটাকে নিক্ষেপ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে এটা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। মূসা (আ) এটার সম্মুখ থেকে পলায়ন করেন। তখন মহান প্রতিপালক তাঁকে হাত বাড়াতে এবং এটার লেজে ধরতে নির্দেশ দিলেন। যখন তিনি এটাকে মযবুত করে ধরলেন তার হাতে সেটা পূর্বের মত লাঠি হয়ে গেল।

সূরা কাসাসের (৩১) আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاَنْ اَلْقِ عَصَاكَ . فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَانٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ . يَا مُوْسٰى اَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ .

অর্থাৎ—আরও বলা হল, 'তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর। অতঃপর যখন সে এটাকে সাপের মত ছুটাছুটি করতে দেখল তখন সে পিছনের দিকে ছুটতে লাগল এবং ফিরে তাকাল না।' অর্থাৎ লাঠিটি একটি বড় ভয়ংকর দাঁত বিশিষ্ট অজগরে পরিণত হল। আবার এটা সাপের মত দ্রুত ছুটাছুটি করতে লাগল, আয়াতে উল্লেখিত جان শব্দটি جنان রূপেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা খুবই সূক্ষ্ম কিন্তু অতি চঞ্চল ও দ্রুতগতিসম্পন্ন। কাজেই এটার মধ্যে স্থূলতা ও তীব্র গতি লক্ষ্য করে মূসা (আ) পিছনে ছুটতে লাগলেন। কেননা, মানবিক প্রকৃতিতে তিনি প্রকৃতস্থ এবং মানবিক প্রকৃতিও তা-ই চায়। তিনি আর কোন দিকে দেখলেন না। তখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে আহ্বান করলেন, 'হে মূসা! সামনে অগ্রসর হও, তুমি ভয় করবে না, তুমি নিরাপদ।' যখন মূসা (আ) ফিরে আসলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাপটি ধরার জন্যে নির্দেশ দিলেন। বললেন, 'এটাকে ধর, ভয় করো না, এটাকে আমি পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব।' কথিত আছে, মূসা (আ) অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন তাই তিনি পশমের কাপড়ের আস্তিনে নিজের হাত রাখলেন। অতঃপর নিজের হাত সাপের মুখে রাখলেন। কিতাবীদের মতে, সাপের লেজে হাত রেখেছিলেন, যখন তিনি এটাকে মজবুত করে ধরলেন, তখন এটা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসল এবং দুই শাখাবিশিষ্ট পূর্বেকার লাঠিতে পরিণত হল। সুতরাং মহাশক্তিশালী এবং দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা পাক পবিত্র। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাত তাঁর বগলে রাখার নির্দেশ দিলেন। এর পর তা বের করতে হুকুম দিলেন। অকস্মাৎ তা চাঁদের মত শুভ্র-সমুজ্জ্বল হয়ে চক্ চক্ করতে লাগল। অথচ এটা কোন রোগের কারণ নয়, এটা শ্বেত রোগের কারণে নয় বা অন্য কোন চর্মরোগের কারণেও নয়।

এজন্য আল্লাহ তা'আলা এর পরের আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

اُسْلُكْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ وَّاضْمُمْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ .

অর্থাৎ—তোমার হাত তোমার বগলে রাখ, এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র-সমুজ্জ্বল নির্দোষ হয়ে। ভয় দূর করার জন্যে তোমার হাত দুটি নিজের দিকে চেপে ধর। (সূরা কাসাস ঃ ৩২)

কেউ কেউ বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যখন তোমার ভয় করবে তোমার হাত তোমার হৃৎপিণ্ডের উপর রাখবে, তাহলে প্রশান্তি লাভ করবে। এ আমলটা যদিও বিশেষভাবে তার জন্যেই ছিল কিন্তু এটার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাতে যে বরকত হবে তা যথার্থ। কেননা, যে ব্যক্তি নবীদের অনুসরণের নিয়তে এটা আমল করবে সে উপকার পাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে নামলে ইরশাদ করেন ঃ

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ .

অর্থাৎ—এবং তোমার হাত তোমার বগলে রাখ। এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্মল অবস্থায়। এটা ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট আনীত নয়টি নিদর্শনের অন্তর্গত। তারা তো সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। (সূরা নাম্‌ল ঃ ১২)

অন্য কথায় লাঠি ও হাত দু'টো নিদর্শন যেগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে কাসাসে ইরশাদ করেন ঃ

فَذٰنِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ.

অর্থাৎ—"এই দু'টি তোমার প্রতিপালক প্রদত্ত প্রমাণ, ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের জন্যে। ওরা তো ছিল সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।" (২৮ ঃ ৩২) এ দু'টির সাথে রয়েছে আরো সাতটি। তাহলে মোট হবে নয়টি নিদর্শন।

সূরায়ে বনী ইসরাঈলের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسْئَلْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّيْ لَأَظُنُّكَ يَامُوْسٰى مَسْحُوْرًا. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ. وَإِنِّيْ لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا.

অর্থাৎ—তুমি বনী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, 'আমি মূসাকে নয়টি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। যখন সে তাদের নিকট এসেছিল, ফিরআউন তাকে বলেছিল, হে মূসা! আমি মনে করি, তুমি তো জাদুগ্রস্ত। মূসা বলেছিল, 'তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন— প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। হে ফিরআউন! আমি তো দেখছি তোমার ধ্বংস আসন্ন। (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০১-১০২)

এই ঘটনা সূরায়ে আ'রাফের আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهِ. وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى

وَمَنْ مَّعَهُ. اَلاَ اِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ. وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ.

অর্থাৎ- আমি তো ফিরআউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা আক্রান্ত করেছি যাতে তারা অনুধাবন করে। যখন তাদের কোন কল্যাণ হত তারা বলত, এটা আমাদের প্রাপ্য আর যখন তাদের কোন অকল্যাণ হত তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে অলক্ষুণে গণ্য করত; শোন, তাদের অকল্যাণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা জানে না। তারা বলল, আমাদেরকে জাদু করবার জন্য তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ কর না কেন, আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না। অতঃপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেল, আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।' (সূরা আরাফ ঃ ১৩০-১৩৩)

এ সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এ নয়টি হল এমন নিদর্শন যা অন্য দশটি নিদর্শনের থেকে ভিন্ন। এ নয়টি নিদর্শন হল আল্লাহ তা'আলার কুদরত সম্পর্কীয় আর অন্য দশটি নিদর্শন আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়ত বিষয়ক তাঁর বাণী সম্পর্কীয়। এ সম্বন্ধে এখানে এজন্য উল্লেখ করে দেয়া হল। কেননা, অনেক বর্ণনাকারীই এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। তাঁরা ধারণা করে থাকেন যে, এ নয়টিই হয়ত উক্ত দশটির অন্তর্ভুক্ত। সূরায়ে বনী ইসরাঈলের শেষাংশের তাফসীরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা যখন মূসা (আ)-কে ফিরআউনের কাছে যাবার জন্যে নির্দেশ দিলেন।

যেমন সূরায়ে কাসাসের আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنِ. وَاَخِىْ هَارُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِىَ رِدْءًا يُّصَدِّقُنِىْ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنِ. قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا بِاٰيَاتِنَا. اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُوْنَ.

অর্থাৎ— "মূসা (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো তাদের একজনকে হত্যা করেছি। ফলে আমি আশংকা করছি, তারা আমাকে হত্যা করবে। আমার ভাই হারূন আমার চাইতে অধিকতর বাগ্মী। অতএব, তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ কর, সে আমাকে সমর্থন করবে। আমি আশংকা করছি, তারা আমাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরাবে। আল্লাহ বললেন, আমি তোমার ভাইয়ের দ্বারা তোমার বাহু শক্তিশালী করব এবং তোমাদের উভয়কে প্রাধান্য দান করব। তারা তোমাদের নিকট পৌঁছতে পারবে না। তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরা আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে।" (সূরা কাসাস ৩৩-৫৫)

অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা, রাসূল, প্রত্যক্ষ সম্বোধনকৃত মূসা (আ) সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মূসা (আ) আল্লাহর শত্রু ফিরআউনের জুলুম ও অত্যাচার হতে পরিত্রাণ পাবার জন্যে মিসর ত্যাগ করেছিলেন। কেননা, তিনি অনিচ্ছাকৃত ভুলক্রমে এক কিবতীকে হত্যা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যখন মূসা (আ)-কে ফিরআউনের কাছে যেতে হুকুম দিলেন—তখন মূসা (আ) উত্তরে বলেন ঃ

رَبِّ اِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنَ وَاَخِيْ هَارُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُّصَدِّقُنِيْ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ .

অর্থাৎ—"হে আল্লাহ! আমার ভাইকে আমার সাহায্যকারী, সমর্থনকারী ও উযীররূপে নিযুক্ত করুন যাতে সে আমাকে তোমার রিসালাত পরিপূর্ণভাবে তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে সাহায্য করতে পারে; কেননা, সে আমা অপেক্ষা বাগ্মী এবং বর্ণনার ক্ষেত্রে আমা থেকে অধিকতর সমর্থ।

তাঁর আবেদনের প্রতি উত্তরে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِاَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا (اى برهانا)

অর্থাৎ—"আমার নিদর্শনসমূহ তোমাদের নিকট থাকার দরুন তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" কেউ কেউ বলেন, অর্থাৎ আমার নিদর্শনগুলোর বরকতে তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, তোমরা এবং তোমাদের অনুসারিগণ আমার নিদর্শন বলে তাদের উপর প্রবল হবে।

সূরায়ে তা-হার আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰي . قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ -

অর্থাৎ—"ফিরআউনের নিকট যাবে, সে সীমালংঘন করেছে। মূসা (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কর্ম সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।" (সূরা তা-হা ঃ ২৪-২৮)

কথিত আছে, মূসা (আ) বাল্যকালে ফিরআউনের দাড়ি ধরেছিলেন। তাই ফিরআউন তাঁকে হত্যা করতে মনস্থ করেছিল। এতে আসিয়া (রা) ভীত হয়ে পড়লেন এবং ফিরআউনকে বললেন, মূসা শিশুমাত্র। ফিরআউন মূসা (আ)-এর সামনে খেজুর ও কাঠের অঙ্গার রেখে মূসা (আ)-এর জ্ঞান-বুদ্ধি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। মূসা (আ) খেজুর ধরতে উদ্যত হন, তখন ফেরেশতা এসে তাঁর হাত অঙ্গারের দিকে ফিরিয়ে দিলেন। তখন তিনি অঙ্গার মুখে পুরে দিলেন। অমনি তাঁর জিহ্বার কিছু অংশ পুড়ে যায় ও তাঁর জিহ্বায় জড়তার সৃষ্টি হয়। অতঃপর মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে এতটুকু জড়তা দূর করতে আবেদন করলেন যাতে লোকজন তাঁর কথা বুঝতে পারে; তিনি পুরোপুরি জড়তা দূর করার জন্যে দরখাস্ত করেননি।

হাসান বসরী (র) বলেন, 'নবীগণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে প্রয়োজন মাফিক দরখাস্ত করে থাকেন। এ জন্য তাঁর জিহ্বায় তার কিছুটা প্রভাব রয়েই যায়। এজন্যে ফিরআউন বলত যে, এটা মূসা (আ)-এর একটি বড় দোষ এবং এ জন্য মূসা (আ) নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে বলতে পারে না; তাঁর মনের কথা উত্তমরূপে বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করতে পারে না।

অতঃপর মূসা (আ) বললেন ঃ

وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ هَارُوْنَ اَخِيْ. اُشْدُدْ بِهٖ اَزْرِيْ وَاَشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِيْ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا. وَنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا. قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَامُوْسٰى.

অর্থাৎ—"আমার জন্যে করে দাও একজন সাহায্যকারী আমার স্বজনবর্গের মধ্য থেকে; আমার ভাই হারূনকে; তার দ্বারা আমার শক্তি সুদৃঢ় কর ও তাকে আমার কার্যে অংশী কর। যাতে আমরা তোমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি প্রচুর এবং তোমাকে স্মরণ করতে পারি অধিক। তুমি তো আমাদের সম্যক দ্রষ্টা। তিনি বললেন ঃ হে মূসা! তুমি যা চেয়েছ তোমাকে তা দেয়া হল।" (সূরা তা-হা ঃ ২৯-৩৬)

অন্য কথায় তুমি যা কিছুর আবেদন করেছ, আমি তা মঞ্জুর করেছি এবং তুমি যা কিছু চেয়েছ তা তোমাকে দান করেছি। আর এটা হয়েছে আপন প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার বিশিষ্ট মর্যাদার কারণে। তিনি তাঁর ভাইয়ের প্রতি ওহী প্রেরণের জন্যে সুপারিশ করায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। এটা একটা বড় মর্যাদা।

যেমন সূরায়ে আহযাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا

অর্থাৎ–"আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান।" (সূরা আহযাব ঃ ৬৯)

সূরা মারয়ামের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُوْنَ نَبِيًّا.

অর্থাৎ– "আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে নবীরূপে।" (সূরা মারয়াম ঃ ৫৩)

একদা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রা) এক ব্যক্তিকে তার সম্প্রদায়ের লোকদের প্রশ্ন করা শুনতে পেলেন। আর তারা সকলে হজের জন্যে ভ্রমণরত ছিলেন। প্রশ্নটি হলো, কোন্ ভাই তাঁর নিজের ভাইয়ের প্রতি সর্বাধিক ইহসান করেছেন ? সম্প্রদায়ের লোকেরা নীরব রইল, তখন আয়েশা (রা) তাঁর হাওদার পাশের লোকদের বললেন, তিনি ছিলেন মূসা (আ) ইবন ইমরান। তিনি যখন আপন ভাইয়ের নবুওত প্রাপ্তির সুপারিশ করেন, তখন তা আল্লাহ তা'আলার দরবারে মঞ্জুর হয় এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করেন।

তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُوْنَ نَبِيًّا.

আবার আল্লাহ্ তা'আলা সূরা শু'আরায় ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ. قَوْمَ فِرْعَوْنَ. اَلَا يَتَّقُوْنَ. قَالَ رَبِّ اِنِّىْٓ اَخَافُ اَنْ يُّكَذِّبُوْنَ. وَيَضِيْقُ صَدْرِىْ وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِىْ فَاَرْسِلْ اِلٰى هٰرُوْنَ. وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَاَخَافُ اَنْ يَّقْتُلُوْنَ. قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ. فَاْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُوْلَآ اِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ قَالَ. اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا. وَلَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِىْ فَعَلْتَ وَاَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ.

অর্থাৎ– "স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বললেন, 'তুমি জালিম সম্প্রদায়ের নিকট যাও– ফিরআউন সম্প্রদায়ের নিকট; ওরা কি ভয় করে না? তখন সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি যে, ওরা আমাকে অস্বীকার করবে এবং আমার হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়বে, আর জিহ্বা তো সচল নয়। সুতরাং হারূনের প্রতিও প্রত্যাদেশ পাঠান! আমার বিরুদ্ধে তো ওদের একটি অভিযোগ রয়েছে, আমি আশংকা করি তারা আমাকে হত্যা করবে। আল্লাহ্ বললেন, না, কখনই নয়; অতএব, তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও, আমি তো তোমাদের সাথে রয়েছি শ্রবণকারী। অতএব, তোমরা উভয়ে ফিরআউনের নিকট যাও এবং বল, 'আমরা তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল, আর আমাদের সাথে যেতে দাও বনী ইসরাঈলকে।' ফিরআউন বলল, 'আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মধ্যে লালন-পালন করিনি? তুমি তো তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটিয়েছ। তুমি তোমার কর্ম যা করবার তা করেছ; তুমি অকৃতজ্ঞ।" (সূরা শু'আরা ঃ ১০-১৯)

মোদ্দাকথা, তারা দুইজন ফিরআউনের নিকট গমন করলেন এবং তাকে উপরোক্ত কথা বললেন। আর তাদেরকে যা কিছু সহকারে প্রেরণ করা হয়েছিল তার কাছে তাঁরা তা পেশ করলেন। তাঁরা তাকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি আহ্বান করলেন। তাঁরা তাকে বনী ইসরাঈলদের তার কর্তৃত্ব ও নির্যাতন থেকে মুক্ত করার আহ্বান জানান। যাতে তারা যেখানেই ইচ্ছে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করতে, নিরংকুশভাবে আল্লাহ তা'আলার একত্ব স্বীকার করতে, আল্লাহ্ তা'আলাকে একাগ্রচিত্তে ডাকতে এবং আপন প্রতিপালকের কাছে অনুনয় বিনয় করে নিজেদের ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু এতে ফিরআউন দাম্ভিকতার আশ্রয় নিল এবং জুলুম ও সীমালংঘন করল; সে মূসা (আ)-এর দিকে তাচ্ছিল্যের নজরে তাকাল এবং বলতে লাগল, 'তুমি কি আমাদের মাঝে বাল্যকালে লালিত-পালিত হওনি? আমরা কি তোমাকে আমাদের ঘরে পুত্রের মত লালন-পালন করিনি? তোমার প্রতি ইহসান করিনি? এবং একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিনি?' ফিরআউনের এই কথার দ্বারা বোঝা যায়, যে ফিরআউনের কাছে মূসা (আ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং যে ফিরআউন থেকে মূসা (আ) পলায়ন করেছিলেন, সে অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু কিতাবীরা মনে করে, যে ফিরআউনের নিকট

থেকে মূসা (আ) পলায়ন করেছিলেন তিনি মাদায়ানে অবস্থান কালেই সে মারা গিয়েছিল। আর যে ফিরআউনের কাছে মূসা (আ)-কে নবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছিল, সে ছিল অন্য লোক। আয়াতাংশ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ এর অর্থ হচ্ছে – তুমি কিবতী লোকটিকে হত্যা করেছ; আমাদের থেকে পলায়ন করেছ এবং আমাদের অনুগ্রহের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছ।

মূসা (আ) প্রতি উত্তরে বলেন ঃ

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِيْ رَبِّيْ حُكْمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ.

অর্থাৎ– 'মূসা বললেন, 'আমি তো এটা করেছিলাম তখন যখন আমি ছিলাম অজ্ঞ।' অন্য কথায়, আমার কাছে ওহী অবতীর্ণ হবার পূর্বে আমি এটা করেছিলাম। অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত ছিলাম, তখন আমি তোমাদের নিকট হতে পলায়ন করলাম। তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে জ্ঞানদান করেছেন এবং আমাকে রাসূলরূপে মনোনীত করেছেন। (২৬ ঃ ১৯-২১) মূসা (আ)-এর প্রতি ফিরআউনের লালন-পালন ও অনুগ্রহ করার উল্লেখের জবাবে—মূসা (আ) বলেন ঃ

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ. قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ. قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. إِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ. قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُوْنَ. قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَاءِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ. قَالَ إِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ. قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا. إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.

অর্থাৎ– 'আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছ তা তো এই যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ। তুমি যে উল্লেখ করেছ, তুমি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ অথচ আমি বনী ইসরাঈলের একজন; আর এর পরিবর্তে তুমি একটা গোটা সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে আপন কাজে নিযুক্ত রেখেছ এবং তাদেরকে তোমার খেদমত করার কাজে দাসে পরিণত করে রেখেছ। ফিরআউন বলল, 'জগতসমূহের প্রতিপালক আবার কী?' মূসা বলল, 'তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।' ফিরআউন তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা শুনছ তো?' মূসা বলল, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণেরও প্রতিপালক। ফিরআউন বলল, 'তোমাদের প্রতি প্রেরিত তোমাদের রাসূলটি তো নিশ্চয়ই পাগল।' মূসা বলল, তিনি পূর্ব-পশ্চিমের এবং এদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা বুঝতে। (সূরা শু'আরা ঃ ২২-২৮)

ফিরআউন ও মূসা (আ)-এর মধ্যে যে সব কথোপকথন, যুক্তিতর্কের অবতারণা ও বাদ-প্রতিবাদ হয়েছিল এবং মূসা (আ) দুশ্চরিত্র ফিরআউনের বিরুদ্ধে যেসব বুদ্ধিবৃত্তিক ও

দৃষ্টিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণের অবতারণা করছিলেন; আল্লাহ তা'আলা তার উল্লেখ করেছেন এভাবে যে, ফিরআউন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করেছিল এবং দাবি করেছিল যে, সে নিজেই মাবূদ ও উপাস্য। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ.

অর্থাৎ— সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল, 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।' (সূরা নাযিআত : ২৩-২৪)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন :

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي.

অর্থাৎ-"ফিরআউন বলল, হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না।" (সূরা কাসাস : ৩৮) উপরোক্ত বক্তব্য উচ্চারণকালে সে জেনে-শুনেই গোয়ার্তুমি করেছে, কেননা সে সম্যক জানতো যে, সে নেহাত একটি দাস, আর আল্লাহ্ই হচ্ছেন সৃজনকর্তা, উদ্ভাবন কর্তা, রূপদাতা, প্রকৃত উপাস্য।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ.

অর্থাৎ— "তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল?" (সূরা নাম্‌ল : ১৪)

এজন্যেই সে মূসা (আ)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করতে গিয়ে এবং একথা প্রকাশ করতে গিয়ে মূসা (আ)-কে যে রিসালাত প্রদানকারী কোন প্রতিপালকই নেই—সে বলেছিল, وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ জগতসমূহের প্রতিপালক আবার কে? কেননা, তাঁরা দু'জন [মূসা (আ) ও হারূন (আ)] তাকে বলেছিলেন, إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমরা জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল।' (সূরা শু'আরা : ১৬) যেন তাদের দুজনকে বলছিল, তোমরা ধারণা করছ যে, জগতসমূহের প্রতিপালক তোমাদেরকে প্রেরণ করেছেন—এরূপ প্রতিপালক আবার কে? জবাবে মূসা (আ) বলেছিলেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন :

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ-

অর্থাৎ— জগতসমূহের প্রতিপালক এসব দৃশ্যমান আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর এবং এগুলোর মধ্যে যেসব সৃষ্টি বিদ্যমান রয়েছে যেমন মেঘ, বাতাস, বৃষ্টি, তৃণলতা, জীব-জন্তু ইত্যাদির সৃজন কর্তা। প্রতিটি বিশ্বাসী লোক জানে যে, এগুলি নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি, এদের একজন সৃষ্টিকর্তা অবশ্যই আছেন আর তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা; তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই; তিনিই জগতসমূহের প্রতিপালক। ফিরআউন তার আশে-পাশে উপবিষ্ট উজির-নাজির ও

আমীর-উমারাকে মূসা (আ)-এর সুপ্রমাণিত রিসালাত অবমাননা এবং খোদ মূসা (আ)-কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার লক্ষ্যে বলল, তোমরা কি মূসার অযৌক্তিক কথাবার্তা শুনছ? মূসা (আ) তখন তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَائِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ অর্থাৎ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্বে তোমাদের বাবা, দাদা ও অতীতের সমস্ত সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করেছেন; কেননা প্রত্যেকেই জানে যে, সে নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি; তার পিতামাতা কেউই নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। অন্য কথায়, সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত কোন কিছুই সৃষ্টি হয়নি এবং প্রত্যেককেই জগতসমূহের প্রতিপালক সৃষ্টি করেছেন। এই দু'টি বিষয়েরই নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

سَنُرِيْهِمْ اٰيَاتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ.

অর্থাৎ- আমি ওদের জন্যে আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করব বিশ্বজগতে এবং ওদের নিজেদের মধ্যে; ফলে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটাই সত্য।' (সূরা হা-মীম আস-সাজদা ঃ ৫৩) এসব নিদর্শন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠা সত্ত্বেও ফিরাউন তার গাফিলতির নিদ্রা থেকে জাগ্রত হল না এবং নিজেকে পথভ্রষ্টতা থেকে বের করল না বরং সে তার স্বেচ্ছাচারিতা, অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতায় অটল রইল। আর মন্তব্য করল ঃ

اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ. অর্থাৎ— 'নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে প্রেরিত রাসূলটি পাগল।'

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ.

সে বলল, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রতিপালক যদি তোমরা বুঝতে। (সূরা শু'আরা ঃ ২৭-২৮)

তিনিই এসব উজ্জ্বল নক্ষত্রকে অনুগত করেছেন এবং ঘূর্ণায়মান কক্ষপথে এগুলোকে আবর্তিত করছেন। তিনিই অন্ধকার ও আলোর সৃষ্টিকর্তা, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, উপগ্রহ, চলমান ও স্থির তারকারাজির সৃজনকর্তা; রাতকে অন্ধকার সমেত এবং দিনকে আলো সমেত সৃষ্টিকারী; সবকিছু তাঁরই অধীনে, নিয়ন্ত্রণে ও ইখতিয়ারে চলমান এবং নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণরত। সব সময়ই একে অন্যকে অনুসরণ করছে এবং নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরে চলেছে। সুতরাং তিনিই মহান সৃষ্টিকর্তা, মালিক, নিজ ইচ্ছেমাফিক আপন মাখলুকের কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপকারী। যখন ফিরআউনের বিরুদ্ধে দলীল-প্রমাণাদি পেশ করা হল, তার সন্দেহ দূরীভূত হল এবং হঠকারিতা ছাড়া তার কোন যুক্তিই অবশিষ্ট রইল না। তখন সে জোর-জবরদস্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগের কৌশল গ্রহণ করল। যেমন আয়াতে উক্ত হয়েছে ঃ

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ -

অর্থাৎ— 'ফিরআউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করে রাখব।' মূসা (আ) প্রতি উত্তরে বলেন, اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَىْءٍ مُّبِيْنٍ অর্থাৎ— 'আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন নিয়ে আসলেও?' ফিরআউন বলল, فَأْتِ بِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ অর্থাৎ— 'তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে তা উপস্থিত কর।'

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.

অর্থাৎ— "অতঃপর মূসা তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগর হয়ে গেল এবং মূসা হাত বের করল আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল।" (সূরা শু'আরা ঃ ২৮ -৩৩)

এ দু'টো স্পষ্ট নিদর্শন যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে শক্তিশালী করেছিলেন। আর এ দু'টো নিদর্শন হচ্ছে লাঠি ও হাত। এগুলো দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বিরাট অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শন করলেন যাতে সকল মানবীয় জ্ঞান ও দৃষ্টি মু'জিযা দু'টোর কাছে হার মেনে গেল। যখন তিনি হাত থেকে লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তখন এটা বিরাট আকারের অত্যাশ্চর্য মোটা ভয়ংকর ও বিস্ময়কর সাপে পরিণত হল। এমনকি কথিত আছে যে, ফিরআউন এটাকে দেখার পর এতই ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল যে, তৎক্ষণাৎ তার দাস্ত হতে লাগল; একদিনেই তার চল্লিশ বার দাস্ত হল অথচ এর পূর্বে সে চল্লিশ দিনে একবার পায়খানায় যেত। এখন অবস্থা বিপরীতে দাঁড়াল। অনুরূপভাবে যখন মূসা (আ) তাঁর নিজ হাত নিজ বগলে রাখলেন এবং বের করলেন তখন তা চাঁদের একটি টুকরার ন্যায় সমুজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসল। আর এমন আলো বিচ্ছুরিত করতে লাগল যা চোখকে একেবারে ঝল্সিয়ে দেয়। পুনরায় যখন হাত বগলের মধ্যে স্থাপন করলেন, তখন তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসল। এসব নিদর্শন দেখার পরও ফিরআউন এর থেকে কোনভাবেই উপকৃত হলো না। বরং সে যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থায়ই রয়ে গেল। সে প্রকাশ করতে লাগল যে, এসব জাদু ব্যতীত অন্য কিছু নয়। তাই সে জাদুকরদের দ্বারা মূসা (আ)-এর মুকাবিলা করতে ইচ্ছা পোষণ করল। সুতরাং সে তার রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার সমস্ত জাদুকরের মাধ্যমে মূসা (আ)-কে মুকাবিলা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করল। অতঃপর সে লোক পাঠাল যারা সমগ্র রাজ্যের, তার প্রজাবর্গের, তার নিয়ন্ত্রণাধীন জাদুকরদের সমবেত করবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা নির্ধারিত জায়গায় পেশ করা হবে। এতে ফিরআউন, তার পারিষদবর্গ, আমীর-উমারা ও অনুসারীদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার অসীম কুদরত, ক্ষমতা ও নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা তা-হায় ইরশাদ করেন ঃ

فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي. اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ. قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ.

অর্থাৎ— অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদায়ানবাসীদের মধ্যে ছিলে, হে মূসা! এর পরে তুমি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়ে নিয়েছি। তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করবে না। তোমরা দু'জন ফিরআউনের নিকট যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে, তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। তারা বলল, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে।" তিনি বললেন, "তোমরা ভয় করবে না, আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি।" (সূরা তা-হা ঃ ৪০-৪৬)

আল্লাহ্ তা'আলা যে রাতে মূসা (আ)-এর প্রতি ওহী নাযিল করেন, তাকে নবুওত দান করেন, নিজের কাছে ডেকে নিয়ে তাঁর সাথে একান্তে কথা বলেন, সে রাতে মূসা (আ)-কে সম্বোধন করে বলেন, "আমি তোমাকে প্রত্যক্ষ করছিলাম যখন তুমি ফিরআউনের ঘরে ছিলে, তুমি আমার হিফাযতে ও যত্নে ছিলে। তারপর আমি তোমাকে মিসর ভূখণ্ড থেকে বের করে আমার ইচ্ছা, কুদরত ও কৌশল মাফিক তোমাকে মাদায়ানে নিয়ে আসলাম। সেখানে তুমি কয়েক বছর অবস্থান করলে। তারপর তুমি নবুওতের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলে অর্থাৎ আমার নির্ধারিত তাকদীর অনুযায়ী। তোমাকে আমার কালাম ও রিসালাতের জন্যে আমি মনোনীত করলাম। সুতরাং তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসহ যাত্রা কর আর যখন তোমরা আমাকে স্মরণ করবে কিংবা তোমাদের আহ্বান করা হবে তোমরা আমার স্মরণে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে না; কেননা, ফিরআউনেকে সম্বোধন করার সময়, তার প্রতি উত্তর প্রদানের সময়, তার প্রতি উপদেশ দানের সময় এবং তার সম্মুখে দলীল পেশ করার সময় আমার স্মরণ তোমাদের বিজয় দানে সাহায্য করবে। আবার কোন কোন হাদীসে এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, আমার ঐ বান্দাই পরিপূর্ণ বান্দা যে তার প্রতিপক্ষের সাথে মুকাবিলার সময়ও আমাকে স্মরণ করে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

অর্থাৎ—"হে মুমিনগণ! তোমরা যখন কোন দলের মুকাবিলা করবে তখন অবিচলিত থাকবে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা আনফাল ঃ ৪৫)

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা নির্দেশ দিয়ে বলেন, "তোমরা দুইজনে ফিরআউনের কাছে যাত্রা কর সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে, তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।" (সূরা তা-হা ঃ ৪৩)

ফিরআউনের কুফরী, জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারটি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও তার সাথে নম্র কথা বলার নির্দেশ, মাখলুকের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার পরম রহমত, বরকত, মেহেরবানী, নম্রতা ও ধৈর্যশীলতার পরিচায়ক। ফিরআউন ছিল তখনকার যুগে আল্লাহ্

তা'আলার নিকৃষ্টতম সৃষ্টি অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ঐ যমানার শ্রেষ্ঠতম মনোনীত ব্যক্তিত্বকে তার হিদায়াতের জন্যে তার কাছে প্রেরণ করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে নম্র ভাষায় তাকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার জন্যে নির্দেশ দেন। আবার তাদের দুইজনকে তার সাথে এমন ব্যবহার করার জন্যে নির্দেশ দেন, যেমনটি যার উপদেশ গ্রহণ কিংবা ভয় করার সম্ভাবনা আছে তার সাথে করা হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সা)-কে সম্বোধন করে ইরশাদ করেন ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ .

অর্থাৎ— 'তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়।' (সূরা নাহ্ল ঃ ১২৫)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا تُجَادِلُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ.

তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না তবে তাদের সাথে করতে পার, যারা তাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী। (সূরা আনকাবূত ঃ ৪৬)

হাসান বসরী (র) বলেন ঃ فَقُوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا আয়াতাংশের মাধ্যমে তার প্রতি রেয়াত প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে— তোমরা দু'জনে তাকে বলবে, তোমার রয়েছেন একজন প্রতিপালক, তোমার জন্যে রয়েছে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান এবং তোমার সামনে রয়েছে বেহেশত-দোযখ। ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র) বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে তোমরা দু'জন তাকে বলে দাও, শাস্তি ও রোষের তুলনায় আমি আল্লাহর্ ক্ষমা ও দয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। য়াযিদ আর রাক্কাশী (র) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, শত্রুর সাথে যিনি এরূপ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছেন বন্ধুর সাথে কিরূপ ব্যবহার এবং তাকে কিরূপ আহ্বানের উপদেশ দেবেন তা সহজেই অনুমেয়। আল্লাহ্র বাণী ঃ

قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى তারা বলল ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালঙ্ঘন করবে।" (সূরা তা-হা ঃ ৪৫)

এটা এজন্যে যে ফিরআউন ছিল অত্যাচারী, অনমনীয়, শয়তান ও সীমালঙ্ঘনকারী; মিসরে তার শক্তি ছিল দুর্দম, সে ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং বিরাট ক্ষমতা ও সৈন্য-সামন্তের অধিকর্তা। তাই মানবীয় চরিত্রের ধারক ও বাহক হিসেবে তাঁরা দু'জনই তার ব্যাপারে ভীত হলেন এবং প্রকাশ্যত তাদের উপর সে হামলা করতে পারে এরূপ আশঙ্কা করছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দৃঢ় থাকতে অনুপ্রাণিত করেন। তিনিই সুউচ্চ, সুমহান। তিনি বলেন, "তোমরা ভয় করবে না, আমি তোমাদের সাথে রয়েছি; আমি শুনি ও আমি দেখি।" অন্য এক আয়াতেও বলেন, اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ "আমি তোমাদের সাথে শ্রবণকারী।"

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَأْتِيَاهُ فَقُوْلَا إِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ. قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ. وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. إِنَّا قَدْ أُوْحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى.

সুতরাং তোমরা তার নিকট যাও এবং বল, আমরা তোমার প্রতিপালকের রাসূল। সুতরাং আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না, আমরা তো তোমার নিকট এনেছি তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে নিদর্শন এবং শান্তি তাদের প্রতি যারা অনুসরণ করে সৎপথ। আমাদের প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয়েছে যে, শাস্তি তার জন্যে যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা তা-হা ঃ ৪৭-৪৮)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাঁদের দু'জনকে নির্দেশ দিলেন যাতে তাঁরা ফিরআউনের নিকট যায় এবং তাকে এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের দিকে আহ্বান করেন। আর বনী ইসরাঈলকে যেন সে তার কয়েদ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দেয়। এবং তাদেরকে যেন সে আর কষ্ট না দেয়। তাদের সাথে যেতে যেন অনুমতি দেয় এবং তাদেরকে তারা আরো বলেন, "আমরা তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে মহা নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আর তা হচ্ছে লাঠি ও হাতের মু'জিযা। শান্তি একমাত্র তাদেরই প্রতি যারা অনুসরণ করে সৎপথ।" সৎপথ অনুসারীদের সাথে শান্তিকে সম্পৃক্ত করার বর্ণনাটি খুবই চিত্তাকর্ষক ও তাৎপর্যপূর্ণ। তারপর তাঁরা তাকে অস্বীকৃতির মন্দ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, আমাদের কাছে ওহী এসেছে যে, শাস্তি ঐ ব্যক্তির জন্যে যে সত্যকে অন্তর দিয়ে অবিশ্বাস করে এবং কার্যত তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

সুদ্দী (র) প্রমুখ আলিম উল্লেখ করেছেন যে, মূসা (আ) যখন মাদায়ান থেকে প্রত্যাবর্তন করে আপন মাতা ও ভাই হারূনের সাথে সাক্ষাৎ করেন, তখন তাঁরা রাতের খাবার খাচ্ছিলেন। খাবারের মধ্যে ছিল শালগম। তিনি তাঁদের সাথে তা খেলেন। তারপর তিনি বললেন, "হে হারূন! আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ও তোমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা ফিরআউনকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দিকে আহ্বান করি। সুতরাং তুমি আমার সাথে চল।" তখন তারা দু'জনেই ফিরআউনের মহলের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। তাঁরা দরজা বন্ধ পেলেন। মূসা (আ) দারোয়ানদের বললেন, তোমরা ফিরআউনের কাছে সংবাদ নিয়ে যাও যে, আল্লাহ্র রাসূল তার দরজায় উপস্থিত। দারোয়ানরা মূসা (আ)-কে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল।

কেউ কেউ বলেছেন, 'ফিরআউন তাঁদেরকে দীর্ঘক্ষণ পর প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছিল। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন, 'দু'বছর পর তাদেরকে ফিরআউন অনুমতি দিয়েছিল। কেননা, কেউ অনুমতি আনার জন্যে যেতে সাহস পায়নি।' আল্লাহই সম্যক অবগত। এরূপও কথিত আছে যে, মূসা (আ) দরজার দিকে অগ্রসর হয়ে লাঠি দ্বারা দরজায় আঘাত করেন। এতে ফিরআউন ভীষণ বিব্রত বোধ করল এবং তাদেরকে উপস্থিত করার জন্যে নির্দেশ দিল। তাঁরা দু'জনেই তার সম্মুখে দাঁড়ালেন এবং তাকে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক তার মহান সত্তার ইবাদতের প্রতি আহ্বান করলেন।

কিতাবীদের মতে, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে বলেছিলেন, 'লাওয়ী ইবন ইয়াকূব (আ) -এর বংশধর হারূন (আ) অতি শিগগির আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তোমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তিনি নিজের সাথে বনী ইস্রাঈলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে নিয়ে ফিরআউনের কাছে যান এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যা কিছু নিদর্শন প্রদান করেছেন ফিরআউনের কাছে তা যেন প্রকাশ করেন। আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে বলেন, "শিগগিরই আমি তার অন্তর কঠিন করে দেব তাতে সে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে যেতে দেবে না। আমার অধিকাংশ নিদর্শন ও অত্যাশ্চর্য বস্তুসমূহ মিসরে অবস্থিত।" আল্লাহ তা'আলা হারূন (আ)-এর প্রতি ওহী পাঠালেন তিনি যেন তাঁর ভাইয়ের দিকে অগ্রসর হন এবং হোরাইব পর্বতের নিকটবর্তী প্রান্তরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। যখন তিনি সাক্ষাৎ করেন তখন মূসা (আ) তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশের কথা অবহিত করলেন। যখন তাঁরা দু'জন মিসরে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁরা বনী ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরকে সমবেত করলেন এবং তাদেরকে সাথে নিয়ে ফিরআউনের কাছে গেলেন। ফিরআউনের কাছে আল্লাহ তা'আলার রিসালতের বাণী পৌঁছালে ফিরআউন বলল, 'আল্লাহ কে? আমি তাকে চিনি না এবং আমি বনী ইসরাঈলকে যেতে দেব না।'

আল্লাহ তা'আলা ফিরআউন সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ

قَالَ فَمَنْ رَّبُّكُمَا يَامُوْسٰى. قَالَ رَبُّنَا الَّذِىْ اَعْطٰى كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى. قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُوْنِ الْاُوْلٰى. قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّىْ فِىْ كِتَابٍ. لَا يَضِلُّ رَبِّىْ وَلَا يَنْسٰى. اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. فَاَخْرَجْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى. كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ. اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى النُّهٰى. مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى .

অর্থাৎ— ফিরআউন বলল, হে মূসা! কে তোমাদের প্রতিপালক? মূসা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর পথনির্দেশ করেছেন।' ফিরআউন বলল, 'তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী?' মূসা বলল, এটার জ্ঞান আমার প্রতিপালকের নিকট কিতাবে রয়েছে; আমার প্রতিপালক ভুল করেন না এবং বিস্মৃতও হন না। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন বিছানা এবং এতে করে দিয়েছেন তোমাদের চলবার পথ, তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন এবং আমি তা দ্বারা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা আহার কর ও তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য। আমি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা থেকে আবার তোমাদেরকে বের করব।" (সূরা তা-হা ঃ ৪৯-৫৫)

আল্লাহ তা'আলা ফিরআউন সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন। ফিরআউন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে বলে, "হে মূসা! তোমার প্রতিপালকটি কে?" মূসা (আ) পতিউত্তরে বলেন, আমাদের প্রতিপালক সমগ্র মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, তাদের আমল, রিযিক ও

মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করেছেন। আর এগুলো তাঁর নিকট সংরক্ষিত কিতাবে বা লাওহে মাহফূযে লিখে রেখেছেন। অতঃপর প্রতিটি সৃষ্টিকে তার জন্যে নির্ধারিত বিষয় বস্তুর প্রতি পথনির্দেশ করেছেন। প্রত্যেক মাখলুকের আমল আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ ইল্ম, কুদরত ও তকদীর অনুযায়ী ঘটে থাকে।

অন্য আয়াতে অনুরূপ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذِىْ خَلَقَ فَسَوّٰى وَالَّذِىْ قَدَّرَ فَهَدٰى.

অর্থাৎ— তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন এবং যিনি পরিমিত বিকাশ সাধন করেন ও (মাখলুককে) সেদিকে পথনির্দেশ করেন। (সূরা আলা ঃ ১-৩)

ফিরআউন মূসা (আ)-কে বলেছিল, "যদি তোমার প্রতিপালক সৃজনকর্তা, পরিমিত বিকাশকারী, মাখলুককে তাঁর নির্ধারিত পথে পথ-প্রদর্শনকারী হয়ে থাকেন এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য না হয়ে থাকেন, তবে পূর্বেকার যুগের লোকেরা কেন তাঁকে ছেড়ে অন্যদের ইবাদত করল? তুমি তো জান, পূর্বেকার যুগের লোকেরা তারকারাজি ও দেব-দেবীকে আল্লাহর সাথে শরীক করত, তাহলে পূর্বেকার গোত্রগুলোকে কেন তিনি তোমার উল্লিখিত সঠিক পথে পরিচালনা করলেন না ?" মূসা (আ) বললেন, 'তারা যদিও আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করেছে এটা তোমার পক্ষের বা আমার বিপক্ষের কোন দলীল হতে পারে না। কেননা, তারা তোমার ন্যায় মূর্খতার শিকার হয়ে যে সব অপকর্ম করেছে, কিতাবসমূহে তাদের ছোট বড় সব আমলের কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এবং আমার মহান প্রতিপালক তাদের শাস্তিদান করবেন। এক অণুপরিমাণ কারো উপর তিনি জুলুম করবেন না। কেননা, বান্দাদের সব আমলই তাঁর নিকট একটি লিপিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, কিছুই বাদ পড়বে না এবং আমার প্রতিপালক কিছুই বিস্মৃত হবেন না। এরপর মূসা (আ) ফিরআউনের কাছে আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব, বস্তুসমূহ সৃষ্টির শক্তি, ভূমিকে বিছানারূপ, আকাশকে ছাদরূপে সৃষ্টি করার শক্তি রয়েছে— এর উল্লেখ করেন। বান্দা ও জীব-জানোয়ারের রিযিকের জন্যে বাদল ও বৃষ্টিকে যে তিনি নিয়ন্ত্রণাধীনে রেখেছেন এটাও তিনি উল্লেখ করেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

كُلُوْا وَارْعَوْا اَنْعَامَكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُوْلِى النُّهٰى

তোমরা আহার কর ও গবাদি পশু চারণ কর অবশ্যই তাতে নিদর্শন রয়েছে সহজ-সরল বিশুদ্ধ বিবেক ও সুস্থ প্রকৃতিসম্পন্ন লোকদের জন্যে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব পুরুষদের সৃষ্টিকর্তা।

যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. اَلَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَاءً وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ. فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ— "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন। সুতরাং তোমরা জেনেশুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিয়ো না।" (সূরা বাকারা ঃ ২১-২২)

এ আয়াতে বৃষ্টির মাধ্যমে ভূমিকে সজীব করা ও উদ্ভিদ জন্মানোর মাধ্যমে পৃথিবীকে সুশোভিত করা দ্বারা মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এই প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন, "মাটি থেকে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং তা হতে পুনর্বার তোমাদেরকে বের করব।"

অনুরূপ সূরায়ে আ'রাফের ২৯ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ অর্থাৎ— 'তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে।'

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ. وَلَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ. وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

অর্থাৎ— তিনি সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, তারপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই; এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা রূম ঃ ২৭)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ اَرَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاَبٰى. قَالَ اَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوْسٰى. فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهٗ نَحْنُ وَلَا اَنْتَ مَكَانًا سُوًى. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيْنَةِ وَاَنْ يُّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى.

আমি তো তাকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম কিন্তু সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে। সে বলল, হে মূসা! তুমি কি আমাদের নিকট এসেছ তোমার জাদু দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ হতে বের করে দেবার জন্যে? আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করব এটার অনুরূপ জাদু, সুতরাং আমাদের ও তোমার মধ্যে নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় ও এক মধ্যবর্তী স্থান, যার ব্যতিক্রম আমরাও করব না এবং তুমিও করবে না। মূসা বললেন, 'তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং যেদিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হবে।' (সূরা- তা-হা ঃ ৫৬-৫৯)

আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউনের দুর্ভাগ্য এবং আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অমান্য করে সে যে পাপিষ্ঠতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছে এর উল্লেখ করছেন। ফিরআউন মূসা (আ)-কে বলেছিল যে, মূসা (আ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার সবটাই জাদু।

কাজেই সেও এরূপ জাদু দ্বারা মূসা (আ)-এর মুকাবিলা করবে। অতঃপর মুকাবিলার জন্যে মূসা (আ)-কে সে একটি নির্দিষ্ট সময় ও স্থান নির্ধারণ করতে বলল। আর মূসা (আ)-এরও উদ্দেশ্য ছিল যাতে তিনি জনতার সামনে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিদর্শন, দলীল ও প্রমাণাদি প্রকাশ করতে পারেন। তাই তিনি বললেন, 'তোমাদের নির্ধারিত সময় হচ্ছে তোমাদের উৎসবের দিন, যেদিন তারা সাধারণত সমবেত হতো। সেদিন দিনের প্রথমভাগে সূর্যের আলো প্রখর হবার সময় জনগণকে সমবেত করা হবে, যাতে সত্য সুস্পষ্টভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরা যায়। এই মুকাবিলা রাতের বেলায় হবার জন্যে মূসা (আ) বলেননি, যাতে তাদের মধ্যে কোন সন্দেহ উদয় না হয় এবং তাদের জন্যে সত্য ও অসত্য বোঝা অসম্ভব না হয়ে পড়ে। বরং তিনি চেয়েছেন যাতে এই মুকাবিলা প্রকাশ্য দিবালোকে অনুষ্ঠিত হয়। কেননা, তিনি তাঁর প্রতিপালক প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সুনিশ্চিত ছিলেন যে, এই মুকাবিলায় আল্লাহ তা'আলা নিজের নিদর্শন ও দীনকে বিজয় মণ্ডিত করবেন— যদিও কিবতীরা তা কোনমতেই মেনে নিতে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন।

فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى. قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى .

অর্থাৎ— "অতঃপর ফিরআউন উঠে গেল এবং পরে তার কৌশলসমূহ একত্র করল ও তারপর আসল। মূসা (আ) তাদেরকে বলল, দুর্ভোগ তোমাদের। তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে না। করলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সেই ব্যর্থ হয়েছে। ওরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করল এবং ওরা গোপনে পরামর্শ করল। ওরা বলল, এ দু'জন অবশ্যই জাদুকর, তারা চায় তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে বহিষ্কার করতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস করতে। অতএব, তোমরা তোমাদের জাদু ক্রিয়া সংহত কর। অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও এবং যে আজ জয়ী হবে সে সফল হবে। (সূরা তা-হা ঃ ৬০-৬৪)

আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনের সত্যের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার প্রস্তুতি সম্বন্ধে বলেন যে, ফিরআউন চলে গেল এবং তার রাজ্যের সমস্ত জাদুকরকে একত্র করল। ঐ সময় মিসর দেশটি জাদুকরে ভরপুর ছিল। আর এ জাদুকররা ছিল তাদের পেশায় খুবই পটু। প্রতিটি শহর ও প্রতিটি স্থান থেকে সংগ্রহ করে জাদুকরদেরকে সমবেত করা হল। বস্তুত তাদের একটি বিরাট দল সমবেত হল। কেউ কেউ বলেন, যথা মুহাম্মদ ইব্ন কা'ব (র) বলেন, "তারা ছিল সংখ্যায় আশি হাজার।" কাসিম ইব্ন আবূ বুরদা (র) বলেন, "তারা ছিল সংখ্যায় সত্তর জাহার।" সুদ্দী (র) বলেন, "তাদের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজারের মধ্যে।" আবূ উমামা (র) বলেন, "তারা ছিল উনিশ হাজার।" মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, "তারা ছিল পনের

হাজার।" কা'ব আহবারের মতে, তারা ছিল বার হাজার। ইব্ন আবূ হাতিম (র) আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "তারা ছিল সংখ্যায় সত্তরজন।" অন্য সূত্রে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তারা ছিল বনী ইসরাঈল বংশীয় চল্লিশজন ক্রীতদাস। এদেরকে ফিরআউন তাদের গণকদের কাছে যেতে নির্দেশ দিয়েছিল এবং সেখানে জাদু শিক্ষা করার জন্যে হুকুম দিয়েছিল। এই জন্যই তারা আত্মসমর্পণের সময় বলেছিল, 'তুমি আমাদেরকে জাদু শিখতে বাধ্য করেছিলে।' এই অভিমতটি সন্দেহযুক্ত।

ফিরআউন, তার আমীর-উমারা, পারিষদবর্গ, সরকারী কর্মচারীবৃন্দ এবং নির্বিশেষে দেশের সকলেই মাঠে হাযির হল। কেননা, ফিরআউন তাদের মধ্যে ঘোষণা করেছিল তারা সকলে যেন এই বিরাট মেলায় হাযির হয়। তারা বের হয়ে পড়ল এবং বলাবলি করতে লাগল, জাদুকররা যদি জিতে যায় তাহলে আমরা তাদেরই অনুসরণ করব। মূসা (আ) জাদুকরদের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে উপদেশ দিলেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন ও দলীলাদির বিরুদ্ধে ভ্রান্ত জাদু নিয়ে মুকাবিলায় অবতরণের জন্যে তাদেরকে তিরস্কারও করেন। তিনি তাদেরকে বললেন, "দুর্ভোগ তোমাদের! তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে না। করলে তিনি তোমাদেরকে শাস্তি দ্বারা সমূলে ধ্বংস করে দেবেন। যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে সেই ব্যর্থ হয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে নিজেদের কর্ম সম্বন্ধে বিতর্ক করল।" কেউ কেউ বলেন, তাদের বিতর্কের অর্থ হচ্ছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, এটা নবীর কথা, জাদু নয়। আবার কেউ কেউ বলে, 'বরং সে-ই জাদুকর।' আল্লাহ্ তা'আলাই সম্যক জ্ঞাত।

এ বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তারা গোপনে সলাপরামর্শ করল এবং বলতে লাগল, মূসা (আ) ও তাঁর ভাই হারূন (আ) দুজনই বিজ্ঞ ও দক্ষ জাদুকর; তারা তাদের জাদুবিদ্যায় অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের ব্যাপারে যেন লোকজন সমবেত হয়, তারা বাদশাহ ও তার পারিষদবর্গের উপর চড়াও হতে পারে, তোমাদের সামগ্রিকভাবে নির্মূল করে দিতে পারে। আর এ জাদুবিদ্যা দিয়ে যেন তারা তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। তারা বলতে লাগল, 'তোমরা তোমাদের জাদু ক্রিয়া সংহত কর, অতঃপর সারিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত হও এবং যে আজ জয়ী হবে সে সফল হবে।' প্রথম কথাটি তারা এজন্য বলল, যাতে তারা তাদের কাছে প্রাপ্ত যাবতীয় ধরনের চেষ্টা, তদবীর, ছলচাতুরী, অন্যের প্রতি অপবাদ, জাদু ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেয়। আফসোস, আল্লাহর কসম, তাদের সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও যুক্তি-তর্ক ছিল মিথ্যা ও ভ্রান্ত। অপবাদ, জাদু ও ভিত্তিহীন যুক্তি-তর্ক কেমন করে এমন সব মু'জিযার মুকাবিলা করতে পারে, যেগুলো মহান আল্লাহ আপন বান্দা ও রাসূল মূসা (আ)-এর মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন। রাসূলকে এমন দলীল দ্বারা শক্তিশালী ও পুষ্ট করা হয়েছে, যার সামনে দৃষ্টি স্তিমিত হয়ে যায় এবং লোক হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। ফিরআউন বলতে লাগল, 'তোমাদের কাছে যা কিছু তদবীর জানা রয়েছে সব কিছু নিয়ে মাঠে নেমে পড় এবং একতাবদ্ধ হয়ে মুকাবিলা কর।' অতঃপর তারা পরস্পরকে মুকাবিলার জন্যে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করতে লাগল। কেননা, ফিরআউন তাদেরকে পদমর্যাদা ও উপঢৌকনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অবশ্যই শয়তানের প্রতিশ্রুতি প্রতারণামূলক।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قَالُوْا يَامُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى. قَالَ بَلْ اَلْقُوْا. فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى. فَاَوْجَسَ فِىْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى. قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى. وَاَلْقِ مَا فِىْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا. اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى.

অর্থাৎ—তারা বলল, 'হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি।' মূসা (আ) বলল, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।' তাদের জাদু প্রভাবে অকস্মাৎ মূসা (আ)-এর মনে হল তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে। মূসা (আ) তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল। আমি বললাম, 'ভয় করবে না, তুমিই হচ্ছো প্রবল। তোমার ডান হাতে যা রয়েছে তা নিক্ষেপ কর; এটা ওরা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে। ওরা যা করেছে তা তো কেবল জাদুকরের কৌশল। জাদুকর যেখানেই আসুক, সফল হবে না।' (সূরা তা-হা ঃ ৬৫-৬৯)

জাদুকররা যখন সারিবদ্ধ হল, মূসা (আ) তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারা তখন মূসা (আ)-কে বলল, 'হয় তুমি আমাদের আগে নিক্ষেপ কর, অথবা আমরা আগে নিক্ষেপ করি।' মূসা (আ) বললেন, 'বরং তোমরাই প্রথম নিক্ষেপ কর।' অতঃপর তারা দড়ি ও লাঠিগুলো নিক্ষেপ করার ঘোষণা দিল এবং পারদ ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এগুলোতে স্থাপন করল। আর এ জন্যে দড়ি ও লাঠিগুলো দর্শকের চোখে মনে হচ্ছিল যেন নিজ ইচ্ছে মাফিক ছুটাছুটি করছে অথচ এগুলো যন্ত্রের জন্যেই নড়াচড়া করছিল। এভাবে তারা মানুষের চোখকে জাদু করেছিল এবং তাদের মনের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছিল। তারা তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো নিক্ষেপ করার সময় বলেছিল, ফিরআউনের মহা মর্যাদার শপথ! আমরা বিজয়ী হবই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْا بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ.

'যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকের চোখে জাদু করল, তাদেরকে আতংকিত করল এবং তারা এক বড় রকমের জাদু দেখাল।' মূসা (আ) জনগণের জন্যে একটু ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি আশংকা করতে লাগলেন যে, ওহী প্রাপ্তির পূর্বে তিনি তার হাতের লাঠি ছাড়তে পারছেন না, তাই লাঠি ছাড়ার পূর্বেই যদি জনগণ তাদের জাদুতে মুগ্ধ হয়ে প্রতারিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা নির্দিষ্ট মুহূর্তে লাঠি নিক্ষেপ করার জন্যে মূসা (আ)-এর কাছে ওহী নাযিল করেন। মূসা (আ) তখন হাতের লাঠি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ. اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ. وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ.

অর্থাৎ—"তোমরা যা এনেছ তা জাদু, আল্লাহ্ তা'আলা এটাকে শীঘ্রই অসার করে দেবেন। আল্লাহ্ তা'আলা অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না। অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তা'আলা তার বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।" (সূরা ইউনুস ঃ ৮১-৮২)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ. فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ. وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ. قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ. رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ.

অর্থাৎ—মূসার প্রতি আমি প্রত্যাদেশ করলাম, 'তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর,' সহসা এটা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল, সেখানে তারা পরাভূত হল ও লাঞ্ছিত হল এবং জাদুকররা সিজদাবনত হল। তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি যিনি মূসা ও হারূন এরও প্রতিপালক। (সূরা আ'রাফ ঃ ১১৭-১২২)

একাধিক পূর্বসূরি আলিম উল্লেখ করেন যে, মূসা (আ) যখন আপন লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তখন তা পা, বড় গর্দান এবং ভয়ংকর ও ভীতিপ্রদ অবয়ববিশিষ্ট একটি বিরাট অজগরে পরিণত হল। জনতা এটাকে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়ল এবং ছুটে পালাতে লাগল। জনতা অজগর দেখে যখন পিছনে সরে গেল, অজগর সম্মুখ পানে অগ্রসর হল এবং জাদুকরদের দড়ি ও লাঠি দিয়ে তৈরি অলীক সৃষ্টিগুলোকে একে একে অতি দ্রুত গ্রাস করতে লাগল। জনতা অজগরের প্রতি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অন্যদিকে জাদুকররা মূসা (আ)-এর লাঠির কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল এবং এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করল যা তাদের ধারণার বাইরে ছিল, যা তাদের বিদ্যার ও পেশার আওতার বাইরে ছিল। এখন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে ও জানতে পারল যে, মূসা (আ)-এর কর্মকাণ্ড ভিত্তিহীন জাদু নয়, অবাস্তব নয়, মায়া নয়, নিছক ধারণা নয়, মিথ্যা নয়, অপবাদ নয়, পথভ্রষ্টতাও নয় বরং এটাই সত্য বা যথার্থ। সত্য দ্বারা পুষ্ট রাসূল ব্যতীত অন্য কোন ধারক ও বাহকের এরূপ অত্যাশ্চর্য প্রদর্শন করা আর কারো পক্ষেই সম্ভব না। এভাবে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর থেকে অজ্ঞতার পর্দা দূর করে দিলেন এবং তাদের অন্তরকে হিদায়াতের নূর দ্বারা আলোকিত করে দিলেন। তাকে কাঠিন্য মুক্ত করে দিলেন। ফলে তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং তার সন্তুষ্টির জন্যেই সিজদায় নত হল। তারা উপস্থিত জনতার পক্ষ থেকে কোন প্রকার শাস্তি বা নির্যাতনের আশংকা না করে প্রকাশ্যভাবে উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ করে বলতে লাগল, "আমরা মূসা ও হারূন-এর প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম।"

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ.

قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ.

অর্থাৎ— "তারপর জাদুকররা সিজদাবনত হল ও বলল, 'আমরা হারূন ও মূসার প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম।' ফিরআউন বলল ঃ 'কী, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা মূসাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে! দেখছি, সে তো তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলব এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করবই এবং তোমরা অবশ্যই জানতে পারবে—আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।' তারা বলল, 'আমাদের নিকট যে স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর উপর তোমাকে আমরা কিছুতেই প্রাধান্য দেব না; সুতরাং তুমি যা করতে চাও তা করতে পার। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছ তাও। আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী, যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো রয়েছে জাহান্নাম, সেথায় সে মরবেও না, বাঁচবেও না। যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সমুচ্চ মর্যাদা- স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই, যারা পবিত্র। (সূরা তা-হা ঃ ৭০-৭৬)

সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা), ইকরিমা, কাসিম ইব্‌ন আবূ বুরদা, আওযায়ী (র) প্রমুখ বলেন, 'যখন জাদুকররা মূসা (আ)-এর মুজিযা প্রত্যক্ষ করে সিজদায় অবনত হলেন তখন তারা জান্নাতে তাদের বসবাসের জন্য তৈরি ও তাদের অভ্যর্থনার জন্যে সুসজ্জিত ও দালানকোঠা অবলোকন করলেন আর এজন্যই তারা ফিরআউনের ভয়ভীতি, শাস্তি ও হুমকির প্রতি

ভ্রূক্ষেপমাত্র করলেন না। ফিরআউন যখন দেখতে পেল, জাদুকররা মুসলমান হয়ে গেছে এবং তারা মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর প্রচারিত বাণী লোকসমাজে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছে, সে ভীত হয়ে পড়ল এবং ভবিষ্যত আশংকায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এতে সে হতবিহ্বল হয়ে আপন অন্তর্দৃষ্টি ও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলল। তার মধ্যে ছিল শঠতা, ধোঁকাবাজী, প্রতারণা, পথভ্রষ্টতা ও জনগণকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার সুনিপুণ কৌশল। এজন্যই সে জনতার উপস্থিতিতে জাদুকরদের বলল, 'কী আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা মূসাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে!' অর্থাৎ আমার প্রজাদের সামনে এরূপ জঘন্য কাজটি করার পূর্বে কেন আমার সাথে পরামর্শ করলে না। অতঃপর সে তাদেরকে ধমকি দিল, শাস্তির ভয় দেখাল এবং মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলতে লাগল, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রধান; সে-ই তোমাদেরকে জাদুশিক্ষা দিয়েছে।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا. فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ .

অর্থাৎ—"ফিরআউন বলল, কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বে তোমরা এটাতে বিশ্বাস করলে? এ তো এক চক্রান্ত; তোমরা সজ্ঞানে এই চক্রান্ত করেছ নগরবাসীদেরকে এটা হতে বহিষ্কারের জন্যে। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই এটার পরিণাম জানবে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১২৩)

ফিরআউনের এ উক্তিটি একটি ভিত্তিহীন অপবাদ ব্যতীত কিছু নয়। প্রত্যেকটি বোধ-শক্তিসম্পন্ন লোকই জানে যে, এটা ফিরআউনের কুফরী, মিথ্যাচারিতা ও প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই নয় বরং এরূপ কথা ছেলেমেয়েদের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তার অমাত্যবর্গ ও অন্য সকলেরই জানা ছিল যে, মূসা (আ)-কে জাদুকররা কোনদিনও দেখেননি, তিনি কেমন করে তাদের প্রধান হতে পারেন? যিনি তাদেরকে জাদুশিক্ষা দিয়েছেন? এছাড়া তিনি তাদেরকে একত্র করেননি এবং তাদের একত্রিত হবার বিষয়টিও তাঁর কাছে জানা ছিল না, বরং ফিরআউন তাদেরকে ডেকেছে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল, গ্রাম-গঞ্জ, শহর-নগর, মিসরের শহরতলি ও বিভিন্ন জায়গা থেকে বাছাই করে তাদেরকে সে মূসা (আ)-এর সামনে উপস্থাপন করেছে।

সূরা আ'রাফে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوْسٰى بِاٰيَاتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَظَلَمُوْا بِهَا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ. وَقَالَ مُوْسٰى يَافِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ. حَقِيْقٌ عَلٰى اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ. قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَرْسِلْ مَعِىَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ. قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِاٰيَةٍ فَاْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ. فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ. وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ. قَالَ الْمَلَاُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اِنَّ هٰذَا لَسَاحِرٌ

عَلِيمٌ. يُرِيدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ. فَمَا ذَا تَاْمُرُوْنَ.

قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ اَرْسِلْ فِى الْمَدَائِنِ حَاشِرِيْنَ. يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوْا اِنَّ لَنَا لاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ. قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ. قَالُوْا يَامُوْسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقِىَ وَاِمَّا اَنْ نَكُوْنَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ. قَالَ اَلْقُوْا. فَلَمَّا اَلْقَوْا سَحَرُوْا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَاءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ. وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ .فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ. وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ. رَبِّ مُوسٰى وَهَارُوْنَ. قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ.اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌمَكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا. فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ. لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلاَفٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ. قَالُوْا اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا اِلاَّ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ— "তাদের পর মূসাকে আমার নিদর্শনসহ ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠাই; কিন্তু তারা এটা অস্বীকার করে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা লক্ষ্য কর। মূসা বলল, 'হে ফিরআউন! আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত। এটা স্থির নিশ্চিত যে, আমি আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলব না; তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণ আমি তোমাদের নিকট এনেছি সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দাও। ফিরআউন বলল, 'যদি তুমি কোন নিদর্শন এনে থাক তবে তুমি সত্যবাদী হলে তা পেশ কর। তারপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং তৎক্ষণাৎ এটা এক সাক্ষাৎ অজগর হল। সে তার হাত বের করল আর তৎক্ষণাৎ এটা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র উজ্জ্বল প্রতিভাত হল। ফিরআউন সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, এতো একজন সুদক্ষ জাদুকর, এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়। এখন তোমরা কী পরামর্শ দাও?

তারা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে কিঞ্চিৎ অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও, যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকরকে উপস্থিত করে। জাদুকররা ফিরআউনের নিকট এসে বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই তবে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?' সে বলল, 'হ্যাঁ, এবং তোমরা আমার সান্নিধ্য প্রাপ্তদেরও অন্তর্ভুক্ত হবে।' তারা বলল, 'হে মূসা! তুমিই কি নিক্ষেপ করবে, না আমরাই নিক্ষেপ করব?' সে বলল, 'তোমরাই

নিক্ষেপ কর', যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকের চোখে জাদু করল; তাদেরকে আতংকিত করল এবং তারা এক বড় রকমের জাদু দেখাল। আমি মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, 'তুমিও তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর, সহসা এটা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তারা যা করছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। সেখানে তারা পরাভূত হল ও লাঞ্ছিত হল এবং জাদুকররা সিজদাবনত হল। তারা বলল, আমরা ঈমান আনলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি – যিনি মূসা ও হারূন-এরও প্রতিপালক।

ফিরআউন বলল, 'কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বে তোমরা এটাতে বিশ্বাস করলে? এটা তো এক চক্রান্ত। তোমরা সজ্ঞানে এ চক্রান্ত করেছ নগরবাসীদের নগর থেকে বহিষ্কারের জন্যে। আচ্ছা, তোমরা শীঘ্রই এটার পরিণাম জানবে; আমি তো তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবই, তারপর তোমাদের সকলেরই শূলবিদ্ধও করব।' তারা বলল : 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাব। তুমি তো আমাদেরকে শাস্তি দান করছ শুধু এজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে ঈমান এনেছি। যখন এটা আমাদের নিকট এসেছে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্যদান কর এবং মুসলমানরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও। (সূরা আ'রাফ ১০৩-১২৬)

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা ইউনুসে ইরশাদ করেন :

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ. أَسِحْرٌ هَذَا. وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ. إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.

অর্থাৎ– "পরে আমার নিদর্শনসহ মূসা ও হারূনকে ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট প্রেরণ করি। কিন্তু ওরা অহংকার করে এবং ওরা ছিল অপরাধী সম্প্রদায়। তারপর যখন ওদের কাছে আমার নিকট হতে সত্য এল তখন ওরা বলল, 'এটা তো নিশ্চয়ই স্পষ্ট জাদু।' মূসা বলল, 'সত্য যখন তোমাদের নিকট আসল, তখন সে সম্পর্কে তোমরা এরূপ বলছ? এটা কি জাদু? জাদুকররা তো সফলকাম হয় না।' ওরা বলল, 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণকে যাতে পেয়েছি তুমি কি তা থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করবার জন্যে আমাদের নিকট এসেছ এবং যাতে দেশে তোমাদের দুজনের প্রতিপত্তি হয় এজন্য? আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বাসী নই।

ফিরআউন বলল, 'তোমরা আমার নিকট সকল সুদক্ষ জাদুকরকে নিয়ে এস। তারপর যখন জাদুকররা এল তখন তাদেরকে মূসা বলল, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।' যখন তারা নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বলল, 'তোমরা যা কিছু এনেছ তা জাদু, আল্লাহ জাদুকে অসার করে দেবেন। আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না। অপরাধীরা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ্ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।' (সূরা ইউনুস ঃ ৭৫-৮২)

আল্লাহ তা'আলা সূরা শূআরায় মূসা (আ) ও ফিরআউন সম্পর্কিত ঘটনা বর্ণনার্থে ইরশাদ করেন ঃ

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ. قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ. قَالَ فَأْتِ بِهٖ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ . فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ. وَنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِىَ بَيْضَاءُ لِلنّٰظِرِيْنَ. قَالَ لِلْمَلَاءِ حَوْلَهٗ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ. يُرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ. قَالُوْا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَائِنِ حَاشِرِيْنَ. يَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ. وَقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغَالِبِيْنَ. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِيْنَ. قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ. قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى اَلْقُوْا مَا اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ. فَاَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُوْنَ. فَاَلْقٰى مُوْسٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ. فَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ. قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ. رَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ. قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِىْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ. لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ. قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ. اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ– ফিরআউন বলল, 'তুমি (হে মূসা) যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর আমি তোমাকে অবশ্যই কারারুদ্ধ করব।' মূসা বলল, 'আমি তোমার নিকট স্পষ্ট কোন নিদর্শন আনয়ন করলেও?' ফিরআউন বলল, 'তুমি যদি সত্যবাদী হও, তবে তা উপস্থিত কর।' তারপর মূসা (আ) তার লাঠি নিক্ষেপ করলে তৎক্ষণাৎ তা এক সাক্ষাৎ অজগর হল এবং মূসা হাত বের করল আর তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র ও উজ্জ্বল প্রতিভাত হল। ফিরআউন

তার পারিষদবর্গকে বলল, 'এতো এক সুদক্ষ জাদুকর। এ তোমাদেরকে তোমাদের দেশ হতে তার জাদুবলে বহিষ্কার করতে চায়। এখন তোমরা কি করতে বল?' ওরা বলল, 'তাকে ও তার ভাইকে কিছুটা অবকাশ দাও এবং নগরে নগরে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও যেন তারা তোমার নিকট প্রতিটি সুদক্ষ জাদুকর উপস্থিত করে।' তারপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে জাদুকরদেরকে একত্র করা হল– এবং লোকদেরকে বলা হল, 'তোমরাও সমবেত হচ্ছ কি?' যেন আমরা জাদুকরদের অনুসরণ করতে পারি, যদি ওরা বিজয়ী হয়। তারপর জাদুকররা এসে ফিরআউনকে বলল, 'আমরা যদি বিজয়ী হই আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?' ফিরআউন বলল, 'হ্যাঁ, তখন তোমরা অবশ্যই আমার ঘনিষ্ঠদের শামিল হবে।' মূসা তাদেরকে বলল, 'তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।' তারপর তারা তাদের রশি ও লাঠি নিক্ষেপ করল এবং ওরা বলল, 'ফিরআউনের ইয্যতের শপথ! আমরাই বিজয়ী হব।' তারপর মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল; সহসা এটা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগল। তখন জাদুকররা সিজদাবনত হয়ে পড়ল এবং বলল, 'আমরা ঈমান আনয়ন করলাম জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রতি; যিনি মূসা ও হারূন-এরও প্রতিপালক।' ফিরআউন বলল, 'কী! আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বেই তোমরা এটাতে বিশ্বাস করলে? সে-ই তো তোমাদের প্রধান, যে তোমাদেরকে জাদু শিক্ষা দিয়েছে। শীঘ্রই তোমরা এটার পরিণাম জানবে। আমি অবশ্যই তোমাদের হাত এবং তোমাদের পা বিপরীত দিক হতে কর্তন করব এবং তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করবই।' ওরা বলল, 'কোন ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করব। আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন; কারণ আমরা মু'মিনদের মধ্যে অগ্রণী। (সূরা শু'আরা ঃ ২৯-৫১)

মোদ্দাকথা হল এই যে, ফিরআউন নিশ্চয়ই জাদুকরদেরকে এ কথা বলে যে, মূসা (আ) ছিলেন তাদের প্রধান যিনি তাদের জাদু শিক্ষা দিয়েছেন। এক্ষেত্রে ফিরআউন মিথ্যা বলেছে, অপবাদ দিয়েছে এবং চরম পর্যায়ের কুফরী করেছে। ফিরআউনের মূসা (আ)-এর প্রতি অপবাদ সর্বজনবিদিত। নিম্নে বর্ণিত আয়াতাংশসমূহের মাধ্যমে বিজ্ঞমহলের নিকট ফিরআউনের ধৃষ্টতা ও মূর্খতা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। যেমন আয়াতাংশ—

إِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا اَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ.

"এটা একটা চক্রান্ত, এই চক্রান্তের মাধ্যমে তোমরা নগরবাসীদেরকে তাদের ভিটামাটি থেকে উৎখাতের চেষ্টা করছ; অচিরেই তোমরা জানতে পারবে।" এবং তার উক্তি ঃ আমি তোমাদের ডান হাত ও বাম পা কিংবা বাম হাত ও ডান পা কর্তন করে দেব। আর তোমাদের সকলকে শূলবিদ্ধ করব যাতে তোমরা অন্যদের জন্যে শিক্ষণীয় হয়ে থাকবে। রাজ্যের অন্য কোন ব্যক্তি ভবিষ্যতে এরূপ করার যেন আর সাহস না পায়। এ জন্যেই ফিরআউন বলেছিল, তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলবিদ্ধ করব। কেননা তা সবচাইতে উঁচু এবং সবচাইতে বেশি দৃষ্টিগ্রাহ্য।' সে আরও বলেছিল, 'তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমাদের মধ্যে দুনিয়াতে কে বেশি কঠোর স্থায়ী শাস্তিদাতা। মু'মিন জাদুকরগণ বলেছিলেন, 'আমাদের কাছে যেসব নিদর্শন ও অকাট্য প্রমাণাদি এসেছে ও আমাদের অন্তরে স্থান নিয়েছে এগুলোকে ছেড়ে আমরা কোনদিনও তোমার আনুগত্য করব না।'

আয়াতাংশ وَالَّذِيْ فَطَرَنَا-এর 'ওয়াও' সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, এটা পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে সংযুক্তকারী অব্যয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে এই অক্ষরটি 'শপথ' অর্থবোধক।

মুমিন জাদুকরগণ ফিরআউনকে আরো বললেন, 'তুমি যা পার তা কর; তোমার আদেশ তো শুধুমাত্র এই পার্থিব জীবনেই চলতে পারে। তবে যখন আমরা এই নশ্বর জগত ছেড়ে আখিরাতে চলে যাব তখন ঐ সত্তার আদেশ বলবৎ থাকবে যার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করছি এবং আমরা যার প্রেরিত রাসূলগণের অনুসরণ করছি।

তাঁরা আরো বললেন ঃ

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. وَاللّٰهُ خَيْرٌ وَّأَبْقَى.

অর্থাৎ- 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যাতে তিনি আমাদের যাবতীয় অন্যায়-অপরাধ ও তুমি যে আমাদেরকে জোর-জবরদস্তি করে জাদু করতে বাধ্য করেছ সেই অন্যায় ক্ষমা করে দেন। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কল্যাণময় এবং তুমি আমাদেরকে সান্নিধ্য প্রদানের (পার্থিব জগতে) যে ওয়াদা অঙ্গীকার করেছ তার চেয়ে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সওয়াব অধিকতর কল্যাণকর ও অধিকতর স্থায়ী।' অন্য আয়াতাংশে বলা হয়েছে ঃ মুমিন জাদুকরগণ বলেছিলেন, 'আমাদের কোন ক্ষতি নেই, কেননা আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাব। আমরা আশা রাখি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের কৃত পাপরাশি ও অনাচারসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আমরা কিবতীদের পূর্বেই মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি বলে আমরা ঘোষিত হব।'

তাঁরা তাকে আরো বললেন ঃ

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ—তুমি তো আমাদেরকে শাস্তিদান করছো শুধু এ জন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করেছি যখন এগুলো আমাদের কাছে এসেছে। এছাড়া আমাদের অন্য কোন অপরাধ নেই। হে আমাদের প্রতিপালক! পরাক্রমশালী অত্যাচারী হিংস্র শাসক, তাগূত ও শয়তান আমাদেরকে যে অসহনীয় শাস্তি প্রদান করছে তা সহ্য করার আমাদেরকে ধৈর্য দাও এবং আমাদেরকে আত্মসমর্পণকারীরূপে মৃত্যু দান কর।'

অতঃপর তাঁরা তাকে উপদেশস্বরূপ মহান প্রতিপালকের শাস্তির প্রতি ভীতি প্রদর্শন করে বললেন ঃ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَيَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْيٰى

অর্থাৎ—'যে তার প্রতিপালকের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্য তো রয়েছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।' তাঁরা বললেন, 'সুতরাং সাবধান তুমি যেন এসব অপরাধীর অন্তর্ভুক্ত না হও।' কিন্তু ফিরআউন তাদের উপদেশ অমান্য করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

তাঁরা তাকে আরো বললেন ঃ

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَاُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى.

অর্থাৎ— যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদের জন্যে রয়েছে সমুচ্চ মর্যাদা— স্থায়ী জান্নাত যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদেরই যারা পবিত্র।' (সূরা তা-হা ঃ ৭৫-৭৬)।

সুতরাং তুমি এ দলের অন্তর্ভুক্ত হও। কিন্তু ফিরআউন ও তার আমলের মধ্যে ভাগ্যলিপি অন্তরায় হল– যা ছিল অখণ্ডনীয় ও অপরিবর্তনীয়। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলা তার দুষ্কর্মের জন্য আদেশ দিলেন যে, "অভিশপ্ত ফিরআউন জাহান্নামী, সে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবে, তার মাথার উপর গরম পানি ঢালা হবে এবং তাকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে বলা হবে –জাহান্নামের আযাব আস্বাদন কর, তুমি তো ছিলে সম্মানিত অভিজাত।" (সূরা দুখান ঃ ৪৯)

উপরোক্ত আয়াতসমূহের পূর্বাপর দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ফিরআউন মু'মিন জাদুকরদের শূলবিদ্ধ করেছিল ও তাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি প্রসন্ন হোন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস ও উবায়দ ইবন উমায়র (রা) বলেন, 'তারা দিনের প্রথম অংশে ছিলেন জাদুকর। আর দিনের শেষাংশে পুণ্যবান শহীদ হিসেবে পরিগণিত হলেন। উপরোক্ত উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে মু'মিন জাদুকরদের নিম্নোক্ত মুনাজাতে ঃ

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ.

অর্থাৎ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্যদান কর এবং মুসলিমরূপে আমাদের মৃত্যু ঘটাও!'

পরিচ্ছেদ

এ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাটি যখন ঘটে গেল— কিবতীরা যখন এই তুমুল প্রতিযোগিতায় পরাজয়বরণ করল; জাদুকরগণ মূসা (আ)-এর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন ও নিজেদের প্রতিপালকের সাহায্যপ্রার্থী হলেন; তখন কিবতীদের কুফরী, হঠকারিতা ও সত্য বিমুখতাই কেবল বৃদ্ধি পেল।

আল্লাহ তা'আলা সূরায়ে আ'রাফে তাদের কথা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন ঃ

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوْسٰى وَقَوْمَهٗ لِيُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَيَذَرَكَ وَاٰلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ اَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْىِ نِسَاءَهُمْ وَاِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُوْنَ. قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا اِنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. قَالُوْا اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ—ফিরআউনের সম্প্রদায়ের প্রধানগণ বলল, 'আপনি কি মূসাকে ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে দেবেন?' সে বলল, 'আমরা তাদের পুত্রদেরকে হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব; আর আমরা তো তাদের উপর প্রবল।' মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলল, 'আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর। যমীন তো আল্লাহরই; তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে এটার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।' তারা বলল, 'আমাদের নিকট তোমার আসার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও।' সে বলল, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রু ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে যমীনে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন; তারপর তোমরা কি কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন। (সূরা আ'রাফ ঃ ১২৭-১২৯)

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ফিরআউনের সম্প্রদায় সম্পর্কে জানাচ্ছেন যে, তারা ছিল ফিরআউনের পারিষদবর্গ ও গোত্রপ্রধান। তারা তাদের বাদশাহ ফিরআউনকে আল্লাহর নবী মূসা (আ)-এর প্রতি অত্যাচার, অবিচার ও জুলুম করার এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্ররোচিত করেছির। তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করার পরিবর্তে তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান, নির্যাতন এবং অগ্রাহ্য করছিল।

তারা বলল ঃ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ

অর্থাৎ— 'আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাগণকে বর্জন করতে দেবেন?' (আ'রাফ ঃ ১২৭) একক লা-শরীক আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের প্রতি আহ্বান করা এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের ইবাদত থেকে নিষেধ করাকে তারা বিপর্যয় সৃষ্টি বলে আখ্যায়িত করেছে। আবার কেউ কেউ বলেন, 'আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, 'আপনি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে ও আপনার ইবাদতকে বর্জন করতে দেবেন?' দু'টি অর্থেরই এখানে সম্ভাবনা রয়েছে। তার একটি হচ্ছে, সে আপনার ধর্মকে বর্জন করে চলে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সে আপনার ইবাদত বর্জন করে। শেষোক্ত সম্ভাবনাটির কথা এজন্যই বলা হয়ে থাকে যে, তারা তাকে উপাস্য বলেও ধারণা করত। তার প্রতি আল্লাহর লা'নত।

সে (ফিরআউন) বলল, 'আমরা তাদের পুত্রদের হত্যা করব এবং নারীদেরকে জীবিত রাখব' অর্থাৎ যাতে তাদের মধ্যে যোদ্ধার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে না পারে। 'আমরা তাদের উপর সর্বদা প্রভাবশালী থাকব।' অর্থাৎ বিজয়ীরূপে থাকব। তখন মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্যধারণ কর।' অর্থাৎ যখন তারা তোমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দিতে উদ্যত, তখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা কর এবং তোমাদের দুঃখ-কষ্টে তোমরা ধৈর্যধারণ কর। জেনে রেখো, এই পৃথিবীর মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান এই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন। তবে শেষ শুভ পরিণতি মুত্তাকীদের জন্যেই। সুতরাং তোমরা মুত্তাকী হতে সচেষ্ট হও যাতে তোমাদের পরিণাম শুভ হয়।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

অর্থাৎ— মূসা (আ) বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহ্তে ঈমান এনে থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর কর। তারপর তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করো না এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায় হতে রক্ষা কর!' (সূরা ইউনুস ঃ ৮৪, ৮৫, ৮৬)

আয়াতাংশ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا -এর অর্থ হচ্ছে, 'হে মূসা! তোমার আগমনের পূর্বে আমাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করা হতো এবং তোমার আগমনের পরেও আমাদের পুত্র-সন্তানদের হত্যা করা হচ্ছে। মূসা (আ) তাদেরকে বললেন, 'অতি শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে যমীনে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।'

আল্লাহ তা'আলা সূরা মু'মিনে ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.

অর্থাৎ—আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা (আ)-কে প্রেরণ করেছিলাম ফিরআউন, হামান ও কারুণের নিকট কিন্তু তারা বলেছিল, এতো এক জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।' (সূরা মুমিন ঃ ২৩-২৪)

ফিরআউন ছিল রাজা, হামান ছিল তার মন্ত্রী এবং কারুণ ছিল মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের একজন ইহুদী কিন্তু সে ছিল ফিরআউন ও তার অমাত্যদের ধর্মের অনুসারী, সে ছিল প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক। তার ঘটনা পরে সবিস্তারে বর্ণনা করা হবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেন ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اقْتُلُوْا اَبْنَاءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوْا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلَالٍ.

অর্থাৎ—অতঃপর মূসা আমার নিকট থেকে সত্য নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হলে তারা বলল, মূসার সাথে যারা ঈমান আনয়ন করেছে, তাদের পুত্রদের হত্যা কর এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখ। কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই। (সূরা মুমিন ঃ ২৫)

মূসা (আ)-এর নবুওত প্রাপ্তির পর পুরুষদের হত্যার উদ্দেশ্য ছিল, বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা এবং তাদের কর্মক্ষমদের সংখ্যা হ্রাস করা যাতে তাদের শান-শওকত লোপ পেয়ে যায় এবং তাদের কোন প্রতিপত্তিই অবশিষ্ট না থাকে। আর তারা যেন কিবতীদের বিরুদ্ধে কোন সময় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে এবং কিবতীদেরকে তারা প্রতিহত না করতে পারে। অন্যদিকে কিবতীরা অবশ্য তাদেরকে যমের মত ভয় করত। তবে এতে তাঁদের কোন লাভ হয়নি এবং তাদের ভাগ্যলিপি যা আল্লাহ তা'আলার মহাহুকুম كُنْ এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে তা তারা রদ করতে পারেনি।

ফিরআউন বলতে লাগল ঃ

ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ.

অর্থাৎ—"আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হউক। আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দীনের পরিবর্তন ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।" (সূরা মুমিন ঃ ২৬)

এ জন্যই জনগণ ঠাট্টার ছলে বলত, 'ফিরআউন নির্দেশদাতা হয়ে গেছে।' কেননা ফিরআউন তার ধারণায় জনগণকে ভয় দেখাত যেন মূসা (আ) তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ.

অর্থাৎ—মূসা বলল, যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, সেই সকল উদ্ধত ব্যক্তি থেকে আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হয়েছি। (সূরা মুমিন ঃ ২৭)

অর্থাৎ আমি আল্লাহ তা'আলার শাহী দরবারের শরণাপন্ন হচ্ছি যাতে ফিরআউন ও অন্যরা আমার প্রতি অনিষ্টের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করতে না পারে, তারা এতই উদ্ধত যে, তারা আমার প্রতি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপই করে না এবং আল্লাহ তা'আলার আযাব ও গযবকে ভয় করে না; কেননা তারা আখিরাতে ও হিসাব-নিকাশে বিশ্বাস রাখে না।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ.

অর্থাৎ—ফিরআউন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজ ঈমান গোপন রাখত; বললেন, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এ জন্য হত্যা করবে যে, সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আল্লাহ, অথচ সে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে? সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্যে সে দায়ী হবে আর যদি সে সত্যবাদী হয়, সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে, তার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত হবেই। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই প্রবল; কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে? ফিরআউন বলল, 'আমি যা বুঝি আমি তোমাদের তাই বলছি। আমি তোমাদের কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি।' (সূরা মুমিন ২৮-২৯)

উপরোক্ত ব্যক্তিটি ফিরআউনের চাচাতো ভাই ছিল। সে তার সম্প্রদায়ের কাছে ঈমান গোপন রাখত। কেননা, সে তাদের তরফ থেকে তার জীবন নাশের ভয় করত। কেউ কেউ বলেন, এ লোকটি ছিল ইসরাঈলী। এই অভিমতটি শুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ এবং পূর্বাপরের সাথে শব্দ ও অর্থের দিক দিয়ে তার কোন মিল নেই। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

ইবন জুরায়জ (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বরাতে বলেন, এই লোকটি এবং যে লোকটি শহরের শেষ প্রান্ত থেকে এসেছিলেন তিনি এবং ফিরআউনের স্ত্রী ব্যতীত কিবতীদের মধ্যকার অন্য কেউ মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেনি। বর্ণনাটি ইব্ন হাতিমের। দারাকুতনী

(র) বলেছেন, শাম আন নামে ফিরআউন বংশের উক্ত মুমিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো কথা জানা যায় না। সুহা'ইলী এরূপ বর্ণনা করেছেন। তাবারানী (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে তার নাম খাইর বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিকতর জ্ঞাত। মূলত এই ব্যক্তিটি তার ঈমান গোপন রেখেছিলেন। যখন ফিরআউন মূসা (আ)-কে হত্যা করার ইচ্ছে করল এবং এই ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হল, তখন সে তার আমীরদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করল। মুমিন বান্দাটি মূসা (আ)-এর ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তাই তিনি ফিরআউনকে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ভয়ভীতিপূর্ণ কথাবার্তা দ্বারা সুকৌশলে এ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন। তিনি তাকে সৎপরামর্শ স্বরূপ এবং যাতে সেও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে এ জন্য তার সাথে কথা বললেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ

افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر .

অর্থাৎ—'অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে ন্যায় কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।' আর এখানে এটার মর্যাদা আরো অধিক। কেননা, ফিরআউন ছিল সর্বাধিক অত্যাচারী। আর মুমিন বান্দার বক্তব্য ছিল অত্যধিক ন্যায়ভিত্তিক। কেননা, এর উদ্দেশ্য ছিল নবীকে নিরাপদ রাখা। আবার এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তিনি তাদের কাছে নিজের গোপন ঈমানকে প্রকাশ করতেই চেয়েছিলেন। তবে প্রথম সম্ভাবনাই অধিকতর স্পষ্ট। আল্লাহ তা'আলাই সম্যক জ্ঞাত। তিনি বললেন, "হে ফিরআউন! আপনি কি এমন একটি লোককে হত্যা করতে যাচ্ছেন যে বলে যে, তার প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা! এ ধরনের কথা বা দাবির প্রতিশোধ অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা হয় না। এ ধরনের কথা যারা বলেন বা স্বীকার করেন তাদের সম্মান ও ইজ্জত করতে হয়; তাদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করতে হয়। তাদের কোন কাজের প্রতিশোধ নিতে হয় না। কেননা, তিনি আপনাদের কাছে আপন প্রতিপালকের নিকট থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন তথা মুজিযা নিয়ে এসেছেন; যা তার সত্যতা প্রমাণ করে। কাজেই যদি আপনারা তাকে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে দেন তাহলে আপনারা নিরাপদ থাকবেন। কেননা, যদি তিনি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকেন, তাহলে এই মিথ্যার দায়দায়িত্ব তাঁর উপরেই বর্তাবে; এতে আপনাদের কোন ক্ষতি হবার আশংকা একেবারেই নেই। আর যদি তিনি সত্যবাদী হয়ে থাকেন (আর আসলেও তাই) এবং আপনারা তাঁর বিরোধিতা করেন, তাহলে আপনাদের উপর ঐসব মুসীবতের কিয়দংশ অবতীর্ণ হবে যেগুলো আপনাদের উপর অবতীর্ণ হবে বলে তিনি সতর্ক করছেন। আপনারা ঐসব আযাবের কিয়দংশ অবতীর্ণ হওয়ার আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। আর যদি ঐসব শাস্তির সবগুলো অবতীর্ণ হয় তাহলে আপনাদের অবস্থা কিরূপ হবে? সেই অবস্থায় ফিরআউনের প্রতি মুমিন বান্দার এরূপ উপদেশ প্রদান তাঁর উচ্চমার্গের বুদ্ধিমত্তা, কর্মকুশলতা ও সতর্কতার পরিচায়ক।

অতঃপর তাঁর উক্তি يَاقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ দ্বারা তিনি তার সম্প্রদায়ের লোকজনদের সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, তাদের এই প্রাণপ্রিয় রাজ্য শীঘ্রই হরণ করে নেয়া হবে। কেননা, যে কোন বাদশাহ বা রাজা যদি ধর্মের বিরোধিতা করে তাহলে তাদের

রাজ্য হরণ করে নেয়া হয় এবং তাদেরকে সম্মান প্রদানের পর লাঞ্ছিত করা হয় যা ফিরআউনের সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে ঘটেছে।

অতঃপর মূসা (আ) যা কিছু নিয়ে এসেছিলেন এ সম্পর্কে ফিরআউনের অনুসারীরা সন্দেহ পোষণ, বিরোধিতা ও বৈরীভাব পোষণ করায় তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের ঘরবাড়ি, সহায় সম্পদ, বিত্তবৈভব, রাজত্ব ও সৌভাগ্য থেকে বহিষ্কার করলেন এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে তাদেরকে সাগরের দিকে ঠেলে দেয়া হলো; আর তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান দানের পর তাদের কর্মফলের দরুন তাদের রূহসমূহকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতম পর্যায়ে অধঃপতিত করা হয়। এ জন্যই প্রাজ্ঞ, আপন সম্প্রদায়ের পরম শুভাকাঙ্ক্ষী সত্যের অনুসারী, সত্যবাদী, পুণ্যবান ও হিদায়াত প্রাপ্ত মুমিন বান্দাটি বললেন, 'হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, জনগণের মধ্যে তোমরা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং তাদের উপর তোমরা শাসন চালিয়ে যাচ্ছ, তোমরা সংখ্যায়, সামর্থ্যে, শক্তিতে ও দৃঢ়তায় যদি বর্তমানের চেয়ে অধিক গুণে প্রতিপত্তি অর্জন করতে পার তাহলেও এটা আমাদের কোন উপকারে আসবে না এবং আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ তা'আলার আযাবকে আমাদের থেকে প্রতিহত করতে পারবে না।' জবাবে ফিরআউন বলল, 'আমি যা বুঝি, আমি তাই তোমাদের বলছি; আমি তোমাদের কেবল সৎপথই প্রদর্শন করে থাকি।' উপরোক্ত দুটি বাক্যেই ফিরআউন ছিল মিথ্যাবাদী। কেননা, অন্তরের অন্তস্থল থেকে সে উপলব্ধি করত যে, মূসা (আ)-এর আনীত বিষয়াদি নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকেই। তবে সে হঠকারিতা, শত্রুতা, সীমালংঘন ও কুফরীর কারণে মুখে এর বিপরীত প্রকাশ করত।

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর উক্তির বিবরণ দিয়ে ইরশাদ করেন ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا. فَأَرَادَ أَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهٖ لِبَنِيْٓ إِسْرَائِيْلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيْفًا.

অর্থাৎ—"তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এ সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ। হে ফিরআউন! আমি তো দেখছি তোমার ধ্বংস আসন্ন। তারপর ফিরআউন তাদেরকে দেশ হতে উচ্ছেদ করার সংকল্প করল, তখন আমি ফিরআউন ও তার সঙ্গীদের সকলকে ডুবিয়ে দিলাম। এরপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম, তোমরা যমীনে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্র করে উপস্থিত করব।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১০২-১০৪)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ. وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَّعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ.

তারপর যখন তাদের নিকট আমার স্পষ্ট নিদর্শন আসল তারা বলল, এটা স্পষ্ট জাদু। তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। (সূরা নামল : ১৩-১৪)

আয়াতাংশে বর্ণিত ফিরআউনের উক্তি وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ অর্থাৎ—"আমি তোমাদেরকে কেবল সৎপথই প্রদর্শন করে থাকি।" এতেও সে মিথ্যা কথা বলেছে। কেননা, সে সঠিক রাস্তায় ছিল না, সে ছিল পথভ্রষ্টতা, নির্বুদ্ধিতা ও সন্ত্রাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে প্রথমত নিজে দেবদেবী ও মূর্তিদের পূজা করে। অতঃপর তার মূর্খ ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়কে তার অনুকরণ ও অনুসরণ করতে এবং সে যে নিজেকে 'রব' বলে দাবি করেছিল এ ব্যাপারে তাকে সত্য বলে স্বীকার করার জন্যে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَاقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ.

অর্থাৎ—ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করল, হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? এ নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা এটা দেখ না? আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি থেকে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম। মূসাকে কেন দেয়া হল না স্বর্ণবলয় অথবা তার সাথে কেন আসল না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে? এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল, ফলে ওরা তার কথা মেনে নিল। ওরা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। যখন ওরা আমাকে ক্রোধান্বিত করল আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম ওদের সকলকে। তৎপর পরবর্তীদের জন্যে আমি ওদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত। (৪৩ যুখরুফ : ৫১-৫৬)

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন :

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى. فَكَذَّبَ وَعَصَى. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. فَحَشَرَ فَنَادَى. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى.

অর্থাৎ—অতঃপর মূসা ওকে (ফিরআউনকে) মহা নিদর্শন দেখাল। কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং অবাধ্য হল। তারপর সে পেছন ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল। সে সকলকে সমবেত

করল এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল আর বলল, 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।' তারপর আল্লাহ তাকে আখিরাতে ও দুনিয়ায় কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন। যে ভয় করে তার জন্য অবশ্যই এটাতে শিক্ষা রয়েছে। (সূরা নাযিআত ঃ ২০-২৬)

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰى بِاٰيٰتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ. اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهٖ فَاتَّبَعُوْا اَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا اَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ .يَقْدُمُ قَوْمَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ. وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهٖ لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُوْدُ.

অর্থাৎ—আমি তো মূসাকে আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়ে ছিলাম ফিরআউন ও তার প্রধানদের নিকট। কিন্তু তারা ফিরআউনের কার্যকলাপের অনুরূপ করত এবং ফিরআউনের কার্যকলাপ ভাল ছিল না। সে কিয়ামতের দিনে তার সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং সে তাদেরকে নিয়ে আগুনে প্রবেশ করবে। যেখানে প্রবেশ করানো হবে তা কত নিকৃষ্ট স্থান! এ দুনিয়ায় তাদেরকে করা হয়েছিল অভিশাপগ্রস্ত এবং অভিশাপগ্রস্ত হবে তারা কিয়ামতের দিনেও। কত নিকৃষ্ট সে পুরস্কার—যা ওদেরকে দেওয়া হবে। (সূরা হূদ ঃ ৯৬-৯৯)

ফিরআউনের উক্তি দুটি যে মিথ্যা তার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مَا اُرِيْكُمْ اِلَّا مَا اَرٰى وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ. وَقَالَ الَّذِىْ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ .مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ. وَيٰقَوْمِ اِنِّىْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوْسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهٖ حَتّٰى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ نِ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتٰهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ.

অর্থাৎ—ফিরাউন বলল, আমি যা বুঝি, আমি তোমাদের তাই বলছি। আমি তোমাদের কেবল সৎপথই দেখিয়ে থাকি। মুমিন ব্যক্তিটি বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের শাস্তির দিনের অনুরূপ দুর্দিনের আশংকা করি। যেমন ঘটেছিল নূহ, আদ, ছামূদ ও তাদের পূর্ববর্তীদের ব্যাপারে। আল্লাহ তো বান্দাদের প্রতি কোন জুলুম করতে চান না। হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য আশংকা করি আর্তনাদ দিবসের।

যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে চাইবে, আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করার কেউ থাকবে না। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার জন্যে কোন পথপ্রদর্শক নেই। পূর্বেও তোমাদের নিকট ইউসুফ এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শনসহ; কিন্তু সে তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছিল তোমরা তাতে বার বার সন্দেহ পোষণ করতে। পরিশেষে যখন ইউসুফের মৃত্যু হল তখন তোমরা বলেছিলে তার পরে আল্লাহ্ আর কোন রাসূল প্রেরণ করবেন না। এভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে। যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল-প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়, তাদের এই কর্ম আল্লাহ্ এবং মু'মিনদের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ। এভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। (সূরা মুমিন ঃ ২৯-৩৫)

এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলার এ ওলী মুমিন বান্দাটি তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে, যদি তারা আল্লাহর রাসূল মূসা (আ)-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার আযাব ও গযব অবতীর্ণ হবে, যেমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল। তাদের পূর্ববর্তী উম্মত যেমন নূহ (আ)-এর সম্প্রদায়, আদ, ছামূদ ও তাদের পরবর্তী যুগের উম্মতদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার গযব অবতীর্ণ হবার বিষয়টি বিশ্ববাসীর কাছে দলীলাদির দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ছিল। আরও প্রমাণিত ছিল যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম যা কিছু নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন তা অস্বীকার করার কারণে তাদের শত্রুদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার আযাব ও গযব অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তাঁদের অনুসরণ করার কারণে তাঁদের অনুসারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা নাজাত দিয়েছেন। তিনি তাদেরকে কিয়ামত সম্পর্কে সতর্ক করেন। উক্ত আয়াতে কিয়ামতের দিবসকে يوم التناد বা আহ্বানের দিবস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। উক্ত দিবসে যখন লোকজন ছুটাছুটি করতে থাকবে, তখন তারা যদি সমর্থ হয় তবে একে অন্যকে আহ্বান করবে অথচ এরূপ সুযোগ তাদের হয়ে উঠবে না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. كَلَّا لَا وَزَرَ. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ.

অর্থাৎ—"সেদিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।" (সূরা কিয়ামা ঃ ১০-১২)

পুনরায় আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

অর্থাৎ— "হে জিন ও মানব সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না সনদ ব্যতিরেকে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

তোমাদের প্রতি প্রেরিত হবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (সূরা আর-রহমান ঃ ৩৩-৩৬)

আয়াতে উল্লিখিত يَوْمَ التَّنَادِ কে কেউ কেউ দালে তাশদীদ দিয়ে পাঠ করেন তখন তার অর্থ يَوْمُ الْفِرَارِ বা পলায়নের দিন। এটা কিয়ামতের দিনও হতে পারে আবার এটার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আযাব-গযব অবতীর্ণ করার দিনও হতে পারে, যেদিন তারা মুক্তির জন্যে পলায়ন করতে চাইবে, কিন্তু পবিত্রাণের কোনই উপায় থাকবে না। (সাদ ঃ ৩)

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

فَلَمَّا اَحَسُّوْا بَأْسَنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُوْنَ . لاَتَرْكُضُوْا وَارْجِعُوْا اِلٰى مَا اُتْرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُوْنَ .

অর্থাৎ—অতঃপর যখন ওরা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখনই ওরা জনপদ থেকে পলায়ন করতে লাগল। তাদেরকে বলা হয়েছিল পলায়ন কর না এবং ফিরে এস তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট ও তোমাদের আবাসগৃহে, হয়ত এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। (সূরা আম্বিয়া ঃ ১২-১৩)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মিসর দেশে ইউসুফ (আ)—এর নবুওত সম্পর্কে সংবাদ দেন। ইউসুফ (আ)-এর নবুওত জনগণের কাছে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্যে একটি নিয়ামত ও আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল। মূসা (আ) ছিলেন তাঁরই অধঃস্তন বংশধর। তিনি জনগণকে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ ও ইবাদতের প্রতি আহ্বান করেছিলেন এবং মাখলুকের মধ্য হতে কাউকেও আল্লাহ তা'আলার অংশীদার ধারণা করতে বিরত রাখেন। আল্লাহ তা'আলা ঐ সময়কার মিসরবাসীদের সত্যকে মিথ্যা এবং নবী-রাসূলগণের বিরোধিতা সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

فَمَا زِلْتُمْ فِىْ شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهٖ حَتّٰى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِهٖ رَسُوْلاً.

অর্থাৎ— তারা রাসূলকে অস্বীকার করেছিল এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذَالِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ اِلَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْ اٰيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ.

অর্থাৎ—আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে তাদের কাছে আগত কোন প্রকার দলীল ও প্রমাণ ব্যতীতই তারা আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত খোদায়ী অস্তিত্ব ও একত্ববাদের জন্যে দলীলাদি ও প্রমাণাদি সম্পর্কে বাক-বিতণ্ডা করে। আর জনগণ থেকে এ কাজে যারা লিপ্ত হবে তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা চরম অসন্তুষ্ট হন।

এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَكَذَالِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ –

অর্থাৎ— এভাবে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। অত্র আয়াতাংশে উল্লিখিত مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ এ শব্দ দুটি বিশেষ্য বিশেষণরূপে বা সম্বন্ধ পদ দু ভাবেই পড়া হয়ে থাকে এবং ঐ দু'টির অর্থই এমন যে, একটি অপরটির জন্যে অবশ্যম্ভাবী। যদি কোন সময় জনগণের হৃদয়সমূহ সত্যের বিরোধিতা করে তাহলে তা প্রমাণ ব্যতিরেকেই করে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এসব হৃদয়ে মোহর মেরে দেন।

ফিরআউনের ঔদ্ধত্য বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِىْ صَرْحًا لَعَلِّىْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ. اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا وَكَذٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ.

অর্থাৎ—"ফিরআউন বলল, হে হামান! আমার জন্য তুমি নির্মাণ কর এক সুউচ্চ প্রাসাদ যাতে আমি পাই অবলম্বন—অবলম্বন আসমানে আরোহণের, যেন দেখতে পাই মূসার ইলাহকে; তবে আমি তো ওকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। এভাবেই ফিরআউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কর্ম এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ থেকে এবং ফিরআউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে।" (সূরা মুমিন ঃ ৩৬-৩৭)

অন্য কথায়, মূসা (আ) দাবি করেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রেরণ করেছেন আর ফিরআউন তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিল এবং তার সম্প্রদায়কে সে বলেছিল ঃ

يَا اَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ فَاَوْقِدْ لِىْ يَاهَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِىْ صَرْحًا لَعَلِّىْ اَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبِيْنَ.

"হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরী কর; হয়ত আমি এটাতে উঠে মূসার ইলাহকে দেখতে পাব। তবে, আমি অবশ্য মনে করি, সে মিথ্যাবাদী।" (কাসাস ঃ ৩৮)

সূরায়ে মুমিনের ৩৬ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে, ফিরআউন বলেছিল ঃ لَعَلِّيْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ। অর্থাৎ—যাতে আমি পাই অবলম্বন—অবলম্বন আসমানে আরোহণের অর্থাৎ আসমানে আরোহণের রাস্তা।

অতঃপর ফিরআউন বলে ঃ فَاَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبِيْنَ –

অর্থাৎ—"হয়ত এটাতে উঠে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাব। তবে আমি অবশ্য মনে করি সে মিথ্যাবাদী।" শেষোক্ত আয়াতাংশের দুটি সম্ভাব্য অর্থ রয়েছে একটি হল—ফিরআউন বলল, মূসা যে বলেছে ফিরআউন ব্যতীত জগতের জন্যে অন্য কোন প্রতিপালক আছে, এই কথায় আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। দ্বিতীয়টি হল—ফিরআউন বলল, মূসা যে বলেছে তাকে আল্লাহ তা'আলা রসূলরূপে প্রেরণ করেছেন এই দাবিতে আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। প্রথম অর্থটি ফিরআউনের অবস্থার প্রেক্ষিতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কেননা, সে

সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল। দ্বিতীয় অর্থটি শব্দগতভাবে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কেননা সে বলেছে ঃ فَاطَّلِعَ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى অর্থাৎ- আমি মূসার ইলাহর কাছে পৌঁছব এবং তাকে জিজ্ঞাসা করবো তিনি মূসাকে নবীরূপে প্রেরণ করেছেন কিনা।

অধিকন্তু তার কথা وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبِيْنَ এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল লোকজনকে মূসা (আ) থেকে বিরত রাখা—তারা যেন মূসা (আ)-কে বিশ্বাস না করে তাই তাকে মিথ্যাবাদী ধারণা করার জন্য ফিরআউন জনগণকে উৎসাহিত করেছিল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ

আবার صُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ কে صَدَّ عَنِ السَّبِيْلِ রূপেও পড়া হয়ে থাকে। আয়াতাংশ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ এর তাফসীর প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন ঃ اِلَّا فِىْ تَبَابٍ-এর অর্থ হচ্ছে اِلَّا فِيْ خَسَارٍ অর্থাৎ সে ব্যর্থ হয়েছে এতে তার কোন উদ্দেশ্যই হাসিল হয়নি। কেননা, মানবজাতির জন্য এটা সম্ভব নয় যে, তাদের শক্তি দ্বারা তারা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে উঠতে পারে, তাহলে তারা কেমন করে উর্ধ্বতর আসমানে কিংবা তারও উর্ধ্বের সুউচ্চ আসমানে উঠতে পারবে যার সম্বন্ধে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জ্ঞাত নন। একাধিক তাফসীরকার উল্লেখ করেছেন যে, এই সুউচ্চ প্রাসাদটি ফিরআউনের মন্ত্রী হামান ফিরআউনের জন্যে নির্মাণ করেছিল। এর চাইতে উচ্চতর প্রাসাদ আর দ্বিতীয়টি দেখতে পাওয়া যায়নি। আর এটা ছিল পোড়ানো ইটের তৈরী। এ জন্যেই ফিরআউন হামানকে বলেছিল, "হে হামান! আমার জন্যে তুমি ইট পোড়াও তারপর এর দ্বারা আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ কর।"

কিতাবীদের মতে, বনী ইসরাঈলকে ইট বানাবার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তারা ফিরআউনের অনুসারিগণ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের ক্লেশজনক কাজকর্ম আঞ্জাম দিতে বাধ্য হত। তাদেরকে ফিরআউনের জন্য যে সব কাজ করতে বাধ্য করা হত তাতে তাদেরকে কেউ সাহায্য করত না বরং তারা নিজেরাই ফিরআউনের জন্যে মাটি, ভূষি ও পানি সংগ্রহ করত এবং ফিরআউন প্রত্যহ তাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করিয়ে নিত। তারা যদি তা না করত তাহলে তাদেরকে প্রহার করা হত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হত এবং তাদেরকে চরম কষ্ট দেয়া হত।

এ জন্যই তারা মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিল ঃ

اُوْذِيْنَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ—"আমাদের নিকট তোমার আসার পূর্বে আমরা নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমার আসার পরেও। তিনি বললেন, শীঘ্রই তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে রাজ্যে তাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। অতঃপর তোমরা কি কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন।"

এমনি করে মূসা (আ) তার সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কিবতীদের বিরুদ্ধে পরিণামে তাদেরই জয় হবে। আর কালে এরূপই সংঘটিত হয়েছিল। এটা ছিল নবুওতের সত্যতার একটি প্রমাণ। এখন আমরা আবার মুমিন বান্দার উপদেশ, নসীহত ও যুক্তি-প্রমাণের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَقَالَ الَّذِيْ اٰمَنَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ. يَاقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰى اِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"মুমিন ব্যক্তিটি বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ কর, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করব। হে আমার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। কেউ মন্দ কাজ করলে সে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মুমিন হয়ে সৎকর্ম করবে তারা দাখিল হবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে দেয়া হবে অপরিমিত জীবনোপকরণ। (সূরা মুমিন ঃ ৩৮-৪০)

অর্থাৎ মুমিন বান্দাটি তাদেরকে সঠিক ও সত্য পথের দিকে আহ্বান করছেন। আর তা হচ্ছে আল্লাহর নবী মূসা (আ)-এর অনুসরণ করা এবং তিনি আপন প্রতিপালকের কাছ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সত্য বলে স্বীকার করা। অতঃপর তিনি তাদেরকে নশ্বর ও নিকৃষ্ট দুনিয়ার মোহ হতে বিরত থাকার উপদেশ দিচ্ছেন যা নিঃসন্দেহে ধ্বংস ও শেষ হয়ে যাবে এবং তিনি তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সওয়ার অন্বেষণের জন্যে অনুপ্রাণিত করছেন, যিনি কোন আমলকারীর আমলকে বিনষ্ট করেন না। তিনি এমনই শক্তিশালী যাঁর কাছে প্রতিটি বস্তুর কর্তৃত্ব রয়েছে, যিনি কম আমলের জন্যে বেশি সওয়াব প্রদান করেন, এবং মন্দ কর্মের প্রতিদান তার বেশি প্রদান করেন না। মুমিন বান্দাটি তাদেরকে আরো সংবাদ দিচ্ছেন যে, আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস, যারা আখিরাতের প্রতি অটল ঈমান রেখে সৎকাজ করে যায়, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সুউচ্চ ও নিরাপদ প্রাসাদমালা, অসংখ্য কল্যাণ, এর চিরস্থায়ী অক্ষয় রিযিক ও ক্রমবর্ধমান কল্যাণসমূহ।

অতঃপর তারা যে মতবাদে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার অসারতা এবং যেখানে প্রত্যাবর্তন করবে তা সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করে তিনি বলেন ঃ

وَيَاقَوْمِ مَالِيْ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْ اِلَى النَّارِ. تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَالَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ. لَاجَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ

الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ . فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ . وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ . فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ . اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ .

অর্থাৎ—'হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে ডাকছ আগুনের দিকে। তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে, যার সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে। নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে আহ্বান করছো এমন একজনের দিকে যে দুনিয়া ও আখিরাতের কোথাও আহ্বানযোগ্য নয়। বস্তুত আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহর নিকট এবং সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী। আমি তোমাদেরকে যা বলছি তোমরা তা অচিরেই স্মরণ করবে এবং আমি আমার ব্যাপার আল্লাহতে অর্পণ করছি। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তারপর আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন, এবং কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল ফিরআউন সম্প্রদায়কে। তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে সকাল ও সন্ধ্যায় এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে ফিরআউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।' (সূরা মুমিন ঃ ৪১-৪৬)

অন্য কথায় মুমিন বান্দাটি ফিরআউনের সম্প্রদায়কে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীর এমন প্রতিপালকের ইবাদতের প্রতি আহ্বান করছিলেন যিনি কোন বস্তুকে সৃষ্টি করতে হলে বলে থাকেন كُنْ অর্থাৎ 'হয়ে যাও' তখন হয়ে যায়। অন্যদিকে তারা তাকে পথভ্রষ্ট মূর্খ ও অভিশপ্ত ফিরআউনের ইবাদতের প্রতি আহ্বান করছিল, এজন্যই তিনি তাদেরকে তাদের অনুসরণ না করার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ

وَيَا قَوْمِ مَالِىْ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِيْ اِلَى النَّارِ . تَدْعُوْنَنِىْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ .

অতঃপর তিনি তাদের কাছে তাদের অবস্থান তুলে ধরলেন যে, তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত এমন দেব-দেবীর ও মূর্তির পূজা-অর্চনা করছে, যারা তাদের কোন প্রকার উপকার বা ক্ষতিসাধন করতে পারে না।

এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَا اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحَابُ النَّارِ .

অর্থাৎ— দেব-দেবীগুলো এ দুনিয়ায় কোন প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ বা কর্তৃত্বের অধিকারী নয় বলে প্রমাণিত, তাহলে চিরস্থায়ী আবাসস্থলে তারা কেমন করে এসবের অধিকারী হবে? তবে

আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রমশালী, সৃষ্টিকর্তা এবং নেককার ও বদকার সকলের রিযিকদাতা, তিনি বান্দাদের জীবিত করেন, মৃত্যুদান করেন এবং তাদের মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা নেককার, তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন। এবং অবাধ্যদেরকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করাবেন।

অতঃপর তারা যখন তাদের অবাধ্যতায় অটল থাকে, তখন তিনি তাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "আমি তোমাদেকে যা বলছি তা অচিরেই তোমরা স্মরণ করবে এবং আমি আমার ব্যাপারে আল্লাহতে অর্পণ করছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি সর্বশেষ দৃষ্টি রাখেন।"

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَوَقَاهُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوْا। অর্থাৎ—মুমিন বান্দাটি ফিরআউন সম্প্রদায়ের অনুসরণকে অস্বীকার করায় তাদের কুফরীর দরুন তাদের উপর আল্লাহ তা'আলা যে কঠিন আযাব-গযব অবতীর্ণ করেন তা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেন। আর তারা তার বিরুদ্ধে ও আল্লাহ্ তা'আলার সরল পথ থেকে জনগণকে বিপথে রাখার জন্যে বিভিন্ন মনগড়া ধ্যান-ধারণা প্রচার করে তারা মুমিন বান্দা ও বনী ইসরাঈলের অন্যান্য সদস্যের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল তা থেকে তিনি তাঁকে নিরাপদে রাখলেন। অন্যদিকে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব-গযব বেষ্টন করলো।

আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেন ঃ "ফিরআউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি পরিবেষ্টন করল।" কবরে তাদের রূহ্সমূহকে সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয় আর যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে, "ফিরআউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ কর।" এই আয়াত্তের মাধ্যমে প্রমাণিত কবর আযাব সম্বন্ধে তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই।

মোদ্দা কথা হল, আল্লাহ্ তা'আলা যেমন কোন সম্প্রদায়কে দলীল পূর্ণ করণ ও রাসূল প্রেরণ ব্যতীত ধ্বংস করেন না, তদ্রূপ ফিরআউন সম্প্রদায়ের কাছে দলীল-প্রমাণাদি ও রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলার প্রমাণাদির ব্যাপারে তাদের সন্দেহ নিরসন করে এবং কখনও ভয়ভীতি প্রদর্শন ও কখনো অনুপ্রেরণা দানের মাধ্যমে তাদের প্রতি রাসূল প্রেরণের পর তারা অমান্য করাতে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِيْنَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ. فَاِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوْا لَنَا هٰذِهٖ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّطَّيَّرُوْا بِمُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗ اَلَا اِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ. وَقَالُوْا مَهْمَا تَاْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوْا وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ.

আমি তো ফিরআউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল-ফসলের ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত করেছি যাতে তারা অনুধাবন করে। যখন তাদের কোন কল্যাণ হত, তারা বলত; এটাতো আমাদের প্রাপ্য। আর যখন কোন অকল্যাণ হতো তখন তারা মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে অলক্ষুণে গণ্য করত; তাদের অকল্যাণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন; কিন্তু তাদের অধিকাংশ এটা জানে না। তারা বলল, আমাদেরকে জাদু করার জন্যে তুমি যে কোন নিদর্শন আমাদের নিকট পেশ করনা কেন, আমরা তোমাতে বিশ্বাস করবো না। তারপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলি স্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেল। আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৩০-১৩৩)

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জানাচ্ছেন যে, তিনি ফিরআউনের সম্প্রদায়কে দুর্ভিক্ষ দ্বারা ক্লিষ্ট করেছেন। ফিরআউনের সম্প্রদায় হচ্ছে কিবতীগণ। سِنِيْنَ বা 'দুর্ভিক্ষের বছরগুলো বলতে এমন সব বছরকে বুঝানো হয়, যে গুলোয় ফসল হয় না এবং গবাদি পশুর দুধ দ্বারাও মানুষ উপকৃত হতে পারে না। আয়াতে উল্লেখিত وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرٰتِ-এর অর্থ হচ্ছে গাছের ফলফলাদি ও কম হওয়া। আয়াতাংশ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ-এর দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে যে, তারা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তারা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারেনি বরং তারা আরো অবাধ্য হয়ে উঠে ও কুফরী হঠকারিতার মধ্যে অবিচল থাকে। যখন তাদের কোন কল্যাণ হত, অর্থাৎ প্রচুর ফসলাদি হত তখন তারা বলত আমাদেরই, অর্থাৎ এটা আমাদের ন্যায্য পাওনা এবং আমরাই এর উপযুক্ত। আর যখন কোন অকল্যাণ হত তখন তারা বলত, এটা মূসা ও তার সঙ্গীরা অলক্ষুণে হওয়ার কারণে আমাদের উপর আরোপিত হয়েছে। অথচ তারা কল্যাণের সময় বলত না যে এটা মূসা ও তার সঙ্গীদের বরকতে কিংবা তাদের শুভ অবস্থানের দরুন হয়েছে। তাদের অন্তরসমূহ দাম্ভিক ও অস্বীকারকারী এবং সত্য থেকে বিমুখ। যখন তাদের প্রতি কোন অকল্যাণ আপতিত হয়, তখন তারা এটা মূসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীদের প্রতি আরোপ করে আর যখন তারা কোন প্রকার কল্যাণ দেখতে পেতো, তখন তারা এটাকে নিজেদের কৃতিত্ব বলে দাবি করতো।

এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ اَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ। তাদের অকল্যাণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে একথার জন্যে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন। তারা বলে ঃ

مَهْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ .

অর্থাৎ—তারা বলল, আমাদেরকে জাদু করার জন্যে তুমি আমাদের কাছে যে কোন নিদর্শন বা মু'জিযা পেশ কর না কেন, আমরা তোমাতে বিশ্বাস করব না, এবং তোমার আনুগত্য করব না।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ . وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ .

অর্থাৎ—নিশ্চয়ই যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে তারা ঈমান আনবে না যদিও তাদের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন আসে, যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৬-৯৭)

তাদের শাস্তি সম্পর্কে অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ‎.

"অতঃপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা ক্লিষ্ট করি। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন; কিন্তু তারা দাম্ভিকই রয়ে গেল আর তারা ছিল এক অপরাধী সম্প্রদায়।"

আয়াতে উল্লেখিত اَلطُّوْفَانُ শব্দটির অর্থ নিয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। اَلطُّوْفَانُ-এর অর্থ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, অত্যধিক বৃষ্টিপাত যাতে ফসলাদি ও ফলমূল বিনষ্ট হয়। সাঈদ ইবন জুবাইর, কাতাদা, সুদ্দী এবং যাহ্হাক (র)ও এ মত পোষণ করেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) ও আতা (র) থেকে অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তুফানের অর্থ 'বিপুল হারে মৃত্যুবরণ'। মুজাহিদ বলেন, 'তুফান'-এর অর্থ সর্বাবস্থায়ই প্লাবন এবং প্লেগ। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তুফানের অর্থ হচ্ছে প্রতিটি মুসীবত যা জনগণকে বেষ্টন করে ফেলে। ইবন জারীর ও ইবন মারদূইয়াহ (র) হতে বর্ণিত। তাঁরা আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন, 'তুফানের অর্থ মৃত্যু'। এই হাদীসটি গরীব পর্যায়ের।

আয়াতে উল্লেখিত اَلْجَرَادُ শব্দটির অর্থ যে পঙ্গপাল তা সুবিদিত। সালমান ফারসী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলার বাহিনীসমূহের মধ্যে এগুলোর সংখ্যাই সর্বাধিক, এগুলো আমি খাই না এবং এগুলো খাওয়াকে হারামও বলি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রুচি বিরুদ্ধ হওয়ার জন্যেই তিনি পঙ্গপাল খাওয়া থেকে বিরত থাকতেন। যেমন তিনি গুইসাপ খাওয়া থেকে বিরত ছিলেন এবং পিঁয়াজ ও রসুন খাওয়া থেকে বিরত থাকতেন। বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়ে আব্দুল্লাহ ইবন আবূ আওফা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে যোগদান করেছি। সে সময় আমরা পঙ্গপাল খেতাম। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীসসমূহ নিয়ে তাফসীরে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সার কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শস্য-শ্যামল মাঠ ধ্বংস করে দিলেন। তাদের ফল-ফসলাদি ও গবাদি পশু কিছুই বাকি রইলো না, সবই ধ্বংস হয়ে গেল।

আয়াতে উল্লেখিত اَلْقُمَّلُ-এর অর্থ নিয়ে মতানৈক্য দেখা যায়। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, قُمَّلٌ হচ্ছে এমন একটি পোকা যা গমের মধ্য থেকে বের হয়ে আসে। এই বর্ণনাকারী থেকে অন্য একটি বর্ণনা বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, قُمَّلٌ-এর অর্থ হচ্ছে এমন ছোট পঙ্গপাল যার পাখা নেই। মুজাহিদ, ইকরিমা ও কাতাদা (র)ও এমত পোষণ

করেন। সাঈদ ইবন জুবাইর (রা) ও হাসান বসরী (র) বলেন قُمَّلُ হচ্ছে এমন একটি জীব যা কাল ও ছোট। আব্দুর রহমান ইবন যায়দ ইবন আসলাম (র) বলেন قُمَّلُ হচ্ছে পক্ষবিহীন মাছিসমূহ। ইবন জারীর (র) আরবী ভাষাভাষীদের বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, قُمَّلُ -এর অর্থ হচ্ছে উকুন বা পরজীবী কীট বিশেষ। উকুন দলে দলে তাদের ঘরে ও বিছানায় প্রবেশ করে এবং তাদের প্রতি অশান্তি ঘটায়। ফলে তাদের পক্ষে ঘুমানোও সম্ভব হতো না এবং জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। আতা ইবন সাইব (র) قُمَّلُ -কে সাধারণ উকুন বলে ব্যাখ্যা করেছেন। হাসান বসরী (র) قُمَّلُ কে ميم এর তাশদীদ ব্যতিরেকে 'কুমাল' রূপে পাঠ করেছেন। ব্যাঙ একটি বহুল পরিচিত প্রাণী। এগুলো তাদের খাবারে ও বাসনপত্রে লাফিয়ে পড়ত। এমন কি তাদের কেউ যদি খাওয়ার বা পান করার জন্যে মুখ খুলত অমনি ওগুলো মুখে ঢুকে পড়ত। রক্তের ব্যাপারটিও ছিল অনুরূপ। যখন তারা পানি পান করতে যেত তখনই পানিকে রক্ত মিশ্রিত পেত। যখনি তারা নীল নদে পানি পান করতে নামত, অমনি তার পানি রক্ত মিশ্রিত পেত। এমনিভাবে কোন নদী-নালা বা কূয়া ছিল না যার পানি ব্যবহারের সময় রক্ত মিশ্রিত মনে না হত। বনী ইসরাঈল বংশীয়রা এসব উপদ্রব থেকে মুক্ত ছিল। এগুলো ছিল পরিপূর্ণ অলৌকিক ঘটনা ও অকাট্য প্রমাণাদি যা মূসা (আ)-এর কাজের মাধ্যমে তাদের জন্যে প্রকাশ পেয়েছিল। বনী ইসরাঈলের আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই এভাবে লাভবান হয়েছিল। এসব ব্যাপার ছিল তাদের জন্য উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ। মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) বলেন, জাদুকররা যখন প্রতিযোগিতায় পরাস্ত ও ব্যর্থকাম হয়ে ঈমান আনয়ন করল তখনও আল্লাহ্‌র শত্রু ফিরআউন তার কুফরী ও দুষ্কর্মে অবিচল রইল। তখন আল্লাহ একে একে তার সম্মুখে নিদর্শনাদি প্রকাশ করেন। প্রথমে দুর্ভিক্ষ এবং তারপর তুফান অবতীর্ণ করেন। এরপর পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত স্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে পর পর প্রেরণ করেন। প্লাবনের ফলে তারা ঘর থেকে বের হতে পারতো না এবং কোন প্রকার কাজ-কর্মও করতে পারতো না। ফলে তারা দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হয়।

এরূপে তারা যখন দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হল তখন তারা মূসা (আ)-কে বলতে লাগল ঃ

يَا مُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ.

অর্থাৎ—হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর, তোমার সাথে তিনি যে অঙ্গীকার করেছেন সে মতে; যদি তুমি আমাদের ওপর থেকে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমাতে ঈমান আনবই এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সাথে অবশ্যই যেতে দেব। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৩৪)

তখন মূসা (আ) তার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ওপর থেকে তার প্রেরিত শাস্তি অপসারিত করেন। কিন্তু তারা তখন তাদের অঙ্গীকার পূরণ করল না। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি পঙ্গপাল অবতীর্ণ করেন। পঙ্গপাল তাদের গাছপালা সব নিঃশেষ করে ফেলে এমনকি তাদের ঘরের দরজাসমূহের লোহার পেরেকগুলো পর্যন্ত খেতে

থাকে। ফলে তাদের ঘরবাড়িগুলো পড়ে যেতে থাকে। তখন তারা পূর্বের মত মূসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ জানায়। মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করায় তাদের উপর থেকে আযাব রহিত হয়ে যায়। কিন্তু তারা তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করল না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি উকুন প্রেরণ করেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, মূসা (আ)-কে একটি বালুর টিবির কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আরো আদেশ দেয়া হয়েছির তিনি যেন তাঁর লাঠি দ্বারা তাতে আঘাত করেন। তারপর মূসা (আ) একটি বড় টিবির দিকে গিয়ে তাতে আপন লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন তাতে তাদের উপর উকুন ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি উকুন ঘরবাড়ি ও খাদ্য-সম্ভারের উপর ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তাদের নিদ্রা ও শান্তি বিঘ্নিত হতে লাগল। যখন তারা এই মুসীবতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল. তখন তারা মূসা (আ)-কে পূর্বের মত আল্লাহ্র দরবারে দু'আর জন্য অনুরোধ জানাতে লাগল। অতঃপর মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর থেকে আযাব হটিয়ে দিলেন কিন্তু তারা তাদের অঙ্গীকার কিছুই পূরণ করল না। তাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর ব্যাঙ প্রেরণ করেন। তাদের ঘরবাড়ি, খানাপিনা, ও হাঁড়ি-পাতিল ব্যাঙে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তাদের কেউ যখন কোন কাপড় কিংবা খাবারের ঢাকনা উঠাত, অমনি তারা দেখতে পেত যে, সেগুলো ব্যাঙ দখল করে রেখেছে। এই মুসীবতে যখন তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, তখন তারা আগের মত মূসা (আ)-এর কাছে দু'আর জন্য অনুরোধ জানাতে লাগল। মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালককে ডাকলেন এবং তিনি তাদের উপর থেকে আযাব বিদূরিত করলেন। কিন্তু তারা তাদের প্রতিশ্রুতি মোটেও রক্ষা করল না। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রক্তের শাস্তি প্রেরণ করেন। ফিরআউন সম্প্রদায়ের পানির উৎসগুলো রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। তারা যখনই কোন কূয়া, নদীনালা ও পাত্র থেকে পানি পান করতে ইচ্ছে করত এগুলো রক্তে পরিণত হয়ে যেত। যায়দ ইবন আসলাম বলেন, আয়াতাংশে উল্লেখিত دم শব্দটির অর্থ رعاف বা নাক থেকে ঝরা রক্ত। বর্ণনাটি ইবন আবী হাতিমের।

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوْا يَامُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلَى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوْهُ اِذَاهُمْ يَنْكُثُوْنَ. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَافِلِيْنَ.

অর্থাৎ—এবং যখন তাদের উপর শাস্তি আসত তারা বলত, হে মূসা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, তোমার সাথে তিনি যে অঙ্গীকার করেছেন সে অনুযায়ী। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত কর, তবে আমরা তো তোমাতে ঈমান আনবই এবং বনী ইসরাঈলকেও তোমার সাথে অবশ্যই যেতে দেব। আমি যখনই তাদের উপর থেকে শাস্তি অপসারিত করতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে যা তাদের উপর নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। সুতরাং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি

এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি। কারণ তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করত এবং এই সম্বন্ধে তারা ছিল গাফিল। (সূরা আ'রাফ ১৩৪-১৩৬)

আল্লাহ্ তা'আলা এখানে ফিরআউনের ও তার সম্প্রদায়ের কুফরী, জোর-জুলুম, পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতায় লিপ্ত থাকা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাদির অনুসরণ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন থেকে বিমুখতা ইত্যাদি সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন। অথচ আল্লাহর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বিষয়টি বিভিন্ন প্রকার অলৌকিক নিদর্শনাদি ও অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিদর্শনাদি প্রদর্শন করেছেন এবং এগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে দলীল ও প্রমাণ সাব্যস্ত করেছেন। যখনই তারা আল্লাহর কোন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত এবং মুসীবতের শিকার হত তখনই তারা মূসা (আ)-এর কাছে শপথ করে ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় যে, যদি তাদের উপর থেকে এসব মুসীবত দূরীভূত হয়ে যায় তাহলে ফিরআউন মূসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং মূসা (আ)-এর দলের লোকদেরকে মূসা (আ)-এর সাথে যেতে দেবে। অথচ যখনি তাদের উপর থেকে এরূপ আযাব-গযব উঠিয়ে নেয়া হত, তখনি তারা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ত এবং প্রেরিত সত্যকে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করত। আর মূসা (আ)-এর দিকে ফিরেও তাকাত না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি অন্য একটি নিদর্শন বা মুসীবত অবতীর্ণ করতেন যা পূর্বের প্রেরিত নিদর্শন ও মুসীবত থেকে অধিকতর কষ্টদায়ক হত। তখন তারা মূসা (আ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মৌখিক অঙ্গীকার করত। কিন্তু পরে তারা মিথ্যাচারে লিপ্ত হত। এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হত কিন্তু তা পূরণ করত না।

ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় বলত, হে মূসা! যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এই মুসীবত দূরীভূত কর, আমরা তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব এবং তোমার সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দেব। তখন তাদের উপর থেকে এই কঠিন আযাব ও শাস্তি দূর করা হত কিন্তু পুনরায় তারা তাদের নিরেট মূর্খতা ও বোকামিতে ফিরে যেত। মহা পরাক্রমশালী, ধৈর্যশীল আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে অবকাশ দিতেন এবং তড়িঘড়ি করে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করতেন না, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সংশোধনের সুযোগ দিতেন এবং আযাব-গযবের ব্যাপারে সতর্ক করতেন। তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণাদি পূর্ণ করার পর তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন যাতে এটা পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয় হয়ে থাকে এবং তাদের মত অন্যান্য কাফিরের জন্য এটা নজীর স্বরূপ এবং মুমিন বান্দাদের মধ্য থেকে যারা নসীহত গ্রহণ করে তাদের জন্যে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা যুখরুফে ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيَاتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِه فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِاٰيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُوْنَ. وَمَا نُرِيْهِمْ مِنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا. وَاَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ. وَقَالُوْا يَا اَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا

عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنْكُثُوْنَ. وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِىْ قَوْمِهٖ قَالَ يَاقَوْمِ أَلَيْسَ لِىْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِىْ أَفَلَا تُبْصِرُوْنَ. أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِىْ هُوَ مَهِيْنٌ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ. فَلَوْلَا أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْجَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَأَطَاعُوْهُ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فَاسِقِيْنَ. فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِيْنَ. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ.

মূসাকে তো আমি আমার নিদর্শনসহ ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, আমি তো জগতসমূহের প্রতিপালকের প্রেরিত। সে ওদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসা মাত্র তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল। আমি তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখাইনি যা এটার অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। তারা বলেছিল, হে জাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর যা তিনি তোমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন; তা হলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব। তারপর যখন আমি তাদের উপর থেকে শাস্তি বিদূরিত করলাম, তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসল। ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করল, হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? আর এ নদীগুলো আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা এটা দেখ না? আমি তো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হতে, যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতেও অক্ষম। মূসাকে কেন দেয়া হল না স্বর্ণবলয় অথবা তার সংগে কেন আসল না ফেরেশতাগণ দলবদ্ধভাবে? এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল, ফলে ওরা তার কথা মেনে নিল। ওরা তো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়! যখন ওরা আমাকে ক্রোধান্বিত করল আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সকলকে। তারপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত। (সূরা যুখরুফ ঃ ৪৬-৫৬)

নীচাশয় ও দুরাচার ফিরআউনের নিকট আপন সম্মানিত বান্দা ও রাসূলকে প্রেরণের ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতসমূহে ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তাঁরা জনগণের সম্মান ও আস্থা অর্জনে সমর্থ হন। এবং তারা কুফর ও শিরক পরিত্যাগ করে সত্য ও সরল পথের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। অথচ তারা বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন না করে ঐ সব নিদর্শন নিয়ে ঠাট্টা ও হাসি-তামাশায় লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ প্রেরিত সত্যপথ থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি পরপর নিদর্শনাদি প্রেরণ করেন। যার প্রতিটিই তার পূর্ববর্তীটির তুলনায় অধিকতর গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

এ প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ. وَقَالُوْا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ.

"আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম যাতে তারা ফিরে আসে। তারা বলেছিল, হে জাদুকর! তোমার প্রতিপালকের নিকট তুমি আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর, যা তিনি তোমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন, তাহলে আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করব।" (সূরা যুখরুফ ঃ ৪৮-৪৯)

তাদের সময়ে জাদুকর সম্বোধন সে যুগে দূষণীয় বলে বিবেচিত হতো না। কেননা, তাদের আলিমদেরকে ঐ যুগে জাদুকর বলে আখ্যায়িত করা হতো। এজন্যই তারা প্রয়োজনের সময় মূসা (আ)-কে জাদুকর বলে সম্বোধন করে এবং তাঁর কাছে অনুনয়-বিনয় করে তাদের আর্জি পেশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ

"যখন আমি তাদের থেকে শাস্তি বিদূরিত করলাম তখনই তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে বসল।"

তারপর আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউনের দাম্ভিকতার বর্ণনা দেন। ফিরআউনও তার রাজ্যের বিশালতা, সৌন্দর্য এবং বহমান নদী-নালা নিয়ে গর্ববোধ করত। নীল নদের সাথে সংযুক্ত করায় এসব বাড়তি খাল, নালা দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। অতঃপর ফিরআউন তার নিজের দৈহিক সৌন্দর্য নিয়েও গর্ব করে এবং আল্লাহ্র রাসূল মূসা (আ)-এর দোষত্রুটি বর্ণনা করতে শুরু করে। স্পষ্ট কথাবার্তা বলতে মূসা (আ)-এর অক্ষমতাকেও সে ত্রুটিরূপে চিহ্নিত করে। বাল্যকালে তাঁর জিহ্বায় কিছুটা জড়তা দেখা দেয়, যা তাঁর জন্যে ছিল পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য ও সম্মানের ব্যাপার যা তাঁর সাথে আল্লাহ তা'আলার কথোপকথন, তাঁর নিকট ওহী প্রেরণ; এর পর তাঁর কাছে তৌরাত অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে এটা কোন প্রকার অন্তরায় হয়নি। অথচ ফিরআউন এটাকে উপলক্ষ করে মূসা (আ)-এর ত্রুটি নির্দেশ করেছিল। ফিরআউন মূসা (আ)-এর স্বর্ণবলয় ও শরীরে সাজসজ্জা না থাকাকেও ত্রুটি বলে আখ্যায়িত করে অথচ এটা হল নারীদের ভূষণ, পুরুষের ব্যক্তিত্বের সাথে এটা সম্পৃক্ত নয়। তাই নবীদের ব্যক্তিত্বের সাথে তা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, কেননা নবীগণ পুরুষদের মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধি, মারেফাত, সাহস, পরহেজগারী ও জ্ঞানের দিক দিয়ে অধিকতর পরিপূর্ণ। তাঁরা দুনিয়ায় অধিকতর সাবধানতা অবলম্বনকারী এবং আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁর ওলীদের জন্যে যে সব নিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সে সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞাত।

আয়াতে উল্লেখিত مُقْتَرِنِيْنَ আয়াতাংশ দ্বারা দুটি অর্থ নেয়া যায়। প্রথমত, যদি ফিরআউনের উদ্দেশ্য হয় যে, ফেরেশতাগণ কেন মূসা (আ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন না। তাহলে তার এই আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, মূসা (আ)-এর চাইতে কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকেরও ফেরেশতাগণ অনেক সময় সম্মান করে থাকেন। কাজেই ফেরেশতা দলবদ্ধভাবে মূসা (আ)-এর সাথে আগমন করা নবুওতের মর্যাদার জন্য শর্ত নয়। যেমন হাদীস শরীফে রয়েছে—রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, 'যখন শিক্ষার্থীগণ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনে ইল্ম শিক্ষার জন্যে ঘরের বের হয় তখন তাদের সম্মানার্থে ফেরেশতাগণ তাদের চলার পথে তাদের পাখা বিস্তার করে দেন। সুতরাং মূসা (আ)-এর প্রতি ফেরেশতাগণের সম্মান, বিনয় প্রদর্শন যে কী পর্যায়ের ছিল তা সহজেই অনুমেয়। আর যদি এই কথার দ্বারা ফিরআউনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে মূসা (আ)-এর নবুওতের পক্ষে ফেরেশতাগণ সাক্ষীরূপে উপস্থিত হন না

কেন, তাহলে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর রিসালতকে এমন সব মু'জিযা ও মজবুত দলীলাদি দ্বারা শক্তিশালী করেছেন যা জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ এবং সত্য সন্ধানীদের কাছে সুপ্রমাণিত হিসেবে বিবেচ্য। তবে এসব মুজিযা ও মজবুত দলীলাদির ব্যাপারে ঐসব ব্যক্তি অন্ধ, যারা সারবস্তু ছেড়ে কেবল ছাল-বাকল নিয়েই ব্যস্ত থাকে। যাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের অন্তর সংশয় সন্দেহের দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন যেমনটি কিবতী বংশীয় ক্ষমতার মোহে অন্ধ ও মিথ্যাচারী ফিরআউনের ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوْهُ অর্থাৎ—এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল, তখন তারা তাঁকে মেনে নিল এবং তাঁর প্রভুত্বকেও স্বীকার করে নিল। যেহেতু তারা ছিল একটি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : فَلَمَّا اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ অর্থাৎ—যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম অর্থাৎ নিমজ্জিত করলাম অবমাননা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনায়, নিয়ামত দানের পর আযাবে নিপতিত করে, সুখের পর দুঃখ দিয়ে, আনন্দের পর বিষাদগ্রস্ত করে এবং সুখের জীবনের পর দোযখের কঠিন আযাব দিয়ে। অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের অনুসারীদের জন্যে অতীত ইতিহাস এবং তাদের থেকে যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে চায় ও আযাবকে ভয় করতে চায় তাদের জন্যে দৃষ্টান্তে পরিণত করলাম।

তাদের পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوْسٰى بِاٰيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَّمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِىْ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِيْنَ. وَقَالَ مُوْسٰى رَبِّىْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ. اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا اَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ. فَاَوْقِدْ لِىْ يَا هَامَانُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّىْ صَرْحًا لَّعَلِّىْ اَطَّلِعُ اِلٰى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُوْدُهٗ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْا اَنَّهُمْ اِلَيْنَا لَا يُرْجَعُوْنَ. فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنَاهُمْ فِى الْيَمِّ. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ. وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُوْنَ. وَاَتْبَعْنَاهُمْ فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ.

অর্থাৎ—মূসা (আ) যখন ওদের নিকটে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনগুলো নিয়ে আসল—ওরা বলল, এটাতো অলীক ইন্দ্রজাল মাত্র। আমাদের পূর্ব-পুরুষগণের কালে কখনও এরূপ কথা শুনিনি। মূসা বলল, আমার প্রতিপালক সম্যক অবগত, কে তাঁর নিকট থেকে পথ-নির্দেশ এনেছে এবং আখিরাতে কার পরিণাম শুভ হবে। জালিমরা কখনও সফলকাম হবে না।

ফিরআউন বলল, হে পারিষদবর্গ! আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ রয়েছে বলে আমি জানি না। হে হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি সুউচ্চ প্রাসাদ তৈরি কর, হয়ত আমি এতে উঠে মূসার ইলাহকে দেখতে পাব। তবে আমি অবশ্য মনে করি, সে মিথ্যাবাদী। ফিরআউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করেছিল এবং ওরা মনে করেছিল যে, ওরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না। অতএব, আমি তাকে ও তার বাহিনীকে ধরলাম এবং তাদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দেখ, জালিমদের পরিণাম কী হয়ে থাকে। ওদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। ওরা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত; কিয়ামতের দিন ওদেরকে সাহায্য করা হবে না। এ পৃথিবীতে আমি ওদের পশ্চাতে লাগিয়ে দিয়েছি অভিসম্পাত এবং কিয়ামতের দিন ওরা হবে ঘৃণিত। (সূরা কাসাস ঃ ৩৬-৪২)

আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যখন ফিরআউন ও তার দলের লোকেরা সত্যের অনুসরণ থেকে অহংকারভরে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং তাদের বাদশাহ মিথ্যা দাবি করল, তারা তাকে মেনে নিল ও তার আনুগত্য করল। তখন মহাশক্তিশালী, মহাপরাক্রমশালী প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ তীব্র আকার ধারণ করল যার বিরুদ্ধে কেউ জয়লাভ করতে পারে না এবং যাকে কেউ প্রতিহত করতে পারে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিলেন, ফিরআউন ও তার সৈন্য-সামন্তকে একদিন প্রত্যুষে ডুবিয়ে দিলেন, ফলে তাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি বা তাদের বাসস্থানের কোন অস্তিত্ব বাকি রইল না। তারা সকলে ডুবে গেল ও দোযখবাসী হল। এই পৃথিবীতে বিশ্ববাসীর মাঝে তারা অভিসম্পাতের শিকার হল এবং কিয়ামতের দিনেও। কিয়ামতের দিনে তাদের পুরস্কার কতই না নিকৃষ্ট হবে এবং তারা হবে ঘৃণিতদের অন্তর্ভুক্ত।

ফিরআউন ও তার বাহিনী ধ্বংসের বিবরণ

বাদশাহ ফিরআউনের আনুগত্য স্বীকার এবং আল্লাহর নবী ও তাঁর রাসূল মূসা ইব্‌নে ইমরান (আ)-এর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়ে মিসরের কিবতীদের যখন তাদের কুফরী, অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবস্থান দীর্ঘায়িত হতে লাগল; আল্লাহ্ তা'আলা তখন মিসরবাসীর নিকট বিস্ময়কর ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি পেশ করেন এবং তাদেরকে এমন সব অলৌকিক ঘটনা দেখান যাতে চোখ ঝলসে যায় এবং মানুষ হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। এতদসত্ত্বেও তাদের কিছু সংখ্যক ব্যতীত কেউ বিশ্বাস স্থাপন করেনি; অন্যায় থেকে প্রত্যাবর্তন করেনি; জোর-জুলুম-অত্যাচার থেকে বিরত থাকেনি এবং কেউ কেউ বলেন, তাদের মধ্যে মাত্র তিন ব্যক্তি ঈমান এনেছিলেন। একজন হচ্ছেন ফিরআউনের স্ত্রী, কিতাবীরা তার সম্বন্ধে মোটেও অবহিত নয়। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন ফিরআউনের সম্প্রদায়ের মুমিন ব্যক্তিটি যার নসীহত প্রদান, পরামর্শ দান ও তাদের বিরুদ্ধে দলীলাদি পেশ করার বিষয়টি ইতিপূর্বেই সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয়জন হচ্ছেন উপদেশ প্রদানকারী ব্যক্তিটি যিনি শহরের দূর প্রান্ত থেকে ছুটে এসে মূসা (আ)-কে তাঁর বিরুদ্ধে সাজানো ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে অবহিত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, 'হে মূসা (আ)! ফিরআউনের পারিষদবর্গ আপনাকে হত্যা করার জন্য সলাপরামর্শ করছে। সুতরাং আপনি বের হয়ে পড়েন। আমি আপনার একজন মঙ্গলকামী বৈ নই। এটি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর অভিমত। যা ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)ও বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অভিমত হল, এঁরা তিনজন হচ্ছেন জাদুকরদের অতিরিক্ত। কেননা জাদুকরগণও কিবতীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, ফিরআউনের সম্প্রদায় কিবতীদের মধ্য হতে একটি দল ঈমান এনেছিল। জাদুকরদের সকলে এবং বনী ইসরাঈলদের সকল গোত্রই ঈমান এনেছিল। কুরআন মজীদে নিম্নোক্ত আয়াতে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঃ

فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ.

অর্থাৎ—"ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গ নির্যাতন করবে এ আশংকায় তার সম্প্রদায়ের একদল ব্যতীত আর কেউই তার প্রতি ঈমান আনেনি। যমীনে তো ফিরআউন পরাক্রমশালী ছিল এবং সে অবশ্যই সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা ইউনুস ঃ ৮৩)

আয়াতাংশ قوم ه-তে ة সর্বনামটিতে ফিরআউনকেই নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা, বাক্যের পূর্বাপর দৃষ্টে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আবার কেউ কেউ নিকটতম শব্দ মূসা (আ)-এর

প্রতি নির্দেশ করে বলে বলেছেন। তবে প্রথম অভিমতটিই বেশি স্পষ্ট। তাফসীরে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আর তারা ঈমান এনেছিল গোপনে। কেননা, তারা ফিরআউন ও তার প্রতিপত্তি এবং তার সম্প্রদায়ের অত্যাচার, অবিচার ও নিষ্ঠুরতাকে ভয় করত। তারা আরো ভয় করত যে, যদি ফিরআউনের লোকেরা তাদের ঈমানের কথা জানতে পারে তাহলে তারা তাদেরকে ধর্মচ্যুত করে ফেলবে। ফিরআউনের ঘটনা আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন আর আল্লাহর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ.

অর্থাৎ– "নিশ্চয়ই দেশে তো ফিরআউন পরাক্রমশালী ছিল। সে ছিল স্বৈরাচারী, হঠকারী ও অন্যায়ভাবে দাম্ভিক।" আবার সে তার প্রতিটি কাজে, আচরণে ও ব্যবহারে ছিল সীমালংঘনকারী। বস্তুত সে ছিল এমন একটি মারাত্মক জীবাণু যার ধ্বংস ছিল অত্যাসন্ন; সে এমন একটি নিকৃষ্ট ফল যার কাটার সময় ছিল অত্যাসন্ন, এমন অভিশপ্ত অগ্নিশিখা যার নির্বাপন ছিল সুনিশ্চিত।

তখন মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন ঃ

يَاقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ. فَقَالُوْا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ.

'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহতে ঈমান এনে থাক, যদি তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর কর। তারপর তারা বলল, আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে জালিম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করো না এবং আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহে কাফির সম্প্রদায় হতে রক্ষা কর।' (সূরা ইউনুস ঃ ৮৪-৮৬)

অর্থাৎ মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করার জন্যে হুকুম দিলেন। তাঁরা তা মান্য করলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলাও তাদেরকে তাদের বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى وَأَخِيْهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوْتًا وَّاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً وَّأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ–"আমি মূসা (আ) ও তার ভাইয়ের নিকট প্রত্যাদেশ করলাম, মিসরে তোমাদের সম্প্রদায়ের জন্য গৃহ স্থাপন কর, তোমাদের গৃহগুলোকে ইবাদত গৃহ কর, সালাত কায়েম কর এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।" (সূরা ইউনুস ঃ ৮৭)

অন্য কথায় আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ) ও তাঁর ভ্রাতা হারূন (আ)-কে ওহী মারফত নির্দেশ দিলেন যেন তারা তাদের সম্প্রদায়ের জন্যে কিবতীদের থেকে আলাদা ধরনের গৃহ নির্মাণ করেন

যাতে তারা নির্দেশ পাওয়া মাত্রই ভ্রমণের জন্যে তৈরি হতে পারে এবং একে অন্যের ঘর সহজে চিনতে পারে ও প্রয়োজনে বের হয়ে পড়ার জন্যে সংবাদ দিতে পারে।

আয়াতে উল্লেখিত আয়াতাংশ وَاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً এর অর্থ হচ্ছে, 'তোমাদের গৃহগুলোকে ইবাদত গৃহ কর।' কেউ কেউ বলেন, 'এটার অর্থ হচ্ছে গৃহগুলোতে বেশি বেশি সালাত আদায় করবে।' মুজাহিদ (র), আবূ মালিক (র), ইবরাহীম আন-নাখয়ী (র), আর রাবী (র), যাহ্হাক (র), যায়িদ ইব্ন আসলাম (র), তাঁর পুত্র আবদুর রহমান (র) ও অন্যান্য তাফসীরকার এ অভিমত পোষণ করেন। এ অভিমত অনুযায়ী আয়াতাংশের অর্থ হবে ঃ তারা যেসব অসুবিধা, ক্লেশ, কষ্ট ও সংকীর্ণতায় ভুগছে তা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে অধিক হারে সালাত আদায় করে আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ .

অর্থাৎ– "ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর।" (সূরা বাকারা ঃ ৪৫)

হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল (সা) যখন কোন কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি সালাত আদায় করতেন।

আবার কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে—ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের অত্যাচারের ভয়ে মসজিদ বা মজলিসে প্রকাশ্য ইবাতদ কষ্টসাধ্য হওয়ায় গৃহের নির্দিষ্ট স্থানে তাদেরকে সালাত আদায়ের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। প্রথম অর্থটি অধিক গ্রহণযোগ্য। তবে দ্বিতীয় অর্থটিও অগ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

সাঈদ ইব্ন জুবাইর (র) আয়াতাংশ وَاجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قِبْلَةً এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'এটার অর্থ হচ্ছে, তোমরা তোমাদের বাড়িগুলোকে মুখোমুখি করে তৈরি কর।'

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَقَالَ مُوْسٰى رَبَّنَا اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ. رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ .قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ— মূসা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ দান করেছ যা দিয়ে হে আমাদের প্রতিপালক! তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে ভ্রষ্ট করে। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদ বিনষ্ট কর, তাদের হৃদয় কঠিন করে দাও। তারা তো মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত ঈমান আনবে না। তিনি প্রতি উত্তরে বললেন, তোমাদের দুজনের প্রার্থনা গৃহীত হল। সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনও অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করবে না। (সূরা ইউনুস ঃ ৮৮-৮৯)

উপরোক্ত আয়াতে একটি বিরাট অভিশাপের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার শত্রু ফিরআউনের বিপক্ষে মূসা (আ) আল্লাহ তা'আলার আযাব-গযব অবতীর্ণ হবার জন্যে বদদু'আ করলেন। কেননা, সে সত্যের অনুসরণ ও আল্লাহ তা'আলার সহজ সরল পথ থেকে বিমুখ ও বিচ্যুত ছিল। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সৎ, সহজ-সরল পথের বিরোধিতা করত, অসত্যকে আঁকড়ে ধরেছিল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণ এবং যুক্তিগ্রাহ্য দলীলাদি দ্বারা সুপ্রমাণিত বাস্তবতাকে সে অস্বীকার, অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করত। মূসা (আ) আরয করলেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি ফিরআউন, তার সম্প্রদায় কিবতী ও তার অনুসারী এবং তার ধর্মকর্মের অনুগামীদেরকে পার্থিব জীবনে শোভা ও সম্পদ প্রদান করেছ, তারা পার্থিব সম্পদকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং তারা অজ্ঞ তাই তাদের এসব সম্পদ, শোভা যথা দামী দামী কাপড়-চোপড়, আরামপ্রদ সুন্দর সুন্দর যানবাহন, সুউচ্চ প্রাসাদ ও প্রশস্ত ঘরবাড়ি, দেশী-বিদেশী সুপ্রসিদ্ধ খাবার-দাবার, শোভাময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জনপ্রিয় রাজত্ব, প্রতিপত্তি ও পার্থিব হাঁকডাক ইত্যাদি থাকাকে বিরাট কিছু মনে করে।

আয়াতে উল্লিখিত رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ আয়াতাংশের অর্থ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতাংশে উল্লেখিত اِطْمِسْ এর অর্থ ধ্বংস করে দাও।

আবুল আলীয়া (র), আর রাবী ইবন আনাস (র) ও যাহ্‌হাক (র) বলেন,এটার অর্থ হচ্ছে—'এগুলোকে, এদের আকৃতি যেভাবে রয়েছে ঠিক সেভাবে নকশা খচিত পাথরে পরিণত করে দাও।'

কাতাদা (র) বলেন, এটার অর্থ সম্পর্কে আমাদের কাছে যে বর্ণনা পৌঁছেছে তা হচ্ছে—'তাদের ক্ষেত-খামার সব কিছুই পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।' মুহাম্মদ ইবন কা'ব (র) বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে তাদের চিনি জাতীয় দ্রব্যাদি পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তিনি আরো বলেন, এটার অর্থ এও হতে পারে যে, 'তাদের সমুদয় সম্পদ পাথরে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।' এ সম্পর্কে উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তখন তিনি তাঁর একটি দাসকে বললেন, 'আমার কাছে একটি থলে নিয়ে এস। নির্দেশানুযায়ী সে একটি থলে নিয়ে আসলে দেখা গেল থলের মধ্যকার ছোলা ও ডিমগুলো পাথরে পরিণত হয়ে রয়েছে।' বর্ণনাটি ইব্‌ন আবূ হাতিম (র)-এর।

আয়াতাংশ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ এর তাফসীর প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে, তাদের অন্তরে মোহর করে দাও। আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত ধর্ম ও নিদর্শনাদিকে ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় কর্তৃক অমান্য করার দরুন মূসা (আ) তাদের প্রতি আল্লাহ, তাঁর দীন ও তাঁর নিদর্শনাদির পক্ষে ক্রুদ্ধ হয়ে যখন বদদু'আ করলেন, অমনি আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করেন এবং আযাব-গযব অবতীর্ণ করেন।

যেমন—নূহ (আ)-এর বদদু'আ তাঁর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা কবুল করেছিলেন। যখন তিনি বলেছিলেন ঃ

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا.

"হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না। তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতকারী ও কাফির।"

যখন মূসা (আ) ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি অভিশাপ দিয়েছিলেন, তার ভাই হারূন (আ) তাঁর দু'আর সমর্থনে 'আমীন' বলেছিলেন এবং হারূন (আ)ও দু'আ করেছেন বলে গণ্য করা হয়েছিল, তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

অর্থাৎ—"তোমাদের দুজনের দু'আ কবূল হল। সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং তোমরা কখনও অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করবে না।" (সূরা ইউনুস ঃ ৮৯)

তাফসীরকারগণ এবং আহলি কিতাবের বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, বনী ইসরাঈল তাদের ঈদের উৎসব পালনের উদ্দেশ্যে শহরের বাইরে যাবার জন্যে ফিরআউনের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করলে ফিরআউন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদেরকে অনুমতি প্রদান করল। তারা বের হবার জন্যে প্রস্তুতি নিতে লাগল এবং পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের সাথে বনী ইসরাঈলের একটি চালাকি মাত্র, যাতে তারা ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের অত্যাচার-অবিচার থেকে মুক্তি পেতে পারে।

কিবাতীরা আরো উল্লেখ করেছে যে, আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে কিবতীদের থেকে স্বর্ণালংকার কর্জ নেয়ার জন্যে হুকুম দিয়েছিলেন; তাই তারা কিবতীদের থেকে বহু অলংকারপত্র কর্জ নিয়েছিল এবং রাতের অন্ধকারে তারা বের হয়ে পড়ল ও বিরামহীনভাবে অতি দ্রুত পথ অতিক্রম করতে লাগল – যাতে তারা অনতিবিলম্বে সিরিয়ার অঞ্চলে পৌঁছতে পারে। ফিরআউন যখন তাদের মিসর ত্যাগের কথা জানতে পারল, সে তখন তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হল এবং তাদের বিরুদ্ধে তার রাগ চরম আকার ধারণ করল। সে তার সেনাবাহিনীকে প্ররোচিত করল এবং বনী ইসরাঈলকে পাকড়াও করার ও তাদের সমূলে ধ্বংস করার জন্যে তাদের সমবেত করল।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَّعُيُونٍ. وَكُنُوزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيمٍ. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. قَالَ كَلَّا. إِنَّ مَعِيَ رَبِّي

سَيَهْدِيْنِ. فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ. وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ. وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَعَهٗ اَجْمَعِيْنَ. ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِيْنَ. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمِ.

আমি মূসা (আ)-এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেছিলাম এই মর্মে ঃ আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা বের হয়ে পড়; তোমাদের তো পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। তারপর ফিরআউন শহরে শহরে লোক সংগ্রহকারী পাঠাল এই বলে যে, এরা তো ক্ষুদ্র একটি দল; ওরা তো আমাদের ক্রোধ উদ্রেক করেছে এবং আমরা তো সকলেই সদা সতর্ক। পরিণামে আমি ফিরআউন গোষ্ঠীকে বহিষ্কৃত করলাম ওদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ থেকে এবং ধনভাণ্ডার ও সুরম্য সৌধমালা থেকে। এরূপই ঘটেছিল এবং বনী ইসরাঈলকে এসবের অধিকারী করেছিলাম। ওরা সূর্যোদয়কালে তাদের পশ্চাতে এসে পড়ল। অতঃপর যখন দু'দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সঙ্গীরা বলল, 'আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম।' মূসা বলল, 'কখনই নয়! আমার সঙ্গে আছেন আমার প্রতিপালক; সত্বর তিনি আমাকে পথ-নির্দেশ করবেন। তারপর মূসার প্রতি ওহী করলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, ফলে এটা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল। আমি সেখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে এবং আমি উদ্ধার করলাম মূসা ও তাঁর সঙ্গী সকলকে। তৎপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। তোমার প্রতিপালক– তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (সূরা শু'আরা ঃ ৫২-৮০)।

তাফসীরকারগণ বলেন, ফিরআউন যখন বনী ইসরাঈলকে পিছু ধাওয়ার জন্যে সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বের হল তখন তার সাথে ছিল একটি বিরাট সৈন্যদল। ঐ সৈন্যদলের ব্যবহৃত ঘোড়ার মধ্যে ছিল একলাখ উন্নতমানের কালো ঘোড়া এবং সৈন্য সংখ্যা ছিল ষোল লাখের উর্ধ্বে। প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সম্যক জ্ঞাত।

কেউ কেউ বলেন, শিশুদের সংখ্যা বাদ দিয়ে বনী ইসরাঈলের মধ্যেই ছিল প্রায় ছয় লাখ যোদ্ধা। মূসা (আ)-এর সাথে বনী ইসরাঈলের মিসর ত্যাগ ও তাদের আদি পিতা ইয়াকূব (আ) বা ইসরাঈলের সাথে মিসর প্রবেশের মধ্যে ছিল চারশ ছাব্বিশ সৌর বছরের ব্যবধান।

মোদ্দা কথা, ফিরআউন সৈন্যসামন্ত নিয়ে বনী ইসরাঈলকে ধরার জন্যে অগ্রসর হল এবং সূর্যোদয়ের সময়ে তারা পরস্পরের দেখা পেল। তখন সামনাসামনি যুদ্ধ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এ সময়ই মূসা (আ)-এর অনুসারিগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে লাগল, 'আমরা তাহলে ধরা পড়ে গেলাম।' তাদের ভীত হবার কারণ হল, তাদের সম্মুখে ছিল উত্তাল সাগর। সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া তাদের আর কোন পথ বা গতি ছিল না। আর সাগর পাড়ি দেয়ার শক্তিও ছিল না। তাদের বাম পাশে ও ডান পাশে ছিল সুউচ্চ খাড়া পাহাড়। ফিরআউন তাদেরকে একেবারে আটকে ফেলেছিল। মূসা (আ)-এর অনুসারীরা ফিরআউনকে তার দলবল ও বিশাল সৈন্যসামন্ত সহকারে অবলোকন করছিল। তারা ফিরআউনের ভয়ে আতংকিত হয়ে পড়ছিল। কেননা, তারা ফিরআউনের রাজ্যে ফিরআউন কর্তৃক লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিল। সুতরাং তারা আল্লাহর নবী মূসা (আ)-এর কাছে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অনুযোগ করল।

তখন আল্লাহর নবী মূসা (আ) তাদেরকে অভয় দিয়ে বললেন ঃ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ অর্থাৎ—'কখনও না; নিশ্চয়ই আমার সাথে আমার প্রতিপালক রয়েছেন, তিনি আমাকে পরিত্রাণের সঠিক পথ-নির্দেশ করবেন।' মূসা (আ) তাঁর অনুসারীদের পশ্চাৎভাগে ছিলেন। তিনি অগ্রসর হয়ে সকলের সম্মুখে গেলেন এবং সাগরের দিকে তাকালেন। সাগরে তখন উত্তাল তরঙ্গ ছিল। তখন তিনি বলছিলেন ঃ আমাকে এখানেই আসার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর ভাই হারূন (আ) এবং ইউশা ইব্‌ন নূন যিনি বনী ইসরাঈলের বিশিষ্ট নেতা, আলিম ও আবিদ। মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে ওহী প্রেরণ করেন ও তাঁকে নবুওত দান করেন। পরবর্তীতে তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আসবে। মূসা (আ) ও তাঁর দলবলের সাথে ফিরআউন সম্প্রদায়ের মু'মিন বান্দাটিও ছিলেন। তারা থমকে দাঁড়িয়েছিলেন আর গোটা বনী ইসরাঈল গোত্র তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। কথিত আছে, ফিরআউন সম্প্রদায়ের মুমিন বান্দাটি ঘোড়া নিয়ে কয়েকবার সাগরে ঝাঁপ দেবার চেষ্টা করেন কিন্তু তার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠল না। তাই তিনি মূসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর নবী (আ)! আমাদেরকে কি এখানেই আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে? মূসা (আ) বললেন, 'হ্যাঁ'। যখন ব্যাপারটি তুঙ্গে উঠল, অবস্থা সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল, ব্যাপারটি ভয়াবহ আকার ধারণ করল; ফিরআউন ও তার গোষ্ঠী সশস্ত্র সৈন্য-সামন্ত নিয়ে ক্রোধভরে অতি সন্নিকটে এসে পৌঁছাল; অবস্থা বেগতিক হয়ে দাঁড়াল; চক্ষু স্থির হয়ে গেল এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল, তখন ধৈর্যশীল মহান শক্তিমান, আরশের মহান অধিপতি, প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা মূসা কালিমুল্লাহ (আ)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন ঃ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ। অর্থাৎ নিজ লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত কর। যখন তিনি সাগরে আঘাত করলেন, কথিত আছে তিনি সাগরকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আল্লাহর হুকুমে বিভক্ত হয়ে যাও।' যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ.

অর্থাৎ–আমি মূসার প্রতি ওহী করলাম, আপন লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল। (সূরা শু'আরা ঃ ৬৩)

কথিত আছে, সমুদ্রটি বারটি খণ্ডে বা রাস্তায় বিভক্ত হয়েছিল। প্রতিটি গোত্রের জন্যে একটি করে রাস্তা হয়ে গেল, যাতে তারা নিজ নিজ নির্ধারিত রাস্তায় সহজে পথ চলতে পারে। এ রাস্তাগুলোর মধ্যে জানালা ছিল বলে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন, যাতে তারা একদল অন্যদলকে অনায়াসে রাস্তা চলার সময় দেখতে পায়। কিন্তু এই অভিমতটি শুদ্ধ নয়। কেননা, পানি যেহেতু স্বচ্ছ পদার্থ তাই তার পিছনে আলো থাকলে দৃষ্টি বাধাপ্রাপ্ত হয় না। সুতরাং একদল অন্যদলকে দেখার জন্যে জানালা থাকার প্রয়োজন হয় না। যেই সত্তা কোন বস্তুকে সৃষ্টি করতে كُنْ হয়ে যাও বললে সাথে সাথে তা হয়ে যায়, সেই সত্তার মহান কুদরতের কারণেই সমুদ্রের পানি ছিল পর্বতের মত দণ্ডায়মান। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রে বিশেষ ধরনের বায়ু প্রেরণ করেন যার ধাক্কায় পানি সরে রাস্তাগুলো শুকিয়ে যায়, যাতে ঘোড়া ও অন্যান্য প্রাণীর খুর না আটকিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوْسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِى الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشٰى. فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ. وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهٗ وَمَا هَدٰى.

অর্থাৎ-"আমি অবশ্যই মূসা (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এ মর্মে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা বেরিয়ে পড় এবং তাদের জন্যে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুকনো পথ নির্মাণ কর। পশ্চাৎ হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এরূপ আশংকা করো না এবং ভয়ও করো না। অতঃপর ফিরআউন তার সৈন্য-সামন্তসহ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল, তারপর সমুদ্র তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করল আর ফিরআউন তার সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং সৎপথ দেখায়নি।" (সূরা তা-হা ঃ ৭৭-৭৯)।

বস্তুত পরম পরাক্রমশালী সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালকের আদেশে যখন সমুদ্রের অবস্থা এরূপ দাঁড়াল বনী ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্র পার হবার জন্যে মূসা (আ)-কে নির্দেশ দেয়া হল, তখন তারা সকলে আনন্দচিত্তে অতি দ্রুত সমুদ্রে অবতরণ করেন। তারা অবশ্য দৃষ্টি নিক্ষেপকারীদের দৃষ্টি ঝলসিয়ে দেয় ও তাদের অবাক করে দেয়। আর এরূপ দৃশ্য মু'মিনদের অন্তরসমূহকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়। যখন তারা এরূপে সমুদ্র পার হবার জন্যে সমুদ্রে অবতরণ করেন, নির্বিঘ্নে তাঁরা সমুদ্র পার হলেন এবং তাঁদের শেষ সদস্যও সমুদ্র পার হলেন। আর যখন তাঁরা সমুদ্র পার হলেন, ঠিক তখনই ফিরআউনের সৈন্য-সামন্তের প্রথমাংশ ও অগ্রগামীদল সমুদ্রের কিনারায় পৌঁছাল। তখন মূসা (আ) ইচ্ছে করেছিলেন যে, পুনরায় সমুদ্রে লাঠি দিয়ে আঘাত করবেন যাতে সমুদ্রের অবস্থা পূর্ববৎ হয়ে যায় এবং ফিরআউনের দল তাদেরকে ধরতে না পারে ও তাদের পৌঁছার কোন বাহনই না থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে এ অবস্থায় ছেড়ে দিতে মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ. اَنْ اَدُّوْا اِلَىَّ عِبَادَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ. وَاَنْ لَا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِنِّىْ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِيْنٍ. وَاِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ. وَاِنْ لَمْ تُؤْمِنُوْا لِىْ فَاعْتَزِلُوْنِ. فَدَعَا رَبَّهٗ اَنَّ هٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُوْنَ. فَاَسْرِ بِعِبَادِىْ لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُوْنَ. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُوْنَ. كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَعُيُوْنٍ. وَزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ. وَنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ. كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ. مِنْ فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ. وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ. وَاٰتَيْنٰهُمْ مِنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰؤٌا مُّبِيْنٌ.

অর্থাৎ— তাদের পূর্বে আমি তো ফিরআউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকটও এসেছিল এক সম্মানিত রাসূল। সে বলল, 'আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল এবং তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না। আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না পার, সে জন্য আমি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণ নিচ্ছি। যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে তোমরা আমার নিকট থেকে দূরে থাক।

তারপর মূসা তাঁর প্রতিপালকের নিকট নিবেদন করল, 'এরা তো এক অপরাধী সম্প্রদায়।' আমি বলেছিলাম, 'তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা বের হয়ে পড়; তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, ওরা এমন এক বাহিনী যা নিমজ্জিত হবে। ওরা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস-উপকরণ, ওতে তারা আনন্দ পেতো। এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এ সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন সম্প্রদায়কে। আকাশ এবং পৃথিবী কেউই ওদের জন্যে অশ্রুপাত করেনি এবং ওদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি। আমি তো উদ্ধার করেছিলাম বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে ফিরআউনের; সে তো ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আমি জেনে-শুনেই ওদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম এবং ওদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী—যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা। (সূরা দুখান ঃ ১৭-৩৩)

আয়াতাংশ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا এর অর্থ হচ্ছে সমুদ্রকে তার অবস্থায় স্থির থাকতে দাও, তার ব্যত্যয় ঘটায়ো না। এ মতটি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র), ইকরিমা (র), রাবী (র), যাহ্‌হাক (র), কাতাদা (র), কা'ব আল-আহবার (রা), সেমাক ইব্‌ন হারব (র) এবং আবদুর রহমান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) প্রমুখের।

সমুদ্রের সেই স্থিতাবস্থায়ই ফিরআউন সমুদ্রের তীরে পৌঁছলো, সবকিছু দেখল এবং সমুদ্রের আশ্চর্যজনক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করল। আর পুরোপুরি বুঝতে পারল যেমন পূর্বেও বুঝত যে, এটা মহাসম্মানিত আরশের মহান মালিক প্রতিপালকেরই কুদরতের লীলাখেলা। সে থমকে দাঁড়াল, সম্মুখে অগ্রসর হলো না এবং বনী ইসরাঈল ও মূসা (আ)-কে পিছু ধাওয়া করার জন্যে মনে মনে অনুতপ্ত হল, তবে এ অবস্থায় অনুতাপ যে তার কোন উপকারে আসবে না, সে তা ভাল করে বুঝতে পারল। তা সত্ত্বেও সে তার সেনাবাহিনীর নিকট তার অটুট মনোবলের কথা ও আক্রমণাত্মক ভাব প্রকাশ করল। যে সম্প্রদায়কে সে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল, ফলে তারা তার আনুগত্য স্বীকার করেছিল, যারা তাকে বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও তার অনুসরণ করেছিল নিজ কুফরীতে লিপ্ত ফাসিক ও ফাজির নাফসের প্ররোচনায় তাদেরকে উদ্দেশ করে সে বলল, 'তোমরা একটু লক্ষ্য করে দেখ, সমুদ্র আমার জন্যে সরে গিয়ে কিরূপে পথ করে দিয়েছে—যাতে আমি আমার ঐসব পলাতক দাসদেরকে ধরতে পারি—যারা আমার আনুগত্য স্বীকার না করে আমার রাজত্ব থেকে বের হয়ে যাবার চেষ্টা করছে। মুখে এরূপ উচ্চবাচ্য করলেও অন্তরে সে দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিল যে, সে কি তাদের পিছু ধাওয়া করবে, নাকি আত্মরক্ষার্থে

পিছু হটে যাবে? হায়! তার হটে যাবার কোন উপায় ছিল না, সে এক কদম সামনে অগ্রসর হলে কয়েক কদম পিছু হটবার চেষ্টা করছিল।

তাফসীরকারগণ উল্লেখ করেন, এরূপ অবস্থায় জিবরাঈল (আ) একটি আকর্ষণীয় ঘোটকীর উপর সওয়ার হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং ফিরআউন যে ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল তার সম্মুখ দিয়ে সমুদ্রের দিকে ঘোটকীটি অগ্রসর হল। তার ঘোড়াটি ঘোটকীর প্রতি আকৃষ্ট হল এবং ঘোড়াটি ঘোটকীর পিছু পিছু ছুটতে লাগল। জিবরাঈল (আ) দ্রুত তার সামনে গেলেন এবং সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। ঘোড়া ও মাদী ঘোড়াটি ছুটতে লাগল। ঘোড়াটি সামনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। ঘোড়ার উপর ফিরআউনের আর নিয়ন্ত্রণ রইল না। ফিরআউন তার ভাল-মন্দ কিছুই চিন্তা করতে সক্ষম ছিল না। সেনাবাহিনী যখন ফিরআউনকে দ্রুত সামনের দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তারাও অতি দ্রুত তার পিছনে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। যখন তারা সকলেই পরিপূর্ণভাবে সমুদ্রে ঢুকে গেল এবং সেনাবাহিনীর প্রথম ভাগ সমুদ্র থেকে বের হবার উপক্রম হল আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে আদেশ করলেন; তিনি যেন তাঁর লাঠি দিয়ে পুনরায় সমুদ্রে আঘাত করেন। তিনি সুমদ্রে আঘাত করলেন। তখন সমুদ্র পূর্বের আকার ধারণ করে ফিরআউন ও তার সেনাবাহিনীর মাথার উপর দিয়ে প্রবাহিত হলো। ফলে তাদের কেউই আর রক্ষা পেল না, সকলেই ডুবে মরল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَنْجَيْنَا مُوْسٰى وَمَنْ مَّعَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ. ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ.

অর্থাৎ– এবং আমি উদ্ধার করলাম মূসা ও তার সঙ্গী সকলকে। তারপর নিমজ্জিত করলাম অপর দলটিকে। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। তোমার প্রতিপালক— তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (সূরা শু'আরা ঃ ৬৫-৬৮)

অর্থাৎ তিনি তার পছন্দনীয় মু'মিন বান্দাদের উদ্ধারের ব্যাপারে পরাক্রমশালী। তাই তাদের একজনও ডুবে মারা যাননি। পক্ষান্তরে তার দুশমনদেরকে ডুবিয়ে মারার ব্যাপারেও তিনি পরাক্রমশালী। তাই তাদের কেউই রক্ষা পায়নি। এতে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার অসীম কুদরতের একটি মহা নিদর্শন ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আবার অন্যদিকে রাসূল (সা) যে মহান শরীয়ত ও সরল-সঠিক তরীকা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, তার সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণও বটে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَجَاوَزْنَا بِبَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُوْدُهٗ بَغْيًا وَّعَدْوًا حَتّٰۤى اِذَاۤ اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اٰمَنْتُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا الَّذِىْۤ اٰمَنَتْ بِهٖ بَنُوْۤا اِسْرَآءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. آٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ اٰيٰتِنَا لَغٰفِلُوْنَ.

অর্থাৎ—আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করলাম; এবং ফিরআউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্যসহকারে সীমালংঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে নিমজ্জমান হল তখন বলল, অমি বিশ্বাস করলাম বনী ইসরাঈল যাতে বিশ্বাস করে। নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকে আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল। (সূরা ইউনুস ঃ ৯০-৯২)

অন্য কথায়, অত্র আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কিবতী কাফিরদের প্রধান ফিরআউনের ডুবে মরার বিবরণ দেন। উত্তাল তরঙ্গ যখন তাকে একবার উপরের দিকে উঠাচ্ছিল এবং অন্যবার নিচের দিকে নামাচ্ছিল এবং ফিরআউন ও তার সেনাবাহিনী কিরূপ মহাসংকট ও দুর্ভেদ্য মুসীবতে পতিত হয়েছিল তা বনী ইসরাঈলরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছিল যা তাদের চোখ জুড়াচ্ছিল ও হৃদয়ের জ্বালা প্রশমিত করছিল। ফিরাউন যখন নিজের ধ্বংস প্রত্যক্ষ করল; সে কোণঠাসা হয়ে পড়ল এবং তার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল তখন সে বিনম্র হল; তওবা করল এবং এমন সময় ঈমান আনয়ন করল, যখন তার ঈমান কারো উপকারে আসে না।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ. وَلَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰيَةٍ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ.

অর্থাৎ—যাদের বিরুদ্ধে তোমার প্রতিপালকের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছে তারা ঈমান আনবে না যদি তাদের নিকট প্রত্যেকটি নিদর্শন আসে— যতক্ষণ না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। (সূরা ইউনুস ঃ ৯৬-৯৭)

আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে আরো ইরশাদ করেছেন ঃ

فَلَمَّا رَوُا بَأْسَنَا قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِيْنَ. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّارَوُا بَأْسَنَا. سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهِ. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُوْنَ.

অর্থাৎ—তারপর তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল, আমরা এক আল্লাহ্তে ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। ওরা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন ওদের ঈমান ওদের কোন উপকারে আসল না। আল্লাহ্র এই বিধান পূর্ব থেকেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং এ ক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা মুমিন ঃ ৮৪-৮৫)

অনুরূপ মূসা (আ) ফিরাউন ও তার গোষ্ঠীর ব্যাপারে বদ দু'আ করেছিলেন, যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পদ ধ্বংস করে দেন এবং তাদের অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা মোহর মেরে

দেন, যাতে তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পূর্বে ঈমান না আনতে পারে। অর্থাৎ তখন তাদের ঈমান তাদের কোন কাজে আসবে না আর এটা হবে তাদের জন্যে আক্ষেপের কারণ। মূসা (আ) ও হারূন (আ) যখন এরূপ বদ দু'আ করছিলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করলেন ঃ – قَدْ أُجِيبَتْ دَّعْوَتُكُمَا

অর্থাৎ—'তোমাদের দু'জনের দু'আ কবূল হল।' এ প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। ইমাম আহমদ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ফিরআউনের উক্তি ঃ

آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ.

"আমি বিশ্বাস করলাম বনী ইসরাঈল যাতে বিশ্বাস করে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই।" (সূরা ইউনুস ঃ ৯০)

এ প্রসঙ্গে জিবরাঈল আমাকে বললেন, (হে রাসূল!) ঐ সময়ের অবস্থা যদি আপনি দেখতেন! সমুদ্রের তলদেশ থেকে কাদা নিয়ে তার মুখে পুরে দিলাম, পাছে সে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত না পেয়ে যায়। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী (র) ইব্ন জারীর (র) ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) প্রমুখ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী (র) হাদীসটি হাসান পর্যায়ের বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবূ দাউদ তাবলিসী (র)ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইব্ন আবূ হাতিম (র) ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা যখন ফিরআউনকে ডুবিয়ে দিলেন, তখন সে তার আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করল এবং উচ্চৈঃস্বরে বলল ঃ

آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَائِيلَ.

রাসূল (সা) বলেন, জিবরাঈল (আ) তখন আশঙ্কা করছিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার রহমত আল্লাহ তা'আলার গযবের উপর প্রাধান্য না পেয়ে যায়। তিনি তখন তাঁর পাখা দ্বারা কাল মাটি তুলে ফিরআউনের মুখে ছুঁড়ে মারল যাতে করে তার মুখ ঢাকা পড়ে যায়।

ইবন জারীর (র) অন্য এক সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ মর্মের হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবরাহীম তায়মী (র), কাতাদা (র), মাইমুন ইব্ন মিহরান (র) প্রমুখ হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, জিবরাঈল (আ) বলেছেন, 'আমি ফিরআউনের মত অন্য কাউকে এত বেশি ঘৃণা করি নাই যখন সে বলেছিল أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى অর্থাৎ 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠতম প্রতিপালক।'

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ. আয়াতাংশে উল্লেখিত প্রশ্নটি অস্বীকৃতি বোঝাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা যে তার ঈমান কবূল করেননি এটি তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা জানতেন যে, যদি তাকে পুনরায়

দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হত তাহলে সে পুনরায় পূর্বের ন্যায় আচরণ করত। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যান্য কাফিরের সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, যখন তারা জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করবে তখন বলে উঠবে ঃ

وَلَوْ تَرٰى إِذْ وُقِفُوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوْا يَالَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِاٰيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"তুমি যদি দেখতে পেতে যখন তাদেরকে আগুনের পার্শ্বে দাঁড় করানো হবে এবং তারা বলবে, হায়! যদি আমাদের প্রত্যাবর্তন ঘটত তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনকে অস্বীকার করতাম না এবং আমরা মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।" (সূরা আন্‌আম ঃ ২৭)

জবাবে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوْا يُخْفُوْنَ مِنْ قَبْلُ. وَلَوْرُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ.

"না, পূর্বে তারা যা গোপন করত তা এখন তাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে এবং তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল পুনরায় তারা তা-ই করত এবং নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আন্'আম ঃ ২৮)

আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ মুফাস্‌সির বর্ণনা করেছেন যে, বনী ইসরাঈলের কেউ কেউ ফিরআউনের মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিল এবং তারা বলেছিল, ফিরআউন কখনও মরবে না; এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে নির্দেশ দেন, যাতে ফিরআউনকে কোন একটি উঁচু জায়গায় নিক্ষেপ করে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ পানির উপরে। আবার কেউ কেউ বলেন, মাটির একটি ঢিবির উপরে। তার গায়ে ছিল তার বর্ম যা ছিল সুপরিচিত যাতে ফিরআউনের লাশ বলে বনী ইসরাঈল সহজে শনাক্ত করতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের পরিচয় পেতে পারে।

এজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً

অর্থাৎ—'আজ আমি তোমার দেহটা রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্যে নিদর্শন হয়ে থাক।' তোমার পরিচিত বর্মসহ তোমাকে রক্ষা করব যাতে তুমি বনী ইসরাঈলের কাছে শক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের একটি নিদর্শন হয়ে থাক।' এ জন্যই কেউ কেউ আয়াতাংশটিকে নিম্নরূপ পাঠ করেছেন لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ اٰيَةً অর্থাৎ—'যাতে তুমি তোমার সৃষ্টিকর্তার একটি নিদর্শন হয়ে থাক। আয়াতাংশের অর্থ নিম্নরূপও হতে পারে। 'তোমাকে রক্ষা করেছি তোমার বর্মসহ যাতে তোমার বর্ম তোমার পরবর্তী বনী ইসরাঈলের জন্যে তোমাকে চেনার ব্যাপারে এবং তোমার ধ্বংসের ব্যাপারে একটি প্রতীক হিসেবে গণ্য হয়।' কোন্ অর্থটি সঠিক, আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত। ফিরআউন ও তার সৈন্যবাহিনী আশুরার দিন ধ্বংস হয়েছিল।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর কিতাব সহীহ বুখারী শরীফে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মদীনা শরীফ আগমন করলে, দেখলেন ইহুদীরা আশুরার দিন সিয়াম পালন করে থাকে। (কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে) তারা বলল, এটা এমন একটি দিন যেদিনে ফিরআউনের বিরুদ্ধে মূসা (আ)-এর বিজয় সূচিত হয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ – انتم احق بموسى منهم فصوموا

অর্থাৎ— মূসা (আ) সম্পর্কে বনী ইসরাঈল থেকে তোমরা (মুসলমানরা) বেশি হকদার। কাজেই তোমরা ঐ দিন সিয়াম পালন কর। বুখারী ও মুসলিম শরীফ ব্যতীত অন্যান্য হাদীস গ্রন্থেও এ মর্মের হাদীসটি পাওয়া যায়।

ফিরআউনের ধ্বংসোত্তর যুগে বনী ইসরাঈলের অবস্থা

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِى الْيَمِّ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَافِلِيْنَ. وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا. وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ. وَجَاوَزْنَا بِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَعْكُفُوْنَ عَلٰى اَصْنَامٍ لَّهُمْ. قَالُوْا يَامُوْسَى اجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ. قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ. اِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّاهُمْ فِيْهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ. قَالَ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْغِيْكُمْ اِلٰهًا وَّهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِيْنَ. وَاِذْ اَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ. يُقَتِّلُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ. وَفِىْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ.

সুতরাং আমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছি। কারণ তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করত এবং এ সম্বন্ধে তারা ছিল গাফিল। যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হত তাদেরকে আমি আমার কল্যাণপ্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকারী করি; এবং বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভবাণী সত্যে পরিণত হল। যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল, আর ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি। আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দেই; তারপর তারা প্রতিমাপূজায় রত এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হয়। তারা বলল, হে মূসা! তাদের দেবতার মত আমাদের জন্যও একটি দেবতা গড়ে দাও; সে বলল, তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়। এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো বিধ্বস্ত হবে এবং তারা যা করছে তাও অমূলক। সে আবারো বলল, আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের জন্য আমি কি অন্য ইলাহ্ খুঁজব অথচ তিনি তোমাদেরকে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন? স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে ফিরআউনের অনুসারীদের হাত হতে উদ্ধার করেছি, যারা তোমাদেরকে নিকৃষ্ট শাস্তি দিত।

তারা তোমাদের পুত্র সন্তানকে হত্যা করত এবং তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত; এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের এক মহাপরীক্ষা। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৩৬ - ১৪১)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কিভাবে তিনি ফিরআউন ও তার সেনাবাহিনীকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন এবং কিভাবে তাদের ইজ্জত-সম্মান ভূলুণ্ঠিত করেছিলেন। আর তাদের মাল-সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলা কেমনভাবে ধ্বংস করে বনী ইসরাঈলকে তাদের সমস্ত ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করে দিয়েছিলেন।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنَاهَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ "এরূপই ঘটেছিল এবং বনী ইসরাঈলকে করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী।" (সূরা শু'আরা ঃ ৫৯)

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ .

আমি ইচ্ছে করেছিলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল, তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও উত্তরাধিকারী করতে। (সূরা কাসাস ঃ ৫)

আবার অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُسْتَضْعَفُوْنَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِىْ بَارَكْنَا فِيْهَا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُوْنَ .

যে সম্প্রদায়কে দুর্বল গণ্য করা হত তাদেরকে আমি আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি এবং বনী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালকের শুভ বাণী সত্যে পরিণত হল, যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল আর ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যে সব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল তা ধ্বংস করেছি। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৩৭)

আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউন ও তার গোষ্ঠীর সকলকে ধ্বংস করে দিলেন। দুনিয়ায় বিরাজমান তাদের মহা সম্মান ঐতিহ্য তিনি বিনষ্ট করে দিলেন। তাদের রাজা, আমীর-উমারা ও সৈন্য-সামন্ত ধ্বংস হয়ে গেল। মিসর দেশে সাধারণ প্রজাবর্গ ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট রইল না। ইব্ন আবদুল হাকাম 'মিসরের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন, ঐদিন থেকে মিসরের স্ত্রী লোকেরা পুরুষদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছিল, কেননা আমীর-উমারাদের স্ত্রীরা তাদের চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর সাধারণ লোকদেরকে বিয়ে করতে হয়েছিল। তাই তাদের স্বামীদের উপর স্বভাবতই তাদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠি হয়। এ প্রথা মিসরে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

কিতাবীদের মতে, বনী ইসরাঈলকে যে মাসে মিসর ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, সে মাসকেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের বছরের প্রথম মাস বলে নির্ধারণ করে দেন। তাদেরকে হুকুম দেওয়া হয় যে, তাদের প্রতিটি পরিবার যেন একটি মেষশাবক যবেহ করে। যদি প্রতিটি পরিবার একটি করে মেষশাবক সংগ্রহ করতে না পারে তাহলে পড়শীর সাথে অংশীদার হয়ে তা

করবে। যবেহ্ করার পর মেষশাবকের রক্ত তাদের ঘরের দরজার চৌকাটে ছিটিয়ে দিতে হবে, যাতে তাদের ঘরগুলো চিহ্নিত হয়ে থাকে। তারা এটাকে রান্না করে খেতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, মেষশাবকের মাথা, পায়া ও পেট ভুনা করে খেতে পারবে। তারা মেষশাবকের কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না এবং ঘরের বাইরেও ফেলতে পারবে না, তারা সাতদিন রুটি দিয়ে নাশ্‌তা করবে। সাত দিনের শুরু হবে তাদের বছরের প্রথম মাসের ১৪ তারিখ হতে। আর এটা ছিল বসন্তকাল। যখন তারা খানা খাবে তাদের কোমর কোমরবন্দ দ্বারা বাঁধা থাকবে, পায়ে মুজা থাকবে, হাতে লাঠি থাকবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দ্রুত খাবে, রাতের বেলায় খাবারের পর কিছু খাবার বাকি থাকলে তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে; এটাই তাদের ও পরবর্তীদের জন্যে ঈদ বা পর্বের দিন রূপে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এই নিয়ম যতদিন বলবৎ ছিল তাওরাতের বিধান ততদিন পর্যন্ত বলবৎ ছিল। তাওরাতের বিধান যখন বাতিল হয়ে যায়, তখন এরূপ নিয়মও রহিত হয়ে যায়। আর পরবর্তীতে এরূপ নিয়ম প্রকৃত পক্ষে রহিত হয়ে গিয়েছিল।

কিতাবীরা আরো বলে থাকেন, ফিরআউনের ধ্বংসের পূর্ব রাতে আল্লাহ্ তা'আলা কিবতীদের সকল নবজাতক শিশু ও নবজাতক প্রাণীকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন, যাতে তারা বনী ইসরাঈলের পিছু ধাওয়া থেকে বিরত থাকে। দুপুরের সময় বনী ইসরাঈল বের হয়ে পড়ল। মিসরের অধিবাসিগণ তখন তাদের নবজাতক সন্তান ও পশুপালের শোকে অভিভূত ছিল। এমন কোন পরিবার ছিল না, যারা এরূপ শোকে শোকাহত ছিল না। অন্যদিকে মূসা (আ)-এর প্রতি ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ আসার সাথে সাথে বনী ইসরাঈলরা অতি দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল। এমনকি তারা নিজেদের আটার খামিরও তৈরি করে সারেনি, তাদের পাথেয়াদি চাদরে জড়িয়ে এগুলো কাঁধে ঝুলিয়ে নিল। তারা মিসরবাসীদের নিকট থেকে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালংকার ধারস্বরূপ নিয়েছিল। তারা যখন মিসর থেকে বের হয়, তখন স্ত্রীলোক ব্যতীত তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬ লাখ, তাদের সাথে ছিল তাদের পশুপাল। আর তাদের মিসরে অবস্থানের মেয়াদ ছিল চারশ ত্রিশ বছর। এটা তাদের কিতাবের কথা। ঐ বছরটিকে তারা নিষ্কৃতির বছর (سنة الفسخ) আর তাদের ঐ ঈদকে 'নিষ্কৃতির ঈদ' বলে অভিহিত করে। তাদের আরো দুটি ঈদ ছিল—ঈদুল ফাতির ও ঈদুল হামল। ঈদুল হামল ছিল বছরের প্রথম দিন। এই তিন ঈদ তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তাদের কিতাবে এগুলোর উল্লেখ ছিল।

তারা যখন মিসর থেকে বের হয়ে পড়ল তখন তারা তাদের সাথে নিয়েছিল ইউসুফ (আ)-এর কফিন এবং তারা সূফ নদীর রাস্তা ধরে চলছিল। তারা দিনের বেলায় ভ্রমণ করত; মেঘ তাদের সামনে সামনে ভ্রমণ করত। মেঘের মধ্যে ছিল নূরের স্তম্ভ এবং রাতে তাদের সামনে ছিল আগুনের স্তম্ভ। এ পথ ধরে তারা সমুদ্রের উপকূলে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে তারা পৌঁছতে না পৌঁছতেই ফিরআউন ও তার মিসরীয় সৈন্যদল তাদের নিকটে পৌঁছে গেল। বনী ইসরাঈলরা তখন সমুদ্রের কিনারায় অবতরণ করেছিল। তাদের অনেকেই শঙ্কিত হয়ে পড়ল। এমনকি তাদের কেউ কেউ বলতে লাগল, এরূপ প্রান্তরে এসে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে মিসরের হীনতম জীবন যাপনই বরং উত্তম ছিল। তাদের উদ্দেশে মূসা (আ) বললেন, 'ভয় করো না'। কেননা, ফিরআউন ও তার সেনাবাহিনী এর পর আর তাদের শহরে ফিরে যেতে

পারবে না। কিতাবীরা আরও বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন সমুদ্রে নিজ লাঠি দ্বারা আঘাত করে সমুদ্র বিভক্ত করে দেন—যাতে তারা সমুদ্রে প্রবেশ করে ও শুকনো পথ পায়। দুই দিকে পানি সরে গিয়ে দুই পাহাড়ের আকার ধারণ করল; আর মাঝখানে শুকনো পথ বেরিয়ে আসে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তখন গরম দক্ষিণা বায়ু প্রবাহিত করে দেন। তখন বনী ইসরাঈলরা সমুদ্র পার হয়ে গেল। আর ফিরআউন তার সেনাবাহিনীসহ বনী ইসরাঈলকে অনুসরণ করল। যখন সে সমুদ্রের মধ্যভাগে পৌঁছল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁর লাঠি দ্বারা সমুদ্রকে আঘাত করেন। ফলে পানি পূর্বের আকার ধারণ করল। তবে কিতাবীদের মতে, এ ঘটনাটি ঘটেছিল রাতের বেলায় এবং সমুদ্র তাদের উপর স্থির হয়েছিল সকাল বেলায়। এটা তাদের বোঝার ভুল এবং এটা অনুবাদ বিভ্রাটের কারণে হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিকতর জ্ঞাত। তাঁরা আরো বলেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউন ও তার সেনাবাহিনীকে ডুবিয়ে মারলেন, তখন মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈল প্রতিপালকের উদ্দেশে নিম্নরূপ তাসবীহ পাঠ করলেন ঃ

يسبح الرب البهى الذى قهر الجنود

ونبذ فرسانها فى البحر المنيع المحمود.

অর্থাৎ—'সেই জ্যোতির্ময় প্রতিপালকের তাসবীহ পাঠ করছি, যিনি সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছেন এবং অশ্বারোহীদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছেন, যিনি উত্তম প্রতিরোধকারী ও প্রশংসিত।' এটা ছিল একটি দীর্ঘ তাসবীহ। তারা আরো বলেন, হারূনের বোন নাবীয়াহ মারয়াম নিজ হাতে একটি দফ[১] ধারণ করেছিলেন এবং অন্যান্য স্ত্রীলোক তার অনুসরণ করেছিল, সকলেই দফ ও তবলা নিয়ে পথে বের হলো, মারয়াম তাদের জন্যে সুর করে গাইছিলেন ঃ

فسبحان الرب القهار الذى قهر الخيول وركبانها القاء فى البحر.

"পরাক্রমশালী পবিত্র সেই প্রতিপালক যিনি ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে প্রতিহত করেছেন।" এরূপ বর্ণনা তাদের কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এরূপ বর্ণনা সম্ভবত, মুহাম্মদ ইবন কা'ব আল কুরাযী (র) থেকে নেয়া হয়েছে, যিনি কুরআনের আয়াত يَا أُخْتَ هَارُوْنَ এর ব্যাখ্যায় বলতেন যে, ইমরানের কন্যা মারয়াম, ঈসা (আ)-এর মা হচ্ছেন মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর বোন। তাঁর বর্ণনাটি যে অমূলক, তাফসীরে তা আমরা বর্ণনা করেছি। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। কেননা, কেউ এরূপ মত পোষণ করেননি বরং প্রত্যেক তাফসীরকার এটার বিরোধিতা করেছেন। যদি ধরে নেয়া হয় যে, এরূপ হতে পারে তাহলে তার ব্যাখ্যা হবে এরূপ ঃ মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর বোন মারয়াম বিন্ত ইমরান এবং ঈসা (আ)-এর মা মারয়াম বিন্ত ইমরানের মধ্যে নাম, পিতার নাম ও ভাইয়ের নামের মধ্যে মিল রয়েছে। যেমন— একদা মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) সাহাবীকে নাজরানের অধিবাসীরা يَا أُخْتَ هَارُوْنَ- আয়াতাংশের তাফসীর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিল। তিনি জানতেন

১. দফ এমন একটি বাদ্যযন্ত্র যার এক দিকে চামড়া লাগানো থাকে।

না তাদেরকে কি বলবেন। তাই তিনি রাসূল (সা)-কে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে বললেন, তুমি কি জান না তারা আম্বিয়ায়েকিরামের নামের সাথে মিল রেখে নামকরণ করতেন? ইমাম মুসলিম (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

মারয়ামকে তারা মাবিয়াহ বলত, যেমন রাজার পরিবারের স্ত্রীকে রানী বলা হয়ে থাকে। আমীরের স্ত্রীকে আমীরাহ বলা হয়ে থাকে, যদিও তাদের বাদশাহী কিংবা প্রশাসনে কোন হাত নেই। নবী পরিবারের সদস্যা হিসাবে তাঁকে নাবিয়াহ বলা হয়েছে। এটি রূপকভাবে বলা হয়েছে। সত্যি সত্যি তিনি নবী ছিলেন না এবং তার কাছে আল্লাহ্ তা'আলার ওহী আসত না। আর মহা খুশির দিন ঈদে তাঁর দফ বাজানো হচ্ছে এ কথার প্রমাণ যে, ঈদে দফ বাজানো আমাদের পূর্বে তাঁদের শরীয়তেও বৈধ ছিল। এমনকি এটা আমাদের শরীয়তেও মেয়েদের জন্য ঈদের দিনে বৈধ। এ প্রসঙ্গে নিম্নে বর্ণিত হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। মিনার দিনসমূহে তথা কুরবানীর ঈদের সময়ে দু'টি বালিকা আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর কাছে দফ বাজাচ্ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের দিকে পিঠ দিয়ে শুয়ে ছিলেন, হুযূরের চেহারা ছিল দেয়ালের দিকে। যখন আবূ বকর (রা) ঘরে ঢুকলেন তখন তাদেরকে ধমক দিলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ঘরে শয়তানের বাদ্যযন্ত্র? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আবূ বকর! তাদেরকে এটা করতে দাও। কেননা, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যেই রয়েছে উৎসবের দিন এবং এটা আমাদের উৎসবের দিন। অনুরূপভাবে বিয়ে-শাদীর মজলিসে এবং প্রবাসীকে সংবর্ধনা জানানোর ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরনের দফ বাজানো জায়েয আছে—যা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাদিতে বর্ণিত রয়েছে।

কিতাবিগণ আরো বলেন যে, বনী ইসরাঈলরা যখন সমুদ্র অতিক্রম করল এবং সিরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করল তখন তারা একটি স্থানে তিনদিন অবস্থান করে। সেখানে পানি ছিল না। তাদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক লোক এ নিয়ে নানারূপ সমালোচনা করে। তখন তারা লবণাক্ত বিস্বাদ পানি খুঁজে পেল, যা পান করার উপযোগী ছিল না। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলে তিনি একটি কাঠের টুকরো পানির উপর রেখে দিলেন। তখন তা মিঠা পানিতে পরিণত হল এবং পানকারীদের জন্যে উপাদেয় হয়ে গেল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে ফরজ, সুন্নাত ইত্যাদি শিক্ষা দান করলেন এবং প্রচুর নসীহত প্রদান করলেন।

মহাপরাক্রমশালী ও আপন কিতাবের রক্ষণাবেক্ষণকারী আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কালামে ইরশাদ করেন ঃ

وَجَاوَزْنَا بِبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ الْبَحْرَ فَاَتَوْا عَلٰى قَوْمٍ يَّعْكُفُوْنَ عَلٰى اَصْنَامٍ لَهُمْ، قَالُوْا يَا مُوْسَى اجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ، قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ. اِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

"আর আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দেই। তারপর তারা প্রতিমা পূজায় রত এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হয়। তারা বলল, 'হে মূসা! তাদের দেবতার মত আমাদের জন্যেও একটি দেবতা গড়ে দাও। সে বলল, তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়; এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তাতো বিধ্বস্ত হবে এবং তারা যা করেছে তাও অমূলক।" (৭ আ'রাফ ঃ ১৩৮-১৩৯)

তারা এরূপ মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতার কথা মূসা (আ)-এর কাছে আরয করছিল অথচ তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাদি ও কুদরত প্রত্যক্ষ করছিল যা প্রমাণ করে যে, মহাসম্মানিত ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল যা কিছু নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন তা যথার্থ। তারা এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হলো, যারা মূর্তি পূজায় রত ছিল। কেউ কেউ বলেন, এই মূর্তিগুলো ছিল গরুর আকৃতির। তারা তাদেরকে প্রশ্ন করেছিল যে, কেন তারা এগুলোর পূজা করে? তখন তারা বলেছিল যে, এগুলো তাদের উপকার ও অপকার সাধন করে থাকে এবং প্রয়োজনে তাদের কাছেই উপজীবিকা চাওয়া হয়। বনী ইসরাঈলের কিছু মূর্খ লোক তাদের কথায় বিশ্বাস করল। তখন এই মূর্খরা তাদের নবী মূসা (আ)-এর কাছে আরয করল যে, তিনি যেন তাদের জন্যেও দেব-দেবী গড়ে দেন যেমন ঐসব লোকের দেব-দেবী রয়েছে।

মূসা (আ) তাদেরকে প্রতিউত্তরে বললেন, প্রতিমা পূজাকারিগণ নির্বোধ এবং তারা হিদায়াতের পথে পরিচালিত নয়। আর এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো বিধ্বস্ত হবে এবং তারা যা করেছে তাও অমূলক। তারপর মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামতরাজি এবং সমকালীন বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে তাদেরকে জ্ঞানে, শরীয়তের এবং তাদের মধ্য থেকে রাসূল প্রেরণের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্ব দানের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি তাদেরকে আরো স্মরণ করিয়ে দেন যে, মহাশক্তির অধিকারী ফিরআউনের কবল থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে উদ্ধার করেছেন এবং ফিরাউনকে তাদের সম্মুখেই ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাছাড়া ফিরআউন ও তার ঘনিষ্ঠ অনুচরগণ যেসব সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা নিজেদের জন্যে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত করে রেখেছিল ও সুরম্য প্রাসাদ গড়েছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সে সবের উত্তরাধিকারী করেছেন। তিনি তাদের কাছে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন যে, এক লা–শরীক আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। কেননা তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও মহাপরাক্রমশালী। তবে বনী ইসরাঈলের সকলেই তাদের জন্যে দেব-দেবী গড়ে দেবার দরখাস্ত করেনি বরং কিছু সংখ্যক মূর্খ ও নির্বোধ লোক এরূপ করেছিল। তাই আয়াতাংশ ঃ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ–এ قوم বা সম্প্রদায় বলতে তাদের সকল লোককে নয়, কিছু সংখ্যককে বুঝানো হয়েছে। যেমন সূরায়ে কাহাফের আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.

অর্থাৎ—"সেদিন তাদের সকলকে আমি একত্রকরণ এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দেব না এবং তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে, তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হবেই অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণে আমি তোমাদেরকে উপস্থিত করব না।" (সূরা কাহাফ ঃ ৪৭-৪৮)

উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'অথচ তোমরা মনে করতে' দ্বারা তাদের সকলকে বুঝানো হয়নি বরং কতক সংখ্যককে বুঝানো হয়েছে। ইমাম আহমদ (র)এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, আবূ ওয়াকিদ

লায়সী (রা) বলেন, হুনাইন যুদ্ধের সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বের হলাম। যখন আমরা একটি কুল গাছের কাছে উপস্থিত হলাম তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা)! কাফিরদের যেরূপ তরবারি রাখার জায়গা রয়েছে, আমাদের সেরূপ তরবারি রাখার জায়গার ব্যবস্থা করে দিন। কাফিররা তাদের তরবারি কুল গাছে ঝুলিয়ে রাখে ও তার চারপাশে ঘিরে বসে। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) বললেন ঃ আল্লাহু আকবার! এবং বললেন এটা হচ্ছে ঠিক তেমনি, যেমনটি বনী ইসরাঈলরা মূসা (আ)-কে বলেছিল ঃ اِجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ — অর্থাৎ— 'হে মূস)! তাদের দেবতাদের মত আমাদের জন্যেও একটি দেবতা গড়ে দাও।' তোমরা তো তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতিই অনুসরণ করছ। ইমাম নাসাঈ (র) এবং তিরমিযী (র)ও ভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলে অভিহিত করেছেন। ইব্ন জারীর (র) আবূ ওয়াকিদ আল লাইসী (রা)-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে খায়বারের উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, কাফিরদের একটি কুলগাছ ছিল, তারা এটার কাছে অবস্থান করত এবং তাদের হাতিয়ার এটার সাথে ঝুলিয়ে রাখত। এ গাছটাকে বলা হত 'যাতু আনওয়াত।' বর্ণনাকারী বলেন, একটি বড় সবুজ রংয়ের কুল গাছের কাছে পৌঁছে আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্যেও একটি যাতু আনওয়াত-এর ব্যবস্থা করুন, যেমনটি কাফিরদের রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, তোমরা এরূপ কথা বললে, যেমন মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় মূসা (আ)-কে বলেছিল, আমাদের জন্য এ সম্প্রদায়ের দেবতাদের মত একটি দেবতা গড়ে দাও। সে বলল, তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়। এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো বিধ্বস্ত হবে এবং তারা যা করছে তাও অমূলক।" (সূরা আরাফ ঃ ১৩৮-১৩৯)

বস্তুত মূসা (আ) যখন মিসর ত্যাগ করে বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে সেখানে পৌঁছলেন, তখন সেখানে হায়সানী, ফাযারী ও কানআনী ইত্যাদি গোত্র সম্বলিত একটি দুর্দান্ত জাতিকে বসবাসরত দেখতে পান। মূসা (আ) তখন বনী ইসরাঈলকে শহরে প্রবেশ করার এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বিতাড়িত করতে হুকুম দিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইবরাহীম (আ) কিংবা মূসা (আ)-এর মাধ্যমে এই শহরটি বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিন্তু তারা মূসা (আ)-এর নির্দেশ মানতে অস্বীকার করল এবং যুদ্ধ থেকে বিরত রইল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ভীতিগ্রস্ত করলেন এবং তীহ প্রান্তরে নিক্ষেপ করেন, যেখানে তারা সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত উদ্ভ্রান্তের মত ইতস্তত ঘোরাফেরা করতে থাকেন।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكًا وَاٰتَاكُمْ مَالَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِيْنَ. يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا

خَاسِرِيْنَ. قَالُوْا يَامُوْسٰى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا. فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ. فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غَالِبُوْنَ. وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. قَالُوْا يَامُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ. قَالَ رَبِّ اِنِّيْ لَا اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ. قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً. يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ. فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ.

স্মরণ কর, মূসা তার সম্প্রদায়কে বলেছিল— হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর; যখন তিনি তোমাদের মধ্য থেকে নবী করেছিলেন ও তোমাদেরকে রাজাধিপতি করেছিলেন এবং বিশ্বজগতে কাউকেও যা তিনি দেননি তা তোমাদেরকে দিয়েছিলেন। হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহ তোমাদের জন্য যে পবিত্র ভূমি নির্দিষ্ট করেছেন তাতে তোমরা প্রবেশ কর এবং পশ্চাদপসরণ করবে না, করলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা বলল, হে মূসা! সেখানে এক দুর্দান্ত সম্প্রদায় রয়েছে এবং তারা সে স্থান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে কিছুতেই প্রবেশ করব না; তারা সেই স্থান থেকে বের হয়ে গেলেই আমরা প্রবেশ করব। যারা ভয় করছিল তাদের মধ্যে দু'জন, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেন তারা বলল, তোমরা তাদের মুকাবিলা করে দরজায় প্রবেশ করলেই তোমরা জয়ী হবে আর তোমরা মু'মিন হলে আল্লাহর উপরই নির্ভর কর। তারা বলল, হে মূসা! তারা যতদিন সেখানে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না। সুতরাং তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর; আমরা এখানেই বসে থাকবো। সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভাই ব্যতীত অপর কারও উপর আমার আধিপত্য নেই। সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। আল্লাহ্ বললেন, তবে এটা চল্লিশ বছর তাদের জন্য নিষিদ্ধ রইল, তারা পৃথিবীতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে, সুতরাং তুমি সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবে না। (সূরা মায়িদা ঃ ২০-২৬)

এখানে আল্লাহর নবী মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের উপর আল্লাহ তা'আলা যে অনুগ্রহ করেছিলেন, তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নিয়ামতসমূহ দান করে অনুগ্রহ করেছিলেন। তাই আল্লাহ্র নবী তাদেরকে আল্লাহ্র রাহে আল্লাহ্র দুশমনের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্যে আদেশ দিচ্ছেন।

তিনি বললেন ঃ

يَاقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰى اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خَاسِرِيْنَ.

অর্থাৎ— 'হে আমার সম্প্রদায়! পবিত্র ভূমিতে তোমরা প্রবেশ কর আর এটা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে না এবং দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকবে না। যদি পশ্চাদপসরণ কর ও বিরত থাক লাভের পর ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পরিপূর্ণতা অর্জনের পর অপরিপূর্ণতার শিকার হবে।

প্রতিউত্তরে তারা বলল, يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ. অর্থাৎ হে মূসা! সেখানে রয়েছে একটি দুর্ধর্ষ, দুর্দান্ত ও কাফির সম্প্রদায়। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে লাগল ঃ

وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا فَإِنَّا دَاخِلُونَ.

অর্থাৎ— যতক্ষণ না ঐ সম্প্রদায়টি সেখান থেকে বের হয়ে যায় আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। যখন তারা বের হয়ে যাবে আমরা সেখানে প্রবেশ করব, অথচ তারা ফিরআউনের ধ্বংস ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ করেছে। আর সে ছিল এদের তুলনায় অধিকতর দুর্দান্ত, অধিকতর যুদ্ধ-কুশলী এবং সৈন্য সংখ্যার দিক থেকে প্রবলতর। এ থেকে বোঝা যায় যে, তারা তাদের এরূপ উক্তির ফলে ভর্ৎসনার যোগ্য এবং খোদাদ্রোহী হতভাগ্য, দুর্দান্ত শত্রুদের মুকাবিলা থেকে বিরত থেকে লাঞ্ছনা ও নিন্দার যোগ্য।

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বহু তাফসীরকার বিভিন্ন ধরনের কল্প-কাহিনী ও বিবেকের কাছে অগ্রহণীয় এবং বিশুদ্ধ বর্ণনা বিবর্জিত তথ্যাদি পেশ করেছেন। যেমন কেউ কেউ বলেছেন, বনী ইসরাঈলের প্রতিপক্ষ দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের লোকজন বিরাট দেহের অধিকারী ও ভীষণ আকৃতির ছিল। তারা এরূপও বর্ণনা করেছেন যে, বনী ইসরাঈলের দূতরা যখন তাদের কাছে পৌঁছল, তখন সে দুর্দান্ত সম্প্রদায়ের দূতদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি তাদের সাথে সাক্ষাত করল এবং তাদেরকে একজন একজন করে পাকড়াও করে আস্তিনের মধ্যে ও পায়জামার ফিতার সাথে জড়াতে লাগল, দূতরা সংখ্যায় ছিল বারজন। লোকটি তাদেরকে তাদের বাদশাহর সম্মুখে ফেলল। বাদশাহ বলল, এগুলো কি? তারা যে আদম সন্তান সে চিনতেই পারল না। অবশেষে তারা তার কাছে তাদের পরিচয় দিল।

এসব কল্প-কাহিনী ভিত্তিহীন। এ সম্পর্কে আরো বর্ণিত রয়েছে যে, বাদশাহ তাদের ফেরৎ যাওয়ার সময় তাদের সাথে কিছু আঙ্গুর দিয়েছিল। প্রতিটি আঙ্গুর একজন লোকের জন্যে যথেষ্ট ছিল। তাদের সাথে আরো কিছু ফলও সে দিয়েছিল, যাতে তারা তাদের দেহের আকার-আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে। এই বর্ণনাটিও বিশুদ্ধ নয়। এ প্রসঙ্গে তারা আরো বর্ণনা করেছেন যে, দুর্ধর্ষ ব্যক্তিদের মধ্য হতে উক্ত ইব্ন আনাক নামী এক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করার জন্যে বনী ইসরাঈলের দিকে এগিয়ে আসল। তার উচ্চতা ছিল ৩৩৩৩$\frac{1}{3}$ হাত। বাগাবী প্রমুখ তাফসীরকারগণ এরূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তা শুদ্ধ নয়। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস ঃ

ان الله خلق ادم طوله ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الان.

অর্থাৎ— আল্লাহ আদমকে ষাট হাত উচ্চতা বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেন তারপর ক্রমে ক্রমে কমতে কমতে তা এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে— এর ব্যাখ্যা বর্ণনা প্রসঙ্গে তা বিস্তারিত আলোচনা

করা হয়েছে। তারা আরো বলেন, উজ নামের উক্ত ব্যক্তিটি একটি পাহাড়ের চূড়ার প্রতি তাকাল ও তা উপড়িয়ে নিয়ে আসল এবং মূসা (আ)-এর সৈন্য-সামন্তের উপর রেখে দেবার মনস্থ করল, এমন সময় একটি পাখি আসল ও পাথরের পাহাড়টিকে ঠোকর দিল এবং তা ছিদ্র করে ফেলল। ফলে উজের গলায় তা বেড়ীর মত বসে গেল। তখন মূসা (আ) তার দিকে অগ্রসর হয়ে লাফ দিয়ে ১০ হাত উপরে উঠলেন। তার উচ্চতা ছিল ১০ হাত। তখন মূসা (আ)-এর সাথে তাঁর লাঠিটি ছিল। আর লাঠিটির উচ্চতাও ছিল ১০ হাত। মূসা (আ)-এর লাঠি তাঁর পায়ের গিঁটের কাছে পৌছল এবং মূসা (আ) তাকে লাঠি দ্বারা বধ করলেন। উক্ত বর্ণনাটি আওফ আল-বাকালী (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইব্‌ন জারীর (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন তবে এ বর্ণনার সনদের বিশুদ্ধতায় মতবিরোধ রয়েছে। এ ছাড়াও এগুলো সবই হচ্ছে ইসরাঈলী বর্ণনা। এর সব বর্ণনা বনী ইসরাঈলের মূর্খদের রচিত। এসব মিথ্যা বর্ণনার সংখ্যা এত অধিক যে, এগুলোর মধ্যে সত্য-মিথ্যা যাচাই করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। এগুলোকে সত্য বলে মেনে নিলে বনী ইসরাঈলকে যুদ্ধে যোগদান না করার কিংবা যুদ্ধ হতে বিরত থাকার ব্যাপারে ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচনা করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যুদ্ধ হতে বিরত থাকার জন্যে শাস্তি প্রদান করেছেন, জিহাদ না করার জন্যে এবং তাদের রাসূলের বিরোধিতা করার জন্যে তাদেরকে তীহের ময়দানে চল্লিশ বছর যাবত ভবঘুরে জীবন যাপন করার শাস্তি দিয়েছেন। দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তি তাদেরকে যুদ্ধ করার জন্যে অগ্রসর হতে এবং যুদ্ধ পরিহারের মনোভাব প্রত্যাহার করার জন্যে যে উপদেশ দান করেছিলেন, তা আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে ইংগিত করেছেন। কথিত আছে, উক্ত দু'জন ছিলেন ইউশা ইব্‌ন নূন (আ) ও কালিব ইব্‌ন ইউকান্না। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র), ইকরিমা (র), আতীয়্যা (র), সুদ্দী (র), রবী' ইব্‌ন আনাস (র) ও আরো অনেকে এ মত ব্যক্ত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ. فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غَالِبُوْنَ. وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ— 'যারা ভয় করে কিংবা যারা ভীত তাদের মধ্য হতে দুইজন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ঈমান, ইসলাম, আনুগত্য ও সাহস প্রদান করেছেন, তাঁরা বললেন, দরজা দিয়ে তাদের কাছে ঢুকে পড় এবং ঢুকে পড়লেই তোমরা জয়ী হয়ে যাবে। আর যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল রাখ তাঁর কাছেই সাহায্য চাও এবং তাঁর কাছেই আশ্রয় চাও, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। তখন তারা বলল, 'হে মূসা! যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্দান্ত সম্প্রদায় উক্ত শহরে অবস্থান করবে, আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। তুমি ও তোমার প্রতিপালক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে রইলাম।' (সূরা মায়িদা ঃ ২৩-২৪)

মোটকথা, বনী ইসরাঈলের সর্দাররা জিহাদ হতে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিল। এর ফলে বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেল। কথিত আছে, ইউশা (আ) ও কালিব (আ) যখন তাদের এরূপ উক্তি

শুনতে পেলেন (তখনকার নিয়ম অনুযায়ী) তারা তাদের কাপড় ছিঁড়ে ফেলেন এবং মূসা (আ) ও হারূন (আ) এই অশ্রাব্য কথার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার গযব থেকে পরিত্রাণের জন্যে বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার রহমত কামনা করে সিজদায় পড়ে গেলেন।

মূসা (আ) বললেন ঃ

رَبِّ إِنِّىْ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِىْ وَأَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ.

হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভাই ছাড়া আর কারো উপর আমার আধিপত্য নেই। সুতরাং তুমি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। (সূরা মায়িদা ঃ ২৫)

উক্ত আয়াতে উল্লেখিত আয়াতাংশের অর্থ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে আমার ও তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً يَتِيْهُوْنَ فِى الْأَرْضِ. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ.

অর্থাৎ— জিহাদ হতে বিরত থাকার জন্য তাদেরকে এ শাস্তি দেয়া হয়েছিল যে, তারা চল্লিশ বছর যাবত দিন-রাত সকাল-সন্ধ্যা তীহ ময়দানে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ভবঘুরে জীবন যাপন করবে। (সূরা মায়িদা ঃ ২৬)

কথিত আছে, তাদের যারা তীহ ময়দানে প্রবেশ করেছিল তাদের কেউ বের হতে পারেনি বরং তাদের সকলে এই চল্লিশ বছরে সেখানে মৃত্যুবরণ করেছিল। কেবল তাদের ছেলে-মেয়েরা এবং ইউশা (আ) ও কালিব (আ) বেঁচে ছিলেন। বদরের দিন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাহাবীগণ মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের ন্যায় বলেননি। বরং তিনি যখন তাদের কাছে যুদ্ধে যাবার বিষয়ে পরামর্শ করলেন, তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এ ব্যাপারে কথা বললেন, আবূ বকর (রা) ও অন্যান্য মুহাজির সাহাবী এ ব্যাপারে উত্তম পরামর্শ দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'তোমরা আমাকে এ ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান কর।' শেষ পর্যন্ত সা'দ ইব্ন মুয়ায (রা) বলেন, সম্ভবত আপনি আমাদের দিকেই ইঙ্গিত করছেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, যদি আপনি আমাদেরকে নিয়ে এ সমুদ্র পাড়ি দিতে চান অতঃপর আপনি এটাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তবে আমরাও আপনার সাথে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত। আমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তিই পিছু হটে থাকবে না। আগামীকালই যদি আমাদেরকে শত্রুর মুকাবিলা করতে হয় আমরা যুদ্ধে ধৈর্যের পরিচয় দেব এবং মুকাবিলার সময় দৃঢ় থাকব। হয়ত শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা আমাদের পক্ষ থেকে আপনাকে এমন আচরণ প্রদর্শন করাবেন যাতে আপনার চোখ জুড়াবে। সুতরাং আপনি আল্লাহ্ তা'আলার উপর ভরসা করে রওয়ানা হতে পারেন। তাঁর কথায় রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত প্রীত হলেন।

ইমাম আহমদ (র) ইব্‌ন শিহাব (র) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সাহাবী হযরত মিকদাদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বদরের যুদ্ধের দিন বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে সেরূপ বলব না, যেরূপ বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-কে বলেছিল ঃ

اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ.

অর্থাৎ— তুমি ও তোমার প্রতিপালক যুদ্ধ কর আমরা এখানে বসে রইলাম, বরং আমরা বলব, 'আপনি ও আপনার প্রতিপালক যুদ্ধে যাত্রা করুন, আমরাও আপনাদের সাথে যুদ্ধে শরীক থাকবো।'

উল্লেখিত হাদীসের এ সনদটি উত্তম। অন্য অনেক সূত্রেও এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদ (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি মিকদাদ (রা)-কে এমন একটি যুদ্ধে উপস্থিত হতে দেখেছি, যে যুদ্ধে তাঁর অবস্থান এতই গৌরবজনক ছিল যে, আমি যদি সে অবস্থানে থাকতাম তবে তা অন্য যে কোন কিছুর চাইতে আমার কাছে প্রিয়তর হতো।' রাসূলুল্লাহ (সা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে বদদোয়ায় রত ছিলেন, এমন সময় মিকদাদ (রা) রাসূল (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, 'আল্লাহ্‌র শপথ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনাকে এরূপ বলব না, যেরূপ বনী ইসরাঈলরা মূসা (আ)-কে বলেছিল ঃ اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا, বরং আমরা যুদ্ধ করব, আপনার ডানপাশে আপনার বামপাশে, আপনার সামনে ও পিছন থেকে— আমরা প্রাণ দিয়ে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। এ কথা শুনার পর আমি রাসূল (সা)-এর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখতে পেলাম। তিনি এতে খুশী হয়েছিলেন।

ইমাম বুখারী (র) তাঁর গ্রন্থের তাফসীর এবং মাগাযী অধ্যায়ে এ বর্ণনা পেশ করেছেন। হাফিজ আবূ বকর মারদোয়েহ্ (র) আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বদরের দিকে রওয়ানা হলেন, তখন তিনি মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করলেন। উমর (রা) তাঁকে সুপরামর্শ দিলেন। তারপর হুযুর (সা) আনসারগণের পরামর্শ চাইলেন। কিছু সংখ্যক আনসার অন্যান্য আনসারকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়! রাসূলূল্লাহ (সা) যুদ্ধের ব্যাপারে তোমাদের পরামর্শ চাইছেন। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এরূপ বলব না যেরূপ বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-কে বলেছিল ঃ اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ. 'যে সত্তা আপনাকে সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, 'আমাদেরকে যদি পৃথিবীর অতি দূরতম অংশেও মুকাবিলার জন্যে যেতে বলা হয়, নিশ্চয়ই আমরা আপনার আনুগত্য করব। ইমাম আহমদ (র) বিভিন্ন সূত্রে আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা পেশ করেছেন। ইব্‌ন হিব্বান (র) তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

বনী ইসরাঈলের তীহ প্রান্তরে প্রবেশ ও অত্যাশ্চর্য ঘটনাবলী

পূর্বোল্লিখিত দুর্দান্ত জাতির বিরুদ্ধে বনী ইসরাঈলের জিহাদ করা হতে বিরত থাকার বিষয়টি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তীহ প্রান্তরে

ভবঘুরের মত বিচরণের শাস্তি দেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, চল্লিশ বছর তারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না। কিতাবীদের গ্রন্থাদিতে জিহাদ থেকে বিরত থাকার বিষয়টি আমার চোখে পড়েনি বরং তাদের কিতাবে রয়েছে, "মূসা (আ) একদিন ইউশা (আ)-কে কাফিরদের একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করার প্রস্তুতি নিতে হুকুম দিলেন। আর মূসা (আ), হারূন (আ) ও খোর নামক এক ব্যক্তি একটি টিলার চূড়ায় বসেছিলেন। মূসা (আ) তাঁর লাঠি উপরের দিকে উঠালেন, যখনই তিনি তাঁর লাঠি উপরের দিকে উঠিয়ে রাখতেন, তখনই ইউশা (আ) শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হতেন। আর যখনই লাঠিসহ তাঁর হাত ক্লান্তি কিংবা অন্য কারণে নিচে নেমে আসত তখনই শত্রুদল বিজয়ী হতে থাকত। তাই হারূন (আ) ও খোর মূসা (আ)-এর দুই হাতকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ডানে, বামে শক্ত করে ধরে রেখেছিলেন। ইউশা (আ)-এর সৈন্য দল জয়লাভ করল।

কিতাবীদের মতে, ইউশা (আ)-এর সেনাবাহিনী সকলে মাদায়ানকে পছন্দ করত। মূসা (আ)-এর শ্বশুরের কাছে মূসা (আ)-এর যাবতীয় ঘটনার সংবাদ পৌঁছল। আর এ খবর পৌঁছল যে, কিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে তার শত্রু ফিরআউনের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছেন। তাই তিনি মূসা (আ)-এর কাছে আনুগত্য সহকারে উপস্থিত হলেন। তাঁর সাথে ছিলেন তাঁর মেয়ে সাফূরা। সাফূরা ছিলেন মূসা (আ)-এর স্ত্রী। তাঁর সাথে মূসা (আ)-এর দুই পুত্র জারশুন এবং আটিরও ছিলেন। মূসা (আ) তাঁর শ্বশুরের সাথে সাক্ষাত করলেন। তিনি তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। তাঁর সাথে বনী ইসরাঈলের মুরুব্বীগণও সাক্ষাত করলেন, তাঁরাও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন।

কিতাবীরা আরো উল্লেখ করে যে, মূসা (আ)-এর শ্বশুর দেখলেন যে, ঝগড়া বিবাদের সময় বনী ইসরাঈলের একটি দল মূসা (আ)-এর কাছে ভিড় জমায়। তাই তিনি মূসা (আ)-কে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন জনগণের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক আমানতদার, পরহেযগার ও চরিত্রবান প্রশাসক নিযুক্ত করেন। যারা ঘুষ ও খিয়ানতকে ঘৃণা করেন। তিনি যেন তাঁদেরকে বিভিন্ন স্তরের প্রধানরূপে নিযুক্ত করেন। যেমন প্রতি হাজারের জন্যে, প্রতি শতের জন্যে, প্রতি পঞ্চাশজনের জন্য এবং প্রতি দশজনের জন্য একজন করে। তারা জনগণের মধ্যে বিচারকার্য সমাধা করবেন। তাদের কর্তব্য সমাধানে যদি কোন প্রকার সমস্যা দেখা দেয়, তখন তারা আপনার কাছে ফায়সালার জন্যে আসবে এবং আপনি তাদের সমস্যার সমাধান দেবেন। মূসা (আ) সেরূপ শাসনের ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন।

কিতাবীরা আরো বলেন, মিসর থেকে বের হবার তৃতীয় মাসে বনী ইসরাঈলরা সিনাইর কাছে সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন। তারা তাদের কাছে চলতি বছরের প্রথম মাসে মিসর থেকে বের হয়েছিলেন। এটা ছিল বসন্ত ঋতুর সূচনাকাল। কাজেই তারা যেন গ্রীষ্মের প্রারম্ভে তীহ নামক ময়দানে প্রবেশ করেছিলেন। আল্লাহই অধিকতর জ্ঞাত।

কিতাবীরা বলেন, বনী ইসরাঈলগণ সিনাইয়ের তূর পাহাড়ের পাশেই অবতরণ করেন। অতঃপর মূসা (আ) তূর পাহাড়ে আরোহণ করেন এবং তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা বলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হুকুম দিলেন, তিনি যেন বনী ইসরাইলকে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব

নিয়ামত প্রদান করেছেন, তা স্মরণ করিয়ে দেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে যেন শকুনের দুইটি পাখায় উঠিয়ে ফিরআউনের কবল থেকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন বনী ইসরাঈলকে পবিত্রতা অর্জন করতে, গোসল করতে, কাপড়-চোপড় ধুয়ে তৃতীয় দিবসের জন্যে তৈরি হতে হুকুম দেন। তৃতীয় দিন সমাগত হলে তিনি নির্দেশ দেন, তারা যেন পাহাড়ের পাশে সমবেত হন, তবে তাদের মধ্য হতে কেউ যেন মূসা (আ)-এর কাছে না আসে। যদি তাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর কাছে আসে তাহলে তাকে হত্যা করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শিংগার আওয়াজ শুনতে থাকবে, এমনকি একটি প্রাণীও তখন তাঁর কাছে যেতে পারবে না। যখন শিংগার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাবে তখন পাহাড়ে যাওয়া তাদের জন্যে বৈধ হবে। বনী ইসরাঈলও মূসা (আ)-এর কথা শুনলেন; তাঁর আনুগত্য করলেন, গোসল করলেন; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলেন; পবিত্রতা অর্জন করলেন ও খুশবু ব্যবহার করলেন। তৃতীয় দিন পাহাড়ের উপর বিরাট মেঘখণ্ড দেখা দিল; সেখানে গর্জন শোনা গেল; বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল ও শিংগার বিকট আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। এতে বনী ইসরাইল ঘাবড়ে গেল ও অত্যন্ত আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা ঘরের বের হল এবং পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়াল। পাহাড়কে বিরাট ধোঁয়ায় ঢেকে ফেলল, তার মধ্যে ছিল অনেকগুলো নূরের স্তম্ভ।

সমস্ত পাহাড় প্রচণ্ডভাবে কাঁপতে লাগল, শিংগার গর্জন অব্যাহত রইল এবং ক্রমাগত তা বৃদ্ধি পেতে লাগল। মূসা (আ) ছিলেন পাহাড়ের উপরে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে একান্তে কথা বলছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে নেমে যেতে হুকুম দিলেন। মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম শোনার জন্যে পাহাড়ের নিকটবর্তী হতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাদের আলেমদেরকেও তিনি নিকটবর্তী হতে আদেশ দিয়েছিলেন। অতঃপর অধিক নৈকট্য অর্জন করার জন্যে তাদেরকে পাহাড়েও চড়তে হুকুম দিলেন।

উপরোক্ত সংবাদটি হলো কিতাবীদের গ্রন্থাদিতে লিখিত সংবাদ যা পরবর্তীতে রহিত হয়ে যায়। (كتاب البداية والنهاية)

মূসা (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এরা পাহাড়ে চড়তে সক্ষম নয় আর তুমি পূর্বে একাজ করতে নিষেধ করেছিলে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে তার ভাই হারূন (আ)-কে নিয়ে আসতে হুকুম দিলেন। আর আলিমগণ এবং বনী ইসরাঈলের অন্যরা যেন নিকটে উপস্থিত থাকে। মূসা (আ) তাই করলেন। তাঁর প্রতিপালক তাঁর সাথে কথা বললেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দশটি কলেমা বা উপদেশ বাণী দিলেন।

কিতাবীদের মতে, বনী ইসরাঈলরা আল্লাহ্র কালাম শুনেছিল কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি, যতক্ষণ না মূসা (আ) তাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর মূসা (আ)-কে তারা বলতে লাগল, 'আপনি প্রতিপালকের কাছ থেকে আমাদের কাছে উপদেশ বাণী পৌঁছিয়ে দিন। আমরা আশংকা করছি হয়তো আমরা মারা পড়ব।' অতঃপর মূসা (আ) তাদের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে প্রাপ্ত দশটি উপদেশ বাণী পৌঁছিয়ে দেন। আর এগুলো হচ্ছে ঃ (এক) লা-শরীক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের নির্দেশ, (দুই) আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মিথ্যা শপথ

করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, (তিন) 'সাবাত' সংরক্ষণের জন্যে নির্দেশ। তার অর্থ হচ্ছে সপ্তাহের একদিন অর্থাৎ শনিবারকে ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট রাখা। শনিবারকে রহিত করে আল্লাহ্ তা'আলা এর বিকল্পরূপে আমাদেরকে জুম'আর দিন দান করেছেন। (চার) তোমার পিতা-মাতাকে সম্মান কর। তাহলে পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমার আয়ু বৃদ্ধি করে দেবেন, (পাঁচ) নর হত্যা করবে না, (ছয়) ব্যভিচার করবে না, (সাত) চুরি করবে না, (আট) তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না, (নয়) তোমার প্রতিবেশীর ঘরের প্রতি লোভের দৃষ্টিতে তাকাবে না, (দশ) তোমার সাথীর স্ত্রী, গোলাম-বাঁদী, গরু-গাধা ইত্যাদি কোন জিনিসে লোভ করবে না। অর্থাৎ হিংসা থেকে বারণ করা হয়। আমাদের প্রাচীনকালের আলিমগণ ও অন্য অনেকেই বলেন যে, এ দশটি উপদেশ বাণীর সারমর্ম কুরআনের সূরায়ে আন'আমের দু'টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

যাতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ.

অর্থাৎ—বল, এস তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন, তোমাদেরকে তা পড়ে শুনাই, তাহল তোমরা তাঁর কোন শরীক করবে না, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের কাছে যাবে না; আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না। তোমাদেরকে তিনি এই নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা অনুধাবন কর। ইয়াতীম বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তম ব্যবস্থা ব্যতীত তোমরা তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ন্যায্যভাবে পুরোপুরি দেবে। আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায্য বলবে, স্বজনের সম্পর্কে হলেও এবং আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর এবং এপথই আমার সরলপথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে। (সূরা আনআম ঃ ১৫১-১৫৩)

তারা এই দশটি উপদেশ বাণীর পরও বহু ওসীয়ত ও বিভিন্ন মূল্যবান নির্দেশাবলীর উল্লেখ করেছেন, যেগুলো বহুদিন যাবত চালু ছিল। তারা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এগুলো আমল করেছেন কিন্তু এরপরই এগুলোতে আমলকারীদের পক্ষ হতে অবাধ্যতার ছোঁয়া লাগে। তারা

এগুলোর দিকে লক্ষ্য করলো এবং এগুলোতে পরিবর্তন সাধন করল, কোন কোনটা একেবারে বদল করে দিল; আবার কোন কোনটার মনগড়া ব্যাখ্যা দান করতে লাগল। তারপর এগুলোকে একেবারেই তারা ছেড়ে দিল। এরূপ এসব নির্দেশ এককালে পূর্ণরূপে চালু থাকার পর পরিবর্তিত ও বর্জিত হয়ে যায়। পূর্বে ও পরে আল্লাহ তা'আলার হুকুমই বলবৎ থাকবে, তিনিই যা ইচ্ছে হুকুম করে থাকেন এবং যা ইচ্ছে করে থাকেন, তাঁরই হাতে সৃষ্টি ও আদেশের মূল চাবিকাঠি। জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ই বরকতময়। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى. كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ هَوٰى. وَإِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى.

হে বনী ইসরাঈল! আমি তো তোমাদেরকে শত্রু থেকে উদ্ধার করেছিলাম, আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং তোমাদের কাছে মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করেছিলাম, তোমাদেরকে যা দান করেছি তা হতে ভাল ভাল বস্তু আহার কর এবং এ বিষয়ে সীমালংঘন করো না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়। আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তাঁর প্রতি, যে তওবা করে ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে। (সূরা তা-হা ঃ ৮০-৮২)

আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের প্রতি যে দয়া ও অনুগ্রহ করেছিলেন সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দিচ্ছেন। তিনি তাদেরকে শত্রু থেকে রক্ষা করেছিলেন, বিপদ-আপদ ও সংকীর্ণ অবস্থা থেকে রেহাই দিয়েছিলেন। আর তাদেরকে তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের নবী মূসা (আ)-এর সঙ্গ দান করার জন্যে অংগীকার করেছিলেন যাতে তিনি তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ বিধান অবতীর্ণ করতে পারেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর মান্না আসমান থেকে প্রতি প্রত্যুষে নাযিল করেন। তাদের জন্যে অতি প্রয়োজনের বেলায় কঠিন সময়ে এমন ভূমিতে ভ্রমণ ও অবস্থানকালে যেখানে কোন প্রকার ফসলাদি ও দুধেল প্রাণী ছিল না, প্রতিদিন সকালে তারা মান্না ঘরের মাঝেই পেয়ে যেত এবং তাদের প্রয়োজন মুতাবিক রেখে দিত যাতে ঐদিনের সকাল হতে আগামী দিনের ঐ সময় পর্যন্ত তাদের খাওয়া-দাওয়া চলে। যে ব্যক্তি এরূপ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয় করে রাখত তা নষ্ট হয়ে যেত; আর যে কম গ্রহণ করত এটাই তার জন্যে যথেষ্ট হত; যে অতিরিক্ত নিত তাও অবশিষ্ট থাকতো না। মান্না তারা রুটির মত করে তৈরি করত এটা ছিল ধব্‌ধবে সাদা এবং অতি মিষ্ট। দিনের শেষ বেলা সালওয়া নামক পাখি তাদের কাছে এসে যেত, রাতের খাবারের প্রয়োজন মত পরিমাণ পাখি তারা অনায়াসে শিকার করত। গ্রীষ্মকাল দেখা দিলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর মেঘখণ্ড প্রেরণ করে ছায়া দান করতেন। এই মেঘখণ্ড তাদেরকে সূর্যের প্রখরতা ও উত্তাপ থেকে রক্ষা করত।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوْا بِعَهْدِيْ أُوْفِ
بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُوْنِ. وَآمِنُوْا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْا
أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. وَلَا تَشْتَرُوْا بِآيَاتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُوْنِ.

"হে বনী ইসরাঈল! আমার সে অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যা দিয়ে আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছি এবং আমার সঙ্গে তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর। আমিও তোমাদের সঙ্গে আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব এবং তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর। আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে ঈমান আন। এটা তোমাদের কাছে যা আছে তার প্রত্যয়নকারী। আর তোমরাই এটার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করবে না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় করবে।" (সূরা বাকারা ঃ ৪০-৪১)

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ اذْكُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ
عَلَى الْعَالَمِيْنَ. وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَاهُمْ يُنْصَرُوْنَ. وَإِذْ نَجَّيْنٰكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ. يُذَبِّحُوْنَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ. وَفِيْ
ذَالِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ
فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ. وَإِذْ وٰعَدْنَا مُوْسٰى أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ
الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُوْنَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ. وَإِذْ قَالَ
مُوْسٰى لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْا إِلٰى
بَارِئِكُمْ. فَاقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ. ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. فَتَابَ عَلَيْكُمْ. إِنَّهُ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى. كُلُوْا مِنْ
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ.

অর্থাৎ— হে বনী ইসরাঈল! আমার সেই অনুগ্রহকে স্মরণ কর, যা দ্বারা আমি তোমাদেরকে অনুগৃহীত করেছিলাম এবং বিশ্বে সবার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম। তোমরা সে দিনকে ভয় কর

যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কারো নিকট থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্য প্রাপ্তও হবে না। স্মরণ কর, যখন আমি ফিরআউনী সম্প্রদায়ের কবল থেকে তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলাম, যারা তোমাদের পুত্রদেরকে যবেহ করে ও তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রেখে তোমাদেরকে মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিত; এবং এতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা ছিল; যখন তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ও ফিরআউনী সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করেছিলাম আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে। যখন মূসার জন্যে চল্লিশ রাত নির্ধারিত করেছিলাম, তার প্রস্থানের পর তোমরা তখন বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিলে। তোমরা তো জালিম। এরপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দান করেছিলাম যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও। আর যখন মূসা আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরে যাও এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার কাছে এটাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করব না, তখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে আর তোমরা নিজেরাই দেখছিলে। তারপর মৃত্যুর পর আমি তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। আমি মেঘ দ্বারা তোমাদের উপর ছায়া বিস্তার করলাম। তোমাদের নিকট মান্না ও সালওয়া প্রেরণ করলাম। বলেছিলাম, তোমাদেরকে ভাল যা দান করেছি তা হতে আহার কর। তারা আমার প্রতি কোন জুলুম করে নাই বরং তারা তাদের প্রতিই জুলুম করেছিল। (সূরা বাকারা ঃ ৪৭-৫৭)

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ذَالِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ.

'স্মরণ কর, যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য পানি প্রার্থনা করল। আমি বললাম, তোমরা লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর।' ফলে তাথেকে বারটি ঝরনা প্রবাহিত হল। প্রত্যেক গোত্র নিজ

নিজ পান-স্থান চিনে নিল। আমি বললাম, 'আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকা হতে তোমরা পানাহার কর এবং দুষ্কৃতকারীরূপে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে বেড়াবে না।' যখন তোমরা বলেছিলে, 'হে মূসা! আমরা একই রকম খাদ্যে কখনও ধৈর্যধারণ করব না। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর তিনি যেন ভূমিজাত দ্রব্য, শাক-সব্‌জি, ফাঁকুড়, গম, মসুর ও পিঁয়াজ আমাদের জন্য উৎপাদন করেন।' মূসা বলল, তোমরা কি উৎকৃষ্টতর বস্তুকে নিকৃষ্টতর বস্তুর সাথে বদল করতে চাও ? তবে কোন নগরে অবতরণ কর। তোমরা যা চাও তা সেখানে রয়েছে। আর তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হল ও তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পাত্র হলো। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে অস্বীকার করত এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। অবাধ্যতা ও সীমালংঘন করবার জন্যই তাদের এই পরিণতি হয়েছিল। (সূরা বাকারা : ৬০-৬১)

এখানে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন ও অনুগ্রহ করেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দু'টো সুস্বাদু খাবার বিনাকষ্টে ও পরিশ্রমে সহজলভ্য করে দিয়েছিলেন। প্রতিদিন ভোরে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যে মান্না অবতীর্ণ করতেন এবং সন্ধ্যার সময় সালওয়া নামক পাখি প্রেরণ করতেন। মূসা (আ)-এর লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত করার ফলে তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলা পানি প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। তারা এই পাথরটিকে তাদের সাথে লাঠি সহকারে বহন করত। এই পাথর থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হত; প্রতিটি গোত্রের জন্যে একটি প্রস্রবণ নির্ধারিত ছিল। এই প্রস্রবণগুলো পরিষ্কার ও স্বচ্ছ পানি প্রবাহিত করত। তারা নিজেরা পান করত ও তাদের প্রাণীদেরকে পানি পান করাত এবং তারা প্রয়োজনীয় পানি জমা করেও রাখত। উত্তাপ থেকে বাঁচাবার জন্যে মেঘ দ্বারা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ছায়া দান করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে তাদের জন্যে ছিল এগুলো বড় বড় নিয়ামত ও দান, তবে তারা এগুলোর পূর্ণ মর্যাদা অনুধাবন করেনি এবং এগুলোর জন্যে যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেনি। আর যথাযথভাবে ইবাদতও তারা আঞ্জাম দেয়নি। অতঃপর তাদের অনেকেই এসব নিয়ামতের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করল। এগুলোর প্রতি অধৈর্য হয়ে উঠল এবং চাইল যাতে তাদেরকে এগুলো পরিবর্তন করে দেয়া হয়। এমন সব বস্তু যা ভূমি উৎপন্ন করে যেমন শাক, সব্‌জি, ফাঁকুড়, গম, মসুর ও পিঁয়াজ ইত্যাদি। এ কথার জন্যে মূসা (আ) তাদেরকে ভর্ৎসনা করলেন এবং ধমক দিলেন, তাদের সতর্ক করে বললেন :

أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ.

অর্থাৎ—ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল শহরের অধিবাসীর জন্য অর্জিত উৎকৃষ্ট নিয়ামতসমূহের পরিবর্তে কি তোমরা নিকৃষ্টতর বস্তু চাও? তাহলে তোমরা যেসব বস্তু ও মর্যাদার উপযুক্ত নও তার থেকে অবতরণ করে তোমরা যে ধরনের নিকৃষ্ট মানের খাদ্য খাবার চাও তা তোমরা অর্জন করতে পারবে। তবে আমি তোমাদের আবদারের প্রতি সাড়া দিচ্ছি না এবং তোমরা যে ধরনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছ তাও আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আপাতত পৌঁছাচ্ছি না। উপরোক্ত যেসব আচরণ তাদের থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, মূসা (আ) তাদেরকে যেসব কাজ থেকে বিরত রাখতে ইচ্ছে করেছিলেন তা থেকে তারা বিরত থাকেনি।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِىْ. وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِىْ فَقَدْ هَوٰى.

এ বিষয়ে সীমালংঘন করবে না, করলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ অবধারিত এবং যার উপর আমার ক্রোধ অবধারিত সে তো ধ্বংস হয়ে যায়। (সূরা তা-হা ঃ ৮১)

বনী ইসরাঈলের উপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার গযব অবধারিত হয়েছিল। তবে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ কঠোর শাস্তিকে আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথেও সম্পৃক্ত করেছেন, ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি প্রত্যাবর্তন করে ও পাপরাশি থেকে তওবা করে এবং বিতাড়িত শয়তানের অনুসরণে আর লিপ্ত না থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى.

আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি যে তওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচলিত থাকে। (সূরা তা-হা ঃ ৮২)

আল্লাহ্‌র দীদার লাভের জন্য মূসা (আ)-এর প্রার্থনা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖۤ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً. وَقَالَ مُوْسٰى لِاَخِيْهِ هٰرُوْنَ اخْلُفْنِىْ فِىْ قَوْمِىْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ. وَلَمَّا جَاۤءَ مُوْسٰى لِمِيْقَاتِنَا وَكَلَّمَهٗ رَبُّهٗ قَالَ رَبِّ اَرِنِىْۤ اَنْظُرْ اِلَيْكَ. قَالَ لَنْ تَرٰىنِىْ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهٗ فَسَوْفَ تَرٰىنِىْ. فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا. فَلَمَّاۤ اَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ. قَالَ يٰمُوْسٰىۤ اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ. فَخُذْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ. وَكَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّاْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا. سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ. سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا. وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا. وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَىِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا

وَكَانُوْا عَنْهَا غَافِلِيْنَ. وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

"স্মরণ কর মূসার জন্য আমি ত্রিশ রাত নির্ধারিত করি এবং আরো দশ দ্বারা তা পূর্ণ করি। এভাবে তার প্রতিপালকের নির্ধারিত সময় চল্লিশ রাত্রিতে পূর্ণ হয় এবং মূসা তার ভাই হারূন (আ)-কে বলল, আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে; সংশোধন করবে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পথ অনুসরণ করবে না, মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সাথে কথা বললেন, তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না, বরং তুমি পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, এটা স্বস্থানে স্থির থাকলে তবে তুমি আমাকে দেখবে।' যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল। আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন সে বলল, 'মহিমময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।'

তিনি বললেন, 'হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি; সুতরাং আমি যা দিলাম তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও। আমি তার জন্য ফলকে সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি; সুতরাং এগুলো শক্তভাবে ধর এবং তোমার সম্প্রদায়কে এগুলোর যা উত্তম তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও। আমি শীঘ্র সত্যত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাব। পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন থেকে ফিরিয়ে দেব, তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবে না, তারা সৎপথ দেখলেও এটাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না। কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে এটাকে তারা পথ হিসেবে গ্রহণ করবে, এটা এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিল গাফিল। যারা আমার নিদর্শন ও পরকালে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে তাদের কার্য নিষ্ফল হয়। তারা যা করে তদনুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪২-১৪৭)

পূর্ববর্তী যুগের উলামায়ে কিরামের একটি দল, যাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতে উল্লেখিত ত্রিশ রাত্রের অর্থ হচ্ছে যিলকাদ মাসের পূর্ণটা এবং যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ রাত মোট চল্লিশ রাত। এ হিসেবে মূসা (আ)-এর জন্যে আল্লাহ্ ত'আলার বাক্যালাপের দিন হচ্ছে কুরবানীর ঈদের দিন। আর অনুরূপ একটি দিনেই আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা)-এর জন্যে তাঁর দীনকে পূর্ণতা দান করেন এবং তাঁর দলীল-প্রমাণাদি প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মূলত মূসা (আ) যখন তাঁর নির্ধারিত মেয়াদ পরিপূর্ণ করলেন তখন তিনি ছিলেন রোযাদার। কথিত আছে, তিনি কোন প্রকার খাবার চাননি। অতঃপর যখন মাস সমাপ্ত হল তিনি এক প্রকার একটি বৃক্ষের ছাল হাতে নিলেন এবং মুখে সুগন্ধি আনয়ন করার জন্যে তা একটু চিবিয়ে নিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আরো দশদিন রোযা রাখত আদেশ দিলেন। তাতে চল্লিশ দিন পুরা হলো। আর এ কারণে হাদীস শরীফে রয়েছে যে, خلوف فم الصائم

اطيب عند الله من ريح المسك। অর্থাৎ রোযাদারের মুখের গন্ধ, আল্লাহ তা'আলার কাছে মিশকের সুগন্ধি উত্তম।

মূসা (আ) যখন তার নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ করার জন্যে পাহাড় পানে রওয়ানা হলেন, তখন ভাই হারূন (আ)-কে বনী ইসরাঈলের কাছে স্বীয় প্রতিনিধিরূপে রেখে গেলেন। হারূন (আ) ছিলেন মূসা (আ)-এর সহোদর ভাই। অতি নিষ্ঠাবান দায়িত্বশীল ও জনপ্রিয় ব্যক্তি।

আল্লাহ তা'আলার মনোনীত ধর্মের প্রতি আহ্বানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মূসা (আ)-এর সাহায্যকারী। মূসা (আ) তাঁকে প্রয়োজনীয় কাজের আদেশ দিলেন। নবুওতের ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট মর্যাদা থাকায় মূসা (আ)-এর নবুওতের মর্যাদার কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ (অর্থাৎ মূসা (আ) যখন তার জন্যে নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে পৌঁছলেন তখন তার প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা পর্দার আড়াল থেকে তার সাথে কথা বললেন।) আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আপন কথা শুনালেন; মূসা (আ)-কে আহ্বান করলেন, সংগোপনে তাঁর সাথে কথা বললেন; এবং নিকটবর্তী করে নিলেন, এটা উচ্চ একটি সম্মানিত স্থান, দুর্ভেদ্য দুর্গ, সম্মানিত পদমর্যাদা ও অতি উচ্চ অবস্থান। তাঁর উপর আল্লাহ্ তা'আলার অবিরাম দরূদ এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার সালাম বা শান্তি। যখন তাঁকে উচ্চ মর্যাদা ও মহাসম্মান দান করা হল এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কালাম শুনলেন, তখন তিনি পর্দা সরিয়ে নেবার আবেদন করলেন এবং এমন মহান সত্তার উদ্দেশে যাঁকে দুনিয়ার সাধারণ চোখ দেখতে পায় না, তাঁর উদ্দেশে বললেন ঃ

رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও! আমি তোমাকে দেখব। আল্লাহ্ উত্তরে বলেন ঃ لَن تَرَانِي তুমি আমাকে কখনই দেখতে পাবে না। অর্থাৎ মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাশের সময় স্থির থাকতে পারবেন না; কেননা পাহাড় যা মানুষের তুলনায় অধিকতর স্থির ও কাঠামোগতভাবে অধিক শক্তিশালী। পাহাড়ই যখন আল্লাহ্ তা'আলার জ্যোতি প্রকাশের সময় স্থির থাকতে পারে না তখন মানুষ কেমন করে পারবে? এ জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي অর্থাৎ তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর তা স্বস্থানে স্থির থাকলে তবে তুমি আমাকে দেখতে পারবে।

প্রাচীন যুগের কিতাবগুলোতে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে বললেন, 'হে মূসা, কোন জীবিত ব্যক্তি আমাকে দেখলে মারা পড়বে এবং কোন শুষ্ক দ্রব্য আমাকে দেখলে উলট-পালট হয়ে গড়িয়ে পড়বে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ মূসা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার পর্দা হচ্ছে নূর বা জ্যোতির। অন্য এক বর্ণনা মতে, আল্লাহ তা'আলার পর্দা হচ্ছে আগুন। যদি তিনি পর্দা সরান তাহলে তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্যের দরুন যতদূর তাঁর দৃষ্টি পৌঁছে সবকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) আয়াতাংশ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ -এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এটা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার ঐ নূর যা কোন বস্তুর সামনে প্রকাশ করলে তা টিকতে পারবে না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ.

"যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল। আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল, যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল তখন সে বলে উঠল ঃ 'মহিমময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মু'মিনদের মধ্যে আমিই প্রথম।"

মুজাহিদ (র) وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي আয়াতাংশ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ

এটার অর্থ হচ্ছে— পাহাড় তোমার চাইতে বড় এবং কাঠামোতেও তোমার চাইতে অধিকতর শক্ত, যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন, মূসা (আ) পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেন, পাহাড় স্থির থাকতে পারছে না। পাহাড় সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, প্রথম ধাক্কায় তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। মূসা (আ) প্রত্যক্ষ করছিলেন পাহাড় কি করে। অতঃপর তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। ইমাম আহমদ (র) ও তিরমিযী (র) হতে বর্ণিত এবং ইব্ন জারীর (র) ও হাকিম (র) কর্তৃক সত্যায়িত এ বিবরণটি আমি আমার তাফসীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। ইব্ন জারীর (র) আনাস (রা) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতে অতিরিক্ত এটুকু রয়েছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا আয়াতাংশ তিলাওয়াত করেন এবং আঙ্গুলে ইশারা করে বলেন, এভাবে পাহাড় ধসে গেল বলে রাসূলুল্লাহ (সা) বৃদ্ধাঙ্গুলিকে কনিষ্ঠা আঙ্গুলের উপরের জোড়ায় স্থাপন করলেন।

সুদ্দী (র) ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর জ্যোতি কনিষ্ঠ অঙ্গুলির পরিমাণে প্রকাশ করায় পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল অর্থাৎ মাটি হয়ে গেল। আয়াতাংশ خَرَّ এ উল্লেখিত وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا এর অর্থ হচ্ছে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া। কাতাদা (র) বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে মারা যাওয়া তবে প্রথম অর্থটি বিশুদ্ধতর। কেননা, পরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ فلما افاق কেননা বেহুঁশ হবার পরই জ্ঞান ফিরে পায়। আয়াতাংশ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (মহিমময় তুমি, আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং মু'মিনদের আমিই প্রথম।) অর্থাৎ আল্লাহ্ যেহেতু মহিমময় ও মহাসম্মানিত সেহেতু কেউ তাঁকে দেখতে পারবে না। মূসা (আ) বলেন, এর পর আর কোন দিনও তোমার দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করব না। আমিই প্রথম মুমিন অর্থাৎ তোমাকে কোন জীবিত লোক দেখলে মারা যাবে এবং কোন শুষ্ক বস্তু দেখলে তা গড়িয়ে পড়বে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ সাঈদ খুদরী (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ "আমাকে তোমরা আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে প্রাধান্য দিও না। কেননা, কিয়ামতের দিন যখন মানব জাতি জ্ঞানহারা হয়ে যাবে, তখন আমিই সর্বপ্রথম জ্ঞান ফিরে পাব। আর তখন আমি মূসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলার আরশের কাছে স্তম্ভ ধরে থাকতে দেখতে পাব। আমি জানি না, তিনি কি আমার পূর্বেই জ্ঞান ফিরে পাবেন, না কি তাঁকে তূর পাহাড়ে জ্ঞান হারাবার প্রতিদান দেয়া হবে।' পাঠটি বুখারীর।

এ হাদীসের প্রথম দিকে এক ইহুদীর ঘটনা রয়েছে। একজন আনসারী তাকে চড় মেরেছিলেন যখন সে বলেছিল ঃ لا والذى اصطفى موسى على البشر অর্থাৎ না, এমন সত্তার শপথ করে বলছি যিনি মূসা (আ)-কে সমস্ত বনী আদমের মধ্যে অধিকতর সম্মান দিয়েছেন। তখন আনসারী প্রশ্ন করেছিলেন আল্লাহ কি মুহাম্মদ (সা) থেকেও মূসা (আ)-কে অধিক সম্মান দিয়েছিলেন? ইহুদী বলল, হ্যাঁ, এ সময় রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ لاتخيرونى من بين الانبياء বুখারী ও মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রা) হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। এই হাদীসে لا تخيرونى على موسى অর্থাৎ মূসা (আ) থেকে আমাকে অগ্রাধিকার দেবে না, কথাটিরও উল্লেখ রয়েছে। এরূপ নিষেধ করার কারণ বিভিন্ন হতে পারে। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এটা বিনয় প্রকাশ করার জন্য বলেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে আমার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে কিংবা আম্বিয়ায়ে কিরামকে তুচ্ছ করার উদ্দেশ্যে আমার অগ্রাধিকার বর্ণনা করবে না।

অথবা এটার অর্থ হচ্ছে এরূপ ঃ এটা তোমাদের কাজ নয় বরং আল্লাহ্ তা'আলাই কোন নবীকে অন্য নবীর উপর মর্যাদা দান করে থাকেন। এই মর্যাদা ও অগ্রাধিকার কারো অভিমতের উপর নির্ভরশীল নয়। এই মর্যাদা অভিমতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় না বরং আল্লাহ্ তা'আলার ওহীর উপর নির্ভরশীল। যিনি বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) সকলের মধ্যে উত্তম' এই তথ্যটি জানার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ বলতে নিষেধ করেছিলেন, যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তিনিই সকলের মধ্যে উত্তম তখন এ নিষেধাজ্ঞাটি রহিত হয়ে যায়। তার এ অভিমতটি সন্দেহমুক্ত নয়। কেননা, উপরোক্ত হাদীসটি আবূ সাঈদ খুদরী (র) ও আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। আর আবূ হুরায়রা (রা) খায়বর যুদ্ধের বছরে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। তাই খায়বর যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ (সা) নিজের শ্রেষ্ঠত্বের কথা জানতে পেরেছেন, এর সম্ভাবনা ক্ষীণ। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ। তবে রাসূলুল্লাহ (সা) যে সমস্ত মানব তথা সমস্ত সৃষ্টির সেরা এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে।' (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০) আর উম্মতের পরিপূর্ণতা তাদের নবীর মান-মর্যাদার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়। হাদীসের সর্বোচ্চ সূত্র তথা মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন আমি থাকব আদম সন্তানদের সর্দার। এটা আমার গর্ব নয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) মাকামে মাহমূদ যে কেবল তারই জন্য নির্দিষ্ট তা তিনি উল্লেখ করেন। মাকামে মাহমূদ পূর্বের ও পরের সকলের কাছেই ঈর্ষণীয় এবং এই মর্যাদা অন্য সব নবী-রাসূলের নাগালের বাইরে থাকবে। এমনকি নূহ (আ), ইবরাহীম (আ), মূসা (আ) এবং ইসা ইব্ন মারয়াম (আ) প্রমুখ বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন নবীগণও এ গৌরব লাভ করবেন না।

فاكون اول من يفيق فاجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا ادرى
افاق قبلى ام جوزى لصعقة الطور.

হাদীসে উক্ত উপরোক্ত বাক্য দ্বারা বোঝা যায়, বান্দাদের আমলের ফয়সালা করার সময় আল্লাহ তা'আলা যখন জ্যোতি প্রকাশ করবেন, তখন কিয়ামতের মাঠে সৃষ্টিকুল জ্ঞানহারা হয়ে

যাবে। অতিরিক্ত ভয়-ভীতি ও আতংকগ্রস্ততার জন্যই তারা এরূপ জ্ঞানহারা হবে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি জ্ঞান ফিরে পাবেন তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নবী এবং সব নবীর চেয়ে আসমান যমীনের প্রতিপালকের প্রিয়তম মুহাম্মদ (সা)। তিনি মূসা (আ)-কে আরশের স্তম্ভ ধরে থাকতে দেখবেন। সত্যবাদী নবী মুহাম্মদ (সা) বলেন ঃ

لا ادرى اصعق فافاق قبلى اوجوزنى بصعقة الطور.

অর্থাৎ— আমি জানি না তাঁর জ্ঞানহারা হওয়া কি অতি হালকা ছিল কেননা তিনি দুনিয়ায় একবার জ্ঞানহারা হয়েছিলেন, নাকি তাঁকে তূর পাহাড়ে জ্ঞান হারানোর প্রতিদান দেয়া হয়েছে অর্থাৎ তিনি আদৌ জ্ঞানহারা হননি। এতে রয়েছে মূসা (আ)-এর জন্য একটি বড় মর্যাদা। তবে এই বিশেষ মর্যাদার কারণে তাঁর সার্বিক মর্যাদাবান বুঝায় না আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) মূসা (আ)-এর মর্যাদা ও ফযীলতের দিকে এভাবে ইংগিত করেন, কেননা যখন ইহুদী বলেছিল ঃ لا والذى اصطفى موسى على البشر অর্থাৎ না, শপথ যিনি মূসা (আ)-কে সমগ্র মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, আনসারী ইহুদীর গালে চপেটাঘাত করায় মূসা (আ)-এর সম্পর্কে কেউ বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে পারে তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছিলেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত এবং বাক্যালাপ দ্বারা তোমাকে মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি অর্থাৎ সমসাময়িক যুগের লোকদের উপর পূর্ববর্তীদের উপর নয়, কেননা ইব্রাহীম (আ) মূসা (আ) থেকে উত্তম ছিলেন। যা ইব্রাহীম (আ)-এর কাহিনীর মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আবার তাঁর পরবর্তীদের উপরও নয়, কেননা মুহাম্মদ (সা) তাঁদের উভয় থেকেই উত্তম ছিলেন। যেমন মি'রাজের রাতে সকল নবী-রাসূলের উপর মুহাম্মদ (সা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ ساقوم مقاما يرغب الى الخلق حتى ابراهيم অর্থাৎ আমি এমন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হব যার আখাঙ্ক্ষা সৃষ্টিকুলের সকলেই করবে, এমনকি ইব্রাহীম (আ)-ও।

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ فَخُذْ مَا اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ অর্থাৎ আমি যে রিসালাত তোমাকে দান করেছি তা শক্তভাবে গ্রহণ কর, তার চাইতে বেশি প্রার্থনা কর না এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ "আমি তার জন্যে ফলকে সর্ববিষয়ে উপদেশ ও সকল বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি।" ফলকগুলোর উপাদান ছিল খুবই মূল্যবান। সহীহ গ্রন্থে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতী হাতে মূসা (আ)-এর জন্য তাওরাত লিখেছিলেন, তার মধ্যে ছিল উপদেশাবলী এবং বনী ইসরাঈলের প্রয়োজনীয় হালাল-হারামের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ অর্থাৎ এগুলোকে সুদৃঢ়ভাবে নেক নিয়তে ধর। তারপর বলেন ঃ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا অর্থাৎ তোমার সম্প্রদায়কে নির্দেশ দাও তারা যেন এগুলোর যা উত্তম তা গ্রহণ করে। অর্থাৎ তারা যেন তার উত্তম ব্যাখ্যা গ্রহণ করে। উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত سَأُرِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ এর অর্থ হচ্ছে তারা আমার আনুগত্য

পরিহারকারী, আমার আদেশের বিরোধী ও আমার রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম গোপন রাখছে। আমি শীঘ্রই সত্য-ত্যাগীদের বাসস্থান তোমাদেরকে দেখাব।

আয়াতে উল্লেখিত

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِىَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاِنْ يَّرَوْا كُلَّ اٰيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوْا بِهَا وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا . وَاِنْ يَّرَوْا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوْهُ سَبِيْلًا. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غٰفِلِيْنَ. وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

অর্থাৎ— পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হতে ফিরিয়ে দেব। তারা এগুলোর তাৎপর্য ও মূল অর্থ বুঝতে অক্ষম থাকবে; তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন ও অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পরও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে না; তারা সৎপথ দেখলেও এটাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, এ পথে চলবে না, এ পথের অনুসরণ করবে না। কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে এটাকে তারা পথ হিসেবে গ্রহণ করবে এটা এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে; এগুলো থেকে তারা গাফিল রয়েছে; এগুলোর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে তারা ব্যর্থ হয়েছে এবং সে অনুযায়ী আমল করা থেকে বিরত রয়েছে। যারা আমার নিদর্শন ও পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের কর্ম নিষ্ফল হবে। তারা যা করবে তদনুযায়ীই তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে। (সূরা আ'রাফ ১৪৬-১৪৭)

বনী ইসরাঈলের বাছুর পূজার বিবরণ

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوْسٰى مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ . اَلَمْ يَرَوْا اَنَّهٗ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيْهِمْ سَبِيْلًا. اِتَّخَذُوْهُ وَكَانُوْا ظٰلِمِيْنَ. وَلَمَّا سُقِطَ فِىْ اَيْدِيْهِمْ وَرَاَوْا اَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوْا. قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ. وَلَمَّا رَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُوْنِيْ مِنْ بَعْدِىْ. اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ. وَاَلْقَي الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيْهِ يَجُرُّهٗ اِلَيْهِ. قَالَ ابْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوْنِىْ وَكَادُوْا يَقْتُلُوْنَنِىْ. فَلَا تُشْمِتْ بِىَ الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِىْ مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِىْ وَلِاَخِىْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ. اِنَّ الَّذِيْنَ

اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا. وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ. وَالَّذِيْنَ عَمِلُوا السَّيِّاٰتِ ثُمَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِهَا وَاٰمَنُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُّوْسَى الْغَضَبُ اَخَذَ الْاَلْوَاحَ. وَفِيْ نُسْخَتِهَا هُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ.

"মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে নিজেদের অলংকার দ্বারা গড়ল একটি বাছুর, একটি অবয়ব, যা হাম্বা রব করত। তারা কি দেখল না যে, এটা তাদের সাথে কথা বলে না ও তাদেরকে পথও দেখায় না? তারা এটাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করলে এবং তারা ছিল জালিম। তারা যখন অনুতপ্ত হল ও দেখল যে, তারা বিপথগামী হয়ে গিয়েছে, তখন তারা বলল, 'আমাদের প্রতিপালক যদি আমাদের প্রতি দয়া না করেন ও আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তবে আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবই। মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রত্যাবর্তন করল, তখন বলল, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা আমার কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ। তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বে তোমরা ত্বরান্বিত করলে? এবং সে ফলকগুলো ফেলে দিল আর তার ভাইকে চুলে ধরে নিজের দিকে টেনে আনল। হারূন বললেন, হে আমার সহোদর! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল ঠাউরিয়েছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল। তুমি আমার সাথে এমন করো না যাতে শত্রুরা আনন্দিত হয় এবং আমাকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করো না। মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর। তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। যারা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে, পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবেই। আর এভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি। যারা অসৎকার্য করে তারা পরে তওবা করলে ও ঈমান আনলে তোমার প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হলো তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য এতে যা লিখিত ছিল তাতে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৪৮-১৫৪)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَامُوْسٰى. قَالَ هُمْ اُولَاءِ عَلٰى اَثَرِىْ وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضٰى. قَالَ فَاِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَاَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ. فَرَجَعَ مُوْسٰى اِلٰى قَوْمِهٖ غَضْبَانَ اَسِفًا. قَالَ يَاقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا. اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَرَدْتُّمْ. اَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِىْ. قَالُوْا مَا اَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذٰلِكَ اَلْقَي السَّامِرِيُّ. فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهٗ خُوَارٌ فَقَالُوْا هٰذَا اِلٰهُكُمْ وَاِلٰهُ مُوْسٰي فَنَسِىَ. اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ اِلَيْهِمْ

قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هٰرُوْنُ مِنْ قَبْلُ يٰقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ. وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُوْنِيْ وَاَطِيْعُوْا اَمْرِىْ. قَالُوْا لَنْ نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى. قَالَ يٰهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا اَلَّا تَتَّبِعَنْ. اَفَعَصَيْتَ اَمْرِيْ. قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِىْ وَلَا بِرَاْسِىْ. اِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ. قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَامِرِىُّ. قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوْا بِهٖ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ. قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ. وَانْظُرْ اِلٰى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا. لَنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا. اِنَّمَا اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا.

অর্থাৎ— হে মূসা! তোমার সম্প্রদায়কে পশ্চাতে ফেলে তোমাকে ত্বরা করতে বাধ্য করল কিসে? সে বলল, এই তো তারা আমার পশ্চাতে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি ত্বরায় তোমার কাছে আসলাম, তুমি সন্তুষ্ট হবে এ জন্য। তিনি বললেন, আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার চলে আসার পর এবং সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। তারপর মূসা তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেল ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে এক উত্তম প্রতিশ্রুতি দেননি? তবে কি প্রতিশ্রুতিকাল তোমাদের কাছে সুদীর্ঘ হয়েছে; না তোমরা চেয়েছ তোমাদের প্রতি আপতিত হোক তোমাদের প্রতিপালকের ক্রোধ, যে কারণে তোমরা আমার প্রতি প্রদত্ত অংগীকার ভংগ করলে? ওরা বলল, 'আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অংগীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি, তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি, অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করে। তারপর সে ওদের জন্যে গড়ল একটা বাছুর, একটা অবয়ব, যা হাম্বা রব করত। ওরা বলল, "এটা তোমাদের ইলাহ এবং মূসারও ইলাহ, কিন্তু মূসা ভুলে গিয়েছে। তবে কি ওরা ভেবে দেখে না যে, এটা তাদের কথায় সাড়া দেয় না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করবার ক্ষমতাও রাখে না। হারূন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! এটার দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। ওরা বলেছিল, আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এটার পূজা হতে কিছুতেই বিরত হব না। মূসা বলল, হে হারূন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল, আমার অনুসরণ করা থেকে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে? হারূন বলল, হে আমার সহোদর! আমার দাড়ি ও চুল ধরো না। আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ ও তুমি আমার বাক্য পালনে যত্নবান হওনি।

মূসা বলল, হে সামিরী! তোমার ব্যাপার কি? সে বলল, আমি দেখেছিলাম যা ওরা দেখেনি তারপর আমি সেই দূতের (জিবরাঈলের) পদচিহ্ন থেকে এবং মুষ্ঠি (ধুলা) নিয়েছিলাম এবং আমি এটা নিক্ষেপ করেছিলাম এবং আমার মন আমার জন্য শোভন করেছিল এইরূপ করা।" মূসা বলল, দূর হও, তোমার জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটাই রইল যে তুমি বলবে, "আমি অস্পৃশ্য" এবং তোমার জন্য রইল একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ, তোমার বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না এবং তুমি তোমার সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুমি রত ছিলে; আমরা ওটাকে জ্বালিয়ে দেবই। অতঃপর ওটাকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই। তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই, যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তাঁর জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত। (সূরা তাহা ঃ ৮৩-৯৮)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মূসা (আ) যখন আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারিত সময়ে উপনীত হলেন, তখন তিনি তূর পর্বতে অবস্থান করে আপন প্রতিপালকের সাথে একান্ত কথা বললেন। মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চান এবং আল্লাহ্ তা'আলা সে সব বিষয়ে তাকে জানিয়ে দেন। তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি যাকে হারূন আস সামিরী বলা হয় সে যেসব অলংকার ধারস্বরূপ নিয়েছিল সেগুলো দিয়ে সে একটি বাছুর-মূর্তি তৈরি করল এবং বনী ইসরাঈলের সামনে ফিরআউনকে আল্লাহ তা'আলা ডুবিয়ে মারার সময় জিবরাঈল (আ)-এর ঘোড়ার পায়ের এক মুষ্ঠি ধুলা মূর্তিটির ভিতরে নিক্ষেপ করল। সাথে সাথে বাছুর মূর্তিটি জীবন্ত বাছুরের মত হাম্বা হাম্বা আওয়াজ দিতে লাগল। কেউ কেউ বলেন, এতে তা রক্ত-মাংসের জীবন্ত একটি বাছুরে রূপান্তরিত হয়ে যায় আর তা হাম্বা হাম্বা রব করতে থাকে। কাতাদা (র) প্রমুখ মুফাসসিরীন এ মত ব্যক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, 'যখন এটার পেছন দিক থেকে বাতাস ঢুকত এবং মুখ দিয়ে বের হত তখনই হাম্বা হাম্বা আওয়াজ হত যেমন সাধারণত গরু ডেকে থাকে। এতে তারা এর চতুর্দিকে নাচতে থাকে এবং উল্লাস প্রকাশ করতে থাকে। তারা বলতে লাগল, এটাই তোমাদের ও মূসা (আ)-এর ইলাহ, কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন। অর্থাৎ মূসা (আ) আমাদের নিকটস্থ প্রতিপালককে ভুলে গেছেন এবং অন্যত্র গিয়ে তাকে খোঁজাখুঁজি করছেন অথচ প্রতিপালক তো এখানেই রয়েছেন। (নির্বোধরা যা বলছে আল্লাহ তা'আলা তার বহু বহু উর্ধে, তার নাম ও গুণগুলো এসব অপবাদ থেকে পূত-পবিত্র এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত নিয়ামত সমূহও অগণিত) তারা যেটাকে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছিল তা বড় জোর একটা জন্তু বা শয়তান ছিল। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার অসারতা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারা কি দেখে না যে, এই বাছুরটি তাদের কথার কোন উত্তর দিতে পারে না এবং এটা তাদের কোন উপকার বা অপকার করতে পারে না। অন্যত্র বলেন, তারা কি দেখে না যে, এটা তাদের সাথে কথা বলতে পারে না এবং তাদেরকে পথনির্দেশ করতে পারে না। আর এরা ছিল জালিম।" (৭ আরাফ ঃ ১৪৮)

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেন যে, এ জন্তুটি তাদের সাথে কথা বলতে পারে না, তাদের কোন কথার জবাব দিতে পারে না, কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না কিংবা কোন উপকার করারও শক্তি রাখে না, তাদেরকে পথনির্দেশও করতে পারে না, তারা তাদের আত্মার

প্রতি জুলুম করেছে। তারা তাদের এই মূর্খতা ও বিভ্রান্তির অসারতা সম্বন্ধে সম্যক অবগত। "অতঃপর তারা যখন তাদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হল এবং অনুভব করতে পারল যে, তারা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে তখন তারা বলতে লাগল, যদি আমাদের প্রতিপালক আমাদের প্রতি দয়া না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।" (৭ আ'রাফ ঃ ১৪৯)

অতঃপর মূসা (আ) তাদের কাছে ফিরে আসলেন এবং তাদের বাছুর পূজা করার বিষয়টি জানতে পারলেন। তাঁর সাথে ছিল বেশ কয়েকটি ফলক যেগুলোর মধ্যে তাওরাত লিপিবদ্ধ ছিল, তিনি এগুলো ফেলে দিলেন। কেউ কেউ বলেন, এগুলোকে তিনি ভেঙ্গে ফেলেন। কিতাবীরা এরূপ বলে থাকে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর পরিবর্তে অন্য ফলক দান করেন। কুরআনুল করীমের ভাষ্যে এর স্পষ্ট উল্লেখ নেই তবে এত দূর আছে যে, মূসা (আ) তাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করে, ফলকগুলো ফেলে দিয়েছিলেন। কিতাবীদের মতে, সেখানে ছিল মাত্র দুইটি ফলক। কুরআনের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, ফলক বেশ কয়েকটিই ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁকে তাঁর সম্প্রদায়ের বাছুর পূজার কথা অবগত করেছিলেন, তখন মূসা (আ) তেমন প্রভাবান্বিত হননি। তখন আল্লাহ্ তাঁকে তা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করতে নির্দেশ দেন। এ জন্যেই ইমাম আহমদ (র) ও ইব্ন হিব্বান (র) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ليس الخبر كالمعاينة অর্থাৎ সংবাদ প্রাপ্তি এবং প্রত্যক্ষ দর্শন সমান নয়। অতঃপর মূসা (আ) তাদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করলেন এবং তাদের এ হীন কাজের জন্যে তাদেরকে দোষারোপ করলেন। তখন তার কাছে তারা মিথ্যা ওযর আপত্তি পেশ করে বলল ঃ

قَالُوْا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذٰلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ

অর্থাৎ— তারা বলল, আমরা তোমার প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিনি তবে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল লোকের অলংকারের বোঝা এবং আমরা তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করি। অনুরূপভাবে সামিরীও নিক্ষেপ করে। (সূরা তা-হা ঃ ৮৭)

তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ফিরআউন সম্প্রদায়ের অলংকারের অধিকারী হওয়াকে তারা পাপকার্য বলে মনে করতে লাগল অথচ আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে তাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছিলেন। অথচ তারা মহা পরাক্রমশালী অদ্বিতীয় মহাপ্রভুর সাথে হাম্বা হাম্বা রবের অধিকারী বাছুরের পূজাকে তাদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে পাপকার্য বলে বিবেচনা করছিল না। অতঃপর মূসা (আ) আপন সহোদর হারূন (আ)-এর প্রতি মনোযোগী হলেন এবং তাঁকে বললেন ঃ يَاهٰرُوْنُ مَا مَنَعَكَ হে হারূন! তুমি যখন দেখলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল আমার অনুসরণ করা থেকে? (সূরা তা-হা ঃ ৯২)

অর্থাৎ যখন তুমি তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারটি দেখলে তখন তুমি কেন আমাকে সে সম্বন্ধে অবহিত করলে না? তখন তিনি বললেন, خَشِيْتُ أَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْ

اِسْرَائِيْلَ আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে যে, তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। (সূরা তা-হা ঃ ৯৪)

অর্থাৎ তুমি হয়ত বলতে, তুমি তাদেরকে ছেড়ে আমার কাছে চলে আসলে অথচ আমি তোমাকে তাদের মধ্যে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে এসেছিলাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ .

"মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর এবং আমাদেরকে তোমার রহমতের মধ্যে দাখিল কর। তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫১)

হারূন (আ) তাদেরকে এরূপ জঘন্য কাজ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন এবং তাদেরকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেছিলেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُوْنُ مِنْ قَبْلُ يَاقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ অর্থাৎ হারূন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! এর দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এ বাছুর ও এর হাম্বা রবকে তোমাদের জন্যে একটি পরীক্ষার বিষয় করেছেন।

নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক খুবই দয়াময় অর্থাৎ এ বাছুর তোমাদের প্রভু নয়। (সূরা তা-হা ঃ ৯০ আয়াত) فَاتَّبِعُوْنِىْ وَاَطِيْعُوْا اَمْرِىْ সুতরাং আমি যা বলি তার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মান্য কর। তারা বলেছিল, আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এটার পূজা থেকে কিছুতেই বিরত হব না।" (সূরা তা-হা ঃ ৯১)। আল্লাহ তা'আলা হারূন (আ) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছেন- আর আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। যে হারূন (আ) তাদেরকে এরূপ জঘন্য কাজ থেকে নিষেধ করেছিলেন, তাদেরকে ভর্ৎসনা করেছিলেন কিন্তু তারা তার কথা মান্য করেনি। অতঃপর মূসা (আ) সামিরীর প্রতি মনোযোগী হলেন এবং বললেন, "তুমি যা করেছ কে তোমাকে এরূপ করতে বলেছিল?" উত্তরে সে বলল, "আমি জিবরাঈল (আ)-কে দেখেছিলাম, তিনি ছিলেন একটি ঘোড়ার উপর সওয়ার তখন আমি জিবরাঈল (আ)-এর ঘোড়ার পায়ের ধুলা সংগ্রহ করেছিলাম।" আবার কেউ কেউ বলেন ঃ সামিরী জিবরাঈল (আ)-কে দেখেছিল। জিবরাঈল (আ)-এর ঘোড়ার খুর যেখানেই পড়ত অমনি সে স্থানটি ঘাসে সবুজ হয়ে যেত। তাই সে ঘোড়ার খুরের নিচের মাটি সংগ্রহ করল। এরপর যখন সে এই স্বর্ণ-নির্মিত বাছুরের মুখে ঐ মাটি রেখে দিল, তখনই সে আওয়াজ করতে লাগল এবং পরবর্তী ঘটনা সংঘটিত হল। এজন্যেই সামিরী বলেছিল—'আমার মন আমার জন্যে এরূপ করা শোভন করেছিল।' তখন মূসা (আ) তাকে অভিশাপ দিলেন এবং বললেন, তুমি সব সময়ে বলবে لَا مِسَاسَ অর্থাৎ আমাকে কেউ স্পর্শ করবে না- কেননা, সে এমন জিনিস স্পর্শ করেছিল যা তার স্পর্শ করা উচিত ছিল না। এটা তার দুনিয়ার শাস্তি। অতঃপর আখিরাতের শাস্তির কথাও তিনি ঘোষণা করেন। অত্র আয়াতে উল্লেখিত لن تخلفه কে কেউ কেউ لن نخلفه পাঠ করেছেন অর্থাৎ এর 'ব্যতিক্রম হবে না' স্থলে 'আমি ব্যতিক্রম করব না।' অতঃপর মূসা (আ) বাছুরটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন।

এ অভিমতটি কাতাদা (র) প্রমুখের। আবার কেউ কেউ বলেন, উখা দিয়ে তিনি বাছুর মূর্তিটি ধ্বংস করেছিলেন। এ অভিমতটি আলী (রা), আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) প্রমুখের। কিতাবীদের ভাষ্যও তাই। অতঃপর এটাকে মূসা (আ) সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন এবং বনী ইসরাঈলকে সেই সমুদ্রের পানি পান করতে নির্দেশ দিলেন। তারা পানি পান করল। যারা বাছুরের পূজা করেছিল, বাছুরের ছাই তাদের ঠোঁটে লেগে রইল যাতে বোঝা গেল যে, তারাই ছিল এর পূজারী। কেউ কেউ বলেন, তাদের রং হলদে হয়ে যায়।

আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ) সম্বন্ধে আরও বলেন যে, তিনি বনী ইসরাঈলকে বলেছিলেন ঃ

إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا.

অর্থাৎ 'তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহই যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তাঁর জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যপ্ত।'

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ.

অর্থাৎ--'যারা বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে পার্থিব জীবনে তাদের উপর তাদের প্রতিপালকের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা আপতিত হবেই, আর এভাবে আমি মিথ্যা রচনাকারীদের প্রতিফল দিয়ে থাকি।' (সূরা আরাফ ঃ ১৫২)

বাস্তবিকই বনী ইসরাঈলের উপর এরূপ ক্রোধ ও লাঞ্ছনাই আপতিত হয়েছিল। প্রাচীন আলিমগণের কেউ কেউ বলেছেন, وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ আয়াতাংশ -এর মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী প্রতিটি বিদআত উদ্ভাবনকারীর এরূপ অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা বলা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আপন ধৈর্যশীলতা, সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও তওবা কবূলের ব্যাপারে বান্দাদের উপর তাঁর অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করে বলেন, 'যারা অসৎ কার্য করে তারা পরে তওবা করলে ও ঈমান আনলে তোমার প্রতিপালক তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা আরাফ ঃ ১৫৩)।

কিন্তু বাছুর পূজারীদের হত্যার শাস্তি ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলা কোন তওবা কবূল করলেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ. فَتَابَ عَلَيْكُمْ. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

আর স্মরণ কর, যখন মূসা আপন সম্প্রদায়ের লোককে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! বাছুরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তোমরা নিজেদের প্রতি ঘোর অত্যাচার করেছ। সুতরাং তোমরা তোমাদের স্রষ্টার পানে ফিরে যাও এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর। তোমাদের স্রষ্টার কাছে

এটাই শ্রেয়। তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা বাকারা ঃ ৫৪)

কথিত আছে, একদিন ভোরবেলা যারা বাছুর পূজা করেনি তারা তরবারি হাতে নিল; অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি এমন ঘন কুয়াশা অবতীর্ণ করলেন যে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে এবং একই বংশের একজন অন্যজনকে চিনতে পারছিল না। তারা বাছুর পূজারীদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করল এবং তাদের মূলোৎপাটন করে দিল। কথিত রয়েছে যে, তারা ঐ দিনের একই প্রভাতে সত্তর হাজার লোককে হত্যা করেছিল।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ.

অর্থাৎ—"যখন মূসার ক্রোধ প্রশমিত হল তখন সে ফলকগুলো তুলে নিল। যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য ওতে যা লিখিত ছিল তাতে ছিল পথনির্দেশ ও রহমত।" (সূরা আরাফ ঃ ১৫৪)

আয়াতাংশে উল্লেখিত ঃ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ-এর দ্বারা কেউ কেউ প্রমাণ করেন যে, ফলকগুলো ভেঙে গিয়েছিল। তবে এই প্রমাণটি সঠিক নয়। কেননা, কুরআনের শব্দে এমন কিছু পাওয়া যায় না যাতে প্রমাণিত হয় যে, এগুলো ভেঙে গিয়েছিল। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ফিৎনা সম্বলিত হাদীসসমূহে উল্লেখ করেছেন যে, তাদের বাছুর পূজার ঘটনাটি ছিল তাদের সমুদ্র পার হবার পর। এই অভিমতটি অযৌক্তিক নয়; কেননা তারা যখন সমুদ্র পার হলো তখন তারা বলেছিল, "হে মূসা! তাদের যেমন ইলাহসমূহ রয়েছে আমাদের জন্যেও তেমন একটি ইলাহ্ গড়ে দাও।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১০৮)

অনুরূপ অভিমত কিতাবীরা প্রকাশ করে থাকেন। কেননা, তাদের বাছুর পূজার ঘটনাটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস শহরে আগমনের পূর্বে। বাছুর পূজারীদেরকে হত্যা করার যখন হুকুম দেয়া হয়, তখন প্রথম দিনে তিন হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিল। অতঃপর মূসা (আ) তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তাদের ক্ষমা করা হল এই শর্তে যে, তারা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ. أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ .تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ . أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِينَ. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ.

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ. وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ. اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِيْنَ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ. يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ. فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِىْ اُنْزِلَ مَعَهٗ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

"মূসা তার নিজ সম্প্রদায় থেকে সত্তরজন লোককে আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হবার জন্যে মনোনীত করল। তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল, তখন মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছা করলে পূর্বেই তো তাদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা যা করেছে সেজন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? এটা তো শুধু তোমার পরীক্ষা, যা দিয়ে তুমি যাকে ইচ্ছে বিপথগামী কর এবং যাকে ইচ্ছে সৎপথে পরিচালিত কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আমাদের ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। আমাদের জন্য নির্ধারিত কর দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করেছি। আল্লাহ বলেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছে দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া, তাতো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি এটা তাদের জন্য নির্ধারিত করব, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে। যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জিল, যা তাদের নিকট রয়েছে তাতে তারা লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকার্যে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে ও অপবিত্র বস্তু হারাম করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার থেকে ও শৃংখল থেকে যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যেই নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৫-১৫৭)

সুদ্দী (র) আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) ও অন্যান্য মুফাস্‌সির উল্লেখ করেন যে, এই সত্তরজন ছিলেন বনী ইসরাঈলের উলামায়ে কিয়াম। আর তাদের সাথে ছিলেন মূসা (আ), হারূন (আ), ইউশা (আ) নাদাব ও আবীহু। বনী ইসরাঈলের যারা বাছুর পূজা করেছিল তাদের পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্যে তারা মূসা (আ)-এর সাথে গিয়েছিলেন। আর তাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছিল তারা যেন পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে গোসল করে ও সুগন্ধি ব্যবহার করে। তখন তারা মূসা (আ)-এর সাথে আগমন করলেন, পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন; পাহাড়ের উপরে ঝুলন্ত ছিল মেঘখণ্ড, নূরের স্তম্ভ ছিল সুউচ্চ। মূসা (আ) পাহাড়ে আরোহণ করলেন। বনী ইসরাঈলরা দাবি করেন যে, তারা আল্লাহ তা'আলার কালাম শুনেছেন। কিছু সংখ্যক তাফসীরকার তাদের এ দাবিকে সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন, সূরায়ে বাকারার ৭৫

নং আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার বাণী শ্রবণকারী যে দলটির কথা বলা হয়েছে, সত্তরজনের দলের দ্বারাও একই অর্থ নেয়া হয়েছে।

সূরায়ে বাকারায় আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

اَفَتَطْمَعُوْنَ اَنْ يُّؤْمِنُوْا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهٗ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ— তোমরা কি এই আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে, যখন তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করে। তারপর তা বুঝবার পর জেনে-শুনে এটা বিকৃত করে। (সূরা বাকারা ঃ ৭৫)

তবে এ আয়াতে যে শুধু তাদের কথাই বলা হয়েছে, এটাও অপরিহার্য নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ. ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ– "মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দেবে। কারণ তারা অজ্ঞ লোক।" (সূরা তওবা ঃ ৬)

অর্থাৎ তাবলীগের খাতিরে তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী শোনাবার জন্যে হুকুম দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে তারাও মূসা (আ) থেকে তাবলীগ হিসেবে আল্লাহ তা'আলার বাণী শুনেছিলেন। কিতাবীরা আরো মনে করে যে, এ সত্তর ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিল। এটা তাদের ভ্রান্ত ধারণা বৈ আর কিছুই নয়। কেননা, তারা যখন আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে চেয়েছিল তখনই তারা বজ্রাহত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ قُلْتُمْ يٰمُوْسٰى لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً فَاَخَذَتْكُمُ الصّٰعِقَةُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ. ثُمَّ بَعَثْنٰكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ!

"স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, হে মূসা! আমরা আল্লাহকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করব না। তখন তোমরা বজ্রাহত হয়েছিলে, আর তোমরা নিজেরাই দেখছিলে, মৃত্যুর পর তোমাদের পুনর্জীবিত করলাম, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।" (সূরা বাকারা ঃ ৫৫-৫৬)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَلَمَّا اَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ الاية.

অর্থাৎ—"তারা যখন ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল তখন মূসা বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছে করলে পূর্বেই তো তাদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে .....।"

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, "মূসা (আ) বনী ইসরাঈল থেকে সত্তরজন সদস্যকে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ক্রমানুযায়ী মনোনীত করেছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন, "আল্লাহ

তা'আলার দিকে প্রত্যাগমন কর, নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তওবা কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা বাছুর পূজা করে অন্যায় করেছে তাদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমরা তওবা কর; তোমরা সিয়াম আদায় কর; পবিত্রতা অর্জন কর ও নিজেদের জামা-কাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর।" অতঃপর আপন প্রতিপালক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে সীনাই মরুভূমির তূর পাহাড়ে মূসা (আ) তাদেরকে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। আর তিনি কোন সময়ই আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ব্যতীত সেখানে গমন করতেন না। আল্লাহ তা'আলার কালাম শোনাবার জন্যে তাদের সেই সত্তরজন মূসা (আ)-কে অনুরোধ করল। মূসা (আ) বললেন, আমি একাজটি করতে চেষ্টা করব। মূসা (আ) যখন পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন, তখন তাঁর উপর মেঘমালার স্তম্ভ নেমে আসল এবং তা সমস্ত পাহাড়কে আচ্ছন্ন করে ফেলল। মূসা (আ) আরও নিকটবর্তী হলেন এবং মেঘমালায় ঢুকে পড়লেন, আর নিজের সম্প্রদায়কে বলতে লাগলেন, 'তোমরা নিকটবর্তী হও।' মূসা (আ) যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলতেন, তখন মূসা (আ)-এর মুখমণ্ডলের উপর এমন উজ্জ্বল নূরের প্রতিফলন ঘটত যার দিকে বনী আদমের কেউ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারত না। তাই সামনে পর্দা ঝুলিয়ে দেয়া হল, সম্প্রদায়ের লোকেরা অগ্রসর হলেন এবং মেঘমালায় ঢুকে সিজদাবনত হয়ে পড়লেন। আল্লাহ তা'আলা যখন মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলছিলেন, মূসা (আ)-কে বলছিলেন, এটা কর, ঐটা করো না। তখন তারা আল্লাহ তা'আলার কথা শুনছিলেন। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর নির্দেশ প্রদান সম্পন্ন করলেন এবং মূসা (আ) থেকে মেঘমালা কেটে গেল ও সম্প্রদায়ের দিকে তিনি দৃষ্টি দিলেন, তখন তারা বলল, হে মূসা! আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করি না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্য দেখতে পাই। তারা তখন বজ্রাহত হল ও তাদের থেকে তাদের রূহ বের হয়ে পড়ল। তাতে তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করল।

তৎক্ষণাৎ মূসা (আ) আপন প্রতিপালককে ডাকতে লাগলেন এবং অনুনয় বিনয় করে আরযী জানাতে লাগলেন ঃ

رَبِّ لَوْشِئْتَ اَهْلَكْتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّاىَ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا.

অর্থাৎ— "হে আমার প্রতিপালক! তুমি ইচ্ছে করলে পূর্বেই তো তাদেরকে এবং আমাকেও ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা যা করেছে সেজন্য তুমি আমাদেরকে কি ধ্বংস করবে?

"অন্য কথায়, আমাদের মধ্য হতে নির্বোধরা যা করেছে; তারা বাছুরের পূজা করেছে। তাদের এ কাজের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা), মুজাহিদ (র), কাতাদা (র) ও ইব্ন জুরায়জ (র) বলেন, বনী ইসরাঈলরা বজ্রাঘাতে আক্রান্ত হয়েছিল, কেননা তারা তাদের সম্প্রদায়কে বাছুর পূজা থেকে বিরত রাখেনি। উক্ত আয়াতে উল্লেখিত আয়াতাংশ اِنْ هِىَ اِلَّا فِتْنَتُكَ-এর অর্থ হচ্ছে, 'এটা তোমার প্রদত্ত পরীক্ষা ছাড়া কিছুই নয়।' এ অভিমতটি আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা), সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রা), আবুল আলীয়া (র), রাবী ইবন আনাস (র) ও পূর্বাপরের অসংখ্য উলামায়ে কিরামের। অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমিই এটা নির্ধারিত করে রেখেছিলে, বা তাদেরকে এটার দ্বারা পরীক্ষা করার জন্যে বাছুর পূজা করার বিষয়টি সৃষ্টি করেছিলে।

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قَالَ لَهُمْ هَارُوْنُ مِنْ قَبْلُ يَاقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ.

অর্থাৎ— "হারূন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! বাছুর পূজা দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায়ই ফেলা হয়েছে।" (সূরা তা-হা ঃ ৯০)

এজন্য মূসা (আ) বলেছিলেন ঃ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِىْ مَنْ تَشَاءُ

অর্থাৎ— "তুমিই এই পরীক্ষা দ্বারা যাকে ইচ্ছে পথভ্রষ্ট কর এবং যাকে ইচ্ছে হিদায়ত কর। তুমিই নির্দেশ ও ইচ্ছার মালিক। তুমি যা নির্দেশ বা ফয়সালা কর তা বাধা দেয়ার মত কারো শক্তি নেই এবং কেউ তা প্রতিহতও করতে পারে না।

اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ. وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا اِلَيْكَ.

তুমিই তো আমাদের অভিভাবক, সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা কর ও আমাদের প্রতি দয়া কর এবং ক্ষমাশীলদের মধ্যে তুমিই তো শ্রেষ্ঠ। আমাদের জন্য নির্ধারিত কর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করেছি এবং অনুনয় বিনয় সহকারে তোমাকেই স্মরণ করেছি।

উপরোক্ত তাফসীরটি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইব্ন জুবাইর, আবুল আলীয়া, ইবরাহীম তায়মী, যাহ্হাক, সুদ্দী, কাতাদা (র) ও আরো অনেকেই এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। আভিধানিক অর্থও তাই।

আয়াতাংশ ঃ قَالَ عَذَابِىْ اُصِيْبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ

অর্থাৎ--'আমি যেসব বস্তু সৃষ্টি করেছি এগুলোর কারণে আমি যাকে ইচ্ছে শাস্তি প্রদান করব। আমার রহমত তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৬)

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা যখন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃজন সমাপ্ত করেন তখন তিনি একটি লিপি লিখলেন ও আরশের উপর তাঁর কাছে রেখে দিলেন, তাতে লেখা ছিল ان رحتى تغلب غضبى "নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার গযবকে হার মানায়।"

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ "সুতরাং এটা আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে, যাকাত দেবে ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করবে।" অর্থাৎ আমি সুনিশ্চিতভাবে তাদেরকেই রহমত দান করব যারা এসব গুণের অধিকারী হবে। "আর যারা বার্তাবাহক উম্মী নবীর অনুসরণ করবে"--- এখানে মূসা (আ)-এর কাছে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর উম্মত সম্বন্ধে উল্লেখ করে তাঁদের মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং মূসা (আ)-এর সাথে একান্ত আলাপে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টিও জানিয়ে দিয়েছিলেন। আমার তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াত ও তার পরবর্তী আয়াতের তাফসীর বর্ণনাকালে আমি এ সম্পর্কে বিস্তারিত প্রয়োজনীয় আলোচনা পেশ করেছি।

কাতাদা (র) বলেন, মূসা (আ) বলেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক! ফলকে আমি এমন এক উম্মতের উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি যারা হবে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানব জাতির জন্য তাদের আবির্ভাব হবে, তারা সৎ কার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কাজে নিষেধ করবে। হে প্রতিপালক! তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন! আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'না, ওরা আহমদের উম্মত।' পুনরায় মূসা (আ) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! ফলকে আমি একটি উম্মতের উল্লেখ পাচ্ছি যারা সৃষ্টি হিসেবে সর্বশেষ কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম। হে আমার প্রতিপালক! তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন!' আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'না, এরা আহমদের উম্মত।' আবার মূসা (আ) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! ফলকে আমি একটি উম্মতের উল্লেখ পাচ্ছি, যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার কালাম সুরক্ষিত, অর্থাৎ ওরা আল্লাহ তা'আলার কালামের হাফিজ। তারা হিফজ হতে আল্লাহ তা'আলার কালাম তিলাওয়াত করবেন। উম্মতে মুহাম্মদীর পূর্বে যেসব উম্মত ছিলেন তারা দেখে দেখে আল্লাহ তা'আলার কালাম তিলাওয়াত করতেন। কিন্তু যখন তাদের থেকে আল্লাহ তা'আলার কালাম উঠিয়ে নেয়া হতো, তখন তারা আর কিছুই তিলাওয়াত করতে পারতো না। কেননা, তারা আল্লাহ তা'আলার কালামের কোন অংশই হিফজ করতে পারেনি। তারা পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলার কালামকে আর চিনতেই সক্ষম হতো না। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদীকে আল্লাহ তা'আলার কালাম হিফজ করার তাওফীক দান করা হয়েছে, যা অন্য কাউকে দান করা হয়নি। মূসা (আ) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! ওদেরকে আমার উম্মত করে দিন।' আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'না, ওরা আহমদের উম্মত।'

মূসা (আ) আবারো বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! ফলকে আমি এমন একটি উম্মতের উল্লেখ পাচ্ছি, যারা তাদের পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং শেষ কিতাবের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করবে । তারা পথভ্রষ্ট বিভিন্ন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এমনকি আখেরী যামানার একচক্ষুবিশিষ্ট মিথ্যাবাদী দাজ্জালের বিরুদ্ধেও জিহাদ করবে। তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন।" আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'না, ওরা আহমদের উম্মত।' মূসা (আ) পুনরায় বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! ফলকে আমি এমন একটি উম্মতের উল্লেখ পাচ্ছি যারা আল্লাহ তা'আলার নামের সাদকা-খয়রাত নিজেরা খাবে কিন্তু তাদেরকে এটার জন্যে আবার পুরস্কারও দেয়া হবে।" উম্মতে মুহাম্মদীর পূর্বে অন্যান্য উম্মতের কোন ব্যক্তি যদি সাদকা করত এবং তা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কবূল হত তখন আল্লাহ তা'আলা আগুন প্রেরণ করতেন এবং সে আগুন তা পুড়িয়ে দিত। কিন্তু যদি তা কবূল না হত তাহলে আগুন তা পোড়াত না। বরং এটাকে পশু-পাখিরা খেয়ে ফেলত এবং আল্লাহ তা'আলা ঐ উম্মতের ধনীদের সাদকা দরিদ্রদের জন্যে গ্রহণ করবেন। মূসা (আ) বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! এদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দিন।" আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'না, ওরা আহমদের উম্মত।' মূসা (আ) পুনরায় বললেন, "ফলকে আমি এমন এক উম্মতের উল্লেখ পাচ্ছি, তারা যদি একটি নেক কাজ করতে ইচ্ছে করে অথচ পরবর্তীতে তা করতে না পারে, তাহলে তাদের জন্য একটি নেকী লেখা হবে। আর যদি তা তারা করতে পারে, তাহলে তাদের জন্যে দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত নেকী দেয়া হবে। ওদেরকে আমার উম্মত করে দিন!" আল্লাহ তা'আলা বললেন, "না, ওরা আহমদের উম্মত।" মূসা (আ) পুনরায় বললেন, "আমি ফলকে এমন একটি উম্মতের উল্লেখ

পাচ্ছি যারা অন্যদের জন্যে কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে এবং তাদের সে সুপারিশ কবূলও করা হবে। তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন।" আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, "না, এরা আহমদের উম্মত।"

কাতাদা (র) বলেন, আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অতঃপর মূসা (আ) ফলক ফেলে দিলেন এবং বললেন اللهم اجعلني من امة احمد হে আল্লাহ্! আমাকেও আহমদের উম্মতে শামিল করুন। অনেকেই মূসা (আ)-এর এরূপ মুনাজাত উল্লেখ করেছেন এবং মুনাজাতে এমন বিষয়াদি সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে, যেগুলোর কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বিশুদ্ধ হাদীস ও বাণীসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত এ সংক্রান্ত বিবরণ আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য, তাওফীক, হিদায়াত ও সহায়তা নিয়ে পেশ করব।

হাফিজ আবূ হাতিম মুহাম্মদ ইব্ন হাতিম ইব্ন হিব্বান (র) তাঁর বিখ্যাত 'সহীহ' গ্রন্থে জান্নাতীদের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মূসা (আ)-এর জিজ্ঞাসা সম্পর্কে বলেন ঃ মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, জান্নাতীদের মধ্যে মর্যাদায় সর্বনিম্ন কে? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর এক ব্যক্তি আগমন করবে। তখন তাকে বলা হবে, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে ব্যক্তি বলবে, আমি কেমন করে জান্নাতে প্রবেশ করবো অথচ লোকজন সকলেই নিজ নিজ স্থান করে নিয়েছে ও নির্ধারিত নিয়ামত লাভ করেছে। তাকে তখন বলা হবে যে, যদি তোমাকে দুনিয়ার রাজাদের কোন এক রাজার রাজ্যের সমান জান্নাত দেয়া হয়, তাহলে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে? উত্তরে সে বলবে, 'হ্যাঁ, আমার প্রতিপালক!' তাকে তখন বলা হবে, তোমার জন্যে এটা এটার ন্যায় আরো একটা এবং এটার ন্যায় আরো এক জান্নাত। সে তখন বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি সন্তুষ্ট।' তখন তাঁকে বলা হবে, 'এর সাথে রয়েছে তোমার জন্যে যা তোমার মন চাইবে ও যাতে চোখ জুড়াবে।' মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার কাছে জানতে চান, 'জান্নাতীদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী কে?' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, "তাদের সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলছি, তাদের মর্যাদার বৃক্ষটি আমি নিজ কুদরতী হাতে রোপণ করেছি এবং তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়েছি— তা এমন যা কোন দিন কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং যা কোন আদম সন্তানের কল্পনায় আসেনি।"

এ হাদীসের বক্তব্যের যথার্থতার প্রমাণ বহন করে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতটি ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

অর্থাৎ— "কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর কি লুক্কায়িত রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ।" (৩২ সাজদা ঃ ১৭)

অনুরূপভাবে ইমাম মুসলিম (র) ও ইমাম তিরমিযী (র) সুফিয়ান ইবন উয়াইনা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন, মুসলিমের পাঠ হচ্ছে ঃ فيقال له اترضى অতঃপর তাকে বলা হবে যদি পৃথিবীর কোন রাজার রাজ্যের সমতুল্য তোমাকে দান করা হয় তাতে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে? তখন সে ব্যক্তি বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি এতে সন্তুষ্ট।' আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার জন্যে রয়েছে এটা, এটার অনুরূপ এবং এটার অনুরূপ। এটার অনুরূপ, আরো এটার অনুরূপ

পঞ্চম বারের পর সে ব্যক্তি বলবে ঃ 'হে আমার প্রতিপালক! এটাতে আমি সন্তুষ্ট।' অতঃপর বলা হবে, এটা তো তোমার জন্যে থাকবেই এবং তার সাথে আরো দশগুণ, আর এছাড়াও তোমার জন্যে থাকবে যা তোমার মনে চাইবে ও যাতে তোমার চোখ জুড়াবে।' তখন সে ব্যক্তি বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি সন্তুষ্ট।' আর মূসা (আ) বললেন ঃ 'হে আমার প্রতিপালক! এরাই তাহলে মর্যাদায় সর্বোচ্চ?' তখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, 'তাদের সম্মানের বৃক্ষ আমি নিজ হাতে রোপণ করেছি এবং সম্মানের পরিচর্যার কাজও আমিই সমাপ্ত করেছি। তাদের এত নিয়ামত দেয়া হবে, যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানবহৃদয় এর কল্পনাও করেনি।' ইমাম মুসলিম (র) বলেন, কুরআন মজীদের আয়াতে তার যথার্থতার প্রমাণ রয়েছে। فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ

ইমাম তিরমিযী (র) হাদীসটি 'হাসান' ও সহীহ বলেছেন। কেউ কেউ বলেন, হাদীসটিকে মওকূফ বললেও বিশুদ্ধ মতে তা মারফূ'। ইব্ন হিব্বান (র) তার 'সহীহ' গ্রন্থে মূসা (আ) কর্তৃক তাঁর প্রতিপালককে সাতটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। একদিন মূসা (আ) আপন প্রতিপালকের কাছে ছয়টি বিষয়ে প্রশ্ন করেন, আর এই ছয়টি বিষয় শুধু তাঁরই জন্যে বলে তিনি মনে করেছিলেন। সপ্তম বিষয়টি মূসা (আ) পছন্দ করেননি। মূসা (আ) প্রশ্ন করেন, (১) হে আমার প্রতিপালক! তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেজগার কে? আল্লাহ তা'আলা বললেন ঃ 'যে ব্যক্তি যিকির করে এবং গাফিল থাকে না। (২) মূসা (আ) বলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত কে? আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করে। (৩) মূসা (আ) বলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম বিচারক কে? আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে মানুষের জন্যে সেরূপ বিচারই করে যা সে নিজের জন্যে করে। (৪) মূসা (আ) বলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী কে? আল্লাহ তা'আলা বলেন, এমন জ্ঞানী যে জ্ঞান আহরণে তৃপ্ত হয় না বরং লোকজনের জ্ঞানকে নিজের জ্ঞানের সাথে যোগ করে। (৫) মূসা (আ) বলেন, তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত কে? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে বান্দা প্রতিশোধ গ্রহণের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়। (৬) মূসা (আ) প্রশ্ন করেন ঃ তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক ধনী কে? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'যে বান্দা তাকে যা দেয়া হয়েছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে।' (৭) মূসা (আ) প্রশ্ন করেন ঃ তোমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাধিক দরিদ্র কে? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'মানকূস'—যার মনে অভাববোধ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "বাহ্যিক ধনীকে প্রকৃত পক্ষে ধনী বলা হয় না, অন্তরের ধনীকেই ধনী বলা হয়।" যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার প্রতি কল্যাণ চান, তখন তাকে অন্তরে ধনী হবার এবং হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভয় করার তাওফীক দেন। আর যদি কোন বান্দার অকল্যাণ চান তাহলে তার চোখে দারিদ্রকে প্রকট করে তুলেন। হাদীসে বর্ণিত منقوص শব্দের ব্যাখ্যায় ইব্ন হিব্বান (র) বলেন, এটার অর্থ হচ্ছে তাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে তা সে নগণ্য মনে করে এবং আরো অধিক চায়।

ইব্ন জারীর (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতটুকু বর্ধিত করে বলেন, মূসা (আ) বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক!

তোমার বান্দাদের মধ্যে কে সর্বাধিক জ্ঞানী? আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যে নিজের জ্ঞানের সাথে সাথে লোকজনের জ্ঞানও অন্বেষণ করে। অচিরেই সে একটি উপদেশ বাণী পাবে, যা তাকে আমার হিদায়াতের দিকে পথপ্রদর্শন করবে কিংবা আমার নিষেধ থেকে বিরত রাখবে। মূসা (আ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কি পৃথিবীতে কেউ আছেন? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, 'হ্যাঁ আছে, সে হচ্ছে খিযির।' মূসা (আ) খিযির (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে পথের সন্ধান চান। পরবর্তীতে এর আলোচনা হবে।

ইব্ন হিব্বানের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস— ইমাম আহমদ (র) বলেন, আবূ সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন, "একদিন মূসা (আ) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার মুমিন বান্দা দুনিয়াতে অভাবে-অনটনে দিন যাপন করে। আল্লাহ বলেন, তার জন্যে জান্নাতের একটি দ্বার খুলে দেয়া হবে তা দিয়ে সে জান্নাতের দিকে তাকাবে। 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'হে মূসা! এটা হচ্ছে সেই বস্তু যা আমি তার জন্যে তৈরি করে রেখেছি।" মূসা (আ) বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যত ও পরাক্রমের শপথ, যদি তার দুই হাত ও দুই পা কাটা গিয়ে থাকে এবং তার জন্ম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সে হামাগুড়ি দিয়ে চলে আর এটাই যদি তার শেষ গন্তব্যস্থল হয়, তাহলে সে যেন কোনদিন কোন কষ্টই ভোগ করেনি।" রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, "পুনরায় মূসা (আ) বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার কাফির বান্দা দুনিয়ার প্রাচুর্যের মধ্যে রয়েছে।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তার জন্যে জাহান্নামের একটি দ্বার খুলে দেয়া হবে।' আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মূসা! এটা আমি তার জন্যে তৈরি করে রেখেছি।' মূসা (আ) বলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার ইয্যত ও পরাক্রমের শপথ, তার জন্ম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যদি তাকে পার্থিব সম্পদ দেয়া হত, আর এটাই যদি তার গন্তব্যস্থল হয় তাহলে সে যেন কখনও কোন কল্যাণ লাভ করেনি।" তবে এ হাদীসের সূত্রের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

ইব্ন হিব্বান (র) মূসা (আ) কর্তৃক আপন প্রতিপালকের কাছে 'এমন একটি যিকির প্রার্থনা' শিরোনামে আবূ সাঈদ (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এটি বর্ণনা করেন যে, একদিন মূসা (আ) আরয করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যার মাধ্যমে আমি আপনাকে স্মরণ করতে পারি ও ডাকতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মূসা! তুমি বল, لا اله الا الله মূসা (আ) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আপনার প্রত্যেক বান্দাই তো এই কলেমা বলে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তুমি বল لا اله الا الله মূসা (আ) বললেন, আমি এমন একটি কালেমা চাই যা আপনি আমার জন্যেই বিশেষভাবে দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'হে মূসা! যদি সাত আসমান ও সাত যমীনের বাসিন্দাদেরকে এক পাল্লায় রাখা হয় এবং لا الا الله কলেমাকে অন্য পাল্লায় রাখা হয় তাহলে لا اله الا الله এর পাল্লাটি অপর পাল্লাটি থেকে অধিক ভারী হবে। এই হাদীসের সত্যতার প্রমাণ حديث البطاقة আর অর্থের দিক দিয়ে এ হাদীসের অতি নিকটবর্তী হল নিম্ন বর্ণিত হাদীস যা হাদীসের কিতাবগুলোতে বর্ণিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, 'সর্বোত্তম দু'আ হচ্ছে, আরাফাত ময়দানের দু'আ।'

আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণের সর্বোত্তম বাণী হল ঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شى قدير.

অর্থাৎ— এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনি একক, অংশীদারহীন, তাঁরই জন্য যত প্রশংসা এবং তিনিই সর্বশক্তিমান। اية الكرسى-এর তাফসীর প্রসঙ্গে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-কে প্রশ্ন করলেন, তোমার প্রতিপালক কি ঘুমান? মূসা (আ) বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তখন তার প্রতিপালক তাকে ডেকে বললেন, হে মূসা! তারা তোমাকে প্রশ্ন করেছে— তোমার প্রতিপালক কি ঘুমান? তাই তুমি তোমার দুই হাতে দুইটি বোতল ধারণ কর এবং রাত জাগরণ কর। মূসা (আ) এরূপ করলেন, যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হল, তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন এবং তাঁর মাথা হাঁটুর উপর ঝুঁকে পড়ল। অতঃপর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং বোতল দু'টিকে মজবুত করে ধরলেন। এরপর যখন শেষরাত হলো তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। অমনি তাঁর দুই হাতের দু'টি বোতল পড়ে গেল ও ভেঙ্গে গেল।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে বললেন, 'হে মূসা! যদি আমি নিদ্রাচ্ছন্ন হতাম তাহলে আসমান ও যমীন পতিত হত এবং তোমার হাতের বোতল দু'টির ন্যায় আসমান-যমীন ধ্বংস হয়ে যেত। বর্ণনাকারী বলেন, এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (সা)-এর কাছে আয়াতুল কুরসী নাযিল করেন।

ইব্‌ন জারীর (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন; তিনি বলেন, 'আমি রাসূল (সা)-কে মিম্বরে বসে মূসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "একদিন মূসা (আ)-এর অন্তরে এই প্রশ্ন উদিত হল যে, আল্লাহ্ তা'আলা কি নিদ্রা যান? তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে একজন ফেরেশতাকে পাঠালেন, তিনি তাকে তিন রাত অনিদ্রা অবস্থায় রাখলেন। অতঃপর তাঁকে দুই হাতে দু'টি কাঁচের বোতল দিলেন, আর এই দু'টো বোতলকে সযত্নে রাখার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাঁর ঘুম পেলেই দু'টো হাত একত্র হয়ে যাবার উপক্রম হত এবং তিনি জেগে উঠতেন। অতঃপর তিনি একটিকে অপরটির সাথে একত্রে ধরে রাখতেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। তাঁর দুটো হাত কেঁপে উঠলো এবং দুটো বোতলই পড়ে ভেঙ্গে গেল।" রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর জন্যে এই একটি উদাহরণ বর্ণনা করেন যে, যদি আল্লাহ্ তা'আলা নিদ্রা যেতেন তাহলে আসমান ও যমীনকে ধরে রাখতে পারতেন না।

উপরোক্ত হাদীস মারফূরূপে গরীব পর্যায়ের। তবে খুব সম্ভব এটা কোন সাহাবীর বাণী এবং এর উৎস ইহুদীদের বর্ণনা।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ. خُذُوْا مَا اٰتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ. فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

"স্মরণ কর যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তূরকে তোমাদের ঊর্ধে উত্তোলন করেছিলাম; বলেছিলাম, আমি যা দিলাম দৃঢ়তার সাথে তা গ্রহণ কর এবং তাতে যা রয়েছে তা স্মরণ রাখ। যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার। এটার পরেও তোমরা মুখ ফিরালে! আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা তোমাদের প্রতি না থাকলে তোমরা অবশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে। (সূরা বাকারা ঃ ৬৩ - ৬৪)

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَاَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوْا اَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ. خُذُوْا مَا اٰتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থাৎ— "স্মরণ কর, আমি পর্বতকে তাদের ঊর্ধে উত্তোলন করি। আর তা ছিল যেন এক চাঁদোয়া। তারা ধারণা করল যে, এটা তাদের উপর পড়ে যাবে। বললাম, আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং ওতে যা আছে তা স্মরণ করো, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হও।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৭১)

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) ও প্রাচীন যুগের উলামায়ে কিরামের অনেকেই বলেন, মূসা (আ) যখন তাওরাত সম্বলিত ফলক নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে আগমন করলেন তখন নিজ সম্প্রদায়কে তা গ্রহণ করতে ও শক্তভাবে তা ধরতে নির্দেশ দিলেন। তারা তখন বলল, তাওরাতকে আমাদের কাছে খুলে ধরুন, যদি এর আদেশ নিষেধাবলী সহজ হয় তাহলে আমরা তা গ্রহণ করব। মূসা (আ) বললেন, 'তাওরাতের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা তোমরা কবূল কর, তারা তা কয়েকবার প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেন তারা যেন তূর পাহাড় বনী ইসরাঈলের মাথার উপর উত্তোলন করেন। অমনি পাহাড় তাদের মাথার উপর মেঘখণ্ডের ন্যায় ঝুলতে লাগল, তাদের তখন বলা হল, তোমরা যদি তাওরাতকে তার সব কিছুসহ কবূল না কর এই পাহাড় তোমাদের মাথার উপর পড়বে। তখন তারা তা কবূল করল। তাদেরকে সিজদা করার হুকুম দেয়া হলো, তখন তারা সিজদা করল। তবে তারা পাহাড়ের দিকে আড় নজরে তাকিয়ে রয়েছিল। ইহুদীদের মধ্যে আজ পর্যন্ত এরূপ বলাবলি করে থাকে যে, যে সিজদার কারণে আমাদের উপর থেকে আযাব বিদূরিত হয়েছিল তার থেকে উত্তম সিজদা হতে পারে না।

আবূ বকর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, মূসা (আ) যখন তাওরাতকে খুলে ধরলেন তখন পৃথিবীতে যত পাহাড়, গাছপালা ও পাথর রয়েছে সবই কম্পিত হয়ে উঠল, আর দুনিয়ার বালক বৃদ্ধ নির্বিশেষে যত ইহুদীর কাছে তাওরাত পাঠ করা হল তারা প্রকম্পিত হয়ে উঠল ও মাথা অবনত করল।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ

অর্থাৎ— তোমরা এই মহাপ্রতিশ্রুতি ও বিরাট ব্যাপার দেখার পর তোমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ।

আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় বলেন ঃ

فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

অর্থাৎ— তোমাদের প্রতি রাসূল ও কিতাব প্রেরণের মাধ্যমে যদি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং অনুকম্পা না থাকত তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হতে।

বনী ইসরাঈলের গাভীর ঘটনা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً. قَالُوْا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَاهِىَ. قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ. عَوَانٌ بَيْنَ ذٰلِكَ. فَافْعَلُوْا مَا تُؤْمَرُوْنَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَالَوْنُهَا. قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَاهِىَ اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا. وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُوْنَ. قَالَ اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَاذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَرْثَ. مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيْهَا قَالُوا الْـٰٔنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ. فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ. وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا. وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ. فَقُلْنَا اضْرِبُوْهُ بِبَعْضِهَا كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيَاتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

অর্থাৎ— স্মরণ কর, যখন মূসা (আ) আপন সম্প্রদায়কে বলেছিল। আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবেহ্‌র আদেশ দিয়েছেন। তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছ? মূসা বলল, আল্লাহ্‌র শরণ নিচ্ছি যাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল, ওটা কী রূপ? মূসা বলল, আল্লাহ্ বলেছেন, 'এটা এমন গরু যা বৃদ্ধও নয়, অল্পবয়স্কও নয়— মধ্যবয়সী। সুতরাং তোমরা যা আদিষ্ট হয়েছ তা কর। তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল, এটার রং কি? মূসা বলল, আল্লাহ্ বলছেন, 'এটা হলুদ বর্ণের গরু, এটার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়।' তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল, তা কোন্‌টি? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি এবং আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই আমরা দিশা পাব। মূসা বলল, তিনি বলছেন, ওটা এমন এক গরু যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, সুস্থ ও নিখুঁত। তারা বলল, এখন তুমি সত্য এনেছো যদিও তারা যবেহ্ করতে প্রস্তুত ছিল না, তবুও তারা এটাকে যবেহ্ করল। স্মরণ কর, যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে এবং একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করছিলে।

তোমরা যা গোপন রাখছিলে, আল্লাহ্ তা ব্যক্ত করছেন। আমি বললাম, 'এটার কোন অংশ দ্বারা ওকে আঘাত কর, এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তার নিদর্শন তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন, যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার। (২ ঃ বাকারা ঃ ৬৭ - ৭৩)

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) উবাইদা সালমানী আবুল আলীয়া (র) মুজাহিদ আর সুদ্দী (র) ও প্রাচীনকালের অনেক আলিম বলেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল খুবই ধনী ও অতিশয় বৃদ্ধ। তার ছিল বেশ কয়েকজন ভাতিজা। তারা তার ওয়ারিশ হবার জন্যে তার মৃত্যু কামনা করছিল। তাই একরাতে তাদের একজন তাকে হত্যা করল এবং তার লাশ চৌরাস্তায় ফেলে রেখে এল। আবার কেউ কেউ বলেন, ভাতিজাদের একজনের ঘরের সামনে তা রেখে এল। ভোর বেলায় হত্যাকারী সম্বন্ধে লোকজনের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। তার ঐ ভাতিজা এসে কান্নাকাটি করতে লাগল এবং তার উপরে জুলুম হয়েছে বলে অভিযোগ করতে লাগল। অন্য লোকজন বলতে লাগল, তোমরা কেন ঝগড়া করছ এবং আল্লাহর নবীর কাছে গিয়ে কেন এটার ফয়সালা প্রার্থনা করছ না? তাই মৃত ব্যক্তির ভাতিজা আল্লাহর নবী মূসা (আ)-এর কাছে আগমন করে তার চাচার হত্যার ব্যাপারে অভিযোগ করল। মূসা (আ) তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার শপথ দিয়ে বললেন, কেউ যদি এ বিষয়ে কিছু জানে তাহলে সে যেন বিষয়টি আমাকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন একটি লোকও পাওয়া গেল না, যে এ বিষয়ে জানে। তারা বরং মূসা (আ)-কে অনুরোধ করল তিনি যেন নিজ প্রতিপালককে এই বিষয়ে প্রশ্ন করে তা জেনে নেন। সুতরাং মূসা (আ) আপন প্রতিপালকের নিকট তা জানতে চান।

আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে হুকুম দিলেন; যাতে তিনি তাদেরকে একটি গাভী যবেহ্ করতে আদেশ করেন। তিনি বললেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً قَالُوْا اَتَتَّخِذُوْنَا هُزُوًا.

অর্থাৎ - "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে একটি গরু যবেহ্ করার নির্দেশ দিয়েছেন।" তারা প্রতি উত্তরে বলল, তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ? অর্থাৎ আমরা তোমাকে নিহত ব্যক্তি প্রসঙ্গে প্রশ্ন করছি আর তুমি আমাদের গরু যবেহ্ করার পরামর্শ দিচ্ছ? মূসা (আ) বললেন, আমার কাছে প্রেরিত ওহী ব্যতীত অন্য কিছু বলার ব্যাপারে আমি আল্লাহ্ তা'আলার শরণ নিচ্ছি। তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে প্রশ্ন করার জন্যে আবেদন করেছ, আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্নের উত্তরে এটা বলেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা), উবায়দা, মুজাহিদ, ইকরিমা, আবুল আলীয়া প্রমুখ বলেছেন, যদি তারা যে কোন একটি গাভী যবেহ্ করত তাহলে তার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হত। কিন্তু তারা ব্যাপারটি জটিল করাতে তাদের কাছে এটা জটিল আকার ধারণ করেছিল। একটি মারফূ হাসীসে এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে তবে এটার সূত্রে কিছু ত্রুটি রয়েছে। অতঃপর তারা গরুটির গুণাগুণ, রঙ ও বয়স সম্পর্কে প্রশ্ন করল এবং তাদেরকে প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এমনভাবে জবাব দেয়া হল যে, এরূপ গরু খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। তাফসীর গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বস্তুত তাদেরকে একটি মধ্য বয়সী গরু যবেহ্ করার জন্যে হুকুম দেয়া হয়েছিল। অন্য কথায়, এটা বৃদ্ধও নয়, আবার অল্প বয়সীও নয়।

এই অভিমতটি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা), মুজাহিদ, আবুল আলীয়া, ইকরামা, হাসান, কাতাদা (র) প্রমুখ তাফসীরবিদের। তারপর তারা নিজেদের জন্য সংকীর্ণতা ও জটিলতা ডেকে আনল। তারা গরুটির রং সম্বন্ধে প্রশ্ন করল। তাই তাদেরকে এমন লোহিতাভ হলুদ রং-এর কথা বলা হল, যা দর্শকদেরও আনন্দ দেয়। এই রংটি একান্তই দুর্লভ। এরপর তারা আরো সংকীর্ণতা ও জটিলতা সৃষ্টি করে বলল, 'হে মূসা! তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল যে, তা কোন্‌টি? আমরা গরুটি সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হয়েছি এবং আল্লাহ্ ইচ্ছে করলে নিশ্চয়ই আমরা দিশা পাব।' এই প্রসঙ্গে ইব্‌ন আবূ হাতিম (র) ও ইব্‌ন মারদুওয়েহ্ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বরাতে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, ইসরাঈল যদি গরু সম্বন্ধে পরিচিতি লাভ করার ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ্ না বলত তাহলে কখনও তাদেরকে এ কাজ সম্পাদন করার জন্যে তাওফীক দেয়া হত না। তবে এ হাদীসের বিশুদ্ধতা সন্দেহমুক্ত নয়। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিকতর জ্ঞাত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ.

অর্থাৎ— মূসা বলল, তিনি বলছেন, ওটা এমন এক গরু যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি। সুস্থ, নিখুঁত। তারা বলল, এখন তুমি সত্য এনেছ। যদিও তারা যবেহ্ করতে উদ্যত ছিল না। তবুও তারা তা যবেহ্ করল। (সূরা ঃ বাকারা ঃ ৬৮ - ৭১)

উক্ত আয়াতে আরোপিত এ বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্বের বৈশিষ্ট্যগুলোর তুলনায় আরো দুষ্প্রাপ্য ছিল। কেননা এতে শর্ত আরোপ করা হয়েছে যেন গরুটি জমি চাষ ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার ফলে দুর্বল ও অসুস্থ না হয়ে থাকে, এবং তা যেন সুস্থ, সবল ও নিখুঁত হয়। এটি আবুল আলীয়া ও কাতাদা (র)-এর অভিমত। আয়াতে উক্ত لَا شِيَةَ فِيهَا এর অর্থ হচ্ছে এটার মধ্যে নিজস্ব রঙ ব্যতীত এতে যেন অন্য কোন রঙ এর মিশ্রণ না থাকে। বরং এটা যাবতীয় দোষ ও অন্য সব রঙয়ের মিশ্রণ থেকে যেন নিখুঁত হয়। যখন গরুটিতে উল্লেখিত শর্ত ও গুণসমূহ আরোপিত করা হল তখন তারা বলল, এখন তুমি সত্য এনেছ। কথিত আছে যে, তারা এসব গুণবিশিষ্ট গরুটি খোঁজাখুঁজি করে এমন এক ব্যক্তির কাছে এটাকে পেয়েছিল, যে ছিলেন অত্যন্ত পিতৃভক্ত। তারা তার কাছ থেকে গরুটি কিনতে চাইল, কিন্তু সে তাদের কাছে গরুটি বিক্রি করতে রাজি হল না। তারা তাকে অত্যন্ত চড়ামূল্য দিয়ে গরুটি খরিদ করল।

সুদ্দী (র) উল্লেখ করেছেন, তারা প্রথমত গরুটির সম-ওজনের স্বর্ণ দিয়ে গরুটি ক্রয় করতে চায়। কিন্তু গরুর মালিক রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তার ওজনের দশগুণ স্বর্ণ দিয়ে তারা গরুটি খরিদ করল। অতঃপর আল্লাহ্‌র নবী মূসা (আ) এটাকে যবেহ করার নির্দেশ দিলেন। তারা গরুটি যবেহ করার ব্যাপারে প্রথমত ইতস্তত করছিল। পরে রাজি হল। এরপর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে হুকুম আসল যেন তারা নিহত ব্যক্তিটিকে যবেহ কৃত গরুটির কোন অঙ্গ দ্বারা আঘাত করে। কেউ কেউ বলেন, উরুর গোশত দ্বারা আঘাত করার কথা বলা হয়েছিল; আবার কেউ কেউ কোমলাস্থি দ্বারা, আবার কেউ কেউ দুই কাঁধের মধ্যবর্তী গোশত দ্বারা আঘাত

করার কথা বলা হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেন। যখন তারা মৃত ব্যক্তিকে ওটার দ্বারা আঘাত করল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পুনর্জীবিত করলেন এবং লোকটি উঠে দাঁড়াল। তার গলার শিরা থেকে রক্ত ঝরছিল। মূসা (আ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তোমাকে হত্যা করেছে?' সে বলল, 'আমার ভাতিজা।' তার পর সে পূর্বের মত অবস্থায় ফিরে গেল.

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كَذٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ.

'এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তার নিদর্শন তোমাদের দেখিয়ে থাকেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।' অর্থাৎ তোমরা যেমন আল্লাহ্ তা'আলার হুকুমে নিহত ব্যক্তির পুনর্জীবিত হওয়া প্রত্যক্ষ করলে, তেমনি আল্লাহ তা'আলা এক মুহূর্তে সমস্ত মৃতকে যখন ইচ্ছে তখন জীবিত করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ -

অর্থাৎ—তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ।

মূসা (আ) ও খিযির (আ)-এর ঘটনা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ لَآ اَبْرَحُ حَتّٰىٓ اَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ
حُقُبًا. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِي الْبَحْرِ
سَرَبًا. فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتٰهُ اٰتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا
نَصَبًا. قَالَ اَرَاَيْتَ اِذْ اَوَيْنَآ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ وَمَآ
اَنْسَانِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ عَجَبًا. قَالَ ذٰلِكَ
مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلٰٓى اٰثَارِهِمَا قَصَصًا. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ
رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا. قَالَ لَهٗ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰٓى
اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا . وَكَيْفَ
تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا.

قَالَ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَآ اَعْصِىْ لَكَ اَمْرًا. قَالَ فَاِنِ
اتَّبَعْتَنِىْ فَلَا تَسْاَلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰىٓ اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. فَانْطَلَقَا حَتّٰىٓ
اِذَا رَكِبَا فِى السَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا. قَالَ اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا
اِمْرًا. قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِىَ صَبْرًا. قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا
نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِىْ مِنْ اَمْرِىْ عُسْرًا. فَانْطَلَقَا حَتّٰىٓ اِذَا لَقِيَا غُلٰمًا فَقَتَلَهٗ
قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْـًٔا نُّكْرًا. قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ
اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا. قَالَ اِنْ سَاَلْتُكَ عَنْ شَىْءٍۢ بَعْدَهَا فَلَا
تُصٰحِبْنِىْ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّىْ عُذْرًا.

فَانْطَلَقَا حَتّٰىٓ اِذَآ اَتَيَآ اَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَآ اَهْلَهَا فَاَبَوْا اَنْ يُّضَيِّفُوْهُمَا
فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُّرِيْدُ اَنْ يَّنْقَضَّ فَاَقَامَهٗ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ

أَجْرًا. قَالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا. أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ فَأَرَدْتُّ أَنْ أَعِيْبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكٰوةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا.

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَّبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِىْ ذٰلِكَ تَأْوِيْلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَّلَيْهِ صَبْرًا.

'স্মরণ কর, যখন মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছে আমি থামব না। অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। তারা উভয়েই যখন দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে পৌঁছল তারা নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল. এটা সুড়ংগের মত পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। যখন তারা আরো অগ্রসর হলো, মূসা তার সঙ্গীকে বলল, 'আমাদের সকালের নাশ্‌তা নিয়ে এসো, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' সঙ্গী বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই এটার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সমুদ্রে নেমে গেল। মূসা বলল, আমরা তো সেই স্থানটিরই অনুসন্ধান করছিলাম। তারপর তারা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চলল। তারপর তারা সাক্ষাৎ পেল, আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের, যাকে আমি আমার কাছ থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার কাছ থেকে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।

মূসা তাকে বলল, সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা হতে আমাকে শিক্ষা দেবেন, এই শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি? সে বলল, আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না, যে বিষয়ে আপনার জ্ঞানায়ত্ত নয় সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে? মূসা বলল, আল্লাহ্ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না। সে বলল, 'আচ্ছা আপনি যদি আমার অনুসরণ করবেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি।' তারপর উভয়ে চলতে লাগল, 'পরে তারা যখন নৌকায় আরোহণ করল, তখন সে ওটা বিদীর্ণ করে দিল। মূসা বলল, আপনি কি আরোহীদের নিমজ্জিত করে দেবার জন্যে এটা বিদীর্ণ করলেন? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।' সে বলল, 'আমি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না?' মূসা বলল, আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।

তারপর উভয়ে চলতে লাগল। চলতে চলতে ওদের সাথে এক বালকের সাক্ষাত হলে সে তাকে হত্যা করল। তখন মূসা বলল, 'আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন, হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।' সে বলল, 'আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না ?' মূসা বলল, 'এটার পর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না, আমার ওযর আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে।' তারপর উভয়ে চলতে লাগল, চলতে চলতে তারা এক জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাদ্য চাইল, কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করলো। তারপর তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল এবং সে এটাকে সুদৃঢ় করে দিল। মূসা বলল, 'আপনি তো ইচ্ছে করলে এটার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।' সে বলল, 'এখানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল; যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।'

নৌকাটির ব্যাপার—এটা ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির, ওরা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত; আমি ইচ্ছা করলাম নৌকাটিকে ত্রুটিযুক্ত করতে। কারণ, তাদের সম্মুখে ছিল এক রাজা যে বলপ্রয়োগে সকল নৌকা ছিনিয়ে নিত। আর কিশোরটি—তার পিতামাতা ছিল মু'মিন। আমি আশঙ্কা করলাম যে, সে বিদ্রোহাচরণ ও কুফরীর দ্বারা তাদেরকে বিব্রত করবে। তারপরে আমি চাইলাম যে, ওদের প্রতিপালক যেন ওদেরকে তার পরিবর্তে এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর। আর ঐ প্রাচীরটি—এটা ছিল নগরবাসী দুই পিতৃহীন কিশোরের, এর নিম্নদেশে আছে ওদের গুপ্তধন এবং ওদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনার প্রতিপালক দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছা করলেন যে, ওরা বয়ঃপ্রাপ্ত হউক এবং ওরা ওদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক। আমি নিজ থেকে কিছু করিনি, আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণে অপারক হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা। (সূরা কাহাফ ঃ ৫৯-৮২)

কোন কোন কিতাবী বলে যে, খিযির (আ)-এর কাছে যে মূসা (আ) গমন করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন মূসা (আ) ইবন মীশা ইবন ইউসুফ (আ) ইবন ইয়াকূব (আ) ইবন ইসহাক (আ) ইবন ইব্রাহীম আল খলীল (আ)। এ সব কিতাবীর অভিমতের সমর্থন করে যারা তাদের কিতাব ও বই-পুস্তক থেকে তথ্যাদি উদ্ধৃত করে থাকে, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন নূপ ইবন ফুআলা আল হেমইয়ারী আশ-শামী, আল বুকালী। কথিত আছে যে, তিনি ছিলেন দামিশকের অধিবাসী। তাঁর মাতা হচ্ছেন কা'ব আহবারের স্ত্রী। বাহ্যত কুরআনের পূর্বাপর বর্ণনা ও সর্বজন গৃহীত বিশুদ্ধ হাদীসের স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মূসা (আ) ইবন ইমরানই হচ্ছেন বনী ইসরাঈলের কাছে প্রেরিত মূসা (আ)।

ইমাম বুখারী (র) বলেন, সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেছেন—একদিন আমি ইবন আব্বাস (রা)-কে বললাম যে, নূফ আল বুকালীর ধারণা যে, খিযির (আ)-এর সাথে যে মূসা (আ) সাক্ষাত করেছিলেন তিনি বনী ইসরাঈলের মূসা (আ) নন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, "আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে।" উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন যে, একদিন মূসা (আ) ইসরাঈলীদের কাছে বক্তব্য রাখছিলেন। এমন সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হল যে, মানব জাতির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী কে ? তিনি বললেন 'আমি'। যেহেতু জ্ঞানকে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দিকে সম্পর্কিত করেন নি তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে

ভর্ৎসনা করলেন। তাঁর কাছে আল্লাহ্ তা'আলা এ মর্মে ওহী প্রেরণ করেন যে, দুই সমুদ্রের সংগমস্থলে আমার এক বান্দা রয়েছে যিনি তোমার চাইতে অধিক জ্ঞানী। মূসা (আ) বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমি কেমন করে তার কাছে পৌঁছতে পারব?" আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, 'একটি মাছ সাথে নিয়ে তা থলেতে পুরে নাও। যেখানেই মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই তাকে পাওয়া যাবে।' তিনি একটি মাছ নিয়ে তা একটি থলে পুরে নিলেন। তারপর তিনি চলতে লাগলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদিম ইউশা ইবন নূনও ছিলেন। যখন তাঁরা শৈলশীলার কাছে পৌঁছলেন, তখন তাঁরা তাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। মাছটি লাফ দিয়ে থলে থেকে বের হয়ে গেল এবং সুড়ঙ্গের পথ করে সাগরে নেমে গেল।

আল্লাহ তা'আলা মাছের যাত্রাপথের পানি ঠেকিয়ে রাখলেন, যাতে সুড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। মূসা যখন জাগলেন, তখন খাদিম মাছটি সম্বন্ধে তাঁকে অবহিত করতে ভুলে গেলেন এবং তাঁরা বাকি দিন ও রাত পথ চলতে লাগলেন। পরদিন সকালে মূসা (আ) তাঁর খাদিমকে বলেন, 'আমাদের প্রাতঃরাশ আন, আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' যে স্থানে পৌঁছার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে হুকুম দিয়েছিলেন সে স্থান অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোন ক্লান্তি বোধ করেননি। খাদিম মূসা (আ)-কে বললেন, "আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আমরা যখন শিলাখণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই এটার কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে সাগরে নেমে যায়।" অর্থাৎ মাছটি পথ করে সমুদ্রে নেমে যাওয়ায় দু'জনই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। মূসা (আ) বললেন, 'আমরা তো সেই স্থানটিরই অন্বেষণ করছিলাম।'

তারপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন ধরে ফিরে চললেন এবং পাথরটির কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তাঁরা সেখানে একজন বস্ত্রাবৃত লোককে দেখতে পান। মূসা (আ) তাঁকে সালাম দিলেন, তখন ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ খিযির (আ) বললেন, আপনার এ জনপদে সালাম আসল কোত্থেকে? মূসা (আ) বললেন, আমি মূসা। তিনি প্রশ্ন করলেন, বনী ইসরাঈলের মূসা (আ)? মূসা (আ) বললেন, হ্যাঁ, তাই। সত্যের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন এজন্য আমি আপনার কাছে এসেছি। খিযির (আ) বললেন, "হে মূসা (আ)! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জ্ঞান থেকে আমাকে একটি বিশেষ জ্ঞান প্রদান করেছেন, যা আপনার অজ্ঞাত। অনুরূপভাবে আপনাকে এমন একটি জ্ঞান দান করেছেন যা আমার অজ্ঞাত। তাই আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।"

হযরত মূসা (আ) খিযির (আ)-কে বললেন, "আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।" খিযির (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, 'যদি আপনি আমার অনুকরণ করেনই, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি।' তারপর উভয়ে সাগরের তীর ধরে চলতে লাগলেন এবং একটি নৌকার দেখা পেলেন। নৌকার মালিকদের সাথে পারাপারের ব্যাপারে আলোচনা করলেন। নৌকার মালিকগণ খিযির (আ)-কে চিনতে পারলেন এবং ভাড়া না নিয়েই তাদেরকে পার করে দিলেন। যখন তারা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন, খিযির (আ) কিছুক্ষণের মধ্যে কুঠার দ্বারা নৌকার একটি কাঠ খুলে ফেললেন। তখন মূসা (আ) তাঁকে

বললেন, 'এরা বিনাভাড়ায় আমাদেরকে পার করে দিলেন আর আপনি আরোহীদেরকে নিমজ্জিত করার জন্যে নৌকাটিকে বিদীর্ণ করে দিলেন! আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন!" তিনি মূসা (আ)-কে বললেন, "আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না?" মূসা (আ) বললেন, "আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী ঠাওরাবেন না এবং আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।"

রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, "প্রথম বারের প্রশ্নটি মূসা (আ) হতে ভুলক্রমে সংঘটিত হয়েছিল।" রসূলুল্লাহ (সা) আরো বলেন, এমন সময় একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক পাশে বসল তারপর ঠোঁট দিয়ে পানি উঠাল। তখন খিযির (আ) মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, "আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় আমার ও আপনার জ্ঞানের পরিমাণ হচ্ছে সাগর থেকে নেয়া চড়ুই পাখির এক বিন্দু পানির মত।" তারা উভয়ে নৌকা থেকে অবতরণের পর সাগরের কূল ঘেঁষে চলতে লাগলেন। অতঃপর খিযির (আ) এক বালককে দেখতে পেলেন। সে অন্যান্য বালকের সাথে খেলাধুলা করছিল। খিযির (আ) কিশোরটির মাথা ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। এভাবে তাকে তিনি হত্যা করলেন। মূসা (আ) তখন তাঁকে বললেন, "আপনি কি এক নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন, হত্যার অপরাধ ছাড়াই? আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন!" তিনি বললেন, "আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না?"

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, এবারের প্রশ্নটি উত্থাপন ছিল পূর্বের বারের চেয়ে গুরুতর। তাই মূসা (আ) বললেন, এটার পর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে আপনি আমাকে সঙ্গে রাখবেন না। আমার ওযর আপত্তির চূড়ান্ত হয়েছে। অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তাঁরা এক জনপদের আধিবাসীদের নিকট পৌঁছে তাদের কাছে খাদ্য চাইলেন। কিন্তু তারা এঁদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা তথায় এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন, তখন খিযির (আ) তা সুদৃঢ় করে দিলেন। তখন মূসা (আ) বললেন, "তারা এমন একটি সম্প্রদায় যাদের কাছে আমরা আগমন করলাম, তারা আমাদেরকে না দিল খাদ্য, না করল মেহমানদারী, আপনি তো ইচ্ছে করলে এটার জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন।" খিযির (আ) বললেন, "এখানেই আপনার এবং আমার মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হল। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেন নি আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি।"

রসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, 'আমাদের এটা পছন্দনীয় ছিল যে, মূসা (আ) যদি ধৈর্যধারণ করতেন, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে আমাদেরকে আরও অনেক ঘটনা শুনাতেন। সাঈদ ইবন জুবায়র (র) বলেন, উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত আয়াতাংশ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا-এর স্থলে আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) পাঠ سَفِينَة শব্দটির সাথে صالحة বিশেষণ সহকারে পাঠ করতেন। পুনরায় আয়াতাংশ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ-এর সাথে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) পড়তেন। وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ : শব্দটি যোগ করে পড়তেন। হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, সে ছিল কাফির। বুখারী শরীফে সুফয়ান ইবন উয়ায়না (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ

বর্ণনা রয়েছে। তবে এতে অতিরিক্ত রয়েছে, মূসা (আ) সফরে বের হয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে ছিলেন ইউশা 'ইবন নূন এবং তাঁদের সাথে ছিল একটি মাছ। অতঃপর তাঁরা উভয়ে একটি পাথরের কাছে পৌঁছলেন এবং দুজনেই পাথরের নিকট অবতরণ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'মূসা (আ) পাথরের উপর তাঁর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। পাথরের উপর ছিল একটি প্রস্রবণ, যাকে الحياة বলা হত। কোন কিছুর মধ্যে ঐ প্রস্রবণের পানি পড়লে ঐ বস্তুটি জীবিত হয়ে যেত। ভুনা মাছটির উপরও উক্ত প্রস্রবণ থেকে পানি পড়েছিল। তাই মাছটি নড়ে উঠল, থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে পড়ে গেল। অতঃপর যখন মূসা (আ) জেগে উঠলেন, তখন খাদিমকে বললেন, আমাদের নাশতা নিয়ে এস। আমরা তো আমাদের এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তারপর হাদীসটির বাকি অংশ বর্ননা করা হয়েছে। উক্ত হাদীসে আরো আছে, তিনি বলেন, নৌকার একপাশে একটি চড়ুই পাখি এসে বসল; সমুদ্রে তার ঠোঁট ডুবাল। তখন খিযির (আ) মূসা (আ)-কে বললেন, "আমার, আপনার এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এই চড়ুই পাখির সমুদ্রে ডুবানো ঠোঁটের মাধ্যমে সংগৃহীত এক বিন্দু পানির ন্যায় নগণ্য। আতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ইমাম বুখারী (র) অন্য একটি সূত্রেও সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেন, 'একদিন আমরা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর ঘরে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তিনি বললেন, "তোমরা আমাকে যে কোন প্রশ্ন করতে পার।" আমি বললাম, হে আবূ আব্বাস (রা)! আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্যে আমাকে উৎসর্গ করে দিন, কূফাতে একজন বক্তা আছে, তাকে বলা হয় নূফ। তার ধারণা যে, খিযির (আ)-এর সাথে যার ঘটনা ঘটেছে তিনি বনী ইসরাঈলের মূসা (আ) নন। বর্ননাকারী আমরের মতে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, "আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলেছে।" বর্ণনাকারী ইয়ালা (র)-এর মতে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, আমাকে উবাই ইবন কা'ব (রা) বলেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহর রাসূল মূসা (আ) একদিন জনগণকে নসীহত করছিলেন, তাতে চোখে পানি এসে গিয়েছিল এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হয়ে গিয়েছিল। মূসা (আ) যখন স্থান ত্যাগ করছিলেন অমনি এক ব্যক্তি তাঁকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর যমীনে কি কেউ আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী রয়েছেন ?" তিনি প্রতি উত্তরে বললেন "না"। জ্ঞানকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্পর্কিত না করায় আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে ভর্ৎসনা করেন। মূসা (আ)-কে বলা হল, "হ্যাঁ রয়েছে।" মূসা (আ) বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! তিনি কোথায় আছেন?" আল্লাহ তাআলা বললেন, "দুই সমুদ্রের সংগমস্থানে।" মূসা (আ) বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি চিহ্ন নির্দেশ করুন যা দিয়ে আমি তাঁকে চিনে নিতে পারব।" তিনি বললেন, "যেখানে মাছটি তোমার নিকট থেকে পৃথক হয়ে যাবে।"

ইয়ালা (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'একটি ভুনা মাছ সাথে নিয়ে নাও। যেখানেই তাতে প্রাণ সঞ্চার করা হবে সেখানেই তুমি খিযির (আ)-কে পাবে।' মূসা (আ) একটি মাছ নিয়ে একটি থলে রাখলেন। অতঃপর আবার খাদেমকে বললেন, "আমি তোমাকে অন্য কোন দায়িত্ব দিয়ে কষ্ট দেব না, তুমি শুধু যেখানে মাছটি আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে সে জায়গাটি সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করবে।" খাদেম ইউশা (আ) বললেন, এটাতো আর তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ অর্থাৎ

'স্মরণ কর, যখন মূসা (আ) আপন খাদেম ইউশা ইবন নূন-কে বললেন।' সাঈদ (রা) ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, ইউশা (আ) একটি পরিষ্কার জায়গায় পাথরের ছায়ায় অবস্থান করছিলেন এবং মূসা (আ) নিদ্রিত ছিলেন। মাছটি নড়ে উঠল, ইউশা (আ) মনে মনে বললেন, নিজে না জেগেওঠা পর্যন্ত আমি মূসা (আ)-কে জাগাব না বরং জেগে উঠলে তাঁর কাছে মাছের ঘটনাটি বলব। কিন্তু পরে তিনি তা বলতে ভুলে গেলেন। এদিকে মাছটি নড়াচড়া করতে করতে সাগরে নেমে গেল। আল্লাহর হুকুমে মাছের নির্গমন জায়গায় পানির চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। পাথরের মধ্যেও মাছের কিছু চিহ্ন রয়ে যায়। বর্ণনাকারী আমর সেই চিহ্নের প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার পাশের দুইটি আঙ্গুলের দ্বারা বৃত্ত তৈরি করে দেখালেন।

অতঃপর মূসা (আ) বললেন ঃ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا

'আমরা এ সফরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' এ পর্যন্ত তোমা থেকে আল্লাহ তা'আলা ভ্রমণের কষ্ট দূর করে রেখেছিলেন। উভয়ে ফিরে চললেন এবং খিযির (আ)-কে পেয়ে গেলেন। উসমান ইবন আবূ সুলাইমান (র) বলেন, খিযির (আ) সমুদ্রের বুকে একটি সবুজ রংয়ের চাটাইয়ের উপর ছিলেন। সাঈদ (রা) বলেন, তিনি তার কাপড়ে আবৃত অবস্থায় ছিলেন। কাপড়ের একপ্রান্ত ছিল তাঁর দুই পায়ের নিচে এবং অপরপ্রান্ত ছিল তাঁর মাথার নিচে। মূসা (আ) তাঁকে সালাম করলেন। তখন তিনি চেহারা থেকে কাপড় সরালেন এবং বললেন, "এ অঞ্চলে কি সালামের প্রথা আছে? আপনি কে?" মূসা (আ) বললেন, "আমি মূসা।" তিনি বললেন, 'বনী ইসরাঈলের মূসা?' মূসা (আ) বললেন, 'হ্যাঁ'। খিযির (আ) বললেন, "ব্যাপার কী? আপনি কেন এসেছেন?" মূসা (আ) বললেন, 'আপনি যে জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছেন তার থেকে আপনি আমাকে কিছু শিখাবেন এজন্যই আমি এখানে এসেছি।' আপনার হাতে তৌরাত রয়েছে তা কি যথেষ্ট নয়? হে মূসা (আ)! আপনার কাছে তো আল্লাহ্‌র ওহী আসে। আমার কাছে এক প্রকার জ্ঞান রয়েছে যা শিক্ষা করা আপনার পক্ষে সমীচীন নয়। অন্যদিকে আপনার কাছে এমন জ্ঞান রয়েছে যা আমাকে মানায় না।

এমন সময় একটি পাখি তার ঠোঁট দ্বারা সমুদ্র থেকে এক বিন্দু পানি উঠাল। খিযির (আ) বললেন, "আল্লাহর শপথ, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের তুলনায় আমার ও আপনার জ্ঞানের পরিমাণ হচ্ছে সমুদ্র থেকে উঠানো পাখির ঠোঁটের এ পানির বিন্দুর মত। যখন তাঁরা উভয়ে নৌকায় আরোহণ করলেন তখন তাঁরা দেখলেন, ছোট ছোট ফেরী নৌকা রয়েছে, যেগুলো লোকদেরকে নদী পারাপার করে। তারা খিযির (আ)-কে চিনতে পেরে বলে উঠল ঃ "ইনি তো আল্লাহ্‌র পুণ্যবান বান্দা।" বর্ণনাকারী বলেন, আমরা সাঈদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তিনি কি খিযির (আ)? তিনি বললেন 'হ্যাঁ'। তারা আরো বলল, তাঁর কাছ থেকে আমরা ভাড়া গ্রহণ করব না। খিযির (আ) নৌকাটিকে ফুটো করে দিলেন এবং এতে একটি পেরেক ঠুকে দিলেন। মূসা (আ) বললেন, "আপনি কি আরোহীদেরকে ডুবিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে ফুটো করে দিলেন ? আপনি তো একটা গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন।"

মুজাহিদ (র) বলেন, আয়াতে উল্লেখিত ।امر। শব্দটির অর্থ হচ্ছে منكر অর্থাৎ অন্যায় কাজ। খিযির (আ) বললেন, "আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সঙ্গে কিছুতেই ধৈর্যধারণ

করে থাকতে পারবেন না?" প্রথম প্রশ্নটি ছিল ভুলক্রমে, দ্বিতীয়টি ছিল শর্ত হিসেবে আর তৃতীয়টি ছিল ইচ্ছাকৃত। মূসা (আ) বললেন, "আমার ভুলের জন্যে আমাকে অপরাধী ঠাওরাবেন না ও আমার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা অবলম্বন করবেন না।" তারপর উভয়ে চলতে লাগলেন, চলতে চলতে তাঁদের সাথে এক বালকের সাক্ষাত হলে তিনি তাকে হত্যা করলেন। বর্ণনাকারী ইয়ালা (র) বলেন, সাঈদ (রা) বলেছেন, তিনি অনেকগুলো ছেলেকে খেলারত অবস্থায় পেলেন, তাদের মধ্য থেকে তিনি একটি চটপটে কাফির বালককে শোয়ালেন এবং ছুরি দ্বারা যবেহ্ করে ফেললেন। মূসা (আ) বললেন, "আপনি একটি নিষ্পাপ জীবন নাশ করলেন, যে এখনও কোন নোংরা কাজ করেনি!" ইবন আব্বাস (রা) আয়াতে উল্লেখিত نَفْسًا زَكِيَّةً-কে – نفسا ذاكية مسلمة পাঠ করেছেন অর্থাৎ নিষ্পাপ ও মুসলিম পবিত্রাত্মা বালক। অতঃপর উভয়ে চলতে লাগলেন এবং তাঁরা একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। তিনি এটাকে সুদৃঢ় করে দিলেন। বর্ণনাকারী হাত উঠিয়ে বলেন, খিযির (আ) এভাবে হাত উঠালেন এবং এতে প্রাচীরটি ঠিক হয়ে গেল। বর্ণনাকারী ইয়ালা বলেন, আমার ধারণা সাঈদ (র) বলেছেন, "খিযির (আ) প্রাচীরটিকে আপন হাত দ্বারা স্পর্শ করলেন। অমনিতেই এটা সুদৃঢ় হয়ে গেল।" মূসা (আ) বললেন, 'আপনি তো ইচ্ছা করলে এটার জন্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতেন, যা আমরা খেতে পারতাম।' আয়াতে উল্লেখিত ঃ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ (তাদের পেছনে) কে ইবন আব্বাস (রা) امامهم- (তাদের সামনে) পড়েছেন। সাঈদ (র) ব্যতীত অন্য মুফাস্সিরগণ বলেন, উল্লেখিত বাদশার নাম ছিল ঃ (هددبن بدد) (হাদাদ ইবন বাদাদ)। আর নিহত কিশোরটির নাম ছিল জায়সূর।

বাদশা'র সামনে দিয়ে যখন কোন খুঁত বিশিষ্ট নৌকা অতিক্রম করত তখন সে এটাকে খুঁতের কারণে ছেড়ে দিত এবং তারপর এ স্থান অতিক্রম করার পর মালিকের খুঁত সারিয়ে নিয়ে নৌকাকে কাজে লাগাত। তাফসীরকারদের কেউ কেউ বলেন, 'নৌকার ছিদ্রটি বন্ধ করা হয়েছিল কাঁচের দ্বারা।' আবার কেউ কেউ বলেন, আলকাতরা দিয়ে। কিশোরটির পিতামাতা ছিলেন মু'মিন বান্দা কিন্তু কিশোরটি নিজে ছিল কাফির। খিযির (আ) বলেন, তাই আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, তার প্রতি বাৎসল্যের কারণে পিতামাতা তার ধর্মের অনুসারী হয়ে পড়বেন। এজন্যেই আমি চেয়েছিলাম যে, তাদেরকে প্রতিপালক যেন ওর পরিবর্তে এমন এক সন্তান দান করেন, যে হবে পবিত্রতায় মহত্তর ও ভক্তি-ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর। সাঈদ ইবন জুবায়র (র)-এর ধারণা, 'সন্তানটি ছিল বালক, মেয়ে নয়।' দাউদ ইবন আবূ আসিম (র) অসংখ্য তাফসীরকারের থেকে বর্ণনা করেন যে, সন্তানটি ছিল বালিকা।

আবদুর রাজ্জাক (র) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে এবং মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (র) উবাই ইবন কা'ব সূত্রে অন্যরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যুহরী (র) আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 'একদিন তিনি ও হুর ইবন কায়স ইবন হাসন ফারাবী মূসা (আ)-এর সঙ্গী সম্পর্কে বিতর্কে রত ছিলেন। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, 'তিনি ছিলেন খিযির (আ)।' এমন সময় উবাই ইবন কা'ব (রা) তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। ইবন আব্বাস (রা) তাঁকে ডাকলেন এবং বললেন, আমি ও আমার এই সঙ্গী মূসা (আ)-এর সঙ্গী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছি, যাঁর সাথে সাক্ষাত করার

জন্যে মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট পথের সন্ধান চেয়েছিলেন। আপনি কি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। এরপর হাদীসের বাকি অংশটুকু বর্ণনা করেন। হাদীসের বিস্তারিত বর্ণনা বিভিন্ন সনদ সহকারে সূরায়ে কাহাফের তাফসীরে আমি বর্ণনা করেছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র।

আয়াতাংশ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا -এ উল্লেখিত ইয়াতীমদের সম্পর্কে সুহায়লী (র) বলেন, তারা ছিল কাশিহ্-এর দুই ছেলে আসরাম ও সুরাইম। আয়াতে উল্লেখিত কান্‌য (كنز) ছিল অর্থ স্বর্ণ। এটা ইকরিমা (র)-এর অভিমত। আবার আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, (كنز)-এর অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। অধিক গ্রহণীয় অভিমত অনুসারে এটার অর্থ হচ্ছে, জ্ঞানের বাণী সম্বলিত একটি স্বর্ণের পাত। বায্‌যার (র) আবূযর (রা)-এর সূত্রে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে যে كنز–এর কথা উল্লেখ করেছেন তা ছিল একটি নিরেট সোনার পাত।

তাতে লিখা ছিল ঃ

عجبت لمن ايقن بالقدر كيف نصب وعجبت لمن ذكر النار لما ضحك وعجبت لمن ذكر الموت كيف غفل لا اله الا الله.

অর্থাৎ—"তকদীরে বিশ্বাসী লোক কী করে ব্যতিব্যস্ত হয়, সে জন্যে বিস্মিত হই, দোযখের কথা মনে রেখেও যে ব্যক্তি হাসতে পারে তার জন্যে আমি বিস্ময় বোধ করি; যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা স্মরণে রেখেও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ থেকে গাফিল থাকে, তার জন্য বিস্মিত রোধ করি।"

অনুরূপভাবে হাসান বসরী (র) ও জাফর সাদেক (র) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আয়াতে উল্লেখিত أَبُوْهُمَا বলতে কারো কারো সপ্তম পূর্ব-পুরুষের, আবার কারো কারো মতে দশম পূর্ব-পুরুষের কথা বলা হয়েছে। যাই হোক, এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ পুণ্যবান লোকের বংশধরদের হেফাজত করে থাকেন।

আয়াতাংশ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ-এর দ্বারা বোঝা যায় যে, খিযির (আ) নবী ছিলেন। তিনি নিজের থেকে কিছুই করেননি। বরং যা করেছেন তাঁর প্রতিপালকের নির্দেশেই করেছেন। সুতরাং তিনি নবী ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, 'তিনি একজন রাসূল ছিলেন।' আবার কেউ কেউ বলেন, 'তিনি একজন ওলী ছিলেন।' একটি বিরল মতে, 'তিনি একজন ফেরেশতা ছিলেন।' এর চাইতে আশ্চর্যজনক কথা হচ্ছে যে, কেউ কেউ বলেন, 'তিনি ফিরআউনের পুত্র ছিলেন।' আবার কেউ কেউ বলেন, 'তিনি ছিলেন যাহ্হাকের পুত্র যিনি হাজার বছর ধরে গোটা পৃথিবীতে রাজত্ব করে গেছেন।'

ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, 'কিতাবীদের অধিকাংশের অভিমত হচ্ছে, তিনি ছিলেন আফরীদুনের যুগের লোক।' আরো কথিত আছে যে, 'তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ যুল-কারনায়নের অগ্রগামী বাহিনীর সেনাপতি। আর এ যুলকুরনায়নকেই কেউ কেউ আফরীদুন ও যুল ফারাস বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ছিলেন, ইবরাহীম খলীল (আ)-এর যুগের লোক।' কিতাবীরা আরো মনে করেন যে, "তিনি 'আবে-হায়াত' পান করে অমর হয়ে গেছেন এবং আজও তিনি

জীবিত আছেন।" কেউ কেউ বলেন, 'ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি যাঁরা ঈমান আনয়ন করেছিলেন এবং বাবেল শহর থেকে ইবরাহীম (আ)-এর সাথে হিজরত করেছিলেন, তিনি তাদের কারোর সন্তান ছিলেন।' আবার কেউ কেউ বলেন, 'তাঁর নাম ছিল মাল্‌কান।' কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম ছিল, 'আরমিয়া ইবন খাল্‌কিয়া।' কেউ কেউ বলেন, 'লাহরাসিবের পুত্র সাবাসিবের আমলে তিনি একজন নবী ছিলেন।' ইবন জারীর (র) বলেন, আফরীদূন ও সাবাসিবের মধ্যে যুগ-যুগান্তরের ফারাক ছিল যা সম্পর্কে বংশ বৃত্তান্তের পারদর্শীদের কেউ অনবহিত থাকতে পারে না।

ইবন জারীর (র) বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত হল যে, তিনি আফরীদূনের যুগের লোক, যিনি মূসা (আ)-এর যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। মূসা (আ)-এর নবুওতের কাল ছিল মনুচেহেরের আমল। আর মনুচেহের ছিলেন পারস্য সম্রাট আফরীদূনের পৌত্র এবং আবরাজের পুত্র। পিতামহ আফরীদূনের পর যুবরাজ মনুচেহের সম্রাট হন। তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। তিনিই প্রথম পরিখা খনন করেছিলেন এবং তিনিই প্রথম প্রত্যেক গ্রামে সর্দার নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল প্রায় ১৫০ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কথিত আছে যে, তিনি ছিলেন ইসহাক ইবন ইবরাহীমের অধঃস্তন বংশধর। তাঁর বহু বাগ্মিতাপূর্ণ সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা ও উক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, যা শ্রোতৃবর্গকে বিস্ময়াভিভূত করে। আর এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি ইবরাহীম খলীল (আ)-এর অধঃস্তন বংশধর ছিলেন। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ.

স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তা'আলা নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে, যখন একজন রাসূল আসবে তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে? (সূরা আল ইমরান ঃ ৮১)

অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবী থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তিনি তাঁর পরে আগত নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবেন ও তাঁকে সাহায্য করবেন। যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় খিযির (আ) জীবিত থাকতেন, তাহলে রসূলুল্লাহ (সা)-এর আনুগত্য স্বীকার, তাঁর সাথে মিলিত হওয়া ও তাঁর সাহায্য করা ব্যতীত খিযির (আ)-এর কোন গত্যন্তর থাকত না। তিনি অবশ্যই ঐসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হতেন যাঁরা বদরের দিন রসূলুল্লাহ (সা)-এর পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন। যেমনটি জিবরাঈল (আ) ও ফেরেশতাদের সর্দারগণ হয়েছিলেন। কিংবা তিনি রাসূল ছিলেন—যা কেউ কেউ বলেছেন; অথবা তিনি ফেরেশতা ছিলেন—যেমনি কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। খিযির (আ) নবী ছিলেন এবং এটিই সঠিক অভিমত। তিনি যাই হয়ে থাকুন না কেন, জিবরাঈল (আ) হচ্ছেন ফেরেশতাদের সর্দার এবং মূসা (আ) মর্যাদায় খিযির (আ)-এর তুলনায় শ্রেষ্ঠ। রসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় যদি মূসা (আ) জীবিত থাকতেন, তবে রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর সাহায্য করা তাঁর জন্যেও অপরিহার্য হত।

এমতাবস্থায় খিযির (আ) যদি ওলীই হয়ে থাকেন যেমনি অনেকেই মনে করে থাকেন। তবে তাঁর উম্মতভুক্ত হওয়াটা অধিকতর যুক্তিযুক্ত হতো। কিন্তু কোন হাসান পর্যায়ের কিংবা নির্ভরযোগ্য দুর্বল হাদীসেও পাওয়া যায় না যে, তিনি একদিনও রসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে হাযির হয়েছিলেন কিংবা তাঁর সাথে মিলিত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে হাকীম (র) কর্তৃক যে শোকবাণী সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত রয়েছে, তার সূত্র খুবই দুর্বল। পরবর্তীতে খিযির (আ) সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হবে।

মূসা (আ)-এর কাহিনী সম্বলিত পরীক্ষার হাদীস

ইমাম আবূ আবদুর রহমান নাসাঈ (র) তাঁর 'সুনানের' কিতাবুত তাফসীরে কুরআন মজীদের সূরায়ে তা-হার ৪০ নং আয়াতের তাফসীরে حديث الفتون বা পরীক্ষার হাদীস বর্ণনা করেন।

আয়াতটি হচ্ছে ঃ – وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا

"আর তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে; অতঃপর আমি তোমাকে দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি দেই, আমি তোমাকে বহু পরীক্ষা করেছি।" আর সে হাদীসটি হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত। তিনি সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একদিন আয়াতাংশ وفتناك فتونا-এর তাফসীর প্রসঙ্গে ইবন আব্বাস (রা)-কে প্রশ্ন করলেন, 'ফুতুন' কি? আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বললেন, 'হে ইবন জুবায়র! দিন ফুরিয়ে আসছে فتون সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ হাদীস রয়েছে। বর্ণনাকারী বললেন, পরদিন সকালে সে প্রতিশ্রুত ফুতুন সংক্রান্ত হাদীসটি শোনার জন্যে আমি আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর কাছে গেলাম। তিনি বললেন ঃ ইবরাহীম (আ)-এর বংশে আল্লাহ তা'আলা যে নবীগণ ও রাজ-রাজড়ার উদ্ভব ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে ফিরআউন ও তার পরামর্শদাতারা আলোচনায় বসে। তাদের কেউ কেউ বলল, বনী ইসরাঈলরা এটা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করে না। তাই তারা এটার জন্যে অপেক্ষা করছে। তারা ধারণা করেছিল যে, ইউসুফ ইবন ইয়াকূব (আ) সেই প্রতিশ্রুত নবী। কিন্তু যখন তিনি ইনতিকাল করলেন, তখন তারা বলল, ইবরাহীম (আ)-কে এরূপ ওয়াদা দেয়া হয়নি।

ফিরআউন বলল, তোমাদের অভিমত কি? অতঃপর তারা পরামর্শ করল এবং এ কথার উপর একমত হল যে, ফিরআউন কিছু সংখ্যক লোককে বড় বড় ছুরিসহ পাঠাবে। তারা বনী ইসরাঈলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে যখনই কোন ছেলে সন্তান পাবে, তখনই তাকে হত্যা করবে। তারা কিছুদিন যাবত এরূপ করল। অতঃপর যখন তারা দেখল যে, বনী ইসরাঈলের বৃদ্ধরা মৃত্যুর কারণে এবং ছোটরা হত্যার কারণে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, তখন তারা বলাবলি করতে লাগল যে, এভাবে বনী ইসরাঈলরা ধ্বংস হয়ে গেলে যে সব দৈহিক শ্রম ও সেবার কাজ তারা করত তা ভবিষ্যতে কিবতীদেরকে করতে হবে, তাই তারা পুনরায় স্থির করল যে, এক বছর প্রতিটি ছেলে সন্তান হত্যা করা হবে এবং পরের বছর তাদের কাউকে হত্যা করা হবে না। নবজাতকগুলো বড় হয়ে বৃদ্ধদের মধ্যে যারা মারা যাবে তাদের স্থান পূরণ করবে। আর বৃদ্ধরা সংখ্যায় যাদের

জীবিত রাখা হচ্ছে, তাদের চেয়ে অধিক হবে না। মোটকথা, প্রয়োজনীয় কর্মীদের সংখ্যা পূর্বের মত থাকবে, তাতে হত্যার দ্বারা কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না। সুতরাং এই সিদ্ধান্তে তারা একমত হল। যে বছর নবজাতকদের হত্যা করা হবে না, সে বছরই মূসা (আ)-এর মা হারূন (আ)-কে নিয়ে অন্তঃসত্ত্বা হন এবং তিনি নির্বিঘ্নে নবজাতক হারূন (আ)-কে জন্ম দেন। পরবর্তী বছর তিনি মূসা (আ)-কে গর্ভে ধারণ করেন। তাই তাঁর অন্তরে ভীতি ও দুশ্চিন্তার উদ্রেক হল। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, হে ইবন জুবায়র! এটা ছিল 'ফুতুন' বা পরীক্ষাসমূহের একটি। মাতৃগর্ভে থাকতেই আল্লাহর ইচ্ছায় মূসা (আ)-কে এই পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর মায়ের কাছে ইল্হাম করলেন যে, তুমি ভীত হবে না ও চিন্তাগ্রস্ত হবে না, আমি তাকে আবার তোমার কাছে ফেরত পাঠাব এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব। আল্লাহ্ তা'আলা তখন তাঁকে নির্দেশ দিলেন যে, যখন তুমি তাকে প্রসব করবে তখন তাকে একটি সিন্দুকে পুরে নদীতে ভাসিয়ে দেবে। যখন তিনি মূসা (আ)-কে প্রসব করেন তখন সে মতে কাজ করেন। সন্তান যখন মার কাছ থেকে দূরে সরে গেল, তখন তাঁর কাছে শয়তান আগমন করল। মা মনে মনে বলতে লাগলেন, হায়! আমার ছেলেকে আমি কী করলাম। যদি আমার সামনে ছেলেকে যবেহ্ করা হত, আমি তাকে দাফন-কাফন করতে পারতাম। তাহলে ছেলেটিকে সাগরের প্রাণী ও মাছের খাদ্য হিসেবে নদীতে ফেলে দেয়া থেকে আমার কাছে অধিকতর প্রিয় হতো। পানির স্রোত সিন্দুকটিকে প্রায় নদীমুখে নিয়ে গেল, যেখান থেকে ফিরআউনের স্ত্রীর বাঁদীরা পানি উঠিয়ে নিয়ে যেতো। যখন তারা সিন্দুকটি দেখতে পেল, তখন এটা তারা উঠিয়ে নিল এবং খুলতে চাইল। তাদের একজন বলল, 'এটার ভেতরে যদি কোন সম্পদ থাকে আর আমরা এটা খুলি তাহলে এটাতে আমরা যা পাব ফিরআউনের স্ত্রী তা বিশ্বাস নাও করতে পারেন।' সুতরাং তারা যেরূপ পেলো হুবহু সে অবস্থায় এটাকে ফিরআউনের স্ত্রীর কাছে নিয়ে হাযির করল। ফিরআউনের স্ত্রী যখন সিন্দুকটি খুললেন তাতে একটি নবজাতক শিশুকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর অন্তরে শিশুটির প্রতি এক অভূতপূর্ব স্নেহের উদ্রেক হল। অন্যদিকে মূসা (আ)-এর মা অস্থির হয়ে পড়লেন এবং তার মনে শুধু মূসা (আ)-এর স্মৃতিই ভাসতে লাগল। জল্লাদেরা যখন এ নবজাতকটির কথা শুনতে পেল তখন তারা তাকে যবেহ করার জন্যে ফিরআউনের স্ত্রীর কাছে ছুরি নিয়ে ছুটে আসল। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, হে ইবন জুবায়র! এটাও ছিল সে ফুতুন বা পরীক্ষাসমূহের অন্যতম।

ফিরআউনের স্ত্রী জল্লাদদের বললেন, ফিরআউন না আসা পর্যন্ত একে ছেড়ে দাও। এই একটি ছেলের জন্যে বনী ইসরাঈল সংখ্যায় বেড়ে যাবে না। তিনি আসলে আমি তার কাছ থেকে তাকে চেয়ে নেবো, যদি তিনি তা মঞ্জুর করেন, তাহলে এটা হবে তোমাদের একটা চমৎকার কাজ, আর যদি তিনি তাকে হত্যার নির্দেশ দেন, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ থাকবে না। তিনি তখন ফিরআউনের কাছে গেলেন এবং বললেন, এই শিশুটি আমার ও আপনার চোখ জুড়াবে। ফিরআউন বলল, তোমার জন্যে তা হতে পারে, কিন্তু আমার জন্যে নয়, আমার এটার কোন প্রয়োজন নেই। রসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন. সে পবিত্র সত্তার শপথ! যাঁর শপথ গ্রহণ করা হয়ে থাকে, যদি ফিরআউন মূসা নবজাতককে নয়ন প্রীতিকর রূপে

গ্রহণ করে নিত, যেমন তার স্ত্রী সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, তাহলে তাকে আল্লাহ তা'আলা সুপথ প্রদর্শন করতেন যেমন তার স্ত্রীকে করেছিলেন কিন্তু সে তা থেকে বঞ্চিত থাকে। সুতরাং ফিরআউনের স্ত্রী তার আশে-পাশের প্রতিটি মহিলার কাছে লোক প্রেরণ করে একজন ধাত্রী তালাশ করতে লাগলেন। কিন্তু যে মহিলাই তাকে দুধ পান করাতে আসে কারো স্তন নবজাতক মূসা গ্রহণ করলেন না। তাতে ফিরআউনের স্ত্রী আশংকা করতে লাগলেন যে, হয়তো এই শিশুটি দুধ না খেয়ে মারাই যাবে। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন।

অতঃপর তিনি এ আশায় তাকে বাজারে ও লোকালয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন যে, হয়তো এই ধরনের কোন ধাত্রী পাওয়াও যাবে, যার স্তন শিশুটি গ্রহণ করবে। কিন্তু শিশুটি কারো স্তনই গ্রহণ করলেন না। অন্যদিকে মূসা জননী ব্যাকুল হয়ে মূসার বোনকে বললেন, তার পিছনে পিছনে যাও এবং খোঁজ নাও যে, তার কোন সংবাদ পাওয়া যায় কিনা, সে জীবিত আছে নাকি কোন জীব-জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে। আর এসময় তিনি তাঁর সন্তান সম্পর্কে তাঁর প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতির কথাটি ভুলেই বসেছিলেন। দূর থেকে মূসা (আ)-এর বোন তার দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন, কিন্তু লোকজন টের পায়নি। মূসার বোন দেখলেন, কোন ধাত্রীই মূসা (আ)-কে দুধ পান করাতে পারছে না। তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হয়ে ধাত্রী অন্বেষণকারীদের বলতে লাগলেন, আমি তোমাদের এমন একটি পরিবারের সন্ধান দিতে পারি, যারা তাকে স্নেহ-মমতা দিয়ে সুচারুরূপে লালন-পালন করার দায়িত্ব নিতে পারে। তারা সব সময়ই তার হিতাকাঙ্ক্ষী হবে। তারা বলতে লাগল, তুমি কেমন করে জানতে পারলে যে, তারা তার হিতাকাঙ্ক্ষী হবে, তারা কি তাকে চিনে? এ ব্যাপারে তারা সন্দেহ করতে লাগল। ইবন আব্বাস (রা) বলেন, হে ইবনে জুবায়র! এটাও ছিল সে পরীক্ষাসমূহের একটা।

মূসার বোন বললেন, তারা তার হিতাকাঙ্ক্ষী ও তার প্রতি সদয়। কেননা, তারা সম্রাটের শ্বশুর পক্ষের সন্তুষ্টি বিধান ও সম্রাটের কাছ থেকে উপকার লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। তার কথায় তারা মুগ্ধ হয়ে মূসার বোনকে তার মায়ের কাছে প্রেরণ করল। তিনি মায়ের কাছে গিয়ে এ সংবাদ দিলেন। তখন তাঁর মা আসলেন। যখন তিনি তাঁকে আপন কোলে তুলে নিলেন, তখন তিনি মায়ের স্তন চুষতে আরম্ভ করেন ও তৃপ্তিসহকারে দুধ পান করেন। তখন একজন সংবাদদাতা ফিরআউনের স্ত্রীর কাছে গিয়ে এ সুসংবাদ দিলেন যে, আমরা আপনার ছেলের জন্যে ধাত্রী পেয়েছি। ফিরআউনের স্ত্রী মা ও শিশুকে ডেকে পাঠান। তারা তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। তিনি যখন তার প্রতি শিশুটির আকর্ষণ লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি এখানে থেকে যাও এবং আমার এই সন্তানকে দুধ পান করাও। কেননা, সে আমার কাছে অতি প্রিয়। মা বললেন, আমার সন্তানাদি ও বাড়িঘর ছেড়ে আমি এখানে থাকতে পারি না, তাতে আমার সব কিছু বিনাশ হয়ে যাবে। যদি আপনি ভাল মনে করেন, তাহলে তাঁকে আমার কাছে সমর্পণ করতে পারেন, আমি তাকে নিয়ে বাড়ি চলে যেতে পারি। সে আমার সাথে থাকবে। তাঁর কল্যাণ সাধনে আমার কোন প্রকার ত্রুটি হবে না। আমি আমার ঘরবাড়ি ও সন্তানাদি ছেড়ে কোথাও থাকতে পারব না। মূসার মা ঐ মুহূর্তে আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে ফিরআউনের স্ত্রীর নিকট অনড় রইলেন এবং নিশ্চিত থাকলেন যে, আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন।

তারপর মূসার মা আপন সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। তখন থেকে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে তাঁর মায়ের তত্ত্বাবধানে অতি উত্তম রূপে লালন-পালন করতে লাগলেন এবং তাঁকে ভাগ্য-নির্ধারিত পন্থায় তাকে হিফাজত করলেন। ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈল যেরূপ উপহাস ও জুলুমের শিকার হচ্ছিল তা কিছুটা লাঘব হল এবং তারা শহরের এক প্রান্তে বসবাস করতে লাগল। মূসা (আ) যখন আরো বেড়ে উঠলেন, তখন একদিন ফিরআউনের স্ত্রী মূসার মাকে বললেন, "একদিন আমাকে তুমি আমার ছেলেটি দেখাবে।" মূসার মা ছেলেকে দেখাবার জন্যে একটি দিন নির্ধারণ করেন। এদিকে ফিরআউনের স্ত্রী খাজাঞ্চী ধাত্রী ও আমলাদেরকে নির্দেশ দিলেন প্রত্যেকে যেন উপহারসহ তাঁর পুত্র মূসা (আ)-কে সংবর্ধনা জানায়। তিনি অন্য একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে পাঠালেন, যাতে তাদের মধ্যে কে কি উপহার দেয় তার হিসাব রাখে।

মূসা (আ) মায়ের বাড়ি থেকে বের হবার পর হতে ফিরআউনের স্ত্রীর কাছে পর্যন্ত আসার পথে অসংখ্য উপহার ও উপঢৌকন লাভ করেন। ফিরআউনের স্ত্রীর কাছে এসে পৌছলে তিনিও তাঁকে উপঢৌকনাদি প্রদান করলেন এবং অত্যন্ত খুশি হলেন। মূসা (আ)-এর মাকেও তার উত্তম সেবার জন্যে বহু টাকা-পয়সা প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি মূসা (আ)-কে নিয়ে ফিরআউনের কাছে যাবো, যাতে করে তিনিও তাকে উপঢৌকন প্রদান করেন ও তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। যখন ফিরআউনের স্ত্রী মূসা (আ)-কে নিয়ে তার কোলে তুলে দিলেন, তখন মূসা ফিরআউনের দাড়ি ও মাটির দিকে আকর্ষণ করলেন। তখন ফিরআউনকে আল্লাহর শত্রু পথভ্রষ্ট পারিষদরা বলল, আপনার কি স্মরণ নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ইবরাহীম (আ)-কে কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ইবরাহীমের একজন অধঃস্তন বংশধর আপনার উত্তরাধিকারী হবেন। তিনি আপনার উপর জয়লাভ করবেন ও আপনাকে পরাজিত করবেন। সুতরাং আপনি কসাই জল্লাদের নিকট কাউকে প্রেরণ করেন যাতে তারা এসে তাকে হত্যা করে ফেলে। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, হে ইবন জুবায়র! এটাও ছিল একটা পরীক্ষা।

ফিরআউনের স্ত্রী একথা শুনে ফিরআউনের কাছে দৌড়ে আসলেন এবং বললেন যে, শিশুটি আপনি আমাকে দান করেছেন, এর ব্যাপারে আপনার কী হয়েছে? ফিরআউন বলল, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে, এই শিশুটির ধারণা সে আমাকে পরাস্ত করবে ও আমার উপর বিজয়ী হবে। ফিরআউনের স্ত্রী বললেন, আপনি বরং তাকে পরীক্ষা করুন। চলুন আমরা এমন একটি কাজ করি যা থেকে সঠিক তথ্য বের হয়ে আসবে। দু'টি জ্বলন্ত অঙ্গার ও দুটি মুক্তা তার সামনে রেখে দিন যদি সে মুক্তা দু'টি ধরে এবং জ্বলন্ত অঙ্গার না ধরে, তাহলে বুঝতে হবে যে তার বোধশক্তি আছে। আর যদি জ্বলন্ত অঙ্গার দু'টি ধরে এবং মুক্তা না ধরে, তাহলে বুঝতে হবে তার এখনও বোধোদয় হয়নি। কেননা বোধশক্তি সম্পন্ন কেউ মুক্তার উপর অঙ্গারকে অগ্রাধিকার দিতে পারে না। সে মতে দু'টি জ্বলন্ত অঙ্গার ও দুটি মুক্তা তাঁর সামনে রাখা হল। তিনি জ্বলন্ত অঙ্গার ধরলেন। ফিরআউন তার হাত পুড়ে যাবে এ ভয়ে তার হাত থেকে অঙ্গারগুলো সরিয়ে নিল। ফিরআউনের স্ত্রী বললেন, আপনি কি লক্ষ্য করছেন না?

শিশু মূসা মুক্তা ধরার জন্যে ইচ্ছে করেছিলেন কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা থেকে তাকে ফিরিয়ে রাখলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সিদ্ধান্ত কার্যকরী করেই থাকেন। মূসা (আ) যখন

যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন ফিরআউন সম্প্রদায়ের কারো পক্ষে বনী ইসরাঈলের প্রতি কোনরূপ জুলুম বা কটাক্ষ করার উপায় ছিল না। এখন বনী ইসরাঈল পুরোপুরি বিরত থাকে। একদিন মূসা (আ) শহরের এক প্রান্ত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, অমনি দেখলেন যে, দুইটি লোক একে অপরের সাথে ঝগড়া করছে। এদের একজন কিবতী ও অন্য একজন ইসরাঈলী। মূসা (আ)-কে দেখে ইসরাঈলীটি তাঁর কাছে কিবতীর বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করল। তাতে মূসা (আ) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। কেননা, কিবতীটি ইসরাঈলীদের মধ্যে মূসা (আ)-এর অবস্থান এবং তিনি ইসরাঈলীদের হিফাজত করে থাকেন তা জানতো। যদিও অন্য কারো তা জানা ছিল না। তখন মূসা (আ) কিবতীটিকে একটি ঘুষি দিলেন। ফলে সে মারা গেল। ইসরাঈলী ও আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ এই হত্যার ব্যাপারটি দেখতে পায়নি। যখন লোকটি মারা গেল, তখন মূসা (আ) বললেন, هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ

অর্থাৎ—এটা শয়তানের কাণ্ড! সে তো প্রকাশ্য শত্রু ও বিভ্রান্তকারী। (কাসাস ঃ ১৫)

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

قَالَ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَغَفَرَلَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ . قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ ـ

সে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি। সুতরাং আমাকে ক্ষমা কর। অতঃপর তাকে ক্ষমা করলেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সে আরো বলল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি যেহেতু আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, আমি কখনও অপরাধীদের সাহায্যকারী হবো না। অতঃপর ভীত সতর্ক অবস্থায় সেই নগরীতে তার প্রভাত হল। (সূরা কাসাস ঃ ১৬-১৮)

ফিরআউনের কাছে তার সম্প্রদায় সংবাদ পৌঁছাল যে, বনী ইসরাঈলরা ফিরআউন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। হে ফিরআউন! আমাদের জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করুন, আমরা তাদেরকে ক্ষমা করব না। ফিরআউন বলল, হত্যাকারীকে তোমরা খুঁজে বের করে দাও, সাক্ষী উপস্থিত করো। কেননা, সম্রাট তার সম্প্রদায়কে ভালবাসলেও বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণে তাদের জন্যে কাউকে হত্যা করা তার পক্ষে সমুচিত হবে না। সুতরাং তাকে খোঁজ করে বের কর; আমি এর প্রতিশোধ নেব। তারা খুঁজতে লাগল কিন্তু তারা কোন প্রমাণ খুঁজে পেল না। পরের দিন মূসা (আ) উক্ত ইসরাঈলীকে দেখতে পেলেন, সে অন্য একজন কিবতীর সাথে ঝগড়া করছে। মূসা (আ)-কে দেখে সে পূর্বের দিনের মত কিবতীটির বিরুদ্ধে মূসা (আ)-এর কাছে ফরিয়াদ করল। মূসা (আ) অগ্রসর হলেন। কিন্তু আগের দিন যেই ঘটনা ঘটে গেছে তার জন্য খুবই লজ্জিত ছিলেন এবং আজকের দৃশ্যও অপছন্দ করতে লাগলেন। এদিকে ইসরাঈলীটি খুবই রাগান্বিত হয়ে কিবতীকে আক্রমণ করতে উদ্যত হল। গতদিনের ও আজকের কাজের জন্য মূসা (আ) ইসরাঈলীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ। অর্থাৎ তুমি তো স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি।

ইসরাঈলীটি মূসা (আ)-এর প্রতি তাকাল। মূসা (আ)-এর কথা শুনে এবং আগের দিনের ন্যায় রাগান্বিত অবস্থায় দেখে সে ঘাবড়ে গেলো এবং ভয় করতে লাগলো যে, তাকে স্পষ্টই একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি বলার পর হয়ত মূসা (আ) তাকেই আক্রমণ করতে পারেন। অথচ তিনি কিবতীকে আক্রমণ করতেই উদ্যত ছিলেন। ইসরাঈলীটি মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করে বলল ঃ হে মূসা! গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ, সেভাবে আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তাকে হত্যা করার জন্যে মূসা (আ) আক্রমণ করছেন ভেবেই সে এ কথাটি বলল। ততক্ষণে তারা দু'জন ঝগড়া থেকে ক্ষান্ত হল। কিন্তু কিবতীটি তার সম্প্রদায়ের কাছে ইসরাঈলীর মুখে শোনা হত্যা তথ্যটি জানিয়ে দিল। এই কথা শুনে ফিরআউন জল্লাদদের মূসা (আ)-কে হত্যার জন্যে প্রেরণ করল। ফিরআউন প্রেরিত জল্লাদরা রাজপথ ধরে ধীর গতিতে মূসা (আ)-এর দিকে অগ্রসর হতে লাগল। মূসা (আ) তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল এরূপ কোন আশংকা তাদের ছিল না। অতঃপর মূসা (আ)-এর দলের একজন লোক শহরের প্রান্ত থেকে সংক্ষিপ্ত পথ ধরে তাদের পূর্বেই মূসা (আ)-এর কাছে পৌঁছে এ সংবাদটি দিল। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, হে ইবন জুবায়র (রা)! মূসা (আ)-এর জন্য এটাও ছিল একটি পরীক্ষা।

মূসা (আ) তখন মাদায়ান শহরের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ইতিপূর্বে মূসা (আ) এ ধরনের কোন পরীক্ষার শিকার হননি এবং এ রাস্তায়ও চলাচল করেন নি। কাজেই এই রাস্তা ছিল তার অপরিচিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ওপর ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও অটল ভরসা। তিনি বলেছিলেন عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ -আশা করি আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন।

এ সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ اُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ. وَوَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمُ امْرَاَتَيْنِ تَذُوْدَانِ .

অর্থাৎ—যখন সে মাদায়ানের কূপের নিকট পৌঁছল, দেখল একদল লোক তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছে এবং ওদের দুটি স্ত্রীলোক তাদের পশুগুলোকে আগলাচ্ছে অর্থাৎ ছাগলগুলোকে ।

মূসা (আ) তাদের দু'জনকে বললেন, তোমাদের কী ব্যাপার? তোমরা পৃথক হয়ে বসে আছ, লোকজনের সাথে পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছ না? তারা দু'জন বললেন, 'জনতার ভিড় ঠেলার শক্তি আমাদের নেই। আমরা তাদের পান করাবার পর উচ্ছিষ্ট পানির অপেক্ষা করছি।' মূসা (আ) তাদের দুজনের বকরীগুলোকে পানি পান করালেন। তিনি বালতি দিয়ে এত বেশি পানি উঠাতে সক্ষম হলেন যে, তিনিই রাখালদের অগ্রবর্তী হয়ে গেলেন। এরপর দু'জন মহিলা তাদের বকরীগুলো নিয়ে তাদের বৃদ্ধ পিতার কাছে পৌঁছলেন। অন্যদিকে মূসা (আ) গাছের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ – رَبِّ اِنِّىْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

অর্থাৎ—"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করবে আমি তার কাঙ্গাল।" আজ বকরীগুলোকে নিয়ে দেরি না করে দ্রুত পৌঁছায় তাদের পিতার কাছে কেমন কেমন

ঠেকছিল। তাই বললেন ঃ আজকে তোমাদের ব্যাপার কী? তখন তারা দু'জনেই মূসা (আ) সম্বন্ধে তাদের পিতাকে অবহিত করল। তাঁকে ডেকে আনার জন্যে পিতা একজনকে মূসা (আ)-এর কাছে পাঠালেন। তাদের একজন মূসা (আ)-এর কাছে গিয়ে তাঁকে ডেকে আনলেন। মূসা (আ) যখন মহিলাদের পিতার সাথে আলোচনা করলেন, তখন তিনি মূসা (আ)-কে অভয় দিয়ে বললেন ঃ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ অর্থাৎ—তুমি জালিম সম্প্রদায়ের কবল হতে বেঁচে গিয়েছ। আমাদের এখানে ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়ের কোন কর্তৃত্ব নেই। আমরা তার রাজত্বে বাস করি না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ -

অর্থাৎ—"তাদের একজন বলল, হে পিতা! তুমি তাকে মজুর নিযুক্ত কর। কারণ, তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী—বিশ্বস্ত।" পিতাকে তাঁর মর্যাদাবোধ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য করল যে, তুমি কেমন করে জানলে যে, সে শক্তিশালী এবং আমানতদার? মেয়েটি বলল, তাঁর শক্তির বিষয়ে প্রমাণ এই যে, পানি পান করানোর ক্ষেত্রে বালতি টানার ব্যাপারে এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী আমি কাউকে দেখিনি। আমানতদারীর বিষয়ে প্রমাণ এই যে, আমি যখন তাঁর কাছে গিয়ে পরিচয় দিলাম, তখন তিনি একবার আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। যখন তিনি আঁচ করতে পারলেন আমি একজন মহিলা, তখন তিনি তাঁর মাথা নীচু করলেন। আপনার সংবাদ তাঁর কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি আর মাথা উঠিয়ে তাকাননি। অতঃপর আমাকে বললেন, তুমি আমার পেছনে চলবে এবং রাস্তার নির্দেশনা দেবে। তাঁর এ কাজের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আমানতদার। পিতার কাছে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল, মেয়ের কথার সত্যতাও প্রমাণিত হল এবং মেয়ের বক্তব্য অনুযায়ী মূসা (আ) সম্বন্ধে তিনি তাঁর অভিমত নির্ধারণ করলেন। তিনি তখন মূসা (আ)-কে উদ্দেশ করে বললেন ঃ

إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِيْ ثَمَانِيَ حِجَجٍ. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ.

'আমি আমার এই কন্যা দু'টির একটি তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে। যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, সে তোমার ইচ্ছে। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ চাহেতো তুমি আমাকে.সদাচারী পাবে।' (সূরা কাসাস ঃ ২৭)

তিনি এ প্রস্তাবে রাযী হলেন। আট বছর কাজ করা ছিল মূসা (আ)-এর উপর অপরিহার্য। আর দুই বছর ছিল তার পক্ষ থেকে অঙ্গীকার। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে পূর্ণ দশ বছরের মেয়াদ পালনের তাওফীক দেন। সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, 'একদিন এক খৃস্টান পণ্ডিত আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, 'তুমি কি জান, মূসা (আ) কোন্ মেয়াদটি পূর্ণ করেছিলেন?' তখন আমি জানতাম না, তাই বললাম, 'না, আমি জানি না।' এরপর আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং এ সম্পর্কে আমি তাঁর সাথে আলোচনা করলাম। তিনি

বললেন, তুমি কি জান না যে, আট বছর পূর্ণ করা আল্লাহ্‌র নবীর উপর ওয়াজিব ছিল। তিনি কোনক্রমেই তার থেকে কম করতে পারতেন না। তুমি জেনে রেখ, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর দ্বারা ওয়াদা মুতাবিক দশ বছরের মেয়াদ পূরণ করান। অতঃপর আমি উক্ত খৃস্টানের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে সংবাদটি দিলাম, তখন সে বলল, 'তোমাকে এ ব্যাপারে যে সংবাদ দিয়েছে সে কি তোমা থেকে বেশি জ্ঞানী?' উত্তরে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তিনি শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য।'

মূসা (আ) যখন তাঁর পরিবার নিয়ে রওয়ানা হলেন, তখন আগুন, লাঠি ও হাতের মু'জিযা প্রকাশিত হল— যা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল করীমে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর মূসা (আ) নিহত ব্যক্তি ও মুখের জড়তা সম্পর্কে ফিরআউন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে যে আশঙ্কা পোষণ করতেন, সে সম্বন্ধে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ফরিয়াদ করেন। মুখের জড়তা অনর্গল কথাবার্তা বলার ব্যাপারে কিছুটা অন্তরায় সৃষ্টি করত। তাই তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করলেন যেন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ভাই হারূনের মাধ্যমে তাঁর সাহায্য করেন। তাঁর পক্ষ থেকে হারূন (আ) প্রাঞ্জল ভাষায় জনগণের সাথে কথা বলেন, যেখানে মূসা (আ) তাদের সাথে অনর্গল কথা বলতে অপারক। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দরখাস্ত মঞ্জুর করলেন। তাঁর মুখের জড়তা দূর করে দিলেন, হারূন (আ)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন ও তাঁকে হুকুম দিলেন যেন তিনি তাঁর ভাই মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। মূসা (আ) আপন লাঠিসহ ফিরে আসলেন। শেষ পর্যন্ত হারূন (আ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

অতঃপর দু'জন একত্রে ফিরআউনের কাছে গমন করলেন এবং তার ফটকে বহুক্ষণ ধরে অপেক্ষা করলেন কিন্তু তাদেরকে অনুমতি দেয়া হল না। কঠোর গোপনীয়তা অবলম্বন করে তাঁদেরকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হল। তাঁরা বললেন, আমরা তোমার প্রতিপালকের দূত। ফিরআউন বলল, তোমাদের প্রতিপালক কে? তাঁরা তার উত্তর প্রদান করেন, যার বর্ণনা কুরআনুল করীমে রয়েছে। ফিরআউন বলল, 'তোমরা কী চাও?' প্রসঙ্গক্রমে সে ইত্যবসরে হত্যার কথাও উল্লেখ করল। হত্যার ব্যাপারে ওযর পেশ করে মূসা (আ) বলেন, আমি চাই যে, তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং বনী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দেবে। ফিরআউন তা অস্বীকার করল এবং বলল, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে কোন মু'জিযা প্রদর্শন কর। তখন তিনি তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন। অমনি তা একটি বিরাট অজগরে পরিণত হল, যা বিরাট হা মেলে ফিরআউনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। ফিরআউন যখন দেখল অজগরটি তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সে ভয় পেয়ে গেল এবং সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ল। মূসা (আ)-এর কাছে এটাকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে ফরিয়াদ করতে লাগল। তখন মূসা (আ) তা-ই করলেন। অতঃপর মূসা (আ) তাঁর হাত বগলের নীচ থেকে বের করলেন। ফিরআউন এটাকে শুভ্রসমুজ্জ্বল নির্দোষ ও শ্বেত রোগে আক্রান্ত নয় দেখতে পেল। তিনি আবার হাত ভিতরে নিয়ে নিলেন। এটা অমনি পূর্বের রঙ ধারণ করল। ফিরআউন যা দেখল তা নিয়ে তার পারিষদবর্গের সাথে সলাপরামর্শ করল। তখন তারা বলল :

هٰذَانِ سَاحِرَانِ يُرِيْدَانِ اَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلٰى.

'এ দু'জন অবশ্যই জাদুকর, তারা চায় তাদের জাদু দ্বারা তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থা ধ্বংস করতে।'

অর্থাৎ তোমাদের রাজত্ব এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে তোমাদেরকে বিতাড়িত করতে। এভাবে মূসা (আ) যা চেয়েছিলেন ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গ তার কিছুই দিতে রাযী হল না। পারিষদরা ফিরআউনকে পরামর্শ দিল, "আপনার রাজত্বে জাদুকরের অভাব নেই, কাজেই সকল জাদুকর একত্রিত হবার জন্যে আপনি নির্দেশ দেন, যাতে তারা তাদের দু'জনের উপস্থাপিত জাদুকে পরাজিত করতে পারে।" অতঃপর ফিরআউন বিভিন্ন শহরে জাদুকর সংগ্রহকারী পাঠাল, যাতে তারা উঁচুমানের জাদুকরদের ডেকে আনে। যখন তারা ফিরআউনের কাছে আসল তখন বলতে লাগল, কি দিয়ে তিনি জাদু দেখান? পারিষদবর্গ বলল, 'সাপ দিয়ে।' তখন তারা বলল, আল্লাহ্র শপথ, তাহলে তারা উভয়ে আমাদের উপর জয়লাভ করতে পারবে না। কেননা, পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নেই, যে আমাদের ন্যায় সাপ, রশি ও লাঠি দিয়ে আমাদের চাইতে উত্তম জাদু দেখাতে পারে। তবে যদি আমরা তাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারি, তাহলে আমাদের পুরস্কার কী হবে? ফিরআউন তাদেরকে বলল, 'তাহলে তোমরা আমার নৈকট্য লাভকারী ও বিশিষ্ট সভাষদবর্গের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর তোমরা যা চাইবে তা-ই আমি তোমাদেরকে দেবো।' এভাবে তারা ফিরআউন থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করল ও উৎসবের দিন নির্ধারিত করল, যে দিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হবে।

সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) আমার কাছে বর্ণনা করেন, উৎসবের দিনেই আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে ফিরআউন ও তার জাদুকরদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেছিলেন। আর সেই দিনটি ছিল আশুরার দিন। যখন তারা একটি মাঠে সমবেত হলো, তখন লোকজন বলাবলি করতে লাগল—চল, আজ আমরা তাদের এই প্রতিযোগিতা দেখার জন্যে উপস্থিত হই এবং উপহাস ছলে বলতে লাগল, 'যদি নতুন জাদুকররা (মূসা ও হারূন) জয়লাভ করে তাহলে আমরা তাদের অনুসরণ করবো। জাদুকরগণ বলল, 'হে মূসা! হয় তুমি প্রথমে নিক্ষেপ কর, নতুবা আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি।' মূসা (আ) বললেন, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর।' তখন তারা তাদের দড়ি ও লাঠি নিক্ষেপ করল ও বলতে লাগল, 'ফিরআউনের ইযযতের শপথ, আমরাই জয়ী হব।' মূসা (আ) তাদের জাদু প্রত্যক্ষ করলেন ও তাতে তিনি তাঁর অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করলেন। তাঁর কাছে আল্লাহ্ তা'আলা ওহী পাঠালেন, 'হে মূসা! তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর।' যখন তিনি তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তখন তা একটি বিরাট অজগরে পরিণত হল, যা হা করে থাকে। সে লাঠি ও দড়িগুলোকে একত্র মিশিয়ে সবগুলোকে তার মুখে পুরতে লাগল। এমনকি কোন লাঠি বা দড়িই অবশিষ্ট রইল না। জাদুকররা যখন ঘটনার যথার্থতা বুঝতে পারল, তখন তারা বলতে লাগল, 'মূসা (আ)-এর ব্যাপারটি যদি জাদু হত তাহলে আমাদের জাদুকে এটা কখনও গ্রাস করতে পারত না। এটা নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। কাজেই আমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ও মূসা (আ) যা কিছু নিয়ে এসেছেন তার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করলাম, আমরা পূর্বে যা কিছু পাপ করেছি তার থেকে তওবা করলাম।' এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত জনপদে ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন।

সত্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং তাদের সমস্ত কার্যকলাপ মিথ্যা প্রতিপন্ন হল। তারা পরাভূত হল ও অপদস্থ হল। অন্যদিকে ফিরআউনের স্ত্রী ছিন্ন বসন পরিহিতা অবস্থায় বের হলেন এবং ফিরআউন ও ফিরআউনীদের বিরুদ্ধে মূসা (আ)-এর সাহায্যের জন্যে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করতে লাগলেন। ফিরআউনের গোত্রের যারা তাকে দেখল তারা মনে করতে লাগল যে, তিনি ফিরআউন ও ফিরআউনীদের জন্যে সহানুভূতি প্রদর্শনার্থে ছিন্ন বসন পরেছেন। আসলে তাঁর সমস্ত চিন্তা-ভাবনা ছিল মূসা (আ)-এর জন্যেই। মূসা (আ)-এর সাথে কৃত ফিরআউনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বিষয়টি দীর্ঘায়িত হতে লাগল। বনী ইসরাঈলকে মূসা (আ)-এর কাছে প্রত্যর্পণ করার জন্যে যখনই ফিরআউন কোন নিদর্শন প্রদর্শন করার শর্ত আরোপ করতো এবং মূসা (আ)-এর দু'আয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিদর্শন প্রকাশিত হতো, তখনই ফিরআউন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বলতো, 'হে মূসা! তোমার প্রতিপালক কি এটা ব্যতীত অন্য একটি নিদর্শন আমাদের জন্যে প্রদর্শন করার ক্ষমতা রাখেন?'

এরূপ বার বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউনের সম্প্রদায়ের প্রতি স্পষ্ট নিদর্শন হিসেবে পর্যায়ক্রমে তুফান, পঙ্গপাল, উঁকুন, ভেক ও রক্ত আযাবরূপে পাঠান। প্রত্যেকটি মুসীবত অবতীর্ণ হলে ফিরআউন মূসা (আ)-এর কাছে ফরিয়াদ করত এবং তা দূর করার জন্যে মূসা (আ)-কে অনুরোধ করত যে, মুসীবত দূর হয়ে গেলে সে বনী ইসরাঈলকে মূসা (আ)-এর কাছে প্রত্যর্পণ করবে। আবার যখনই মুসীবত দূর হয়ে যেত, তারপর দিনই সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। শেষ পর্যন্ত আপন সম্প্রদায়সহ উক্ত জনপদ ত্যাগ করার জন্যে মূসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ আসল। মূসা (আ) তাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা রওয়ানা হয়ে পড়লেন। প্রত্যুষে ফিরআউন টের পেল যে, বনী ইসরাঈলরা চলে গেছে। তখন সে বিভিন্ন শহরে লোক পাঠাল এবং বিরাট এক সৈন্যদল নিয়ে তাঁদের পিছু ধাওয়া করল। এদিকে আল্লাহ্ তা'আলা সমুদ্রকে হুকুম দিলেন, আমার বান্দা মূসা (আ) তোমাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করবে, তখন তুমি বারটি খণ্ডে খণ্ডিত হয়ে যাবে, যাতে মূসা ও তার সাথীরা নির্বিঘ্নে পার হয়ে যেতে পারে। অতঃপর তুমি ফিরআউন ও তার সাথীদেরকে গ্রাস করে ফেলবে।

লাঠি দিয়ে সমুদ্রকে আঘাত করতে মূসা (আ) ভুলে গেলেন ও সমুদ্রের পাড়ে পৌছে গেলেন। মূসা (আ) তাঁর লাঠি দ্বারা আঘাত করবেন আর সে গাফিল থাকবে, যার কারণে সে হবে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নাফরমান—এই ভয়ে সাগর উত্তাল ছিল। যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল ও নিকটবর্তী হল, মূসা (আ)-এর সাথিগণ তাঁকে বলল, আল্লাহ্ আপনার প্রতিপালক, আল্লাহ্ তা'আলা যা হুকুম করেন তাই করুন, নচেৎ আমরা ধরা পড়ে যাব। তিনি মিথ্যা বলেননি এবং আপনিও আমাদেরকে মিথ্যা বলেননি। মূসা (আ) বলেন, আমার প্রতিপালক আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, আমি যখন সমুদ্রের কিনারায় আসব, তখন তা বার ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে যাতে আমি নির্বিঘ্নে সমুদ্র পার হয়ে যেতে পারি। অতঃপর লাঠির কথা স্মরণে আসল, তখন তিনি আপন লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করলেন। এরপর যখন ফিরআউনের সেনাবাহিনীর অগ্রভাগ মূসা (আ)-এর সেনাবাহিনীর পশ্চাৎভাগের নিকটবর্তী হলো, সমুদ্র তার প্রতিপালকের নির্দেশ অনুযায়ী ও মূসা (আ)-এর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বিভক্ত হয়ে গেল। যখন মূসা (আ) ও তাঁর সাথিগণ সকলেই সমুদ্র পার হলেন এবং ফিরআউন ও তার সাথীরা সমুদ্রে

প্রবেশ করল, নির্দেশ মোতাবেক সমুদ্র দু'দিক থেকে মিশে গিয়ে তাদের ডুবিয়ে দিল। আবার মূসা (আ) যখন পার হয়ে গেলেন, তখন তাঁর সাথিগণ বলতে লাগল, আমাদের আশংকা হচ্ছে ফিরআউন হয়তো ডুবেনি। আমরা তার ধ্বংসের ব্যাপারে সুনিশ্চিত নই।

মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালকের কাছে এ ব্যাপারে দু'আ করলেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরআউনের শরীর সমুদ্র থেকে বের করে দিলেন যাতে তারা ফিরআউনের ধ্বংসের ব্যাপারে নিশ্চিত হল। অতঃপর বনী ইসরাঈলরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে আগমন করলেন যাদের ইবাদতের জন্যে প্রতিমা রয়েছে, তখন তারা মূসা (আ)-কে বলতে লাগল ঃ

قَالُوْا يَامُوْسَى اجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ. اِنَّ هٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

তারা বলল, "হে মূসা! তাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যেও এক দেবতা গড়ে দাও।" তিনি বললেন, তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায়, এসব লোক যাতে লিপ্ত রয়েছে তা তো বিধ্বস্ত হবে এবং তারা যা করছে তাও অমূলক।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৩৮)

অর্থাৎ—হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তো সমুদ্র পার হওয়ার ব্যাপারটি নিজ চক্ষে প্রত্যক্ষ করলে এবং নিজ কানেও শুনলে, যা তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্র কুদরত অনুধাবন করার জন্যে যথেষ্ট।

অতঃপর মূসা (আ) পথ চলতে লাগলেন এবং তাদেরকে নিয়ে অবতরণ করলেন ও বলতে লাগলেন, তোমরা হারূন (আ)-এর আনুগত্য করবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে আমার প্রতিনিধি মনোনীত করেছেন। আমি আমার প্রতিপালকের সমীপে যাচ্ছি এবং ত্রিশ দিন পর আমি তোমাদের কাছে ফিরে আসব। মূসা (আ) যখন তাঁর প্রতিপালকের সাথে ত্রিশ দিনের মধ্যে কথাবার্তা বলার ইচ্ছে করলেন ও ত্রিশ দিন-রাত রোযা রাখলেন, তখন তিনি রোযাদারের মুখের গন্ধের ন্যায় গন্ধ অনুভব করলেন এবং আপন প্রতিপালকের সাথে এ গন্ধ নিয়ে কথাবার্তা বলা অপছন্দনীয় মনে করলেন। তাই মূসা (আ) একটি গাছের ডাল নিয়ে চিবালেন যাতে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। মূসা (আ) যখন আল্লাহ্র সমীপে পৌঁছলেন, তখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে বললেন, তুমি রোযা কেন ভঙ্গ করলে? অথচ কেন তিনি এরূপ করেছিলেন এ ব্যাপারে তিনিই অধিক জ্ঞাত ছিলেন। মূসা (আ) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! সুগন্ধিযুক্ত মুখ নিয়ে ছাড়া আপনার সাথে কথাবার্তা বলা আমার অপছন্দনীয় ছিল।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, 'হে মূসা! তুমি কি জান না, রোযাদারের মুখের গন্ধ মিশকের গন্ধের চেয়ে শ্রেয়? কাজেই তুমি ফেরত যাও, আরো দশটি রোযা রাখ এবং তারপর আস।' প্রতিপালক যা নির্দেশ দিলেন মূসা (আ) তা-ই করলেন।

এদিকে মূসা (আ)-এর সম্প্রদায় যখন দেখতে পেল যে, মূসা (আ) নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ ত্রিশদিনের মধ্যে ফেরত আসছেন না, এটা তাদের কাছে খুবই খারাপ লাগল। হারূন (আ) বনী ইসরাঈলদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা মিসর থেকে বের হয়ে এসেছ অথচ তোমাদের কাছে ফিরআউন সম্প্রদায়ের দেয়া ও আমানতের প্রচুর বস্তু রয়েছে। অনুরূপভাবে তোমাদেরও প্রচুর বস্তু তাদের কাছে রয়েছে। আমার মতামত হচ্ছে, তাদের কাছে তোমাদের যে পরিমাণ বস্তু

রয়েছে, সে পরিমাণ তোমরা হিসাব করে রেখে দিতে পার, তবে তাদের ধার দেয়া বস্তু তোমাদের কাছে তাদের আমানতী বস্তু, আমি তোমাদের জন্য হালাল মনে করি না। আর আমরা তাদের কোন বস্তু তাদের কাছে ফেরত পাঠাতে পারছি না। অন্যদিকে আমরা তাদের কোন বস্তু নিজেরাও ভোগ করতে পারছি না। হারূন (আ) একটি গর্ত খুঁড়তে হুকুম দিলেন, যখন একটি বিরাট গর্ত খোঁড়া হল, তখন তিনি সম্প্রদায়ের সকলকে তাদের কাছে মজুদ জিনিসপত্র ও অলংকারাদি গর্তে নিক্ষেপ করতে আদেশ করলেন। অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে তা পুড়িয়ে দেয়া হল। হারূন (আ) বললেন, এ সম্পদ আমাদেরও নয় এবং তাদেরও নয়।

সামিরী ছিল বনী ইসরাঈলের পড়শী এমন এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত যারা গরু পূজা করত। সে বনী ইসরাঈলের লোক ছিল না। মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলের সাথে সমুদ্র পাড়ি দেবার সময় সে জিবরাঈলের ঘোটকীর পায়ের ধুলা দেখতে পেয়ে এক মুষ্টি তুলে নিয়েছিল। এখন সে হারূন (আ)-এর কাছে গেল। হারূন (আ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন : 'হে সামিরী! তোমার মুষ্ঠির মধ্যে যা রয়েছে তুমি কি তা অগ্নিতে নিক্ষেপ করবে না?' সে সকলের অলক্ষ্যে সেই ধুলা মুঠোয় ধরে রেখেছিল। সে বলল, এটাতো সেই দূতের ঘোটকীর পায়ের ধুলা, যে আপনাদেরকে সমুদ্র পার করিয়েছেন, তবে আমি এটাকে কিছুতেই নিক্ষেপ করব না, যতক্ষণ না আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করেন যে, আমি যে কাজের জন্য এটাকে নিক্ষেপ করব সে কাজই যেন হয়ে যায়। সে মতে তিনি দু'আ করলেন এবং সে তা নিক্ষেপ করে বলল, আমি চাই এগুলো যেন বাছুরে পরিণত হয়ে যায়। ফলে গর্তের মধ্যে যত সোনা-দানা, সহায়-সম্পদ অলংকারাদি তামা-লোহা ইত্যাদি ছিল, একত্রিত হয়ে একটি বাছুরের আকার ধারণ করল। যার মধ্যখানটা ছিল ফাঁকা, তার মধ্যে প্রাণ ছিল না, ছিল শুধু গরুর ডাক।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম, বাছুরটির কোন শব্দ ছিল না, বাতাস তার পেছনের দিক্ দিয়ে ঢুকত এবং সামনের দিক্ দিয়ে বের হয়ে যেত। এজন্য এক প্রকারের শব্দ হত, বাছুরের নিজস্ব কোন শব্দ ছিল না। এই ঘটনার পর বনী ইসরাঈল তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল বলল, হে সামিরী! এটা কি? তুমিই তো এটা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। সামিরী বলল, এটা তোমাদের প্রতিপালক। তবে মূসা (আ) পথ হারিয়ে ফেলেছেন। অন্য একদল বলল, যতক্ষণ না মূসা (আ) আমাদের কাছে ফিরে আসেন, আমরা এটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করব না। এমনও তো হতে পারে যে, এটাই আমাদের প্রতিপালক! তাই এটাকে আমরা বিনষ্ট করলাম না আর এটা সম্বন্ধে আমরা বিপাকেও পড়লাম না। তাই আমরা এটাকে দেখে-শুনে রাখব। আর যদি এটা আমাদের প্রতিপালক বলে প্রমাণিত না হয়, তাহলে এ সম্পর্কে আমরা মূসা (আ)-এর নির্দেশই মান্য করব। অন্য একদল বলল, এটা শয়তানের কাজ, এটা আমাদের প্রতিপালক নয়, এটাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি না, এটাকে আমরা সত্য বলে গ্রহণও করি না। বাছুরটি সম্বন্ধে সামিরী যা বলেছিল, তাকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার মিথ্যা দাবিকে তারা মিথ্যা বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করল। হারূন (আ) তাদেরকে বললেন :

يَاقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمٰنُ.

"হে আমার সম্প্রদায়! এটা দ্বারা তো কেবল তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের প্রতিপালক দয়াময়।" এটা তোমাদের প্রতিপালক নয়। তারা হারূন (আ)-কে প্রশ্ন করল, মূসা (আ)-এর খবর কি? আমাদের সাথে ত্রিশদিনের ওয়াদা করে গিয়েছেন, তিনি তো আমাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করলেন না! চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তারা বলল, মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালককে পাননি, তাই তিনি তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলার সময় তিনি তাকে বনী ইসরাঈলের মধ্যে সংঘটিত ব্যাপারসমূহ অবগত করেন। তাতে মূসা (আ) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রাগান্বিত হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসেন। এরপর তিনি তাদেরকে যা বললেন, তা কুরআনুল করীমে উল্লেখিত হয়েছে।

মূসা (আ) তাঁর সহোদর হারূন (আ)-এর কেশ ধরে আকর্ষণ করতে লাগলেন এবং রাগের কারণে ফলকগুলো ফেলে দেন। তারপর তিনি তাঁর সহোদরের ওযর গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁর জন্যে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অতঃপর তিনি সামিরীর দিকে মনোযোগ দিলেন এবং তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি এমনটি কেন করলে?' সামিরী বলল, "আমি জিবরাঈলের ঘোটকীর পায়ের এক মুঠো ধুলা সংগ্রহ করেছিলাম, আমি এটার অলৌকিক ক্ষমতা অনুধাবন করেছিলাম এবং আপনাদের কাছে ছিল এটা অজানা বস্তু। এরপর এটাকে নিক্ষেপ করলাম এবং আমার মন এরূপ করাই আমার জন্য শোভন করেছিল। মূসা (আ) বললেন, 'দূর হ', তোর জীবদ্দশায় তোর জন্যে এটাই রইল যে, তুই বলবি, 'আমাকে কেউ ছুঁয়ো না' এবং তোর জন্য রইল একটি নির্দিষ্ট কাল, তোর বেলায় যার ব্যতিক্রম হবে না; তুই তোর সেই ইলাহের প্রতি লক্ষ্য কর যার পূজায় তুই রত ছিলে, আমরা এটাকে জ্বালিয়ে দেবই; অতঃপর এটাকে বিক্ষিপ্ত করে সাগরে নিক্ষেপ করবই।"

বলাবাহুল্য, এটা যদি উপাস্যই হত তাহলে এটাকে এরূপ কেউ করতে পারত না। এজন্যই বনী ইসরাঈল এটাকে নিশ্চিতভাবে পরীক্ষা হিসেবে গণ্য করে। আর যাদের মতামত হারূন (আ)-এর মতামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল তারা মহাখুশী হলো এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের উপকারার্থে মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করে তারা আরো বলল, "হে মূসা (আ)! আপনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করুন, যেন তিনি আমাদের জন্যে তওবা করার নিমিত্তে একটি বিধি ব্যবস্থা করেন, যা আমরা আঞ্জাম দিলে, আমাদের কৃত পাপরাশির কাফ্ফারা হয়ে যায়।" অতঃপর মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায় থেকে সত্তরজন এমন লোককে এ কাজের জন্যে মনোনীত করলেন, যারা ভাল কাজ সম্পাদনে ত্রুটি করে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করে না, তাদের নিয়ে মূসা (আ) তওবার জন্যে চললেন। অতঃপর ভূমিকম্প দেখা দিল। আর এতে আল্লাহ্র নবী, তাঁর সম্প্রদায় ও মনোনীত লোকদের কাছে লজ্জিত হলেন এবং বলতে লাগলেন, "হে আল্লাহ্ তা'আলা! ইচ্ছে করলে তুমি তাদেরকে ও আমাকে এর পূর্বেই ধ্বংস করে দিতে পারতে। আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ, তাদের কৃতকর্মের জন্যে কি আমাদেরকে তুমি ধ্বংস করবে?" উত্তর আসল, তাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যাদের অন্তরে বাছুরপ্রীতি রয়েছে ও এটার প্রতি তারা বিশ্বাস রাখে; তাই তাদেরকে নিয়ে ভূমি কেঁপে উঠেছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ. اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ.

"আমার দয়া—তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত। সুতরাং আমি এটা তাদের জন্যে নির্ধারিত করব যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে, যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জীল, যা তাদের কাছে আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়।" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৫৬-১৫৭)

মূসা (আ) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায়ের জন্য আমি তোমার কাছে তওবা কবূলের দু'আ করছি, আর তুমি আমাকে বলছ, নিশ্চয়ই আমার রহমত এমন একটি সম্প্রদায়ের জন্যে লিপিবদ্ধ করেছি যা তোমার সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন। হায়! যদি তুমি আমার জন্মকে আরো বিলম্ব করতে এবং আমাকে সেই রহমতপ্রাপ্ত ব্যক্তির উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করতে, কতই না ভাল হত! আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে বললেন, তাদের তওবা হচ্ছে তাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি যার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তার পিতা বা সন্তান হোক না কেন সে তাকে তরবারি দ্বারা হত্যা করবে। কে নিহত হলো, এ ব্যাপারে কোন পরোয়া করবে না। যাদের গুনাহ্ মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর কাছে অজ্ঞাত থাকলেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পাপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তারা নিজ নিজ পাপের কথা স্বীকার করলো ও তাদেরকে যা করতে বলা হয়েছে তা করলো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়কে মাফ করে দিলেন।

অতঃপর মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদেরকে নিয়ে পবিত্র ভূমির দিকে অগ্রসর হলেন। রাগ থেমে যাবার পর তিনি ফলকগুলো কুড়িয়ে নিলেন এবং ফলকে লিখিত বিভিন্ন করণীয় কাজ সম্পর্কে উম্মতদেরকে নির্দেশ দিলেন। এগুলো তাদের কাছে কঠিন মনে হতে লাগল এবং এগুলোকে পুরোপুরি স্বীকার করে নিতে তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তূর পাহাড় তাদের মাথার উপর চাঁদোয়ার মত উত্তোলিত করলেন। পাহাড় তাদের নিকটবর্তী হতে লাগল, এমনকি তারা ভয় করতে লাগল যে, তা তাদের মাথার উপর না পড়ে যায়। তারা একদিকে তাদের ডান হাতে কিতাবখানা ধরে রেখেছিল, অন্যদিকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিল। তারা ছিল পাহাড়ের পেছনে। ভয় করছিল, না জানি কখন তাদের উপর তা পড়ে যায়।

অতঃপর তারা চলতে চলতে পবিত্র ভূমিতে পৌঁছে গেল এবং সেখানে তারা একটি শহর পেল, যাতে রয়েছে একটি দুর্ধর্ষ জাতি। তারা ছিল নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী। তাদের ফল-ফলাদি অত্যন্ত বৃহৎ আকারের ছিল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বনী ইসরাঈলরা বলল, 'হে মূসা! এখানে রয়েছে একটি দুর্দান্ত জাতি যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত এরা শহরে অবস্থান করবে আমরা তাতে প্রবেশ করব না। যদি তারা বের হয়ে যায় তাহলেই কেবল আমরা সেখানে প্রবেশ করব। দুর্দান্ত সম্প্রদায়টির মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি

যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করত; বললেন, আমরা মূসা (আ)-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আমাদের সম্প্রদায় থেকে বেরিয়ে এসেছি। তাঁরা আরো বললেন, আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে সম্যক অবগত। তোমরা তাদের বিরাট শরীর ও সংখ্যার আধিক্য দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছো। আসলে তাদের তেমন শক্তি-সামর্থ্য নেই। তোমরা তাদের ফটক দিয়ে প্রবেশ করার চেষ্টা কর। তোমরা তাতে প্রবেশ করতে পারলেই তাদের উপর জয়ী হবে। কেউ কেউ বলেন, যাদের উক্তি উপরে উল্লেখ করা হল, তারা হলেন মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের লোক। অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা ভয় করছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قَالُوْا يَامُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا اَبَدًا. مَا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ.

"তারা বলল, হে মূসা! তারা যতদিন সেখানে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করবই না। সুতরাং তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ কর। আমরা এখানেই বসে থাকব। (৫ মায়িদা ঃ ২৪)।

এরূপ বলে তারা মূসা (আ)-এর ক্রোধের উদ্রেক করল। তিনি তাদের জন্য বদদু'আ করলেন, তাদেরকে 'ফাসিক' বলে আখ্যায়িত করলেন। এর আগে তিনি তাদের বিরুদ্ধে আর বদদু'আ করেননি। কেননা, এখন তিনি তাদের মধ্যে পাপ এবং অবাধ্যতা দেখতে পেলেন, আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বদদু'আ কবূল করলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তাদেরকে ফাসিক বলে আখ্যায়িত করলেন—যেমনটি মূসা (আ) করেছিলেন। চল্লিশ বছরের জন্যে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ তাদের জন্যে নিষিদ্ধ করে দিলেন। যাতে তারা পৃথিবীতে উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াবে। সারাদিন ধরে তারা চলতেই থাকবে। তাদের কোন স্বস্তি নসীব হবে না। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা সদয় হয়ে তাদের উপর তীহের ময়দানে মেঘের ছায়া দান করেন; তাদের জন্যে মান্না ও সালওয়া অবতীর্ণ করেন। তাদেরকে এমন পোশাক দান করেন যা না ছিঁড়ে, না ময়লা হয়। তাদেরকে এমন একটি বর্গাকৃতির পাথর দান করলেন এবং এটাকে লাঠি দ্বারা আঘাত করার জন্য মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিলেন। ফলে পাথর থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হল। প্রতি দিকে তিনটি করে প্রস্রবণ অবস্থিত ছিল, তাদের প্রতিটি গোত্র নিজ নিজ প্রস্রবণের পরিচয় পেয়ে গেল। তারা নিজ নিজ প্রস্রবণ থেকে পানি পান করতো। আবার তারা যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেত, সেখানেই এই পাথরটিকে পূর্বদিনের অবস্থানে পেত।

উপরোক্ত হাদীসটি মারফূ বলে ইব্‌ন আব্বাস (রা) উল্লেখ করেছেন। আমার মতে এটাই যথার্থ। কেননা, একদা মু'আবিয়া (রা) ইব্‌ন আব্বাস (আ) থেকে শোনার পর মূসা (আ) কর্তৃক নিহত ব্যক্তিটি সম্বন্ধে ফিরআউনীকে তথ্য প্রকাশকারী হিসেবে মানতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে ফিরআউন বংশীয় লোকটির জানার কোন উপায়ই ছিল না। জানতো কেবল ইসরাঈলীটি, যে সেখানে উপস্থিত ছিল। তাহলে ফিরআউনী ব্যক্তিটি কেমন করে এ তথ্য প্রকাশ করতে পারে? তাঁর এই উক্তি শুনে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাগান্বিত হলেন এবং মু'আবিয়া (রা)-এর হাত ধরলেন ও তাঁকে নিয়ে সা'দ ইব্‌ন মালিক যুহরী (রা)-এর কাছে গেলেন

এবং তাঁকে বললেন, 'হে আবূ ইসহাক! আপনার কি ঐ দিনটির কথা মনে পড়ে? যেদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মূসা (আ) কর্তৃক নিহত ফিরআউন সম্প্রদায়ের লোকটি সম্বন্ধে বর্ণনা করেছিলেন? তথ্যটি ইসরাঈলীটি প্রকাশ করেছিল, না-কি ফিরআউনী? জবাবে তিনি বলেছিলেন, এই তথ্যটি প্রকাশ করেছিল ফিরআউনী। তবে সে এটা শুনেছিল ইসরাঈলী থেকে, যে এ ঘটনার সাক্ষ্য দিয়েছিল ও এটা উল্লেখ করেছিল।

ইমাম নাসাঈ (র)-ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন জারীর তাবারী (র) ও ইব্ন আবূ হাতিম (র) তাঁদের তাফসীরে এরূপ হাদীসের উল্লেখ করেছেন। তবে এ হাদীসটি মরফূ না হয়ে মওকূফ হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। এ বর্ণনার অধিকাংশই ইসরাঈলী বর্ণনা থেকে গৃহীত। এতে কিছু কিছু অংশ এমনও রয়েছে যা সন্দেহমুক্ত নয়। আমি আমার উস্তাদ হাফিজ আবূল হাজ্জাজ মযী (র) থেকে শুনেছি। তিনি বলেন, এটা ইহুদী আলিমদের বর্ণনা হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

তাঁবু গম্বুজের নির্মাণ প্রসঙ্গ

কিতাবীরা বলে, আল্লাহ্ তা'আলা একবার মূসা (আ)-কে শিমশার কাঠ, পশুর চামড়া ও ভেড়ার পশমের দ্বারা একটি তাঁবু তৈরি করতে নির্দেশ দিলেন। তাদের বিস্তারিত বর্ণনা অনুযায়ী রঙিন রেশম, স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা এটাকে সজ্জিত করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। এতে ছিল ১০টি শামিয়ানা। প্রতিটি শামিয়ানার দৈর্ঘ ছিল ২৮ হাত ও প্রস্থ ছিল ৪ হাত। এতে ছিল ৪টি দরজা। এর রশিগুলো ছিল বিভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন বর্ণের রেশমের, এতে এর চৌকাঠ এবং তাক ছিল স্বর্ণ-রৌপের। প্রতিটি কোণে ছিল ২টি দরজা, এছাড়া আরো অনেক বড় বড় দরজা ছিল। এর পর্দাগুলো ছিল রঙিন রেশমের।

এ ধরনের বহু সাজসজ্জার সামগ্রী ছিল, যার ফিরিস্তি ছিল দীর্ঘ। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে শিমশার কাঠের একটি সিন্দুকও তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যার দৈর্ঘ আড়াই হাত এবং প্রস্থ দুই হাত এবং উচ্চতা ছিল দেড় হাত। ভিতরে ও বাইরে খাঁটি স্বর্ণ দ্বারা মোড়ানো, এটার চার কোণে ছিল চারটি আঙটা, সম্মুখ ভাগের দুই দিকে ছিল চারটি আঙটা; সম্মুখ ভাগের দুই দিক ছিল স্বর্ণের পাখাবিশিষ্ট। তাদের ধারণায় দুইজন ফেরেশতার মূর্তি যেগুলো মুখোমুখিভাবে স্থাপিত ছিল। এগুলো ছিল বাসলিয়াল নামক এক প্রসিদ্ধ শিল্পীর তৈরি। তাঁরা তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন শিমশার কাঠের একটি খাঞ্চা তৈরি করতে যার দৈর্ঘ দুই হাত ও প্রস্থ ছিল দেড় হাত। এতে ছিল উপরের ডালায় স্বর্ণের তালা ও স্বর্ণের মুকুট; এর চতুর্দিকে ছিল চারটি আঙটা যেগুলোর কিনারাগুলো ছিল সোনা দিয়ে মোড়ানো, আনারের ন্যায় কাঠের তৈরি। তাঁরা তাকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন খাঞ্চাটিতে বড় বড় বরতন; পেয়ালা ও গ্লাসের ব্যবস্থা করেন। তিনি যেন স্বর্ণের মিনারা তৈরি করেন যাতে প্রতি দিকে তিনটি করে ৬টি সোনার আলোক স্তম্ভ থাকে, আবার প্রতিটি স্তম্ভে যেন ৩টি করে বাতি থাকে। আর মিনারের মধ্যে যেন চারটি ঝাড় বাতি থাকে। এগুলো এবং অন্যান্য পানপাত্র যেন স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত হয়। এ সবই ছিল বাসলিয়ালের তৈরী। বাসলিয়াল পশু যবাইর বেদীও তৈরী করে। উপরোক্ত তাঁবুটি তাদের

বছরের প্রথম দিন স্থাপন করা হয়। আর সেই দিনটি ছিল বসন্ত ঋতুর প্রথম দিন। আবার 'শাহাদতের তাবূত'ও এতে স্থাপন করা হয়েছিল। সম্ভবত কুরআনুল করীমে নিম্নোক্ত আয়াতে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

"তার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের কাছে সেই তাবূত (ইসরাইলীদের পবিত্র সিন্দুক) আসবে, যাতে তোমাদের প্রতিপালকের কাছ থেকে চিত্ত প্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন বংশীয়গণ যা পরিত্যাগ করেছে তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফেরেশতাগণ এটা বহন করে আনবে। তোমরা মু'মিন হও, তবে অবশ্যই তোমাদের জন্য এটাতে নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা বাকারা ঃ ২৪৮)

ইসরাঈলী কিতাবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এতে রয়েছে তাদের শরীয়ত, তাদের জন্যে নির্দেশাবলী, তাদের কুরবানীর বৈশিষ্ট্য ও নিয়ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা। আবার এতে বর্ণিত রয়েছে যে, তার গম্বুজ তাদের বাছুর পূজার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর বাছুর পূজার ব্যাপারটি ঘটেছিল তাদের বায়তুল মুকাদ্দাসে আগমনের পূর্বে। আবার এটা ছিল তাদের কাছে কাবা শরীফ তুল্য। তারা এটার ভিতরে ও এটার দিকে মুখ করে প্রার্থনা করত এবং এটার কাছেই আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভের আশা করত। মূসা (আ) যখন এটার ভিতরে প্রবেশ করতেন, তখন বনী ইসরাঈলরা এর পাশে দণ্ডায়মান থাকত। এটার দ্বারপ্রান্তেই মেঘমালার জ্যোতির্ময় স্তম্ভ অবতীর্ণ হত। তখন তারা আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত। আল্লাহ তা'আলা মেঘমালার স্তম্ভের ভেতর থেকে মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলতেন। মেঘমালাটি ছিল আল্লাহ্ তা'আলার নূর। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করে একান্তে কথা বলতেন। তার প্রতি আদেশ-নিষেধ অবতীর্ণ করতেন এবং মূসা (আ) তাবূতের কাছে দণ্ডায়মান থাকতেন ও পূর্বোক্ত মূর্তি দুইটির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করতেন। ঐ সময় শাসন সংক্রান্ত ফয়সালাদি আসতো। ইবাদতখানায় স্বর্ণ, রঙিন মুক্তার ব্যবহার তাদের শরীয়তে বৈধ ছিল। কিন্তু আমাদের শরীয়তে বৈধ নয়। আমাদের শরীয়তে মসজিদে জাঁকজমকপূর্ণ অলংকরণ নিষিদ্ধ, যাতে সালাতে মুসল্লীদের মনোযোগ বিঘ্নিত না হয়। মসজিদুন নববী সম্প্রসারণের সময় উমর ইবন খাত্তাব (রা) নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিকে বললেন, এমনভাবে মসজিদটি নির্মাণ কর যাতে বেশি বেশি লোকের জায়গা হয়। তবে মসজিদকে লাল কিংবা হলদে রং করা থেকে বিরত থাকো। কেননা, তাতে মুসল্লীগণের একাগ্রতা বিঘ্নিত হবে। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেন, আমরা অবশ্যই আমাদের মসজিদসমূহ এমনভাবে সাজাবো যেরূপ ইয়াহুদ ও নাসারাগণ তাদের গির্জা ও ইবাদতখানাগুলোকে সাজায়। এটা হবে মসজিদের ইজ্জত-সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে। কেননা, এই উম্মত পূর্বেকার উম্মতের মত নয়। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাদের সালাতে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি একনিষ্ঠ ও মনোযোগী হবার, গাইরুল্লাহ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখার, এমনকি অন্য সকল চিন্তা ও

ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত থেকে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার দিকে একাগ্রচিত্ত হবার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর জন্যেই সমস্ত প্রশংসা।

উপরোক্ত 'তাঁবু গম্বুজ' তীহ্ প্রান্তরে বনী ইসরাঈলদের সাথে ছিল, তারা এটার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করত। এটা ছিল তাদের কিবলা ও কা'বা এবং মূসা (আ) ছিলেন তাদের ইমাম আর তাঁর ভাই হারূন (আ) ছিলেন কুরবানীর দায়িত্বপ্রাপ্ত। যখন হারূন (আ) এবং তারপর মূসা (আ) ইন্তিকাল করলেন, তখন হারূন (আ)-এর বংশধররা নিজেদের মধ্যে কুরবানী প্রথা চালু রাখেন এবং এটা আজ পর্যন্তও তাদের মধ্যে চালু রয়েছে। মূসা (আ) এরপর তাঁর খাদেম ইউশা ইবন নূন (আ) রিসালাতসহ সমস্ত কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং তিনি তাদেরকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। এ ঘটনাটি পরে বর্ণনা করা হবে।

মোদ্দা কথা, বায়তুল মুকাদ্দাসের নিয়ন্ত্রণভার যখন ইউশা ইবন নূন (আ)-এর উপর ন্যস্ত হল, তখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি পাথরের উপর এই তাঁবু গম্বুজটি স্থাপন করেন। বনী ইসরাঈলরা এটার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করত। অতঃপর যখন তাঁবু গম্বুজটি বিনষ্ট হয়ে যায় তখন তারা গম্বুজের স্থান অর্থাৎ পাথরের দিকেই সালাত আদায় করতে লাগল। এ জন্যেই ইউশা (আ)-এর পর থেকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ পর্যন্ত সমস্ত নবীর কিবলা ছিল এটাই। এমনকি রাসূলুল্লাহ্ (সা)ও হিজরতের পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতেন, তবে কাবা শরীফকে সামনে রেখেই তা করতেন। রাসূল (সা) যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং ষোল মাস মতান্তরে সতের মাস তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেন। অতঃপর দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে আসরের নামাযে মতান্তরে জোহরের সময় ইবরাহীমী কিবলা কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তিত হয়। তাফসীরে এ সম্পর্কে নিম্ন বর্ণিত আয়াতের ব্যাখায় বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.

নির্বোধ লোকেরা বলবে যে, তারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিল এটা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল? বল, পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছে সরল পথে পরিচালিত করেন। আকাশের দিকে তোমার বার বার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করি। সুতরাং তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি পছন্দ কর। অতএব, তুমি মসজিদুল হারমের দিকে মুখ ফিরাও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন সেদিকে মুখ ফিরাও। (সূরা বাকারা ঃ ১৪২ ও ১৪৪)

মূসা (আ)-এর সাথে কারূনের ঘটনা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰى فَبَغٰى عَلَيْهِمْ وَاٰتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِى الْقُوَّةِ. إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ. وَابْتَغِ فِيْمَا اٰتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْأَرْضِ . إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ . قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيْتُهُ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ. أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا. وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ. فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهِ فِىْ زِيْنَتِهِ. قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِىَ قَارُوْنُ إِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ. وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّمَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا. وَلَا يُلَقّٰهَا إِلَّا الصّٰبِرُوْنَ. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ. وَأَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. لَوْ لَا أَنْ مَّنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ. تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ.

কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। আমি তাকে দান করেছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল। স্মরণ কর, তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, দম্ভ করবে না, নিশ্চয় আল্লাহ্ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না । আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস

অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলবে না। তুমি অনুগ্রহ কর যেমনটি আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না। সে বলল, 'এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।' সে কি জানত না আল্লাহ্ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানবগোষ্ঠীকে, যারা তার চাইতে শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল অধিক। অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না। কারণ, তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, আহা! কারূনকে যেরূপ দেয়া হয়েছে আমাদেরকেও যদি তা দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহাভাগ্যবান। এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ এবং ধৈর্যশীল ব্যতীত এটা কেউ পাবে না। তারপর আমি কারূনকে তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।' আগের দিন যারা তার মত হবার কামনা করেছিল তারা বলতে লাগল, 'দেখলে তো আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছে, তার রিযিক বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছে হ্রাস করেন। যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সদয় না হতেন তবে আমদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন। দেখলে তো কাফিররা সফলকাম হয় না। এটা আখিরাতের সেই আবাস যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য, যারা এই পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। (সূরা কাসাস ঃ ৭৬-৮৩)

আ'মাশ (র) আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কারূন ছিল মূসা (আ)-এর চাচাতো ভাই। অনুরূপভাবে ইবরাহীম নাখয়ী আবদুল্লাহ ইবন হারিস ইবন নওফল (র) সিমাক ইবন হরব (র) কাতাদা (র) মালিক ইবন দীনার (র) ও ইবন জুরাইজ (র) বলেছেন, তবে তাঁরা মূসা (আ) ও কারূনের বংশপরম্পরা নিম্নরূপ বর্ণনা করেন। কারূন ইবন ইয়াস্হার ইব্ন কাহিস; মূসা (আ) ইবন ইমরান ইব্ন হাফিছ। ইব্ন জুরাইজ ও অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে কারূন ছিল মূসা (আ)-এর চাচাতো ভাই।

ইব্ন ইসহাক (র) তাকে মুসা (আ)-এর চাচা বলে মনে করেন, কিন্তু জুরাইজ (র) তা প্রত্যাখ্যান করেন। কাতাদা (র) বলেছেন, সুমধুর কণ্ঠে তাওরাত পাঠের জন্যে তাকে নূর বলে আখ্যায়িত করা হতো। কিন্তু আল্লাহ্র শত্রু মুনাফিক হয়ে গিয়েছিল, যেমনি সামিরী হয়েছিল। অতঃপর তাঁর ধন-দৌলতের কারণে তার দাম্ভিকতা তাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। শাহ্র ইব্ন হাওশাব (র) বলেন, নিজ সম্প্রদায়ের উপর গর্ব করার উদ্দেশ্যে কারূন তার পরিধেয় কাপড়ের দৈর্ঘ এক বিঘত লম্বা করে দিয়েছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা কারূনের প্রচুর সম্পদের কথা কুরআনুল করীমে উল্লেখ করেছেন। তার চাবিগুলো শক্তিশালী লোকদের একটি দলের জন্যে কষ্টকর বোঝা হয়ে যেতো। কেউ কেউ বলেন, এ চাবিগুলো ছিল চামড়ার তৈরি আর এগুলো বহন করতে ষাটটি খচ্চরের প্রয়োজন হতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই সমধিক জ্ঞাত। তার সম্প্রদায়ের উপদেশ দাতাগণ তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা তাকে বলেছিলেন, তোমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে গর্ব করো না এবং অন্যের উপর দর্প করো না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা দাম্ভিক লোকদের পছন্দ করেন

না। আল্লাহ্ যা তোমাকে দিয়েছেন, তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অন্বেষণ কর। অর্থাৎ তাঁরা বলেছিলেন, হে কারূন! আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলা থেকে যাবতীয় ছওয়াব অর্জন করার প্রচেষ্টা তোমার অব্যাহত থাকা প্রয়োজন। কেননা, এটা তোমার জন্যে উত্তম ও অধিকতর স্থায়ী। এতদসত্ত্বেও তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলবে না অর্থাৎ বৈধভাবে অর্জন ও ব্যয় করবে এবং হালাল পবিত্র বস্তুসমূহ উপভোগ করবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করবে, যেমনটি তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ্র যমীনে ফিৎনা-ফাসাদ করবে না। আমার নির্দেশ লঙ্ঘন করে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার ও ঝগড়াঝাটি করবে না। অন্যথায় তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং তোমাকে যা দেয়া হয়েছে তা কেড়ে নেয়া হবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ফিৎনা সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।

তার সম্প্রদায়ের এরূপ স্পষ্ট নসীহতের জবাবে তার একমাত্র উত্তর ছিল, আমার জ্ঞানের জন্যে আমাকে এসব দেয়া হয়েছে। তোমরা আমাকে যেসব নসীহত করলে এগুলো মান্য করার আমার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, এগুলো আল্লাহ্ তা'আলা আমায় দান করেছেন এ জন্য যে, তিনি আমাকে এসব বস্তুর উপযুক্ত বলে মনে করেছেন। যদি আমি তাঁর অন্তরঙ্গ না হতাম কিংবা তাঁর কাছে আমার কোন প্রাপ্য না থাকত তাহলে কখনও তিনি আমাকে যা দিয়েছেন তা দিতেন না। তাঁর এ বক্তব্য খণ্ডন করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّاَكْثَرُ جَمْعًا. وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ.

"সে কি জানত না, আল্লাহ্ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব গোষ্ঠীকে, যারা তার চাইতে শক্তিতে ছিল প্রবল, জনসংখ্যায় ছিল অধিক। অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না।" (সূরা কাসাস ঃ ৭৮)

অর্থাৎ তার পূর্বে বহু উম্মতকে তাদের পাপ ও অপরাধের জন্যে ধ্বংস করে দিয়েছি, যারা কারূন অপেক্ষা শক্তিতে অধিক প্রবল ছিল, ধনবলে, জনবলে তার চাইতে অগ্রগামী ছিল। যদি কারূনের বক্তব্য যথার্থ হত তাহলে তার চাইতে অধিক শক্তিশালী ও সম্পদশালী কাউকে শাস্তি দিতাম না। সুতরাং তার সম্পদ আমার প্রিয়পাত্র বা অনুগ্রহভাজন হওয়ার প্রমাণ নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمَا اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا.

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দেবে। তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। (সূরা সাবা ঃ ৩৭)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَيَحْسَبُوْنَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهٖ مِنْ مَّالٍ وَّبَنِيْنَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

"তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তা দিয়ে তাদের জন্য সকল প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করেছি ? না, বরং তারা বুঝে না।" (সূরা মুমিনূন ঃ ৫৫-৫৬)

উপরোক্ত প্রতিউত্তর দ্বারা বোঝা যায় যে, আয়াতাংশ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي -এর অর্থ আমরা যা বুঝেছি তা যথার্থ। আর যারা মনে করেন কারূন যে জ্ঞানের গর্ব করতো তা কি রসায়নশাস্ত্রে তার পারদর্শিতা কিংবা তা ছিল তার ইসমে আজমের জ্ঞান, যা প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পদ আহরণ করত, তাদের ধারণা সঠিক নয়। কেননা রসায়নশাস্ত্র এমন একটি শিল্প যা বস্তুর মৌলিক কোন পরিবর্তন সাধন করে না এবং এটা সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নয়। ইসমে আজম-এর মাধ্যমে কাফিরের দু'আ ঊর্ধজগতে উত্থিত হয় না। আর কারূন ছিল অন্তরে কাফির এবং দৃশ্যত মুনাফিক। এ ছাড়াও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে তার উত্তরটি সঠিক হয় না। অধিকন্তু দুটি বাক্যের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কও বিরাজমান থাকে না। এই সম্পর্কে তাফসীর গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কারূন তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হয়েছিল জাঁকজমক সহকারে। (সূরা কাসাস ঃ ৭৯)

বহু তাফসীরকার উল্লেখ করেছেন যে, একদিন কারূন মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে গাড়ি, ঘোড়া, বহু সংখ্যক লস্কর ও পরিচর্যাকারী নিয়ে শহরে বের হল। যারা পার্থিব সম্পদকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে, কারূনকে এরূপ শান-শওকতে দেখে তারা কামনা করতে লাগল যদি তাদেরও এরূপ ধন-সম্পদ থাকত! তারা তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হলো। তখনকর বুদ্ধিমান পণ্ডিত ও সাধকগণ তাদের কথা শুনে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا -

অর্থাৎ—'ধিক তোমাদেরকে! আখিরাতের জীবনে আল্লাহ্ প্রদত্ত পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ, অধিকতর স্থায়ী ও উন্নতর।' আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ إِلَّا الصَّابِرُونَ অর্থাৎ—এ পৃথিবীর চাকচিক্যের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আখিরাতের মহাকল্যাণ লাভের জন্য যে উপরোক্ত নসীহতকে গ্রহণ করতে পারে একমাত্র ঐ ব্যক্তি—যার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা হিদায়ত প্রদান করেছেন, তাকে দৃঢ়চিত্ত করেছেন, তার বুদ্ধি-বিবেক পোক্ত করেছেন এবং তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছার তাকে তাওফীক দান করেছেন। কোন কোন বুযুর্গানে দীন কতই না উত্তম কথা বলেছেন, সন্দেহের স্থলে দূরদৃষ্টি এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রিয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ.

অর্থাৎ—আল্লাহ্ তা'আলা যখন কারূনের জাঁকজমক ও দাম্ভিকতাসহ স্বীয় সম্প্রদায়ের উপর গর্ব সহকারে তার শহর প্রদক্ষিণের কথা বর্ণনা করে তার পরিণতি সম্পর্কে বলেন, তাকে তার বাড়িঘরসহ আমি ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। (সূরা কাসাস ঃ ৮১)

ইমাম বুখারী (র) আবূ সালিম (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে রাসূল (সা) দেখতে পেলেন, সে তার পরিধেয় বস্ত্র হেঁচড়িয়ে চলছে। সে ভূগর্ভে চলে যাচ্ছে। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সে এভাবে ভূগর্ভে তলিয়ে যেতেই থাকবে।

ইমাম বুখারী (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকেও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। ইব্ন আব্বাস (রা) ও ইমাম সুদ্দী (র) বর্ণনা করেছেন, একদিন কারূন একজন ব্যভিচারী মহিলাকে এ শর্তে কিছু অর্থ দিল যে, সে জনতার সামনে প্রকাশ্যে বলবে, হে মূসা! তুমি আমার সাথে ব্যভিচার করেছ। কথিত আছে যে, মহিলাটি জনসমক্ষে মূসা (আ)-কে এরূপ বলেছিল। মূসা (আ) আঁৎকে উঠলেন এবং দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। অতঃপর মহিলাটির দিকে অগ্রসর হয়ে শপথ সহকারে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাকে এরূপ মিথ্যা অপবাদে কে প্ররোচিত করেছে?' মহিলাটি তখন উল্লেখ করল যে, কারূনই তাকে এ কাজে প্ররোচিত করেছে। সে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাইল এবং তওবা করল। তখন মূসা (আ) সিজদাবনত হলেন এবং কারূনের বিরুদ্ধে বদ্ দু'আ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর কাছে এ মর্মে ওহী প্রেরণ করলেন যে, ভূমিকে নির্দেশ দেয়া হয়েছো এ ব্যাপারে সে তোমার যাবতীয় নির্দেশ মান্য করবে। তখন মূসা (আ) কারূন ও তার ঘরবাড়ি গ্রাস করার জন্যে ভূমিকে নির্দেশ দিলেন। ফলে তা-ই হয়। আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

এরূপও কথিত আছে যে, একদিন কারূন সাজসজ্জা করে সৈন্য-সামন্ত, ঘোড়া, খচ্চর ও মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে তার সম্প্রদায়কে নিজ ক্ষমতা প্রদর্শনার্থে মূসা (আ)-এর মাহফিলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মূসা (আ) তখন তাঁর সম্প্রদায়কে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাবহুল দিনগুলো সম্বন্ধে নসীহত করছেন। জনতা যখন কারূনকে দেখল, তখন মজলিসের অনেকেই তার দিকে ফিরে তাকাল। মূসা (আ) তাকে ডাকালেন এবং তার এরূপ করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কারূন বলল, হে মূসা! যদিও তুমি নবুওত প্রাপ্ত হয়ে আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছ, কিন্তু মনে রেখো, আমিও বিত্ত-সম্পদের দিক থেকে তোমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছি। যদি ইচ্ছে কর, তাহলে তুমি ঘরের বের হয়ে আমার বিরুদ্ধে আল্লাহ্র কাছে বদদু'আ করতে পার এবং আমিও তোমার বিরুদ্ধে বদ দু'আ করব।

তখন তারা উভয়েই জনতার সামনে হাযির হলেন। মূসা (আ) বললেন, 'তুমি দু'আ করবে, না কি আমি দু'আ করব? "অতঃপর কারূন দু'আ করল কিন্তু মূসা (আ)-এর বিরুদ্ধে তার দু'আ কবুল হলো না। মূসা (আ) বললেন, এবার আমি দু'আ করব কি? কারূন বলল, 'হ্যাঁ'। মূসা (আ) বললেন, اللهم مر الارض فلتطعن اليوم। "হে আল্লাহ্! ভূমিকে নির্দেশ দাও, যাতে সে আজ আমার নির্দেশ মান্য করে।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে জানালেন, 'আমি ভূমিকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি।' তখন মূসা (আ) বললেন, 'হে ভূমি! তাদেরকে পাকড়াও কর!' ভূমি তাদেরকে তাদের পা পর্যন্ত গ্রাস করল। এরপর মূসা (আ) বললেন, 'হে ভূমি তাদেরকে আরো পাকড়াও কর।' ভূমি তাদেরকে হাঁটু পর্যন্ত গ্রাস করল। তারপর কাঁধ পর্যন্ত। পুনরায় মূসা (আ) বললেন, 'তাদের পুঞ্জীভূত ধন-দৌলতের দিকে অগ্রসর হও। 'ভূমি

এগুলোর দিকে অগ্রসর হল এবং তারা সে দিকে তাকাল। মূসা (আ) আপন হাতে ইংগিত করলেন এবং বললেন, 'বনু লাওয়ী নিপাত যাও!' সাথে সাথে ভূমি তাদেরকে গ্রাস করে ফেলল।

কাতাদা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কারূন ও তার সম্প্রদায় কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিদিন একটি মানব দেহের পরিমাণ তলিয়ে যেতে থাকবে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সপ্ত যমীন পর্যন্ত ভূমি তাদেরকে ভূগর্ভস্থ করেছিল। এই প্রসঙ্গে বহু তাফসীরকার বহু ইসরাঈলী বর্ণনা পেশ করেছেন, আমি ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলো পরিহার করেছি। আয়াতাংশ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ এর অর্থ হচ্ছে وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ. তার জন্যে নিজের থেকে কিংবা অপর থেকে কোন সাহায্যকারী ছিল না।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ অর্থাৎ তার শক্তিও নেই কিংবা তার সাহায্যকারীও নেই। যখন কারূন ভূগর্ভে চলে গেল তার বাড়িঘর, জান-মাল, পরিবার-পরিজন, জমি-জমা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কারূনের ন্যায় যারা সম্পদ কামনা করেছিল তারা লজ্জিত হল এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্যে উত্তম ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। এ জন্যেই তারা বলল ঃ

لَوْلَا اَنْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا. وَيْكَاَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُوْنَ.

"যদি আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি সদয় না হতেন, তবে আমাদেরকেও তিনি ভূগর্ভে প্রোথিত করতেন। দেখলে তো, কাফিররা সফলকাম হয় না। (সূরা কাসাস ঃ ৮২)

আয়াতে উল্লেখিত وَيْلَكَ শব্দটি সম্পর্কে তাফসীরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কাতাদা (র) বলেছেন ঃ وَيْكَاَنَّ এর অর্থ হচ্ছে اَلَمْ تَرَ اَنَّ অর্থাৎ তুমি কি দেখনি? ও অর্থের দিক দিয়ে এটি একটি চমৎকার উক্তি।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দেন ঃ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ هِىَ دَارُ الْقَرَارِ

'আখিরাতের আবাস অর্থাৎ স্থায়ী আবাস।' এটা এমন একটি আবাস যাকে দেয়া হয় সে ঈর্ষার পাত্র হয়। আর যাকে বঞ্চিত করা হয় সে করুণার পাত্র হয়। এরূপ আবাসস্থল এমন লোকদের জন্যে তৈরি করে রাখা হয়েছে, যারা পৃথিবীতে উদ্ধত হতে চায় না কিংবা কোন প্রকার বিপর্যয়ও সৃষ্টি করতে চায় না। আয়াতে উল্লেখিত عُلُوًّا কথাটির অর্থ হচ্ছে ঔদ্ধত্য অহংকার ও গর্ব فَسَادًا বা বিপর্যয়ের অর্থ হচ্ছে পাপের কাজ যা পাপী ব্যক্তির নিজের মধ্যে হোক বা অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হোক। যেমন লোকের সম্পদ আত্মসাৎ করা ও তাদের জীবিকা অর্জনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা এবং তাদের অকল্যাণ কামনা করা। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ "শুভ পরিণতি তাক্ওয়া অবলম্বনকারীদের জন্যে।" কারূনের ঘটনাটি হয়ত বা তাদের মিসর থেকে বের হবার পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল।

কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ- তাকে ও তার প্রাসাদ ভূগর্ভে প্রোথিত করলাম। دار-এর প্রকাশ্য অর্থ প্রাসাদই হয়ে থাকে। আবার এটা হয়ত বা তীহের ময়দানেই হয়েছিল। তাহলে এখানে دار এর অর্থ হবে এমন একটি স্থান যেখানে তাঁবু নির্মাণ করা হয়ে থাকে। যেমন প্রসিদ্ধ কবি আনতারাহ্ বলেছেন ঃ

يادار عبلة بالجواء تكلمى – وعمى صباحا دار عبلة واسلمى

এখানে دار শব্দটি স্থান অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কারূনের অপকীর্তির কথা একাধিক আয়াতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ. إِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.

"আমি আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম ফিরআউন, হামান ও কারূনে র নিকট, কিন্তু তারা বলেছিল এ তো এক জাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী। (সূরা মু'মিন ঃ ২৩ - ২৪)

আল্লাহ্ তা'আলা সূরায়ে আনকাবূতে 'আদ, ছামূদ, কারূন, ফিরআউন ও হামানের কথা উল্লেখের পর বলেন ঃ

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوْسٰى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْأَرْضِ وَمَا كَانُوْا سَابِقِيْنَ. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ.

"মূসা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ এসেছিল। তখন তারা দেশে দম্ভ করত, কিন্তু তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি। তাদের প্রত্যেককেই আমি তার অপরাধের জন্যে শাস্তি দিয়েছিলাম। তাদের কারো প্রতি প্রেরণ করেছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝড়। তাদের কাউকে আঘাত করেছিল মহানাদ, কাউকে আমি প্রোথিত করেছিলাম ভূগর্ভে এবং কাউকে করেছিলাম নিমজ্জিত। আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোন জুলুম করেননি। তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (সূরা আনকাবূত ঃ ৩৯-৪০)

যাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করা হয়েছিল সে ছিল কারূন, যার কথা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। যাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল, তারা ছিল ফিরআউন, হামান ও তাদের সৈন্য-সামন্ত। তারা ছিল অপরাধী।

ইমাম আহমদ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সালাত সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ যে ব্যক্তি সালাত নিয়মিত আদায় করে, কিয়ামতের দিন এই সালাত তার জন্যে হবে নূর, দলীল ও পরিত্রাণের উপকরণ আর যে ব্যক্তি সালাত নিয়মিত আদায় করবে না তার জন্যে কোন নূর, দলীল ও নাজাত হবে না এবং কিয়ামতের দিন সে কারূন, ফিরআউন, হামান ও উবাই ইব্‌ন খালফের সঙ্গী হবে। এটি ইমাম আহ্‌মদ–এর একক বর্ণনা।

মূসা (আ)-এর ফযীলত স্বভাব গুণাবলী ও ওফাত

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مُوْسٰى اِنَّهٗ كَانَ مُخْلَصًا وَّكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. وَوَهَبْنَا لَهٗ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُوْنَ نَبِيًّا.

"স্মরণ কর, এই কিতাবে উল্লেখিত মূসার কথা, সে ছিল বিশুদ্ধচিত্ত এবং সে ছিল রাসূল, নবী। তাকে আমি আহবান করেছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ দিক থেকে এবং আমি অন্তরঙ্গ আলাপে তাকে নিকটবর্তী করেছিলাম। আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে নবীরূপে।" (সূরা মারয়াম ঃ ৫১ - ৫৩)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন ঃ

قَالَ يَا مُوْسٰى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ.

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। (সূরা আরাফ ঃ ১৪৪)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বরাতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমাকে তোমরা মূসা (আ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে না। কেননা, কিয়ামতের দিন যখন মানব জাতি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে, তখন আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে সংজ্ঞা ফিরে পাবো। তখন আমি মূসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলার আরশের একটি স্তম্ভ ধরে রয়েছে দেখতে পাব। আমি জানি না, তিনি কি অচেতন হয়েছিলেন? অতঃপর আমার পূর্বে তিনি চেতনা ফিরে পেলেন, নাকি তূরে অচেতন হওয়ার প্রতিদানে তিনি আদৌ অচেতনই হননি। একথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এ ধরনের উক্তি ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিনম্রতা ও বিনয়ের প্রকাশ স্বরূপ। কেননা, তিনি ছিলেন সর্বশেষ নবী, তিনি ছিলেন দুনিয়া ও আখিরাতে নিঃসন্দেহে আদম সন্তানের সর্দার। এর বিপরীত হওয়ার কোন অবকাশ নেই।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِهٖ. وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ. وَاٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنٰهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا.

"আমি তো তোমার কাছে ওহী প্রেরণ করেছি, যেমন নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের কাছে প্রেরণ করেছিলাম, ইবরাহীম, ইস্‌মাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁর বংশধরগণ ঈসা, আইয়ূব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মান-এর নিকটও ওহী প্রেরণ করেছিলাম এবং দাউদকে যাবূর দিয়েছিলাম। অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে আমি তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল, যাদের কথা তোমাকে বলিনি এবং মূসার সাথে আল্লাহ্ সাক্ষাত বাক্যালাপ করেছিলেন। (সূরা নিসা ঃ ১৬৩ - ১৬৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ آذَوْا مُوْسَى فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا .

"হে মুমিনগণ! মূসাকে যারা ক্লেশ দিয়েছে, তোমরা তাদের মত হয়ো না। ওরা যা রটনা করেছিল, আল্লাহ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন এবং আল্লাহর নিকট সে মর্যাদাবান। (সূরা আহযাব ঃ ৬৯)

ইমাম বুখারী (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন; মূসা (আ) ছিলেন এক লজ্জাশীল ও পর্দা রক্ষাকারী ব্যক্তি। শালীনতার কারণে তাঁর দেহের কোন অংশই দেখা যেতো না। তাই বনী ইসরাঈলের কিছু সংখ্যক লোক তাকে অপবাদ দিল ও বলতে লাগল, কোন রোগের কারণে তিনি নিজের পায়ের চামড়া কাউকে দেখতে দেন না। তিনি শ্বেত রোগ কিংবা একশিরা অথবা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সে সব দোষ থেকে মুক্ত বলে প্রতিপন্ন করতে ইচ্ছে করলেন। একদিন মূসা (আ) এক নির্জন স্থানে গোসল করছিলেন ও পাথরের উপর কাপড় রেখেছিলেন। যখন তিনি গোসল সেরে কাপড় পরার জন্যে কাপড় ধরতে গেলেন, অমনি পাথর কাপড় নিয়ে দৌড়াতে লাগল। মূসা (আ) হাতে লাঠি ধারণ করলেন ও পাথরের পেছনে ছুটলেন এবং বলতে লাগলেন, হে পাথর! আমার কাপড়, হে পাথর! আমার কাপড়। এমনিভাবে তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে বনী ইসরাঈলের গণ্যমান্য লোকদের সামনে হাযির হয়ে গেলেন। তখন তারা তাঁকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে নিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অপবাদ থেকে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণ করেন। পাথরটি থেমে গেল, মূসা (আ) আপন কাপড় তুলে নিয়ে পরে নিলেন আর পাথরকে তিনি লাঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন। তিনটি, চারটি কিংবা পাঁচটি আঘাতের কারণে পাথরের উপর অংশ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এই তথ্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে নিম্নের আয়াতে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ آذَوْا مُوْسَى فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا .

হে মু'মিনগণ! তোমরা ওদের মত হয়ো না, যারা মূসাকে ক্লেশ দিয়েছিল। ওরা যা রটনা করেছিল, আল্লাহ্ তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন এবং আল্লাহ্র নিকট সে মর্যাদাবান। (সূরা আহযাব ঃ ৬৯)

ইমাম আহমদ (র), ইমাম বুখারী (র) ও মুসলিম (র) বিভিন্ন সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। প্রাচীন কালের আলিমগণের কেউ কেউ বলেন, মূসা (আ)-এর মাহাত্ম্যের একটি ছিল—তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে আপন ভাই-এর ব্যাপারে সুপারিশ করেছিলেন এবং তাঁকে তার সাহায্যকারী হিসেবে পাওয়ার জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দরখাস্ত কবূল করেছিলেন এবং তাঁর ভাইকে নবীও করে দিয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا

আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভাই হারূনকে নবীরূপে। (সূরা মারয়াম ঃ ৫৩)

ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (সা) কিছু সম্পদ সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, এই বণ্টনের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে এসে তাঁকে তা জানালাম। তখন আমি তাঁর চেহারায় ক্রোধের ভাব লক্ষ্য করলাম। তখন তিনি ইরশাদ করেন, মূসা (আ)-এর উপর আল্লাহ্ তা'আলার রহমত বর্ষিত হোক। তাকে এর চাইতেও বেশি ক্লেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন। ইমাম মুসলিম (র)-ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র)-ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ তাঁর সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যেন কারোর দোষ সম্বন্ধে আমাকে অবহিত না করে। কেননা আমি চাই, যেন তোমাদের মধ্যে পরিষ্কার মন নিয়ে চলাফেরা করি। অর্থাৎ আমার মনে যেন তোমাদের কারো ব্যাপারে বিরূপ ধারণা না থাকে। বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন, ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে কিছু সম্পদ এসে পৌঁছল। তখন তিনি এগুলো বিতরণ করলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) বলেন, আমি দুই ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন একজন অন্যজনকে বলছিল, আল্লাহ্‌র শপথ, এই বিরতণে মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কিংবা আখিরাত কামনা করেন নি। তখন আমি সেখানে দাঁড়ালাম ও তাদের কথোপকথন শুনলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করলাম এবং বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি বলেছেন যে, আমার সাহাবীদের মধ্য হতে কেউ যেন আমার কাছে কারোর দুর্ণাম না করে। কিন্তু আমি অমুক ও অমুকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম আর তারা এরূপ এরূপ বলছিল। এতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চেহারা রক্তিম হয়ে গেল। তিনি এতে খুবই দুঃখ পেলেন এবং বললেন, "এসব বাদ দাও, মূসা (আ)-কে এর চাইতেও অধিক দুঃখ-কষ্ট দেয়া হয়েছিল। তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছিলেন।"

আবূ দাঊদ ও তিরমিযী (র) ভিন্ন সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মি'রাজের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মূসা (আ)-এর কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম কালে দেখেন, তিনি তাঁর কবরে সালাত আদায় করছেন।

সহীহায়নের অন্য হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, মি'রাজের রাতে ষষ্ঠ আসমানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। জিবরাঈল (আ) বললেন, ইনিই মূসা, একে সালাম করুন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'আমি তাকে সালাম করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, পুণ্যবান

নবী ও পুণ্যবান ভাইকে স্বাগতম।' রাসূল (সা) বলেন, যখন আমি তাঁকে অতিক্রম করি তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনি কাঁদছেন কেন?" তিনি বললেন, "আমার পরে একজন যুবককে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে, যার বেহেশতে প্রবেশকারী উম্মতের সংখ্যা আমার উম্মতের চাইতে বেশি হবে।" পক্ষান্তরে ইবরাহীম (আ) সপ্তম আসমানে অবস্থান করছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় ইবরাহীম (আ) ষষ্ঠ আসমানে এবং ঈসা (আ) সপ্তম আসমানে অবস্থান করছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পূর্বোক্ত বর্ণনা বিশুদ্ধতর।

বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের মতে, মূসা (আ) ষষ্ঠ আসমান এবং ইবরাহীম (আ) সপ্তম আসমানে বায়তুল মামুরের প্রতি পিঠ দিয়ে হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। বায়তুল মামুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা যিয়ারত করেন এবং তারা আর কোনদিন সেখানে আসেন না। তবে এ ব্যাপারে সমস্ত বর্ণনাকারীই একমত যে, আল্লাহ্ তা'আলা যখন মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর উম্মতের প্রতি দিনে-রাতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মূসা (আ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মূসা (আ) বললেন, আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে ফেরত যান এবং তাঁর কাছে আবেদন করুন, যেন তিনি আপনার উম্মতের জন্যে তা লাঘব করে দেন। কেননা, আমি আপনার পূর্বে বনী ইসরাঈলের আচরণে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। অথচ আপনার উম্মত চোখ, কান ও অন্তরের দিক থেকে বনী ইসরাঈল থেকে দুর্বলতর।

মূসা (আ)-এর পরামর্শে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে গিয়ে প্রতিবার হ্রাস করাতে করাতে শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তে পৌঁছলেন। এবার আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, এই নাও পাঁচ ওয়াক্ত কিন্তু সওয়াবের দিক থেকে তা হবে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মূসা (আ) উভয়কে আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ইমাম বুখারী (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদের কাছে তাশরীফ আনেন এবং বলেন, "আমার সম্মুখে সকল উম্মতকে পেশ করা হয়। তখন আমি একটি বিরাট দল দেখতে পেলাম যা দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। ঘোষণা করা হল যে, এই হচ্ছে মূসা (আ) ও তাঁর উম্মত। ইমাম বুখারী (র) সংক্ষিপ্ত আকারে এবং ইমাম আহমদ (র) বিস্তারিতভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "একদিন হুসায়ন ইব্‌ন আবদুর রহমান সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে ঐ তারকাটি দেখেছ, যা গত রাতে বিধ্বস্ত হয়েছে?" হুসায়ন (রা) বলেন, 'আমি দেখেছি।' এরপর তিনি আবার বলেন, 'আমি নামাযে ছিলাম না। কেননা আমাকে বিচ্ছু বা সাপ দংশন করেছিল।' তিনি বললেন, তখন তুমি কী করলে? তখন আমি বললাম, 'আমি ঝাড়-ফুঁক করাই।' তিনি বললেন, 'তুমি কেন তা করতে গেলে?' তখন আমি বললাম, 'বুরাইদাহ্ আসলামী (র) থেকে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে।' তিনি বলেন, ঝাড়-ফুঁক করা হয় অন্যের কুদৃষ্টি অথবা দংশন থেকে রক্ষা পাবার জন্যে।

সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র বলেন ঃ 'শ্রুত হাদীসের উপর যিনি হুবহু আমল করে থাকেন, তিনি উত্তম কাজই করে থাকেন।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ

(সা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ "সকল উম্মতকে আমার সামনে পেশ করা হলে আমি কোন নবীকে দেখলাম, তাঁর সাথে একটি ক্ষুদ্র দল রয়েছে, আবার কোন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেবল একজন কি দুইজন। আবার এমন নবীকেও দেখলাম যার সাথে একজন লোকও নেই। অতঃপর আমার কাছে একটি বিরাট জামাতকে উপস্থিত করা হলো। আমি বললাম, এরাই বুঝি আমার উম্মত। তখন বলা হল, এ হচ্ছে মূসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়। আমাকে বলা হল, এবার দিগন্ত রেখার দিকে তাকান। দেখতে পেলাম, একটি বিশাল দল। অতঃপর বলা হল, 'এদিকে একটু লক্ষ্য করুন!' দেখলাম, এ দিকেও একটি বিশাল দল। তখন বলা হল, 'এরাই হচ্ছে আপনার উম্মত। তাদের সাথে রয়েছে এমন সত্তর হাজার ব্যক্তি যারা বিনাহিসাবে এবং শাস্তি ভোগ ব্যতীতই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) উঠে দাঁড়ালেন এবং ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন সকলে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। তখন তারা বলাবলি করতে লাগলেন, এরা কারা হতে পারে, যারা বিনা হিসাবে ও আযাব ভোগ ব্যতীতই জান্নাতে প্রবেশ করবেন? কেউ কেউ বললেন, সম্ভবত তারা হচ্ছেন নবী করীম (সা)-এর সাহাবীগণ। আবার কেউ কেউ বললেন, সম্ভবত তারা হচ্ছেন ঐ সব ব্যক্তি যাঁরা ইসলামের যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কখনো কাউকে শরীক করেন নি। এ ধরনের অনেক কিছুই তাঁরা উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অতঃপর তাদের দিকে বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, তোমরা কাদের ব্যাপারে বলাবলি করছ? তখন তাঁরা তাদের কথোপকথন সম্বন্ধে তাকে অবহিত করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, "তারা হচ্ছে ঐ সব ব্যক্তি যাঁরা কপটতা করে না, যারা ঝাড়ফুঁকের আশ্রয় নেয় না। যাঁরা অশুভ নিয়ে কু-সংস্কারের আশ্রয় নেয় না এবং তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি ভরসা রাখে।"

এই হাদীস শুনে উক্কাশা ইব্ন মুহায়সিন আল আসাদী (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি তাদের একজন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তাদের একজন। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি দাঁড়িয় বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমিও তাদের একজন।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, উক্কাশা এ ব্যাপারে তোমার চাইতে অগ্রগামী হয়ে গেছে। এই হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। আমরাও কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা বর্ণনাকালে আবার এটার উল্লেখ করব। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ) সম্পর্কে কুরআনের বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন ও তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর কালামে মজীদে মূসা (আ)-এর কাহিনী কোথাও বিস্তারিত আবার কোথাও সংক্ষিপ্ত আকারে বহুবার উল্লেখ করেছেন। কুরআনের বহু স্থানে মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর প্রতি প্রেরিত কিতাবের পাশাপাশি মূসা (আ) ও তাঁর প্রতি প্রদত্ত কিতাব তাওরাত সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। যেমন সূরা বাকারায় রয়েছে ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ
أُوْتُوا الْكِتَابَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ—যখন আল্লাহ্র পক্ষ হতে তাদের নিকট রাসূল আসল, যে তাদের নিকট যা রয়েছে তার সমর্থক, তখন যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের একদল আল্লাহ্র কিতাবটিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল, যেন তারা জানে না। (সূরা বাকারা ঃ ১০১)

অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

الٓـمّٓ. اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ . نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ. مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوْ انْتِقَامٍ.

অর্থাৎ—আলিফ লাম মীম, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক। তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যা তার পূর্বের কিতাবের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করেছিলেন তাওরাত ও ইঞ্জীল ইতিপূর্বে; মানব জাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আর তিনি ফুরকানও অবতীর্ণ করেছেন। যারা আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী দণ্ডদাতা। (সূরা আল ইমরান ১ - ৪)

সূরায়ে আনয়ামে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَمَا قَدَرُوْا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ اِذْ قَالُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ اَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِيْ جَاءَ بِهٖ مُوْسٰى نُوْرًا وَّهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهٗ قَرَاطِيْسَ تُبْدُوْنَهَا وَتُخْفُوْنَ كَثِيْرًا وَعُلِّمْتُمْ مَالَمْ تَعْلَمُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَاؤُكُمْ. قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ .

তারা আল্লাহ্ তা'আলার যথার্থ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি; যখন তারা বলে, আল্লাহ্ মানুষের নিকট কিছুই নাযিল করেন নি। বল, কে নাযিল করেছেন মূসার আনীত কিতাব যা মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশ ছিল তা তোমরা বিভিন্ন পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করে কিছু প্রকাশ কর ও যার অনেকাংশ গোপন রাখ এবং যা তোমাদের পিতৃ-পুরুষগণ ও তোমরা জানতে না তাও শিক্ষা দেয়া হয়েছিল? বল, আল্লাহ্ই; তারপর তাদেরকে নিরর্থক আলোচনারূপ খেলায় মগ্ন হতে দাও। আমি এ কল্যাণময় কিতাব নাযিল করেছি, যা এর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যা দ্বারা তুমি মক্কা ও এর চতুর্পার্শ্বের লোকদেরকে সতর্ক কর, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে তারা তাতে বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের সালাতের হেফাজত করে। (সূরা আন'আম : ৯১-৯২)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাতের প্রশংসা করেছেন। অতঃপর কুরআনুল করীমের ততোধিক প্রশংসা করেছেন।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেন ঃ

ثُمَّ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِىْ اَحْسَنَ وَتَفْصِيْلًا لِكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُوْنَ . وَهٰذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

তারপর আমি মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব যা সৎকর্মপরায়ণের জন্য সম্পূর্ণ, যা সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ, পথ-নির্দেশ এবং দয়াস্বরূপ, যাতে তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্বন্ধে বিশ্বাস করে। এই কিতাব আমি নাযিল করেছি যা কল্যাণময়। সুতরাং এটার অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে। (সূরা আন'আম ঃ ১৫৪-১৫৫)

আল্লাহ্ তা'আলা সূরা মায়িদায় ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرٰةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيَاتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ. وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ.

নিশ্চয়ই আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম; তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো; নবীগণ যারা আল্লাহ্র অনুগত ছিল তারা ইহুদীদের সে অনুসারে বিধান দিত, আরো বিধান দিত রাব্বানীগণ এবং বিদ্বানগণ, কারণ তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল তার সাক্ষী। সুতরাং মানুষকে ভয় করবে না, আমাকেই ভয় করবে এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করবে না। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।

ইনজীল অনুসারীগণ যেন আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই ফাসিক। আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক রূপে। (সূরা মায়িদা ঃ ৪৪, ৪৭ ও ৪৮)

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল করীমকে অন্যান্য কিতাবের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালাকারী, এগুলোর সমর্থক অন্যান্য কিতাবে যা কিছু বিকৃতি ও পরিবর্তন করা হয়েছে তার প্রকাশকারীরূপে গণ্য করেছেন। কিতাবীদেরকে তাদের কিতাবসমূহের রক্ষক

নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তারা এগুলোর হিফাজত করতে পারেনি। এগুলো সংরক্ষণ ও এগুলোর পবিত্রতা রক্ষা করতে সমর্থ হয়নি। এ জন্যই তাদের নির্বুদ্ধিতা, জ্ঞানের স্বল্পতা, তাদের উপাস্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদির কারণে ঐ সব কিতাবে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আর তাদের প্রতিও কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত । এ জন্যেই তাদের কিতাবগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সম্পর্কে এমন সব স্পষ্ট ভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়, যেগুলোর কদর্যতা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

সূরায়ে আম্বিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى وَهَارُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِيْنَ. اَلَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُوْنَ. وَهٰذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ اَنْزَلْنَاهُ اَفَاَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ.

আমি তো মূসা ও হারূনকে দিয়েছিলাম ফুরকান, জ্যোতি ও উপদেশ, মুত্তাকীদের জন্যে যারা না দেখেও তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং তারা কিয়ামত সম্বন্ধে ভীত-সন্ত্রস্ত। এটা কল্যাণময় উপদেশ, আমি এটা অবতীর্ণ করেছি। তবুও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার কর? (সূরা আম্বিয়া ঃ ৪৮ - ৫০)

সূরায়ে কাসাসে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَا اُوْتِيَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ مُوْسٰى اَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَا اُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ. قَالُوْا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوْا اِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُوْنَ. قُلْ فَاْتُوْا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَا اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

তারপর যখন আমার নিকট থেকে তাদের নিকট সত্য আসল, তারা বলতে লাগল, মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, তাকে সেরূপ দেয়া হলো না কেন? কিন্তু পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? ওরা বলেছিল, দুটিই জাদু, একে অপরকে সমর্থন করে। এবং ওরা বলেছিল, 'আমরা সকলকে প্রত্যাখ্যান করি।' বল, তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহ্র নিকট হতে এক কিতাব আনয়ন কর, যা পথনির্দেশে এ দুটি থেকে উৎকৃষ্টতর হবে, আমি সেই কিতাব অনুসরণ করব। (সূরা কাসাস ঃ ৪৮ - ৪৯)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা উভয় কিতাব ও উভয় রাসূলের প্রশংসা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবার হতে ফিরে গিয়ে জিন্‌রা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, আমরা এমন একটি কিতাবের বাণী শুনেছি, যা মূসা (আ)-এর পরে অবতীর্ণ হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি প্রথম ওহী নাযিল হয় নিম্নরূপ ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ. اَلَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ.

পাঠ কর, তোমার প্রতি পালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না। (সূরা আলাক ঃ ১-৫)

এই প্রথম ওহী নাযিল হবার প্রেক্ষিতে যে ঘটনা ঘটেছিল তা শোনার পর ওয়ারকা ইব্‌ন নওফল বলেছিল, পবিত্র, পবিত্র, ইনিই সেই জিবরীল (নামূস) যিনি মূসা ইব্‌ন ইমরানের নিকট ওহী নিয়ে এসেছিলেন। মোটকথা, মূসা (আ)-এর শরীয়ত ছিল মহান, তাঁর উম্মতের সংখ্যা ছিল প্রচুর, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বহু নবী, আলিম-ইবাদতগোযার বান্দা, সাধুসন্ত, বুদ্ধিজীবী, বাদশাহ, আমীর-সর্দার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। কিন্তু তাঁরা যখন বিদায় নিলেন, তখন সে উম্মতের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিল। যেমন তাদের এবং তাদের শরীয়তেও বিকৃতি ঘটলো। তারা নিজ নিজ কর্মদোষে বানর ও শূকরে পরিণত হলো। একের পর এক বিধান রহিত হতে লাগল এবং তাদের উপর বিপদাপদ নেমে আসতে লাগল। তাদের এই ঘটনাসমূহ খুবই দীর্ঘ ও আলোচনা-সাপেক্ষ। তাই অতি সংক্ষেপে অবহিত হতে ইচ্ছুকদের জন্যে তার কিঞ্চিত বর্ণনা করা হবে।

মূসা (আ)-এর বায়তুল্লাহয় হজ্জ পালন

ইমাম আহমদ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সা) 'আল আযরাক' উপত্যকায় গমন করেন এবং প্রশ্ন করেন এটা কোন্ উপত্যকা? উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আল আযরাক উপত্যকা। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, আমি যেন মূসা (আ)-কে দেখতে পাচ্ছি, তিনি যেন রাস্তার মোড় থেকে অবতরণ করছেন এবং তালবিয়া সহকারে আল্লাহ্ তা'আলাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকছেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হারশা মোড়ে পৌঁছলেন এবং প্রশ্ন করলেন, এটা কোন্ মোড়? উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম বললেন, "এটা হারশা মোড়"। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আমি যেন ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা (আ)-কে দেখতে পাচ্ছি। তিনি একটি লাল রঙের উটের উপর সওয়ার রয়েছেন, তাঁর পরনে পশমের একটি জুব্বা এবং তাঁর উটের নাকের দড়ি ছিল খেজুর গাছের ছালের। তিনি তালবিয়া পড়ছেন। এই হাদীসটি মুসলিমও বর্ণনা করেছেন।

তাবারানী (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে মারফূ রূপে হাদীস বর্ণনা করেন যে, মূসা (আ) একটি লাল রঙের ষাঁড়ে সওয়ার হয়ে হজ্জ করেছিলেন। এ হাদীসটি অত্যন্ত গরীব পর্যায়ের।

ইমাম আহমদ (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা একদিন আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকটে ছিলাম। সকলে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। কেউ একজন বললেন, দাজ্জালের কপালে দুই চক্ষুর মাঝে লিখা থাকবে ك-ف-ر। ইব্‌ন আব্বাস (রা) মুজাহিদকে বলেন, 'তারা কি বলাবলি করছে?' মুজাহিদ (র) বললেন, তারা বলছেন, দাজ্জালের দুই চোখের মাঝখানে লিখা থাকবে ك-ف-ر। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আমি এরূপ কথা বলতে শুনিনি। তবে এই কথা বলতে শুনেছি, ইবরাহীম (আ) সম্বন্ধে জানতে হলে তোমাদের সাথীর দিকে অর্থাৎ আমার দিকে লক্ষ্য কর। আর মূসা (আ) ছিলেন ধূসর রংয়ের ব্যক্তি, তাঁর ছিল কোঁকড়ানো চুল। তিনি লাল রঙের

উটের উপর সওয়ার ছিলেন। উটের নাকের দড়ি ছিল খেজুর গাছের ছালের। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'আমি যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছি। আর তিনি উপত্যকা থেকে তালবীয়া পড়ায় রত অবস্থায় নেমে আসছেন।

ইমাম আহমদ (র) অন্য এক সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, '(মি'রাজের রাতে) ঈসা ইব্‌ন মারয়াম, মূসা (আ) ও ইবরাহীম (আ)-কে দেখেছি। তবে ঈসা (আ)-এর রঙ সাদা। তিনি ছিলেন কোঁকড়ানো চুল ও চওড়া বুকধারী। মূসা (আ) ছিলেন ধূসর রঙের এবং বিশালদেহী।' সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইবরাহীম (আ) কেমন ছিলেন? তিনি বললেন, 'তোমাদের সাথী অর্থাৎ আমার দিকে তাকাও।'

ইমাম আহমদ (র) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্‌র নবী বলেছেন, মিরাজের রাতে আমি মূসা (আ) ইব্‌ন ইমরানকে দেখেছি একজন দীর্ঘদেহী ও কোঁকড়ানো চুলধারী ব্যক্তি হিসেবে, মনে হয় যেন তিনি শানুয়া গোত্রের লোক। ঈসা ইব্‌ন মারয়াম (আ)-কে দেখেছি মাঝারি গড়ন, লাল-সাদা মিশ্রিত রং ও লম্বাটে মাথার অধিকারী।

ইমাম আহমদ (র) অন্য এক সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, 'মি'রাজের রাতে আমি মূসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করেছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর শারীরিক গঠন বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তিনি ছিলেন ঢেউ খেলানো চুলের অধিকারী, যেন তিনি শানুয়া গোত্রের একজন। এরপর আমি ঈসা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঈসা (আ)-এর শারীরিক গঠন বর্ণনা করেন এবং বলেন, তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের ও গৌরবর্ণের অধিকারী। মনে হয় তিনি যেন এইমাত্র গোসলখানা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম (আ)-কে দেখেছি। তাঁর বংশধরের মধ্যে তাঁর সাথে আমার অত্যধিক সামঞ্জস্য রয়েছে। ইবরাহীম (আ)-এর আলোচনায় এই ধরনের অধিকাংশ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

মূসা (আ)-এর ইন্তিকাল

ইমাম বুখারী (র) তাঁর 'সহীহ্ বুখারী'তে 'মূসা (আ)-এর ইন্তিকাল' শিরোনামে আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন মৃত্যুর ফেরেশতা (আযরাঈল)-কে মূসা (আ)-এর কাছে প্রেরণ করা হয়। যখন তিনি মূসা (আ)-এর কাছে আসলেন, তখন তিনি তাঁকে চপেটাঘাত করলেন। ফেরেশতা আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ফিরে গিয়ে আরয করলেন, 'আপনি আমাকে এমন এক বান্দার কাছে প্রেরণ করেছেন যিনি মৃত্যু চান না।' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, তাঁর কাছে পুনরায় যাও ও তাঁকে একটি ষাঁড়ের পিঠে হাত রাখতে বল এবং এ কথাটিও বল যে, তার হাতের নিচে যতগুলো চুল পড়বে তাঁকে তত বছরের আয়ু দেয়া হবে।' মূসা (আ) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তারপর কি হবে?' আল্লাহ্ বললেন, 'তারপর মৃত্যু।' তখন তিনি বললেন, 'তাহলে এখনই তা হয়ে যাক।'

বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আরয করলেন যেন তাঁকে একটি ঢিল নিক্ষেপের দূরত্বে পবিত্র ভূমি বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী করা হয়। আবূ হুরায়রা (রা)

বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, "যদি আমি সেখানে এখন থাকতাম, তাহলে ঐ স্থানটিতে তাঁর কবরটি তোমাদেরকে চিহ্নিত করে দেখাতাম। এটা রাস্তার পার্শ্বে 'লাল ঢিবির' নিকটে অবিস্থত।" ভিন্ন সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। ইমাম মুসলিম (র) ও ইমাম আহমদ (র) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে আহমদ (র)-ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর উক্তিরূপে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতা মূসা (আ)-এর নিকট আগমন করে বললেন, 'আপনি আপনার প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিন। তিনি তখন মৃত্যুর ফেরেশতাকে চপেটাঘাত করে তার একটি চোখ নষ্ট করে দেন। ফেরেশতা তখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি আমাকে আপনার এমন এক বান্দার কাছে প্রেরণ করেছেন, যিনি মৃত্যু চান না। তিনি আমার চোখ নষ্ট করে দিয়েছেন।' বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার চোখ নিরাময় করে দিলেন এবং বললেন, তুমি আমার বান্দার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, আপনি কি দীর্ঘায়ু চান? যদি আপনি দীর্ঘায়ু চান, তাহলে আপনি একটি ষাঁড়ের পিঠের উপর আপনার হাত রাখুন এবং আপনার হাতের নিচে যতগুলো লোম পড়বে তত বছরের আয়ু আপনাকে প্রদান করা হবে। মূসা (আ) বললেন, 'তারপর কি হবে?' আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, 'তারপর মৃত্যু।' মূসা (আ) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তাহলে অচিরেই মৃত্যু দেয়া হোক।' এ বর্ণনাটি শুধু ইমাম আহমদ (র)-এরই।

ইব্‌ন হিব্বান (র)-ও উপরোক্ত হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করে এ হাদীসে কিছু জটিলতা রয়েছে বলে ইঙ্গিত করে এগুলোর যে উত্তর প্রদান করেছেন তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

মৃত্যুর ফেরেশতা যখন মূসা (আ)-কে মৃত্যুর কথা বললেন, তখন তিনি তাঁকে চিনতে পারেননি। কেননা, তিনি মূসা (আ)-এর কাছে অপরিচিত অবয়বে আগমন করেছিলেন। যেমন একবার জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকটে এক বেদুঈনের অবয়বে আগমন করেছিলেন। ইবরাহীম (আ) ও লূত (আ)-এর নিকট ফেরেশতাগণ যুবকের অবয়বে এসেছিলেন। তাই তাঁরা তাঁদেরকে প্রথমে চিনতে পারেননি। অনুরূপভাবে মূসা (আ)-ও তাঁকে সম্ভবত চিনতে পারেননি, তাই তাঁকে চপেটাঘাত করে তাঁর চোখ নষ্ট করে দিয়েছিলেন। কেননা, তিনি বিনা অনুমতিতে মূসা (আ)-এর ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। এই ব্যাখ্যাটি আমাদের শরীয়তসম্মত। কেননা, যদি কেউ কারো ঘরের মধ্যে বিনা অনুমতিতে তাকায় তাহলে এভাবে তার চোখ ফুটো করে দেয়ার বৈধতা রয়েছে। অতঃপর তিনি হাদীসটি আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, একদা মূসা (আ)-এর রূহ কবয করার জন্যে মৃত্যুর ফেরেশতা মূসা (আ)-এর কাছে আগমন করে তাঁকে বলেন, আপনার প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিন! তখন মূসা (আ) মৃত্যুর ফেরেশতাকে চপেটাঘাত করলেন। তাতে তাঁর চোখ বিনষ্ট হয়ে যায়। এরপর তিনি সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন, যেমন ইমাম বুখারী (র)-ও এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

অতঃপর তিনি তার ব্যাখ্যায় বলেন, 'যখন মূসা (আ) মৃত্যুর ফেরেশতাকে চপেটাঘাত করার জন্যে হাত উঠালেন, তখন ফেরেশতা তাকে বললেন ঃ اجب ربك। অর্থাৎ "আপনার

প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিন।" তাঁর এ ধরনের ব্যাখ্যা যথার্থ বলে মেনে নেয়া যায় না, কেননা মূল পাঠে তাকে চপেটাঘাত করার বিষয়টি 'প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দিন' বলার পরের ঘটনা বলে উল্লেখিত হয়েছে। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটি মূল পাঠের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কেননা, মূসা (আ) মৃত্যুর ফেরেশতাকে চিনতে পারেন নি। ঐ নির্দিষ্ট সময়টিতে ফেরেশতা রূহ কবয করার জন্যে আসবেন এরূপ ধারণা করাও হয়নি। কেননা, মূসা (আ) অনেক কিছু করার আশা পোষণ করেছিলেন আর সেই সব কাজ বাকি রয়ে গিয়েছিল। যেমন মূসা (আ) ময়দানে তীহ থেকে বের হয়ে পবিত্র ভূমি বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যে, তিনি হারূন (আ)-এর পর 'তীহ' প্রান্তরে ইনতিকাল করবেন। অচিরেই এ সম্পর্কে বর্ণনা পেশ করা হবে।

কোন কোন তাফসীরকার মনে করেন, মূসা (আ) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে তীহ ময়দান থেকে বের হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছিলেন। এই অভিমতটি কিতাবীদের ও জমহুর উলামার অভিমতের পরিপন্থী। আর এটা মূসা (আ)-এর সেই দু'আর সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ যাতে তিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি ঢিল নিক্ষেপের তফাতে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী করুন। যদি তিনি তথায় প্রবেশই করে ফেলতেন, তাহলে তিনি এরূপ দু'আ করতেন না। কিন্তু তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের সাথে তীহ প্রান্তরে ছিলেন। যখন তাঁর মৃত্যু সন্নিকট হল, তখন তিনি যেই পবিত্র ভূমিতে হিজরত করার জন্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেই ভূমির নিকটবর্তী হবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং নিজের সম্প্রদায়কে এই কাজে অনুপ্রাণিত করলেন, কিন্তু তাদের ও তাদের আকাঙ্ক্ষিত পবিত্র ভূমির মাঝে ভাগ্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্যই সারা দুনিয়ার জন্যে প্রেরিত রাসূল ও মানব-কুল শিরোমনি মুহাম্মদ (সা) ইরশাদ করেন, 'যদি আমি সেখানে যেতাম, তাহলে তোমাদেরকে লাল ঢিবির কাছে মূসা (আ)-এর কবর দেখাতাম।'

ইমাম বুখারী (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন, মি'রাজের রাতে যখন আমি মূসা (আ)-এর কাছে গমন করলাম তখন আমি তাঁকে লাল ঢিবির নিকট তাঁর কবরে সালাত আদায় করতে দেখলাম।

ইমাম মুসলিম (র)-ও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। সুদ্দী (র) ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন, আমি হারূন (আ)-কে মৃত্যু দান করব। তাই তাঁকে অমুক পাহাড়ে নিয়ে আস। নির্দেশ মুতাবিক মূসা (আ) ও হারূন (আ) নির্দেশিত পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হলেন। পথে তাঁরা এমন একটি গাছ দেখতে পেলেন, যেরূপ গাছ কেউ কোনদিন দেখেনি। এরপর তাঁরা একটি পাকা ঘর দেখতে পেলেন, সেখানে একটি খাট রয়েছে এবং খাটে সুসজ্জিত বিছানাও রয়েছে। আর ঘরে তখন সুবাতাস খেলছে।

হারূন (আ) যখন পাহাড় ও ঘরের দিকে তাকালেন তখন এগুলো তাঁর কাছে খুবই ভাল লাগল। তাই তিনি বললেন ঃ 'হে মূসা! আমি এই খাটে ঘুমাতে চাই।' মূসা (আ) বললেন, আপনার ভাল লাগলে আপনি এখানে ঘুমিয়ে পড়ুন। হারূন (আ) বললেন, তবে আমার ভয়

হচ্ছে, ঘরের মালিক যদি এসে আমার উপর রাগান্বিত হন। মূসা (আ) বললেন, এ ব্যাপারে আপনি কোন ভয় করবেন না, ঘরের মালিকের ব্যাপারটি আমিই দেখব। আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। তিনি বললেন, 'হে মূসা! তুমিও আমার সাথে ঘুমিয়ে পড়। যদি ঘরের মালিক আসেন তাহলে তিনি আমাদের দু'জনের প্রতিই রাগান্বিত হবেন।' যখন তাঁরা দু'জনই ঘুমিয়ে পড়লেন, হারূন (আ)-কে মৃত্যু স্পর্শ করল। যখন তিনি ব্যাপারটি টের পেলেন, তখন বললেন, "হে মূসা! তুমি আমাকে ফাঁকি দিয়েছ।" হারূন (আ) যখন ইন্তিকাল করলেন, ঘর, গাছ ও খাট আসমানে উঠিয়ে নেয়া হল। অতঃপর মূসা (আ) যখন তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসলেন, অথচ হারূন (আ)-ও তার সাথে নেই, তখন বনী ইসরাঈলরা বলতে লাগল, "নিশ্চয়ই মূসা হারূনকে হত্যা করেছেন। বনী ইসরাঈলরা হারূন (আ)-কে যেহেতু অধিকতর ভালবাসে, সে জন্য মূসা হিংসা করে হারূন (আ)-কে হত্যা করেছেন। বস্তুত মূসা (আ) থেকে বনী ইসরাঈলের কাছে হারূন (আ) ছিলেন অধিকতর নমনীয়। পক্ষান্তরে মূসা (আ)-এর মধ্যে ছিল কিছুটা কঠোরতা। "মূসা (আ) একথা শুনে তাদেরকে বললেন, "তোমাদের জন্য আমাদের আফসোস, তোমরা কি জান না, তিনি ছিলেন আমার সহোদর । তোমরা কি করে ভাবলে যে, আমি তাঁকে হত্যা করতে পারি? যখন তারা এ বিষয় নিয়ে মূসা (আ)-কে অধিক জ্বালাতন করতে লাগল, তখন তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করলেন ও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করলেন। তখন খাটটি উপর থেকে নিচে নেমে আসল এবং তারা সকলে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী জায়গায় হারূন (আ)-এর লাশটি দেখতে পেল।

অতঃপর মূসা (আ) ও তাঁর খাদেম ইউশা (আ) একদিন পায়চারী করছিলেন। এমনি সময় একটি কাল বাতাস বইতে লাগল। ইউশা (আ) সেদিকে তাকালেন এবং এটাকে কিয়ামতের আলামত বলে ধারণা করলেন। তখন তিনি মূসা (আ)-কে জড়িয়ে ধরলেন এবং বলতে লাগলেন, কিয়ামত সমাগত আর আমি আল্লাহর নবী মূসা (আ)-কে জড়িয়ে ধরে আছি। মূসা (আ) তখন জামার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং ইউশা (আ)-এর হাতে জামা রয়ে গেল। ইউশা (আ) জামা নিয়ে যখন বনী ইসরাঈলের কাছে আসলেন, তখন তারা তাঁকে অভিযুক্ত করে বলতে লাগল, "তুমি আল্লাহর নবীকে হত্যা করেছ।" তিনি বললেন, না, আল্লাহ্র শপথ, আমি তাঁকে হত্যা করিনি। বরং তিনি আমার হাত থেকে ছুটে চলে গেছেন। তারা তাঁর কথা বিশ্বাস করল না এবং তাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। ইউশা (আ) বললেন, "যেহেতু তোমরা আমাকে বিশ্বাস করছ না, সেহেতু আমাকে তিন দিনের অবকাশ দাও।" অতঃপর তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন। ফলে যত জন ইউশা (আ)-কে পাহারা দিত সকলকে স্বপ্নে দেখানো হল যে, ইউশা (আ) মূসা (আ)-কে হত্যা করেন নি বরং তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। ফলে তারা ছেড়ে দিল। অন্যদিকে মূসা (আ)-এর সাথে যারা দুর্ধর্ষ লোকদের কবলিত পবিত্র শহর বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেছিল তাদের কেউই এ শহরের বিজয়ের সময় অবশিষ্ট ছিল না। সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। তবে উপরোক্ত বর্ণনার সূত্রে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। আল্লাহ্ই অধিকতর জ্ঞাত। পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, মূসা (আ)-এর সাথে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্য হতে ইউশা ইব্‌ন নূন (আ) ও কালিব ইব্‌ন ইউকান্না (আ) ব্যতীত অন্য কেউ তীহ প্রান্তর থেকে বের হতে পারেনি। কালিব

ছিলেন মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর বোন মারয়ামের স্বামী। তাঁরা উল্লেখিত দুই ব্যক্তি ইসরাঈলদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন।

ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ্ (র) উল্লেখ করেছেন যে, একদিন মূসা (আ) একদল ফেরেশতার নিকট আগমন করলেন। তারা তখন একটি কবর খুঁড়ছিলেন। এই কবর থেকে উত্তম, সুন্দর ও মনোরম কবর কখনও দেখা যায়নি। তিনি ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা কার জন্যে এই কবরটি খুঁড়ছেন? তাঁরা বললেন, "এটা আল্লাহ্ তা'আলার এক বান্দার জন্যে যিনি খুবই সম্মানিত। যদি আপনি এরূপ সম্মানিত বান্দা হতে চান তাহলে এ কবরে প্রবেশ করুন। বহুক্ষণ এখানে সটান শুয়ে পড়ুন এবং আপনার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করুন এবং আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিতে থাকুন। তিনি তাই করলেন ও ইন্তিকাল করলেন। ফেরেশতাগণ তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন এবং তাঁকে দাফন করেন।

কিতাবীরা ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করেন যে, মূসা (আ) যখন ইন্তিকাল করেন তখন তাঁর বয়স ছিল একশ বিশ বছর। ইমাম আহমদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে মারফূ হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন; পূর্বে মৃত্যুর ফেরেশতা জনগণের কাছে প্রকাশ্যে আগমন করতেন। তাই একদিন মূসা (আ)-এর কাছেও প্রকাশ্যে আগমন করলেন। অমনি মূসা (আ) তাঁকে চপেটাঘাত করে তাঁর চোখ নষ্ট করে দেন। ফেরেশতা প্রতিপালকের কাছে আগমন করলেন ও বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দা মূসা (আ) আমার চোখ বিনষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি যদি আপনার কাছে সম্মানিত না হতেন তাহলে আমি তাঁর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করতাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, "হে ফেরেশতা! তুমি আমার বান্দার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল যে, সে যেন একটি ষাঁড়ের পিঠের উপর তার হাত রাখে। তাতে তার হাতের নিচে যতটি লোম পড়বে তাকে তত বছরের আয়ু দেয়া হবে। মূসা (আ) বললেন, তারপর কী হবে? তিনি বললেন, "তারপর মৃত্যু।" মূসা (আ) বললেন, "তাহলে তা এখনই হোক।" বর্ণনাকারী বলেন, মৃত্যুর ফেরেশতা তাঁকে একটি বস্তুর ঘ্রাণ নিতে দিলেন এবং এভাবে তাঁর রূহ কবয করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা মৃত্যুর ফেরেশতার চোখ নিরাময় করে দিলেন। এরপর থেকে মৃত্যুর ফেরেশতা লোকজনের কাছে গোপনে আসেন। ইব্ন জারীর তাবারী (র)-ও অনুরূপ হাদীস মারফূ'ভাবে বর্ণনা করেন।

ইউশা (আ)-এর নবুওত লাভ এবং বনী ইসরাঈলের দায়িত্ব গ্রহণ

তিনি হলেন ইউশা ইব্ন নূন ইব্ন আফরাসীম ইব্ন ইউসুফ (আ), ইব্ন ইয়াকূব (আ), ইব্ন ইসহাক (আ), ইব্ন ইবরাহীম খলীল (আ)। কিতাবীরা বলেন, "ইউশা হলেন হুদ (আ)-এর চাচাতো ভাই। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে খিযির (আ)-এর ঘটনা প্রসঙ্গে ইউশা (আ)-এর নাম উল্লেখ না করে তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰهُ 'স্মরণ কর, যখন মূসা তার খাদেমকে বলেছিল'। বুখারী শরীফেও উবায়

ইব্ন কা'ব (রা) থেকে নাম ধরে তাঁর বর্ণনা এসেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন যে, তিনি হলেন ইউশা ইব্ন নূন (আ)। কিতাবীদের মধ্যে তাঁর নবুওত সম্পর্কে ঐকমত্য রয়েছে। তাদের একটি দল যারা সামিরাহ বলে বিখ্যাত, তারা মূসা (আ)-এর পর ইউশা ইব্ন নূন (আ) ব্যতীত কারো নবুওত স্বীকার করে না। তাওরাতে ইউশা (আ)-এর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই তারা ইউশা (আ) ব্যতীত অন্যের নবুওতকে অস্বীকার করে। অথচ অন্যদের নবুওত প্রতিপালকের তরফ থেকে সত্য ও যথার্থ। তাদের উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত বর্ষিত হতে থাকবে।

ইব্ন জারীর প্রমুখ তাফসীরকার, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন; মূসা (আ)-এর শেষ জীবনে মূসা (আ) হতে ইউশা (আ)-এর দিকে নবুওত স্থানান্তরিত হয়। মূসা (আ) ইউশা (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করে প্রশ্ন করতেন যে, কি কি নতুন আদেশ-নিষেধ অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন ইউশা (আ) বল্লেন, "হে কালীমুল্লাহ্! আমি আপনাকে কোন দিনও প্রশ্ন করিনি যে, আপনার কাছে আল্লাহ্ তা'আলা কী ওহী প্রেরণ করেছেন, আপনিই বরং প্রয়োজনে আমাকে নিজের পক্ষ থেকে ওহী সম্পর্কে ব্যক্ত করতেন।" তখন মূসা (আ) বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করলেন এবং মৃত্যুকেই শ্রেয় বিবেচনা করলেন। উপরোক্ত বর্ণনায় সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা মূসা (আ)-এর কাছে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সর্বদাই আল্লাহ্র আদেশ, ওহী, শরয়ী নির্দেশ ও কথাবার্তা অবতীর্ণ হত এবং তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আজীবন সম্মানিত, যোগ্য, মর্যাদাবান ও দক্ষতাসম্পন্ন নবী রূপেই ছিলেন। বুখারী শরীফে মূসা (আ) কর্তৃক মৃত্যুর ফেরেশতার চোখ বিনষ্ট করা সম্পর্কিত হাদীসটি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক (র)-এর উপরোক্ত বর্ণনাটি যদি তিনি আহলি কিতাবদের কিতাব থেকে বর্ণনা করে থাকেন তাহলে জেনে রাখা দরকার যে, তাদের তাওরাত নামী কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, মূসা (আ)-এর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের প্রয়োজন মুতাবিক আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-এর প্রতি আদেশ-নিষেধ সংক্রান্ত ওহী অবতীর্ণ করেছেন। তাঁবু আকৃতির গম্বুজে স্থাপিত সাক্ষ্যদানে তাবূত সম্বন্ধে তাদের কিতাবে উল্লেখিত তথ্যাদি পর্যালোচনা করলে তা সহজেই প্রতীয়মান হয়। বনী ইসরাঈলের তৃতীয় যাত্রা পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে যে, বনী ইসরাঈলকে ১২টি গোত্রে বিভক্ত করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। আবার প্রতিটি গোত্রের একজন আমীর নির্ধারণ করার জন্যে হুকুম দিয়েছিলেন। আমীরকে বলা হতো নকীব। তীহ ময়দান থেকে বের হবার পর দুর্ধর্ষ জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি হিসেবে তাদেরকে এরূপ বিভক্ত করার হুকুম দেয়া হয়েছিল। আর এ নির্দেশটি ছিল চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হবার শেষের দিকে। এ জন্যই কেউ কেউ বলেছেন, 'মূসা (আ) মৃত্যুর ফেরেশতার চোখ বিনষ্ট করে দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি তাঁকে তাঁর ঐ সময়ের অবয়বে চেনেননি। অধিকন্তু আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর যমানায় যেটা সংঘটিত হবার তিনি আশা পোষণ করছিলেন কিন্তু তাঁর আমলে এটা সংঘটিত হওয়া তকদীরের ফয়সালা ছিল না। বরং এটা তাঁর খাদেম ইউশা ইবন নূনের ভাগ্যেই নির্ধারিত ছিল।

যেমন রাসূলুল্লাহ্ (স) সিরিয়ার রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছে করেছিলেন এবং এজন্য নবম হিজরীতে তিনি তাবূকে পৌঁছেও ছিলেন। কিন্তু ঐ বছর তিনি যুদ্ধ না করে ফিরে আসেন। অতঃপর দশম হিজরীতে তিনি হজ আদায় করেন ও মদীনায় ফিরে এসে উসামা (রা)-কে আমীর নিযুক্ত করেন। তাঁর জীবদ্দশায় সিরিয়ার উদ্দেশে একটি সেনাদল প্রেরণের প্রস্তুতির নির্দেশ দেন এবং নিম্ন বর্ণিত আয়াতের মর্মানুযায়ী স্বয়ং যুদ্ধে যাবার প্রস্তুতি নেন।

যাতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ .

যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহে ঈমান আনে না, শেষ দিনেও নয়। এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন, তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করেনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়। (সূরা তওবা : ২৯)

রাসূলুল্লাহ (সা) উসামা বাহিনী প্রস্তুত করার সাথে সাথেই ইনতিকাল করেন। তখন উসামা জুরাফ নামক স্থানে স্থাপিত তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পর তাঁর খলীফা আবূ বকর সিদ্দিক (রা) উসামা বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করেন। অতঃপর যখন আরব উপদ্বীপের অবস্থা স্বাভাবিক হয় ও নিজেদের অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের অবসান ঘটে এবং সত্য তার নিজস্ব পথে অগ্রসর হয়, পূর্ব-পশ্চিমে ইরাক-সিরিয়ায় এবং পারস্য সম্রাট কিসরার সাথী-সংগীও রোম সম্রাট কায়সরের বাহিনীর বিরুদ্ধে ইসলামী বাহিনী প্রেরণ করা হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিজয় দান করেন এবং শত্রু পক্ষের জানমালের অধিকারী করে দেন। এ সম্বন্ধে ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-কে বনী ইসরাঈল থেকে সৈন্য সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে নকীব নির্ধারণ করতে হুকুম দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا .

আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের অংগীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্য হতে বারজন নেতা নিযুক্ত করেছিলেন। (সূরা মায়েদা ঃ ১২)

وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مَعَكُمْ لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِيْ وَعَزَّرْتُمُوْهُمْ وَاَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَلَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ .

আর আল্লাহ বলেছিলেন, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; তোমরা যদি সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও, আমার রাসূলগণে ঈমান আন ও তাদেরকে সম্মান কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান কর, তবে তোমাদের পাপ অবশ্যই মোচন করব এবং নিশ্চয় তোমাদেরকে দাখিল করব জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এর পরও কেউ কুফরী করলে সে সরল পথ হারাবে। (সূরা মায়েদা ঃ ১২)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে উদ্দেশ করে বলেন, তোমাদের প্রতি আমি যা বাধ্যতামূলক করেছি তা যদি তোমরা যথাযথ পালন কর এবং যুদ্ধ থেকে বিরত না থাক—যেমন পূর্বে বিরত ছিলে তাহলে এটার সওয়াবকে আমি তোমাদের উপর পতিত গযব ও শাস্তির কাফফারা রূপে গণ্য করব। এ প্রসঙ্গে হুদায়বিয়ার যুদ্ধে যে সব বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে পিছু হটে রয়েছিল তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِىْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ أَوْيُسْلِمُوْنَ فَإِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا.

যে সব আরব মরুবাসী পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বল, তোমরা আহূত হবে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে; তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এ নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন। আর তোমরা যদি পূর্বের মত পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন। (সূরা ফাত্হ ঃ ১৬)

অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রেও বলেছেন ঃ

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ.

'এরপরও তোমাদের কেউ কুফরী করলে সে সরল পথ হারাবে।' অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দুষ্কর্মের ও ওয়াদাভঙ্গের জন্য তিরস্কার করেন। যেমন তাদের পর খৃস্টানদের ধর্মীয় ব্যাপারে মতবিরোধের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তিরস্কার করেন। এ সম্পর্কে তাফসীরের কিতাবে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে বনী ইসরাঈলের ঐসব যোদ্ধার নাম লিপিবদ্ধ করার জন্যে নির্দেশ দেন যারা অস্ত্রধারণ করতে পারে, যুদ্ধ করতে পারে এবং বিশ বছর কিংবা তার অধিক বয়সে পৌঁছেছে আর তাদের প্রতিটি দলের জন্যে একজন নকীব তথা নেতা নির্ধারণেরও তিনি হুকুম দেন।

প্রথম গোত্রটি ছিল রূবীল-এর গোত্র। রূবীল ছিলেন ইয়াকূব (আ)-এর প্রথম সন্তান। এ গোত্রে যোদ্ধার সংখ্যা ছিল ৪৬ হাজার ৫শ'। তাদের নেতা ছিলেন আল ইয়াসূর ইব্ন শাদ ইয়াসূরা।

দ্বিতীয় গোত্রটি ছিল শামউন-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৫৯ হাজার ৩শ'। তাদের নেতা ছিলেন শালো মীঈল ইবন হুরইয়া শুদাই।

তৃতীয়টি ছিল ইয়াহুদা-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৭৪ হাজার ৬শ'। তাদের নেতা ছিলেন নাহশূন ইবন ওমায়না দাব।

চতুর্থ ছিল ঈশাখার-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৫৪ হাজার ৪শ'। তাদের নেতা ছিলেন নাশাঈল ইবন সাওগার।

পঞ্চম গোত্রটি ছিল ইউসুফ (আ)-এর। তাদের সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার ৫শ'। তাদের নেতা ছিলেন ইউশা ইবন নূন (আ)।

ষষ্ঠ ছিল মীশা-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৩১ হাজার ২শ'। তাদের নেতা ছিলেন জামলীঈল ইবন ফাদাহ সূর।

সপ্তম গোত্রটি ছিল বিন ইয়ামীন-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার ৪শ'। তাদের নেতা ছিলেন আবীদান ইবন জাদউন।

অষ্টম গোত্রটি ছিল হাদ-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৪৫ হাজার ৬শ' ৫০ জন। তাদের নেতা ছিলেন আল ইয়াসাফ ইবন রাউঈল

নবমটি ছিল আশীর-এর। তাদের সংখ্যা ছিল ৪১ হাজার ৫শ'। তাদের নেতা ছিলেন ফাজ-ঈল ইবন আকরান।

দশম গোত্রটি ছিল দান-এর। তাদের সংখ্যা ছিল ৬২ হাজার ৭শ'। নেতা ছিলেন আখী আযার ইব্‌ন আম শুদাই।

একাদশতম গোত্রটি ছিল নাফতালী-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৫৩ হাজার ৪শ'। তাদের নেতা ছিলেন আখীরা ইব্‌ন আইন।

দ্বাদশতম গোত্রটি ছিল যাবূলূন-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ৫৭ হাজার ৪শ'। তাদের নেতা ছিলেন আলবাব ইবন হাইলূন। উপরোক্ত বর্ণনাটি ইহুদীদের কিতাবে উল্লেখিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক পরিজ্ঞাত।

বনু লাওয়ী উপরোক্ত বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বনী ইসরাঈলের সাথে যোদ্ধা হিসাবে গণ্য করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, তারা ছিল তাঁবু-গম্বুজের বহন, খাটানো ও গুটানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা ছিল মূসা (আ) ও হারূন (আ)-এর গোত্র। তাদের সংখ্যা ছিল ২২ হাজার। এ সংখ্যার মধ্যে ১ মাস বা তদূর্ধ বয়সের শিশুদেরকেও ধরা হয়েছে। তারা আবার নিজেরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি ছোট ছোট গোত্র তাঁবু গম্বুজের বিভিন্ন কাজের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল। একদল এটাকে পাহারা দিত, অন্য একদল এটার যাবতীয় মেরামতের কাজে নিয়োজিত থাকত। যখন বনী ইসরাঈলরা অন্যত্র গমন করত, তখন একটি দল তাঁবু পরিবহন ও খাটানোর কাজে নিয়োজিত থাকত। তারা সকলেই তাঁবু গম্বুজের আশেপাশে, সামনে, পেছনে, ডানে ও বামে হেফাজতে নিয়োজিত থাকত।

বনু লাওয়ী ব্যতীত বনী ইসরাঈলের যোদ্ধাদের মোট সংখ্যা যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে ৫ লাখ ৭১ হাজার ৬শ' ৫৬; কিন্তু তারা বলে ২০ বছর বয়স্ক ও তদূর্ধের অস্ত্র ধারণকারী বনী ইসরাঈলের যোদ্ধাদের সংখ্যা হচ্ছে (তা অবশ্য বনু লাওয়ীকে বাদ দিয়ে) ৬

লাখ ৩ হাজার ৫শ' ৫৫ জন। এরূপ বর্ণনায় সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেননা, তাদের কিতাবে উল্লেখিত উপরোক্ত সৈন্যদের মোট সংখ্যার সাথে তাদের উল্লেখিত সৈন্য সংখ্যার মিল নেই। আল্লাহ্ তা'আলাই অধিক পরিজ্ঞাত।

চলার সময় তাঁবু-গম্বুজের হেফাজতে নিযুক্ত বনু লাওয়ীরা বনী ইসরাঈলের মধ্যভাগে অবস্থান করতেন। আর ডান-পাশের শীর্ষে থাকতেন বনু রুবীল ও বাম পার্শ্বের শীর্ষে থাকতেন বনুবান। বনু নাফতালী হতেন পশ্চাৎবর্তী দলে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে মূসা (আ) বনু হারূন (আ)-কে ইমাম নির্ধারণ করলেন। তাদের পূর্বে তাদের পিতারাও এরূপ ইমাম ছিলেন। তারা ছিলেন নাদাব; হুবকারাহ, আবীহু, আল আযির ও ইয়াসমার।

বস্তুত বনী ইসরাঈলের যারা মূসা (আ)-কে বলেছিল, তুমি ও তোমার প্রতিপালক শত্রুর সাথে গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে রইলাম। অর্থাৎ যারা দুর্দান্ত লোকজন অধ্যুষিত শহর বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল, তাদের একজনও তখন জীবিত ছিল না।

এটা সাওরী (র)-এর অভিমত। তিনি ইবন আব্বাস (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেন। অনুরূপভাবে কাতাদা (র), ইকরিমা (র) ও সুদ্দী (র), ইব্ন আব্বাস (রা), ইবন মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-সহ পূর্ব ও পরের উলামায়ে কিরাম বলছেন, হারূন (আ) ও মূসা (আ) উভয়েই ইতোপূর্বে তীহের প্রান্তরে ইনতিকাল করেছিলেন। তবে ইবন ইসহাক (র) মনে করেন যে, যিনি বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেছেন, তিনি হচ্ছেন মূসা (আ) আর ইউশা (আ) ছিলেন তাঁর অগ্রগামী দলের প্রধান। তিনি আবার এ প্রসঙ্গে বালআম ইব্ন বাউর-এর ঘটনাও বর্ণনা করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِىْ اٰتَيْنَاهُ اٰيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلٰكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْتَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ. سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا وَاَنْفُسَهُمْ كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ.

তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও যাকে আমি দিয়েছিলাম নিদর্শন, অতঃপর সে ওটা বর্জন করে ও শয়তান তার পেছনে লাগে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি ইচ্ছে করলে এটার দ্বারা তাকে উচ্চমর্যাদা দান করতাম কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে ও তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। তার অবস্থা কুকুরের মত, যার ওপর তুমি বোঝা চাপালে সে হাঁপাতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপালেও হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও এরূপ; তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত কর যাতে তারা চিন্তা করে। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে ও নিজেদের প্রতি জুলুম করে তাদের অবস্থা কত মন্দ! (সূরা আ'রাফ : ১৭৫-১৭৭)

বালয়াম ইবন বাওর-এর ঘটনা তাফসীরে উল্লেখ রয়েছে। ইবন আব্বাস (রা) প্রমুখ উল্লেখ করেছেন যে, সে ইসমে আযম জানত। তার সম্প্রদায় তাকে মূসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের উপর অভিশাপ দিতে অনুরোধ করেছিল। প্রথমত সে বিরত ছিল কিন্তু যখন তারা তাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করল, তখন সে তার একটি গাধার উপর আরোহণ করল। এরপর বনী ইসরাঈলের শিবিরের দিকে অগ্রসর হল। যখন সে তাদের নিকটবর্তী হল, তখন গাধাটি তাকে নিয়ে বসে পড়ল। সে গাধাটিকে মারধর করতে লাগল। গাধাটি দাঁড়িয়ে কিছু দূর চলার পর আবার বসে পড়ল। তখন সে গাধাটিকে আগের চাইতে অধিক মার দিল। গাধাটি দাঁড়াল, পরে আবার বসে পড়ল। তখন সে আবার গাধাটিকে অধিক জোরে পিটাতে লাগল। তখন গাধাটির মুখে ভাষা ফুটল। সে বালয়ামকে বলতে লাগল, হে বালয়াম! তুমি কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি ফেরেশতাদের দেখছ না–তাঁরা আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে তীব্রভাবে বাধা দিচ্ছেন? তুমি কি আল্লাহ্‌র নবী ও মু'মিনদের অভিশাপ দেওয়ার জন্য যাচ্ছ? তবু সে বিরত রইল না, সে আবার গাধাটিকে মার দিল।

গাধাটি অগ্রসর হল এবং হাসবান পাহাড়ের চূড়ার নিকটবর্তী হল। বালয়াম মূসা (আ)-এর শিবির ও বনী ইসরাঈলের দিকে তাকালো এবং তাদেরকে অভিশাপ দিতে লাগল। তবে তার জিহবা তার এখতিয়ারে ছিল না। সে মূসা (আ) ও তাঁর সম্প্রদায়ের জন্যে আশীর্বাদ করতে লাগল এবং তার নিজের সম্প্রদায়ের উপর অভিশাপ দিতে লাগল। তার সম্প্রদায় তাকে এ জন্য তিরস্কার করতে লাগল। তখন সে তার সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং বলল যে, সে তার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। তার জিহবা ক্রমেই ঝুলে পড়ছিল এবং তা শেষ পর্যন্ত বুকের উপর গিয়ে পড়ল। সে তার সম্প্রদায়কে বলতে লাগল, আমার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হয়ে গেল। প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি ব্যতীত আমার জন্যে আর কোন পথই বাকি রইলো না। তারপর সে তার সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিল তারা যেন তাদের নারীদেরকে বিশেষ সাজে সজ্জিত করে পণ্য বিক্রয়ের ছলে মূসা (আ)-এর সৈন্যদের কাছে পাঠায়। তারা তাদের কাছে মালপত্র বিক্রয় করবে ও নিজেদেরকে তাদের কাছে সমর্পণ করবে যাতে তারা তাদের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। কেননা, তাদের মধ্য হতে যদি একজনও ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে এটা তাদের সকলের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। তারা এরূপ করল। তাদের নারীদের বিশেষভাবে সজ্জিত করল এবং তাদেরকে বনী ইসরাঈল শিবিরে পাঠাল। তাদের মধ্যকার কুস্তি নাম্নী একজন নারী বনী ইসরাঈলের একজন সরদারের কাছে গেল। তার নাম ছিল যামরী ইবন শালূম। কথিত আছে যে, সে ছিল বনু শামাউন ইবন ইয়াকূব (আ)-এর গোত্রের সরদার। সে তখনই এই নারীটিকে নিয়ে তার তাঁবুতে প্রবেশ করল ও তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হল। আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাইলের প্রতি প্লেগ রোগ পাঠালেন। এ রোগ তাদের মধ্যে ছড়াতে লাগল। এই সংবাদ যখন ফিনহাস ইবন আযার ইবন হারূন-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি তার লোহার বর্শা হাতে ঐ তাঁবুতে ঢুকে তাদের দুইজনকেই বিদ্ধ করলেন। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে ঘরের বের হয়ে জনসমক্ষে আসলেন। তখন তাঁর হাতে ঐ হাতিয়ারটিও ছিল। পুরুষ ও মহিলা উভয়ের লাশ তিনি ঘরের বাইরে নিয়ে আসেন এবং আকাশের দিকে লাশ দু'টি তুলে ধরে বললেন, হে

আল্লাহ্! আপনার অবাধ্যের সাথে আপনি এরূপ আচরণই করে থাকেন। এরপর প্লেগের প্রকোপ প্রশমিত হয়ে যায়। ঐ প্লেগ মহামারীতে সত্তর হাজার লোক মারা গিয়েছিল। যারা এ সংখ্যা কম করে বলেন, তারাও বিশ হাজার লোক মারা গিয়েছিল বলে থাকেন।

ফিনহাস ছিলেন তাঁর পিতার প্রথম সন্তান। তার পিতা আল আযার ছিলেন হারূন (আ)-এর পুত্র। এ জন্য বনী ইসরাঈলরা কুরবানীর পশুর নিতম্ব, বাহু ও চোয়াল ফিনহাস বংশীয়দের প্রাপ্য বলে মনে করত। অনুরূপভাবে তাদের সবকিছুর প্রথমটি তাদের প্রাপ্য বলে মনে করত। বালয়ামের উপরোক্ত ঘটনাটি ইবন ইসহাক (র) বর্ণনা করেন। আর তা যথার্থই বলে বুযুর্গানে দীনের অনেকেই মন্তব্য করেছেন। তবে হয়ত মিসর থেকে প্রথমবার বায়তুল মুকাদ্দাস প্রবেশের জন্যে মূসা (আ) যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন তিনি তা বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু কোন কোন বর্ণনাকারী তা অনুধাবনে সক্ষম হননি। ইতিপূর্বেও এ সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা তাওরাতের বরাতে উদ্ধৃত করা হয়েছে। আল্লাহই অধিক পরিজ্ঞাত। আবার এ ঘটনাটি তীহ ময়দানে ভ্রমণকালে সংঘটিত একটি ভিন্ন ঘটনাও হতে পারে। কেননা, এ ঘটনার বর্ণনায় হাসবান পাহাড়ের উল্লেখ রয়েছে। তা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বহু দূরে অবস্থিত। অথবা এ ঘটনা ছিল মূসা (আ)-এর বাহিনীর যারা ইউশা ইবন নূন (আ)-এর নেতৃত্বে বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশে তীহ ময়দান থেকে বের হয়ে এসেছিল তাদের—যেমন সুদ্দী (র) বলেছেন।

উপরোক্ত বিভিন্ন মতামতের প্রেক্ষিতে জমহুর উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, হারূন (আ) তাঁর ভাই মূসা (আ)-এর প্রায় দু'বছর পূর্বে তীহ প্রান্তরে ইনতিকাল করেন। তারপর মূসা (আ)ও সেখানেই ইনতিকাল করেন। একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, মূসা (আ) তাঁর প্রতিপালকের কাছে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী স্থানে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দু'আ করেছিলেন এবং তা কবূলও হয়েছিল।

বনী ইসরাঈল যাঁর সাথে তীহ ময়দান থেকে বের হয়েছিল এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল, তিনি ছিলেন ইউশা ইব্ন নূন (আ)। কিতাবীরা ও অন্যান্য ইতিহাসবেত্তা উল্লেখ করেন যে, ইউশা ইবন নূন (আ) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে জর্দান নদী অতিক্রম করে উরায়হায় পৌঁছলেন। উরায়হা ছিল ময়দানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মজবুত প্রাচীরঘেরা দুর্গ, সুউচ্চ অট্টালিকাপূর্ণ জনবহুল শহর। তিনি এ শহরটিকে ছয় মাস অবরোধ করে রাখেন। অতঃপর একদিন ইউশা (আ)-এর সৈন্যরা শহরটি আক্রমণ করলেন এবং যুদ্ধের শিংগায় ফুঁক এবং সমস্বরে তাকবীর দিতে লাগলেন, শহরের প্রাচীরগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হল এবং প্রাচীরের একটি বিধ্বস্ত অংশ দিয়ে ইউশা (আ)-এর সৈন্য দুর্গে ঢুকে গেলেন। তারা প্রচুর গণিমত লাভ করলেন এবং বার হাজার নারী-পুরুষকে হত্যা করলেন। এভাবে তারা বহু রাজরাজড়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।

এরূপও কথিত আছে যে, ইউশা (আ) সিরিয়ার একত্রিশজন রাজার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন আবার এরূপও বর্ণিত রয়েছে যে, উপরোক্ত শহরটির অবরোধ জুম'আর দিন আসরের পর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। যখন সূর্য অস্ত যায় কিংবা অস্ত্র যাওয়ার উপক্রম হয় ও তাদের জন্য তাদের শরীয়তে নিষিদ্ধ শনিবার প্রায় আগত, তখন ইউশা (আ) সূর্যকে লক্ষ্য করে

বললেন, তুমি অস্ত যাবার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত, আর আমিও এই শহরকে জয় করার জন্য নির্দেশ প্রাপ্ত। হে আল্লাহ! সূর্যকে আমার জন্যে ঠেকিয়ে রাখুন। শহরটি জয়লাভ করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা সূর্যকে ইউশা (আ)-এর জন্য ঠেকিয়ে রাখলেন। অন্যদিকে আলাহ্ তা'আলা চাঁদকে হুকুম দিলেন—যেন উদয় হতে বিলম্ব করে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত রাতটি ছিল পূর্ণিমার রাত। সূর্যের ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে যা একটু পরেই আমরা আলোচনা করছি। তবে চাঁদের ব্যাপারটি কিতাবীদের দ্বারা বর্ণিত এবং তা হাদীসের পরিপন্থী নয়; বরং এটা অতিরিক্ত। এ বর্ধিত অংশকে সত্য বা মিথ্যা বলা যায় না। তারা আরো উল্লেখ করেন যে, এ ঘটনাটি ঘটেছিল উরায়হা বিজয়কালে। তবে এতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা অধিক পরিজ্ঞাত। অধিকতর গ্রহণযোগ্য মতামত হচ্ছে— এ ঘটনাটি ঘটেছিল বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়কালে। মূল লক্ষ্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় আর উরায়হা বিজয় ছিল তার উপায় মাত্র।

ইমাম আহমদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন—ইউশা (আ) ব্যতীত অন্য কারোর জন্যে সূর্যকে নিশ্চল করে রাখা হয়নি। এ বর্ণনাটি শুধু ইমাম আহমদ (র) থেকেই বর্ণিত। তবে এটা ইমাম বুখারী (র)-এর শর্ত অনুযায়ী সূত্রে বর্ণিত। এ হাদীসের দ্বারা বোঝা যায়, বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মিত হয় ইউশা ইবন নূন (আ)-এর হাতে, মূসা (আ)-এর হাতে নয়। আর সূর্যের নিশ্চলতা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়কালে, উরায়হা বিজয় করার সময় নয়। এ কথা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। আবার এটাও বোঝা যায় যে, সূর্যকে নিশ্চল করে রাখা ছিল ইউশা (আ)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বর্ণনার দ্বারা নিম্নোক্ত হাদীসের দুর্বলতাও বোঝা যায়, যাতে বলা হয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আলী (রা)-এর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিলেন। সে জন্য আলী (রা) আসরের নামায আদায় করতে পারেননি। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আবেদন করলেন, যেন সূর্যকে তার জন্য ফিরিয়ে দেয়া হয়— যাতে তিনি আসরের নামায আদায় করতে পারেন। তখন সূর্যকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। উপরোক্ত হাদীস আলী ইবন সালেহ আল মিসরী (র) বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু এটা মুনকার হাদীস যার মধ্যে বিশুদ্ধতার লেশমাত্র নেই। এমনকি এটাকে হাসান পর্যায়ের হাদীসও বলা যায় না। এ ঘটনাটি বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হওয়াই ছিল স্বাভাবিক অথচ এক পর্যায়ে আহলে বায়তের কোন একজন মাত্র অপরিচিত মহিলা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন একজন নবী যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। তখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেন, যে ব্যক্তি নব বিবাহিত, এখনও বাসর রাত যাপন করেনি, সে যেন আমার সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত না হয়, আর এমন ব্যক্তিও যেন অন্তর্ভুক্ত না হয়—যে ঘরের ভিত্তি পত্তন করেছে কিন্তু এখনও তার ছাদ দিতে পারেনি। আবার এমন ব্যক্তিও যেন অন্তর্ভুক্ত না হয়, যে বকরী কিংবা মেষ খরিদ করেছে ও শাবক জন্মের অপেক্ষায় রয়েছে। অতঃপর তিনি যুদ্ধ করতে করতে এমন সময় শহরের নিকটবর্তী হলেন, যখন আসরের সালাত

আদায় করা হয় কিংবা তিনি বলেন, আসরের ওয়াক্তের নিকটবর্তী হন। তখন তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি যেমন নির্দেশপ্রাপ্ত তেমনি আমিও নির্দেশপ্রাপ্ত। হে আল্লাহ! এটাকে ক্ষণকাল আমার জন্যে নিশ্চল করে রাখুন! অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান পর্যন্ত সূর্যকে নিশ্চল করে রাখেন। নবীর সৈন্যগণ গনীমতের মাল এক স্থানে জড়ো করলেন এবং আগুন এগুলোকে গ্রাস করার জন্যে আসল কিন্তু গ্রাস করতে অস্বীকার করল। তখন তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কেউ এ গনীমতের মাল হতে কিছু মালে খিয়ানত করেছ, কাজেই তোমাদের প্রতি গোত্র থেকে একজন করে আমার কাছে বায়আত কর। তারা বায়আত করলো। একজনের হাত নবীর হাতের সাথে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের গোত্রের লোকই গনীমতের মাল আত্মসাৎ করেছে। কাজেই তোমাদের গোত্রের লোকজনকে বল, আমার বায়আত গ্রহণ করতে। গোত্রের সকলে তাঁর হাতে বায়আত হল, কিন্তু দুই বা তিনজনের হাত নবীর হাতের সাথে আটকিয়ে গেল। তখন নবী বললেন, তোমাদের কাছে চুরির মাল রয়েছে। তোমরাই আত্মসাৎকারী। তখন তারা একটি গরুর মাথা পরিমাণ স্বর্ণ বের করে দিল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা তা গনীমতের মালের সাথে রেখে দিল। মাল ময়দানে রাখা ছিল। এরপর আগুন অগ্রসর হয়ে আসল এবং মালগুলোকে গ্রাস করে নিল। আমাদের উম্মতের পূর্বে কারোর জন্য গনীমতের মাল বৈধ ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করে গনীমতের মাল আমাদের জন্য বৈধ করে দিলেন। উপরোক্ত সূত্রে শুধু ইমাম মুসলিম (র)-ই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

বাযযায (র)ও অন্য সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মোদ্দাকথা, যখন ইউশা (আ) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে শহরের দরজায় পৌঁছেন তখন তাদেরকে বিনীতভাবে শহরে প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতি মতে মহান বিজয় দান করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সেজন্য তাদেরকে অনুনয়-বিনয়ের সাথে শোকর গোযার হয়ে ও রুকূ অবস্থায় প্রবেশ করতে হুকুম দেয়া হল। তাদেরকে আরো হুকুম দেয়া হল, যেন তারা প্রবেশ করার সময় মুখে উচ্চারণ করে حطة অর্থাৎ পূর্বে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করতে অস্বীকার করে আমরা ও আমাদের পূর্ব পুরুষেরা যে ভুল করেছিলাম সেই ভুল ক্ষমা কর। আর এজন্যই মক্কা বিজয়ের সময় যখন রাসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি উটের উপর আরোহণ করে অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহর শোকর গোযার ও প্রশংসাকারী রূপে প্রবেশ করেন। তিনি মাথা এতই নিচু করেছিলেন যে, তাঁর পবিত্র দাড়ি জিনের গদি স্পর্শ করছিল। আর তাঁর সাথে ছিল এমন সৈন্য-সামন্ত যাদের মাথানত থাকার কারণে শুধু চোখের কাল অংশই দেখা যাচ্ছিল। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (সা) যে সবুজ বাহিনীতে অবস্থান করছিলেন তাদের অবস্থা এরূপ ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কায় পৌঁছে গোসল করেন ও আট রাকাত সালাত আদায় করেন। এই সালাত সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের দুইটি মতামত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল শোকরানা সালাত। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মহা বিজয় দান করেছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন,এটা ছিল চাশতের সালাত। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) চাশতের ওয়াক্তে এই সালাতটি আদায় করেন। বনী ইসরাঈল কথায় ও কাজে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের বিরোধিতা করেছিল

এবং নিতম্বের ওপর ভর করে দ্বারে প্রবেশ করেছিল ও বলতে ছিল حبة فى شعرة অর্থাৎ বীজ তার খোসায়। অন্য বর্ণনা মতে, তারা বলেছিল حنطة فى شعرة অর্থাৎ গম তার খোসায়। মোটকথা, তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারা তা পাল্টে দিয়েছিল ও এ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল। মক্কী সূরা আল আ'রাফের উক্ত ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيْئَاتِكُمْ. سَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ. فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَظْلِمُوْنَ.

স্মরণ কর, তাদেরকে বলা হয়েছিল, এ জনপদে বাস কর এবং যেখানে ইচ্ছা আহার কর এবং বল, ক্ষমা চাই এবং নতশিরে দরজায় প্রবেশ কর। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব। আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে আরও অধিক দান করব। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জালিম ছিল তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তার পরিবর্তে তারা অন্য কথা বলল। সুতরাং আমি আকাশ থেকে তাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করলাম— যেহেতু তারা সীমালংঘন করেছিল। (সূরা আরাফ ঃ ১৬১-১৬২)

মাদানী সূরা আলবাকারায় ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذْ قُلْنَا ادْخُلُوْا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيْدُ الْمُحْسِنِيْنَ. فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ.

স্মরণ কর, যখন আমি বললাম, এ জনপদে প্রবেশ কর, যা ইচ্ছা এবং যেখানে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর, নতশিরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং বল, ক্ষমা চাই। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মপরায়ণ লোকদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব। কিন্তু যারা অন্যায় করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। সুতরাং অনাচারীদের প্রতি আমি আকাশ থেকে শাস্তি প্রেরণ করলাম, কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিল। (সূরা বাকারা ঃ ৫৮-৫৯)

সাওরীর (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে আয়াতংশ وَّادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا -এর তাফসীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি বলেছেন— এটার অর্থ হচ্ছে ছোট দরজা দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর। হাকিম (র), ইবন জারীর (র), ইবন আবূ হাতিম (র) এবং আওফী (র) ইবন

আব্বাস (রা) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। সাওরী (র) থেকে ভিন্ন সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। মুজাহিদ, সুদ্দী ও যাহ্হাক (র) বলেন, উপরোক্ত দরজাটি ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের বায়তে ঈলিয়ার বাবে হিত্তা।

আবদুল্লাহ ইবন মাসঊদ (রা) বলেন, তারা নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের মাথা উঁচিয়ে প্রবেশ করে। তবে এটি ইবন আব্বাস (রা)-এর মতের পরিপন্থী নয়। ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন যে, তারা তাদের নিতম্বের উপর ভর দিয়ে প্রবেশ করেছিল। তারা মাথা উঁচিয়ে নিতম্বের ওপর ভর দিয়ে প্রবেশ করেছিল বলে একটি হাদীস পরবর্তীতে আসছে।

আয়াতাংশে উল্লেখিত وَقُوْلُوْا حِطَّةٌ এ 'ওয়াও' অক্ষরটি অবস্থা জ্ঞাপক -حاليه সংযোজক অব্যয় (عاطفة) নয়। অর্থাৎ—তোমরা (حطة) বলতে বলতে নতশিরে প্রবেশ কর। ইবন আব্বাস (রা), আতা, হাসান বসরী, কাতাদা, রাবী (র) বলেন, তাদেরকে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

ইমাম বুখারী (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : বনী ইসরাঈলকে বলা হয়েছিলে, নতশিরে দরজায় প্রবেশ কর, حطة বল কিন্তু তারা তাদের নিতম্বের ওপর ভর করে প্রবেশ করেছিল। এভাবে তারা حطة এর পরিবর্তে বলেছিল حبة فى شعرة অর্থাৎ চুলের মধ্যে বীজ রয়েছে। অনুরূপভাবে নাসাঈ (র) মওকূফ রূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আবদুর রাজ্জাক (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা নতশিরে বায়তুল মুকাদ্দাসের দ্বারে প্রবেশ কর এবং বল حطة অর্থাৎ ক্ষমা চাই, তাহলে তোমাদের তাবৎ পাপ মাফ করে দেব। কিন্তু তারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ পরিবর্তন করে নিতম্বের ওপর ভর করে حنطة فى شعرة বলতে বলতে বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে। ইমাম বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তিরমিযী (র) হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র) আবূ হুরায়রা ও ইবন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে সে বর্ণনায় حبة فى شعرة এর স্থলে তারা حنطة فى شعيرة বলেছিল বলে উল্লেখ আছে। যার অর্থ হচ্ছে যবের মধ্যে গম।

মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করে আসবাত (র) আয়াতাংশ ঃ

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ-এর তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, নিজ ভাষায় বনী ইসরাঈল বলেছিল ঃ هطى سقاثا ازمة مزبا আরবী অর্থ হচ্ছে ঃ

حبة حنطة حمراء متقوبة فيها شعرة سوداء .

অর্থাৎ 'লাল গমের বীজ যার মধ্যে খচিত ছিল কাল দানা।'

আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল করীমে উল্লেখ করেছেন যে, তাদের ঐ বিরোধিতার জন্যে তিনি আযাব নাযিল করেছিলেন। আর এই আযাব হচ্ছে প্লেগ, যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে উল্লেখ রয়েছে। উসামা ইবন যায়িদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূল (সা) ইরশাদ করেন—এই ব্যথা কিংবা রোগ (প্লেগ) একটি আযাব, তোমাদের পূর্বে কোন কোন সম্প্রদায়কে এর মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয়েছিল।

ইমাম নাসাঈ (র) ও ইবন আবূ হাতিম (র) সাদ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা) উসামা ইবন যায়দ ও খুযায়ম (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, প্লেগ রোগটি একটি আযাব, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে এর মাধ্যমে আযাব দেয়া হয়েছিল। পাঠটি ইব্ন আবূ হাতিমের। যাহ্হাক (র) ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, رجز শব্দটির অর্থ হচ্ছে আযাব।

অনুরূপভাবে মুজাহিদ, আবূ মালিক, সুদ্দী, হাসান বসরী (র) ও কাতাদা (র) বলেছেন ঃ

আবুল আলীয়া (র) বলেন رجز -এর অর্থ গযব। শাবী বলেন رجز শব্দটির অর্থ প্লেগ কিংবা তুষারপাত। সাঈদ ইবন জুবায়র (রা) বলেন, তা হচ্ছে প্লেগ।

যখন বনী ইসরাঈল বায়তুল মুকাদ্দাসে আধিপত্য বিস্তার করে, তখন থেকেই তারা সেখানে বসবাস করতে থাকে। আর তাদের মধ্যে ছিলেন আল্লাহর নবী ইউশা (আ)। আল্লাহর কিতাব তাওরাতের নির্দেশ মুতাবিক তিনি তাদের প্রশাসন কার্য পরিচালনা করতেন। অতঃপর তিনি একশ' সাতাশ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি মূসা (আ)-এর ইন্তিকালের পর সাতাশ বছরকাল জীবিত ছিলেন।

খিযির (আ) ও ইলিয়াস (আ)-এর ঘটনা

খিযির (আ) সম্পর্কে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাঁর নিকট থেকে ইলমে লাদুন্নী অর্জন করার জন্যে মূসা (আ) তাঁর কাছে গমন করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দু'জনের ঘটনা তাঁর পবিত্র গ্রন্থের সূরা কাহাফে বর্ণনা করেছেন। উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে তাফসীরে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। আমরা সেখানে ঐ হাদীসটিরও উল্লেখ করেছি যাতে খিযির (আ)-এর নাম স্পষ্ট উল্লেখিত হয়েছে। আর যিনি তাঁর কাছে গমন করেছিলেন, তিনি ছিলেন বনী ইসরাঈলের নবী মূসা (আ) ইবন ইমরান, যাঁর প্রতি তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছিল।

খিযির (আ)-এর নাম, বংশ পরিচয়, নবুওত ও অদ্যাবধি জীবিত থাকা সম্পর্কে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তার কিছু বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হল :

হাফিজ ইবন আসাকির (র) বলেন, কথিত আছে যে, খিযির (আ) আদম (আ)-এর ঔরসজাত সন্তান।

তিনি দারা কুতনীর বরাতে—ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, যে, খিযির (আ) আদম (আ)-এর ঔরসজাত সন্তান। দাজ্জালকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার সময় পর্যন্ত তাকে আয়ু দান করা হয়েছে। এই হাদীসটি 'মুনকাতে' এবং গরীব পর্যায়ের।

আবূ হাতিম (র) বলেন, আমার উস্তাদ আবূ উবায়দাহ প্রমুখ বলেছেন, আদম সন্তানদের মধ্যে দীর্ঘতম আয়ুর অধিকারী হচ্ছেন খিযির (আ) আর তার নাম হচ্ছে খাযরুন। তিনি ছিলেন আদম (আ)-এর পুত্র কাবীল এর সন্তান। তিনি আরো বলেন, ইবন ইসহাক (র) উল্লেখ করেছেন, যখন আদম (আ)-এর মৃত্যুর সময় হল, তখন তিনি তাঁর সন্তানদেরকে জানালেন যে, একটি প্লাবন আসন্ন। তিনি তাদেরকে ওসীয়ত করলেন, তারা যেন তাঁর মৃতদেহ তাদের সাথে নৌযানে উঠিয়ে নেয় এবং তার নির্দেশিত স্থানে তাঁকে দাফন করে। যখন প্লাবন সংঘটিত হল, তখন তারা তাঁর লাশ তাদের সাথে উঠিয়ে নিলেন আর যখন তারা অবতরণ করলেন, তখন নূহ (আ) তাঁর পুত্রদের নির্দেশ দিলেন, যেন তারা তাঁকে তাঁর ওসীয়ত মত নির্দিষ্ট স্থানে দাফন করেন। তখন তাঁরা বলতে লাগলেন, পৃথিবী এখনও বসবাসযোগ্য হয়ে উঠেনি। এখনো তা' নিভৃত নির্জন। তখন নূহ (আ) তাদেরকে দাফনের কাজে উৎসাহিত করলেন। তিনি বললেন, 'আদম (আ)-এর দাফনের দায়িত্ব যিনি নেবেন, তাকে দীর্ঘায়ু করার জন্যে আদম (আ) আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছিলেন। ঐ সময় তাঁরা দাফনের নির্দেশিত স্থানে যেতে ভীতিবোধ করলেন। ফলে আদম (আ)-এর দেহ তাদের কাছেই রয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত খিযির (আ) আদম (আ)-এর দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। এবং আল্লাহ্ তা'আলাও তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যত দিন চান, খিযির (আ) ততদিন জীবিত থাকবেন।

ইবনে কুতায়বা তাঁর মাআরিফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, খিযির (আ)-এর নাম বালিয়া।

কেউ কেউ বলেন, তার নাম ঈলীয়া ইবন মালকান, ইবন ফালিগ ইবন আবির, ইবন শালিখ, ইবন আর-ফাখশায, ইবন সাম, ইবন নূহ (আ)।

ইসমাঈল ইবন আবূ উয়ায়েস (র) বলেন, আমাদের জানা মতে, খিযির (আ)-এর নাম হচ্ছে— মামার ইবন মালিক ইবন আবদুল্লাহ ইবন নসর ইবন লাযিদ।

আবার কেউ কেউ বলেন, খিযির (আ)-এর নাম হচ্ছে—খাযিরুন ইবন আমীয়াঈল, ইবন ইয়াফিয ইবন ঈস, ইবন ইসহাক, ইবন ইবরাহীম খলীল (আ)। কেউ কেউ বলেন, তাঁর নাম আরমীয়া ইবন খালকীয়া। আল্লাহ তা'আলাই অধিক পরিজ্ঞাত।

কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন মূসা (আ)-এর সমসাময়িক মিসরের সম্রাট ফিরআউনের পুত্র। এটা অত্যন্ত দুর্বল অভিমত।

ইবনুল জাওযী (র) বলেন, উপরোক্ত অভিমতটি মুহাম্মদ ইবন আইয়ূব, ইবন লাহীয়া থেকে বর্ণনা করেন। আর তারা দু'জনই হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বল।

কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন ইবন মালিক ও ইলিয়াস (আ)-এর ভাই। এটা সুদ্দী (র)-এর অভিমত।

কেউ কেউ বলেন, তিনি যুলকারনায়নের অগ্রবর্তী বাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন এমন এক মুমিন বান্দার পুত্র, যিনি ইবরাহীম খলীল (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিলেন এবং তাঁর সাথে হিজরতও করেছিলেন।

কেউ কেউ বলেন, তিনি বাশতাসিব ইবন লাহরাসিরের যুগে নবী ছিলেন।

ইবন জারীর তাবারী (র) বলেন, শুদ্ধমত হল যে, তিনি ছিলেন আফরীদূন ইবন আসফীয়ান-এর যুগের প্রথম দিকের লোক এবং তিনি মূসা (আ)-এর যুগ পেয়েছিলেন। হাফিজ ইবন আসাকির (র) সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রা) থেকে বর্ণনা করেন—তিনি বলেন, খিযির (আ)-এর মা ছিলেন রোম দেশীয় এবং পিতা ছিলেন পারস্য দেশীয়।

এরূপ বর্ণনাও পাওয়া যায়—যাতে বোঝা যায় যে, তিনি ছিলেন ফিরআউনের যুগে বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত।

আবূ-যুরআ (র) دلائل النبوة এ উবাই ইবন কা'ব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সা) মিরাজের রাতে সুগন্ধি অনুভব করেন। তখন তিনি বলেন, হে জিবরাঈল! এই সুগন্ধি কিসের? জবাবে জিবরাঈল (আ) বললেন, এটা ফিরআউন কন্যার চুল বিন্যাসকারিণী মহিলা, তার কন্যা ও তার স্বামীর কবরের সুগন্ধি। আর এই সুগন্ধির সূচনা হয়েছিল নিম্নরূপ ঃ

খিযির (আ) ছিলেন বনী ইসরাঈলের সম্মানিত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর রাস্তায় ছিল এক ধর্মযাজকের ইবাদতখানা। তিনি খিযির (আ)-এর সন্ধান পান এবং তাকে সত্যধর্ম ইসলামের শিক্ষা দেন। খিযির (আ) যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হন, তখন তার পিতা তাকে বিবাহ দেন। তখন খিযির (আ) তাঁর স্ত্রীকে ইসলাম শিক্ষা দেন এবং তার থেকে প্রতিশ্রুতি নেন যে, তিনি তা কারো কাছে

ব্যক্ত করবেন না। খিযির (আ) যেহেতু স্ত্রী সংসর্গে যেতেন না, তাই তিনি তাকে তালাক দেন। তারপর তার পিতা তাকে অন্য এক মহিলার সাথে বিবাহ দেন। তিনি তাকেও ইসলাম শিক্ষা দেন এবং তার থেকেও প্রতিশ্রুতি নেন যে, তিনি কারো কাছে তা ব্যক্ত করবেন না। অতঃপর তিনি তাঁকেও তালাক দেন। তাদের একজন তা প্রকাশ না করলেও অপরজন প্রকাশ করে দিল। তাই তিনি পলায়ন করলেন এবং সাগরের একটি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সেখানে দু'জন কাঠুরিয়া তাঁকে দেখতে পায়। তাদের মধ্য হতে একজন তাঁর কথা গোপন রাখল কিন্তু অন্যজন প্রকাশ করে দিল। সে বলল, আমি ইযকীল অর্থাৎ খিযির (আ)-কে দেখেছি। তাকে বলা হল, তুমি ইযকীলকে দেখেছ, তবে তোমার সাথে আর কে দেখেছে? সে বলল, আমার সাথে অমুকও দেখেছে। তাকে প্রশ্ন করা হল, তখন সে এ সংবাদটি গোপন করল। আর তাদের ধর্মে এ রীতি ছিল, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলত তাকে হত্যা করা হত, তাই তাকে হত্যা করা হল। ঘটনাচক্রে ইতিপূর্বে গোপনকারী ব্যক্তিটি পূর্বোক্ত গোপনকারিণী মহিলাকে বিয়ে করেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, একদিন মহিলাটি ফিরআউনের কন্যার চুল আঁচড়াচ্ছিল, এমনি সময় তার হাত থেকে চিরুনিটি পড়ে যায়, তখন সে বলে উঠল—ফিরআউন ধ্বংস হোক। কন্যা তার পিতাকে এ সংবাদটি দিল। ঐ মহিলাটির স্বামী ও দুইটি পুত্র ছিল। ফিরআউন তাদের কাছে দূত পাঠাল এবং মহিলা ও তার স্বামীকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করতে প্ররোচিত করল কিন্তু তাঁরা তাতে অস্বীকৃতি জানাল। তখন সে বলল, 'আমি তোমাদের দু'জনকে হত্যা করব। তাঁরা বললেন, যদি তুমি আমাদেরকে হত্যাই কর তাহলে আমাদেরকে এক কবরে দাফন করলে তবে এটা হবে আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ। বর্ণনাকারী বলেন, এর চেয়ে অধিক সুগন্ধি আর কখনও পাওয়া যায়নি। মহিলাটি জান্নাতের অধিকারী হন। আর এই মহিলাটিই ছিল ফিরআউনের কন্যার সেবিকা, যার ঘটনা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

খিযির (আ)-এর ব্যাপারে চিরুনির ঘটনাটি সংক্রান্ত উক্তি সম্ভবত উবাই ইবন কা'ব (রা) কিংবা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

কেউ কেউ বলেন, খিযির (আ)-এর উপনাম ছিল আবুল আব্বাস। তবে খিযির তাঁর উপাধি ছিল– এটাই অধিক গ্রহণযোগ্য।

ইমাম বুখারী (র) আবূ হুরায়রা (রা)-এর বরাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন। খিযির (আ)-কে খিযির বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এজন্য যে, একদিন তিনি একটি সাদা চামড়ার উপর বসেছিলেন। অকস্মাৎ দেখা গেল তাঁর পেছন থেকে সাদা চামড়াটি সবুজ আকার ধারণ করে কেঁপে উঠল।

অনুরূপভাবে আবদুর রাজ্জাক (র) বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, হাদীস শরীফে উল্লেখিত فروة শব্দটির অর্থ হচ্ছে সাদা শুকনো ঘাস এবং এরূপই অন্য জিনিস যেমন শুকনো তূষ।

খাত্তাবী (র) বলেন, আবূ উমর (র) বলেছেন فروة এর অর্থ হচ্ছে শুভ্র রংয়ের ভূমি যার উপর কোন ঘাস জন্মেনি।

কেউ কেউ বলেন, এটা ছিল সাদা তূষ; রূপক অর্থে ফারওয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থেই বলা হয়ে থাকে فروة الرأس এটার অর্থ হচ্ছে, চুলসহ মাথার চামড়া। যেমন আরবী কবি রাঈ বলেন,

ولقد ترى الحبشى حول بيوتنا جذلا اذا ما نال يوما جعدا اصك كأن

فروة رأسه بذرت فانبت جانباه فلفلا.

অর্থাৎ— তুমি আমাদের ঘরের পাশে কাফ্রীটিকে আনন্দিত দেখবে, তখন যেদিন সে খাবার পায়। কাফ্রীটির কোঁকড়া চুলও খুশীতে আন্দোলিত—তার দুটোও হাঁটু এমন দেখতে পাবে, মনে হয় যেন তার মাথার চামড়ায় বীজ বপন করা হয়েছে আর মাথার দুই পাশে মরিচ ধরে রয়েছে।

খাত্তাবী (র) বলেন, "খিযির (আ)-কে তাঁর সৌন্দর্য ও চেহারার উজ্জ্বলতার জন্যে খিযির নামে অভিহিত করা হয়েছে।" এ বর্ণনাটি বুখারী শরীফের বর্ণনার পরিপন্থী নয়। আবার বর্ণিত কারণের যে কোনটির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত বিধায় বুখারী শরীফের উল্লেখিত তথ্যটি অধিকতর গ্রহণীয়। তাই অন্য কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

হাফিজ ইবন আসাকির (র) ও.... ইবন আব্বাস (রা) সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, খিযির (আ)-কে খিযির বলা হয়ে থাকে এ জন্যে যে, তিনি একবার সাদা চামড়ার ওপর সালাত আদায় করেন। অকস্মাৎ চামড়াটি সবুজ বর্ণ ধারণ করে নড়ে উঠে। হাদীসের উপরোক্ত সূত্রটিতে কোন এক পর্যায়ে একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন।

মুজাহিদ (র) বলেন, 'তাঁকে খিযির (আ) বলা হত এজন্যে যে, তিনি যখন কোথাও সালাত আদায় করতেন তাঁর আশেপাশের স্থানটিতে ঘাস জন্মাত ও স্থানটি সবুজ হয়ে যেত।' তিনি আরো বলেন, 'মূসা (আ) ও ইউশা (আ) যখন পদাঙ্ক অনুকরণ করে পশ্চাতে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন তাঁরা সমুদ্রের মাঝে একটি ফরাশের উপর শোয়া অবস্থায় খিযির (আ)-কে দেখতে পেলেন। তিনি কাপড়ের দুই প্রান্ত মাথা ও দুই পায়ের নিচে মুড়ে রেখেছিলেন। মূসা (আ) তাঁকে সালাম করলেন। তখন তিনি মুখ থেকে কাপড় সরালেন ও সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, এ জায়গায় সালাম কোত্থেকে এল? আপনি কে? মূসা (আ) বললেন, 'আমি মূসা।' তিনি বললেন, 'আপনি কি বনী ইসরাঈলের মূসা?' তিনি বললেন, জ্বি হ্যাঁ। অতঃপর যা ঘটেছিল আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে তা বর্ণনা করেছেন।

এ কাহিনীর বর্ণনা ধারা থেকে খিযির (আ) যে নবী ছিলেন তার কিছুটা ইঙ্গিত মিলে।

প্রথমত আল্লাহ্র বাণী :

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا.

অতঃপর তারা সাক্ষাৎ পেল আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের, যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম ও আমার নিকট হতে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (সূরা কাহাফ ঃ ৬৫)

দ্বিতীয়ত কুরআনে উল্লেখিত মূসা (আ)-এর উক্তি। ইরশাদ করেন ঃ

هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا.

মূসা তাঁকে বলল, "সত্য পথের যে জ্ঞান আপনাকে দান করা হয়েছে তা থেকে আমাকে শিক্ষা দেবেন— এ শর্তে আমি আপনার অনুসরণ করব কি?" সে বলল, "আপনি কিছুতেই আমার সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। যে বিষয় আপনার অবগতিতে জ্ঞানায়ত্ত নেই, সে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে?" মূসা বলল, "আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আপনার কোন আদেশ আমি অমান্য করব না।" সে বলল, "আচ্ছা আপনি যদি আমার অনুসরণ করবেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যতক্ষণ না আমি সে সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলি।" (সূরা কাহাফ ঃ ৬৬-৭০)

যদি তিনি ওলী হতেন ও নবী না হতেন তাহলে মূসা (আ)ও তাঁকে লক্ষ্য করে এরূপ বলতেন না। আর তিনিও এরূপ জবাব দিতেন না। বরং মূসা (আ) তাঁর সঙ্গ লাভের আবেদন করেছিলেন যাতে তিনি তাঁর কাছ থেকে এমন কিছু ইল্‌ম শিখতে পারেন, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকেই বিশেষভাবে দান করেছিলেন। তিনি নবী না হলে তিনি মাসুম বা নিষ্পাপ হতেন না।

মহান নবী, সম্মানিত রাসূল ও নিষ্পাপ সত্তা মূসা (আ)। নিষ্পাপ হওয়া জরুরী নয় এমন একজন ওলীর কাছ থেকে শিক্ষা লাভের জন্য এত আগ্রহী হতেন না। আবার মূসা (আ)ও যুগ যুগ ধরে তাঁকে খুঁজে তার কাছে পৌঁছার ইচ্ছে পোষণ করতেন না। কেউ কেউ বলেন, 'এখানে উল্লেখিত حقبا শব্দের অর্থ হচ্ছে আশি বছর।' অতঃপর মূসা (আ) যখন তাঁর সাথে মিলিত হলেন, তখন তিনি বিনয় ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন এবং তাঁর কাছ থেকে উপকৃত হবার মানসেই তাঁকে অনুসরণ করেন।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মূসা (আ)-এর মতই একজন নবী ছিলেন, যাঁর কাছে তাঁরই মত ওহী প্রেরিত হত, আর তাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন সব লাদুন্নী ইল্‌ম ও নবুওতের গোপনীয় তথ্যাদি দান করেছিলেন, যে সম্বন্ধে বনী ইসরাঈলের মূসা (আ)-কে অবহিত করেননি। রুম্মানী (র) খিযির (আ)-এর নবুওতের অনুকূলে এ দলীলটি পেশ করেছেন।

তৃতীয়ত, খিযির (আ) কিশোরটিকে হত্যা করলেন। আর এটা মহান আল্লাহর ওহী ব্যতীত হতে পারে না। এটিই তাঁর নবুওতের রীতিমত একটি দলীল এবং তাঁর নিষ্পাপ হবার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা, ওলীর পক্ষে ইলহামের মাধ্যমে আদিষ্ট হয়ে প্রাণ বধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ বৈধ নয়। ইলহামের দ্বারা নিষ্পাপ হবার বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় না, বরং এখানে ভুল-ভ্রান্তির আশংকা সর্বজন স্বীকৃত। কিশোরটি প্রাপ্ত বয়স্ক হলে কাফির হবে, তার প্রতি গভীর

মহব্বতের দরুন তার পিতামাতা তার অনুকরণে পথভ্রষ্ট হবেন ইত্যাদি তথ্য অবগত হয়ে অপ্রাপ্ত বয়সের কিশোরটিকে খিযির (আ) হত্যা করার পদক্ষেপ নেয়ায় বোঝা যায় যে, এ হত্যাকাণ্ডে বিরাট কল্যাণ নিহিত ছিল। আর তা হচ্ছে তার পিতার ঐতিহ্যবাহী বংশ রক্ষা এবং কুফরী ও তার শাস্তি থেকে তাকে রক্ষার ব্যবস্থা করা। এটাই তাঁর নবুওতের প্রমাণ।

অধিকন্তু এতে বোঝা যায় যে, তিনি তার নিষ্পাপ হওয়ার কারণে আল্লাহর সাহায্যপুষ্ট। শায়খ আবুল ফারাজ ইবন জাওযী (র) তাঁর মতবাদের পক্ষে খিযির (আ)-এর নবুওত প্রমাণের জন্যে এই দলীলটি পেশ করতেন। আর রুম্মানী (র)ও এটাকে তাঁর দলীল রূপে পেশ করেছেন।

চতুর্থত, খিযির (আ) যখন তাঁর কর্মকাণ্ডের রহস্য মূসা (আ)-এর কাছে ব্যাখ্যা করলেন এবং মূসা (আ)-এর কাছে তার তাৎপর্য সুস্পষ্ট হলো তারপর খিযির (আ) মন্তব্য করেন ঃ

رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِىْ .

অর্থাৎ— "আমি যা কিছু করেছি আমার নিজের ইচ্ছে মত করিনি বরং আমি এরূপ করতে আদিষ্ট হয়েছিলাম। আমার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়েছিল।"

এসব কারণ দ্বারা খিযির (আ) যে নবী ছিলেন তা প্রমাণিত হয়। তবে এটা তাঁর ওলী হওয়া বা রাসূল হওয়ার পরিপন্থী নয়, যেমন অন্যরা বলেছেন। তাঁর ফেরেশতা হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। উপরোক্ত বর্ণনায় তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারটা প্রমাণিত হবার পর তিনি ওলী হওয়ার সপক্ষে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ থাকে না। যদিও কোন কোন সময় আল্লাহর ওলীগণ এমনসব তথ্য অবগত হন, যেগুলো সম্বন্ধে প্রকাশ্য শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ অবহিত থাকেন না।

খিযির (আ)-এর আজ পর্যন্ত বেঁচে থাকার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তবে জমহুর উলামার মতে, তিনি এখনও জীবিত রয়েছেন। কেউ কেউ বলেন, নূহ (আ)-এর বংশধরগণ প্লাবন শেষে জাহাজ থেকে অবতরণ করার পর আদম (আ)-এর লাশকে নির্ধারিত জায়গায় যেহেতু তিনিই দাফন করেছিলেন, সেহেতু তিনি দীর্ঘ হায়াতের ব্যাপারে পিতা আদম (আ)-এর দু'আ পেয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি আবে হায়াত পান করেছিলেন, তাই তিনি এখনও জীবিত রয়েছেন।

তথ্য বিশারদগণ বিভিন্ন তথ্য পেশ করেছেন এবং এগুলোর মাধ্যমে খিযির (আ)-এর আজ পর্যন্ত জীবিত থাকার প্রমাণ পেশ করেছেন। যথাস্থানে আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করব। খিযির (আ) মূসা (আ)-কে বলেছিলেন ঃ

هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِىْ وَبَيْنِكَ سَاُنَبِّئُكَ بِتَاْوِيْلِ مَالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا –

এখানেই আপনার এবং আমার সম্পর্কের ইতি। যে বিষয়ে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি। (সূরা কাহাফ : ৭৮)

এ সম্পর্কে অনেক মুনকাতে বা বিচ্ছিন্ন সূত্রের হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

বায়হাকী (র) আবূ আবদুল্লাহ্ মুলাতী (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মূসা (আ) যখন খিযির (আ) থেকে বিদায় নিতে চাইলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'আমাকে ওসীয়ত করুন!' খিযির (আ) বললেন, "মানুষের জন্য কল্যাণকারী হবেন, অকল্যাণকারী হবেন না, হাসিমুখে থাকবেন, ক্রুদ্ধ হবেন না। একগুঁয়েমি করবেন না, প্রয়োজন ব্যতিরেকে ভ্রমণ করবেন না।" অন্য এক সূত্রে অতিরিক্ত রয়েছে : ولاتضحك من غير عجب 'অদ্ভুত কিছু না দেখলে হাসবেন না।'

ওহাব ইব্ন মুনাব্বিহ (র) বলেন, খিযির (আ) বলেছিলেন, "হে মূসা! দুনিয়া সম্বন্ধে মানুষের নিমগ্নতা অনুযায়ীই তাদেরকে দুনিয়ায় শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে।" বিশর ইবন হারিস আল হাফী (র) বলেন : মূসা (আ) খিযির (আ)-কে বলেছিলেন, "আমাকে উপদেশ দিন। তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার জন্যে তাঁর আনুগত্যকে সহজ করে দিন!" এ সম্পর্কে একটি মারফূ হাদীস ইবন আসাকির (র) থেকে যাকারিয়া ইবন ইয়াহইয়া আল ওকাদ সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। তবে এ যাকারিয়া একজন চরম মিথ্যাবাদী, সে বলে.... উমর (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, "আমার ভাই মূসা (আ) বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! এ কথা বলে তিনি আল্লাহর বাণী স্মরণ করেন, অতঃপর তার কাছে খিযির (আ) আসলেন, তিনি ছিলেন একজন যুবক। সুরভিতদেহী, ধবধবে সাদা কাপড় পরিহিত ও কাপড়কে টেনে ধরে রয়েছেন। তিনি মূসা (আ)-কে বললেন, আপনার প্রতি আল্লাহ্র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক, হে মূসা ইবন ইমরান! আপনার প্রতিপালক আপনার কাছে সালাম প্রেরণ করেছেন।" মূসা (আ) বললেন, "তিনি নিজেই সালাম (শান্তি), তাঁর কাছেই সালাম, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার, যিনি সারা জগতের প্রতিপালক, যাঁর যাবতীয় অনুগ্রহের হিসাব করা সম্ভব নয় এবং তাঁর সাহায্য ব্যতীত তাঁর যাবতীয় নিয়ামতের শোকরগুজারীও সম্ভব নয়।

এরপর মূসা (আ) বললেন, আমি আপনার কাছে কিছু উপদেশ চাই যেন আল্লাহ্ তা'আলা আপনার পরে আমাকে এগুলোর দ্বারা উপকৃত করেন। খিযির (আ) বললেন, 'হে জ্ঞান অন্বেষী, জেনে রাখুন, বক্তা শ্রোতা থেকে কম ভর্ৎসনার পাত্র, তাই আপনি যখন কারো সাথে কথা বলবেন, তাদেরকে বিরক্ত করবেন না। আরো জেনে রাখুন, আপনার অন্তরটি একটি পাত্রের ন্যায়। তাই আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে কি দিয়ে আপনি তা পরিপূর্ণ করছেন! দুনিয়া থেকে সামান্য গ্রহণ করুন, বাকিটা আপনার পেছনে ফেলে রাখুন। কেননা, দুনিয়া আপনার জন্যে বসবাসের জায়গা নয়। এটি শান্তি পাবার জায়গাও নয়। দুনিয়াকে বান্দাদের জন্য স্বল্প পরিমাণ বলেই আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং পরকালের জন্য পাথেয় সংগ্রহের স্থান বলেই মনে করতে হবে। ধৈর্যধারণ করবেন, তাহলে পাপ থেকে বাঁচতে পারবেন। হে মূসা (আ)! জ্ঞান অন্বেষন কর, যদি তুমি জ্ঞান লাভ করতে চাও— কেননা, জ্ঞান যে অন্বেষণ করে, সেই তা লাভ করতে পারে। জ্ঞান অন্বেষণের জন্যে অতিরিক্ত বকবক করবেন না। কারণ, তাতে আলিমগণ বিরক্ত হন ও বোকামি প্রকাশ পায়। তবে আপনাকে মধ্যমপন্থী হতে হবে। কেননা, এটা আল্লাহ্ প্রদত্ত তাওফীক ও সত্যপথ লাভের উপায়। মূর্খদের মূর্খতা থেকে বিরত থাকুন! বোকাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করুন। কেননা, এটাই বুদ্ধিমানের কাজ ও এটাতেই উলামায়ে

কিরামের সৌন্দর্য নিহিত। যদি কোন মূর্খ লোক আপনাকে গাল দেয়, ধৈর্যধারণ করে চুপ থাকবেন ও সতর্কতার সাথে তাকে পরিহার করবেন। কেননা, তার বোকামি আপনারই অধিক ক্ষতি করবে ও আপনাকে আরও অধিক তিরস্কৃত করবে।

"হে ইমরানের পুত্র! আপনি কি অনুভব করেন না যে আপনাকে অতি অল্প জ্ঞানই দেয়া হয়েছে। কোন কিছুতে অযথাই জড়িয়ে পড়বেন না এবং বিপথগামী হবেন না। হে ইমরানের পুত্র! আপনি এমন কোন বন্ধ দরজা খুলবেন না, যেটা কিসে বন্ধ করেছে তা আপনার জানা নেই। অনুরূপ এমন কোন খোলা দরজা বন্ধ করবেন না যা কিসে উন্মুক্ত করেছে তা আপনার জানা নেই। হে ইমরানের পুত্র! যে ব্যক্তির দুনিয়ার প্রতি লোভের শেষ নেই, দুনিয়ার প্রতি তার আকর্ষণের অন্ত নেই এবং যে ব্যক্তি নিজেকে হীন বোধ করে এবং তার ভাগ্যের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাকে দোষারোপ করে সে কেমন করে সংসারাসক্তিমুক্ত হতে পারবে? প্রবৃত্তি যার উপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে, তাকে কি কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখা যায়? কিংবা মূর্খতা যাকে গ্রাস করে ফেলেছে, জ্ঞান অন্বেষণ কি তার কোন উপকার সাধন করতে পারে? না, পারে না। কেননা, তার অভীষ্ট আখিরাত হলেও সে তো শুধু দুনিয়ার প্রতিই আকৃষ্ট।"

"হে মূসা! যা শিখবেন তা কার্যে পরিণত করার জন্য শিখবেন। কোন কিছু নিয়ে শুধু গল্প করার জন্যই তা শিখবেন না। যদি এরূপ করেন, তাহলে এটা ধ্বংসের কারণ হবে আপনার জন্যে অথচ তা অন্যের জন্যে আলোকবর্তিকা হবে। হে মূসা ইবন ইমরান! সংসার থেকে মোহমুক্তি ও তাকওয়াকে আপনার পোশাকরূপে গ্রহণ করুন। আর ইল্ম ও যিকিরকে নিজের বুলিতে পরিণত করুন! বেশি বেশি করে নেক আমল করবেন; কেননা, অচিরেই আপনি মন্দ কাজের শিকার হতে পারেন। আল্লাহর ভয়ে নিজের অন্তরকে কম্পমান রাখুন, কেননা তা আপনার প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করবে। সৎ কাজ করুন, কেননা, মন্দ কাজ করা অবশ্যম্ভাবী। আমার এসব নসীহত আপনার কাজে আসবে, যদি আপনি তা স্মরণ রাখেন।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর খিযির (আ) চলে গেলেন এবং মূসা (আ) দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

উপরোক্ত বর্ণনাটি শুদ্ধ নয়। সম্ভবত এটা যাকারিয়া ইবন ইয়াহয়া আল ওক্কাদ আল মিসরীর মনগড়া বর্ণনা। একাধিক হাদীস বিশারদ তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছেন। তবে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে যে, হাফিজ ইবন আসাকির (র) তার ব্যাপারে নিশ্চুপ।

হাফিজ আবূ নুয়ায়ম আল ইসফাহানী (র) আবূ উমামাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর সাহাবিগণকে লক্ষ্য করে একদিন বললেন, 'আমি কি তোমাদের কাছে খিযির (আ) সম্বন্ধে কিছু বলবো? তাঁরা বললেন, জী হ্যাঁ! হে আল্লাহর রাসূল! রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'একদিন খিযির (আ) বনী ইসরাঈলের একটি বাজারে হাঁটছিলেন। এমন সময় একজন মুকাতাব[১] ক্রীতদাস তাঁকে দেখল এবং বলল, "আমাকে কিছু সাদকা দিন, আল্লাহ

---

১. মুকাতাব হচ্ছে ঐ দাস যে তার মালিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুক্তিপণ পরিশোধের শর্তসাপেক্ষে স্বাধীনতা লাভের প্রতিশ্রুতি পেয়েছে।

তা'আলা আপনাকে বরকত দান করবেন।" খিযির (আ) বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী একজন বান্দা আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়ে যাক। আমার কাছে তোমাকে দান করার মত কিছু নেই।

মিসকিন ব্যক্তিটি বলল, আমি আল্লাহর নামে আপনার কাছে যাঞ্চা করছি যে, আমাকে কিছু সাদকা দিন।

আমি আপনার চেহারায় আসমানী আলামত লক্ষ্য করেছি এবং আপনার কাছে বরকত কামনা করছি। খিযির (আ) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঈমান রেখে অর্থাৎ শপথ করে বলছি, 'আমার কাছে তোমাকে দেবার মত কিছুই নেই। তবে তুমি আমাকে নিয়ে বিক্রি করে দিতে পার।' মিসকিন লোকটি বলল, এটা ঠিক আছে তো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এটা আমি তোমাকে সত্যিই বলছি। তুমি আমার কাছে একটি বড় যাঞ্চা করেছ। তবে আমি আমার প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য তোমাকে নিরাশ করব না। তুমি আমাকে বিক্রি করে দাও।' বর্ণনাকারী বলেন, সে তাকে বাজারে উঠাল এবং চারশ' দিরহামের বিনিময়ে তাঁকে বিক্রি করে দিল। তিনি ক্রেতার কাছে বেশ কিছুদিন অবস্থান করলেন। কিন্তু ক্রেতা তাকে কোন কাজে নিয়োজিত করলেন না। খিযির (আ) ক্রেতাকে বললেন, আমা থেকে কিছু না কিছু উপকার পাবার জন্য আপনি আমাকে ক্রয় করেছেন, তাই আপনি আমাকে কিছু করতে দিন! ক্রেতা বললেন, 'আপনাকে কষ্ট দিতে আমি পছন্দ করি না। কেননা, আপনি একজন অতি বৃদ্ধ দুর্বল লোক।' খিযির (আ) বললেন, 'আমার কোন কষ্ট হবে না।' ক্রেতা বললেন, 'তাহলে আপনি এ পাথরগুলোকে সরিয়ে দিন।' প্রকৃতপক্ষে একদিনে ছয়জনের কম লোক এগুলোকে সরাতে পারতো না। ক্রেতা লোকটি তার কোন কাজে বের হয়ে পড়লেন ও পরে ফিরে আসলেন। অথচ এক ঘন্টার মধ্যে পাথরগুলো সরানোর কাজ সমাপ্ত হয়েছিল। ক্রেতা বললেন, 'বেশ করেছেন! চমৎকার করেছেন। আপনি যা পারবেন না বলে আমি ধারণা করেছিলাম তা আপনি করতে সমর্থ হয়েছেন।'

অতঃপর লোকটির সফরের প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি খিযির (আ)-কে বললেন, আমি আপনাকে আমানতদার বলে মনে করি। তাই আপনি আমার পরিবারের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করুন! তিনি বললেন, 'তাহলে আমাকে কি করতে হবে বলে দিন!' ক্রেতা লোকটি বললেন, আমি আপনাকে কষ্ট দেয়াটা পছন্দ করি না। তিনি বললেন, না আমার কোন কষ্ট হবে না। তখন তিনি বললেন, 'আমি ফিরে আসা পর্যন্ত আপনি আমার ঘরের জন্য ইট তৈরি করবেন।' লোকটি তার ভ্রমণে বের হয়ে পড়ল ও কিছুদিন পর ফেরত আসল এবং তার প্রাসাদ তৈরি দেখতে পেল। তখন তিনি তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, 'আপনি কে? এবং আপনার ব্যাপারটি কী?' তিনি বললেন, আপনি আল্লাহর শপথ দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন। আর আল্লাহর নামে যাঞ্চাই আমাকে দাসে পরিণত করেছে। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, আমি কে। আমিই খিযির— যার কথা আপনি শুনে আসছেন; আমার কাছে একজন মিসকিন ব্যক্তি সাদকা চেয়েছিল। আমার কাছে তাকে দেবার মত কিছুই ছিল না। সে আল্লাহর নামে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির দোহাই দিয়ে আমার কাছে পুনরায় কিছু চাইল।

অগত্যা আমি নিজেকেই তার হাতে তুলে দিলাম। তখন সে আমাকে বিক্রি করে দেয়। আমি একটি তথ্য আপনার কাছে বলছি, আর তা হচ্ছে— 'আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির দোহাই দিয়ে যদি কেউ কারো কাছে কিছু যাঞ্চা করে আর সে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা না দেয়, তাহলে সে কিয়ামতের দিন তার শরীরে মাংসবিহীন চামড়া নিয়ে দণ্ডায়মান হবে এবং চলার সময় মটমট শব্দকারী কোন হাড়ও তার শরীরে থাকবে না।' ক্রেতা লোকটি বলল, 'হে আল্লাহর নবী! আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং না চিনে আমি আপনাকে কষ্ট দিয়েছি।' তখন তিনি বললেন, 'তাতে কোন কিছু আসে-যায় না, বরং তুমি ভালই করেছ ও নিজকে সংযত রেখেছ।' লোকটি বলল, 'হে আল্লাহর নবী! আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আপনি আমার পরিবার ও সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত হুকুম অনুযায়ী নির্দেশ করুন, যাতে আমি আপনাকে মুক্ত করে দিতে পারি।' তিনি বললেন, 'আমি চাই, তুমি আমাকে মুক্ত করে দাও— যাতে আমি আমার প্রতিপালকের ইবাদত করতে পারি।' অতঃপর লোকটি খিযির (আ)-কে মুক্ত করে দিলেন। তখন খিযির (আ) বললেন : 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার যিনি আমাকে দাসত্বে নিপতিত করেছিলেন এবং পরে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।'এ হাদীসটিকে মারফূ বলা ঠিক নয় সম্ভবত এটা মওকূফ পর্যায়ের। বর্ণনাকারীদের মধ্যে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিও রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলাই সমধিক জ্ঞাত।

ইবনুল জাওযী (র) তাঁর কিতাব عجالة المنتظر في شرح حال الخضر -এ আবদুল ওহ্হাব ইবন যাহ্হাক (র)-এর বরাতে বর্ণনা করেন। কিন্তু এ ব্যক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়।

হাফিজ ইবন আসাকির (র) সুদ্দী (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, খিযির ও ইলিয়াস (আ) ছিলেন দুই সহোদর ভাই। তাঁদের পিতা একজন বাদশাহ ছিলেন। একদিন ইলিয়াস (আ) তাঁর পিতাকে বললেন, আমার ভাই খিযির-এর রাজত্বের প্রতি কোন আগ্রহ নেই, যদি আপনি তাকে বিয়ে দেন তাহলে হয়ত তাঁর কোন সন্তান জন্ম নিতে পারে, যে হবে রাজ্যের কর্ণধার। অতঃপর তাঁর পিতা একটি সুন্দরী কুমারী যুবতীর সাথে তাঁর বিয়ে দিলেন। খিযির (আ) মহিলাকে বললেন, "আমার কোন মহিলার প্রয়োজন নেই, তুমি চাইলে আমি তোমাকে বন্ধনমুক্ত করে দিতে পারি। আর যদি চাও তাহলে তুমি আমার সাথে থাকতেও পার। আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করবে ও আমার রহস্যাদি গোপন রাখবে।" মহিলা তাতে সম্মত হলেন। এভাবে তিনি তাঁর সাথে এক বছর অবস্থান করলেন। এক বছর পর বাদশাহ মহিলাটিকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "তুমি যুবতী এবং আমার ছেলেও যুবক, তোমাদের সন্তান কোথায়?" মহিলা বললেন, "সন্তান তো আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে। তিনি যদি চান সন্তান হয়, আর না চাইলে হয় না।" তখন পিতা পুত্রকে নির্দেশ দিলেন এবং পুত্র মহিলাকে তালাক দিলেন। পিতা তাঁকে আবার অন্য একটি সন্তানবতী স্বামীহীনা মহিলার সাথে বিয়ে দিলেন। মহিলা বাসর ঘরে এলে খিযির (আ) পূর্বের মহিলাকে যা বলেছিলেন তাকেও তাই বললেন। তখন মহিলা তার সাথে থাকাকেই বেছে নিলেন। যখন এক বছর গত হল; বাদশাহ মহিলাকে সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। মহিলা উত্তরে বললেন, "আপনার ছেলে, মেয়েদের কোন প্রয়োজনবোধ করেন না।" তাঁর পিতা তখন তাঁকে ডাকলেন, কিন্তু তিনি পলায়ন করলেন। তাঁকে ধরে আনার জন্য লোক পাঠানো হয়, কিন্তু তারা তাঁকে ধরে আনতে সমর্থ হলো না।

কথিত আছে যে, তিনি দ্বিতীয় মহিলাটিকে হত্যা করেছিলেন, কেননা সে তার রহস্য ফাঁস করে দিয়েছিল। এ কারণেই তিনি অতঃপর পলায়ন করেন ও দ্বিতীয় মহিলাকে তিনি নিজ থেকে এভাবে মুক্ত করলেন।

পূর্বের মহিলা শহরের কোন এক পাশে নির্জন জায়গায় থেকে আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করছিলেন। এমনি সময় একদিন এক লোক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মহিলা পুরুষটিকে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনলেন। মহিলা পুরুষকে বললেন, "তোমার কাছে এ নামটি কেমন করে আসল?" অর্থাৎ— তুমি কোথা থেকে এ নামটি শিখলে? তিনি বললেন, আমি খিযির (আ)-এর একজন শিষ্য। তখন মহিলা তাঁকে বিয়ে করলেন ও তাঁর ঔবসে সন্তান ধারণ করলেন। অতঃপর ঐ মহিলাই ফিরআউনের কন্যার চুল বিন্যাসকারিণী রূপে নিযুক্ত হন। একদিন মহিলা ফিরআউনের কন্যার মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর হাত থেকে চিরুনিটি পড়ে যায়। চিরুনিটি উঠাবার সময় মহিলা বললেন, 'বিসমিল্লাহ' অর্থাৎ— আল্লাহর নামে উঠাচ্ছি। ফিরআউন কন্যা বলল ঃ "আমার পিতার নামে বল।" মহিলা বললেন, "না বরং এমন আল্লাহর নামে উঠবে যিনি আমার, তোমার ও তোমার পিতার প্রতিপালক।" মেয়েটি তার পিতাকে এ ব্যাপারটি সম্পর্কে জানাল। ফিরআউন তখন একটি গর্তে তামা ভর্তি করে তা উত্তপ্ত করতে নির্দেশ দিল। এরপর তার নির্দেশে গর্তের মধ্যে মহিলাটিকে নিক্ষেপ করা হল। মহিলা যখন তা দেখতে পেলেন, তখন তিনি যাতে এ গর্তে পড়ে না যান এজন্যে পিছিয়ে আসলেন। তখন তার একটি ছোট ছেলে যে তার সাথে ছিল— বলল, 'হে আম্মাজান! তুমি ধৈর্য ধর, কেননা তুমি সত্যের উপর রয়েছ।' তখন তিনি আগুনে ঝাঁপ দিলেন এবং প্রাণ ত্যাগ করলেন। (আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি রহমত নাযিল করুন!)

ইবন আসাকির (র) আবূ দাউদ আল-আমা নাফী থেকে বর্ণনা করেন। আর সে ছিল একজন চরম মিথ্যুক ও জাল হাদীস রচয়িতা। সে আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে এবং কাসীর ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আউফ থেকে আর সেও ছিল আরেকজন চরম মিথ্যুক। সে তার পিতামহের বরাতে বর্ণনা করে যে, খিযির (আ) একরাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দু'আ করতে শুনলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলছিলেন, "হে আল্লাহ! আমাকে ভয়ভীতি থেকে রক্ষাকারী বস্তুসমূহ অর্জনে সাহায্য কর! আর তোমার নেককার বান্দাদের আগ্রহের ন্যায় তাদের আগ্রহের বস্তুসমূহের প্রতি আমার আগ্রহ সৃষ্টি করে দাও।" রাসূলুল্লাহ (সা) তার কাছে আনাস ইবন মালিক (রা)-কে পাঠালেন। আনাস (রা) তাকে সালাম দিলেন। তখন তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলে দিও ঃ অর্থাৎ—"আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সকল নবীর তুলনায় এমন মর্যাদা দিয়েছেন, যেমন সব মাসের তুলনায় রমযান মাসকে মর্যাদা দান করেছেন। আবার আপনার উম্মতকে সকল উম্মতের তুলনায় এমন মর্যাদা দিয়েছেন যেমনি জুম'আর দিনকে অন্যদিনসমূহের তুলনায় মর্যাদা দিয়েছেন।"

উপরোক্ত বর্ণনাটি মিথ্যা, তার সূত্র বা মতন কোনটাই শুদ্ধ নয়। এটা কেমন করে হতে পারে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে আত্মপ্রকাশ করবেন না অথচ তিনি স্বয়ং একজন

অনুগত ও একজন শিক্ষার্থী হিসেবে এসেছিলেন? মিথ্যা হাদীস রচয়িতারাও সাধারণত তাদের কিসসা-কাহিনীতে খিযির (আ)-এর উল্লেখ করে থাকে। তাদের কেউ কেউ আবার এরূপও দাবি করে যে, খিযির (আ) তাদের কাছে আসেন, তাদেরকে সালাম করেন, তাদের নাম-ধাম ঠিকানা তিনি জানেন। এতদসত্ত্বেও তিনি মূসা ইব্ন ইমরান (আ)-কে চেনেননি, অথচ আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে উক্ত যমানায় শ্রেষ্ঠ মানুষ ও আল্লাহ্র নবী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি বনী ইসরাঈলের মূসা?

হাফিজ আবূ হুসাইন ইবনুল মুনাদী (র) আনাস (রা)-এর বর্ণিত এই হাদীসটি উদ্ধৃত করার পর বলেন, হাদীস বিশারদগণ একমত যে, এ হাদীসটির সূত্র মুনকার পর্যায়ের, তার মতনে ত্রুটি আছে। এর মধ্যে জালিয়াতির লক্ষণ সুস্পষ্ট।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সা) ইনতিকাল করেন তাঁর সাহাবীগণ তাঁর চতুষ্পার্শ্বে বসে গেলেন ও রোদন করতে লাগলেন। তাঁরা সকলে একত্রিত হলেন। এমন সময় একজন আধাপাকা শ্মশ্রুধারী উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবান এক ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করলেন ও সকলকে ডিঙ্গিয়ে তাঁর নিকটবর্তী হলেন এবং কান্নাকাটি করলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কিরামের প্রতি তাকালেন ও বললেন ঃ "প্রতিটি মুসীবত হতেই আল্লাহ তা'আলার কাছে সান্ত্বনা রয়েছে। প্রতিটি ক্ষতিরই ক্ষতিপূরণ রয়েছে এবং প্রতিটি নশ্বর বস্তুর স্থলবর্তী রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর প্রতি সকলে প্রত্যাবর্তন করুন! তাঁরই দিকে মনোযোগী হোন! তিনি আপনাদেরকে মুসীবতের মাধ্যমে পরীক্ষা করছেন। তাই আপনারা ধৈর্যধারণ করুন! ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে-ই যার ক্ষতি পূরণ হবার নয়। এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন।" সাহাবীগণের একজন অন্যজনকে বলতে লাগলেন, তোমরা কি এই ব্যক্তিকে চেন? আবূ বকর (রা) ও আলী (রা) বললেন ঃ "হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জ্ঞাতি ভাই খিযির (আ)।"

উপরোক্ত হাদীসটি আবূ বকর ইবন আবূদ দুনিয়াও বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীসের মূল পাঠে বায়হাকীর বর্ণনার সাথে কিছুটা গরমিল রয়েছে। বায়হাকী (র) বলেন, "এ হাদীসের সূত্রে উল্লেখিত ইবাদ ইবন আবদুস সামাদ ছিলেন দুর্বল। কোন কোন সময় তাকে হাদীস শাস্ত্রে মুনকার বা প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য করা হয়। আনাস (রা) হতে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে যার অধিকাংশই জাল বলে ইবন হিব্বান ও উকায়লী (র) মনে করেন। ইমাম বুখারী (র) এটাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। আবূ হাতিম (র) বলেন, এটা অত্যন্ত দুর্বল ও মুনকার হাদীস। ইবন আদী (র) বলেন, আলী (রা)-এর ফযীলত সম্বন্ধে বর্ণিত হাদীসগুলোর অধিকাংশই দুর্বল ও শিয়াদের অতিরঞ্জিত বর্ণনা।

ইমাম শাফিঈ (র) তাঁর মুসনাদে আলী ইবন হুসাইন (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন ইনতিকাল করেন ও শোকবাণী আসতে থাকে, তখন উপস্থিত সাহাবীগণ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন, তিনি বলেছেন, 'প্রতিটি মুসীবত থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সান্ত্বনা রয়েছে, প্রতিটি নশ্বর বস্তুর স্থলবর্তী রয়েছে, প্রতিটি ক্ষতিরই ক্ষতিপূরণ রয়েছে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ভরসা করুন ও তাঁর কাছেই প্রত্যাশা

করুন। আর প্রকৃত মুসীবতগ্রস্ত ব্যক্তি তিনিই, যিনি সওয়াব থেকে বঞ্চিত হন। আলী ইবন হুসাইন (র) বলেন, 'তোমরা কি জান, তিনি কে ছিলেন? তিনি ছিলেন খিযির (আ)।'

উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী কাসিম আমরী প্রত্যাখ্যাত। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র) ইয়াহয়া ইবন মাঈন (র) তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। আহমদ (র) আরো বলেন যে, সে হাদীস জাল করতো। অধিকন্তু হাদীসটি মুরসাল হওয়ার কারণে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলাই সম্যক জ্ঞাত। উপরোক্ত হাদীসটি অন্য একটি দুর্বল সূত্রে আলী (রা) থেকে বর্ণিত, কিন্তু তা শুদ্ধ নয়।

আবদুল্লাহ ইবন ওহাব (র) মুহাম্মদ ইবন মুনকাদির (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন উমর ইবন খাত্তাব (রা) একটি জানাযার নামায আদায় করছিলেন, এমন সময় তিনি একজন অদৃশ্য ব্যক্তির আওয়ায শুনলেন, "আপনার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা রহমত করুন। আমাদেরকে ছেড়ে জানাযা পড়বেন না।" উমর (রা) তাঁর জন্য অপেক্ষা করলেন। তিনি নামাযে যোগদান করলেন এবং মৃত ব্যক্তির জন্য এরূপ দু'আ করলেন

ان تعذبه نكثيرا عصاك وان تغفرله ففقير الى رحمتك .

অর্থাৎ— "হে আল্লাহ! আপনি যদি তাকে শাস্তি দেন তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই সে আপনার অবাধ্যতা করেছে। আর আপনি যদি তাকে মাফ করে দেন তাহলে সে তো আপনার রহমতেরই মুখাপেক্ষী।" মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর ঐ ব্যক্তি বললেন ঃ

طوبى لك يا صاحب القبر ان لم تكن عريفا اوجابيا اوخازنا اوكاتبا اوشرطيا .

অর্থাৎ— হে কবরের বাসিন্দা! তোমার জন্য সুসংবাদ, যদি না তুমি তত্ত্বাবধানকারী, কর উশুলকারী, খাজাঞ্চী, কোষাধ্যক্ষ, কিংবা কোতয়াল হয়ে থাক।

তখন উমর (রা) বলেন, চল, আমরা তাঁকে তাঁর দু'আ ও তাঁর উক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কে? বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তাঁরা লক্ষ্য করে দেখলেন যে, তাঁর পায়ের চিহ্ন এক হাত দীর্ঘ। তখন উমর (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! ইনিই খিযির (আ), যাঁর সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে অবহিত করেছিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনাটিতে একজন রাবী অজ্ঞাত পরিচয়। এ বর্ণনার সূত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা পায়নি। এরূপ বর্ণনা শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয় না।

হাফিজ ইবন আসাকির (র) আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদিন রাতের বেলায় আমি তাওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ এক লোককে আমি কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে থাকতে দেখলাম। তখন তিনি বলছিলেন ঃ

يا من لا يمنعه سمع من سمع ويا من لا تغلطه المسائل ويامن لايبرمه الحاح الملحين ولا مسالة السائلين ارزقنى برد عفوك وحلاوة رحمتك .

অর্থাৎ— হে মহান সত্তা! যার বাণী শুনতে কেউ বিরক্ত বোধ করে না, যাঞ্চা যাঁকে বিব্রত করে না, পুনঃ পুনঃ কাকুতি মিনতিকারীর মিনতিতে এবং যাঞ্চাকারীদের প্রার্থনায় যিনি বিরক্ত হন না, আপনার ক্ষমার শীতলতা দিয়ে আমার প্রাণ জুড়ান! এবং আপনার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করান!

আলী (রা) বলেন, আমি বললাম, 'আপনি যা বলছিলেন তা আমার জন্য পুনরায় বলুন।' তিনি বললেন, 'আমি যা বলেছি তুমি কি তা শুনে ফেলেছ?' বললাম, শুনেছি। তখন তিনি আবার বললেন, ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে খিযিরের প্রাণ ন্যস্ত। আলী (রা) বলেন, "ইনিই হচ্ছেন খিযির (আ)।" যে ব্যক্তি দু'আটি প্রতি ফরয সালাতের পর পড়বে তার গুনাহরাশি আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেবেন, যদিও তার গুনাহরাশি সাগরের ফেনা, গাছের পাতা ও তারকার সংখ্যার মত হয় তবুও আল্লাহ্ তা'আলা তা মাফ করে দেবেন।

এ হাদীসটি যঈফ পর্যায়ের। কেননা, এর একজন বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবন মুহরিযের— বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। আবার অন্য একজন বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবন আসাম, আলী (রা)-এর সাক্ষাৎ পাননি। এ ধরনের বর্ণনা শুদ্ধ বলে বিবেচিত হয় না। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত।

আবূ ইসমাইল তিরমিযী (র)ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। তবে এর শেষাংশের বক্তব্যটুকু এরূপ ঃ "এমন সত্তার শপথ যার হাতে খিযিরের জান ও প্রাণ ন্যস্ত, যদি তোমার পাপরাশির পরিমাণ আকাশের তারকা, বৃষ্টি, ভূমণ্ডলের কংকররাশি ও ধুলিকণার সংখ্যার সমানও হয় তবুও আল্লাহ্ তা'আলা চোখের পলকের চাইতে দ্রুত তা মাফ করে দেবেন।

এই হাদীসটিও 'মুনকাতে' বা সূত্র বিচ্ছিন্ন। এই হাদীসের সূত্রে অজ্ঞাত পরিচয় লোকও রয়েছে।

ইবনুল জাওযী (র) ও আবূ বকর ইবন আবীদ দুনিয়া (র)-এর মাধ্যমে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। পরে তিনি মন্তব্য করেন, এ হাদীসের সূত্র অপরিচিত ও এ হাদীসে ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি। আর এটাতে ব্যক্তিটি যে খিযির (আ) ছিলেন, তাও প্রমাণিত হয় না। ইবন আসাকির (র) ইবন আব্বাস (রা)-এর বরাতে মারফূ' রূপে বর্ণনা করেন যে, খিযির (আ) ও ইলিয়াস (আ) প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে পরস্পর সাক্ষাত করতেন। একে অন্যের মাথা মুণ্ডন করতেন ও নিম্ন বর্ণিত বাক্যগুলো উচ্চারণ করে একে অন্যের থেকে বিদায় গ্রহণ করতেন ঃ

بسم الله ما شاء الله. لا يسوق الخير الا الله ما شاء الله. لا يصرف الشر الا الله ما شاء الله. ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله.

অর্থাৎ— আল্লাহর নামে শুরু করছি মাশাআল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কেউ কল্যাণ দেয় না—মাশাআল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কেউ অকল্যাণ দূর করে না—মাশাআল্লাহ। প্রতিটি নিয়ামত তাঁর থেকেই এসে থাকে—মাশাআল্লাহ। আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত ছাড়া অন্য কারো নিজস্ব শক্তি, সামর্থ্য নেই।

বর্ণনাকারী বলেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল উক্ত দু'আটি তিন তিন বার পড়বে তাকে আল্লাহ তা'আলা ডুবে মরা থেকে, পুড়ে মরা থেকে ও চুরির ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখবেন।" বর্ণনাকারী বলেন, আমার যতদূর মনে হয়, ইবন আব্বাস (রা) আরো বলেছেন, 'শয়তান, অত্যাচারী বাদশাহ, সাপ ও বিচ্ছুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখবেন।'

ইমাম দারা কুতনী (র) বলেন, এ হাদীসটি গরীব পর্যায়ের। হাদীসটি বর্ণনায় একমাত্র আল হাসান ইবন যরাইক (র) নামক একজন অপরিচিত রাবী রয়েছেন।

ইবন আসাকির (র) মিথ্যা হাদীস রচয়িতা আলী ইবন হাসান জাহাদমী-এর মাধ্যমে আলী ইবন আবূ তালিব (রা) থেকে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেন। তার প্রারম্ভিকা হচ্ছে— তিনি বলেন, প্রতি বছর আরফার দিন আরাফাতের ময়দানে জিবরাঈল, মিকাঈল, ইস্রাফিল ও খিযির (আ) একত্রিত হন। এটি একটি সুদীর্ঘ জাল হাদীস। এটি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে এখানে উদ্ধৃত করছি না।

ইবন আসাকির (র) হিশাম ইবন খালিদ সূত্রে অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে বলা হয়েছে, ইলিয়াস ও খিযির (আ) দু'জনই বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রতি বছর রমযানের সিয়াম পালন করেন ও বায়তুল্লাহ্য় হজ্জ করেন এবং যমযম কূয়া থেকে একবার পানি পান করেন যা সারা বছরের জন্যে যথেষ্ট হিসেবে গণ্য।

ইবন আসাকির (র) আরো বর্ণনা করেন, ওলীদ ইবন আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান যিনি দামেশকের জামে মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা— একবার সে মসজিদে রাতে ইবাদত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তিনি মসজিদ কর্তৃপক্ষকে মসজিদটি খালি রাখার নির্দেশ দেন। তাঁরা তা করলেন, যখন রাত শুরু হল তিনি 'বাবুস আসসাআত' নামক দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন ও এক ব্যক্তিকে বাবুল খাদরা ও তার মধ্যবর্তী স্থানে সালাতরত দেখতে পান। খলীফা মসজিদ কর্তৃপক্ষকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে মসজিদ খালি করে দিতে বলিনি? তারা বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! ইনি খিযির (আ), প্রতিরাতে তিনি এখানে এসে সালাত আদায় করে থাকেন।

ইবন আসাকির (র) রাবাহ ইবন উবায়দা (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,'একদিন আমি একটি লোককে দেখলাম উমর ইবন আবদুল আযীয (র)-এর হাতে ভর দিয়ে তাঁর আগে আগে চলছে। তখন আমি মনে মনে বললাম, এ লোকটি পাদুকাবিহীন। অথচ উমরের কত অন্তরঙ্গ! বর্ণনাকারী বলেন, উমর ইবন আবদুল আযীয (র) সালাত শেষে ফিরে আসলেন, তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম— এই মাত্র যে লোকটি আপনার হাতে ভর দিয়ে চলছিলেন তিনি কে? তিনি বললেন, 'তুমি কি তাকে দেখেছ হে রাবাহ?' আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ'। তিনি বললেন, "তোমাকে তো আমি একজন পুণ্যবান লোক বলেই জানি। তিনি হচ্ছেন আমার ভাই, খিযির (আ)। তিনি আমাকে সুসংবাদ দিলেন যে, আমি অচিরেই শাসনকর্তা হব এবং ন্যায় বিচার করব।"

শায়খ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (র) এ হাদীসের সূত্রে উল্লেখিত রামলীকে উলামায়ে কিরামের নিকট সমালোচিত ব্যক্তি বলে মন্তব্য করেছেন। এ বর্ণনার অন্যান্য রাবী সম্পর্কেও বিরূপ সমালোচনা রয়েছে।

ইবন আসাকির (র) অন্যান্য সূত্রেও উমর ইবন আবদুল আযীয (র) ও খিযির (আ)-এর মিলিত হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। এ ধরনের সকল বর্ণনাকেই তিনি অনির্ভরযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইবন আসাকির (র) উমর ইবন আবদুল আযীয (র), ইবরাহীম আত-তায়মী, সুফইয়ান ইবন উয়াইনা (র) এবং আরো অনেকের সাথে খিযির (আ) মিলিত হয়েছিলেন বলে বর্ণনা করেছেন।

যারা বিশ্বাস করেন যে, খিযির (আ) আজও বেঁচে আছেন। এসব রিওয়ায়তই তাদের এরূপ বিশ্বাসের ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে মারফূ 'বলে কথিত যে সব বর্ণনা রয়েছে সেগুলো অত্যন্ত দুর্বল। এ ধরনের হাদীস বা বর্ণনা দ্বারা ধর্ম ও ঘটনার ব্যাপারে দলীল পেশ করা যায় না। বড়জোর এগুলোকে কোন সাহাবীর উক্তি বলা যেতে পারে, আর সাহাবীকে তো মাসুম বলা যায় না।'[১]

আবদুর রাজ্জাক (র) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একদিন দাজ্জাল সম্পর্কে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, দাজ্জাল আবির্ভূত হবে, কিন্তু মদীনার রাস্তায় প্রবেশ করা তার জন্যে নিষিদ্ধ। রাস্তার মাথায় আসলে মদীনার একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তার দিকে অগ্রসর হয়ে বলবেন— আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি দাজ্জাল যার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে বলে গিয়েছেন। দাজ্জাল বলবে— তোমরা কি বল? যদি আমি এ লোকটিকে হত্যা করি ও পরে জীবিত করি, তোমরা কি আমার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে? তারা বলবে, না। দাজ্জাল লোকটিকে হত্যা করবে, পুনরায় জীবিত করবে। যখন ঐ ব্যক্তি জীবিত হবেন, তখন তিনি বলবেন, আল্লাহ তা'আলার শপথ! তোমার সম্বন্ধে এখন আমার অন্তর্দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হল। বর্ণনাকারী বলেন, দাজ্জাল দ্বিতীয়বার তাকে হত্যা করতে উদ্যত হবে, কিন্তু সে তা করতে পারবে না। বর্ণনাকারী মা'মার (র) বলেন, 'আমার কাছে এরূপ বর্ণনাও পৌঁছেছে যে, ঐ মুমিন বান্দার গলা তামায় পরিণত করা হবে।' আবার এরূপ বর্ণনাও পৌঁছেছে, যে ব্যক্তিকে দাজ্জাল একবার হত্যা করবে এবং পুনরায় জীবিত করবে—তিনি হচ্ছেন খিযির (আ)।

উপরোক্ত হাদীসটি বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে রয়েছে। কোন কোন হাদীসের মূল পাঠ নিম্নরূপ রয়েছে। فياتى بشاب تمتلى شبابا فيقتله অর্থাৎ দাজ্জাল একজন ভরা যৌবনের অধিকারী যুবককে নিয়ে আসবে এবং তাকে হত্যা করবে। হাদীছে উল্লেখিত মূল পাঠ الذى حدثنا عنه رسول الله صلعم। এর দ্বারা রাসূল (সা)-এর মুখ থেকে বর্ণনাকারী শুনেছেন বলে বোঝা যায় না বরং এটা বহুল প্রচলিত বিবরণও হতে পারে। যা বহু সংখ্যক লোক এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায় শুনেছেন। শায়খ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী (র) তাঁর কিতাব عجالة المنتظر এ সম্পর্কে মারফূ রূপে বর্ণিত হাদীসগুলোকে জাল বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন থেকে যে সব বর্ণনা এসেছে এগুলোর সূত্রসমূহ দুর্বল এবং বর্ণনাকারীদের পরিচয়বিহীন বলে তিনি আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর এ সমালোচনা চমৎকার।

১. সাহাবীগণ মাসুম না হলেও তাঁদের দোষ চর্চা বা নিন্দাবাদ জায়েয নয়।

খিযির (আ) ইনতিকাল করেছেন বলে যাঁরা অভিমত পেশ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, ইমাম বুখারী (র), ইবরাহীম আল হারবী (র), আবুল হুসায়ন ইবনুল মুনাদী (র), ইবনুল জাওযী (র)। ইবনুল জাওযী এ ব্যাপারে অধিকতর ভূমিকা নিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি عجالة المنتظرفى شرح حالة الخضر একটি কিতাব লিখেছেন। এতে বিভিন্ন প্রকারের দলীল রয়েছে। সে দলীলসমূহের একটি হল আল্লাহর বাণী ঃ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ অর্থাৎ —আমি তোমার পূর্বেও কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৪)

সুতরাং খিযির (আ) মানুষ হয়ে থাকলে তিনিও অবশ্যই এই সাধারণ নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর বিশুদ্ধ দলীল ব্যতীত তাঁকে ব্যতিক্রম বলে গণ্য করা যাবে না। সাধারণ নিয়ম হচ্ছে ব্যতিক্রম না থাকা—যতক্ষণ না নবী করীম (সা) থেকে তার সপক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায়। খিযির (আ)-এর ক্ষেত্রে এরূপ কোন ব্যতিক্রমের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا اٰتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوْا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ.

স্মরণ কর যখন আল্লাহ নবীদের অংগীকার নিয়েছিলেন, 'তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তারপর তোমাদের কাছে যা রয়েছে তার সমর্থক রূপে যখন একজন রাসূল আসবে, তখন তোমরা অবশ্যই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করলে? এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে?' তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।' (সূরা আল ইমরান : ৮১)

ইবন আব্বাস (রা) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রেরিত প্রত্যেক নবী থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, যদি মুহাম্মদ (সা)-কে তাঁর আমলে পাঠানো হয় এবং তিনি জীবিত থাকেন, তাহলে তিনি মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবেন ও তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য সহায়তা করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে হুকুম দিয়েছিলেন তিনি যেন তার উম্মত থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নেন যে, যদি তাদের জীবিত অবস্থায় তাদের কাছে মুহাম্মদ (সা)-কে প্রেরণ করা হয় তাহলে তারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে ও তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। সুতরাং খিযির (আ) যদি নবী কিংবা ওলী হয়ে থাকেন তাহলে তাঁর ক্ষেত্রেও এই অঙ্গীকার প্রযোজ্য। তিনি যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগে জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময়েই তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে হাযির থাকতেন, রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতেন এবং রাসূল (সা)-কে তিনি সাহায্য করতেন। যাতে কোন শত্রু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ক্ষতি করতে না পারে। আর তিনি যদি ওলী হয়ে থাকেন, তাহলে আবূ বকর সিদ্দিক (রা) ছিলেন তাঁর থেকে বেশি মর্যাদাবান। আর যদি নবী হয়ে থাকেন তাহলে মূসা (আ) ছিলেন তাঁর থেকে বেশি মর্যাদাবান।

ইমাম আহমদ (র) তাঁর মুসনাদে.... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, যে পবিত্র সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, যদি মূসা(আ) আমার যমানায় বেঁচে থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ ব্যতীত তাঁর কোন উপায় থাকত না। এ ব্যাপারটি সন্দেহাতীতভাবে সত্য, এবং ধর্মের একটি মৌলিক বিষয়— যা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট এবং এর জন্য কোন দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। উপরোক্ত আয়াতটিও তার সমর্থন করে। যদি নবীগণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় জীবিত থাকতেন, তাহলে তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসারী হতেন এবং তাঁর আদেশ-নিষেধের আওতাধীন থাকতেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিরাজের রাতে যখন সকল নবীর সাথে মিলিত হলেন, তাঁকে তাঁদের সকলের উপরে মর্যাদা দান করা হয়, আর যখন তাঁরা তাঁর সাথে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবতরণ করেন ও সালাতের ওয়াক্ত হয় আল্লাহ্ তা'আলার আদেশে আদিষ্ট হয়ে জিবরাঈল (আ) রাসুলুল্লাহ (সা)-কে তাঁদের সকলের ইমামতি করতে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের অবস্থান স্থল কর্তৃত্বের এলাকায় তাঁদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা) শ্রেষ্ঠ ইমাম ও মহাসম্মানিত আখেরী রাসূল।

যখন জানা গেল আর প্রত্যেক মুমিন বান্দার নিকটই তা সুবিদিত যে, যদি খিযির (আ) জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মত ও তাঁর শরীয়তের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হতেন। এছাড়া তাঁর গত্যন্তর থাকত না। ধরুন, ঈসা (আ)-এর কথা। তিনি যখন শেষ যমানায় অবতরণ করবেন, তখন তিনি মহানবীর পবিত্র শরীয়ত মুতাবিক ফয়সালা করবেন। তিনি এই শরীয়তের বহির্ভূত কোন কাজ করবেন না এবং এর বিরোধিতাও করবেন না। অথচ তিনি পাঁচজন শ্রেষ্ঠ (اولو العزم) পয়গাম্বরের অন্যতম এবং তিনি বনী ইসরাঈলের শেষ নবী। এটা জানা কথা যে, কোন সহীহ কিংবা সন্তোষজনক 'হাসান' পর্যায়ের বর্ণনা পাওয়া যায় না, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খিযির (আ) কোন একদিনও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে মিলিত হয়েছিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে কোন একটি যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেননি। বদরের যুদ্ধের কথা ধরুন, সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করছিলেন, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন এবং কাফিরদের মুকাবিলায় বিজয় প্রার্থনা করছিলেন, তখন তিনি বলছিলেন, এই ছোট দলটি যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে আর তোমার ইবাদত হবে না। ঐ ছোট দলটিতে ছিলেন সেদিন মুসলমানদের ও ফেরেশতাদের নেতৃবর্গ, এমনকি জিবরাঈল (আ)ও তথায় উপস্থিত ছিলেন। যেমন হাসসান ইবন ছাবিত (রা) তাঁর কাসীদার একটি লাইনে—যাকে আরবের শ্রেষ্ঠ গৌরবগাঁথা বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে– বলেন ঃ

وثبير بدر اذ يرد وجوههم -جبريل تحت لوائنا ومحمد .

অর্থাৎ— বদরের সাবীর পাহাড়ে আমাদের পতাকাতলে জিবরাঈল (আ) ও মুহাম্মদ (স) কাফিরদের প্রতিহত করছিলেন।

যদি খিযির (আ) জীবিত থাকতেন তাহলে তার এই পতাকাতলে থেকে যুদ্ধ করাটাই হত তাঁর মহান মর্যাদা ও সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধাভিযান।

কাজী আবূ ইয়ালা মুহাম্মদ ইবনু হুসাইন হাম্বলী (র) বলেন,'আমাদের জনৈক আলিমকে খিযির (আ) সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তিনি কি ইন্তিকাল করেছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তিনি আরও বলেন, অনুরূপ বর্ণনা আবূ তাহের ইবনুল গুবারী (র) সূত্রেও আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তিনি এভাবে যুক্তি দেখাতেন যে, যদি খিযির (আ) জীবিত থাকতেন তাহলে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে অবশ্যই আগমন করতেন। এ তথ্যটি ইবনুল জাওযী (র) তাঁর 'আল-উজালা' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

কোন ব্যক্তি যদি এরূপ বলেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁকে দেখেনি। তা হলে তার উত্তর হবে যে, এরূপ সম্ভব নয়, এটা সুদূর পরাহত। কেননা, এতে শুধু ধারণার বশবর্তী হয়ে সাধারণ নিয়ম-কানুনকে বাদ দিয়ে বিষয়টিকে বিশেষভাবে বিচার করতে হয়। অতঃপর একথাটিও বিবেচ্য যে, রহস্যাবৃত হবার চেয়ে এতেই তাঁর মর্যাদা ও মুজিযা বেশি প্রকাশ পেতো। পুনরায় যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরে তাঁকে জীবিত ধরা হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইনতিকালের পর হাদীসসমূহ ও কুরআনুল করীমের আয়াতসমূহের প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তাতো। উপরন্তু মিথ্যা হাদীস বিকৃত রিওয়ায়েতের বিরুদ্ধাচরণ, বিভিন্ন বাতিল মতবাদের খণ্ডন, মুসলিম জামাতের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ, জুম'আ ও জামায়াতে উপস্থিত হওয়া, তাদের উপকার সাধন করা এবং তাদের প্রতি অপরের ক্ষতিসাধনকে প্রতিহত করা, উলামায়ে কিরামকে সৎপথে পরিচালিত করা ও অত্যাচারী শাসকদের সঠিক পথে চলতে বাধ্য করা এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা ইত্যাদি কর্তব্য পালন, বিভিন্ন শহরে, বনে-জঙ্গলে তার কথিত আত্মগোপন করে থাকা, এমন লোকদের সাথে বসবাস করা যাদের অধিকাংশের অবস্থা অজানা এবং তাদের তত্ত্বাবধান করা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেয়। এ আলোচনার পর এ বিষয়ে আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। আল্লাহ্ তা'আলা যাকে চান তাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে এবং অন্যান্য কিতাবেও আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ্ (সা) এশার নামায আদায় করলেন এবং সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন, আজকের রাতে তোমরা কি একটা কথা চিন্তা করেছ যে, আজকের দিনে যারা পৃথিবীতে জীবিত রয়েছে, একশ' বছর পর তাদের কেউই পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকবে না। বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বলেন, একথা শুনে লোকজন ভীত হয়ে পড়লেন। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর যুগের সমাপ্তির কথাই বুঝাচ্ছিলেন। ইমাম আহমদ (র)ও সামান্য শাব্দিক পার্থক্যসহ অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর ইনতিকালের একমাস কিংবা কিছুদিন পূর্বে বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা এখন জীবিত, একশ' বছরের মাথায় তাদের কেউই জীবিত থাকবে না।

অন্য এক সূত্রে ইমাম আহমদ (র) জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সা) ইনতিকালের একমাস পূর্বে বলেন, তারা আমাকে কিয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছে, অথচ এ সম্বন্ধে শুধু আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। আল্লাহর শপথ, আজকাল পৃথিবীতে

যারা রয়েছে তাদের কেউই একশ' বছর অতিক্রম করবে না। ইমাম মুসলিম (র) ও তিরমিযী (র) অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইবনুল জাওযী (র) বলেন, উপরোক্ত বিশুদ্ধ হাদীসগুলো খিযির (আ)-এর বেঁচে থাকার দাবিকে নাকচ করে দেয়। অন্যন্যা উলামা বলেন, খিযির (আ) যদি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ না পেয়ে থাকেন, যেমন দৃঢ় দলীল দ্বারা বোঝা যায়— তাতে কোন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে না। আর যদি তিনি তাঁর যুগ পেয়ে থাকেন তাহলে এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি একশ' বছর পর আর জীবিত ছিলেন না। সুতরাং এখন আর তিনি বেঁচে নেই। কেননা তাঁর ক্ষেত্রেও সাধারণ নীতি প্রযোজ্য। যতক্ষণ না, ব্যতিক্রমের অকাট্য দলীল পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলাই সম্যক জ্ঞাত। হাফিজ আবুল কাসিম সুহায়লী তাঁর কিতাব التعريف والاعلام -এ ইমাম বুখারী (র) আবূ বকর ইবনুল আরাবী (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম (সা)-এর যুগ পেয়েছেন, কিন্তু এরপর তিনি উপরোক্ত হাদীসের মর্ম অনুসারে ইনতিকাল করে গিয়েছেন। খিযির (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে ইমাম বুখারী যে মন্তব্য করেছেন, এতথ্যটিতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সুহায়লী (র) খিযির (আ)-এর ঐ পর্যন্ত বেঁচে থাকার বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এটাই অধিকাংশের মত বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, তাঁর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করা এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইনতিকালের পর নবী পরিবারের প্রতি তাঁর সমবেদনা জ্ঞাপনের বিষয়টি বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর তিনি আমাদের পূর্বে বর্ণিত দুর্বল হাদীসগুলো উপস্থাপন করেন কিন্তু এগুলোর সূত্র উল্লেখ করেননি। আল্লাহ তা'আলাই সম্যক অবগত।

ইলিয়াস (আ)

মূসা ও হারূন (আ)-এর ঘটনা বর্ণনার পর আল্লাহ তা'আলা সূরা আসসাফ্ফাতে ইরশাদ করেন ঃ

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ. إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُوْنَ. أَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَتَذَرُوْنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ. اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ. فَكَذَّبُوْهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ. إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ. سَلَامٌ عَلٰى إِلْ يَاسِيْنَ. إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ.

ইলিয়াসও ছিল রাসূলদের একজন। স্মরণ কর, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা কি সাবধান হবে না? তোমরা কি বা'আলকে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে সেই শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা আল্লাহকে, যিনি প্রতিপালক তোমাদের— প্রতিপালক তোমাদের পূর্ব পুরুষদের। কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, কাজেই তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে। তবে আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র। আমি এটা পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইলিয়াসের (ইলিয়াস ও তার অনুসারীদের) ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম। (সূরা সাফ্ফাত ১২৩-১৩২)

বংশ পরিচয় বিশারদগণ বলেন, তিনি ছিলেন ইলিয়াস তাশাবী। আবার বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন ইবন ইয়াসীন ইবন ফিনহাস ইবন আল ঈযার ইবন হারূন (আ)। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন ইলিয়াস ইবন আল আযির ইবনুল ঈযার, ইবন হারূন, ইবন ইমরান (আ)। আবার কথিত আছে, তাঁকে দামেশকের পশ্চিমস্থ বা'লাবাক[১]-এর অধিবাসীদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল।

তিনি তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আহ্বান করলেন এবং তাদের দেব মূর্তি বা'ল-এর ইবাদত করতে তাদেরকে বারণ করলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, বা'ল ছিল একটি মহিলার নাম। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটিই শুদ্ধ। এজন্যই ইলিয়াস (আ) তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

أَلَا تَتَّقُوْنَ. أَتَدْعُوْنَ بَعْلًا وَتَذَرُوْنَ أَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ. اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ اٰبَائِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ.

---

১. এটি লেবাননের সুপরিচিত এলাকা।

অর্থাৎ— "তোমরা কি সাবধান হবে না? তোমরা কি বা'লকে ডাকবে এবং পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলাকে, যিনি তোমাদের প্রতিপালক ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক?"

তারপর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, তাঁর বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। কথিত আছে যে, তিনি তাদের থেকে পলায়ন করে আত্মগোপন করেছিলেন। আবূ ইয়াকূব আযরাঈ (র) কা'ব আহবার (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ইলিয়াস (আ) নিজ সম্প্রদায়ের বাদশার ভয়ে দম পাহাড়ের নিচে গুহার মধ্যে দীর্ঘ দশ বছর আত্মগোপন করেছিলেন। ঐ বাদশাহর মৃত্যু হলে পরবর্তী বাদশাহর নিকট ফিরে এসে তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। বাদশাহ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দশ হাজার লোক ছাড়া তাঁর সম্প্রদায়ের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। বাদশাহর নির্দেশে ঐ দশহাজার লোককে হত্যা করা হয়।

ইব্‌ন আবিদ দুনিয়া (র) দামেশকের জনৈক শায়খের বরাতে বর্ণনা করেন, ইলিয়াস (আ) তাঁর সম্প্রদায় থেকে পলায়ন করে এক পাহাড়ের গুহায় বিশ দিন কিংবা চল্লিশ দিন যাবত আত্মগোপন করেছিলেন। কা'বের দল তার খাবার নিয়ে আসত।

ওয়াকেদীর সচিব মুহাম্মদ ইবন সাদ (র) মুহাম্মদ ইবন সায়িব কালবী (র) থেকে বর্ণনা করেন : সর্বপ্রথম প্রেরিত নবী হচ্ছেন ইদরীস (আ), এরপর নূহ (আ), এরপর ইবরাহীম (আ), এরপর ইসমাঈল (আ) ও ইসহাক (আ), এরপর ইয়াকূব (আ), এরপর ইউসুফ (আ), এরপর লুত (আ), এরপর হূদ (আ), এরপর সালিহ (আ), এরপর শু'আয়ব (আ), এরপর ইমরানের পুত্রদ্বয় মূসা ও হারূন (আ), এরপর ইলিয়াস তাশাবী ইবন কাহিস, ইবন লাওয়ী, ইবন ইয়াকূব (আ), ইব্‌ন ইসহাক (আ), ইব্‌ন ইরবাহীম (আ)। নবীদের উপরোক্ত বিন্যাস সন্দেহমুক্ত নয়।

মাকহূল (র) কা'ব (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, চারজন নবী জীবিত রয়েছেন, দু'জন যমীনে যথা ইলিয়াস ও খিযির (আ) এবং দু'জন আকাশে যথা ইদরীস (আ) ও ঈসা (আ)।

পূর্বেই ঐসব ব্যক্তির উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। যারা বলে থাকেন , ইলিয়াস (আ) ও খিযির (আ) প্রতি বছর রমযান মাসে বায়তুল মুকাদ্দাসে একত্রিত হন। প্রতি বছর একত্রে হজ্জ করেন এবং তাঁরা দু'জনই যমযম কুয়ার পানি এমন পরিমাণে পান করেন যে, পরবর্তী বছর পর্যন্ত তাঁদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়। এরূপ হাদীসও আমরা উদ্ধৃত করে এসেছি; যাতে বলা হয়েছে, "তাঁরা দু'জন প্রতি বছর আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হন।" আবার এই কথাটিও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এগুলোর কোন একটিও শুদ্ধ নয়। বরং দলীল-প্রমাণে বোঝা যায় যে, খিযির (আ) ও ইলিয়াস (আ) ইনতিকাল করেছেন।

ওহাব ইবন মুনাব্বিহ ও অন্যরা বর্ণনা করেন, যখন ইলিয়াস (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায় মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল ও তাঁকে কষ্ট দিতে লাগল, তখন তাঁর রূহ কবয করার জন্য তিনি

তাঁর প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করলেন। অতঃপর তাঁর কাছে একটি চতুষ্পদ জন্তু আসল যার রঙ ছিল আগুনের মতো। তিনি তার ওপর সওয়ার হলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মূল্যবান নূরের পোশাক পরিধান করালেন, তাঁর পানাহারের স্বাদ তিরোহিত করলেন এবং তিনি একাধারে মানবীয়, ফেরেশতাসুলভ আসমানী ও যমীনী সত্তায় পরিণত হলেন। তিনি ইয়াসা ইবন আখতুব (আ)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এই বর্ণনাটি সন্দেহযুক্ত। এটা ইসরাঈলী বর্ণনা— যেগুলোকে সত্য বা মিথ্যা কোনটাই বলা যায় না। বরং এটার সত্যতা সুদূর পরাহত। আল্লাহ্ তা'আলাই সম্যক পরিজ্ঞাত।

হাফিজ আবূ বকর বায়হাকী (র) আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে একটি সফরে ছিলাম। অতঃপর আমরা একটি মনযিলে অবতরণ করলাম ও উপত্যকায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম।

তিনি দু'আ পড়ছেন ঃ

اللهم اجعلني من امة محمد صلي الله عليه وسلم المرحومة المغفورة المتاب لها.

অর্থাৎ— হে আল্লাহ্! আমাকে রহমত প্রাপ্ত, ক্ষমাপ্রাপ্ত ও তাওবা কবুলকৃত উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত করুন!

আনাস (রা) বলেন, আমি উপত্যকার দিকে অগ্রসর হলাম এবং এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম যার উচ্চতা তিনশ' হাতের অধিক। তিনি আমাকে বললেন— তুমি কে হে? উত্তরে আমি বললাম, 'আমি মালিকের পুত্র আনাস, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খাদিম।' তিনি বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) কোথায়?' আমি বললাম, 'তিনি আপনার কথা শুনছেন।' তিনি বললেন, "তুমি তাঁর কাছে যাও এবং তাঁর কাছে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দাও এবং বল, আপনার ভাই ইলিয়াস আপনাকে সালাম দিচ্ছেন।" আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসলাম ও তাঁকে এ সম্বন্ধে সংবাদ দিলাম। তিনি তাঁর কাছে এসে তাঁর সাথে মুলাকাত করলেন, তাঁকে আলিঙ্গন করলেন ও সালাম করলেন। অতঃপর দু'জনে বসে কথোপকথন করতে লাগলেন। ইলিয়াস (আ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি বছরে একবার খাবার খাই। আজকে আমার সেই খাওয়ার দিন। আপনিও চলুন, একসাথে খাওয়া-দাওয়া করি। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, তখন আসমান থেকে দু'জনের জন্যে একটি দস্তরখান অবতীর্ণ হল। তার মধ্যে ছিল রুটি, মাছ ও স্যালারী শাক। তাঁরা উভয়ে খেলেন ও আমাকে খেতে দিলেন। এরপর উভয়ে আসরের সালাত আদায় করেন। তারপর ইলিয়াস (আ) রাসূল (সা) থেকে বিদায় নিয়ে মেঘমালার মধ্য দিয়ে আসমানের দিকে চলে গেলেন।

বায়হাকী (র) এ হাদীসটি দুর্বল বলে যে মন্তব্য করেছেন তাই যথেষ্ট। তাজ্জব ব্যাপার হচ্ছে এই যে, হাকিম আবূ আবদুল্লাহ নিশাপুরী (র) তাঁর 'মুস্তাদরাক' গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। যা মুস্তাদরাক গ্রন্থটিকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। এই হাদীসটি জাল এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে অন্যান্য সহীহ হাদীসের পরিপন্থী। প্রথমত এই হাদীসের বক্তব্যই শুদ্ধ নয়।

কেননা, সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে আসমানে সৃষ্টি করেছেন, যার উচ্চতা ছিল ষাট হাত—এরপর সৃষ্টিকুলের উচ্চতা হ্রাস পেতে পেতে বর্তমান আকারে এসে পৌঁছেছে।

দ্বিতীয়ত, হাদীসটিতে রয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে আসেননি, বরং রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। আর এটাও শুদ্ধ হতে পারে না। কেননা, তাঁর পক্ষে এটাই অধিক শোভনীয় ছিল যে, তিনি নিজেই খাতিমুন্নাবীয়ীন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দিকে এগিয়ে আসবেন।

তৃতীয়ত, হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, তিনি বছরে একবার পানাহার করেন অথচ অন্যত্র ওহাব ইবন মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত আছে যে, তার থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পানাহারের স্বাদ রহিত করে দিয়েছিলেন।

চতুর্থত, বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যমযম কূয়া থেকে প্রতি বছর এমনভাবে একবার পানি পান করতেন যা তাঁর পরবর্তী বছর পর্যন্ত যথেষ্ট হত।

এরূপে হাদীসে বিভিন্ন ধরনের বিপরীতধর্মী ও বাতিল তথ্যাদি পরিবেশন করা হয়েছে, যার কোনটাই সঠিক নয়। ইবন আসাকির (র)ও এ হাদীসটি অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন এবং তার কিছু অংশের দুর্বলতা রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, তিনি এই হাদীসটি সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করলেন। অথচ তিনি নিজেই অন্য সূত্রে সবিস্তারে এটি বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে যে, এ ঘটনাটি তাবূকের যুদ্ধের সময় ঘটেছিল। আর তার কাছে রাসূলুল্লাহ (সা) আনাস ইবন মালিক (রা) ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা)-কে পাঠিয়ে ছিলেন। তারা দু'জন বলেন, তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের চাইতে দুই-তিন হাত অধিক উচ্চতাসম্পন্ন এবং উটগুলি পালিয়ে যাবার আশঙ্কার কারণে তিনি স্বয়ং মুলাকাত করতে অক্ষম বলে ওজর পেশ করেছিলেন। আবার এতে আরো রয়েছে, যখন তার সাথে রাসূলুল্লাহ (সা) মুলাকাত করেন তখন তাঁরা দু'জন মিলে জান্নাতী খাবার খান। তখন ইলিয়াস (আ) বলেন, আমি চল্লিশ দিনে একবার এক লোকমা খাবার খেয়ে থাকি। আর অন্যদিকে দস্তরখানে ছিল রুটি, ডালিম, আঙ্গুর, কলা, খেজুর, অন্যান্য শাক-সবজি— তবে তাতে পিঁয়াজ-রসুন জাতীয় কিছু ছিল না। এতে আরো রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে খিযির (আ)-এর সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, আমার সাথে তাঁর সাক্ষাত করার কথা বছরের প্রথমে। তাই তিনি আমাকে বলেছেন, "তুমি আমার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তুমি আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম দিবে।" এতে বোঝা যায় যে, খিযির (আ) ও ইলিয়াস (আ) যদি বেঁচেও থাকেন এবং এ হাদীসটি যদি শুদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে নবম হিজরী পর্যন্ত সাক্ষাৎ করেননি। আর এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কাজেই এই হাদীসটিও জাল। ইবন আসাকির (র) বিভিন্ন সূত্রে ইলিয়াস (আ)-এর সাক্ষাৎ লাভকারী বিভিন্ন ব্যক্তির বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু এসব বর্ণনায় দুর্বলতা ও বর্ণনাকারীরা অজ্ঞাত পরিচয়

হওয়ায় তিনি এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। এ বর্ণনাসমূহের সর্বোত্তমটি হচ্ছে যা আবূ বকর ইবন আবীদ দুনিয়া (র) বর্ণনা করেছেন। তিনি ছাবিত (র) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমরা মুস'আব ইবন যুবায়র (র)-এর সাথে কূফার শহরতলিতে অবস্থান করছিলাম। আমি একটি বাগানে প্রবেশ করলাম। সেখানে দুই রাকাত সালাত আদায় করছিলাম। আমি শুরু করলাম ঃ

حٰمٓ - تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ. غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ.

অর্থাৎ– হা-মীম, এই কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হতে যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবূল করেন, যিনি শাস্তিদানে কঠোর শক্তিশালী। (সূরা মু'মিন ঃ ১-৩)

আমার পেছনে ছিলেন এক ব্যক্তি তিনি ধূসর বর্ণের এক খচ্চরের পিঠে সওয়ার ছিলেন। তার গায়ে ছিল ইয়ামানী চাদর। তিনি আমাকে বললেন, যখন তুমি বল غافر الذنب তখন তুমি বলবে يا غافر الذنب اغفرلى ذنبى হে ক্ষমাকারী! আমার পাপ ক্ষমা করে দাও; যখন তুমি বলবে قابل التوب তখন তুমি বলবে- يا قابل التوب تقبل توبتى হে তওবা কবূলকারী! আমার তওবা কবূল কর; যখন তুমি বলবে شديد العقاب তখন তুমি বলবে يا شديد العقاب لا تعاقبنى- অর্থাৎ হে শাস্তিদানে কঠোর সত্তা! আমাকে শাস্তি দিও না; যখন তুমি বলবে ذى الطول তখন তুমি বলবে يا ذا الطول تطول على برحمة অর্থাৎ হে শক্তিশালী প্রভু! তুমি আমার জন্য রহমতকে বাড়িয়ে দাও। তখন আমি পেছনের দিকে তাকালাম কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। বের হয়ে গেলাম। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, ধূসর রংয়ের খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে ইয়ামানী চাদর গায়ে কেউ কি তোমাদের পাশ দিয়ে গিয়েছেন? তারা বলল, 'না আমাদের এদিক দিয়ে কেউ অতিক্রম করেনি।' তখন তারা সকলে ধারণা করলেন যে, তিনি ইলিয়াস (আ)-ই হবেন।

সূরায়ে সাফ্ফাতে ইরশাদ হয়েছে فَكَذَّبُوْهُ فَاِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ এর অর্থ হচ্ছে, তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিল। কাজেই তাদের অবশ্যই শাস্তির জন্য উপস্থিত করা হবে। (সূরা সাফ্ফাত ঃ ১২৭)

অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে কিংবা শুধু আখিরাতে। তাফসীরকার ও ঐতিহাসিকগণের অভিমত অনুযায়ী প্রথম অর্থটিই স্পষ্টতর। আল্লাহর বাণী اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ-এর অর্থ হচ্ছে, তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করেছে ও একনিষ্ঠ বান্দা হিসেবে গণ্য হয়েছে। আয়াতে উল্লেখিত وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ এর অর্থ হচ্ছে— তারপরে জগতে পরবর্তীদের মধ্যে তাঁর সুখ্যাতি অব্যাহত রেখেছি। তারা তাঁর সুনামই করে থাকে। আর

এজন্যই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন سَلٰمٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ অর্থাৎ ইলিয়াস (আ)-এর উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (সূরা সাফ্ফাত : ১৩০)

আরবগণ অধিকাংশ নামের সাথে নূনকে যুক্ত করে এবং শেষ অক্ষরকে পরিবর্তন করে পাঠ করে। যেমন তারা اسماعيل শব্দটিকে اسماعين, اسرائيل শব্দটিকে اسرائين، الياس শব্দটিকে الياسين রূপে পাঠ করে। আর যারা سلام على ال ياسين পড়ে থাকেন। তাদের উদ্দিষ্ট থাকে, শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবার পরিজনের প্রতি।

ইবন মাসঊদ (রা) ও অন্যরা পাঠ করেন : سلام على ادريس ইবন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, الياس হচ্ছেন - ادريس (আ)। এটি যাহ্হাক, কাতাদা ও মুহাম্মদ ইবন ইসহাক (র)-এর অভিমত। তবে বিশুদ্ধ মতামত হচ্ছে الياس ও ادريس ভিন্ন ভিন্ন দু'জন নবী—যেমন পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাই সম্যক জ্ঞাত।

আল্লাহ্র শোকর— আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হল। এর অব্যবহিত পরেই আসছে এর দ্বিতীয় খণ্ড, যার শুরুতে থাকবে মূসা (আ)-এর পরবর্তী বনী ইসরাঈলের নবীগণের বর্ণনা।

ইফাবা–২০০৬-২০০৭–প্র/৯৮৮২ (উ)–৩,২৫০